ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৩ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০]   ভারতী কার্য্যালয়,   [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

১৩২৩ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

চিত্র-সূচী

উমার তপস্যা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

৪০শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২৩ [১ম সংখ্যা

প্রণাম

অতনু আকাশে যাঁর বিহার
যাঁর প্রকাশ চিত্ত ভায়
সবিতা বারতা বয় যাঁহার
আজ প্রণাম তাঁর দু' পায়।

সাগরে সরিতে মূর্চ্ছনায়
হয় নিতুই যাঁর বোধন,—
প্রভাতে প্রদোষে রোজ জোগায়
অর্ঘ্য যাঁর পুষ্পবন ;—

দেহে দেহে যিনি প্রাণ প্রবল,—
প্রাণ-পুটের প্রেম অনুপ,—
প্রেমে প্রেমে যিনি হন্ উজল,—
রূপ যাঁহার বাক্ অরূপ ;—

ভারতী আরতি হেম প্রদীপ
যাঁর পূজায় নিত্য দিন
মানসে যিনি আনন্দ নীপ
বন্দি তাঁয় জাগ্‌রে, দীন !

জাগিয়া, মাগিয়া লও আশিস্,
গাও নবীন ছন্দে গান,
নব সুরে ওরে ! আজ বাঁধিস্
তোর তানেই বিশ্বপ্রাণ।

তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায় !
কচি কিশলয়ে কুঞ্জ ছায়
সব তরুণ আজ ধরায় !

তরুণী আশারে সঙ্গী কর
আজ আবার, মন রে মন !
চির নূতনেরি যেই নিঝর
ব্যক্ত আজ সেই গোপন।

প্রাণে প্রাণে শুধু যাঁর প্রকাশ,
যাঁর আভাষ মন্-পবন,
গানে গানে নিতি যাঁর বিলাস
বন্দি আজ তাঁর চরণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুষ্পাঞ্জলি

ভারতী ভারতের আজিকের দেবতা ন'ন্। ব্রহ্মাবর্ত্তে যে সময়ে নদী-সরস্বতী পূর্ণ যৌবনে বহমানা ছিলেন—দেবী সরস্বতী তখন সেই নদী-সরস্বতীর সাগর সঙ্গমের গভীর তল-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভূলোক দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষ স্পর্শ করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় বিরাজমানা ছিলেন। ঋক্‌বেদে আছে—বাক্ বলিতেছেন ঃ—

"অহং সুবে পিতরং অস্য মূর্ধন্। মম যোনিরপ্স্ অন্তঃ সমুদ্রে। ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা উতামূং দ্যাং বর্ষ্মনা উপস্পৃশামি।"

ইহার অর্থ ঃ—এই পৃথিবীর মূর্দ্ধস্থিত পিতা-আকাশকে আমি প্রসব করিয়াছি। আমার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের গভীরে পরিব্যাপ্ত জলরাশিতে। সেখান হইতে উত্থান করিয়া আমি সমস্ত ভুবনে পরিব্যাপ্ত হই এবং ভুবন ছাড়াইয়া ঐ দ্যুতিমান আকাশ স্পর্শ করি।

ঋক্‌বেদের আর এক স্থানে আছে "সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং নঃ। ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্ত্তিঃ।"

ইহার অর্থ ঃ—সরস্বতী আমাদের বুদ্ধি সাধন করিতেছেন ঃ—সেই ইলা—সেই দেবী ভারতী—যিনি সর্ব্ববিষয়গতা, তিনি আমাদের বুদ্ধি সাধন করিতেছেন।

এ-ভারতী এখনকার কালের এই সাজাইয়া গুজাইয়া পুতুলটির মতো করিয়া দাঁড় করানো স্বরস্বতী ন'ন। ভারত যখন ভারত ছিল—দেবী ভারতী সেই জীবন্ত ভারতের জাগ্রত জীবন্ত দেবতা ছিলেন! তিনিই আসল-ভারতী!

তোমাদের পুনঃপুনঃ প্রীতির আহ্বানে চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আমি আজ সূক্ষ্ম শরীরে ভারতী সদনে উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে আর কালবিলম্ব না করিয়া ভারতের সেই চিরারাধ্যা দেবী ভারতীর চরণে ভক্তিনম্র হৃদয়ে শান্তিনিকেতনের বনপুষ্পের অঞ্জলি দিই ঃ—

দেহি জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহি প্রীতি—শুদ্ধ প্রীতি, তুমী মঙ্গল আলয়। ধৈর্য্য দেহি, বীর্য্য দেহি, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহি, বিবেক বৈরাগ্য দেহি, দেহী ও-পদ আশ্রয়!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশীর্ব্বাদ

ভারতীকে গড়িয়া তুলিলাম কিরূপে, এইকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি ভারতীকে কতটুকু গড়িয়াছি বা না গড়িয়াছি তাহা ত আমি জানি না, ভারতী যে আমাকে 'এই আমি' করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহাই আমি জানি।

পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানস-তনয়া, কল্পনালব্ধা ভারতী; সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাহার বরপুত্র, আমার সাধ্য কি যে আমি তাঁহাকে গড়ি। তাঁহার সেবার অধিকার পাইয়াছিলাম ইহাই আমার সৌভাগ্য।

পূজার আয়োজনে ফুলমালা হইতে রত্ন-মালা গাঁথিয়াছি; জানিনা, সে ফুল পারিজাত বা অপরাজিতা, সে রত্ন হীরকমণি বা কঙ্কর, —সে বিচার আজি তোমরা কর; ভারতীকে মাল্যভূষিত করিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি আমি শুধু তাহাই জানি।

ভারতীর নব-আবির্ভাব দিনে পূজা করিতে আসিয়াছেন যত নবীন পূজারি; তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের গুরুর আসনে বসাইয়া আমার নিকট হইতে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বল্প-সন্তানের জননী আমি, ভারতীর প্রসাদে শত-সন্তানের মাতা হইয়া আপনাকে কৃতার্থ, ধন্য বোধ করিয়াছি। এখনো তাঁহাদের নিকট আমার গুরুর অধিকার অচল অটল কিনা তাহা জানি না; একদিন যে তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ মাতৃ-সম্বোধনে হৃদয় গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আমি শুধু তাহাই জানি।

কত সময় পূজার উপচার যোগাইতে না পারিয়া দুঃখে কষ্টে অবসন্ন হইয়াছি; তখন কত অযাচিত বন্ধু আমার সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই আজি আর ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম প্রীতি-সহায়তা আমার হৃদয়মন এখনো স্মৃতিপূর্ণ করিয়া আছে —চিরদিনই থাকিবে, আমি ইহাই জানি।

আজিও আমার আনন্দের দিন। দেখিতেছি ভারতী-মন্দিরে পূজারির আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। মণিভূষণে দেবী মনোমোহিনী-রূপ ধারণ করিয়াছেন।

হে নবীন পূজারি, তোমার কথা—ভাবে ভাষায়, তোমার গাথা—ছন্দে বন্ধে, তোমার বীণা—রাগে মূর্চ্ছনায়, তোমার গান—সুতানে সুলয়ে, ভারতীর পত্রে পত্রে ঝঙ্কার শিহরণ তুলিয়া বঙ্গের সাহিত্যাকাশ অপূর্ব্ব যশঃ পূরিত করুক, প্রবীণ পূজারির এই আশীর্ব্বাদ লইয়া নববর্ষে নবউদ্যমে, নব অনুরাগে তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ কর।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নব বার্ষিকী

তব যাত্রা শুভ হোক, বান্ধব আমার,
অরুণের তরুণ কিরণ শ্রান্ত ললাটে তোমার,
প্রভাতের আশীর্ব্বাদ দিক্ বারম্বার !

উন্মেষিত কমলের আনন্দ সৌরভ,
বিকাশের আগমনী, জাগিবার একান্ত গৌরব
তোমার অন্তরে দিক্ তৃপ্তি অভিনব।

নিশীথের বিদায়ের সিক্ত পুষ্পাঞ্জলি
ঝরুক আতপ্ত শিরে, নেত্রে আলো উঠুক উজলি,
কল গীতে পূর্ণ হ'ক স্তব্ধ বনস্থলী !

পিছনে পড়িয়া থাক্ নিশার কালিমা,
অশ্রুভরা মর্ত্ত্যব্যথা, আকাশের অমর নীলিমা
সম্মুখে দেখাক্ খুলি অপার মহিমা !

যে আনন্দে ক্ষোভ ক্ষতি লোপ হয়ে যায়,
যে আলোকে সব ছায়া ত্রস্ত পদে চকিতে মিলায়,
সে সম্পদ লভ' সৌম্য,—প্রাণ মোর চায় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কবির নীড়

স্নেহাস্পদেষু,

কি-সূত্রে ভারতীর জন্ম হল, আমার জীবন-স্মৃতিতে, সেটা সংক্ষেপেই বলেছি বটে। অনেক দিন হল ; সব কথা আমার এখন মনে নেই। তবে, কি রকম আব্-হাওয়ার মধ্যে, কি রকম পরিবেষ্টনের মধ্যে ভারতীর জন্ম হয়, তার একটু আভাস তোমাকে দিতে পারি।

সে সময়ে নব-রত্নপরিবেষ্টিত আমাদের সাহিত্য-বিক্রমাদিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, "বঙ্গদর্শনে"র সিংহাসনে আসীন হয়ে বঙ্গ-সাহিত্যের রাজ্যে একাধিপত্য করছিলেন। আশ-পাশের আকাশে দুই তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, কবিতার কিরণধারা বর্ষণ করছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রতিভা-প্রভাবে অৰ্দ্ধ-সুপ্ত বঙ্গ-সাহিত্য আবার জেগে উঠেছিল। মৃতকল্প হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম খুব একটা নাড়া পেয়েছিল। আমাদের বাড়ীতেও এই সময় কাব্য-রচনার, গান-রচনার সাহিত্যালোচনার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল। আমার তখন পূর্ণ যৌবন। মন উৎসাহ উদ্যমে, আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ। সৌন্দর্য্যরস, কবিত্বরস উপভোগের জন্য আকুল। একটা অনির্দ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা মনকে দখল করে বসেছিল। "কিছু-একটা করতে হবে"—কিন্তু সে কি তা আমি জানি না। —তা দেশের হিতসাধনই হোক্ আর সাহিত্যের উন্নতিসাধনই হোক্! নানা প্রকার কল্পনা আমার মনে উদয় হত কিন্তু সে-সব অনেক সময়ে কল্পনাতেই অবসান হত।

আমি তখন আমাদের যোড়াসাঁকো বাড়ীর তেতালায় বাস করতুম। তেতালার

ঘরের সংলগ্ন একটা লম্বা ছাদ আছে, তাত তুমি জান। সেই সময়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টবে পোঁতা ঝাউ, নারকেল প্রভৃতি উদ্যান-সুলভ খুব বড় বড় গাছ একটা নিলামে কিনেছিলুম। সেগুল নীচের বাগানে না রেখে, ছাদের উপরে * উঠিয়েছিলুম। গাছগুল কোথাও বা কুঞ্জের মত পুঞ্জীকৃত করে, কোথাও বা সারি-সারি সাজিয়ে, কোথাও বা লতা-বিতান তৈরি করে, ছাদটাকে একটা উদ্যানে পরিণত করেছিলুম। আর, কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা, ভীমরাজ প্রভৃতি সকল রকম গায়ক বিহঙ্গ আমার ছিল। তাদের কলকূজনে, কুহুতানে, ঝঙ্কারে ছাদটা অষ্টপ্রহর মুখরিত হত। আর, নানাপ্রকার সুরভি-ফুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হত। জায়গাটা ভারতী-সেবার পক্ষে কেমন অনুকূল হয়ে উঠল তা ত বুঝ্‌তেই পারচ। কত জ্যোৎস্নাময়ী মধু-যামিনী আমরা এই ছাদে কাটিয়েছি।

আমি তেতালায় যে-ঘরটিতে বসতুম, সেখানে একটা গোল টেবিল, তার চারিধারে খানকতক চৌকি। আর দেয়ালের গায়ে একটা পিয়ানো ছিল। রবি আমার নিত্য সঙ্গী (বালক-কবি তখন জগৎ-কবি হন নি), আর-এক কবি, আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয় মধ্যে মধ্যে এসে জুটতেন। আমরা তিন জনে যখন একত্র এই টেবিলের চারিধারে বসতুম, কত গাল্‌-গল্প হত, কত কবিতা পাঠ হত, কত গান বাজনা হত, গান রচনা হত, তার ঠিকানা নেই। পাখীর গানে যেমন ছাদটা মুখরিত হত, এই দুই কবি-বিহঙ্গের গানে ও কবিতা-পাঠে বৈঠকখানাটাও তেমনি প্রতিধ্বনিত হত।

একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করচি—কি-শুভক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল,—এই দুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আকাশে-আকাশেই উড়ে বেড়াচ্চে, ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্চে। লোকালয়ের কোন কুঞ্জ-কুটীরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটা নীড় বাঁধ্‌তে পারে, তাহলে কতলোকে ওদের স্বর-সুধা পান করে কৃতার্থ হয়। এই কথা মনে হবা মাত্র, দোতালায়* নেমে এলুম!

দোতালার দক্ষিণ-বারণ্ডায় আর-একটি প্রবীণ বিহঙ্গরাজের আসন ছিল। আসনটি জমিতে থাক্‌লেও তিনি স্বপ্নরাজ্যেই উধাও হয়ে অষ্টপ্রহর বিচরণ করতেন। তাঁর সুললিত অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে আমাদের সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। বুঝ্‌তেই পারচ তিনি কে।· আমার প্রস্তাব শোনবা মাত্রই তিনি রাজি হলেন, আর তখনি দেবী "ভারতী"কে আবাহন করে তাঁরই পুণ্যকুঞ্জে, নবীন কবি-বিহঙ্গদের জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন। সেই অবধি দেবীর পূজা অর্চ্চনা হয়ে আস্‌চে। কিছুকাল পরে, দেবীর হাতের বীণাটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়, তারপর এখন আবার সেই স্বর্ণ-বীণাটি মণি-ভূষণে ভূষিত হয়েছে। একেই বলে "মণি-কাঞ্চনের যোগ"!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* কিছুকাল পরে, ভারী-ভারী টবের ভারে ছাদটা জখম হবে এইরূপ আপত্তি ওঠায় ও আশঙ্কা হওয়ায় আমি সেই গাছগুল পালিত-সাহেবকে উপহার-স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

তখন ও এখন

ভারতী চল্লিশ বছরে পড়িল। এই সাময়িক পত্রের নৌকাখানি সময়ের স্রোতে যেদিন প্রথম ভাসানো হইল, সেদিন আমার বয়স ছিল ষোলো। চাণক্যের মতে তখন আমার চুপ করিয়া থাকিবার অবস্থা ছিল। কিন্তু তাঁহার উপদেশটি আমি যেমন হেলা করিয়াছি এমন আর কেহ নহে।

মানুষের পক্ষে চল্লিশটা বছর বড় কম নয়। ইতিমধ্যে নিজের পরিচয়-দেওয়া এবং জগতের পরিচয়-নেওয়ার মেয়াদ প্রায় শেষ হইয়া আসে। সংসারে যত-রকমের উমেদারি আছে—ধন মান বিদ্যা স্নেহ প্রীতির—সবই প্রায় চুকিয়া যায়—শিখার পালা শেষ হইয়া ছাইয়ের পালা আরম্ভ হইতে থাকে। অর্থাৎ এই চল্লিশ বছরের মধ্যে মানুষের জীবনটা হাউয়ের মত জ্বলিতে জ্বলিতে উপরে উঠবার পর্ব্ব শেষ করিয়া নিবিতে নিবিতে নীচে নামিবার পর্ব্ব সুরু করে। জীবন যে একটা অনিশ্চিতের মুখে রওনা হইয়াছিল তাহার শেষ-সীমানায় ঠেকিয়া নিশ্চিতের মুখে যাত্রা করিতে থাকে—তাহা সেই নিশ্চিত পরিণাম, যাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ আপন বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করে।

এই সাময়িক পত্রের খেয়া নৌকাটি প্রথম-ভাসানের দিনে আমরা যাহারা দাঁড়ি-মাঝি ছিলাম আজ আর-একবার কলম হাতে আমাদের তলব পড়িয়াছে। সেদিন-কার কথা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে।

রূপকথায় শুনিয়াছি রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সকাল বেলায় উঠিয়া যার মুখ দেখিবেন তারই সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিবেন। কন্যাদায়-হরণের এটা সোজা রাস্তা—যারা কুঁড়ে মানুষ তাদের পক্ষে এই রাস্তাই ভালো। আমিও ভাবিলাম যে-কথাটা সব-প্রথমেই মনে আসিবে সেইটে দিয়াই লেখা সুরু করিব। নিজেকে ঠেলা মারিয়া বলিলাম যে কথাটা মুখে আসে বলিয়া ফেল।

মুখে এই আসিল, আজ চল্লিশ বছর আগে দৈবক্রমে আমার বয়স ছিল ষোলো, এবং সেই-সময়ে দৈবাৎ আমার গুরুজনদের খেয়াল গেল তাঁরা ভারতী বাহির করিবেন। দৈবক্রমে সমস্তই অন্যরকম হইতে পারিত—দৈবক্রমে সে-সময়ে আমি না জন্মিতে পারিতাম, দৈবক্রমে ভারতী বাহির করিবার কথা কাহারো মনে না আসিতে পারিত।

মনে করা যাক্ আজকের দিনে আমার বয়স ষোলো, এবং আজ ভারতী প্রথম বাহির হইতেছে। তাহা হইলে সমস্তটাই অন্যরকম কিছু হইত এ-কথা বলাই বাহুল্য।

সেই চল্লিশ বছর পূর্ব্বে দেশের মনটা ছিল অনেক-বেশি কাঁচা। লেখক কাঁচা, পাঠক কাঁচা, সাহিত্য কাঁচা। ঠিক সেই সময়ে আমি যে ষোলো বছরে পড়িয়াছিলাম এ আমার ভারি সুবিধা ঘটিয়াছিল।

তখনকার কাঁচা বুদ্ধিতে যাহা আসিত তাহাই কাঁচা কলমে লিখিতে বসিলাম;

মনে ভয়-ডর-মাত্র ছিল না। কোনো কড়া লোকের কাছে এ-সম্বন্ধে যে বিশেষ একটা জবাবদিহি আছে এ-ভাবটাই যেন দেশের কোনোখানেই নাই। ভারতীতে যাঁহারা বালকের সেই লেখাগুলি বাহির করিলেন তাঁহারাও দিব্য নিশ্চিন্ত। জগতে তখন যেন কর্ম্মফলের নিয়মটা অত্যন্ত ঢিলা ছিল।

তখনকার দিনে, পাঠকরা যে আছে, এটা খুব স্পষ্ট করিয়া যেন দেখা যাইত না, এই জন্য ভয়-লজ্জাটা মনে ছিল না। তখনকার গৃহস্থ ঘরের উৎসবে যে-খুসি যেমন-তেমন সাজ করিয়া বা না করিয়া আঙিনায় গিয়া জড় হইতে সঙ্কোচ করিত না—কিন্তু এখনকার কালের নিমন্ত্রণ-ক্ষেত্রে তেমন অবাধ-প্রবেশও নাই স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণও সম্ভবপর নয়। সাহিত্য-উৎসবেও তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের সেই তফাৎ ঘটিয়াছে। তখনকার দিনের সেই ষোলো বছরের অর্ব্বাচীনটা নিশ্চয় এখনকার কোনো নজ্রেই স্থান পাইত না।

তখনকার দিনে পাঠক-দলকে বিশেষ সমীহ করিবার দরকার ছিল না এটা ভালো কি মন্দ সে তর্ক করিব না—আমার বলিবার কথা এই যে, এই সুযোগটুকু না হইলে লিখিবার বদ্-অভ্যাসটা বাল্যকাল হইতে আমাকে পাইয়া বসিত না—অতএব এ-সম্বন্ধে আমার যত-কিছু অপরাধের জন্য আমি একলা দায়ী নই।

অল্পবয়সেই মাঝে মাঝে দর্শকসাধারণের সম্মুখে, বাল্মীকি প্রতিভা প্রভৃতি নাট্য আমাকে অভিনয় করিতে হইয়াছে। অথচ আমার স্বভাবটা লাজুক ছিল। সুবিধা ছিল এই যে, আমি চোখে কম দেখিতাম। দর্শকদের কারো মুখ দেখিতে পাইতাম না, সমস্ত যেন একটা লেপা রং। ইহাতে অসঙ্কোচে অভিনয় করা আমার পক্ষে সহজ ছিল।

তখনকার পাঠকরাও সেই-রকম অস্পষ্ট ছিলেন। তাঁরা ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক, অয়কেন, ব্যর্গসঁ, বার্ণার্ড শ, আনাটোল ফ্রাঁস পড়িয়াছিলেন কি না কিছুমাত্র বুঝা যাইত না। তাই ষোলো বছরের মূঢ় লেখকের পক্ষে সেটা সত্যযুগ ছিল। আমার দাদার এক ভিংরাজ পাখী ছিল, সে হাঁচি কাশি দরজা বন্ধ করার শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বিড়াল কুকুর কাক কোকিলের ডাক পর্য্যন্ত সমস্ত এত উচ্চস্বরে নকল করিত যে অন্য খাঁচার দোয়েল শ্যামা বেচারাদের একেবারে মুখ বন্ধ করিয়া দিত। সেই চল্লিশ বছর আগে আমরা যখন একটু-আধটু ডাক আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন কাছা-কাছির মধ্যে কোনো ভিংরাজ ছিল না।

অর্থাৎ, যাকে ডারুয়িন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিয়াছেন সেই নিয়মটা বঙ্গসাহিত্যে পূরাপূরি জোরে চলিতে সুরু হইবার পূর্ব্বেই দৈবক্রমে আমি ষোলো বছরে পড়িয়াছিলাম, এবং দৈবক্রমে ঠিক সেই-সময়ে ভারতী বাহির হইয়াছিল। এই শাসন-শৈথিল্যের মধ্যে মানুষ হইবার যা ভালো মন্দ তা আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কঠোরতা শৈশবের ঘাড়ে যাতে চাপিয়া না পড়ে এজন্য মা-বাপকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। বাহিরের ঘা হইতে ছোট ছেলেকে যদি

না বাঁচানো যায় ত সে বাঁচেই না। এই জন্য সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই স্বভাবত দেখা যায় যে সাহিত্যের যখন কিশোর বয়স তখন সমালোচকের আবির্ভাব হয় না। যাহা কচি তার উপরে ক্রমাগত নজর-দেওয়া বা হাত-দেওয়া ভালো নয়।

এখন প্রশ্ন এই, বাংলা সাহিত্যকে কি আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি? না পারি না। এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—ইহার কচি ডালপালাগুলোকে গোরু ছাগল দিয়া মুড়াইয়া খাইতে দিলে যে ইহার উপকার হইবে এমন কথা আমি মনে করি না।

এই জন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন আসে নাই। যে লেখা ভালো বলিতে পারিব না তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে।

অথচ দেখিতে পাই বালক বাংলা সাহিত্য যেন অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর হাতে চারদিক হইতে কেবলি বাণ খাইতেছে। না, সপ্তরথী বলাও ভুল—কেননা বীরের হাতের মারও নয়। ছোট ছোট সমালোচকের ছোট ছোট খোঁচা তাহাকে হয়রান করিয়া মারিতেছে। দিল খুলিয়া প্রশংসা করিবার ইচ্ছাটুকু কোথাও দেখা যায় না।

যেমন দেখা যায় তরকারিকে স্বাদু করিবার শক্তি যাহাদের নাই তারা সকল রান্নাতেই খুব করিয়া লঙ্কামরিচ প্রয়োগ করে তেমনি সাহিত্যিক রান্নায় যাদের হাতে আর কোনো মসলা নাই তাদের একমাত্র ভরসা কটুকথা।

অথচ এই সহজ কথাটা সকলেরই জানা উচিত সাহিত্যে এবং অন্যত্র সৌজন্যই সৌজাত্যের লক্ষণ। কটুকাটব্যের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয় না, তাহা হাটে মাঠে সর্ব্বত্র দেখা যায়। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে অসৌজন্যের কোনো লজ্জা নাই ইহাতে স্বজাতির জন্য লজ্জা বোধ করিতে হয়।

বাংলা সাহিত্যের জন্য সৌজন্যের চেয়ে আরো বেশি কিছু চাই, তাহা স্নেহ। স্নেহের লক্ষণ এই, তাহা বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণতাকেই বড় করে না, তাহা ভবিষ্যতের আশার প্রতিই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে। যে জিনিষ কাঁচা, যার বাড় ফুরায় নাই, এই স্নেহ, এই ভবিষ্যতের আশ্বাস, তার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ যার শক্তির পরিচয় তার বর্ত্তমানেই, প্রধানতঃ ভবিষ্যতে নহে, স্নেহ তার পক্ষে অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর।

সমস্ত অপরিণতির মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও গৌরব অনুভব করিবার শক্তি আমাদের থাকা চাই,—ভালো বলিতে পারিবার আনন্দ যদি আমাদের মনে না থাকে, যদি মন্দ বলিবার উৎসাহই যখন-তখন ছোবল মারিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে তবে এমন নির্ম্মমতার পথে বঙ্গসাহিত্যের কোনো কল্যাণ দেখি না।

ভাষা আপনার সম্পূর্ণ শক্তি এবং সাহিত্য আপন পূর্ণতার আদর্শ একদিনেই পায় না। যতদিন না পায় ততদিন তাহাকে অবজ্ঞা যে করে সে নিজে অন্ধ

অন্ধ বাউল

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ও অক্ষম। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে একটি অসামান্য শক্তি আছে, সে শক্তি প্রমাণ করা যায় না, অনুভব করা যায়। বাংলায় যে-রচনা সকল-দেশের ও সকল-কালের তাহা সংগ্রহ করিলে দেখা যায় সংখ্যায় বেশি নহে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের এখন সেই দশা যখন ওজন করিয়া গুনতি করিয়া তার গৌরব প্রমাণ করা যায় না। যার হৃদয় আছে ও সত্য দৃষ্টি আছে, সে ভিতর হইতে অনুভব করিতে পারে।

যদি আমরা এই অন্তর্গূঢ় অব্যক্ত শক্তিটিকে সত্য অনুভব করি তবে সাময়িক ও অসাময়িক পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আমাদের নবীন সাহিত্যকে অহরহ অশ্রদ্ধা করিবার যে অভ্যাস আমরা পাকাইয়া তুলিতেছি তাহা আমাদিগকে দূর করিতেই হইবে। যে শক্তি আমাদের মাতৃভূমির কোলের শিশু ও হৃদয়ের ধন, যাহা তাঁহাকে একদিন বিশ্বসভায় রাজমুকুট পরাইবে, তাহাকে অনেক যত্নে অনেক স্নেহে সমস্ত আঘাত বাঁচাইয়া মানুষ করিতে হইবে,—সমস্ত অপরিণতিসত্ত্বেও তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই। ছোট ছেলের কান মলিতে পারি বলিয়াই তার কানমলা যে মস্ত একটা বাহাদুরি এই বর্ব্বরতা যেন আমাদের মনে না থাকে। ছোট ছেলেকেও যে শ্রদ্ধা করিতে পারে সেই মহৎ।

বাহিরের যতটা শিক্ষা আমাদের রক্তে মাংসে মিশিয়া যায় কেবলমাত্র তাহাই আমাদের সাহিত্যে ভালো করিয়া ব্যক্ত হয়, যাহা আমাদের ভাঁড়ারে স্তূপাকার হইয়া আছে তাহা নহে। আমাদের মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমাদের চিত্তের প্রকাশ যতদূর পৌঁছিয়াছে আমাদের পুঁথির বুলি তার চেয়ে অনেকদূর আগাইয়া গেছে। আমরা পরের সাহিত্য হইতে পড়িয়া থাকি বিস্তর—সেই পড়ার জোরে আমাদের সমালোচক তৈরি হইয়া থাকে,—কিন্তু লেখক ত কেবলমাত্র পড়ার জোরে হয় না, তার হজমের জোর, প্রাণের জোর থাকা চাই। এই জন্য, পড়ার আদর্শ, যাহা বাহিরের, তাহা আমাদের প্রাণের বিকাশের চেয়ে ওজনে অনেক ভারি হইয়াছে। যাহা কেবলমাত্র বোঝা তাহা আমাদের জীবনীশক্তিকে লজ্জা দিতেছে। ভোজে আমাদের পাতে যাহা পড়িয়াছে তাহাকে ভাণ্ডারী তাহার বস্তার তুলনায় যদি টিট্‌কারী দেয় তবে তাহাতে ভাণ্ডারীর সুবুদ্ধি বা সহৃদয়তা প্রকাশ পায় না। ইব্‌সেন, বার্ণার্ডশকে নমস্কার করি, যাঁহারা তাঁহাদের বস্তা বহন করেন তাঁহাদেরও যথাযোগ্য খাতির করিব কিন্তু মাতৃভাষা নিজের লক্ষ্মীহস্তের যে অন্ন পরিবেষণ করিতেছেন তাহাকে প্রত্যেক গ্রাসে নিন্দা নাই করিলাম। ভালো যদি নাও লাগে তবে মৌন থাকিতে বলি।

সেই জন্য এই কথাটাই আমার আজ সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়িতেছে যে, দৈবক্রমে চল্লিশ বছর আগে আমি ষোলোয় পড়িয়াছিলাম। যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম তাহা ষোলো বছরেরই যোগ্য, তবু প্রশ্রয় পাইয়াছিলাম। অন্তত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুর তুলিয়া বঙ্গসাহিত্যের জন্য তখন কণ্টকশয্যা পাতা হয় নাই।

তাহার ফল কি হইয়াছিল? দক্ষিণ-হাওয়ার প্রশ্রয় পাইয়া বসন্তে যেমন অজস্র আমের বোল ধরে তেমনি অজস্র লিখিয়াছি। তবু হাজার প্রশ্রয় পাইলেও যাহা ঝরিবার তাহা ঝরে, যাহা ফলিবার তাহা ফলে। অতএব সেই প্রথম মুকুল প্রায় সবই ঝরিয়াছে। কিন্তু সেই অপ্রতিহত প্রাণের উদ্যমটা রহিয়া গেছে।

আমাদের দিনে আরো অনেক লেখক দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামও আজ কেহ জানে না। তাঁহাদের দিন যেমন ফুরাইয়াছে অমনি তাঁরা অন্য সকলকে পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেছেন। পদে পদে পথের মধ্যে তাঁদের গায়ে পাঁক-ছড়াইবার কোনো লোক ছিল না বলিয়া সাহিত্যের যে লেশমাত্র ক্ষতি হইয়াছে আমি তাহা বিশ্বাস করি না।

সকল সাহিত্যেই প্রশংসাই সমালোচকের গুণের পরিচয়। ভালোর গুণগান দ্বারাই আমরা মন্দকে সত্যরূপে দেখিতে পাই। এই ভালোর গুণ বুঝিতে ও গাহিতে পারায় কেবল বুদ্ধি নহে হৃদয়ের প্রয়োজন আছে। এই জন্যই ভালো সমালোচক সকল দেশেই দুর্লভ।

সত্য ব্রূয়াৎ প্রিয় ব্রূয়াৎ। এ কথাটা বড় কথা। পৃথিবীতে দেখা যায় প্রিয়-সত্যই অধিকাংশ লোকের মুখ দিয়া কোনোমতে বাহির হইতে চায় না। অপ্রিয়-সত্য বলিতে পারি বলিয়া গর্ব্ব করে এমন-লোক রাস্তায় ঘাটে দেখিতে পাই। অন্যক্ষেত্রের কথা বলিতে পারি না কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই উপদেশটি অমূল্য—

সত্য ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৈফিয়ৎ

নববর্ষের ভারতীর জন্য একটি লেখা চাইই চাই—আমারও প্রতি এইরূপ একটি নোটিস জারি হইয়াছে। কেন? অপরাধ? না, কিছু দিনের জন্য একসময় আমিও ইহার সম্পাদক ছিলাম। বেশ, হুকুম-নামা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া সেই-কৈফিয়ৎই তবে এখানে প্রকাশ করি, যে-কারণে আমাকেও এই অসম-সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। লেখাটি যদি সুপাঠ্য না হয় ত আমার কিন্তু দায়-দোষ নাই। এ কথাটি আমি আগে হইতেই বলিয়া রাখি।

* * *

ভারতী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন যে আমরা খুবই ছোট ছিলাম এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও বোধ হয় চলিতে পারে। তখন সবেমাত্র আমাদের অক্ষর-পরিচয় হইয়াছে। ৺পিতৃদেব তখনও ইংলণ্ডে যান নাই, আমরা থাকি তখন বীডন্ ষ্ট্রীটের একটি

বাড়ীতে। আমার পূজনীয় নতুন-মামা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' বাহির হইবামাত্র পত্রিকাখানি হাতে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সহাস্যমুখে মাতৃদেবীর হাতে দিলেন। তাঁহাদের সেদিনকার আনন্দ-উৎসাহের ভাব শিশু-আমাকেও এতটা আনন্দ প্রদান করিয়াছিল যে সেদিনটি আমার মনে একটা শুভদিন বলিয়াই অঙ্কিত আছে।

সাহিত্য-রসে প্রবেশ করা দূরে থাক, তখন বেশ পরিষ্কাররূপে পড়িতেই পারিতাম না। কিন্তু ভারতীর নাগাল পাইলেই পাখীর মত কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিতে চেষ্টা করিতাম। অর্থ না বুঝিলেও ছন্দে আমি মুগ্ধ হইতাম। শিশুকাল হইতেই—যখন হইতে আমার স্মৃতি আরম্ভ তখন হইতেই—কবিতার প্রতি আমার এই টান। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সেই সকল কণ্ঠস্থ কবিতার অর্থবোধ যেমন সহজ হইতে লাগিল, অন্যদিকে ভারতীর সহজ সরল প্রবন্ধ ও গল্পগুলি আমাদের পাঠ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে ভারতী আজন্মকাল আমাদের সাহিত্য-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

* * *

যতদূর মনে পড়িতেছে ভারতীর বয়স যখন দুই বৎসর তখন পিতৃদেব আমাদের যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রাখিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। এই সময় রবিমামাও বিলাত যান। আমার বড়মামা পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ছিলেন নামে, কিন্তু কার্য্যতঃ নতুন-মামা ও রবিমামাই ভারতী চালাইতেন। রবিমামা বিলাত যাত্রা করিবার পর নতুন-মামার স্কন্ধেই সম্পূর্ণরূপে এ ভার পড়িল; তাঁহার একজন প্রধান সহায়ক হইলেন মাতৃদেবী। "দীপ নির্ব্বাণ" ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুনমামার রচনা। তিনি লিখিলেন, "জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?"

'দীপ নির্ব্বাণে'র পর যোড়াসাঁকোয় অবস্থান কালে ২য়-৩য় বৎসরের 'ভারতী'তে মাতৃদেবীর 'ছিন্নমুকুল', 'গাথা' 'মালতী' প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়। বসন্ত-উৎসবও তাঁহার সেই সময়ের লেখা। যোড়াসাঁকো হইতে কাব্য-নাট্যের সৃজন প্রথম এই 'বসন্ত-উৎসবে'ই। ইংলণ্ডে বইখানি পড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি মা রাখেন নাই। রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ী ফিরিবার পর আমাদের অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসবের অভিনয়ও হইয়াছিল।

* * *

তারপর রবিমামা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি কাব্যনাট্য রচনা ও অভিনয় করেন। এই সময় রবির কিরণে, জ্যোতির জ্যোতিতে, স্বর্ণের দীপ্তিতে বাড়ী আলোকময়। পুরবাসী আনন্দে তাহাতে "করিছে পান, করিছে স্নান"; ভারতীর পাঠকবর্গও বঞ্চিত নহেন। নিত্য সভায় নিত্য নব গান নব সুর নব রচনা—নবলীলা। বড়রা যা করেন, আমরা ছেলের দল তাহার অনুকরণ করি। বাল্মীকি-

প্রতিভা বড়দের যেমন অভিনয় হইয়া গেল, আমাদের পালা আরম্ভ হইল! স্থির হইল, আগে বড়দের এ বিষয় জানিতে দেওয়া হইবে না। গোপনে সব উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যায়? বাড়ীতে তখন হরিশবাবু নামে একটি পোষা চিত্রকর থাকিতেন। তিনি একলা নহেন, বাড়ীতে আরো কতকগুলি পোষা মানুষ তখন ছিলেন। সরকার, মাষ্টারদের সঙ্গে তাঁহারা দপ্তরখানায় বসবাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন নিয়মিত কাজ ছিল না; আসলে বাবুদের মোসাহেবী করিতেন।

আমরা হরিশবাবুকে ধরিলাম যে আমাদের একটি ষ্টেজ' আঁকিয়া দিতে হইবে। আমাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা বৃথা! রফা হইল যে ৫০৲ টাকায় তিনি সে কাজটা করিয়া দিবেন। কিন্তু এত টাকা আমরা কোথায় পাই একেবারে? মাসে মাসে জল-খাবারের পয়সা হইতে কিছু কিছু পাইবেন এই বন্দোবস্ত হইল। আমাদের পড়ার ঘরে ষ্টেজ খাটাইয়া অভিনয়ের আয়োজন করা হইল। মাতৃদেবীর জন্মদিনে বড়দের সকলেই সেই ঘরে আমাদের তৈরী জল-পানের নিমন্ত্রণে আসিলেন। অভিনয়ের কথা অগে প্রকাশ করা হয় নাই। তাঁহারা আসিয়া ষ্টেজ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন, অভিনয় দেখিয়াও আনন্দ লাভ করিলেন। আমার মামা মহাশয় স্বর্গীয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ষ্টেজের ইতিহাস শুনিয়া হরিশবাবুর দেনা-পরিশোধের ভার লইলেন। হরিশবাবুর কপাল ভাল। আমরা কত দিনে সে টাকা শোধ করিতাম জানি না; এখন পাওনার সঙ্গে বখসিসও মিলিল। বাস্তবিক সে ষ্টেজ হইয়াছিল বড় সুন্দর। "ভারতী"র মলাটে তখন বীণাপাণির যে ছবি থাকিত, আমাদের ষ্টেজের শিরোভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল সেই ছবি। ড্রপ্‌সিনে—মধ্যে অঙ্কিত রবিমামার মুখ—আর তার চারদিকে একটি ফুলের মালা—কিন্তু সে ফুল, বাগানের ফুল নয়—নাট্যাভিনেতা ছেলে-মেয়েদের মুখগুলি। আজ সে মালার ফুলগুলি কোন্‌টি কোথায়? যদি যত্ন করিয়া রাখিতে জানিতাম—আজ সে ড্রপসিন অমূল্য ধন!

* * *

ভারতীর ৭ম বর্ষের শেষে আমার পূজনীয়া নতুন-মামী ইহলোক ত্যাগ করিলে মামামহাশয়েরা শোক-মুহ্যমান হইয়া ভারতী ছাড়িয়া দিতে সংকল্প করিলেন। মাতৃদেবী নববর্ষে ভারতী-রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। ভারতী নূতন গৃহে প্রবেশ করিল। পিতৃদেব দুই-এক বৎসর পূর্ব্বেই দেশে ফিরিয়াছেন—আমরা বাস করি তখন কাসিয়া-বাগানে। এই সূত্রে আমরা ভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা-সম্পর্কে আবদ্ধ হইলাম। আমরা আর তখন কেবল ভারতীর পাঠক নহি—লেখকও হইলাম। এই সাত বৎসরের শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতী আমাদেরও সাহিত্য-জীবন পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। আমারি নববর্ষের কবিতা-বরিত হইয়া ভারতী আমাদের গৃহে স্বাগত হইলেন।

ওই যে রে কেঁদে হেসে
নববর্ষ নব বেশে
বর্ষচক্রে আরবার আসিল ফিরিয়া:

নয়নে শোকাশ্রুরাশি
অধরে বিদায়-হাসি
ফুলময় আশা-ডালা করেতে ধরিয়া।

ভারতীর ভার মা গ্রহণ করিয়াছিলেন সভয়ে সঙ্কোচে। কিন্তু বৈশাখের ভারতী বাহির হইবার পর যখন মামারা আসিয়া প্রফুল্ল মুখে সার্টিফিকেট দিয়া গেলেন—সাধারণে তাহাতে যোগদান করিলেন, তখন আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

*　　*　　*

ভারতী হাতে লইয়া মাকে আমার কি অসীম পরিশ্রমই করিতে হইত! ছোট গল্প বড় গল্প ত তিনি লিখিতেনই, হাস্যকৌতুক হইতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহাকে নিজে লিখিতে হইত। ইহা ছাড়া সমালোচনা, অন্যের লেখা নির্ব্বাচন, সংশোধন এবং প্রুফ দেখার কাজত ছিলই; ঘরকন্নার কাজ, লোক-লৌকিকতা— এসবও ত বাদ যাইবার নয়,—তাহার উপর সখী-সমিতির পর্ব্ব!

তখন মাসিক-পত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না—বঙ্গদর্শন তখন বন্ধ, তাহার স্থলে নবজীবন ও প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নব্যভারত প্রভৃতি আরও কয়েকখানির নাম উল্লেখযোগ্য।

এক বৎসর পরে জোড়াসাঁকো হইতে প্রথম 'বালক' পরে 'সাধনা' বাহির হইল। মামাদের নিকট হইতে প্রবন্ধ-লাভের আশাও আর তখন রহিল না। বাহিরের ভাল লেখকের সংখ্যাও অঙ্গুলি-গণ্য। যে দুই চারিজন খ্যাতনামা লেখক আছেন, সকল সম্পাদকই তাঁহাদের লইয়া টানাটানি করেন। ফলে দাঁড়ায় এই,—যিনি সম্পাদক, তাঁহার নিজের লেখা দিয়া এবং তাঁহার দলের লোককে দিয়া লেখাইয়াই কাগজ পূরাইতে হয়। প্রকৃত পক্ষে তখন সম্পাদকের পরিশ্রমের উপরই একান্তভাবে মাসিক-পত্রিকার পরিচালনা নির্ভর করিত।

কাঁচা লেখকের লেখা পাকা করিয়া তুলিতে মা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন। যে লেখার মধ্যে একটুও ক্ষীর তিনি দেখিতেন, তাহা নীর-বর্জ্জিত করিয়া লইতেন। অনেক সময় এমন হইত যে সংশোধনের পর লেখক বুঝিতে পারিতেন না যে লেখাটি তাঁহার কি না! আজকাল লেখকের সংখ্যা, তুলনায় অনেক বেশী—ভাল লেখা সহজেই পাওয়া যায়; তখনকার দিনের লেখার কষ্ট তাই তোমরা ঠিক বুঝিতে পারিবে না। সে সময়ের অনেক সাহিত্যনবীশ এখন খ্যাতনামা লেখক। এই সময় ভারতীর নিয়মিত লেখক ছিলেন কৈলাস সিংহ, যাদব সিংহ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

তখন আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—রাজসাহী হইতে চুঁচুড়ায় আমরা বদলী হইয়াছি—তাই অনেক সময়ই কলিকাতায় আসিয়া থাকি এবং মাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করি। আমার প্রধান কাজ ছিল ইংরাজী পুস্তক হইতে 'চয়ন' সংগ্রহ করা। নিজে কবিতা এবং ছোট গল্পও লিখিতাম। তখন আমি স্বামীর নিকট হইতে বিজ্ঞান, দর্শন যাহা শিখিতাম তাহাও মধ্যে মধ্যে অনুবাদ করিয়া দিতাম। আমার ভগিনী সরলার তখন পাঠ্যাবস্থা তাই আমরা ভারতী গ্রহণ কালে তাঁহার রচনা

পাই নাই। পরে তিনিও মাতার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যের সমালোচনা ভারতীর উপাদেয় প্রবন্ধাবলী।

মাতৃদেবীর একজন প্রধান সহায়-বন্ধু ছিলেন ৺কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাসিয়া-বাগানে আসিতেন এবং মাতার রচনা শুনিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন। বিহারীবাবু মায়ের একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তিনি বসন্ত-উৎসবের গানগুলি ঠিক তাঁর নিজের রচিত গানগুলির মতই ভাব-বিহ্বলকণ্ঠে গাইতেন। তাঁহার মতে ছিন্নমুকুলের মত উপন্যাস আর বাঙ্গলায় বাহির হয় নাই। মা আমার চিরদিনই নিরভিমান—তিনি কোন প্রশংসায় কোন দিনই চঞ্চল হ'ন নাই। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার নিজের আদর্শ তাঁহাকে নম্র বিনীত করিয়া রাখিয়াছে। যে মহোচ্চ আদর্শ তাঁহার মনে আছে—তাঁহার রচনাকে সে শিখরে তুলিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু তিনি গর্ব্ববোধ না করুন—তাঁহার প্রশংসায় গর্ব্ববোধ করিতাম আমরা—তাঁহার সন্তানেরা। আর আনন্দ অনুভব করিতেন আমার পিতৃদেব। মাতার এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা সে ত তাঁহারি যত্নের ফল।

৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মাতার আর একজন অকৃত্রিম সাহিত্য-বন্ধু ছিলেন। প্রচারপত্র বাহির হইবার পর হইতে লেখক-সূত্রে ইঁহার সহিত আমাদের পরিচয় আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উভয় পরিবারের মধ্যে একটি আত্মীয়তা-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কৃষ্ণধন বাবুর স্ত্রী মাকে দিদি বলিতেন, মা তাঁহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতেন। মার ধাতটাই স্নেহপ্রবণ; সেজন্য তাঁহার জীবনে বন্ধুতার কখনো অভাব হয় নাই। মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী, সরোজকুমারী, নিস্তারিণী দেবী এবং সুলেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বন্ধু।

* * *

এই অত্যধিক পরিশ্রমে ১০।১২ বৎসর ভারতী পরিচালিত করিয়া মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ১৩০১ সালের চৈত্রমাসে একদিন চুঁচুড়া হইতে কাসিয়া-বাগানে আসিয়া দেখি ভারতীর ম্যানেজার সতীশবাবু ভারতীর ভাসান-আয়োজনে ব্যস্ত। ডাক্তার বলিয়াছেন মাকে ভারতী হইতে অবসর গ্রহণ করিতেই হইবে। তাই সতীশবাবু—নববর্ষে আর ভারতী বাহির হইবে না এই মর্ম্মে একখানি মুদ্রিত নোটিস-সহ আগামী বর্ষের অনেক গুলি অগ্রিম মনিঅডার ফিরাইয়া-দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কাসিয়া-বাগানে তখন ভারতীর নিজেরই প্রেস ছিল। তাই নোটিস অবাধে অবিলম্বে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই আয়োজন দেখিয়া আমার মনে যে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। আমি তৎক্ষণাৎ নোটিস বিলি প্রভৃতি বন্ধ রাখিয়া যোড়াসাঁকোয় গিয়া রবিমামাকে সম্পাদক হইবার জন্য ধরিয়া পড়িলাম। তিনি তাহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না, কিন্তু আশা দিলেন যে আমি ভারতীর সম্পাদন-কার্য্য গ্রহণ করিলে তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। অগত্যা তাঁহার খাতা-পত্র ঝাড়িয়া যাহা কিছু পাইলাম তাহা সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। মাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য নীলগিরি লইয়া

গেলাম। সেখান হইতে তাঁহাকে মহীশূরে সরলার কাছে রাখিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া ভারতীর ধান্ধায় রহিলাম। এই উপলক্ষে অনেক সময়ই আমার রবিমামাকে আক্রমণ করিতে হইত এবং কোন দিনই প্রায় একবারে শূন্য-হস্তে ফিরিতাম না। সেই জন্য মাতুল-মহাশয় এখনো বলিয়া থাকেন—"আমার এই ভাগিনেয়ীটিকে আমি কিঞ্চিৎ ভয় করি।"

সম্পাদন-ভার ত গ্রহণ করিলাম কিন্তু নিজের নাম তবু ভারতীর কলেবরে প্রকাশ করিতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম একলার নাম না দিয়া যদি দুই ভগিনীর নামে ভারতী চালাই ত নিশ্চয়ই দেখাইবে ভাল। সরলাকে লেখায় তিনিও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি অনেকটা আরাম বোধ করিলাম। উমেশবাবু, রামেন্দ্র বাবু, অক্ষয়-বাবু, ঠাকুরদাসবাবু এই সময় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু এবং জলধরবাবুও লিখিতেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। মাও মধ্যে মধ্যে লেখা পাঠাইতেন। এইরূপে তিন বৎসর কাল আমরা দুই ভগিনী ভারতীর সম্পাদক ছিলাম। আমি কিন্তু ইহার মধ্যে একটি দিনও মাতুল মহাশয়কে ভারতী গ্রহণের জন্য ভজাইতে ছাড়ি নাই। ক্রমাগত জল ঢালিলে পাথরও ক্ষয় হয়—মামামহাশয়েরও আমার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল। তিনি ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে অর্থাৎ লিখিতে ও লেখা নির্ব্বাচন করিতে সম্মত হইলেন। ম্যানেজারী করা—প্রুফ দেখা, লেখা সংগ্রহ করার ভার আমার উপর রহিল। এইরূপে পুনরায় ভারতীকে যোগ্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আমার সে কি আনন্দ! তবু মামাটির স্বভাব আমার জানা ছিল—বেশী দিন যে এ আনন্দ ভোগ করা আমার ভাগ্যে ঘটিবে না মনে মনে তাহা বুঝিতাম—তাই বিদায়-সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম :—

> রবি যদি অস্ত যায় আসে অন্ধকার,
> তবু রব কাছে ; যদি নিভে যায় হাসি,
> ম্লান হয়ে আসে রূপ, কোলে তুলে নিয়ে
> যতনে মুছায়ে দেব অশ্রুজলরাশি।

সে দুর্দ্দিন শীঘ্রই আসিল। কিন্তু মাতৃদেবী ও সরলা তখন মহীশূর হইতে দেশে ফিরিয়াছেন। কাসিয়া-বাগান হইতে উঠিয়া বালীগঞ্জে তখন আমরা বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। সরলা এ ভার একাই বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভারতীর নিকট সর্ব্বতোভাবে বিদায় লইয়া আমি মৃত সখী-সমিতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার ভার গ্রহণ করিলাম।

এখনও পর্য্যন্ত সেই কাজ লইয়াই আছি। —বাঙ্গালীর মেয়ের অবসর কোথায়? সংসার আমাদের দেহ মন প্রাণ ষোল আনায় দখল করিতে চায়। জোর করিয়া ইহার মধ্য হইতে যে কড়াক্রান্তি বাঁচাইতে পারি, হে নবীন সম্পাদক, সেটুকু তোমায় দিলে আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে কিসে? অতএব আমার এই কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিয়াই আমাকে মুক্তি প্রদান কর; আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ভারতীর ছবি

ছোটদের জন্য তখন বাসন্তী-কাগজের দুইখানিমাত্র পাতায় "পূজার সুলভ"—আদুরে ছেলে গাল-ফুলাইয়া ক্রমাগত সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ উড়াইতেছে এই চিত্রটির ছাপ লইয়া বাহির হইত; আর সবই ছিল বড়দের জন্য; —'বঙ্গদর্শন' 'ভারতী' 'বামাবোধিনী' 'তত্ত্ব-বোধিনী' সবই। অন্ততঃ বিশ বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত 'ভারতী'র কাছে আমরা ঘেঁসিতে পারি নাই;—সে ঘরের আদরিণী কন্যার মত বড়দের কাছে-কাছেই থাকিত।

আমাদের তেতালার উত্তরের ঘরে মায়ের একটা বড় কাচের আল্‌মারি; তারি সর্ব্বোচ্চ তাকের একটা অংশে 'ভারতী'। চৌকির উপর চৌকির সোপান বহিয়া আমরা অনেকদিন এই আলমারির চালটা পর্য্যন্ত উঠিয়া গেছি—এবং সেই অজানা রাজত্বের কত সংবাদ, কত টুকিটাকি সংগ্রহ করিয়া দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত দলে ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ঐ একখানিমাত্র কাচের আবরণ ভাঙিয়া ভারতীর উপরে হস্তক্ষেপ—এটা কোনো দিন আমার সাহসে কুলায় নাই। লণ্ঠন-ঘেরা আলোর বাইরে পতঙ্গ যেমন, আমাদের শিশু-কালটা তেমনি ভারতীর বাইরে-বাইরেই ঘুরিয়া মরিয়াছে বলিলেও চলে।

কেবল একটি দিন—বছরে একটিবারমাত্র মা আমাদের হাতে আল্‌মারির চাবি ছাড়িয়া দিতেন—সে ভাদ্র মাসের রৌদ্রোজ্জ্বল একটি প্রভাত। ভারতীকে কাঁধে তুলিয়া আমরা ছাদের উপর রোদ পোহাইতে চলিতাম। সেই-দিন ক্ষণিকের জন্য ভারতী আমাদের কাছে আসিত। আমরা দেখিতাম—সে পদ্মের উপরে পা-খানি রাখিয়া গালে হাত দিয়া সুদূরে চাহিয়া আছে;—কোলে তার অনাহত বীণা। এই ছবিটি মাত্র—এছাড়া তখনকার ভারতীর আর কোন ছবি আমার মনে আসে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতী

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দার্জ্জিলিঙে ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত আমার পরিচয় হয়। প্রথম-পরিচয়েই তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও অদম্য জ্ঞানানুশীলনের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হই। সাহিত্যের যে-সব বিষয়ে সাধারণতঃ কেহ কোনো চর্চ্চা করে না, দেখিলাম সে-সব বিষয়ে তাঁহার গভীর অনুরাগ আছে এবং সেগুলির চর্চ্চায় তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। আমার সহিত তিনি মহা উৎসাহে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যের কতিপয় গুরুতর বিষয়ের

দোদুল দোলা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সেই প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণগুলি কোন্ কোন্ গ্রন্থে আছে তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারই অনুরোধে ঐ সময় হইতে আমি ভারতীতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া প্রাচীন ও নব্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বহুদিন বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার এতই উৎসাহ ছিল যে এই আলোচনার জন্য তিনি আমাকে প্রায়ই আহ্বান করিতেন। তর্কে তাঁহার যুক্তির তীব্রতা ও জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। এই সময়ে তাঁহার নাম চারিদিকে শুনিতাম। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও উৎসাহশীলতার কথা তখন বঙ্গের প্রত্যেকে শিক্ষিত গৃহে শ্রদ্ধা ও গৌরবের সহিত আলোচিত হইত। সকল বিষয়েই দেখিতাম তাঁহার প্রতিভা অসামান্য।

বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জাতিকে চারিটি মূল-বর্ণে পরিণত করিবার উপায় কি– আমার সঙ্গে এই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত আলোচনা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এইটি আমাদের দেশের একটি গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে আমি তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের বিধি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম।

কোথায় কোন্ গুণ আছে, এবং সেই গুণের আদর কিরূপে করিতে হয় এবং ঐ গুণের দ্বারা সমাজের ও সাহিত্যের উপকার কিরূপে হয় তাহা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। এবং এই অসাধারণ গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সেই সময়ে বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণের নিকট হইতে সুন্দর প্রবন্ধরাজি সংগ্রহ করিয়া ভারতীকে সুসজ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"ভারতী"র কথা উঠিলে সেই মূর্ত্তিমতী ভারতীকেই মনে পড়ে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভারতী ও ভারতী-সম্পাদিকা

সে আজ বহুদিনের কথা—প্রায় ত্রিশ বৎসর—যেদিন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল পবিত্র প্রয়াগধামে আমাদের দুই বন্ধুর সম্মিলন হয়। তখনকার দিনে সাহিত্যক্ষেত্রে এখনকার মত এত বঙ্গরমণীর আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং সে সময়ে একজন বঙ্গরমণী মাসিক-পত্রের সম্পাদক—এই সংবাদেই মন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। শুধু আনন্দ নয়,—বিস্ময়ও ছিল ;—কোন্‌টা বেশী তাহা বলা শক্ত। ভারতীর ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী তখন এলাহাবাদে একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা করিতেন, তদুপলক্ষে তিনিও কিছুদিন প্রবাসের সুখ উপভোগ করিতে আসিয়াছিলেন।

এই বিদুষী মহিলাটিকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতে মনে জাগিতেছিল কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ একদিন দৈবযোগে, ৺পূজনীয় পিতৃদেবের বন্ধুভবনে আমরা উভয়েই নিমন্ত্রিত হইলাম। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমার পিতা ও ভ্রাতার সহিত ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ

ঘোষাল মহাশয়ের যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভাগ্যে দেবী-দর্শন ঘটে নাই। জানিনা সে কোন্ শুভলগ্ন ছিল, পরস্পরকে দেখিবামাত্র অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব-সূত্রে গ্রথিত হইলাম। সেই প্রথম-দর্শনে মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল এবং নিজেকে যে কত ধন্য মানিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সাক্ষাতে সে মনোভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিতে পারি নাই;—মনের কথা মনেই থাকিয়া গিয়াছিল। যেমন বিদ্যার প্রভা, তেমনি রূপেরও প্রভা;—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—একেবারে মূর্ত্তিমতী। এমন রূপ, এমন গুণ দেখিলে কে না মুগ্ধ হয়? আমি ভক্তিনম্র হৃদয়ে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদে বরণ করিয়া লইলাম। এই মিলনের প্রধান দূতী হইল আমাদের সাহিত্যালোচনা; তদ্দ্বারা আমরা ক্রমশ নিকটতর হইতে নিকটতম হইয়া গেলাম। ভারতীর পত্রে ইতিপূর্ব্বেই ইঁহার রচনার রস-মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; এখন হইতে ভারতীরও ভক্ত হইয়া পড়িলাম।

সেকালে ভারতীর মত পত্রিকা বড় বেশি ছিল না; এবং ভারতীর স্থান মাসিক সাহিত্য-জগতে প্রধান ছিল। মহিলাদ্বারা সাহিত্য-রচনা দূরে থাক, তখন মহিলা-পাঠিকার সংখ্যা বিরল ছিল বলিলেও চলে। এমনি সময়ে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গলা মাসিক-পত্রের সম্পাদক একজন বাঙ্গালী-মহিলা হইতে পারেন—এ কথা তখন বোধ হয় কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। সেই সময় আমার মনে হইত, একদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যশাসনদণ্ড হাতে লইয়া যেমন জগতে রমণীর গৌরববর্দ্ধন করিতেছেন, আর-একদিকে আমাদের ক্ষুদ্র বাংলা দেশের সাহিত্য-শাসন-দণ্ড হাতে লইয়া স্বর্ণকুমারী আমাদের বঙ্গরমণীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

তখনকার সেই শিশু-সাহিত্য স্বর্ণকুমারীর মত একটি স্নেহময়ীর স্নেহ ও যত্নের অপেক্ষায় ছিল। তখন আমাদের দেশের যাঁহারা সাহিত্যগুরু ছিলেন তাঁহারাও ত অনেক মাসিকপত্র চালাইয়াছেন কিন্তু বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। ভারতী যে আজ এত-বড়টি হইয়াছে তাহার কারণ, সে যে অনেকদিন ধরিয়া মাতৃস্নেহ পাইয়াছে। এত বাধা-বিপদের মধ্যেও যে ভারতী দীর্ঘজীবী হইয়াছে সে ত শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর অপরিসীম যত্ন ও তাঁহার পরিপাটীরূপে পরিচালন-ক্ষমতার ফলে। যখনই ভারতী যায়-যায় হইয়াছে তখনই তিনি তাহাকে কোলে লইয়া তার শুশ্রূষা করিয়াছেন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সে প্রতিভা যে অন্তঃপুরের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায় নাই ইহা আমাদের সৌভাগ্য। কথায় বলে আগুন কখনো ছাই চাপা থাকে না। আর-কিছু না করিয়া তিনি যদি কেবলই ভারতীর সম্পাদকতা করিতেন তাহা হইলেও তাঁহার কৃতিত্ব বড় কম হইত না। শুধু এদেশে কেন, দেশ-দেশান্তরেও তাঁহার মত মহিলা-সম্পাদিকা কয়জন আছেন? তিনি যখন সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন তখন বিদেশেও নাম-করা কোন মহিলা-সম্পাদিকার

কথা ত শুনি নাই। এ কথা যাক্। বঙ্গসাহিত্যকে যে তিনি বহুমূল্য রত্নরাজি দান করিয়াছেন তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? কবিতা বল, গল্প বল, উপন্যাস বল—এমন কি বিজ্ঞান-আলোচনা, কোনটা তিনি বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারে দান করেন নাই? এবং গুণে কোনটাই বা কম? সেকালে ত দেখিয়াছি ঘরে ঘরে তাঁহার উপন্যাস সানন্দে পঠিত হইতেছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার সফলতাই তাঁহার পরবর্ত্তী লেখিকাদের উৎসাহিত করিয়াছে—ইহা ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি যে শুধু সাহিত্য-রচনার যশ-গৌরবেরই অধিকারিণী তাহা নহে—তিনি বঙ্গরমণীর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সাহস করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে না নামিলে আর কোনো রমণী এ পথে আসিতেন কি না আমার সন্দেহ হয়! সেই জন্য বলি তিনি বাংলা দেশে রমণীজাতির আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমস্ত বঙ্গনারীর পক্ষ হইতে আজ আমি তাই তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

তাঁহার গ্রন্থাবলী সমালোচনা করিবার স্থান ইহা নয়। তবে এইটুকু বলিতেই হইবে যে তাঁহার রচনা যেমন সরস, তেমনি জীবন্ত—এ যেন পুরাতন হইতে চাহে না। ভাষায় এমন-একটি মাধুর্য্য আছে যে কালের দীর্ঘতাতেও তাহার নবীনতা ম্লান হয় না। এরূপ ভাষার গুণ খুব কম লেখকেরই আছে—বিশেষত সেই যুগের লেখকদের, যখন স্বর্ণকুমারী লেখা আরম্ভ করেন। চরিত্র-চিত্রনে স্বর্ণকুমারীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা; কিন্তু একটি বিশেষত্ব আছে তাঁর নারী-চরিত্র-রচনায়। তাঁহার রচিত নারীগুলি এক মহিমাময়ী দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তাহারা রমণী বলিয়া যে ধূলি-অবনত, তাহা নহে; তাহাদের মধ্যে আত্ম-সম্মানের তেজ, নারীত্বের গর্ব্ব এবং অন্তরের একটি শক্তি আছে। তাহারা অন্ধবিশ্বাসের পথে চোখ বাঁধিয়া চলে না এবং বিপদের মুখে কেবলই হাহাকার করিয়া মরে না। তাঁহার অন্তরে নারীজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে তাহারই প্রেরণায় তিনি আমাদের দেশের নারীজাতিকে একটি প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। ইহা শক্তিমানের কাজ, স্বর্ণকুমারী সেই মহাশক্তির অধিকারিণী।

সম্প্রতি স্বর্ণকুমারীর যশ বঙ্গ ছাড়াইয়া সমুদ্র-পারে গিয়া পৌঁছিয়াছে—ইহাতে আমরা সকলেই আনন্দিত। তাঁহার কয়েক খানি উপন্যাসের অনুবাদ বিলাতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইহাতে দেশে বিদেশে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

আমরা শুনি, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে উগ্র হইয়া উঠে—তাঁহাদের নারীত্বের কোমলতা মরিয়া যায়। স্বর্ণকুমারী এই উক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সেই জানে বিদ্যার প্রভায়, জ্ঞানের দীপ্তিতে তাঁহার নারীত্বটি আরো কেমন সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে নাই।

শিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন বলিয়া স্বর্ণকুমারী চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে পক্ষপাতিনী। কিসে স্ত্রী-সমাজ সর্ব্বপ্রকারে উন্নতিলাভ করিবে ইহাই তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে তিনি সখীসমিতি

ও মহিলা-শিল্পমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন রমণীদের চিন্তা উন্নত করিবার, রুচি মার্জ্জিত করিবার ও বিমল আনন্দ দিবার আয়োজন তাহাতে কত ছিল। তিনি ধনী-কন্যা হইয়াও সকলশ্রেণীর রমণীর সহিত এমন সহাস্যমুখে মিশিতেন যে দেখিবামাত্র সকলে তাঁহার আপনার হইয়া যাইত। সেই সখীসমিতি ও মহিলা-শিল্পমেলার উজ্জ্বল স্মৃতি এখনো অনেকের মনে জাজ্জ্বল্যমান আছে, সন্দেহ নাই!

স্বর্ণকুমারীর অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনা এখনো অব্যাহত। মনে হয় তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ এই সাহিত্যচর্চ্চা। এমন করিয়া সাহিত্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন কয়জন? বাংলাভাষা অল্পদিনের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমরা অবাক হই, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, এর মূলে ইঁহার মত কয়েকজন ভক্তের তপস্যা নিহিত আছে বলিয়াই এমনটি হইতে পারিয়াছে। বঙ্গভাষার ইতিহাসে স্বর্ণকুমারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে।

ভারতী চল্লিশ বৎসরে পড়িল—ইহা আমার কাছে বড়ই আনন্দের দিন। বিশেষ করিয়া এই জন্য আনন্দ যে, ইহা স্বর্ণকুমারীরই জয়-গান আজ বিঘোষিত করিতেছে। চিরদিন করুক ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভারতী-স্মৃতি

'ভারতী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা পড়াশুনা করিতাম—সে আজ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—সেকালের কথা বলিলেই হয়। তখন আমরা ইংরাজী স্কুলে পড়িলেও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ চর্চ্চা করিতাম; কারণ তখন আমরা কাঙ্গাল হরিনাথের কাছে শিক্ষানবিশী করিতাম। সে সময়ে যে কত আগ্রহে 'ভারতী' পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না; অনেক প্রবন্ধ বুঝিতে পারিতাম না, তবুও পড়িতাম, এখনকার কালের মত শুধু গল্প পড়িয়া অবশিষ্ট পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইতাম না, যাহা পড়িতাম তাহার রীতিমত পরীক্ষা দিতে হইত; যাহা বুঝিতাম না, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইত। তখন মাসিকপত্র পাঠ আমাদের সখের ব্যাপার ছিল না, আমরা সখের খাতিরে বাঙ্গালা পড়িতাম না। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর, ভারতী এবং তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা আমরা আমাদের সেই পল্লীভবনে বসিয়া যথারীতি পড়িতাম; শব্দের প্রয়োগ শিখিতাম; ভাল ভাল কথা খাতায় লিখিয়া রাখিতাম, কণ্ঠস্থ করিতাম, এবং যখন কিছু লিখিতাম, তখন ঐ সকল কথা, ঐ সকল শব্দ, ঐ সকল ভাব গ্রহণ করিতাম। এই ভাবে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষা করিতাম। মাসিকপত্রের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, ডাকঘরে আনাগোনা করিতাম; কোন একখানি মাসিকপত্র আসিলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত। আমাদিগের জ্যেষ্ঠেরা প্রথমে

পড়িতেন, তাহার পর আমরা পড়িতে পাইতাম; তখন ত আর বাড়ীতে বাড়ীতে কাগজ আসিত না; বিশেষতঃ আমি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলাম, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক কিনিবারই শক্তি আমার ছিল না; কাজেই আমাকে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াই পত্রাদি পড়িতে হইত।

তাহার পর কতদিন চলিয়া গেল; আমার মাথার উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গেল; কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিলাম; কত বিয়োগ-বেদনা বুক পাতিয়া লইলাম; কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরিলাম, কত পর্ব্বতে প্রান্তরে অরণ্যে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইলাম। তাহার পর দেশে ফিরিয়া আসিলাম। সে সকল কথা আর বলিব না।

বাঙ্গালা দেশে আসিয়া আমি যখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদলের রাজার বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়া যাই, সেই সময় আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় সেখানে ছিলেন। তিনিই আমাকে মহিষাদলে যাইতে বাধ্য করেন; চাকুরী করা তখন আমার অভিপ্রেতই ছিল না, আমি তখন আর একবার অজ্ঞাতবাসে যাইবার কল্পনা করিতেছিলাম। তাহা হইল না, আমি মহিষাদলেই গেলাম।

যখন আমি হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, সেই সময় আমার আর কিছুই সম্বল ছিল না, সুধু সম্বল ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের বাউলের গানের একখানি বই। আমার এক বন্ধু সেই বইখানির দুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দেন, তখন তিনি তাহার সহিত কয়েকপৃষ্ঠা সাদা কাগজ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে আমার ভ্রমণের কথা একটু-আধটুকু লিখিয়া রাখিতাম,—ওটা একটা খেয়ালমাত্র; পরে যে কিছু করিব, এ কথা ভাবিয়া লিখিতাম না; সে অভিপ্রায় থাকিলে যথাযথভাবে অনেক কথা লিখিয়া রাখিতে পারিতাম। যখন মহিষাদলে গেলাম, তখনও ঐ বইখানি আমার সঙ্গে ছিল—কাঙ্গালের গানগুলি যে আমার নিকট বড়ই বহুমূল্য ছিল—আমি ঐ গানগুলিকেই আমার জপমন্ত্র করিয়াছিলাম—উহারই মধ্যে আমি সব পাইতাম। মহিষাদলে একদিন দীনেন্দ্রবাবু আমার সেই গানের বইখানি দেখিতে পান এবং পেন্সিলে লেখা সেই কথাগুলিও পড়েন। সে সময়ে তিনি 'ভারতী'তে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং 'ভারতী'-সম্পাদিকামহাশয়াও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দীনেন্দ্র বাবু আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণকথা 'ভারতী'তে লিখিতে হইবে। আমি ত কথাটা প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম। শৈশবকাল হইতে যদিও একটু-আধটুকু লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতাম, কাগজপত্রেও সামান্য কিছু লিখিতাম; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আর ওদিকে যাইবার ইচ্ছা ছিল না; নিজের শক্তিসামর্থ্যও ছিল না। সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একরকম বিদায় গ্রহণই করিয়াছিলাম; অন্ধকারের মধ্যেই জীবন কাটাইব বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু দীনেন্দ্রবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, জোর করিয়া হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব

লিখিয়া লইলেন এবং নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া 'ভারতী' পত্রে প্রেরণ করিলেন। বোধ হয় সে সময় পূজনীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া এবং তাঁহার কন্যাদ্বয় ফাইল খুঁজিয়া প্রকাশের মত কিছু পান নাই, অথবা দীনেন্দ্রবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; তাই আমার সেই লেখাটা 'ভারতী'তে প্রকাশিত করিলেন। আমি কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, আমার নামটা যেন ছাপা না হয়; আমার মত নিতান্ত অপরিচিত, নিরক্ষর, গ্রাম্যস্কুল মাষ্টারের অতি অকিঞ্চিৎকর লেখার নীচে আমার নিরাকার নাম দিয়া 'ভারতী'র প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু সম্পাদিকা মহাশয়া বোধ হয় রহস্য দেখিবার জন্যই আমার আকার-ইকার-উকার-বর্জ্জিত নামটা প্রবন্ধের শেষে ছাপিয়া দিলেন এবং আমাকে আরও লিখিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলেন। প্রবন্ধ-দৈন্যই যে তখন এই অনুরোধের একমাত্র কারণ হইয়াছিল, তাহা আমি এখনও হলফ্ করিয়া বলিতে পারি; নতুবা 'ভারতী'র ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হইবে কেন?

কিন্তু সম্পাদিকা মহাশয়া আমাকে জানাইলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। ইহা হইতেই বর্ত্তমান পাঠক-পাঠিকাগণ সে সময়ের পাঠক-পাঠিকাগণের সাহিত্য-রস বিচারের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। সে যাহাই হউক, আমি 'ভারতী'তে লিখিতে লাগিলাম। যে পত্রের সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী পরে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী ও শ্রীমতী সরলা দেবী, যে পত্রে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য দিগ্‌গজ সাহিত্য-রথী যথানিয়মে লেখেন, সেই পত্রে আমার লেখাও বাহির হইতে লাগিল —পুষ্পের সহিত কীটও দেবতার মাথায় উঠিতে লাগিল। হিমালয়ের কথা তাহার পূর্ব্বে কেহ বাঙ্গালায় হয়ত লেখেন নাই; তাই আমার লেখা যা-তাই সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাস-পল্লী হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, 'জলধর সেন' নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুর-বাড়ীর কেহ ছদ্মনামে হিমালয়-কাহিনী লিখিতেছেন। কিন্তু এ কথাটা কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না যে, বাঙ্গালা ভাষায় নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি শ্রুতিমধুর নাম থাকিতে উক্ত প্রবন্ধাবলীর লেখক দীনবন্ধু বঙ্কিম কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ঐ নামটিই ছদ্মনাম বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? আরও একটি কথা আছে, তাহা এখানে বলিতে হইতেছে। আমি যখন 'ভারতী'তে হিমালয় ভ্রমণ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইউরোপ যাত্রীর পত্র' প্রকাশিত করিয়া ছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাঁহারই অতুলনীয় লিখন-পদ্ধতি (style) অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যে অক্ষম অনুসরণ, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না; কিন্তু সে সময় হয়ত-বা ঐ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন! আর যাঁহারা আমার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন,

তাঁহাদিগেরও দোষ দিতে পারি না; কারণ আমার নামটার সহিত পূজনীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু এমনই একটা চিত্র জড়াইয়া দিয়াছেন যে, কোন পিতামাতাই পুত্রের ঐ নামকরণ করিতে কিছুতেই রাজী হইতে পারেন না। আমার পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ এই যে, উপরিউক্ত সাহিত্যরথীদ্বয়ের লেখনীধারণের পূর্ব্বেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব খোসখেয়ালের বশেই আমার ঐ নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি ভবিষ্যৎ জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত এমন কার্য্য করিতেন না। যাক্ সে কথা। আমি প্রায় দুই বৎসর ক্রমাগত লিখিয়া 'ভারতী'-পত্রে আমার হিমালয়-ভ্রমণের এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম; তাহাই একত্র সংগ্রহ করিয়া পরে 'হিমালয়' ছাপাইয়াছিলাম।

যে 'ভারতী'কে অবলম্বন করিয়া আমি বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সেই 'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিল, ইহাতে আমার ন্যায় 'ভারতী'র নগণ্য সেবকের যে কি আনন্দ বোধ হইতেছে, তাহা বলিবার ভাষা নাই।

শ্রীজলধর সেন।

পথের প্রেম

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে ?
দুঃখ সুখের লীলা
ভাবিস্ একি রৈবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন-শিলা ?
চলেছিস্ রে চলাচলের পথে
কোন্ সারথির উধাও-মনোরথে ?
নিমেষ তবে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ-ঢিলা।

শিশু হয়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরি বিষম দোলার দোলে
কাট্‌ল কেঁদে হেসে।
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা'
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা ?
আবার কবে কি সুর বাঁধা হবে
আজ্‌কে পালার শেষে !

চল্‌তে যাদের হবে চিরকালই
নাইক তাদের ভার।
কোথা তাদের রৈবে থলি-থালি,
কোথা বা সংসার ?
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া ;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চল্‌চে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর্ না চলার গান,
বাজারে এক-তারা !
এই খুসিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইক কূল-কিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধন-হারা।

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ।
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সাম্‌নে সেও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির নিরুদ্দেশ!

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এম্‌নি করেই নাচে
এম্‌নি ভালোবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজ্‌বে গো এই সুরে,
কোন্ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুট্‌বে আবার হেসে!

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলাম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরে'
নেব যে তার গান।

সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলি-বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোম্‌টা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালা খানি
পরাল মোর শিরে।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষ তরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা
উদাস প্রান্তরে।
এম্‌নি করেই তার সে আসা-যাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
মর্ম্মরে মর্ম্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হলনা ঘর-বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,
এম্‌নি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
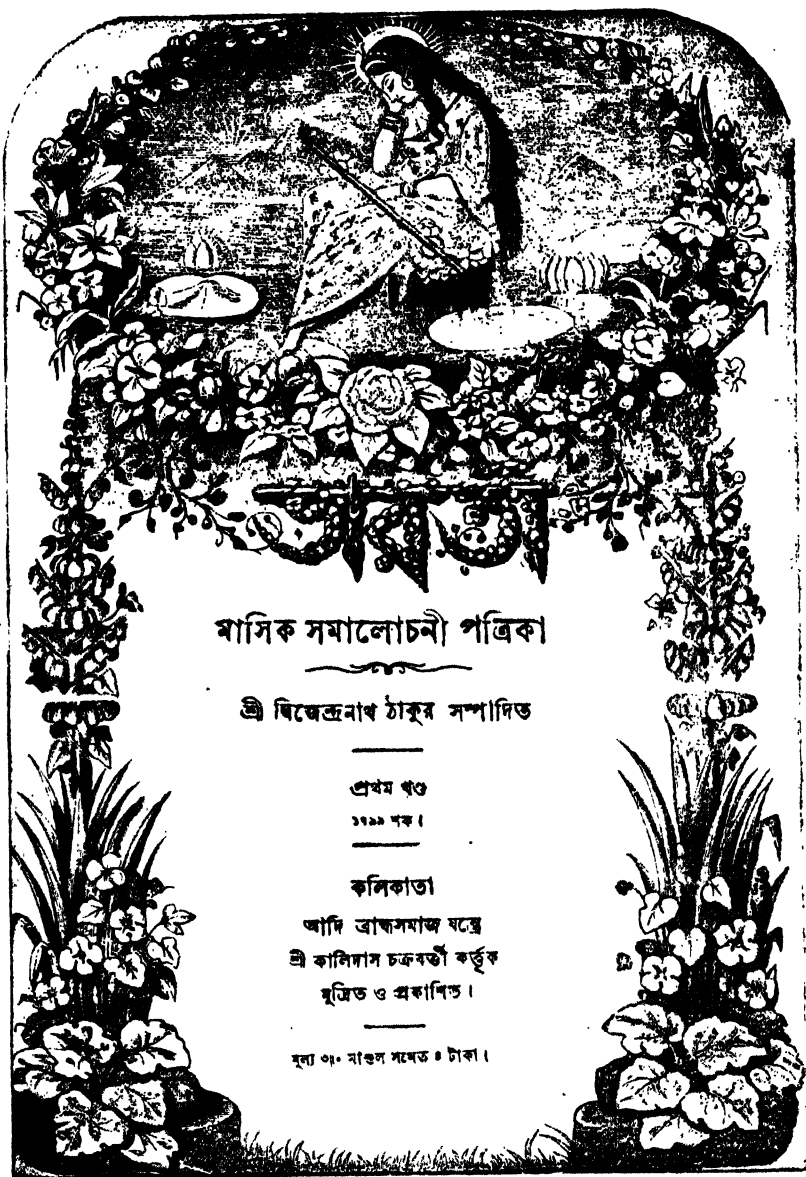
প্রথম বর্ষের প্রচ্ছদপটের নমুনা

পদ্মের পাপড়ি

[যে পদ্মের উপর ভারতীর আসন তাহার কয়েকটি পাপড়ি এইখানে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। এগুলি প্রথম বর্ষের ভারতী হইতে সংগৃহীত। পুরাতন ভারতীতে এমন অনেক রচনা আছে যাহা এখনও নবীনতার দাবী রাখে। সেগুলি এ যুগেও পাঠকদের মনের খোরাক ও চিত্তের আনন্দ দানে সমর্থ। অনেক বহুমূল্য জিনিষ আছে কিন্তু স্থানাভাব। যাহা পাঠক-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে এমন প্রবন্ধের অংশবিশেষ বাছিয়া এই বিভাগে উদ্ধৃত হইবে।]

ভূমিকা

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই সুপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ,—জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ-নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এরূপ করিব, তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জ্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু ভাব তাহার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জ্জন সম্ভবে না। যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আর এক জাতি হইতে তাঁহাদের ভাব উপার্জ্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, তাঁহাদের মনে করা মাত্রই সার। পাদ্‌রী সাহেবেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙ্গালীর মত বাঙ্গলা লিখি, এবং ইঙ্গ-বঙ্গেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে তাঁহাদের সে সুখস্বপ্নে আমরা ব্যাঘাত দিতে চাহি না। কালিদাস শকুন্তলার এক স্থলে বলিয়াছেন—"স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বং।" স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব; এই যে একটি কথা ইহা ভাবের পক্ষে খুব খাটে। ভাব বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া পটুত্ব লাভ করে না, পরন্তু ভিতর হইতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ইংরাজী মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন,—"Our poesy is a gum which oozes from whence 'tis nourished" কবিত্বরূপ নির্যাস ভিতরে যেখানে যত্নপূর্ব্বক পোষিত হয় সেই স্থান হইতে চুঁয়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশে সেদিনকার উপস্থিত-ভাষী কবি হরুঠাকুর বলিয়াছেন,—

"প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে খুঁজলে মেলে ?
সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে ॥"

স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিতভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক; যে ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয় তাহা কৃত্রিম, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে।

বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়; হার্প কি শোভা পায়? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানিয়া নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার বহু পূর্ব্বে এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা মিনর্বা—এথেনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি? না, নামের সহিত ধামের অকাট্য সম্বন্ধ। আর্য্য-ভাষা মূলসমেত অদ্যাপি কোথায় বিরাজ করিতেছেন? ভারতে! আর্য্য ভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিদ্যা আছে, ভারতভূমি তাবতেরই জন্মভূমি। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের বীজ প্রথমে ভারত-ভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়, পরে তাহার ফল দূর দূর দেশে বিকীর্ণ হইয়া, এতদিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে। ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে ভাবের প্রগাঢ় মিল দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহা মুক্ত-কণ্ঠে উক্ত হইতে পারে যে, হংসের যেমন পদ্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাস-শিখর, ভারতীর তেমনি ভারতভূমি। কিম্বা পদ্মের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভারতের তেমনি ভারতী। ভারত-ভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজ-মান থাকেন তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাঁহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাম্বরা দেবী আমাদের এই দুরবস্থার সময় যদি আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাবাস-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিব? তাই আমরা ভারতী-দেবীকে বলি যে "হে মাত-র্ভারতী! তুমিই আমাদের আঁধারের প্রদীপ, তোমার আলোকেই আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমাদের জীবন, তোমার অন্তর্ধানেই আমাদের মৃত্যু। তোমার শুভ্র বদন-জ্যোতি কাল-যবনিকায় সহস্র সহস্র ভাঁজের মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, প্রলয়-কালেও তাহা অন্তর্হিত হইবে না। তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সবল, গতশ্রী হইয়াও নবশ্রী, নির্জীব হইয়াও সজীব। আমাদের প্রতি এই যে তোমার অনিমেষ কৃপাদৃষ্টি, আমরা আমাদের নিজদোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা।"

আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহন পূর্ব্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন, ভারতীর আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

ভারতী

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন ?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন ?
অযতনে আহা সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে আহা এলোথেলো চুল
এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ ভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রাণী
মলিন মলিন বসন ভূষণ
মলিন বদনে নাহিক বাণী !
তবে কি জননি অমৃত-ভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?
দেখ তবে মাতা দেখ গো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশানপারা !
ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন
নরনারী সব চেতন-হারা !
যাহা কিছু ছিল সকলি গিয়াছে
সেদিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব
গভীর আঁধার যেদিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি
তোমারো কি বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?

না না গো ভারতী নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনী বীণা !
বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
দেখিব ভারত জাগিবে কি না ?
অযুত অযুত ভারত নিবাসী
কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে
সে রোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
উঠিবে জননি দেবতা-লোকে।
তা যদি না হয় তা হলে ভারতি
তুলিয়া লও গো বিজয়-ভেরী !
বাজাও জলদ গভীর গরজে
অসীম আকাশ ধ্বনিত করি !
গাও গো হতাশ-পূরিত গান
জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ
উথলি উঠুক ভারত-জলধি
কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।
দেখিব তখন প্রতিভা-হীনা
এ ভারতভূমি জাগিবে কি না
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
শরমে হইয়া মরমে মরা !
এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিই ভারতী গেয়েছ গান
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন তান।
আজও তুমি মাতা বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাও গো গান
হীনবল সেও হইবে সবল,
মৃত দেহ সেও পাইবে প্রাণ॥

সমালোচনা

(মেঘনাদবধ কাব্য)

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে কোন গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকেরা ইহাঁদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড় একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোন দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোন দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরুস্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠ-কালে কোন দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এগুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠক সমাজের রুচি ইংরাজি শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের 'ভাল না লাগুক, কবিতার অন্য সকল দোষ ইংরাজি গিল্টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধর তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইহাঁরা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলন-সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য-জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্য্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে পারে না।

অভিনয়-সমালোচনা

আমাদের নাট্যশালার একটা বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি, কতকাল হইল তাহার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গোড়ায় যাহা দেখিয়াছিলাম আজও তাহাই দেখিতেছি, ইহার আর উন্নতিও হইল না, অবনতিও হইল না। বীররস অভিনয় করিতে হইলেই তাঁহারা চীৎকার করিতে থাকেন, করুণ রস হইলেই তাঁহারা বুক চাপড়াইয়া নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া বিকৃত অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে থাকেন, হাস্য রসের অবতারণা করিতে হইলেই বিবিধ অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী করিয়া বিকৃত কণ্ঠে সে যে কত প্রকার ভাঁড়ামি করিতে থাকেন তাহার আর সীমা-পরিসীমা নাই। ধীর প্রশান্ত গম্ভীর বীরত্ব যে কিরূপ, তাহা তাঁহারা জানেন না, চটুল চপল আস্ফালনই তাঁহাদের বীরত্বের আদর্শ; প্রশান্ত চিন্তাময় যে এক প্রকার বিষাদ আছে তাহা তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকেন, তখন করুণ রসের আবির্ভাব দূরে থাকুক, উল্‌টা এমন বিরক্তি বোধ হয় যে, তাহা আর বলিবার নহে; আর ভাঁড়ামি না করিয়া, নিরর্থক প্রলাপোক্তি না করিয়াও যে হাসাইবার শত সহস্র উপায় আছে ইহা কি তাঁহারা এ-পর্য্যন্ত বুঝিলেন না? কিন্তু দর্শক-মণ্ডলীরই বা কিরূপ বিচার? নাটকের যদি কোন বীর প্রাণপণে ভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করিতে পারিলেন, যদি কোন শোকগ্রস্ত ব্যক্তি দুই চারিটি কথা বলিয়া সোজা হইয়া মূর্চ্ছা যাইতে পারিলেন, তবে আর রক্ষা নাই; করতালির পর করতালি, রঙ্গভূমির কন্সার্ট বাদ্য অপেক্ষাও আমাদের বিরক্ত করিয়া তুলে। দর্শকমণ্ডলীর রুচির উপর অভিনয়ের ও অভিনেতাদিগের অভিনয়ের উপর দর্শকমণ্ডলীর রুচির উন্নতি নির্ভর করে সত্য, এবং নাট্যশালাধ্যক্ষেরা বলিতে পারেন যে, দর্শকদের যাহাতে ভাল লাগে সেই অনুসারেই তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইবে, নহিলে তাঁহাদের চলিবে কি করিয়া। চাতক পক্ষীর ন্যায় তাঁহাদিগকে ঐ করতালির ধারা বর্ষণের জন্য তৃষিত কর্ণে অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের উৎসাহ থাকিবে কিরূপে? এবং উৎসাহ অভাবে যে অভিনয় অধিকতর নিকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কথাটি সত্য বটে, কিন্তু ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানিবেন যে, ভাল অভিনয় হইলে দর্শকদিগের সন্তোষজনক হইবে না ইহা অসম্ভব; যদি দর্শকদিগের এতই রুচি বিকৃত হইয়া থাকে তবে তাঁহাদের দোষেই হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই হস্তে তাহার সংস্কারের ক্ষমতাও আছে। অভিনেতাদিগের আর এক দোষ আছে গ্রন্থকার নাটকের প্রতি ছত্র কত ভাবিয়া চিন্তিয়া কত সাবধানে বসাইয়াছেন তাহা তাঁহারা ভাবেন না। তাঁহারা যে মুহূর্ত্তের-মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে দুই এক কথা বাড়াইয়া বা কমাইয়া দেন, তাহা অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য বলিতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র কথায় সামান্য স্বর ও হস্তপদ-ভঙ্গীতে এক একটি চরিত্র উলটিয়া পালটিয়া যায়, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান নাই।

বুড়ার কথা

[কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উমানাথ রায় লিখিত। ইহাঁর বয়ঃক্রম তখন অশীতি বৎসর। ইনি এই প্রবন্ধের সূচনায় লিখিতেছেন—"এই অশীতি বৎসর বয়সে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং স্বর্গীয় অতি-বৃদ্ধদের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলাম।"]

গাড়ি পাল্কি।—বোঁচা ও মেয়ানা পাল্কি, বজরা, তানজান ইত্যাদিতে বড়লোকেই চড়িতেন। বাঙ্গালির মধ্যে চুঁচুড়া-নিবাসী মৃত নীলমণি হালদার প্রথমে গাড়ি চড়েন, তাঁহার সাহেব কোচম্যান ছিল। তাঁহার দেখা দেখি কলিকাতার বড়মানুষেরা গাড়ি ধরিলেন। পূর্ব্বে এ প্রকার ছেক্ড়া গাড়ি ছিল না, দড়িতে ঝুলান নৌকা আকারের গাড়ি কয়েকখানা মাত্র ছিল।

বুড়ার সম্মান।—এখনকার নব্য সম্প্রদায় "বুড়া" মাত্রকেই "ওল্ড্ ফুল" বলিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বে বুড়াদের অত্যন্ত সম্মান ছিল। গ্রামের বুড়া কলহ ভঞ্জন করিবেন, দলাদলি নিবারণ করিবেন, পঞ্জিকা দেখিয়া দিন স্থির করিবেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে আয়োজনাদির ব্যবস্থা দিবেন; এমন কি, তিনি গ্রামের শিরোমণি, যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। গ্রামের জামাতারা আসিয়া অগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, নূতন লোক আসিয়া প্রথম তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন, গ্রামস্থ নব্য দল তাঁহার নিকটে উচ্চ কথা কহিবে না, শীষ দিবে না, বা গান করিবে না, বৌ-ঝিরা সে পথে যাইলে মলের বাদ্য করিবে না; এমন কি, মাথায় ফের্তা দিয়া সেথান দিয়া কেহ যাইবে না।

বয়স্থের শৈশব-সরলতা।—কলিকাতার কোন বড় মানুষ প্রত্যহ বৈকালে গল্প শুনিতেন। গল্প করিবার জন্য মাহিনা করা চাকর নিযুক্ত ছিল। গল্পের নায়ক নায়িকা বা অপর কেহ যদি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইত, বা তাহাদিগের কোন বিপদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তিনি এত উত্তেজিত হইতেন যে তৎক্ষণাৎ বলিতেন "মেরো না মেরো না, ওকে বাঁচাও আমি দশ টাকা দিব" অথবা "ঐ বাঘটাকে তাড়াইয়া দেও, ঘুমন্ত কোটালের পুত্রের অনিষ্ট না হয়, আমি ৫ টাকা দিব।" কথকেরা ইচ্ছা করিয়া বাবুকে উত্তেজিত করিত ও নায়ক-নায়িকাদিগকে কষ্টে ফেলিয়া টাকা সংগ্রহ করিত।

গণিকা।—তখনকার অধিকাংশ লোকেই বেশ্যালয়ে গমন করিতেন। যাইবার কোন কদর্য্য অভিপ্রায় ছিল না। কেবল দশ জন ভদ্রলোকে একত্রিত হইয়া গান বাদন, ক্রীড়া বা সদালাপ করা মাত্র। এ বিষয়ে পূর্ব্বকার গ্রীকদিগের সহিত বাঙ্গালীদের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুটীয়ালেরা আফিস হইতে আসিয়া হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, বৃদ্ধ ও আধ বৃদ্ধেরা হরি-নামের ঝুলি লইয়া বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন; বয়সের তারতম্য ছিল না, সকল বয়সের লোকই সমবেত হইতেন। অনেকে ঐ সমস্ত স্থানে "সহবৎ" শিক্ষা করিতে আসিতেন।

সম্পাদকের বৈঠক

বায়রণের কথোপকথনকালীন উক্তি

অমরত্ব।—আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসই জীবনের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের একমাত্র প্রকৃত ঔষধ।

যশের যন্ত্রণা।—কোন গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত হইলে তাহার লেখক চিরকালের জন্য অসুখী হয়েন। ইহাতে তাঁহার যশ-তৃষ্ণা এত দূর বর্দ্ধিত হয় যে, তাঁহার মন হইতে শান্তি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। তাহার একটি গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হইয়া আরও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিতে সচেষ্ট হয়েন; লোকেও প্রত্যাশা করে যে, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলি আরও উৎকৃষ্ট হইবে। এই জন্য নিরাশা উপস্থিত হয়। কারণ লেখকের আশা এতদূর উত্তেজিত হয় যে, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ আজ কালের এইরূপ ধরণ যে, গ্রন্থকারের একটি রচনাও যদি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হয় তাহা হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই—তাঁহার পূর্ব্বরচিত যদি ৫০ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকে তথাপি একটি নিকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্ব-কীর্ত্তির অপলাপ করে।

জীবন।—জীবনের স্বল্পতা লইয়া লোকে আক্ষেপ করে, জীবন অতি দীর্ঘ বলিয়া বরং তাহাদিগের আক্ষেপ করা উচিত। কারণ জীবনচক্রের অর্দ্ধ পথে যাইতে না যাইতেই জীবনের সমস্ত সুখ তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল ছলনার অস্তিত্বে জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয় না, সেই সকল ছলনা-গুলি চলিয়া গিয়া যখন গম্ভীর উপদেষ্টা অভিজ্ঞতা আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে তখন আর জীবনে কি সুখ? তাহার পূর্ব্বেই যাহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহারা অতি ভাগ্যবান্। যৌবন যখন জীবন-তরণীর হাল ধরিয়া থাকে, প্রবৃত্তি-স্রোত যখন তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—অভিজ্ঞতা তখন তফাৎ থাকেন। কিন্তু যখনি যৌবন পলায়ন করে ও প্রবৃত্তির বেগ মন্দীভূত হয়, যখন অভিজ্ঞতার সাহায্য আর প্রয়োজন হয় না, তখনি অভিজ্ঞতা আসিয়া অতীতের জন্য আমাদিগকে তিরস্কার করিতে থাকেন, বর্ত্তমানের প্রতি বিরক্তি জন্মাইয়া দেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য ভয় প্রদর্শন করেন।

কবিতা-প্রবণ প্রকৃতি।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কবিতাপ্রবণ-প্রকৃতিতে কি একটি উপাদান আছে যাহা সুখের নিতান্ত বিরোধী। যাহার প্রকৃতি কবিতাপ্রবণ সে নিজেও সুখী হয় না—তাহার সম্পর্কীয় লোকদিগকেও সুখী হইতে দেয় না।

প্রতিভা ও জন-সমাজ।—জনসমাজ ও প্রতিভা এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী পদার্থ। প্রতিভা জনসমাজের সহিত অধিক কিম্বা ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে প্রায়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রসিকতা ও কার্য্যপটুতা সম্বন্ধে সেরূপ নহে। এই দুইটিগুণ জন-সমাজের ঘর্ষণেই উত্তেজিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

মৃগয়া
প্রাচীন চিত্র হইতে

স্বেচ্ছাচারী

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক

[শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত; অধ্যয়ন-অধ্যাপনে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয় এবং গ্রামের জমিদার মুখোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর পৈতৃক টোলের বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরের আয়েই তাঁহার জীবিকা। তাঁহার একমাত্র পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথম হইতেই তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া অল্পকালের মধ্যেই গ্রামের সকলের পরিচিত হইয়া উঠে। গ্রামের জমিদার কালিকামোহন মুখোপাধ্যায় এই বালকের রূপেগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা শৈলজাসুন্দরীর সহিত ভবিষ্যতে বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন এবং সেইজন্য কার্ত্তিক ও তাহার বন্ধু সর্ব্বানন্দকে টোল ছাড়াইয়া গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। কালিকামোহন তাঁহার এই ইচ্ছাটা প্রথমে গোপন রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর শীঘ্রই তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মদ্যপ ও কুসঙ্গী পুত্র মণিশঙ্করের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে এই দুইটী জীবন্ত বাধাকে সরাইবার জন্য জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিক তাহার প্রচণ্ড শক্তিতে সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। শেষে একদিন মণিশঙ্করের মাতলামিতে দুর্গাশঙ্করের সর্ব্বপ্রকার আশা সমূলে উৎপাটিত হইল এবং মণিশঙ্করও লাঞ্ছিত হইয়া তাহার পিতার মস্তকে অপমানের বোঝা চাপাইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কার্ত্তিক প্রথম হইতেই তেজস্বী এবং একরোখা—সে তাহার শক্তির পরিচয় সর্ব্বপ্রকারেই প্রদান করিয়া শীঘ্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কার্ত্তিকের পিতা সরলবুদ্ধি ব্রাহ্মণপণ্ডিত; তিনি এতদিন পর্য্যন্ত কালিকামোহনের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ধনী ও বদান্য কালিকাবাবু যেমন সকলকেই মুক্তহস্তে সাহায্য করেন, কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দকে সেইরূপই করিতেছেন। কিন্তু তিনি যখন কালিকামোহনের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন, তখন কার্ত্তিকের কলিকাতায় যাইয়া পড়াশুনা করার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "সকলেই মনে করবে যে আমি টাকার লোভে ছেলে বিক্রী করেছি।" কিন্তু অবশেষে কালিকামোহনের অনুনয়-বিনয়ে ও কাতর প্রার্থনায় তিনিও শৈলজার সহিত কার্ত্তিকের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইতিমধ্যে কার্ত্তিক জানিতে পারিল যে সর্ব্বানন্দ শৈলজাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে. এবং সেইজন্য যাহাতে সর্ব্বানন্দর সহিত শৈলজার বিবাহ হয়, তাহার চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। তারপর যথাসময়ে সে তাহার বন্ধুর সহিত কলেজে এফ-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।]

দ্বিতীয় খণ্ড

১

"বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—সনাতন ভারতবর্ষের এই সনাতন উক্তির সনাতন সার্থকতা দেখাইবার জন্য মণিশঙ্কর পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে যখন আবার তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে একজন প্রবল প্রাণায়ামী পরিব্রাজক পরমহংস। যদিও পরিব্রাজক ধর্ম্মের প্রচলিত রীতি-অনুসারে দ্বাদশ বর্ষের শেষভাগে একবার জন্মভূমিতে দেখা দিতে হয়, তথাপি 'তেজীয়সাং ন দোষায়' শাস্ত্রের এই বচনানুসারে পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করানন্দ স্বামীজি ওরফে মণিশঙ্কর তাঁহার অজ্ঞাতবাসের দুই বৎসর অতীত

হইতে না হইতেই শিববামপুরে আপনার পূর্ব্ব পীঠস্থান পোড়া বাঙ্গলায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন না এবং সেই কারণেই তাঁহার পুণ্যনাম অচিরে দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গ্রামের বৃদ্ধগণ বলিলেন, "মানুষ কি আর চিরদিন এক-রকমই থাকে? সুবাতাস বহিলে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। আহা, মণির আমাদের কি সুন্দর পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! হইবে না কেন? সনাতন ধর্ম্ম!"

সনাতন ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব সন্তানটির কীর্ত্তি-কলাপের কথা ইতিমধ্যে সুপ্রচারিত হওয়ায় সে সংবাদ যথারীতি জমিদারী অন্তঃপুরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্র পুরাঙ্গনাগণ যেমন সাধু-দর্শনার্থ মাঝে মাঝে পোড়া বাঙ্গলায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, কালিকাবাবুর পুরমহিলাগণের মধ্যেও সেইরূপ করিবার একটা কথাবার্ত্তা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। নবীন স্বামীজিটির যশের অন্যান্য নানাবিধ কারণের মধ্যে একটী কারণ ইহাই ছিল যে, তিনি নাকি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিতে সিদ্ধহস্ত এবং নাস্তিপুরের রাজকন্যার দুই চারি বৎসরের মূর্চ্ছারোগ তিনি নাকি তিন দিনের স্বস্ত্যয়নে আরাম করিয়াছেন! সর্ব্বোপরি তিনি সামুদ্রিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

যদি কোন হতভাগ্য ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিত, দুই-এক বৎসরের মধ্যে মণিশঙ্কর এত শিখিল কি করিয়া! তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে স্বামীজির নবীন ভক্তগণের দ্বারা তিরস্কৃত হইত। কেহ বলিত, "দৈবশক্তির দ্বারা কি না হয়?" যাঁহারা অধিকতর বুদ্ধিমান, তাঁহারা বলিতেন, "কেমন করিয়া হইল, সে প্রশ্নের কি প্রয়োজন! গণনার ফলই স্বামী শঙ্করানন্দের অমানুষিক ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" স্বামীজির এমনি অদ্ভুত ক্ষমতা যে তিনি হাত দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তির গৃহ কোন্ দুয়ারী এবং সেই গৃহের ঈশান কিম্বা নৈঋৎ কোণে কোনও বৃক্ষাদি আছে কি না। এমন কি সদর রাস্তা সেই গৃহের কোন্ দিকে, তাহাও অধিকাংশ সময় মিলিয়া যায়। তবে যদি কখনও তাঁহার ভুল হয়, সে ভুল ব্যস্ততা-প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে, কারণ স্বামীজির নিকট লোক-সমাগমের বিরাম নাই।

স্বামীজির গণনা-শক্তির একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। নিকটস্থ গ্রাম হইতে এক বৃদ্ধ গোপজাতীয় ব্যক্তি স্বামীজির নিকট আপনার ভাগ্য-গণনার জন্য উপস্থিত হইল, এবং সাড়ম্বরে একটী রজত মুদ্রা পরমহংসের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিল। পরিব্রাজকাচার্য্য তৎক্ষণাৎ বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর! এ লোকটি, দেখছি, ঘোর-বিষয়ী! সন্ন্যাসী যোগীর কাছে এসেও টাকার কথা ভুলতে পারেনি! টাকা-কড়ির চেষ্টায় আমার কাছে কেন, বাপু?" বৃদ্ধ গোয়ালাটি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এ কি মানুষ! আমার মনের কথা আসতে মাত্র ধরেছে! বাবাঠাকুর, আমি বড় গরীব, আমায় দয়া কর—হাতটি দেখ।"

মণিশঙ্কর কহিল, "হাত দেখাতে এসেছিস্ ত টাকা এনেছিস কেন?"

ভক্তগণের মধ্যে একজন তখন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওহে বাপু, উনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী; ওঁকে কি টাকার লোভ দেখাতে আছে? টাকাটা তুলে নাও, দেখছ না, উনি টাকার জন্য বসতে পাচ্ছেন না!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি টাকাটা উঠাইয়া লইয়া বলিল, "বাবাঠাকুর, আমি গরীব, আমার কপালে কি যে লিখেছে বিধেতা, তা জানিনে! আমার চার-চারটে গরু মরে গেল। দেখ দেখি বাবা-ঠাকুর, আর কতদিন এমনি চলবে?"

শঙ্করানন্দ স্বামী আসন পরিগ্রহ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে তোদের গ্রামে চামার আছে?"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিল, "আজ্ঞে আছে বই কি!" স্বামীজি পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "তাদের মধ্যে বেঁটে মোটা কালো রংয়ের যে, সে-ই তোর শত্রু, সে-ই তোর গরুদের বিষ দিয়ে মারছে। তাকে বিশ্বাস করিসনে।"

বৃদ্ধ চমকিত হইয়া বলিল, "এ্যাঁ, হারাণে! হারাণে বেটার এই কাজ! ভাগ্যে বাবাঠাকুর তোমার কাছে এয়েছিলুম! দাঁড়া বেটা, তোর চামারগিরি বার করছি!"

বৃদ্ধ আরও দুই-চারিটী প্রশ্নের সঠিক উত্তর গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে এই সংবাদ নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া সারা গ্রামময় রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না।

তবে যেমন সকল মহৎ ব্যক্তিরই শত্রু থাকে, তেমনি স্বামীজিরও দুই-একজন শত্রু জুটিয়াছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের দুই-একটী ত্রিপণ্ড ছাত্র স্বামীজির বৈরাগ্যমেবাভয়ং এই সূত্রের অদ্ভুত ব্যাখ্যাও বাহির করিয়াছিল। তাহারা বলিত, শঙ্করানন্দ পরমহংস নন, পরম বক; এবং বৈরাগীর বেশ তাঁহার ভণ্ডামির আশ্রয়, তাই বৈরাগ্যই তাঁহার পক্ষে অভয়। অবশ্য এ ব্যাখ্যার জন্য তাহারা গুরুজনের নিকট যথারীতি শাস্তি পাইত বটে, তবুও তাহারা এ কথা বলিতে ছাড়িত না।

তাঁহার সম্বন্ধে এইরকম একটু-আধটু সন্দেহজনক জনরব প্রচারিত হইবার কারণও ছিল। স্বামীজি প্রতিরাত্রে পূজায় বসিয়া বীরাচার-মতে দুই-এক বোতল কারণ-সলিল বা সুধাপান করিতেন এবং ভক্তির আবেগে মধ্যরাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাসভ-নিন্দিত স্বরে যখন গান ধরিতেন,

> "সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই
> জয় কালী বলে,
> আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ
> মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

তখন পথিকের চিত্তে ভক্তি-মোহের পরিবর্ত্তে ত্রাসেরই সঞ্চার হইত। কিন্তু অন্তরে অন্তরে "মহাকৌল" হইয়াও বাহ্যতঃ তিনি কখনও সে ভাব প্রকাশ করিতেন না; যদি কোন সংশয়ী শিষ্য তাঁহার এই অসমঞ্জস ভাবদ্বয়ের বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলিত, তাহা হইলে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন,

> অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।

অন্তরে শাক্ত রহিয়া বাহিরে শৈবের ন্যায় আচরণ করিবে এবং সভায় বৈষ্ণবের ন্যায় কথা কহিবে। ইহাই হইতেছে কুলধর্ম্ম, ইহাই শিববাক্য।

২

এ-হেন মহাপুরুষ যে তাঁহার লৌকিক পিতামাতার সহিত আপনার জ্ঞানগরিষ্ঠ চরিত্রোচিত ব্যবহার করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করাই অন্যায়। ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা,—কেহই কিছু নয়, সকলেই মায়ার বিজৃম্ভন মাত্র। অতএব এই "শিব-স্বরূপ" পুত্রের, এই চলন্ত শঙ্করের মাতা হইয়া নিস্তারিণী দেবী স্বভাবতই আপনাকে ধন্যা মনে করিতেছিলেন। কিন্তু পিতার সহিত এই মহাপুরুষ-সন্তানের প্রথম দর্শনেই চোখে চোখে যে কথা হইয়া গিয়াছিল, স্থূল শরীরে যে যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল, সে কথা প্রাকৃত লোকের বুদ্ধির অগম্যই রহিয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, প্রভুপাদ শঙ্করানন্দের পিতা-মাতা উভয়েই উপযুক্ত পুত্রের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে নানাভাবে বিস্তারিত করিতে ত্রুটি রাখেন নাই; এবং তাঁহাদের, বিশেষতঃ নিস্তারিণী দেবীর সহিত শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবীর বিশেষ সখিত্ব থাকায় শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন কোন-এক প্রভাতে শঙ্করানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও স্বামীজির সদালাপে মুগ্ধ হইয়া গৃহে গিয়া কেবলমাত্র এই কথাটী উচ্চারণ করিলেন, "কাকঃ কাকঃ।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় উঠিয়া গেলে সহসা স্বামীজির চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যেন সহসা একটা প্রচণ্ড বিষাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "অহো, এমন জ্ঞানী পিতার এমন কুসন্তান!" শিষ্যগণ প্রভুর মুখ হইতে এবম্বিধ বাক্য উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু কেহই প্রভুর উক্ত প্রকার অদ্ভুত উক্তির কারণ জানিতে পারিল না। প্রভু কেবল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ক্রমশঃ এই কথাটী অজ্ঞাত উপায়ে জমিদারী অন্তঃপুরেও প্রচারিত হইয়া গেল। কালিকাবাবুর মাতা পুত্রকে ধরিয়া বসিলেন যে অদ্য কালিকাবাবু স্বয়ং গিয়া এ-বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানিয়া আসুন। কালিকাবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মণিশঙ্করের কথায় যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে যে-কোন মাতালের মাতলামিতেও বিশ্বাস করতে হবে।"

মাতা বলিলেন, "কিন্তু মণি আর যাই হোক, ওর কথা যে শুন্‌ছি অনেক সময় ফলে যায়। ওর একটা-কিছু ক্ষমতা হয়েছে নিশ্চয়, নইলে এত লোক ওকে মানবে কেন?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "মা, সহজে বিশ্বাস করা সাধারণ লোকের একটা রোগ। বিশেষ যদি তার সঙ্গে দৈব শক্তি-টক্তির ভণ্ডামি থাকে, তাহলে ত আর কথাই নেই। আমায় যদি স্বয়ং ভগবান এসে বলেন যে মণিশঙ্কর সাধু হয়েছে, তাহলেও আমি সে কথা বিশ্বাস করব না।"

মাতা কহিলেন, "এ তোমার অন্যায়! সাধু-সঙ্গে কি না হয়?"

"হ্যাঁ, সাধু-সঙ্গ হলে! কিন্তু ওর যে

সাধু-সঙ্গ হয়েছিল, তা কে বল্লে? তা-ছাড়া আমার বিশ্বাস, কয়লাকে হাজার ধুলেও তার কালো রং যায় না।"

"কিন্তু আগুনে লাগলে সে কালি যেতে পারে ত।"

"মা, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, দেশের যত ওঁছা ত্রিপণ্ড্র, মায়ে-তাড়ান বাপে-খ্যাদান ছোঁড়া ওর সঙ্গে গিয়ে জুটেছে। সাধুর প্রথম লক্ষণ এই যে তার কাছে গিয়ে বসলেই মনটা ঠাণ্ডা হবে। সাধু-চরিত্র ঠিক চিনির গুদোমের মত, ঘরে ঢুকলেই মুখটা মিষ্টি মিষ্টি হয়ে যাবে। যার একটুও ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা আছে, সে-ই ওর কাছ থেকে ফিরে এসে বলছে, ওর মধ্যে আঠারো-আনাই ভণ্ডামি। বাস্তবিক শান্ত প্রকৃতির সাধু-চরিত্রের লোক কি একটিও এ-পর্য্যন্ত ওর সঙ্গী হয়েছে? ইংরিজিতে একটা চলিত কথা আছে, যার মানে হচ্চে, মানুষের সঙ্গী দেখেই তার চরিত্র ধরা যায়।"

মাতা কহিলেন, "তোমাদের ইংরিজি-পড়া লোকেদের ঐ কেমন এক ধরণ! কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না! কিন্তু ডাকিনী যোগিনী সিদ্ধি এ সবও যে শুনি আজকাল বড় বড় ইংরিজি-জানা লোকও মানছে। বিলেতে সাহেবরাও না কি মানছে।"

"তা মানুকগে, মা, আমি মানতে পারব না।"

"যাই হোক, তুমি কার্ত্তিকের বিষয় তাহলে খোঁজ নাও।"

"তার খোঁজ আমি রোজই পাই মা, এই ত কালও মনোহর তার বিষয় লিখেছে। মনোহরের ছেলে শশীর সঙ্গে কার্ত্তিক আর সর্ব্বানন্দর খুব ভাব হয়েছে। তার কাছ থেকে মনোহর রোজই কার্ত্তিকের খবর পায়।"

"তোমার টৌর্ণি বাবুকেও চিঠি লিখে দাও। কি জানি, সহর বাজার স্থান—কার্ত্তিক হয়ত—"

"তুমি ভয় করো না। আমি কার্ত্তিকের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখেছি, নইলে কি এতদিন ধরে আমার মেয়ের বিয়ে না হয়ে থাকে? কার্ত্তিক যদি সহজে নষ্ট হবার মত ছেলে হত, তাহলে এমন করে ওকে পাবার জন্য চেষ্টা করতুম না।"

তথাপি কালিকাবাবুর মাতা জগদম্বা দেবীর সন্দেহ দূর হইল না। তিনি নানা কৌশলে মণিশঙ্করের নিকট হইতে কার্ত্তিকের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজির সেই এক কথা,—"আমি কখন্ কি যে বলি, সব কি আমার মনে থাকে? যখন যে ভাব যে কথা গুরুর কৃপায় আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে ওঠে, তখন তাই প্রকাশ করি। তবে যদি কারও কিছু জানবার দরকার থাকে, সে যেন একটা হরিতকী হাতে করে জিজ্ঞাসু-ভাবে আমার কাছে আসে, তাহলে তার প্রশ্নের সদুত্তর আপনিই আমার মনে উদয় হবে এবং সেও জান্‌তে পারবে।"

কালিকাবাবুর মাতা জগদম্বা দেবী ব্যস্ত হইয়া একদিন মণিশঙ্করের মাতা নিস্তারিণী দেবীকে ধরিয়া বসিলেন যে তাঁহাকে সঠিক সংবাদ আনিয়া দিতে হইবে। আর যদি নিস্তারিণী দেবী অক্ষম হন, তাহা হইলে

জগদম্বা দেবী স্বয়ং একদিন তাহার কাছে যাইবেন। শৈলজার মাতা ইন্দিরা দেবী এ সংবাদে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে মৃদু অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্চেন? উনি যখন নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, তখন আমাদের ভয় কি? আর আপনি এই রকম কাণ্ড করছেন শুনলে উনি দুঃখিত হবেন। সে দিন তিনু ঠাকুরঝি ক্ষান্ত পিশি মণির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বলে উনি কত রাগ করলেন! তার ওপর যদি আপনি যান, তাহলে উনি বড্ড দুঃখিত হবেন।"

জগদম্বা কহিলেন, "বৌমা, শৈল ত তোমাদের একার নয়! ওর কিসে ভাল-মন্দ হবে, তা আমিও বুঝি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি যা করছি, তাতে কেউ দোষ দিতে পারবে না।"

ইন্দিরা দেবী ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন। জগদম্বা দেবী শৈলজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শৈলজা আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "ওরে তোর মণি-দার সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাবি? সে এখন মস্ত সাধু হয়ে এসেছে। চল্‌না, একবার দেখে আসি।"

শৈল কহিল, "মণিদার সঙ্গে দেখা করতে যাব! কেন?"

জগদম্বা কহিলেন, "শুনিসনে, সে না কি ভারি গুণতে পারে! চল্, তোর হাতটা দেখিয়ে আনি।"

শৈল কহিল, "কেন, আমার হাত দেখিয়ে আবার কি হবে?"

জগদম্বা কহিলেন, "তোর কেমন বর হবে, সেটা জানবি নে?"

শৈলজা হাসিয়া বলিল, "সে তখন যেমন হয় হবে, তার জন্য আমি এখন থেকে ভাবতে যাব কেন?"

জগদম্বা কহিলেন, "তুই ভাববি না ত কে ভাববে?"

শৈলজা কহিল, "যার দরকার হয়, সে ভাবুকগে, আমি ভাবব না।"

জগদম্বা কহিলেন, "অর্থাৎ তোর ভাবা-টাবা সব ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন কেবল হাতে পেলেই হয়, কেমন?"

শৈল কহিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু! আমি চল্লুম।"

জগদম্বা কহিলেন, "আহা, চল্ না! তোকে যে বিয়ে করবে, সে কেমন লোক হবে, এ কথা কি জান্‌তে ইচ্ছে করে না?"

শৈল কহিল, "কে কেমন হবে, তা কি কেউ হাত দেখে বলে দিতে পারে না কি?"

জগদম্বা কহিলেন, "যারা গুণতে জানে, তারা পারে।"

শৈল কহিল, "তা পারুক, আমি সে সব গুণে-টুনে দেখতে চাইনে।"

জগদম্বা কহিলেন, "কেন, শুনি?"

শৈল কহিল, "কেন আবার কি! আমি বারে বারে তোমার 'কেন'র উত্তর দিতে পারব না,—আমি কোথাও যাব না।"

জগদম্বা এইবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার কথা তবে রাখবিনে? তোর বাবার ভয় করছিস? আমি নিয়ে গেলে সে কিছু বলবে না।"

শৈল কহিল, "আর যদি আমিই না যাই?"

জগদম্বা কহিলেন, "তাহলে আর আমি কি করব!"

শৈল কহিল, "তবে সেই বেশ কথা! আমিই যাব না। কোথাকার একটা কে, মদো-মাতাল গাঁজাখোর লোক, তার কাছে হাত দেখাতে যেতে হবে! তোমার দিন দিন বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন কি হয়ে যাচ্ছে!"

জগদম্বা কহিলেন, "কোথাকার কে কেন হ'তে যাবে? ও যে আমাদের মণি।"

শৈল কহিল, "হলই বা মণি! কে ওর মনের ভিতর ঢুকে দেখতে গিয়েছে যে, ওর মনে কি আছে? এই ত' বছর-দুই আগে ও একটা মস্ত মাতাল বওয়াটে ছিল। এরই মধ্যে দুবছর যেতে না যেতে একখানা গেরুয়া কাপড় পরে এল, আর অমনি তোমরা দেশশুদ্ধ লোক ওর পেছনে ছুটতে আরম্ভ করেছ। তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও, মা যেখানে যেতে বারণ করেন, সেখানে আমি কিছুতেই যাব না।"

শৈলজা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। জগদম্বা দেবী নানা প্রকারে বুঝাইয়াও কিছুতেই তাহাকে মণিশঙ্করের নিকট হাত দেখাইতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। শেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হায় হায়, দেবতা-বামুনে ভক্তি আজকাল কোথায় চলে গেল? হায় রে সেকাল!"

৩

কলিকাতার কোন এক প্রসিদ্ধ কলেজের সেকণ্ড ইয়ার ক্লাশে সংস্কৃত অধ্যাপক প্রবেশ করিবামাত্র ছাত্রগণ নানারূপ গল্প-গুজবে প্রবৃত্ত হইল। অধ্যাপক মহাশয় 'রোল্' 'কল্' করিয়া রঘুবংশের কোন এক সর্গের শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র কয়েকজন ছাত্র সর্ব্বানন্দকে ধরিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা, আজ পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ-ঘটিত একটা তর্ক জুড়ে দাও, আমরা একটু মজা করি।"

সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বসিল, "রোজ রোজ তোমাদের জন্য পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারিনে।"

যোগীন্দ্র নাছোড়-বন্দা। সে বলিল, "সে হবে না সর্ব্ব-দা, তোমায় তর্ক করতেই হবে। ঐ দেখ, পণ্ডিত মশায় কেবল বাঁকা চোখে তোমার দিকে চাচ্ছেন। তোমাকেই সব-চেয়ে সমজদার ছাত্র বলে জানেন। তুমি চুপ করে থাকলে আজকের ঘণ্টাটাই উনি ব্যর্থ মনে করবেন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তা করুন! আজ আমার নিশ্চুপের পালা। আজ কার্ত্তিককে গিয়ে ধর্ না।"

পিছন হইতে কালো-কোলো মোটা-সোটা দেবনাথ তাহার অসম্পূর্ণোদ্গত গুম্ফে তা'. দিতে দিতে বলিল, "ওখানে দাঁত ফুটবে না, তার চেয়ে বাইরে চলুন, সর্ব্ববাবু, আপনার উদ্ভট শোনা যাক গিয়ে।"

গীতবাতিকগ্রস্ত কাব্য-কূপ সত্যজীবন তাহার স্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখাইয়া অতি দ্রুতবেগে বলিল, "উদ্ভট কবিতা, উদ্ভট কবিতা! আমি—আমি—আমি সেদিন যে একটা চমৎকার কবিতা পেয়েছি, তার কাছে, তার কাছে, সব, বুঝেছ কি না, সব কবিতা meaningless trash বলে মনে হবে। কবিতাটা ঠিক যেন ইয়ের মত,—মন-প্রাণ একেবারে উঃ, সে কি বলব, ভাই!"

দেবনাথ তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল, "তা আর বলে কাজ নেই।"

সত্যজীবন কহিল, "ওহে না, না, সেদিন আমি যাঁর কাছ থেকে শুনলুম—"

যোগীন্দ্র কহিল, "ওঃ বোঝা গেছে! যাঁর কাছ থেকে শুনেছ, তাঁরই কমনীয় কণ্ঠের যোগ থাকাতে সেটা এত সুমিষ্ট হয়ে উঠেছিল।"

বন্ধুদের দলে একটা চাপা হাসির স্রোত বহিয়া গেল। সত্যজীবনের মনের "চর্ম্ম"টা কিঞ্চিৎ স্থূল, তাই যোগীন্দ্রর বিদ্রূপে সে-ই বেশী হাসিল; কিন্তু পরক্ষণেই অতি প্রবলবেগে হাত-মুখ নাড়িয়া সে বলিল, "তোমরা যদি তাঁর গলা শুনতে, তাহলে আর সে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করতে না! আঃ, সে কি সুন্দর! গলা ত নয়, যেন—"

দেবনাথ বাধা দিয়া কহিল, "মিছরির ছুরি! চোরের নাক কাটা চলে! খেতেও মিষ্টি!"

আবার চাপা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতেই সর্ব্বানন্দ বলিল, "ওহে, পণ্ডিত মশায় চশমার ওপর দিয়ে ঘন-ঘন এ ধারে তাকাচ্ছেন। তোমরা বাইরে যাও।"

সত্যজীবন তাহার "তিনি"র গল্প করিবার জন্য ছটফট করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "তাই চল, তাই চল।"

যোগীন্দ্র তাহার পার্শ্বস্থিত 'ঠাকুরদা'-নামধারী প্রকাণ্ড-কালো-দাড়ী-সমন্বিত নিদ্রিত বন্ধুটীকে একটা খোঁচা মারিয়া জাগাইয়া দিল। এই ঠাকুরদা দশ-বারো বৎসর ধরিয়া এফ, এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া উক্ত উপাধিটি অর্জ্জন করিয়াছিল, এবং আপনার বহুদিনের অধিকারের ফলে যে-কোন ঘণ্টায় নিদ্রা যাইবার একটা অবাধ ও চিরস্থায়ী সত্ত্ব প্রফেসর ও ছাত্রগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিল। খোঁচা খাইয়া 'ঠাকুরদা' তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটী উন্মীলিত করিয়া একবার কক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইল, তারপর মৃদু স্বরে বলিল, "ওঃ, পণ্ডিত এসেছে! চল্ রে, তামাক খেয়ে আসি।"

যোগীন্দ্র ও সত্যজীবন সর্ব্বানন্দকে টানাটানি আরম্ভ করিতেই কিঞ্চিৎ দূরস্থিত কার্ত্তিকের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। কার্ত্তিক তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইল বটে, কিন্তু সর্ব্বানন্দ আর উঠিতে পারিল না। যোগীন্দ্র তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কার্ত্তিক কি তোমার অভিভাবক না কি যে, ওর মত না নিয়ে তুমি নড়বে না?"

ঠাকুরদা হাই তুলিয়া বলিল, "কার্ত্তিকটাকেও ডেকে নাও না। ও'ই বা কি করছে বসে?"

যোগীন্দ্র কার্ত্তিকের নিকট গিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, ঠাকুরদা তোমায় ডাকছে, এস।"

কার্ত্তিক তাহাদের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা, দিন-দিন তোমার এ কি হচ্ছে? পণ্ডিতমশায় নিরীহ গোবেচারা বলে তাঁকে কেন তোমরা এমনভাবে রোজ রোজ অপমান কর? তোমাকে উনি সব চাইতে বেশী ভালবাসেন, আর তুমিই ওঁকে সব-চাইতে বেশী অবহেলা দেখাচ্ছ!"

সর্ব্বানন্দ লজ্জিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় যোগীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "এদিকে ত' দাদা বলা হয়, কিন্তু কথা শুনে মনে হয়, যেন তুমিই ওর দাদা!"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্যায় দেখলে সকলকেই সাবধান করা যেতে পারে, তাতে বড়-ছোট বলে কোন কথা মনে রাখবার দরকার নেই।"

সত্যজীবন বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি যোগীন্দ্র আর কার্ত্তিকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আরে যেতে দাও, যোগীন। কার্ত্তিকবাবু, রাগ করবেন না। আমিই একটা কথার জন্য সর্ব্ববাবুকে ডেকে এনেছি।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি কথা ?"

ঠাকুরদার নিদ্রার ঘোর সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্রমশঃ কাটিয়া আসিতেছিল, তাই সে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আরে, সে কথা কি তোর সঙ্গে হতে পারে রে বেরসিক ? সতুর কথার মর্ম্ম যারা বুঝবে, তাদের কাছেই ও বলবে। তুই আমার কাছে আয়, একটা কথা আছে। ও চ্যাংড়াদের ছেড়ে দে।"

বয়সে চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের তফাৎ হইলেও এই ঠাকুর্দ্দা ওরফে শশিভূষণের সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্রের এই কয় মাসের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। শশিভূষণ মনোহর বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। মনোহরবাবু সীতাপুরের জমিদার এবং কালিকাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। পুত্র শশিভূষণ যখন বারম্বার চেষ্টা করিয়াও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তখন তিনি পুত্রকে লেখাপড়া ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিয়া কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্র শশিভূষণ পত্রোত্তরে লিখিল, সেকণ্ড ইয়ারের বেঞ্চখানার মায়া সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। দ্বিপ্রহরে একবার কলেজে গিয়া ঐ বেঞ্চখানায় বসিয়া ঐ ডেস্কের উপর মাথা রাখিয়া না ঘুমাইলে তাহার সারারাত্রি নিদ্রা হইবে না। এমন কি রবিবার প্রভৃতি ছুটির দিনে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও সে দরোয়ানদের দ্বারা দ্বার খোলাইয়া সেই বেঞ্চখানায় বসিয়া আসে। অতএব যতদিন না ঐ বেঞ্চখানা ভাঙ্গিবে, ততদিন আর শশীর নিস্তার নাই, তাহাকে কলেজে যাইতেই হইবে!

স্নেহ-দুর্ব্বল পিতা আর কোন উপায় নাই দেখিয়া মাসে মাসে যথারীতি টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। পুত্রও এক পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে সের বা মণ-দরে কতকগুলি অতি পুরাতন পুস্তক কিনিয়া আনিয়া একটা আলমারি সাজাইয়া রাখিল এবং কলেজের নিয়মিত নিদ্রায় ও প্রতি সন্ধ্যার উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

কার্ত্তিক ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া নিকটস্থ পুষ্পবৃক্ষ হইতে একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল এবং সপত্র সেই ডালটাকে মাটির উপর আছাড় মারিতে মারিতে বলিল, "কি কথা ?"

শশিভূষণ দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমি এক মুস্কিলে পড়েছি। বুড়োবয়সে বাবা বলছেন, আবার বিয়ে কর। এখন এর উপায় কি ?"

কার্ত্তিক কহিল, "বিশ-পঁচিশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না। তুমি যদি বুড়ো হও, আমরা তাহলে কি প্রৌঢ় না কি!"

শশিভূষণ কহিল, "তুমি আমার চেয়েও

বুড়ো। বয়স নিয়ে কি হবে? যাক্ ও কথা। এখন উপায় কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "উপায় আবার কি! তোমার বাবা যখন ধরেছেন, তখন হয় বিয়ে কর, নয় সাফ লিখে দাও, করব না।"

"লিখে না হয় দিলুম, কিন্তু কারণ কি দেখাব?"

"কারণ আবার কি! বিয়ে করা না করা তোমার ইচ্ছে।"

"উহুঃ আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে ত নয়,—"

"তবে কার?"

"সেই কথাই তোকে বলব। আজ আমার ওখানে সন্ধ্যার সময় যাস্, সর্ব্বাকেও নিয়ে যাস্। ওকেই আমার বিশেষ দরকার।"

ইতিমধ্যে দেবনাথ নিকটে আসিয়া বলিল, "ওহে ঠাকুরদা, সতুর কথা শোনো, ও বলে কি যে ওর সে ইতিমধ্যে ওকে এমন সব পত্র লিখে ফেলেছে, যা বঙ্গসাহিত্যে কাউপারের letterএর স্থান অধিকার করবে!"

সত্যজীবন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করছ না?"

শশিভূষণ কহিল, "ওরা বিশ্বাস না করুক, আমি করি। প্রেম-পত্রের ঠেলায় এই যে এত-বড় দাড়ী দেখছ, এর প্রত্যেক গাছিতে পাক ধরে গেছে। সতু ভাই, মাভৈঃ, আমি তোকে বিশ্বাস করি।"

সত্যজীবন কহিল, "ঠাকুরদা, ঠাট্টা করছ? কিন্তু সেগুলো যদি তোমায় দেখাতে পারতুম, তা'লে—"

শশিভূষণ কহিল, "অমন কাজটি করো না, ভাই। প্রেমপত্র আর সব সইতে পারে, পকেটের বাইরে আসা শুধু সইতে পারে না। প্রেমেরও যেমন আঁধারে স্বভাব, প্রেমপত্রেরও তেমনি সর্দ্দির ধাত,—ঠাণ্ডা লাগিয়েছ, কি সর্ব্বনাশ!"

ইতিমধ্যে সে ঘণ্টা শেষ হইয়া যাওয়ায় বন্ধুগণের সভাভঙ্গ হইল এবং তাহারা তাড়াতাড়ি ক্লাসে ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিল।

কলেজের ছুটী হইলে সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক তাহাদের বেনেটোলা লেনের মেশের একটা কক্ষে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া চাঁপাতলায় শশিভূষণের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিভূষণ একটা ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া ভৃত্য রঘুনাথ উড়েকে তামাক কিনিয়া না রাখার জন্য বকিতেছিল; এবং মাঝে মাঝে তাহার সযত্ন-বর্দ্ধিত দাড়ীর উপর সিগারেটের ছাই পড়াতে তাহাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে রেলিংয়ের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল, সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক আসিতেছে কি না।

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ আসিয়া পৌঁছিলে সে বলিল, "তোরা চা-ও খাবিনে, তামাকও খাবিনে, কি দিয়ে তোদের অভ্যর্থনা করি?"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "মৃদু মধুর হাস্য দিয়ে।"

শশিভূষণ কহিল, "তাও ত ঐ দাড়ীর ফাঁকে মিলিয়ে যাবে।"

শশিভূষণ চা প্রস্তুত করিয়া পান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে চাকর আসিয়া গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। একচুমুক

করিয়া চা ও একটান করিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে শশিভূষণ বলিল, "আজ তোদের কেন ডেকেছি, জানিস?"

সর্ব্বানন্দ বলিল "জানি বৈ কি! খুব বড়রকম একটা ভোজের আয়োজন করতে।"

শশিভূষণ কহিল, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক বটে! তবে কে যে তার খরচ জোগাবে, সেটা এখনও ঠিক হয় নি। যাক্, আজ আমার সঙ্গে এক জায়গায় তোদের যেতে হবে।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভোজের জোগাড় করতে ত? খুব রাজি আছি।"

শশিভূষণ কহিল, "এখন ত বলছিস্, খুব রাজি, কিন্তু কোঁৎকা দেখে তখন যেন পেছুস নে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সে আবার কি, ঠাকুরদা? কোৎকা-টোৎকার ভয় থাকে ত' আমি ভাই তাতে নেই। গরীব পুঁটী মাছের প্রাণ, আমায় দুটো-একটা সন্দেশ টন্দেশ দাও ত কষ্টে-স্বষ্টে খেতে পারি।"

শশিভূষণ কহিল, "আগে থাকতে ভয় পেলে কোন শক্ত কাজই করা যায় না। যাক, ভণিতা ছেড়ে, চল্, একটা কাজ করি আগে।"

শশিভূষণ উঠিয়া পাশের ঘরের দরজা খুলিল। এই ঘরটা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত, কেহ কখনও শশীকে ও ঘর খুলিতে দেখে নাই এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেও সে কখনও কোন উত্তর দিত না। আজ হঠাৎ ঐ কক্ষ উন্মুক্ত হইলে সর্ব্বানন্দ উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "ব্যাপার কি, ঠাকুরদা, আজ কি তোমার যক্ষের ধনাগার আমাদের দেখাবে না কি? এত অনুগ্রহ কেন আজ!"

শশী কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর ভাবে উক্ত কক্ষের জানালা-দরজাগুলি খুলিয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "এস তোমরা!"

তাহারা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কক্ষটী বেশ প্রশস্ত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে আলো ও বাতাস আসিবার দিব্য বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বাসার অন্যান্য কক্ষ হইতে এটি সর্ব্ব-প্রকারেই শ্রেষ্ঠ। কক্ষের চারিদিকেই আলমারি। একটা জানালার সম্মুখে একটা বড়-রকমের টেবিল, এবং তাহার পার্শ্বস্থিত একটা র‍্যাকে নানা প্রকারের কেমিকেলের শিশি ও নানাবিধ যন্ত্র-পাঁতি। আলমারি গুলির ভিতরে বিপুলকায় পুস্তকাবলী; এবং সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার, উত্তরের দেওয়ালের গায়ে একটা প্রকাণ্ড তৈল-চিত্র। চিত্রে একটী রমণী বিস্ফারিত নেত্রে কোন এক গবাক্ষের পর্দ্দা সরাইয়া আলোকের অবাধ প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। চিত্র তেমন কোন অসাধারণ সুন্দরীর নয়, তথাপি ঐ বিস্ফারিত-নেত্রা রমণীর মুখের উপর এমন একটা ভাব চিত্রকরের অসামান্য নৈপুণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়, রমণীটী অন্ধ। তথাপি আলোকের জন্য তাহার একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ধরিতে পারা যায়! চিত্রাঙ্কিতা রমণীর প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী, এমন কি তাহার গাত্র-বস্ত্রের প্রত্যেক

ভাঁজটী অবধি যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আলো, আলো, আলো দাও, আমি একবার দেখি।"

সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকের মুখ হইতে হাস্তোপহাসের রেখা মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে একটা গূঢ় বেদনায় ব্যথিত হইয়া উভয়েই যুগপৎ শশিভূষণের দিকে ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখিল, শশিভূষণ একটা গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে চাহিয়া আছে। কার্ত্তিক অতি সন্তর্পণে তাহার নিকটে গিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "ছবিখানা কার?"

শশিভূষণ না ফিরিয়া উদাসভাবে মৃদু স্বরে বলিল, "মানুষের আত্মার।"

সর্ব্বানন্দ শুনিতে না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কার?"

শশিভূষণ মুদিত নেত্রে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বর্গগতা স্ত্রী আশাময়ীর।"

বহুক্ষণ তিনজনে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। পরে শশিভূষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমি এ ছবি আজ পর্য্যন্ত বাবা ছাড়া আর কাকেও দেখাইনি। আমার এ ঘরের যা-কিছু দেখছ, সবই ঐ ওঁরই জন্য। বিবাহের চার-পাঁচ বছরের পর ওঁর বাতশ্লেষ্মা বিকার হয়, তারপর বছর-দুই ভুগে উনি মারা যান। ঐ রোগেই ওঁর প্রথমে দুই চোখ যায়, শেষে সেই অবস্থাতেই উনি প্রাণ পর্য্যন্ত হারান। কিন্তু সেই ব্যারামের সময় আলোর জন্য তাঁর যে ব্যাকুলতা দেখেছিলুম, তা এ জীবনে কখনো ভুলব না। সেই ভাবটী তাঁর একটা সুস্থ সময়ের ছবির উপর আঁকিয়ে নিয়েছি। আর সেই সময়ে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে সারা জীবনে আমার আর কোন কাজ রইল না। কেবল সংসারে যারা অন্ধ, তাদের দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করব। ভগবানের আলো থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের চোখে আলো ফোটাবার চেষ্টা করব। যদি তা না পারি ত এমন কোন উপায় করব, যাতে চোখের অভাবের কষ্ট যৎকিঞ্চিৎও দূর হয়। এই যে সব বৈ এই আলমারিতে দেখছ, এ সমস্তই চক্ষু-রোগ সম্বন্ধে। এ সব ওষুধ-পত্রও তারই জন্য। ঐ তিনটে আলমারি হলে অনেক খরচ করে বিলেত থেকে বাঙ্গলা আর ইংরিজি বৈ raised অক্ষরে আমি transcribe করিয়ে আনিয়েছি। আমি নিজেও অনেক কষ্টে ঐ রকম transcription শিখেছি। তোমাদের কেন এ সব বলছি, তা' বলি। আমি একা আর এ কাজ পারছি না। তোমরা যদি আমায় এ কাজে সাহায্য কর, তাহলে অবশ্য তোমাদের তাতে কোন লাভ হবে না, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত যে-সব হতভাগারা আছে, তাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদের যদি কোন মূল্য থাকে, তা তোমরা পাবে।"

শশিভূষণ নীরব হইলে সর্ব্বানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠাকুরদা, আমায় সঙ্গে নাও, আমি তোমায় সাহায্য করব। আমার আর কেউ নেই যে আমায় বাধা দেবে!"

শশিভূষণ কহিল, "কিন্তু তোমায় মিছিমিছি খাটাতে চাইনে, তোমার এমন অবস্থা

নয় যে একটা wild goose chaseএ বাজে কাজে সারাজীবন কাটাবে। তাই যাতে তোমার দিনপাত হয়, অথচ আমার কাজটাও সফল হয়, তা করব। সেজন্য চিন্তা করো না।”

কার্ত্তিক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “আর আমি! আমায় কেন এ সব কথা জানালে, যদি কোন কাজ না দেবে?”

শশিভূষণ কহিল, “তোমার জীবনের লক্ষ্য আর পরিণতি ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমি তোমাকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারব না। তা যদি করি, তাহলে কালিকা কাকার ক্ষতি করা হবে!”

কার্ত্তিক কহিল, “কালিকাবাবুর ক্ষতি হবে বলে আমার নিজের কোন স্বাধীনতা থাকবে না? আমি নিজের ইচ্ছে-অনুসারে নিজের জীবন গড়ে তুলতে পাব না? আমি কি তাঁর ক্রীতদাস যে তিনি আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করিয়ে নেবেন।”

শশিভূষণ কহিল, “তোমার মত তেজী একগুঁয়ে লোককে নিয়ে আমার চলবে না। তোমার সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি, তোমাকে আমি ঠিক আমার হাতের তেলোর মধ্যে ধরে রাখতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই। তুমি যে কাজে আছ, তাতেই লেগে থাক, তাতেই তুমি যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে, তাতেই তুমি সংসারের অনেক উপকার করবে।”

কার্ত্তিক কহিল, “তা হবে না, ঠাকুরদা। আমায় এই অন্যায় পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে দাও, আমায় তোমার সঙ্গী করে নাও। আমি কলের পুতুল নই, আমাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আমি স্বাধীন।”

শশিভূষণ কহিল, “কার্ত্তিক, তোর হাত ধরে বলছি, তুই স্বাধীনতার অহঙ্কার করিস নে। জগতে কেউ স্বাধীন নয়—স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যে স্বেচ্ছাচারী, সে কখনই পরার্থপর হতে পারে না। আজ কত-দিন হল যে চলে গিয়েছে, সেও যদি পর-জগৎ থেকে আমাদের ইচ্ছেকে, আমাদের কাজকে তার ইচ্ছে দিয়ে চালাতে পারে, তাহলে যারা বেঁচে আছে, তাদের ইচ্ছে অনুসারে কেন আমরা চলব না? নিজেকে বড় করে দেখতে শিখলে, নিজের ইচ্ছেটা নীতির বাঁধকে ডিঙ্গিয়ে গেলে, তখন নিজেকে ছাড়া জগতে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই দেখ, বাবা আমার সব জানেন, সব জেনেশুনেও তিনি আমায় আবার তাঁর সংসারের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করছেন। তাঁর কষ্ট হচ্ছে বলে আমাকেও ফিরতে হবে; জানি না, হয়ত তাঁকে সুখী করবার জন্য বিয়েও বুঝি করতে হয়। বাবাকে বোঝাব, কিন্তু তিনি যদি না বোঝেন, আমার তখন আর কোন উপায় থাকবে না। সেইজন্যই সর্ব্বাকে তাড়াতাড়ি এই কাজে ঢোকাতে চাচ্ছি।”

কার্ত্তিক কহিল, “কিন্তু সর্ব্বদাদাও ত স্বাধীন নয়।”

শশিভূষণ কহিল, “ও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় বটে, তবু কতকটা স্বাধীন। কারণ প্রথমতঃ ওর নিজের বলতে কেউ তেমন নেই যার মুখ চেয়ে ওকে থাকতে হবে। আর কালিকা কাকা? তিনি ওর

ভালবাসা আর সম্মান ছাড়া ওর উপর অন্য কিছুরই দাবী রাখেন না। এ সংবাদ আমি জানি, তাই ওকে আমার কাজে ডেকে নেবার চেষ্টা করছি।”

কার্ত্তিক কহিল, “কালিকাবাবুরই অর্থ-সাহায্যে ওর সমস্ত হচ্চে, অথচ ও মুক্ত! আর আমার ওপর তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি আছে বলে আমি বদ্ধ!”

শশিভূষণ কহিল, “লোভ! কালিকা কাকার এত বড় অপমান তুই করলি? তোর মুখ না দেখাই উচিত। যিনি তোকে এত ভালবাসেন যে তোর হাতে তাঁর সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করবেন না, তাঁকে বল্‌ছিস্, লোভী! এতখানি ভালবাসার এত-বড় অপমান করতে তোর সাহস হল! না কার্ত্তিক, আমি তোমায় চাই না।”

কার্ত্তিক মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অভিমান ও ক্রোধের উষ্ণ রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সর্ব্বানন্দ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “কার্ত্তিক, ভাই, আমায় ক্ষমা কর!”

কার্ত্তিক কহিল, “ক্ষমা! ক্ষমা আমি আমাকেই করতে পারছি না তা তোমাকে! আমি কাউকে ক্ষমা করব না। আমি তোমায় ছাড়ব না, তোমাকে দিয়েই আমার স্বাধীনতা কিনে নেব।”

শশিভূষণ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কথায় কথায় বেলা গেল। চল, আজ যেখানে তোমাদের নিয়ে যাব বলে-ছিলুম, সেইখানে নিয়ে যাই। কার্ত্তিক, ভাই, সেখানে গিয়ে সব অবস্থা দেখেও যদি না তুমি আমাদের ক্ষমা করতে পার, যদি না কেমন করে নিজের ইচ্ছেকে দমন করে পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হয় শিখতে পার, তাহলে বুঝব, তোমার আর কোন আশা নেই।”

৪

বাগবাজারে এক গলির মোড়ে এক দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে শশিভূষণ ও তাহার বন্ধুদ্বয় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বড় রাস্তা ও গলির সব আলোগুলাই জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং অনতিদূরস্থিতা গঙ্গার যে অংশ দেখা যাইতেছিল, তাহাতেও অসংখ্য সচল আলোক-বিন্দু ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

শশিভূষণ কড়া ধরিয়া কোন এক কৌশলে টানিবামাত্র ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। শশিভূষণ বন্ধুদের লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বন্ধুদ্বয় প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহটি বাহির হইতে যেরূপ মনে হইয়াছিল, সেরূপ নয়। উঠানটি বেশ প্রশস্ত। উঠানের চারিদিকেই বারান্দা এবং সেই বারান্দা নানাজাতীয় পুষ্পিত ও অপুষ্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতায় শোভিত। সমস্ত বাড়ীটি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। দেখিলেই বুঝা যায়, যেন সমস্ত বাড়ী হইতে চেষ্টা করিয়া অন্ধকারকে দূর করা হইয়াছে। যেখানে আলোর কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও হয়ত একটা বড় টবে বড় একঝাড় জুঁই ও তাহার উপর একটা আলোকাধার হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত শ্বেতপুষ্পের অমল শুভ্রতা আরও

বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উঠানটির মাঝখানে গোলাকার বেদী; তাহার উপরও একটা প্রকাণ্ড চিনামাটির টবে একরাশ গন্ধরাজ ফুটিয়া রহিয়াছে!

বন্ধুদ্বয় অধিকক্ষণ ধরিয়া এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় পাইল না, কারণ দুইটী বালক ও একটী বালিকার সঙ্গে এক সুবেশা রমণী আসিয়া অপর দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল, "শশিদা, মার জ্বর আজ বেড়েছে, তোমায় ডাকছেন।"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজ, এদের নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসাও। আমি যাচ্ছি।"

শশী তাড়াতাড়ি একটী সোপান অবলম্বনে উপরে চলিয়া গেল। রমণী; বন্ধুদ্বয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "আসুন আপনারা।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ দেখিল, রমণী, সুন্দরী, বয়স অনুমান সতেরো আঠারো বৎসর হইবে। সে যে-ভাবে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে যথেষ্ট লজ্জাহীনতা প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উভয় বন্ধুই নিমেষে বুঝিল, রমণী দৃষ্টি-শক্তি-হীনা। যদিও সুন্দর মুখখানির উপর দুইটী আয়ত নয়ন লজ্জা-সঙ্কোচহীন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া রহিয়াছে, তথাপি তাহাতে অন্ধজন-সুলভ উদ্দেশ্যহীনতা প্রকাশ পাওয়ায় উভয় বন্ধুরই সমস্ত সঙ্কোচ মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। এক দুর্ভেদ্য অন্তরালে অবস্থিত নরনারীর মধ্যে যেমন কোন সঙ্কোচের প্রয়োজন থাকে না, তেমনি কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ তাহাদের সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করিয়া বলিল, "চলুন।"

রমণী, বালক-বালিকাদের নিকটস্থ হইয়া বালকদ্বয়কে বলিল, "তোমরা সুকুকে নিয়ে রঘুকাকার কাছে গিয়ে গল্প শোনোগে—আমি এঁদের নিয়ে ওপরে যাচ্ছি। সুকু, এদের সঙ্গে যাও।"

বালকদ্বয়ের মধ্যে একটী বালক নিকটে আসিয়া কার্ত্তিককে স্পর্শ করিয়া বলিল, "আপনি কি সর্ব্বদাদা?"

কার্ত্তিক বলিল, "না, আমি কার্ত্তিকদাদা" তার পর উহার হাতখানি সর্ব্বানন্দর গায়ে ছোঁয়াইয়া বলিল, "উনিই তোমার সর্ব্বদাদা।"

সর্ব্বানন্দ বালকটিকে হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "চল, তোমরা আজ আমার কাছেই থাকবে। তোমার নাম কি ভাই?"

বালক বলিল, "আমার নাম শ্রীমণীশ চন্দ্র ঘোষ, ওর নাম শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায়। আর সুকুর নাম, শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।"

কিশোরীটি হাসিয়া বলিল, "আর আমার নাম বললিনে?"

মণীশ বলিল, "তোমার নাম কি তুমি এতক্ষণও বল নি? আপনারা সরোদিদির নাম জানেন না?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "এই ত জানলুম। চল, ওপরে যাই।"

কার্ত্তিক দেখিল, রমণী: অন্ধ বটে কিন্তু অভ্যাসের জন্য এমনভাবে চলিতেছে যেন সে সমস্তই দেখিতে পাইতেছে। সোপান অতিক্রম করিয়া সে উপরে উঠিল, এবং পথে যে সমস্ত বস্তু ছিল, অনায়াসে তাহাদের পাশ কাটাইয়া একটী কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভিতরে চলুন।"

কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহার সাজ-সজ্জা একটু

অন্য ধরণের, এটি যেন পাঠ-কক্ষ। সমস্ত বাড়ীর প্রত্যেক গলি-ঘুঁজিও যেমন নানা-রূপ চিত্রাদিতে পরিশোভিত, এই কক্ষে তেমন কিছুই নাই। ইহাতে কেবল আলমারি, টেবিল ও পুস্তকের রাশি। কক্ষের মধ্যস্থলে একটা বড়-রকমের ফুলের তোড়ার মত বৈদ্যুতিক আলোকের তোড়া কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো রহিয়াছে।

কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব-দা, আজ যেন আমার প্রথম চোখ ফুটল। আগে জানতুম না, আলো এত সুন্দর!"

সর্ব্বানন্দর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণীশ বলিয়া উঠিল, "আমি ছেলেবেলায় আলো দেখেছি, কিন্তু জ্যোতি বলে, আলো কেমন, জানিনে। ও বলে, আলো নেই, ও-সব মিছে কথা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সুকু কি বলে?"

সুকুমারী আর জ্যোতিপ্রসাদ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দিদি ঘরে প্রবেশ না করিলে তাহারা প্রবেশ করিবে না। এইভাবে তাহাদিগকে রমণীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, "আপনারা ভিতরে আসুন, আর আমাদের কাছে সঙ্কোচ করবার প্রয়োজন নেই, আমরা আপনাদের আত্মীয়।"

রমণী প্রবেশ করিয়া বলিল, "সঙ্কোচ করবার আর আমাদের উপায় কৈ? যার জন্য সঙ্কোচ, তাই আমাদের নেই।" সর্ব্বানন্দ সসঙ্কোচে বলিল, "আপনি জন্মাবধিই কি এই রকম?"

সরোজ কহিল, "কি রকম সে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন? আপনাদের চোখ আছে, তাই এ বিষয়ে আপনাদের হার! আমাদের চোখ যেদিন থেকে গিয়েছে, সেইদিন থেকে ও বাধাটুকুও দূর হয়েছে। এখন আমাদের পক্ষে সবই সমান। আমি জন্মান্ধ নই, এখনও আমার চোখে সম্পূর্ণ অন্ধকার নেমে আসেনি—ঐ আলোর একটা অস্পষ্ট আভাস আমি পাচ্ছি—যেন একটা পুরু কাপড়ের মধ্য দিয়ে আলো আসছে। আমার যখন আট-ন' বছর বয়স, তখন থেকে আমার চোখের দোষ দেখা দেয়, তার পর ক্রমশ আমার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আপনার আবার সেই পূর্ব্বাবস্থা পেতে ইচ্ছে করে না?"

কথাটা শুনিবামাত্র সর্ব্বানন্দ লজ্জিত হইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের পানে চাহিল। কিন্তু নির্লজ্জ কার্ত্তিক নির্ব্বিকার চিত্তে সরোজিনীর দিকে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। সরোজিনী তাহার দৃষ্টি-শক্তিহীন বিশাল চক্ষু কার্ত্তিকের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "হারানো জিনিস কে না ফিরে চায়।"

কার্ত্তিক কহিল, "আর যার কিছু হারায়নি? যে জন্মান্ধ?"

সরোজ কহিল, "তার কি হয়, তা এই সুকুকে জিজ্ঞাসা করুন। কেমন সুকু, তুই আলো দেখতে চাস?"

সুকুমারী মাথা নাড়িল। সরোজ তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "তা লজ্জা কি, বল্ না?"

সুকুমারী মৃদু স্বরে বলিল, "আলো যে কি, তাই আমি বুঝিনে।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব সুকু, তুমি আমার কাছে এস।"

সরোজিনী তখন হাসিয়া বলিল, "আপনারা তাহলে এদের সঙ্গে আলাপ করুন, আমি আপনাদের জলখাবারের জোগাড় করে আনি।"

সে বাহির হইয়া গেলে সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিককে বলিল, "কার্ত্তিক, তোর একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই! কি করে ও কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করলি?"

কার্ত্তিক কহিল, "অন্ধের কাছে লজ্জা বা সঙ্কোচ দেখানো আর একটা অন্ধতা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "উনি অন্ধ হলেও স্ত্রীলোক ত!"

কার্ত্তিক কহিল, "ওটাও একটা অন্ধতা! তুমি দেখতে পাচ্ছ বলে ওঁকে বলছ, স্ত্রীলোক! যদি না দেখতে পেতে, তাহলে উনি স্ত্রীলোক কি পুরুষ, তা-নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠত না। এ স্ত্রীলোক, ও পুরুষ, এ সমস্তই চক্ষুষ্মানের অন্ধতার ফল। আমি তোমার মত অন্ধ নই, তাই ওঁকে কেবল মানুষ বলেই দেখছি।"

সর্ব্বানন্দ আর কোন উত্তর না দিয়া বালক-বালিকাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল,—কি করব? আমার শাশুড়ীর জ্বর বেড়েছে। আজ বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে ফিরতে পারব না। সরোজ কৈ? তোমাদের জল-টল দেয় নি যে এখনও!"

কার্ত্তিক কহিল, "তিনি তোমার চেয়ে কম বুদ্ধিমতী নন। আমরা যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অতিথি, সে কথা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছেন, আর তারই জোগাড়ে গেছেন।"

শশিভূষণ কহিল, "এই অন্ধের বাথানে পড়ে তোমাদের কষ্ট হয়নি ত?"

কার্ত্তিক কহিল, "এত কষ্ট হয়েছে যে ইচ্ছে করছে, আমিও অন্ধ হয়ে গিয়ে এই রকম করে তোমাদের সেবা নি। মোদ্দা, তোমার শ্বশুর-মশায় সুন্দর বাড়ী, লোক-জন, সব ফেলে মলেন কি করে, আমি তাই ভাবছি আর আশ্চর্য্য হচ্ছি!"

শশিভূষণ কহিল, "তিনি ডাক্তার ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটির মধ্যে বোধ হয় কবিতা দেবী সর্ব্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারতেন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "ভাই, অমন লঘুভাবে তাঁর বিষয় নিয়ে কথা বলো না। ঠাকুরদা, এই সরোজ তোমার কে হয়?"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজের পরিচয় এখনও পাওনি? এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে তার থলি খালি হয়নি, এইটেই আশ্চর্য্য! ওর পরিচয় তবে দি। ও আমার শাশুড়ীর গুরুদেবের নাতনী। অন্ধ হবার পর থেকে ওর চিকিৎসার জন্য শ্বশুর-মশায় ওকে এখানে নিয়ে আসেন। সেই থেকে ও এই হতভাগার জোগাড়-করা সম্পত্তি। শাশুড়ীর কন্যাটী মারা যাবার পর থেকে, কি জানি কেন, হঠাৎ তাঁর খেয়াল ওঠে যে, গরীব-দুঃখীর অন্ধ ছেলে-মেয়েদের চোখের চিকিৎসায় তাঁর স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি তিনি ব্যয় করবেন। এমন সময় আমি জুটে পড়ে তাঁকে আমার খেয়ালে যোগ দিতে অনুরোধ করি। তার পর

থেকে এই যা দেখছ। এরা ছাড়া আরও দু-চারটি ছেলে-মেয়ে এখানে আসে, কিন্তু তারা দিনে আসে, দিনেই চলে যায়। সরোজের উপরই এদের সব ভার। সে-ই প্রোফেসর, আমি প্রিন্সিপাল মাত্র, যখন খুসী আসি, যখন খুসী চলে যাই।”

তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সরোজিনী একজন দাসীর সাহায্যে তিনখানি রেকাবিতে মিষ্টান্নাদি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। শশিভূষণ হাসিয়া বলিল, “সরোজ, এই রকম করে কি তুমি অতিথি-সেবা কর না কি? অতিথিরা ত তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরবার মত হয়েছিল। আগে থেকে জোগাড় করে রাখনি কেন?”

সরোজ কহিল, “তুমি যে আজই এঁদের আনবে, তা ত বলে যাওনি। আপনারা ত্রুটি মার্জ্জনা করে মিষ্টিমুখ করুন।”

কার্ত্তিক কহিল, “ঠিক! আপনার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বটে, ঘুষ দিয়ে আগে মুখ বন্ধ করে দিন, তার পর আর আমাদের কিছুই বলবার থাকবে না।”

শশিভূষণ কহিল, “তোমার মত জ্যাঠা মশায়ের মুখে ঘুসি মারলেও মুখ বন্ধ হবে না, তা ঘুষ! যাক্, লেগে পড়ি, এস। সরোজ, আমার চা কৈ?”

সরোজ কহিল, “সে আর বলতে হবে না। লোকজন বেশী দেখে রঘুদা বামুন ঠাকরুণের হাঁড়ি নামিয়ে বড় কেটলিতে জল চাপাবার চেষ্টায় ছিল, আমি বারণ করে দিয়ে ষ্টোভে চড়িয়েছি। আগে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও, তার পর চা খেয়ে গরম হয়ো। বিন্দি, তুই দেখ্‌গে, জল হল কি না।”

বিন্দি দাসী চলিয়া গেলে শশী রাগিয়া বলিল, “এই যে দেখছ ব্রাহ্মণীটিকে, ইনি চোখের মাথা খেয়ে অবধি লজ্জার মাথাও খেয়েছেন! ওগো, দুটো অপরিচিত মানুষ এখানে আছে, দেখতে পাচ্ছ না?”

সরোজ তাহার অন্ধ স্বভাবের বহির্ভূত ভাবে একটু জোরে হাসিয়া বলিল, “কি করে দেখতে পাব? আশাদিদি গিয়ে পর্য্যন্ত তুমি এমনই অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছ যে আমাদের অন্ধকারও তোমার আগমনে তিন গুণ বেশী হয়ে দাঁড়ায়, তা দেখব কি?”

শশিভূষণ কার্ত্তিকের পানে ফিরিয়া বলিল, “এঁর আক্কেলটা ত শুন্‌লে তোমরা! নিজের চক্ষুদুটো খেয়েও তৃপ্তি নেই! আবার আমার দুটীর উপরও টাঁক করছ?”

সরোজ তেমনি হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল, “ধৃতরাষ্ট্রের চোখ ছিল এমন অপবাদ ত অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারেনি। তাইতেই ত আমার আশা-দিদি গান্ধারীর মত চোখ ঢাকেন। তোমার চোখ ছিল কবে যে, তা খাব?”

শশিভূষণ হতাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর পানে চাহিতে লাগিল। কার্ত্তিক অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, “আঃ ঠাকুরদা, তোমার এমন হার—এ আমাদের পক্ষে যে কি উপভোগের জিনিস, তা আর কি বল্‌ব?”

সর্ব্বানন্দ এইসকল হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতে না পারিয়া মণীশের হাতে একটা রসগোল্লা দিয়া বলিল, “এটা কি বল ত?” মণীশ নির্ব্বিবাদে সেটা উদরসাৎ করিয়া বলিল, “রসগোল্লা।”

কার্ত্তিক তাহার হাতে সর্ব্বানন্দর রেকাবিটা উঠাইয়া দিয়া বলিল, "বোকা কোথাকার! বলতে হয়, আরও দু-চারটে না পেলে বুঝব কি করে?"

বালক রেকাবি নামাইয়া দিয়া বলিল, "আমরা জল খেয়েছি সর্ব্বদাদা, আপনি খান।" জ্যোতিপ্রসাদের বোধ হয় প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই সে একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। কার্ত্তিক তাহার ও সুকুমারীর হাতে সন্দেশ দিতে উদ্যত হইলে শশী বলিল, "ওরে শূয়ার, মেশে পৌঁছুতে রাত দশটা বেজে যাবে। বোকামি করিস্ নে, খেয়ে ফেল্।"

ইতিমধ্যে বিন্দি দাসী তিন পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "তিন পেয়ালা কেন? আমরা ত চা খাই না।"

শশিভূষণ কহিল, "সরোজ আজ তোমাদের জাত মারবে ঠিক করেছে। ওর হাতে যখন পড়তে যাচ্ছ, আর আমার সাকরেদী যখন নিতে চলেছ—"

সরোজ কহিল, "তখন আপনাদের চক্ষু দুটীও যাবে, বুদ্ধিও খোঁড়াবে! আরও যে কি সব বিপদ ঘটবে, তা মনেই আনতে পারছি নে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তার আর আশ্চর্য্য কি! এ বাড়ীর সমস্ত স্থানই বোধ হয় চক্ষু রোগের বীজাণুতে পরিপূর্ণ। আর কথায় বলে, সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।"

শশিভূষণ কহিল, "এই রে সর্ব্বনাশ করলে! সংস্কৃত আউড়েছ কি মরেছ! ঐ যে দেখছ ব্রাহ্মণীটিকে, উনি এই আমার আমার মত বর্ব্বরকে দিয়েও দু'খানা সংস্কৃত বই transcribe করিয়ে নিয়েছেন। অতএব চেপে যা, কার্ত্তিক, যদি ও টের পায় যে তুই ভাল সংস্কৃত জানিস, তাহলে তোকে এমন চৌচাপটে ধরে বসবে যে আর তোকে উদ্ধার করা যাবে না। তখন রোজ এসে একখানা করে বৈ শুনিয়ে যেতে হবে। বাইরের দুটি চক্ষুর মাথা খেলে কি হয়—ভিতরের আর একটি চোখকে দেবী খুব উজ্জ্বলভাবেই জগতের উপর স্থির রেখেছেন। ওঁর সেই তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিলাভটি যার কপালে ঘটে, তার আর সহজে নিস্তার নেই! তাছাড়া—"

শশী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, কারণ সরোজ এবার সত্যই লজ্জিত হইয়াছিল। কার্ত্তিক কিন্তু থামিবার পাত্র নহে। এই অন্ধ নারীর সঙ্কোচহীন আলাপে তাহার মাথার মধ্যে এক অপূর্ব্ব খেয়াল জাগিয়া উঠিয়াছে। সরোজের অন্ধ-নয়নের অন্ধকারের ব্যবধান দুই হাতে সরাইয়া তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবার একটা উদ্দাম চেষ্টা তাহাকে পাইয়া বসিল। সে বলিল, "আমি রাজী আছি।" শশী এইবার শঙ্কিত হইয়া বলিল, "তা হয় না, কার্ত্তিক! আমিই এ ক্ষেত্রে ওঁর একমাত্র কর্ণধার হয়ে থাক্‌বার দাবী রাখি। সে দাবীর সত্ত্ব আর কাউকে বিলিয়ে দিতে পারব না।"

সরোজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! আমরা যাই পৃথিবীতে আছি, তাই তোমার মত অকেজো লোকের দিনপাত হয়! তা স্বীকার না করে উল্টে কর্ণধারের খবর! আমরাই বরং এ কথা বল্‌তে পারি, তা জান!"

শশিভূষণ কৃতাঞ্জলি-পুটে নিজের কান সরোজের হাতের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়া বলিল, "দেবি, ভৃত্যের অবিনয় ক্ষমা করে তার কর্ণটি করপল্লবে ধারণ করে এই দেবী যে জগতে মাত্র একা এরই, এটি সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণিত করে দাসকে কৃতার্থ কর।"

সরোজ সে কথা কানে না তুলিয়া নিজ-মনে বলিল, "দয়ার দাবী জগতের প্রত্যেকেরই আছে। এ কারও সত্বের বস্তু নয়, কার্ত্তিক বাবু, আপনার ইচ্ছা হলেই স্বচ্ছন্দে আপনি আসবেন।"

কার্ত্তিক এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "বাঁচ্‌লুম! আপনাদের রাজায়-রাজায়-যুদ্ধে উলু খড়ের প্রাণ যাবার জোগাড় হয়েছিল, আর কি! আপনার অভয়-বাণীই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

শশিভূষণ তাহার আশঙ্কাকে যথাসাধ্য দমন করিয়া কৃত্রিম কোপে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, "তবে রে অকৃতজ্ঞ! একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস্ খাওয়া! তুই কি ভেবেছিস্, ঢুকে পড়লেই হল! এ সভার যোগ্য অকেজো হওয়ার যোগ্যতা তোর হাড়ের দিক্ দিয়েও যে নেই। তখন পালাবার পথ পাবি না, তাই বল্‌ছি, এই বেলা সাবধান হ।"

কার্ত্তিক অকুণ্ঠিত মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "যোগ্যতা কি একদিনেই পাওয়া যায়? কতদিনের সাধনায় ক'বছর এফ এ ফেল্ করে এমন যোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছ, বল দেখি? তেমনি—"

সর্ব্বানন্দ এতক্ষণে বাধা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল কার্ত্তিক, আর না! ঠাকুরদা, আজ আমরা আসি।" কার্ত্তিককে একটু অনিচ্ছুক বুঝিয়া সে আবার বলিল, "মেশের ঠাকুর হয় ত এতক্ষণ চলে গেছে, আর দেরী নয়।" শশিভূষণ সাগ্রহে বলিল, "আজ না হয় এইখানেই সে কাজটা সারো! এই ব্রাহ্মণী দ্রৌপদীটির তত্ত্বাবধানে মেশের চেয়ে সে কাজটা এখানে একটু পরিপাটী রকমেই সম্পন্ন হবে।" সর্ব্বানন্দ রাজী হইল না, অগত্যা কার্ত্তিকও বাধ্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

(ক্রমশ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

আরোহণ

রাজপুরের পান্থশালায়, হিমালয়ের ঠিক পায়ের কাছটিতে বসে বিশ্রাম করছি। বরফের বাতাস-দিয়ে-ধোয়া তরুণ প্রভাত, আকাশ-জোড়া পাহাড়ের কোলে ছোট এই সহরের ঘরে-ঘরে জাগরণের সোনার কাঠি স্পর্শ করে যাচ্ছে। দক্ষিণে একটি গিরিনদী,—গোপন গুহা থেকে স্বচ্ছ ধারাটি তার উপলগুের উপর দিয়ে, পুষ্পিত কুঞ্জের ভিতর দিয়ে নেমে এসেছে—তরল কল্লোলে পৃথিবীর বুকের উপর; আর বামে উঠে গেছে গিরি-পথ—পৃথিবীছেড়ে ক্রমাগত আকাশের দিকে, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে, মেঘের অন্তরালে। এই

আকাশের দিকে উঠে চলা আর এই অনন্ত সাগরের দিকে নেমে আসা—এরি মাঝে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম এই পান্থশালার কুঞ্জতীরে।

পর্ব্বতের নীলের ভিতরে প্রবেশ করছি। চোখ-জুড়ানো নীল অঞ্জন, ঘুম-পাড়ানো নীল রহস্য,—এরি একটি স্নিগ্ধ আভা সমস্ত দিনটিকে, সকল পথটিকে সুশীতল করেছে।

পাহাড়ের একটা বাঁক। মেঘ-ফাটা রৌদ্রে একখানা প্রকাণ্ড পাথর, মাথায় একবোঝা শুকনো ঘাস চাপিয়ে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওধারে ভীষণ একটা ভাঙ্গন—পাহাড়ের গায়ে অগ্নিদাহের ক্ষত-চিহ্নের মত কালো দেখা যাচ্ছে। প্রখর রুদ্রমূর্ত্তিতে দিক্‌বিদিক্ এখানে দেখা দিয়েছে—যেন দুঃস্বপ্নহত! একটা নির্জ্জীব ঘোড়া এরি মাঝ দিয়ে একরাশ পাথর বহে চলেছে—পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা একটা রাজঅট্টালিকার দিকে।

এ-পাহাড়ের আর একটা বাঁক। বনতরুর ঘনপল্লবের তলায় ছায়া—একখানি নীড়ের মত—পায়ের তলা থেকে মাথার উপর পর্য্যন্ত ঘিরে নিয়েছে। চির-রাত্রি এখানে অবগুণ্ঠন টেনে, কোলের মধ্যে ঝরা-পাতা নব-কিশলয় জীবন-মরণ সবাইকে নিয়ে দোলা দিচ্ছেন—নির্জ্জনে, মেঘ-রাজের গোপন অন্তঃপুরে।

পর্ব্বতের সানুদেশ অতিক্রম করছি। দুই ধারে উপবন; তারি মাঝ দিয়ে পথ; জনমানব নাই; কিন্তু সমস্ত যেন কারা সযত্নে সুমার্জ্জিত করে রেখেছে! সুবিন্যস্ত তরু-শ্রেণী, সুশ্যাম সুচারু তৃণভূমি; তারি প্রান্তে দেখা যাচ্ছে পার্ব্বতী মন্দির—সুধাধবল। এরি ওপারে পাহাড়ের নীলের কূলকিনারা-হারা একটিমাত্র গভীর প্রলেপ বর্ষার মেঘের মত আকাশ ঢেকে রয়েছে। এই কালোর উপরে আলো নিয়ে শোভা পাচ্ছে সমস্ত দৃশ্যটি স্থির বিদ্যুতের মত। দেখতে দেখতে কুয়াশা এসে সমস্ত দৃশ্যটি মুছে দিয়ে গেল; অনাবিল শুভ্রতার কোলে ফুটে উঠলো সোনার ফুলে সাজানো একটি মাত্র কর্ণিকার।

মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছি! কুয়াশার সুবিমল শিশির-চুম্বন মুখে লাগছে, চোখে লাগছে—প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত স্পর্শ করছে—পথের ক্লেশ ক্লান্তি ধুয়ে মুছে।

পাহাড়ের একটি অন্ধকার কোণ। লতা-পাতার ভিতর থেকে একটা জলপ্রপাত নেমেছে; তারি উপরে অপরিসর সেতু। ছত্রাকে ভরা জীর্ণ একখানি কাঠের উপর ভর দিয়ে রসাতলের দিকে চেয়ে রয়েছি! একখানা বিশাল পাথর অতলস্পর্শ অন্ধকারের উপরে ঝুঁকে রয়েছে; আর তারি তীরে বনদেবীটির মত বনলতা—পুঞ্জপুঞ্জ তারা-ফুলের একটিমাত্র গুচ্ছ! জলের হাওয়ায় কাঁপছে—কচি পাখীর ডানাদুখানির মত দুটি লতাবল্লরী; আর তারি পাশ দিয়ে ফেনিল জল চলেছে অট্টরোলে অতলের মুখে! ঝাঁপিয়ে-পড়া, গড়িয়ে-চলা, তলিয়ে-যাওয়ার একটা প্রকাণ্ড ডাক! অনেকখানি জুড়ে দূরে দূরে পর্ব্বতে পর্ব্বতে রণিত হচ্ছে এই নিরুদ্দেশের দিকে নৃত্য করে চলে-যাওয়ার এই গহনের কোলে ঝাঁপিয়ে-পড়ার ঝনৎকার!

মেঘরাজ্যের উপরে উঠে এসেছি। প্রকাণ্ড অজগরের নির্ম্মোকের মত একখণ্ড কুয়াশা

সমস্ত গিরিশ্রেণীটি বেষ্টন করে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। নীচে একটা সুদীর্ঘ কালো ছায়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত লতিয়ে উঠেছে; আর উপরে একটা সবুজ উচ্ছ্বাস নীল আকাশে তরঙ্গিত দেখা যাচ্ছে! ঐখানে—নির্ম্মেঘ ঐ নীলের বুকে, শরতের সুতীক্ষ্ণ হাওয়ায় কোন্ দেবদারু বনের ছায়ায় আমাদের এবারের নীড়;— মন যেখানে উড়ে যেতে চাচ্ছে এখনি, —অর্দ্ধপথের এই পান্থশালা ছেড়ে!

পাহাড়ের গা দিয়ে একটি সরু পথ; একদিকে খাড়া পাথরের দেয়াল, আর একদিকে অতলস্পর্শ শূন্য! অনেক দূরে—যেন একটা প্রকাণ্ড হ্রদের পরপারে, ধূসর গিরি শ্রেণী দেখতে পাচ্ছি। একখণ্ড মেঘ শূন্যের উপরে সাদা পাল তুলে ধীরে ধীরে চলেছে —বাতাস তাকে যেদিকে নিয়ে যায়! মাঝে মাঝে পর্ব্বতের এক-একটা মোড় নেবার সময় এই শূন্যের উপর দিয়ে খেয়া দিতে দিতে চলেছে আমার এই জীর্ণ কাঠের দোলাখানি! পাথর আপনার অটুট পরমায়ু, লতাপাতা আপনাদের ক্ষণিকের জীবন যৌবন নিয়ে এই শূন্যতায় একেবারে তীরে এসে প্রতীক্ষা করছে—ঝরে যাবার জন্য খসে যাবার জন্য। এইখানে একটি পাখীর গান! অদূরে বনের নিবিড় ছায়া থেকে সে ক্রমান্বয়ে বলছে—পিয়া পিয়া পিউ পিউ।

শুষ্ক নদীর খাতের মত উসর একটা গিরিসঙ্কট; তারি মোহড়ায় একটা লোক সরকারি-আফিসে বসে যত লোকের কাছে চুঙ্গি আদায় করে ছেড়ে দিচ্ছে। একটা বুভুক্ষিত কুকুর এইখানের চারিদিকে মাটি শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্ব্বতের সুনীল ছায়া, সমস্ত শোভা, এই শুষ্ক ভূমিটাকে ছেড়ে দেখছি, অনেক দূরে পিছিয়ে গেছে! এ যেন আকাশের উপরে একটা রাশিকৃত পাথর আর ধূলার মরুভূমি! এরি পরে বনের নীলের মধ্যে আর-একবার অবগাহন। সেখানে পায়ের তলায় পাহাড় ক্রমান্বয়ে অন্ধকারের ভিতরে গড়িয়ে গেছে। দিন সেখানে যেতে পারেনি; কেবলমাত্র কেলু-বনের শিখরে শিখরে পূর্ব্ব-সন্ধ্যার একটু ধূসর জ্যোতি নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। সূর্য্যদেব এখন মধ্য-গগনে বিরাজ কচ্ছেন, কিন্তু এই বনরাজির তলায় শিশিরসিক্ত ঝরা-পাতার বিছানায় এখনো রাত্রি! ঝিল্লিরবের ঘুম-পাড়ানো সুর এখানে বাজছেই—কিবা রাত্রি কিবা দিন। পুরাতন অরণ্যানীর নিসুপ্তির মধ্যে এই একটিমাত্র ডুব দিয়েই পথ একেবারে জনতা, সভ্যতা, কর্ম্মকোলাহলের মাঝখানে গিয়ে মাথা তুলেছে। একটা মানুষ এখানে কর্কশ গলায় চীৎকার করে কেবল ডাকছে —ফাল্‌তো ফাল্‌তো এ ফাল্‌তো! এরে বেকার কুলী!

সভ্যতার এই প্রবেশ-দ্বারেই একদিকে রয়েছে দেখি 'ওল্ড ব্রুয়ারী' বা পুরাতন মদের ভাটি; আর-একদিকে কতকগুলা দোকানঘর; সেখানে একটা দর্জ্জি, সে বসে কাপড় ছাঁটছে, আর-একটা টেবিলের সাম্‌নে সোডা লেমনেড্ হুইস্‌কির্ বোতল সাজিয়ে হোটেল-ওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। এখানথেকে ক্রমাগত চোখকে পীড়া দিচ্ছে টিনের ছাদ, পোষ্ট আফিস, রয়েল হোটেল, ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড, সাহেবদের

হ্যাটকোট; একটা মাড়োয়ারি রাজার ক্যাসেল এবং পর্ব্বতের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ছাপা নিলাম, কন্‌সর্ট ও স্কেটিংরিঙ্কের বিজ্ঞাপনী! বাহকেরা যখন দেখিয়ে দিলে আমাদের বাসাটা অনেক দূরে—আর-একটা পর্ব্বতের শিখরদেশে, তখন মনটা যেন সুস্থির হল।

দুর্গম দুরারোহ গিরিপথ উচ্চ হতে উচ্চ হয়ে বন্ধুর একটা গিরিসঙ্কটে গিয়ে প্রবেশ করেছে; তারি শেষে, পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে—হাটবাজারের অনেক উর্দ্ধে—পাখীর বুকের পালকের মত শুভ্র সুকোমল মেঘে-ঘেরা শরতের আমার এবারের বাসা—ফুলে-ঢাকা পর্ব্বতের একটা বিশাল অলিন্দের একটি কোণে, গোলাপলতা আর মল্লিকা-ঝাড়ের পাশাপাশি!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যুদ্ধ-প্রসঙ্গে

ভগবানের সঙ্গে ত সন্ধি সর্ত্ত চলেনা, তিনি যা দেন তাই নিতে হয়। তিনি প্রত্যেকের মনে, প্রতি জীবনেই কাজ করেন সত্য, কিন্তু এ কাজ শুধু একের জন্য নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য। তা না হলে বিশ্ব-ব্যাপারে এত রহস্য, এমন অকারণ শোক-দুঃখ-বেদনার স্থান হয় কোথা হতে? এই যে ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছে, এই যে দিনের পর দিন গৃহ শূন্য, পরিবার বিচ্ছিন্ন, দেশ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হচ্ছে, বহুকাল ধরে বহু জীবনের আত্মদানের বিনিময়ে যে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল সমস্তই ভেঙ্গে চুরে পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে এ কি একেবারেই নিরর্থক? এক-একটি জীবনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এ ব্যাপারে সর্ব্ব-শক্তিমানের শক্তি ও করুণা দুয়েরই সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়তে হয়, কিন্তু সমগ্রের দিক দিয়ে যখন দেখা যায় তখন এর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই যুদ্ধে ভাই ভাইকে গ্যাস দিয়ে নিশ্বাস রোধ করে মারছে; সহর, নগর, পল্লীগ্রাম, শ্যাম শস্যক্ষেত্র সব পুড়িয়ে ছারখার করছে;—ন্যায় দয়া ধর্ম্ম কোন-কিছুরই দোহাই মান্‌ছেনা। এতদিন ধরে ইউরোপ ধর্ম্মের ধ্বজা ধরে, বিশ্বমৈত্রীর বাহানা করে, যে-বিরাট-মিথ্যার অভিনয় করে আসছিল, আজ কি তাই অবারিত হয়ে পড়েনি?

মানবের সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্য যখন চলে যায়, যখন প্রবল লোভ দয়া-ধর্ম্মকে অভিভূত করে, তখনই পিনাকীর জটা নড়ে ওঠে—তখনি প্রলয় উপস্থিত হয়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ঘটনা যখন ঘটতে থাকে তখন তার নিগূঢ় কারণটি বুঝতে পারা যায় না,—মন একটা ভালর দোহাই দেয়ই। কিন্তু যখনই লোভ মোহ আর অহঙ্কারের প্রবল প্রলোভনের আকর্ষণ হ'তে সরে দাঁড়ান যায়, যখনই মিথ্যার আবছায়া কেটে যায়, তখনই প্রখর উজ্জ্বল দিব্যালোকে দেখতে পাই ব্যাপার কি বীভৎস, কি অশোভন, কি বিশ্রী!

ইউরোপের এ যুদ্ধে যাঁরা লিপ্ত নাই, যাঁরা দূর হ'তে দেখ্‌ছেন, আর স্থির হয়ে ভাববার অবসর পেয়েছেন, তাঁরাই এর স্বরূপ সম্যক দেখতে পাচ্ছেন। কেননা নিতান্ত ঘেঁষা-ঘেঁষি করে পড়ে থাকলে, কিম্বা চোখের উপর একেবারে ঠিক্‌রে পড়লে কোন-কিছুরই ঠিক পরিমাণটি পাওয়া যায় না। প্রমাণ করে নিতে হ'লে একটু দূরতার প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ ব্যবচ্ছেদের আবশ্যক!

খৃষ্টানধর্ম্ম বিশেষ করে ক্ষমারই ধর্ম্ম, এক-গালে চড়-খেয়ে বিনা আপত্তিতে অন্য-গাল পেতে দেবার বিধান এঁদের ধর্ম্মগুরু করেছেন, তাছাড়া সর্ব্বস্বত্যাগী হওয়াই খৃষ্টান-জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, অথচ খৃষ্টের ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ এবং খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ইউরোপীয়ের ভাবটি সাধারণতঃ এমন নিরঙ্কুশ নয়। এঁরা যাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যান, তাদের একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ গণ্য করেন। যাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করলেন তাকে উদ্ধার করলেন বলে মনে করেনইত, তার মধ্যে জয় করবার একটা গর্ব্বও আছে। এই যে-পাশ্চাত্য জাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্তই অধিকার করেছেন, তাঁরাই আবার ধর্ম্মের অস্ত্রে সমস্ত জাতিকে আয়ত্ব করবেন এ বিশ্বাস তাঁদের খুব দৃঢ়। যদিও এঁদের ধর্ম্ম দারিদ্র্য সন্ন্যাস উদারতা ও ত্যাগের ধর্ম্ম তবুও ইউরোপীয় ভাবগতিকের সঙ্গে এ সাধনার কেমন যেন খাপ খায় না,—যেটা দান করা হয়,তার মধ্যেও আদায়ের একটা ভাব আছে। তাই বলে সবারই এ-ভাব নয়, এক-এক-জন ধর্ম্মে একেবারে তন্ময়! সবচেয়ে প্রশংসনীয় এঁদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও নির্ব্বিচার বাধ্যতা যাঁকে বড় বলে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁর কোন ভাব কি কথার কৈফিয়ৎ চাইবার এঁদের ইচ্ছামাত্রও নাই। এঁরা যোদ্ধার জাত, বহুকাল ধরে রাজ্য অধিকার করেই আসছেন, তাই নেতার অনুসরণ করে চলবার অভ্যাস এঁদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। আমরা পরাধীন জাতি, তাই স্বস্বপ্রধান, কখনই আত্মরক্ষা করতে পারিনি, তবু আমাদের আত্মম্ভরিতার অন্ত নাই, প্রত্যেকেই আত্ম-মতের সমর্থন করতে উদ্যত। তাই আমাদের কিছুই হওয়া হলনা। বড় হ'তে হ'লে যে ছোট হয়েই আরম্ভ করতে হয়, প্রধান হ'তে হ'লে যে "মহাজনো যেন গতঃ" তারই অনুসরণ করতে হয়, এ শিক্ষা আমাদের এখনও হয়নি; কবে হবে কে জানে! আমাদের আছে একমাত্র সম্বল-বুদ্ধি তাও কখনো কার্য্যকরী হয়নি কেন?

এমন কারো কি অভ্যুদয় হবে না, যিনি আমাদের বুদ্ধি বিদ্যা সব ভুলিয়ে দিয়ে, একে-বারে শিশুর মত অবোধ করে দেবেন, একেবারে সরল বিশ্বাসে জীবনের প্রত্যেক অংশ অনুপ্রাণিত করে তুলবেন, আর আমরা বিনা প্রশ্নে ধর্ম্ম-গুরুর অনুসরণ করে ধন্য হব। সমস্ত দেশের উদ্ধার সাধন হবে।

এখনও আমাদের কাজের সময় আসেনি, ধ্যানধারণার ফলে যখন আমরা ধর্ম্মে একেবারে তন্ময় হয়ে যাব, তখনি দেশে আশ্রম গড়ে উঠবে, শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে, সেবার ধর্ম্ম প্রচার হবে। যতক্ষণ সে ধর্ম্মের আর সেই ধর্ম্ম-বীরের আমাদের মধ্যে

অভ্যুত্থান না হচ্ছে ততক্ষণ কিছুরি আশা নাই। কিন্তু আশা কি নাই? আছে ত! এই যে গারো, খাসি, কোল, ভীল, জেলে, ধোপা, চাঁড়াল, চামার সবাই ধর্ম্মব্যাকুল হয়েছে, সবাই উঠতে চায়, সবাই নূতন পথে চল্‌তে উৎসুক, এর কি কোন অর্থ নাই? এই ত আশার সম্পূর্ণতা লাভের প্রথম সোপান।

ইউরোপ যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিপ্লব, রক্তপ্লাবনের মধ্য দিয়ে শান্তির পথে চলেছে; আমাদের শান্ত-কর্ম্মের পথে সার্থকতা অর্জ্জন করতে হবে। ইউরোপ অনধিকার চর্চ্চার স্বাধিকার প্রমত্ত হয়েছে, আর আমরা অপরের অনধিকার চর্চ্চার প্রশ্রয় দিয়ে স্বাধিকার-বঞ্চিত, অসাড় হয়ে বসে আছি। যুদ্ধ-প্রিয় ইউরোপ দেখ্‌বে যুদ্ধ কি ভয়ানক, ভাইয়ের বুকে ভায়ে ছুরি বসান কি কুৎসিত, কি অস্বাভাবিক; তেম্নি আমাদেরও দেখ্‌তে হবে, কর্ম্মহীন অসাড় জীবন কি অসার, জড়তা কি পরিমাণ স্বার্থপরতা, মানুষের স্বাধীন চিত্তবৃত্তি অকর্ম্মণ্য হয়ে থাক্‌লে কত পাপেরই সৃষ্টি করে, যুগান্ত ধর্ম্ম ভিন্ন তার বিনাশ নাই। তাইত গীতায় বারম্বার বলে কাজ কর। ভুল কাজ কর সেও ভাল, নিষ্কর্ম্মা হয়ে থেক না। মানুষ পথে পড়ে মরছে, আর আমাদের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ চন্দনতিলক কেটে, নামাবলি খানি গায়ে সামলে নিয়ে, মালা জপতে-জপতে পাশ-কাটিয়ে চলে গেলেন, পাছে অশুচি স্পর্শে তাঁর জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট হয়। অথচ তিনি কি জানেন না যে ভগবানের জীবকে দয়া করলেই তাঁর যথার্থ পূজা করা হয়; ও মালা-জপে কিছুই নাই! সবই জানেন, তবুও করেন না কিছুই। করার মধ্যে যে-যে অসুবিধা আছে, যে স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, সেইটি স্বীকার করতে সম্মত নন। নিজেকে ভুলিয়ে, দশের চোখে ধুলা দেবার চেষ্টায় বলেন, "যাঁর কর্ম্ম তিনিই করবেন, আমি কি করতে পারি? সময় যখন আস্‌বে তখন সবই হবে।" কিন্তু এ কথা ত ঠিক্ নয়, সময় তো সব সময়েই এসে রয়েছে, আমরা প্রত্যেকেই যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের সহায় হতে পারি। একেই দশের কাজ করে, —আমাদের দেশের ইতিহাস ধর্ম্ম ও পুরাণ-কাহিনী এই সত্যই বার বার প্রচার করে আস্‌ছে। একা রাম রাবণের অগণ্য সৈন্য অপরিসীম ক্ষমতা দর্প চূর্ণ করে দিয়েছিলেন; এক শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিবলে পঞ্চপাণ্ডব কৌরব-অক্ষৌহিণী সমূলে নিধন করেছিল। একা বুদ্ধ সমগ্র আসিয়া-খণ্ড অহিংসা পরমধর্ম্মে জয় করেছিলেন; একা নিমাই প্রেমের প্লাবনে সব ভেদবুদ্ধি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ তখনই দুর্ব্বল যখন তার ইচ্ছা আর কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী কিন্তু যখন তার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়, তখন সে যে অজেয়, অপার শক্তির অধিকারী;—কিছুই তার পক্ষে অসম্ভব থাকে না, তখনি সে অলৌকিক কাজ সকল করতে সক্ষম হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রথম প্রণয়

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া বরদাবাবু ডাকিলেন, "বিভা—"

কালো রঙের শাড়ী-পরা এক অপূর্ব্ব-সুন্দরী কিশোরী চঞ্চল চরণক্ষেপে "বাবা—" বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল; কিন্তু পিতার সহিত অপরিচিত এক তরুণ যুবাকে দেখিয়া সসঙ্কোচে থমকিয়া দাঁড়াইল। যুবার হাত ধরিয়া বরদাবাবু হাসিয়া কহিলেন, "এঁকে চিনতে পারছিস্ না? এঁর নাম শিশির বাবু—যাঁর লেখা গল্প-টল্প পড়ে তোরা খুব সুখ্যাতি করিস্, ইনি সেই শিশিরবাবু। ইনি এখানকার কলেজে ফিলজফির প্রোফেসর, আজ পাঁচ-ছ' মাস ভাগলপুরে রয়েছেন।" তাহার পর যুবার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "বসুন, শিশির বাবু—"

শিশির নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে আসন গ্রহণ করিলে বরদাবাবু হাঁকিলেন, "রামফল—"

সে আহ্বানে একজন ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। বরদাবাবু তাহার হাতে লাঠিগাছটা দিয়া চাদরখানা টেবিলের উপর ফেলিলেন ও সম্মুখস্থ ইজিচেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "এইটিই আমার মেয়ে, শিশিরবাবু,—বিভা। এরই কথা আপনাকে বলছিলুম। বেচারী নেহাৎ একলা থাকে। বাড়ীতে আমার আর ত কেউ নেই—আমি আর আমার এই ছোট্ট মা-টি। তুই ঐ চেয়ারটায় বোস্ না, বিভা, দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? এঁর সঙ্গে আলাপ কর্। আজ আমি এঁকে একরকম আবিষ্কার করেছি। কেমন শিশির বাবু, নয় কি?" বলিয়া বরদা বাবু হা-হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

শিশির একবার মুখ তুলিয়া বিভাকে দেখিয়া লইল। অপূর্ব্ব সুন্দরী বটে! কালো রঙের কাপড়খানায় সে রূপে আরও যেন মাধুরী ফুটিয়াছে। বিভা সস্মিত দৃষ্টিতে এই তরুণ আগন্তুককে দেখিয়া লইতেছিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে শিশিরের চোখ আপনিই নত হইল। বিভা কোন কথা কহিল না, বা কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখাইল না। শিশিরের মনে হইল, সে যেন এই ক্ষুদ্র নিভৃত শান্তির কুঞ্জটিতে কোথা হইতে দস্যুর মত সহসা প্রবেশ করিয়া ইহার সরল সহজ আনন্দটুকুকে একেবারে হরণ করিয়া লইয়াছে। সে না থাকিলে এখনই এ ঘরে হাসি ও কথার লহর ছুটিয়া যাইত! শিশির ঈষৎ কুণ্ঠিত হইল। বরদাবাবু কহিলেন, "আজ টাউন হলে এঁরই বক্তৃতা ছিল। 'কাব্য ও কবি'র সম্বন্ধে ইনি চমৎকার প্রবন্ধ পড়েছেন। কবি আর কাব্য—দুটো আলাদা জিনিষ নয়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির আলোচনা করলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঠিক কথা! ভারী সুন্দর কথা! আর কি যুক্তি

দিয়েই তা বুঝিয়েছেন। সত্যি বিভা, ইনি যে এমন ইংরিজিও লিখতে পারেন, তা বোধ হয় তোর জানা ছিল না। তুই সেদিন ওঁর কি-একটা গল্পের খুব সুখ্যাতি করছিলি না? ভারী সুন্দর বাঙ্‌লা লেখেন, বলছিলি! হাঁ ভাল কথা, শিশির বাবু, আপনি চা খান ত?"

শিশির সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া কহিল, "আপনি আমায় 'বাবু' বলবেন না, শুধু শিশির বলবেন। বাবু বললে আমি বড়ই লজ্জা পাব।"

বরদাবাবু কহিলেন, "কেন, আপনি কি এই নতুন শ্রীযুতদের দলে?" শিশির বিভার পানে চকিতের জন্য একটা লজ্জা-মিশ্রিত দৃষ্টি হানিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনি আমায় 'আপনি' বলে কথা কইলে আমার বড় সঙ্কোচ হয়।"

বরদাবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "ওহোহো, তাই বলছেন! আচ্ছা, আমি তোমাকে 'তুমি'ই বলব। বিভা, তুমি মা দু' কাপ চায়ের জোগাড় দেখ। আপনি কি চায়ে চিনি বেশী পছন্দ করেন, শিশির বাবু? না, না, ভুল হয়েছে, পছন্দ কর?"

শিশির কোনমতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, বেশী চিনি দিতে হবে না।"

বিভা উঠিয়া গেল। বরদাবাবু কহিলেন, "বুঝেছেন, শিশির বাবু? না, না, বুঝেছ শিশির, বিভা নেহাৎ একলাটি থাকে। ওর সঙ্গী বা বন্ধু কেউ নেই। আমি বুড়ো মানুষ, তায় আমার আবার একটু ঐ নুড়ি-পাথর নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা এক রোগ আছে। আমার স্ত্রী মারা গেছেন আজ দশ বছর; বিভা তখন সাত বছরের মেয়ে। সেই অবধি ঐ নুড়ি-পাথরে ঝোঁকটাও আমার অসম্ভব বেড়ে গেছে। তবু এর মধ্যে বিভার লেখাপড়ার দিকে যে মোটেই মনোযোগ করিনি, তা ভেবো না। ও ইংরিজি সংস্কৃত অনেক পড়ে ফেলেছে। তা-ছাড়া ওর একটু বাঙ্‌লা লেখারও সখ আছে। এত-বড় মোটা খাতা পাঁচ ছ'খানা লিখে ফেলেছে, গল্প আর কবিতা—নেহাৎ মন্দ লেখে না!"

শিশির একটা কথা কহিবার বিষয় পাইয়া যেন বর্ত্তাইয়া গেল। সে কহিল, "কোন মাসিকপত্রে ছাপিয়েছেন কি সে-সব?"

বরদাবাবু কহিলেন, "না, সে দিকে ওর খেয়ালই নেই। এই আমিই ওর একটি মাত্র পাঠক। মাঝে মাঝে আমাকেই দু'-চারটে এসে শোনায়। আমাকেও ও নুড়ি-পাথর সরিয়ে শুনতে হয়! কি করি, ও ছাড়ে না। কিন্তু কি জানো, ও-সবগুলো, তোমাদের ঐ কবিতা কি গল্প, আমি কেমন বুঝতে ভালো পারি না। তবুও শুনতে হয়—না হলে বেচারী মনে ব্যথা পাবে। আমিই ওর মা-বাপ, ভাই-বন্ধু সব কি না!"

বরদাবাবুর স্বর ঈষৎ আর্দ্র হইয়া আসিল। শিশির তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। এই স্বরে বৃদ্ধের ভিতরটা যেন তাহার চোখের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। স্নেহময় সুন্দর একটি প্রাণ—সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, সমবেদনায় সুমধুর!

বরদাবাবু একটু থামিয়া একটা দীর্ঘ

নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে আবার কহিলেন, "তুমি যদি মাঝে মাঝে এসে ওর সঙ্গে একটু আধটু সাহিত্যালোচনা কর—তাহলে দেখবে, ও বেশ বুদ্ধিমতী! মেয়েটার যখন এদিকে একটু ঝোঁক আছে, তখন আমার ইচ্ছে নয়, সেটা দমে যায়! ঐ নিয়ে ও যদি ভালো থাকে, থাকুক!"

শিশিরের চিত্তে একটা তীব্র কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। সে কৌতূহলে একটু বেদনাও যে না ছিল, এমন নয়। বিভার এই সুন্দর তরুণ জীবনে তবে বিষাদ কি কোন করুণ রেখা পাত করিয়াছে? অকাল বৈধব্যের ছায়া কি তাহার এই শুভ্র জীবনে কালি মাখাইয়া দিয়াছে? কিন্তু না, তাহার ঐ সজ্জিত সুন্দর বেশ, সস্মিত দৃষ্টি—! তবুও একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা সে রোধ করিতে পারিল না, কোনমতে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটির বিয়ে দেন নি?"

বরদাবাবু যেন স্বপ্নোত্থিতের মত কহিলেন, "এঁ্যা, বিয়ে! না, বিয়ে আর দেওয়া হয় নি—" বরদাবাবু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু বলা হইল না। বিভা কক্ষে প্রবেশ করিল, সঙ্গে রামফল; হাতে তাহার ট্রে, ট্রের উপর চায়ের কেট্‌লি, কাপ প্রভৃতি সরঞ্জাম।

বরদাবাবু একটা বড় রকমের নিশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "এই যে চা তৈরি। বাঃ, এর মধ্যে হয়ে গেল!"

বিভা কহিল, "রামফল আগে থেকেই জল চাপিয়ে রেখেছিল—" বিভা কাপে চা ঢালিয়া চামচে চিনি লইয়া শিশিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার কাপে দু'চামচে চিনি দি?"

শিশিরের সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কোনমতে মুখ তুলিয়া জড়িত স্বরে সে কহিল, "না, এক চামচেই হবে।"

চায়ের কাপ মুখে তুলিতেই শিশিরের সব কেমন গুলাইয়া গেল। একজন কিশোরীর সহিত এমন অসঙ্কোচ আলাপ তাহার জীবনে এই প্রথম! ফিলজফির প্রোফেসরি করিলে কি হইবে, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই—নারী-হৃদয়ের সহিত তাহার পরিচয় গৃহে আপনার মাতা ও ভগ্নীদের লইয়াই! সে স্নেহ, সে অভ্যর্থনা আর-এক জিনিষ! কিন্তু এ অভ্যর্থনার মাধুরী,—এ অপূর্ব্ব! কেতাবে-পড়া নারী-চরিত্র হইতেই তাহার নারী-হৃদয়ের অভিজ্ঞতা! তাহারই উপর রঙ্‌ ফলাইয়া কল্পনার তুলিতে গল্পে-উপন্যাসে সৃষ্টিছাড়া কত নারীর চিত্র সে আঁকিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজিকার এই বিজন প্রবাসে মধুর সন্ধ্যায় নারী-হৃদয়ের যে সঙ্কোচহীন সরল সহজ লীলাটুকু তাহার চোখে পড়িল, তেমন ছবি তাহার কল্পনাতেও কোন দিন উঁকি দেয় নাই!

চা পান করিয়া বরদাবাবু কহিলেন, "ঐ যাঃ! বেরোবার আগে যে পাথরটা দেখ্‌ছিলুম, সেটা বাগানেই ফেলে এসেছি। যাই, দেখে তুলে আনি সেটা—"

বরদাবাবু চলিয়া গেলেন। শিশিরের বুকের মধ্যটা অস্বাভাবিক স্পন্দনে দুর-দুর করিয়া উঠিল। সে স্পন্দনের ধ্বনি শুনিয়া লজ্জায় তাহার মরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল।

তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল, মূকের মত এমনভাবে বসিয়া থাকাটা নিতান্তই বিশ্রী দেখাইতেছে! একটা কথা বলা ভারী দরকার—নহিলে মহিলার সম্মান রক্ষা হয় না। আর এরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে এই বুদ্ধিমতী কিশোরীর মনে এ ধারণাও জন্মিতে পারে যে, সে একেবারেই বেকুব! কিন্তু কি কথা কহা যায়? কি কথা? সহসা একটা কথা তাহার মনে পড়িল। অমনি তাহার মন সস্মিত হইয়া উঠিল! বাঃ, ঠিক হইয়াছে—এই ব্যাপার লইয়াই কথা আরম্ভ করা যাক—বিষয়টা প্রাসঙ্গিক হইবে এবং প্রথম আলাপের পক্ষেও মন্দ নহে।

শিশির কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু এমন একটা জড়িত অস্পষ্ট স্বর বাহির হইল যে তাহার মনে হইল, এই মুহূর্তে চক্ষু মুদিয়া ঘর হইতে সে ছুটিয়া পলায়! সুন্দরী শ্রোত্রীটি কোনরূপ চাঞ্চল্যের আভাষমাত্র না দিয়া কহিল, "আমাকে বলছেন?" এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! কথা কহিতে গেলে স্বর বাধিয়া যায়!

প্রাণপণ বলে স্বরটাকে স্পষ্ট করিয়া শিশির কহিল, "আমার এ তুচ্ছ নগণ্য লেখা তাহলে আপনি পড়েন—এ শুনে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে!"

বিভা দিব্য অচপল স্বরেই উত্তর দিল, "আপনার কতকগুলো গল্প আমার ভারী ভাল লেগেছিল। সেগুলো আমি বাবাকেও পড়ে শুনিয়েছি।" শিশির মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার লেখার এমন পাঠিকা আছে! আর সে পাঠিকাকে কখনও চক্ষে দেখিবে, ইহা যে সে স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিতে পারে নাই!

শিশির কহিল, "শুনলুম, আপনি বেশ লিখতে পারেন। দয়া করে সেগুলি আমায় একবার পড়তে দিতে হবে! আমি তাহলে কৃতার্থ হব।"

মৃদু হাসিয়া বিভা কহিল, "বাবা বুঝি বলেছে? হ্যাঁ, সে আবার লেখা! আপনি পাগল হয়েছেন!"

শিশির কহিল, "পাগল হব কেন? একটু আলাপেই যা বুঝেছি, তাতে আপনার বাবার উপর আমার শ্রদ্ধা বড় অল্প হয় নি।"

বিভা একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "না, সে আমায় মাপ করবেন, শিশিরবাবু—সে আমি কিছুতেই দেখাব না! আপনি একজন অত-বড় লেখক—না, না, সে লেখা দেখানো হবে না।"

শিশির কহিল, "আমি 'তরণী'তে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দেব।"

বিভা কহিল, "আমি ত সে-সব ছাপাবার জন্য লিখি না—আর সে সাধ্যও আমার নেই। ছাপাবার মত লেখাই যদি হত, তাহলে কি আর কারও সুপারিশের জন্য এতদিন ফেলে রাখতুম!"

"তবু—"

"না, সে আমায় মাপ করবেন, শিশির বাবু—"

বিভার এই আব্দার-মাখানো অসম্মতি-টুকু শিশিরের ভারী ভাল লাগিল। সে আবার অনুরোধ করিতে ছাড়িল না, কহিল, "নিজের লেখার ঠিক সমালোচনা কেউ করে না, করতে পারেও না! তাই আপনি

বলছেন, আপনার লেখা ছাপাবার যোগ্য নয়—”

ঈষৎ হাসিয়া বিভা এবার কহিল, “এ কথাটা ঠিক হল না, শিশিরবাবু। নিজের লেখা যত নিকৃষ্টই হোক, লেখকদের ধারণা থাকে যে তা ভারী সরেস হয়েছে। তা যদি না হবে ত এত-সব লক্ষ্মীছাড়া লেখা নিয়ে নতুন-নতুন মাসিক-পত্রই বা রোজ-রোজ বেরুবে কেন?”

শিশির হাসিয়া কহিল, “আপনার এ কথাটা ভারী খাঁটি, বটে!”

শিশিরের কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিভা কহিল, “কিন্তু আপনাকে দেখে আজ আমি ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেছলুম, শিশির-বাবু—”

শিশির কহিল, “কেন?”

বিভা একবার দ্বিধা করিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বলিল, “আপনার লেখা পড়ে আপনার চেহারার সম্বন্ধে আমার অন্য রকম ধারণা ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি ঢের বড়—মাথার চুলেও কিছু-কিছু পাক ধরেছে, আর—”

শিশির হাসিয়া কহিল, “কিন্তু দেখলেন কি!”

“দেখলুম, আপনার বয়স তার চেয়ে ঢের কম।”

বরদাবাবু এই সময় ঘরে আসিলেন, আসিয়াই কহিলেন, “দেখলি বিভা, ভাগ্যে গেছলুম—পাথরটা কে ফেলে দিয়েছিল! না নিয়ে এলে হয়ত হারিয়ে যেত! অথচ এটার জন্য কত দাম লেগেছে, জানিস ত? সাতচল্লিশ টাকা। পুরোনো পাটলিপুত্রের পাথর। এর লেখা উদ্ধার করতে আজ এক মাস কি কষ্টই পাচ্ছি!”

বিভা হাসিয়া কহিল, “তা তুমি ত বাবা আমাকে ও-সব তুলতে-নাড়তে দেবে না!”

বরদাবাবু কহিলেন, “কি জানিস্ মা, কত রকম করে ধরে, কত লেখার সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক-ঠাক করি, তোরা যদি ঘাঁটতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলিস্, তাহলে আমার পরিশ্রম বেড়ে যেতে পারে! এই জন্যই আর কি বলা! কি বলেন, শিশির বাবু—না, না, শিশির, তাহলে তোমাদের আলাপ-পরিচয় হল? কেমন, বিভার বুদ্ধি-সুদ্ধি কেমন দেখলে? আমি যা বলেছি—exceptionally intelligent—নয় কি?”

শিশির ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সেদিন বিদায় দিবার সময় বরদাবাবু বারবার অনুরোধ করিলেন, “যখন সময় পাবে, তখনই এসো, শিশির। আমরা এখানে এক রকম নির্ব্বান্ধব-গোছ রয়েছি।” বিভা কোন কথা কহিল না; কিন্তু আসিবার সময় শিশির তাহার পানে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, বিভার চোখেও বেশ একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে ঔজ্জ্বল্যের সে যে অর্থ বুঝিল, তাহাতে তাহার আর তৃপ্তির সীমা রহিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সারারাত্রি শিশিরের ঘুমটা বড় সুবিধার হইল না। মনের মধ্যে অনেকখানি আনন্দ যেন কে ঠাসিয়া দিয়াছে—হৃদয়ের দুই কূল অপরূপ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে নিঃসঙ্গ প্রবাসের নিরানন্দ দিনগুলাকে

ঠেলিয়া এ কি হর্ষ শতদলে আজ ফুটিয়া উঠিল! সার্থক সে টাউনহলে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিল! জয়ের এতখানি আনন্দ সে আর কখনও পায় নাই।

তাহার পর প্রতিদিনই কলেজের ছুটি হইলে শিশিরকে কে যেন মন্ত্র-চালিতের মতই টানিয়া বরদাবাবুর গৃহের দিকে লইয়া যাইত! যে শিশির আপনার নির্জ্জন গৃহ কোণটিতে আবদ্ধ থাকিত, সে আজ অবসর-কালে সে জায়গায় একান্তই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। বরদাবাবুর গৃহের চায়ে সে কি অপূর্ব্ব রসের স্বাদ পাইয়াছিল, তাহা সে-ই জানে। সন্ধ্যায় নিজের গৃহে চায়ের পাঠ একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। ভৃত্য-পাচক মনিবের ভাবান্তরে বিস্মিত হইল।

সেদিন রবিবার। সকালেই শিশির বরদাবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। চায়ের কাপ নামাইয়া বরদাবাবু কহিলেন, "আরে শিশির যে, এস, এস। রামফল, তোর দিদিমণিকে বল্, শিশিরবাবুর জন্য এক কাপ চা চাই।"

শিশির হঠাৎ কেমন লজ্জা পাইয়া বলিল, "এধারে একটু কাজে আসতে হয়েছিল, ভাবলুম, আপনার এখানেও অমনি একবার ঘুরে যাই।"

বরদাবাবু কহিলেন, "বেশ করেছ হে! আজ রবিবার, তোমার ছুটিও আছে। তোমাকে তাহলে একটু খাটিয়ে নি। কি বল? কোন অসুবিধে হবে না ত?"

অসুবিধা! শিশির বর্ত্তাইয়া গেল। অনেকক্ষণ সে স্বচ্ছন্দে এখন এখানে কাটাইতে পারিবে!

বিভা চায়ের কাপ লইয়া আসিয়া কহিল, "এই নিন্ চা, শিশিরবাবু—" বরদাবাবু কহিলেন, "হাঁ, চাটা খেয়ে নাও, শিশির। তারপর, বুঝলি বিভা, আজ শিশিরকে একটু খাটাব মনে করছি। আমি ভাবছিলুম, কি করি—তা শিশির খুব এসে পড়েছে, যাহোক্।"

শিশির কহিল, "বলুন, আমায় কি করতে হবে।"

বরদাবাবু কহিলেন, "এমন কিছু নয়—প্রায় পঁচিশ-ত্রিশখানা পাথর থেকে বিস্তর লেখার পাঠোদ্ধার করা গেছে। সেগুলো অমনি নোট্ করা আছে; তুমি সেগুলো দেখে একটা indexএর মত করে দেবে। কেন না, ওগুলো গুছোনো থাকলে আমার লেখবার সুবিধে হবে। এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালের জন্য একটা প্রবন্ধ লিখছি কি না!"

বিভা হাসিয়া কহিল, "তবেই হয়েছে! তুমি বাবা বাঙলা দেশের একজন এত-বড় নভেলিষ্টকে একেবারে প্রত্নতাত্ত্বিক করে দিতে চাও! সাহিত্য পরিষৎ এতে কৃতার্থ হতে পারে, কিন্তু দেশের যত গল্পখোর পাঠক তোমার উপর খড়্গাহস্ত হবে। কি বলেন, শিশিরবাবু, আপনি তাহলে গল্পটল্প ছেড়ে এবার তাম্রশাসন লিখতে সুরু করবেন না কি?"

বরদাবাবু কহিলেন, "তাম্রশাসন লেখাটা কি নগণ্য কাজ হল?"

বিভা কহিল, "না বাবা, ও-সব দুর্ব্বোধ টীকা-টিপ্পনী দেখলে আমার জ্বর আসে। যাক্, আমি কোথায় ভাবছিলুম, শিশিরবাবু যদি এলেন, ওঁর সঙ্গে একটু

শাজঙ্গীর দিকে বেড়িয়ে আসব—না, তুমি ওঁকে একেবারে একরাশ নুড়ি-পাথরে চাপা দিয়ে বসলে !"

এই সরল সহাস স্বর শুনিয়া শিশির মুগ্ধ হইয়া গেল। এ যেন পাখীর গান! স্বর কোথাও এতটুকু বাধে না, কথায় কোথাও একটু খোঁচ নাই—সলীল স্বচ্ছ প্রবাহে হৃদয়খানি উছলিয়া চলিয়াছে! আর সে, এত-বড় হতভাগা বেকুব সে—যে, এই বিভার সহিত কথা কহিতে তাহার গলা বুজিয়া আসে, কথা বাধিয়া যায়, দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না!

বরদাবাবু কহিলেন, "তা যা, না হয় একটু বেড়িয়ে আয় তোরা। এক কাজ করলে হয় না বরং? শিশিরের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে এখানেই না হয় আজ ওকে নিমন্ত্রণ কর্ না! কি বল, শিশির, তোমার আপত্তি আছে?"

শিশির তেমনই কুণ্ঠার সহিত বলিল, "না, আপত্তি আবার কিসের?"

বিভা কহিল, "কি জানি, শিশিরবাবু, ঘরের কোণে ঐ ভাঙ্গা পিয়ানোটা দেখে যদি আপনার মনে কোন খটকা উঠে থাকে! আমরা ব্রাহ্ম নই, শিশিরবাবু। আমাদের বাড়ী খেলে জাত যাবে না—বামুনেই রাঁধে, বাবুর্চ্চিতে নয়।"

কথাটা কাঁটার চাবুকের মতই শিশিরের হাড়ে গিয়া বিঁধিল। প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে এই সংশয়টুকুই তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিয়া ফিরিতেছে এবং সে যে ঠিক প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত মিশিতে পারিতেছে না, এই সংশয়টুকুও তাহার এক প্রধান কারণ!

দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শিশিরের বাড়ী কোথায়, সেখানে কে-কে আছেন, কেন তাঁহাদের এখানে আনেন নাই ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ কি উপলক্ষ করিয়া এই প্রসিদ্ধ গল্প-লেখকটি সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন, এ প্রশ্নও বিভা বাদ রাখিল না। অনায়াস কৌতূহলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া সে তাহার নূতন অতিথির মনের অলি-গলির বিস্তর বার্ত্তা সংগ্রহ করিল। এই ভক্ত তরুণীটির সম্বন্ধে শিশিরের মনেও যে কোন কৌতূহল জাগে নাই, এমন কথা বলা যায় না। তবে সঙ্কোচই এক্ষেত্রে দারুণ অন্তরাল রচনা করিয়া তুলিল। কি জানি, কোন্ প্রশ্ন সমীচীন হইবে, কোন্টাই বা কিশোরী মহিলার কানে অমর্য্যাদার মত শুনাইবে! তাই প্রতিপদে সে কেমন থমকিয়া পড়িতেছিল। তাহার উপর আশপাশের পথিকগুলার নিতান্ত অসন্দিগ্ধ দৃষ্টি যখন তাহার উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন সে লজ্জায় কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। প্রকাশ্য পথে কিশোরীর সহিত এভাবে ভ্রমণ করার ব্যাপার যে তাহার জীবনে সকল সম্ভাবনার বাহিরে ছিল!

পাহাড়ের উচ্চ টিলার সম্মুখে আসিয়া বিভা কহিল, "এই শাজঙ্গী।" টিলার কোলে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী—টিলার উপরে দেওয়াল-গাঁথা ছোট একটা ঘরের মত। শিশিরকে লইয়া বিভা সেই ঘরের সম্মুখে আসিল। স্নিগ্ধ রৌদ্রালোকে চারিধার ঝলমল করিতেছিল—নীচে জমির উপর কয়-ঘর দরিদ্র মুসলমানের বাস—তাহাদের ছোট

ছেলেমেয়েরা পুকুরের পাহাড়ে খেলা করিতেছিল। পথে একরাশ ধূলা উড়াইয়া গরুর গাড়ী বোঝাই লইয়া চলিয়াছে—বলদগুলার গলায় ঝুলানো ঘণ্টা হইতে বিচিত্র ধ্বনি মৃদু তালে রণিয়া উঠিতেছে। শিশিরের কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা স্বপ্নের মতই মনে হইতেছিল। নিভৃত প্রদেশ, দূর লোকালয়ের হাস্য-কলরব মৃদু গুঞ্জনের মত কানে আসিয়া লাগিতেছে, পার্শ্বে তরুণী সঙ্গিনী! কল্পনা-লোকের এই তরুণ অতিথিটির সহসা মনে হইল, জগৎ-সংসার ছাড়িয়া সে যেন আজ সাধারণের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—সঙ্গে কেহ নাই, কিছু নাই! আছে শুধু অপরূপ মাধুরীর জীবন্ত প্রতিমা, এই সুন্দরী সহচরী! তাহার বুকের মধ্যে এক বিচিত্র বাসনা সাগর-মন্থনের সুধার ন্যায়ই ভাসিয়া উঠিল। বিশ্বের ললামভূতা এই ললনা চিরদিন যদি তাহার পাশে থাকিত! যাক্ মুছিয়া সমস্ত জগৎ-সংসার, কলেজের প্রোফেসরি, ফিলজফির লেকচার,—কি তাহাতে আসিয়া যাইবে!

বিভা এদিকে স্থির ছিল না। দেওয়ালের গায় বন্যলতাগুলা বিচিত্র বর্ণের ছোট ফুলে ভরিয়া ছিল। সে ক্ষিপ্র হস্তে অজস্র ফুল-পাতাসহ একটা লতা টানিয়া শিশিরের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিল, "আজকাল কবিদের অভিনন্দন দেবার ভারী ধূম চলেছে, আমি আপনার একজন নগণ্য ভক্ত পাঠিকা—এই laurel আপনার শিরে আজ জয়মালোর মত পরিয়ে দিচ্ছি—নিন্।" বলিয়া দিব্য অসঙ্কোচে সে সেই লতাটি শিশিরের মাথায় পরাইয়া দিল। নিটোল সুন্দর সেই হাতের স্পর্শ শিশিরের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত ছুটাইয়া দিল। নিমেষের জন্য তাহার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত বনভূমি, আকাশ-চরাচর অদৃশ্য হইয়া গেল—সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা দুইটি উদগ্র কোমল বাহুর বেষ্টনে পরিণত হইল! শিশিরের একবার ইচ্ছা হইল, এই দুটি বাহুকে সাদরে সে আপনার তপ্ত বুকে চাপিয়া ধরে! সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার চৈতন্য ছিল না। চোখের সম্মুখে এই যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য! না, স্বপ্ন! ভাল করিয়া সব বুঝিবার পূর্ব্বেই শিশিরের হাত ধরিয়া টানিয়া বিভা কহিল, "আসুন, শিশিরবাবু, ঐ টিলার উপর বসিগে—আপনি চারধার দেখে-শুনে একটা প্লট ঠিক করে ফেলুন। সেটার নাম দেবেন, 'শাজঙ্গী'। আসুন।" বিমূঢ় শিশিরকে একরূপ টানিয়া আনিয়া বিভা টিলার একধারে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল—শিশির দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বিভার পানে চাহিয়া রহিল। বিভা হাসিয়া কহিল, "অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে রইলেন যে! আমি ঠাট্টা করছি না। বসুন, দেখুন দেখি কোন প্লট পান কি না! আচ্ছা শিশির বাবু, আপনি গল্প লেখেন কি করে? আমায় আজ সব বলতে হবে। আমি ত কিছুতেই প্লট পাই না—কত ভাবি, তবুও না।"

শিশির কথা কহিবে কি—তাহার বাক্-শক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। বিভার কণ্ঠস্বরে কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত উচ্ছলিয়া

উঠিয়াছিল,—হায়, বিভা কি তাহার কোন সন্ধান রাখে? বাঁশীর তানে মুগ্ধ মৃগ যেমন সকল চেতনা হারাইয়া ব্যাধের শর বিনা যাতনায় বক্ষে ধারণ করে, বিভার এই সরল মধুর কণ্ঠস্বরে এক অদৃশ্য দেবতার পুষ্প শর অলক্ষ্যে তাহার বুকে বিঁধিতেছিল। সে স্বরে এমনই সে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার খেয়ালই ছিল না, এই যে অনুভূতি তাহাকে গ্রাস করিতেছে, ইহা সুখের, না, যাতনার? তাহার মনটা এক ঘুর্নীপাকের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিছুই হুঁস ছিল না! তার পর হঠাৎ এক সময় শিশির চাহিয়া দেখে, বিভা নীরবে মূক প্রকৃতির পানে চাহিয়া আছে। শিশুগাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল চারিদিকে বহুদূর অবধি বিস্তৃত—টিলার উঁচু জমি হইতে সে জঙ্গল চমৎকার সজ্জিত দেখাইতেছিল। শিশির বিভার পানেই চাহিয়া ছিল। মাথার মধ্যে কি একটা কথা তাল পাকাইতেছিল। হঠাৎ তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কম্পিত স্বর ফুটিয়া বাহির হইল, "বিভা—"। বিভা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস চেষ্টা করিয়াও সে রোধ করিতে পারিল না। শিশির তাহা লক্ষ্য করিল। কেন এ নিশ্বাস! বিভা কি ভাবিতেছে! বিভার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল—পাছে শিশির তাহা দেখিতে পায়, তাই সেদিকে না চাহিয়া নত নেত্রে সে বলিয়া উঠিল, "রোদ উঠেছে—চলুন শিশিরবাবু, বাড়ী যাই!" এবং তখনই 'শিশিরের মতামতের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেদিন খর রৌদ্রে ফিরিবার পথে শিশির স্পষ্ট বুঝিল, তাহার নিজের অস্তিত্ব বলিয়া আর-কিছুই নাই। সে যে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কথা কহিতেছে, এ শুধু এই তরুণী সহচরীটিরই তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোমবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিশির যখন বরদাবাবুর গৃহে আসিল, বরদাবাবু তখন জর্নালের জন্য কাপি লিখিতেছেন। শিশিরকে দেখিয়া বরদাবাবু কহিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এই কাজটা সেরে নিয়েই একটু বেড়াতে বেরুব। আজ জ্যোৎস্না আছে—নদীর ধারে বেড়াতে কোন অসুবিধা হবে না। বিভা বাড়ীতে নেই, আমার দাইয়ের ছেলেটির খুব জ্বর হয়েছে, তাকে দেখতে গেছে—সেবা-শুশ্রূষা নিজের হাতেই সে করছে সব। মার আমার ভারী মমতা! আমিও একবার ফেরবার মুখে দেখে আসব।"

শিশির এ কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া গেল। বিভার প্রতি শ্রদ্ধার আর তাহার সীমা রহিল না। এই কিশোরী কি নিষ্ঠুর জগতের বুকে শুধু আনন্দ আর করুণা বিলাইতেই আসিয়াছে!

নদীর ধারে খানিকটা ঘুরিয়া শিশির কহিল, "চলুন, এবার দাইয়ের ছেলেটিকে দেখে আসি।"

বরদাবাবু বলিলেন, "চল, অসুখটা বেশী। যদি সে ভাল না থাকে, তাহলে বিভাকে রাত্রে বাড়ী ফেরানো দায় হবে।"

দরিদ্র পল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে দাইয়ের বাস। দুইজনে সেখানে আসিতে বিভা বরদা-

বাবুকে কহিল, "ডাক্তারবাবু এই মাত্র চলে গেলেন, বাবা—তিনি বললেন, টাইফয়েডই। সাত-আট দিন চিকিৎসা ত হয়ই নি, উল্টে কুপথ্য চলেছিল। ভরসা ত তিনি এখন কিছুতেই দিতে পারলেন না।"

বরদাবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাই ত, বেচারী দাই! শিশির কহিল, "এ রকম রোগে এরা ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারবে কি? তার চেয়ে হাসপাতালে—"

"শিশির বাবু—" বিভার স্বরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সে আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "বলেন কি, আপনি! তা-ছাড়া এদের ধারণা কি জানেন, হাসপাতালে গেলে কেউ বাঁচে না। ঘরে পড়ে বিনা চিকিৎসায় এরা মরতে রাজী আছে, তবু হাসপাতালে গিয়ে সারতেও এরা চায় না। তখন এদের কাছে ও কথা তোলায় ফল কি! ডাক্তার বাবু অবশ্য এসে ঐ কথাই তুলেছিলেন, শুনে দাই ত কেঁদেই অস্থির! আমি অনেক করে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। রোগীকে নাড়া শক্ত। না হলে আমাদের বাড়ীতেই নিয়ে যেতুম।"

শিশিরের মুখে মুহূর্তের জন্য কথা ফুটিল না, লজ্জায় তাহার মাটীতে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। বরদাবাবু বিভাকে কহিলেন, "তাহলে রাত্রে তুমি ফিরছ কি?"

বিভা কহিল, "কি করে ফিরি, বল! মাথায় আইস্‌-ব্যাগ দেওয়া, টেম্পারেচার নেওয়া, ওষুধ-পথ্যি—কে করে, এ-সব? এই ত লোক এরা! একবার হদ্দ-মুদ্দ চেষ্টা করে দেখি, আমরা। এই যে রামফল ফিরেছে—কিরে, বরফ এনেছিস? নে, খানিকটা চট্ করে ভেঙ্গে ঐ আইস-ব্যাগটায় পুরে দে দেখি। দাই ভিতরে আছে, একটু ভাল জল চেয়ে নে। রামফলকে তুমি নিয়ে যাও, বাবা, না হলে তোমার কষ্ট হবে। তুমি বরং রাত্রের জন্য সহিসকে পাঠিয়ে দাওগে—"

শিশির কহিল, "যদি অনুমতি পাই, তাহলে আমিও রাত্রে থেকে রোগীর সেবার অংশ নিয়ে কৃতার্থ হই!"

"আপনি!" বিভার স্বরে অনেকখানি বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। শিশির হাসিয়া কহিল, "আমাকে এতই অপদার্থ ভাবছেন কেন?"

বরদাবাবু কহিলেন, "শিশির, তোমার এ কথা শুনে ভারী আনন্দ পেলুম। আর্ত্ত বেদনাতুর মনুষ্যত্বের সেবা করতে যে অগ্রসর হয়, তারই শিক্ষা সার্থক!"

শিশির কৃতজ্ঞভাবে কহিল, "কিন্তু এ শিক্ষা কলেজে কখনো পাই নি, বরদাবাবু, এ শিক্ষা আজ এই প্রথম পেলুম, আপনার কন্যার কাছে।"

বিভা কহিল, "এখন এ সব ধন্যবাদ আর কীর্ত্তিগানের পালা বন্ধ রাখুন, শিশির বাবু। যদি রাত্রে সেবা করতে চান, তাহলে আমাদের ওখান থেকে খেয়ে আসুন গে—বাবাকেও নিয়ে যান।"

শিশির এ কথার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিল না। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। এই যে তরুণী, স্বরে তাহার এতখানি কাঠিন্য নাই, আদেশ করিবার কোন ধারও সে ধারে না, অত্যন্ত কোমল সরল ভঙ্গীতে যাহা বলে, তাহা মাথা পাতিয়া লইতেই হয়—না লওয়া ছাড়া

উপায় নাই। রাজার আদেশও বুঝি কেহ এত খানি মাথা পাতিয়া লইতে পারে না। এ কি মন্ত্র জানে, না, উহার স্বরে কি যাদু আছে!

রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। শিশির বরফ ভাঙ্গিয়া আইসব্যাগে পুরিয়া রোগীর বিছানার পাশে আসিয়া বসিলে বিভা কহিল, "বাইরে ইজিচেয়ার আনিয়ে রেখেছি, শিশির বাবু, আমার হাতে ব্যাগ দিয়ে আপনি বরং একটু গড়িয়ে নিন্‌গে, তারপর না হয় শেষ রাত্রে আপনাকে ডেকে দেব।"

শিশির কহিল, "আর আপনি সারা-রাত জাগবেন! দিনের বেলাতেও ত খাটুনি কম যায় নি, তার উপর মুখেও কিছু দেন নি, বোধ হয়?"

বিভা কহিল, "মুখে দেবার প্রবৃত্তিই মোটে নেই। তাছাড়া আমি ত বেলা দুটো-তিনটের সময় এসেছি, সারাদিন আর কি খাটলুম! দাই গিয়ে কেঁদে পড়ল—তা'ও যদি দু'চারদিন আগে খবরটা দিত!"

শিশির কহিল, "যাক্‌, এখন আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নিন—শেষ রাত্রে আমি ডেকে দেব। কি বলেন?"

বিভা বলিল, "আমার ঘুম পায় নি মোটে। তা-ছাড়া কি জানেন, শিশির বাবু, এ-সব সেবার কাজ আমাদের দ্বারাই চির কাল ধরে চলে আসছে। এ কাজে মেয়েদের মত তৎপরই বা কে! দেখুন না, পুরুষ নার্শ কোন হাসপাতালে নেই, মেয়েরাই সারা পৃথিবীতে নার্শের কাজ করে বেড়াচ্ছে। এ কাজে মেয়েদের ভগবান-দত্ত সার্টিফিকেট আছে। পুরুষ দৌড়-ঝাঁপের কাজে খুব দড় বটে, কিন্তু এ কাজ বড় কোমল মিহিভাবে করতে হয়। মেয়েমানুষের প্রাণ—মার প্রাণ, বোনের প্রাণ, স্ত্রীর প্রাণ, তাই রোগী কোনো বিষয়ে একটু কাতর হলে খুব সহজেই সে তা বুঝতে পারে। তাছাড়া এতে সহ্য করবারও ঢের আছে, পুরুষ তত সহ্য করতে পারে না।"

শিশির কহিল, "আমাদের জাতকে এ-সব মহৎ কাজ থেকে একেবারে বরখাস্ত করতে চান না কি!"

বিভা কহিল, "দেখুন, এই আজই সকালে একখানা বাঙলা মাসিকপত্রে একটা প্রবন্ধের উপর কেমন আমার নজর ঠেক্‌ল, হঠাৎ। প্রবন্ধটার নাম, "নারী ও পুরুষ"—লেখক অবশ্য পুরুষ। একটু কৌতূহল হল—পড়তে লাগলুম—দেখি, লেখক মশায় লিখেচেন, পুরুষ আর নারীর মধ্যে সব রকমে সাম্য আনতে হবে, কোন পার্থক্য থাকবে না। ঘোড়ায় চড়া, মোটর হাঁকানো থেকে আরম্ভ করে অফিসে কেরাণীগিরি এবং কোর্টে ওকালতি করা—কোন বিষয়েই না! আমার হাসি পেলে, সে প্রবন্ধ পড়ে। আমাদের বাঙ্গালী পুরুষদের নিজেদের কি অধিকার আছে, তা তাঁরা নিজেরা জানেন না, অথচ তাঁরা ছুটেচেন, মেয়েদের অধিকার নির্ণয় করতে! তাঁদের কাছে আমাদের একটা শুধু নিবেদন আছে, ঘোড়ায় চড়তে পেলে আমরা বর্ত্তে যাব না! ও-সব কাজ তাঁদেরই থাক্‌, আমাদের শুধু তাঁরা যেন মানুষ বলে মনে করেন, একটু আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত না করেন, আর জ্ঞান-

রাস্তার বাইরে অন্ধ করে যেন ফেলে না রাখেন, তাহলেই আমাদের অধিকার আমরা নিজেরা বুঝে নিতে পারব!"

এমনি কথা আলোচনা ও সেবার মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে বরদাবাবুর বাড়ী হইতে চা ও প্রাতরাশ আসিল। বিভা শিশিরকে বলিল, "আপনি মুখে হাতে একটু জল দিয়ে চাটুকু খেয়ে নিন, বিস্কুট ক'খানাও খেয়ে ফেলুন। আর যদি আপনার অসুবিধা না হয় ত আধঘণ্টা অপেক্ষা করলে আমি তার মধ্যে বাড়ী থেকে স্নানটা সেরে আসি। রামফলের সঙ্গেই তাহলে যাই!"

শিশির কহিল, "বেশ, আধঘণ্টা কেন, এখনও দেড়ঘণ্টা আমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি। আপনি একেবারে সব সেরে-সুরে আসুন। বলেন ত, দুপুর বেলায় আমি কলেজের ছুটি করেও আসতে পারি।"

বিভা কহিল, "কোন দরকার নেই! তার চেয়ে বরং আর এক কাজ করলে ভাল হয়। ক'রাত্রি এখন জাগতে হয়, তার কোন ঠিকানা নেই! আপনি বরং বেশী রাত করে আসবেন! শেষ রাতটায় একলা রোগীর কাছে থাকতে ভয় পায়, সে সময় দু'জনে জেগে থাকলে তবু কতক ভরসা হয়।"

শিশির হাসিয়া বলিল, "দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তাহলে আপনি রোগী নিয়ে থাকবেন! কিন্তু এভাবে ক'দিন কাটাবেন? নিজের শরীরটাকেও ত দেখা চাই। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না! আপনি না হয় রাত বারোটা অবধি জাগবেন, তারপর ঘুমুবেন—ও রাতটুকু আমিই জাগব। কেন না, আবার দিনটা ত আপনারই হাতে পড়ছে।"

বিভা হাসিয়া কহিল, "আপনারও ত দিনের বেলা কলেজ আছে, ঘুমুবেন কখন? তার চেয়ে ও ঘুম পেলেই ঘুমোনো যাবে, এই ব্যবস্থাই ভাল। এখন আমাদের এ কষ্টটুকু সার্থক হয়, তবেই না! কিন্তু আপনার এ সাহায্য আমি কখনো ভুলব না, শিশিরবাবু। এক অজানা দুঃখী লোকের ছেলের জন্য এত কষ্ট করছেন!"

শিশিরের বুকটা আনন্দে ভরিয়া গেল। সস্মিত মুখে সে কহিল, "যদি আমি কোন কাজে এতটুকুও যোগ্যতা দেখাতে পেরে থাকি, তবে সে জানবেন, শুধু আপনারই আদর্শ অনুসরণ করে—"

"আপনারা লেখক মানুষ তিলকে একেবারে তাল করে তোলেন! বড়-বড় কথা ছাড়া কিছু জানেনই না—"

এই সময় রামফল আসিয়া কহিল, "দিদিমণি, তাহলে যাবে না কি?"

"হাঁ, চ—" বলিয়া বিভা রামফলের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। যতক্ষণ দেখা যায়, শিশির মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিভার পানে চাহিয়া রহিল। এ কি মানুষ! এমন ত সে কখনো চোখেও দেখে নাই। একে নারী, তায় এই তরুণ বয়স, তাহার উপর দিব্য লেখাপড়া শিখিয়াছে, নিজের আরাম-বিলাস, বসন-ভূষণ লইয়া যে বয়সে মত্ত থাকিবার কথা, বাহিরের জগৎ রহিল কি গেল, সে সংবাদে কিছুই আসিয়া যায় না—এই নারী ঠিক সেই বয়সে সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও এ কি তপশ্চারিণীর দুরূহ

পবিত্র ব্রত যাচিয়া হাতে লইয়াছে! শিশিরের সাহায্য! হায়, বিভা কি এটুকু বুঝিতে পারে না যে, তাহার সঙ্গ-সুখ পাইবার জন্য জগতে এমন কোন কঠিন কাজ নাই, যাহা সে পালন করিতে না পারে! রোগীর সেবার মত এই কঠোর নীরস কর্ত্তব্য কাল রাত্রে তাহার যে অমন সহজ সুন্দর ঠেকিয়াছে, সে কি কেবল নিষ্কাম কর্ত্তব্য-পালনের জন্য—না, বিভার সাহচর্য্যে! বিভা পাশে থাকিলে সারা জীবনে সারা দিনরাত্রি ধরিয়া অক্লান্ত ভাবে যে সে এ কাজ করিয়া যাইতে পারে! এতটুকু ক্লান্তি বা দুঃসহতা বোধ করিবার কোনই আশঙ্কা থাকে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরও পাঁচ-সাত দিন সেবা-শুশ্রূষার পর সুরাহার লক্ষণ দেখা গেল। বিভা তখন দাইয়ের ছেলেকে নিজেদের গৃহে লইয়া আসিল।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা শিশির আসিল না দেখিয়া বিভা একটু চিন্তিত হইল। সকালে শিশিরের শরীর তেমন ভাল ছিল না, চোখ দুইটাও লাল হইয়া উঠিয়াছিল। বিভার মনটা অস্থির হইল। তবুও এ চিন্তার কথা মুখ ফুটিয়া সে কাহারও কাছে বলিতে পারিল না। এ কয়রাত্রে শিশিরের সঙ্গে পরিচয় তাহার অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে; তাই আজিকার এই প্রথম অভাবটা নূতন করিয়াই তাহার মনে বাজিতেছিল।

পরদিন প্রাতে বিভা উঠিয়া বরদা বাবুকে বলিল, "বাবা, শিশির বাবু কাল মোটেই এলেন না,—আমার কেমন ভাবনা হচ্ছে, বুঝি, তাঁর কোন অসুখ হয়েছে! কাল সকালে স্পষ্টই বলে গেলেন, শরীরটা কেমন ভাল ঠেকছে না।"

বরদাবাবু চিন্তিতস্বরে কহিলেন, "তাই ত, কাল সে এলই না মোটে! আমারও তত খেয়াল ছিল না—নিজের ঐ লেখাটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম—ভাবলুম, বুঝি, তোরা ওধারে কোথাও গল্পসল্প করছিস—তা আমি এখনই একবার কাকেও পাঠাই—"

বিভা কহিল, "তার চেয়ে বাবা, আমি নিজেই একবার গাড়ী করে গিয়ে দেখে আসি—রামফলকে সঙ্গে নি, সে তাঁর বাড়ী চেনে। বেহারী ভালই আছে—তার বন্দোবস্তও আমি সব করে রেখে গেলুম।"

বিভার আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিতেছিল না। যদি সত্যই শিশির বাবুর অসুখ করিয়া থাকে! আত্মীয়-স্বজনহীন সুদূর প্রবাসে কষ্টের তাহা হইলে যে আর সীমা থাকিবে না। যদি অসুখ বেশী হয়—! বিভার সমস্ত প্রাণ বেদনায় ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। সৌখীন মানুষ, অভ্যাস নাই, কয়দিন রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা—শরীরে সহিবে কেন? গাড়ী যতই বাড়ীর কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার ভাবনা বাড়িয়া উঠিল। নানা দেবতার কাছে শিশিরের কুশল মাগিতে মাগিতে উদ্বিগ্ন চিত্ত লইয়া বিভা একখানা ছোট বাঙ্‌লার ফটকের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিল! তাহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। একটা অমঙ্গল-আশঙ্কায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ফটক পার হইয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাঙলার বারান্দার

পানে সে চাহিল—ঐ না, কে বসিয়া আছে—শিশিরবাবুই যে! আঃ, রাজ্যের আরাম যেন সে কুড়াইয়া পাইল!

বাঙলার পথে পদশব্দ পাইয়া শিশির উৎকর্ণ হইয়াছিল—বিভাও ততক্ষণে একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। শিশির চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এ কি, বিভা—! বিস্ময়ে তাহার মুখে কথা ফুটিল না। বিভা কহিল, "কেমন আছেন, শিশিরবাবু?"

শিশির কহিল, "কেন, আমি ত ভালই আছি।"

বিভা কহিল, "তবু ভাল। কাল আপনি গেলেন না বলে এমনি আমার ভাবনা হয়েছিল—"

এইটুকু বলিয়াই বিভা কথাটা শুধরাইয়া লইল, কহিল, "বাবা বললেন, এসে আপনার খোঁজ নিতে! তিনি ভারী ব্যস্ত বলে নিজে আসতে পারলেন না। যাই হোক্, আপনি যে ভাল আছেন, এই আমাদের পরম মঙ্গল। আমরা ভাবছিলুম, ক'রাত্তির খেটে বুঝি কোন অসুখ-বিসুখ করে ফেললেন—"

শিশির কহিল, কলেজ হইতে ফিরিয়া সে কেমন ক্লান্তি বোধ করিতেছিল—একটু গড়াইয়া লইবে ভাবিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িয়াছিল; তার পর আর-কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! যখন ঘুম ভাঙ্গিল, রাত্রি তখন দশটা, কাজেই আর যাইতে পারে নাই। কথার শেষে সে একটা পরিহাসের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। বসন্তের প্রভাত, স্নিগ্ধ আলোর বিকাশ, মহুয়া ফুলের গন্ধে মাতাল হাওয়া, গাছের ডালে পাখীর বিচিত্র গান—আর সম্মুখে এই তরুণী সহচরী! শিশির কহিল, "আপনি বুঝি তাই রোগীর সেবার ভার নিতে ছুটে এলেন! কিন্তু তেমন ভাগ্য কি আমার হবে যে আপনার হাতের—"

বিভা বাধা দিয়া হাসিয়া কহিল, "সে আপশোষ রাখবার দরকার কি? বলুন না, কি করতে হবে, মাথায় অডিকলোন দেব, না, পা টিপে দিতে হবে! যদি এতই সাধ হয়ে থাকে ত রোগ করে সেবা নেবার চেয়ে সুস্থ শরীরে যেচেই নয় সেটা নিলেন! তাতে তবু উদ্বেগের হাত এড়ানো যায়!"

শিশির বিস্ময়ে বিভার পানে চাহিল। বিভার মুখে কোনরূপ ভাবান্তর দেখা গেল না। এ কথাগুলার অর্থ কি! তবে কি তাহার আশা দুরাশা নয়!

বিভা কহিল, "শিশিরবাবু, আপনি ত আদর-অভ্যর্থনার কোন কায়দাই জানেন না, দেখছি। একজন মহিলা বিনা-নিমন্ত্রণে যেচে এসে আপনার অতিথি হল, আর আপনি তাকে বসবার আসন দেওয়া দূরে থাক্, ঘরে ঢুকতেও বল্লেন না। যাক্, অতিথি বিমুখ হলে গৃহস্থের পক্ষে ভাল কথা নয়—আমি নিজেই তাহলে আপনার ঘর-টরগুলো দেখে নি! লেখক মানুষের ঘর! গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই আবার ফিরে বাবাকে খবর দিতে হবে ত!"

বিভা ঠিক বসন্তের এক ঝলক মিষ্ট বাতাসের মতই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—শিশিরের বই-ভরা ছোট আলমারিটার সম্মুখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইল, দেওয়ালের গায়ে যে সকল ছবি ঝুলিতেছিল, একবার সেগুলাও

দেখিয়া লইল, পরে টেবিলের উপরকার খাতাপত্র ঘাঁটিয়া দেখিল শুনিল; পরে একেবারে শিশিরের মুখের পানে চাহিয়া শরের মতই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন নিক্ষেপ করিল, "আচ্ছা শিশিরবাবু, আপনি কখনও লভে পড়েছিলেন ?"

শিশিরের মুখ পাংশু হইয়া গেল—সমস্ত রক্ত ছলাৎ করিয়া তাহার মুখ হইতে মুহূর্ত্তে নামিয়া গেল! সে কি বলিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না—সমস্ত বহির্জগৎ নিমেষে তাহার চোখের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার পায়ের তলায় মাটি নাই! শূন্যে যেন কে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! বিভা উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তেমনি অচপল স্বরে কহিল, "আপনি এ উদ্ভট প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেছেন—না? কিন্তু কাল রাত্রে আপনার কতকগুলো গল্প নতুন করে ফের পড়ছিলুম—আপনি ত বিয়ে করেন নি—তবুও আপনার গল্পের মেয়েগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—অথচ তাদের জ্বলজ্বলে প্রাণ আছে —তাদের মনের এত খুঁটিনাটি তত্ত্বকথা আপনি জানলেন কি করে? তাই আমার জিজ্ঞেস করা। থাক্, নির্লজ্জ কৌতূহল দিয়ে আপনার কোন গোপন কথা আমি টেনে তুলতে চাই না। আমার এ প্রগল্‌ভতাটুকু ক্ষমা করবেন। আর যদি সুবিধে হয় ত আজ ওবেলা আমাদের ওখানে যাবেন, ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। এ খাওয়ানো শুধু নার্শিংয়ের পুরস্কার! বুঝলেন? তাহলে এখন আসি।"

একটা দমকা বাতাসের মতই বিভা চলিয়া গেল। সে যেমন আসিয়াছিল, অনেক খানি গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ লইয়া—তেমনি গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ এখানে ঢালিয়া দিয়াই সে চলিয়া গেল। ছড়াইয়া-দেওয়া সে গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ যে লাভ করিল, তাহার মুখের একটা কৃতজ্ঞ বাণী শুনিবার জন্য মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিল না! হায় দুর্ব্বোধ সৌন্দর্য্য, শিশিরের কাছে প্রহেলিকার মত ক্রমেই তুমি জটিল হইয়া উঠিতেছ, এবং যত তুমি জটিল হইতেছ, ততই তোমার পাকে-পাকে তাহাকে অসহ্য উপায়হীন ভাবে বাঁধিয়া ফেলিতেছ! তুমি তাহাকে দুরাশার পিছনে ছুটাইয়াছ, অথচ আশা যে একেবারে দাও নাই, এমনও নহে! যদি শিশিরের মনের বার্ত্তা পাইয়া থাক, তবে আর কেন এ দুর্ভেদ্য অন্তরালে তাহাকে ব্যথিত উন্মাদ করিয়া রাখ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বরদাবাবুর ঘরে বসিয়া শিশির তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিল। শিশির বলিতেছিল, "আপনি এই প্রত্নতত্ত্বে আমার একটু interest create করিয়ে দিতে পারেন ত ভালো হয়!"

বরদাবাবু কহিলেন, "এ তোমার ভাল লাগবে না। বিশেষ তুমি রক্ত-মাংসের মানুষ গড়ছ, কত বিচিত্র চরিত্রের নর-নারী সৃষ্টি করছ, এ নুড়ি-পাথরের নীরস কর্কশ কাজ, এ তোমার ভাল লাগবে না। তা-ছাড়া emotional লোকের পক্ষে এ দিকে না আসাই উচিত। কারণ সত্য

আর উচ্ছ্বাসে মিশলে এর মধ্যে অনেকখানি মিথ্যা জড়িয়ে পড়বে।”

এমন সময় বিভা আসিয়া কহিল, “বাবা, দুটো তরকারী আর বাকী আছে, এখনই হবে —আর এক ঘণ্টা পরেই তোমরা খাবে ত?’

শিশির কহিল, “আপনি নিজের হাতে সব তৈরী করছেন?”

বিভা কহিল, “আমরা এখনও কল-কেতার বাতাস পেয়ে এত বড় পণ্ডিত হয়ে উঠিনি যে বাড়ীতে অতিথ আনিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করব, হোটেলের উচ্ছিষ্ট দিয়ে! যাক্, আপনার সঙ্গে ভারী ঝগড়া আছে, কিন্তু শিশিরবাবু। আপনি আমায় এখনও ‘আপনি’ বলা ছাড়লেন না—এত বলি—”

শিশির কহিল, “আপনি যদি সেটা seriously mean মনে করে থাকেন, তা হলে তাই হবে।”

বরদাবাবু কহিলেন, “দু’একটা গান আজ গাস্ মা। অনেক দিন তোর গান শুনিনি।”

বিভা মুহূর্ত্তের জন্য একটু অপ্রতিভের মত হইয়া পড়িল, পরে কহিল, “আচ্ছা, আগে এদিককার সব হোক ত, তারপর যদি সময় থাকে, দেখা যাবে।”

কিছুক্ষণ পরেই এক বিচিত্র সুরের প্লাবনে ঘর ভরিয়া গেল। বিভা যখন তাহার ললিত কণ্ঠে গাহিতে সুরু করিল,

> **তুমি কেমন করে’ গান কর যে গুণী,**
> **আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি!**
> **সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে**
> **সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে**
> **পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে**
> **বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী!**

তখন শিশিরের সমস্ত চেতনা লোপ পাইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত চরাচর এক বিচিত্র সুরের জালে ঘিরিয়া গিয়াছে, চারিধারে সুরের হাওয়া ছুটিয়াছে, সুরের আলো ফুটিয়াছে!

বিভা যখন মৃদু কণ্ঠে গাহিল,

> **কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে,**
> **হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে,**
> **আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে**
> **চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি!**

তখন শিশিরের মনে হইল, তাহার আর কোন আশা নাই! চারিদিকে সুরের জাল বুনিয়া শিশিরকে কে আজ এমন বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রাণ তাহার অহরহ এক গভীর অতৃপ্তির কান্না কাঁদিয়াও নিজের অবস্থা ঠিক বুঝাইতে পারিতেছে না, বুঝাইবার ভাষা তাহার নাই, কথাও সব বাধিয়া যায়!

মন যখন সহসা গানের সুরে স্বপ্নলোকে উধাও হইয়াছিল, ঠিক এমন সময়ে বাহিরে প্রলয়-ঝঞ্ঝা বিশ্ব-সংহারে মাতিয়া উঠিল। বরদাবাবু চমকিয়া উঠিলেন, “এ কি হঠাৎ ঝড় এল যে!”

বিভা পিয়ানো ছাড়িয়া হাসিয়া কহিল, “হঠাৎ নয়, বাবা, ও পুরোপুরি আয়োজন করেই এসেছে। অনেকক্ষণ থেকেই মেঘ জমছিল। তোমরা ঘরে বসে কথা কইছিলে, তাই কিছু লক্ষ্য করনি।”

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল, “তাই ত, বড় বিপদ হল যে! এ কি চট্ করে থামবে?”

বিভা কহিল, “নাই বা থামল! আপনি ত আর জলে পড়েন নি!”

এ কথার উপর আর কথা চলে না।

শিশির ভাবিল, আর সে ইহার সহিত কোন তর্ক করিবে না—যখনই সে কথা কহিবে, তখনই কি বিভা একটা আঘাত না দিয়া ছাড়িবে না!

বিভা কহিল, "মেঘের কথা আমি বলিনি, তার কারণ, আমার খাবার তৈরি হবার আগেই আপনারা তাহলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। ধীরে সুস্থে খাওয়া হত না।"

বাহিরে তুমুল রবে বায়ু গর্জ্জিয়া ফিরিতেছিল—সার্শিগুলা বন্ধ করা হইয়াছে—সেগুলাকে কাঁপাইয়া এক দারুণ আর্ত্ত রব বাহিরে উন্মাদের ন্যায় হাহাকার করিতেছিল। সেই সঙ্গে বৃষ্টিরও বিরাম ছিল না।

রাত্রে খাইতে বসিয়া বরদাবাবু কহিলেন, "এই যে সব মিষ্টান্ন দেখচ, এর কোনটি বাজারের নয়, সমস্তই বিভা তৈরী করেছে!"

আহারাদির পরও ঝড়-বৃষ্টি থামিল না দেখিয়া শিশির চিন্তিতভাবে সার্শির ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে চাহিয়াছিল। বিভা হাসিয়া বরদাবাবুকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, এই রাত্রে শিশিরবাবু জলে পড়তে চান।"

বরদাবাবু কহিলেন, "তুমি আর বাইরের পানে চেয়ে কি দেখচ! এই দুর্য্যোগে মানুষ বেরোয়! এখানেই আজকের মত থেকে যাও—কোন অসুবিধে হবে না। তোমার জন্য একটু ঠাঁই দিতে পারব হে।"

বিভা কহিল, "আসুন শিশিরবাবু, বৃষ্টি যদি দেখতে চান ত ওধারের বারাণ্ডা থেকে দেখবেন, আসুন। আপনাদের এ-সব দেখার দরকারও আছে। কোন এক গল্পে বর্ণনা জুড়ে দিতে পারবেন। নায়ক-নায়িকার মনের দ্বন্দ্বের সঙ্গে উপমা দেবারও দরকার হতে পারে!"

শিশির চমকিয়া উঠিল। এই কিশোরী কি অন্তর্যামী? তাহার মনের মধ্যে বিচিত্র ভাব ঝড়ের তালে প্রচণ্ডরকম নৃত্য সুরু করিয়াছিল—কত বিরুদ্ধ কথা, কত চিন্তা! ঝড় পাইয়া শিশির কতক বর্ত্তাইয়া ছিল। বাহিরের এ গর্জ্জনে তাহার মনের ভিতরকার সে সব দ্বন্দ্ব-কোলাহল কেহ আর শুনিতে পাইবে না! বিভার কথায় তাই সে চমকিয়া উঠিল। কি করিয়া তাহার নিভৃত হৃদয়-পুরের দুরন্ত সংগ্রামের সংবাদ সে বুঝিল! বাহিরে আঁধারের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র রেখা ছুটিয়া গেল। সে আলোয় আর একটা জিনিস তাহার চিত্তে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল! তবে কি বিভার বুকেও এ ঝড় এমনি তালে-ছন্দে এমনই রুদ্র গর্জ্জনে ছুটিয়াছে!

বিভা শিশিরকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, "কি, আপনার ভাব লেগে গেছে না কি? অবাক হয়ে আকাশ দেখচেন! কি দেখচেন্—যেন এক দুরন্ত বালিকা বিস্রস্ত কেশপাশ এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই কেশপাশ বয়ে চারিধারে মত্ত হাসির ফোয়ারা ঝরে পড়েছে! আমায় মাপ করবেন শিশিরবাবু, এমনি ধারাই সব কবিতা মাসিকপত্রে পড়ি কি না, তাই বলছি। নিজে ত ও-সব ideaর ধার ধারি না। যাক্, ওঘরে আপনার বিছানা তৈরি হচ্ছে, আপনি ততক্ষণ ঝড় দেখবেন, আসুন।"

শিশির মন্ত্র-চালিতের মতই বাঙ্লার পিছন-দিককার বারাণ্ডায় আসিয়া বসিল। সার্শির বাহিরে বাগান দেখা যাইতেছিল—অন্ধকারে ঝোপগুলা আরও কালো দেখা-

ইতেছিল—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ হানিয়া যায়, আর মনে হয়, যেন দৈত্যগুলা মাথা ঝাড়া দিয়া হাসিয়া উঠিতেছে! গাঢ় অন্ধকারের পানে চাহিয়া দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। শিশির ভাবিল, বিভার এ কি দুষ্টামি! তাহাকে লইয়া এমন নির্দ্দয় খেলা সে কেন খেলিতেছে? স্পষ্ট করিয়া কেন সে ধরা দিতেছে না? পাকে-প্রকারে আকারে-ইঙ্গিতে আপনাকে যেটুকু সে দেখাইতেছে, তাহা হইতে ত শিশিরের কিছুই দুরাশা বলিয়া মনে হয় না—তবুও স্পষ্ট একটা আশা দিতে কেন বিভা এতখানি চাতুরী খেলিতেছে! এই যে সরলতার সে আভাষ দিতেছে, সে কি সত্যই সরলতা, না, এ ভাণ! শুধু আলেয়ার আলোয় দুইদণ্ড তাহাকে মাতাইয়া দিয়াই বিভার খেলা শেষ হইবে? না, না, এমন পিশাচী কি সে হইতে পারে? বিভার মুখে-চোখে কৈ তেমন-কোন লক্ষণ ত দেখা যায় না!

সহসা কক্কড় শব্দে চারিধার কাঁপাইয়া দীপ্ত আলোয় আকাশ ভরাইয়া অদূরে বাজ পড়িল। বিভা সরিয়া আসিয়া শিশিরের হাতটা চাপিয়া ধরিল। শিশির চপলার আলোয় বিভার মুখের পানে চাহিল, তাহার চোখে জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে!

শিশিরের প্রাণের মধ্যটা জ্বালা-ইয়া দিয়া এক তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা ছুটিয়া গেল। বিভা কাঁদিতেছে! কেন! কি তাহার দুঃখ! সে যে যাতনায় অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছে, সে যাতনা কি তবে বিভার বুকেও বিঁধিয়াছে? মুহূর্ত্তে এক দারুণ বাসনা শিশিরের বুকে জাগিয়া উঠিল। মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলিতে পারিলে ত আর এ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের দুইপারে বসিয়া দুইজনকে হা-হুতাশ করিতে হয় না! এই নীরব নিঝুম বাদলার রাত,—প্রাণের সে গোপন বাসনা ফুটাইবার পক্ষে এমন অবসর যে আর মিলিবে না!

শিশির মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "বিভা—" সে স্বরে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। বিভা কোন কথা কহিল না। শিশিরের মাথা ঘুরিতে ছিল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় সে বিভাকে দুই হাতে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বিভা, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি।" তাহার সর্ব্বশরীর দারুণ উত্তেজনায় থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আবার বিদ্যুৎ চমকিল। উত্তর পাইবার আশায় বিভার পানে শিশির নিমেষের জন্য চাহিল; সহসা বিভা শিশিরকে প্রচণ্ডভাবে ঠেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "শিশিরবাবু—এত বড় আপনার স্পর্দ্ধা! একলা পেয়ে এভাবে আপনি আমায় অপমান করেন! যান, এখনই চলে যান, আপনি!"

শিশিরের মাথায় তখনও আগুন জ্বলিতে-ছিল। সে বিভার পানে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "শোন বিভা—"

বিভা তেমনই কঠিন স্বরে কহিল, "কিছু শুনতে চাই না, কোন কথা নয়! এত ছোট মন নিয়ে আপনি শিক্ষার ভাণ করে বেড়ান! নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রী বলেই জেনেছেন! আর কোন পবিত্র সম্পর্কের কথা ধারণাও করতে পারেন না! আমি ভুল করেছিলুম, তাই আপনার

সঙ্গে এমন অসঙ্কোচে মিশেছিলুম—আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। যাক্, আপনার সঙ্গে এর পর যদি কখনও আর আমার দেখা হয়, তা হলে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ব্যবহারই আপনি আশা করবেন।”

শিশিরকে তাহার অবস্থা বুঝিবার অবসর মাত্র না দিয়া বিভা ক্ষিপ্র সে স্থান ত্যাগ করিল। শিশির হতাশ চিত্তে সেই অন্ধকারে বসিয়া পড়িয়া বাহিরের জমাট অন্ধকারের পানে উদাসভাবে চাহিয়া রহিল! তখনও ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রলয়ের অট্টহাসি চারিধারে ভীষণ বিদ্রূপ ছড়াইয়া হো-হো করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে!

পরদিন। বেলা প্রায় আটটা। শিশির বিছানায় পড়িয়াছিল—ভৃত্য শিবু আসিয়া সংবাদ দিল, বরদাবাবু আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বরদাবাবুও কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শিশির উঠিয়া বসিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি কক্ষে হিল্লোলিত হইয়া পড়িয়াছিল। বরদাবাবু কহিলেন, “কাল রাত্রে ঐ ঝড়ে-জলে তুমি একটিও খবর না দিয়ে চলে এলে! ব্যাপার কি, বল ত?”

শিশির লজ্জায় বরদাবাবুর পানে চাহিতে পারিল না। বরদাবাবু কহিলেন, “এ রকম পাগলামি করলে কেন, হঠাৎ? এ্যাঁ? আমি সকালে তোমার জন্য বসেছিলুম—তুমি চলে এসেছ, তা জানতুমও না।”

শিশির সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। অপরাধের অনুতাপে জ্বলিয়া মনটাকে সে অনেকখানি প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়াছিল। বরদাবাবুর কাছে একরকম কাঁদিয়াই সে কহিল, “আপনার বাড়ীতে পদার্পণ করবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি বিশ্বাসঘাতক, নরাধম।”

বরদাবাবু এ-সকল শুনিয়া ভড়কাইয়া গেলেন—জিজ্ঞাসুভাবে শিশিরের পানে চাহিলেন। শিশির তাহার সে দুর্ব্বল মোহের কথা অতি কষ্টে কোনমতে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বরদা বাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কহিলেন, “আমারই দোষ, শিশির। আমি যদি তোমাকে সব কথা আগেই খুলে বলতুম, তাহলে আর এটা ঘটত না। এ বয়সে তোমাদের ওরকম ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। তুমি ত জান না, বিভার জীবনের উপর দিয়ে কি প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে!”

বরদাবাবুর স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন, “নরেন আমারই এক বন্ধুর ছেলে ছিল। পিতৃমাতৃহীন তাকে আমিই মানুষ করি। বিভার সঙ্গে তার বিয়েরও ঠিক হয়। তারপর তাকে বিলেত পাঠাই। সেখানে তিন বছর থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে আর বছর সে বাড়ী ফিরছিল। পথে জাহাজেই তার জীবনের সঙ্গে আমাদেরও সমস্ত সাধ আশা অকালে ফুরিয়ে গেল। তারই জন্য বিভাকে বিলেত-ফেরতের স্ত্রীর মতই এতখানি free করে গড়ে তুলছিলুম।” খানিকটা থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, “তারপর বিভার বিয়ের আবার সব স্থির করেছিলুম। শুনে সে একেবারে কি দীন মূর্ত্তিতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল! কাঁচি দিয়ে মাথার চুল নির্ম্মূল করতে গেছল! আমি তার হাতখানি ধরে ফেললুম। সে একটা

নিশ্বাস ফেলে শুধু ডেকেছিল, "বাবা—" সেই সুর, আর তার চোখের সেই চাওয়া—আমার বুকে ছুরির মত বিঁধেছিল! সে ভর্ৎসনার সুর আমি জীবনে ভুলবো না। বিভা তার সমস্ত কায়-মন দিয়ে নরেনের স্মৃতিকে আঁকড়ে আছে। এর পর দ্বিতীয় বার আর আমি বিয়ের কথা তুলিনি। তারপর আমার চোখে জল দেখে সে দীন সাজ সে খুলে ফেলে; তবে এই বেশভূষা আর হাসির খোলসে শোকটা যে সে চেপে রেখেছে, এ শুধু এই বুড়োর মুখ চেয়েই।"

বরদাবাবুর কাতর দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল। শিশির স্তম্ভিতভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিপি-রীতি বনাম সবুজপত্র

সবুজপত্রের সম্পাদক-মহাশয় 'অলঙ্কারের সূত্রপাত' প্রবন্ধে লিপি-রীতির দোষ বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রথম-বয়সের কাব্য' হইতে কয়েকটি ছত্র তুলিয়া, নানা রকম ভুল-ভ্রান্তির বিচার করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের নূতন যুগের অধিনায়ক নিজেই স্বীকার করিতেন যে, তাঁহার প্রথম-বয়সের রচনায় অনেক ত্রুটি ছিল; কিন্তু চৌধুরীমহাশয় তাঁহার যে প্রয়োগগুলিকে ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার একটিও ভুল বলিয়া মনে হইল না। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল অগ্রহায়ণ মাসে; তবে আমি দোলযাত্রার পরে উহার সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছি বলিয়া এতদিন পরে উহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিতেছি। যেগুলি ভুল বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার বিচার করিতেছি।

(১) **প্রগল্‌ভবয়সী**—চৌধুরীমহাশয় বলেন যে, "প্রগল্‌ভ শব্দের অর্থ দাম্ভিক, নির্লজ্জ ইত্যাদি।" "ইত্যাদি" কথায় আর যত অর্থই চাপা থাকুক না কেন, ঐ শব্দে যে, বয়সের একটু আধিক্য বুঝাইতে পারে তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই; অর্থাৎ প্রগল্‌ভ অর্থ যে matured, developed বা full grown হইতেই পারে না ইহাই তিনি জোর করিয়া বলিয়াছেন। যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থেই শেষোক্ত অর্থটি পাওয়া যায়, এবং স্বয়ং কালিদাসের রচনাতেও ঐ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গের ৫১ শ্লোকে গৌরীর 'প্রগল্‌ভ বয়সের' কথা পাই। আমরা ঐ শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে গোল করিতে পারি, কিন্তু মল্লিনাথ ঐ কথার টীকা করিয়া লিখিয়াছেন,—"অস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ প্রগল্‌ভে বয়স্যপি যৌবনে সত্যপি ইত্যাদি"। তাহা হইলেই দেখিলাম 'প্রগল্‌ভবয়স' ভুল নয়। সমালোচক নিজেই বলিয়াছেন যে প্রাকৃত বা ভাষা ব্যাকরণের অনুসারেই আমাদিগকে চলিতে হইবে, এবং 'বয়সী' যে

চলিত ভাষার ব্যাকরণে শুদ্ধ হয়, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। তবে আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র খুঁজিয়া ঐ কথাটির বিচার হইল কেন?

(২) **মুখাবয়ব**—প্রবন্ধে আছে—"তারপর দেখিতে পাই যে তিলোত্তমার 'দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকা-ভাব ছিল।' 'মুখাবয়ব' বলায় 'অবয়ব' শব্দের প্রয়োগ শিষ্ট হয় নি। 'অবয়ব' শব্দের অর্থ হস্তপদাদি অঙ্গ। ইংরাজিতে যাকে বলে limb।" হস্ত ও পদের সহিত 'আদি' যুক্ত থাকিলেও, যখন limb দিয়া খাঁটি অর্থ বুঝান হইয়াছে, তখন লেখকের মতে 'অবয়ব' শব্দের অর্থ কেবল হাত-পা বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। Obsolete ইংরাজিতে organs প্রভৃতিও limb অর্থে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন ধড় ও মুণ্ড বাদ দিয়া হাত-পাকেই limb বলে। Organকে limb-এর সামিল করিয়া লইলেও মুখের গণ্ডাদি অংশকে কোন প্রকারে limb বলা চলে না। কাজেই 'অবয়বের' অর্থ limb নয়, যদিও limb অবয়বের অন্তর্ভুক্ত বটে। মুখের নাক, চোখ, গাল, চিবুক প্রভৃতি লইয়াই মুখের সম্পূর্ণ অবয়ব; ঐ সকলগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বয়সের কাঁচা বা পাকা ভাব বেশ অনুমিত হয়। তাহা হইলে **মুখাবয়ব** শব্দের ব্যবহার অশিষ্ট হইল কেন? মুখের উপরকার নাকটা যে মুখের অবয়বের মধ্যে, তাহা কবি কালিদাসের রঘুবংশের ১২ সর্গের ৪৩ শ্লোকে নাক-কাটা সূর্পণখার বর্ণনাতে আছে, যথা "মুখাবয়বলূণাং তাং—"ইত্যাদি। গণ্ড প্রভৃতি অংশও যে মুখের অবয়ব তাহা যখন প্রবন্ধের একটি পরবর্তী ছত্রে স্বীকৃত দেখিতেছি, তখন অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

(৩) প্রবন্ধটিতে আছে—"তার পর তিলোত্তমার—'ললাট……নিশীথ কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায়।' নদীর ন্যায় তরল পদার্থের সঙ্গে কপালের মত নিরেট পদার্থের তুলনা করা আলঙ্কারিকের মতে সঙ্গত নয়।" ঠিক হইল কি? কঠিনের সহিত কঠিন, তরলের সহিত তরল গ্যাস্ বা বায়বীয়ের সহিত বায়বীয়, মিলাইয়া মিলাইয়া উপমা না দিলে কি সংস্কৃত-শাস্ত্রের মতেও উপমায় দোষ ঘটে? চৌধুরীমহাশয় তাঁহার সমালোচনায় আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের উদাহরণই দিয়াছেন, আমিও বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থনের জন্য প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের দৃষ্টান্তই দিতেছি। ঋতুসংহারে ৫ম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে সাদা পাথর-মোড়া হর্ম্ম্যতলকে শরদিন্দুর মত নির্ম্মল বলা হইয়াছে, এবং শীতল বাতাসকে তুষারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে চাঁদের শুভ্র কিরণকে মার্ব্বেলের মত শক্ত মনে হয় না কিংবা বাতাসকে জমাট পদার্থ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে না। তবুও যদি তিলোত্তমার কঠিন কপালের কথা উঠে, তাহা হইলে Hard "luck!" বলিয়া কথা শেষ করিতে হয়। উদ্ধৃত বাক্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, "নদীর গায়ে জ্যোৎস্না পড়লে তার চঞ্চল হয়ে ওঠবারই কথা।" এটুকু হয়ত অসাবধানে লিখিত। চাঁদের কিরণ পড়ার দরুণ নদী চঞ্চল হইয়া উঠে অথবা সমুদ্রে জোয়ার হয় একথা ঠিক নয়।

চাঁদের কিরণে অমাবস্যায় জলের উচ্ছ্বাস হয় না। আর তাহা যদি হইতই, তাহাতেই বা ক্ষতি ছিল কি? চাঁদের মত মুখ বলিলে যে কলঙ্কের দাগযুক্ত গোলাকার মুখ বুঝায় না, কিংবা চাঁদের ক্ষয়-বৃদ্ধির হিসাবে মুখের ক্ষয়-বৃদ্ধির কথা ধ্বনিত হয় না, এ কথা ত প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাই বার বার বলিয়া গিয়াছেন।

চৌধুরীমহাশয় দৈবাৎ ভুলিয়া গিয়াছেন যে নিশীথ অর্থ গভীর রাত্রি; যে অর্দ্ধ রাত্রে মানুষেরা একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে তাহাকেই বলে নিশীথ। সাধারণভাবে রাত্রি-জ্ঞাপক শব্দ হইল নিশা; তবে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে নিশা অর্থে নিশীথ শব্দ অসাবধানে ব্যবহৃত দেখা যায়। যে গভীর রাত্রে মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, তাহাকেই যে খাঁটি সংস্কৃতে নিশীথ বলিত এবং কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতির লেখায় যে সেই অর্থই পাওয়া যায় তাহা যে-কোন সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আপ্তে-সঙ্কলিত সংস্কৃত অভিধান-গ্রন্থে দৃষ্টান্ত তুলিয়া অর্থ দেওয়া আছে; সেই সহজলভ্য গ্রন্থখানি সকলেই দেখিতে পারেন। প্রাচীন সংস্কৃতের নিশীথ, ঠিক অর্থেই প্রাচীন প্রাকৃতে পাই, যথা, "অগ্‌গি যথা পজ্‌জলিতো নিশীথে" (থেরী গাথা)। আমাদের ভাষাতেও অতি চলিত কথায় গভীর রাত্রি অর্থে "নিশীথ রাত্রি" বলে। এই নিশীথ শব্দ হইতেই, খাঁটি অর্থ ধরিয়া, আমাদের 'নিশুতি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। নিশুতি সময়ে গভীর রাত্রে যে জলের উপর চাঁদের আলো আমাদের মনে অতি মধুর ও প্রশান্তভাব জাগায়, তাহা হয়ত স্বীকৃত হইবে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে বঙ্কিমবাবুর প্রয়োগটিকে দোষযুক্ত না বলিয়া প্রশংসা করাই উচিত।

(৪) বঙ্কিমবাবু ১৬ বছরের তিলোত্তমার চুলের 'নিবিড় বর্ণের' কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সে রং যে কাল, কি কটা, কি সোনালি, কি সাদা তাহা বলেন নাই। এইজন্য বর্ণনাটা দোষযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চুলের রং যে কটা কিংবা সোনালি হয় তাহা আমাদের মনেও পড়ে না; গুপ্তকবি যাঁহাদিগকে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী বলিয়াছেন তাঁহাদের চুলের স্বপ্নে কোন পাঠকের মনে চুলের রং সম্বন্ধে খট্‌কা উপস্থিত না হইবারই কথা। বিদেশকে মনে করিয়া রং প্রভৃতির কথা কেহ বড় লেখে না। ইউরোপের বাজারে Skin Colour নাম দিয়া যাহা বাহির হয়, তাহার ব্যাখ্যায় যে ভারতে এবং আফ্রিকায় খট্‌কা লাগিবে, একথা বিক্রেতারা মনে করেন না। গল্পের নায়িকাদিগকে প্রায়ই একটুখানি 'পাকা' দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ১৬ বছরের মেয়ে তিলোত্তমার মাথার চুল যে পাকা ছিল, এ সন্দেহ হয় না; কাজেই ইউরোপের Skin Colourএর মত এদেশে চুলের রং বিনা বিশেষণেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কিন্তু লিখিয়াছেন যে চুলের রং লাল, কি সোনালি, কি কালো, পাঠকের মনে এ সন্দেহের উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। বঙ্কিমবাবুর প্রয়োগে 'সংশয় দোষ' ঘটে নাই, কিন্তু লেখকের এ সংশয়টুকু দোষের হইয়াছে।

(৫) **কুঞ্চিতালক—** এই কথাটা

একটু অসাবধানে কেশসকল-এর বিশেষণ-রূপে লইয়া চৌধুরীমহাশয় গোল করিয়াছেন। প্রথম গেল ললাটের বর্ণনা; এবং তাহার পরেই লিখিত আছে যে 'তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক' ইত্যাদি। 'তৎপার্শ্বে' অর্থাৎ কপালের পাশে বা উপরভাগে যাহা আছে বলা হইল, তাহার শেষে একটা দাঁড়ি না দিলেও সেমিকোলন দিতেই হয়; কারণ পরে যে মুক্তকেশ স্থানে স্থানে পড়িয়াছে, সে 'কেশসকল' কোন প্রকারে 'তৎপার্শ্বে'-এর সহিত যোজনা করা যায় না। বঙ্কিমবাবু যদি কুঞ্চিতালক অর্থ কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া ভাবিয়া লিখিয়াছিলেন (অতিরিক্ত কেশটুকু না হয় তর্কের খাতিরে ছাঁটিয়াই দিলাম) বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে বিনা সেমিকোলনে বাক্যটি কিরূপ দাঁড়ায় দেখাইতেছি :—তৎপার্শ্বে (ললাট-প্রান্তে) অতি নিবিড়বর্ণ 'কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া' কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে। কেশ (কর্ত্তা) আসিয়া পড়িয়াছে নানাস্থানে; তাহার উল্লেখও হইল; এখন তৎপার্শ্বে বা কপোল-প্রান্তে কি করিয়া রক্ষা করা যায়? কাজেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে "তৎপার্শ্বে… কুঞ্চিতালক" পর্য্যন্ত গিয়াই একটি ছেদ চাই এবং এই ছেদ সেমিকোলন হইলেই যথেষ্ট হইবে। ছাপায় আছে কিনা জানি না; না থাকিলেও বিরাম-চিহ্ন দিতেই হইবে।

অ ক শব্দের অর্থ যে কেবল কোঁক্‌ড়া চুল, তাহা নয়। আমি কালিদাসের দৃষ্টান্তই দিয়া আসিতেছি; এখানেও সেই দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি যে অলক অর্থে কেবল চুল-ও হয়। সংস্কৃত কোষগ্রন্থেও ইহা দেখিতে পাইবেন। রঘুবংশের ৪র্থ সর্গের ৫৪ শ্লোকে দেখিতে পাইবেন যে কেরল রমণীদের অলকে অর্থাৎ চুলে চমূরেণু উড়িয়া পড়িতেছে। এখানে মল্লিনাথ অলককে কোঁক্‌ড়া চুল অর্থে বুঝেন নাই, এবং অলক শব্দের যে সোজাসুজি চুল অর্থ হয় তাহাও সংস্কৃত কোষগ্রন্থে কালিদাসের এই প্রয়োগ এবং অন্যান্য প্রয়োগের দৃষ্টান্তে লিখিত হইয়াছে। আপ্তে-সঙ্কলিত কোষগ্রন্থ দেখিতে পারেন। বহুদৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যাইত, কিন্তু প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে কুঞ্চিতালক ললাটপ্রান্তে শিষ্টভাবেই সুসজ্জ রহিয়াছে।

ললাটপ্রান্তের কুঞ্চিত কেশের পর মুক্ত কেশের বিচার করিতেছি। সেই কেশ যে-যে স্থানে পড়িয়াছে তাহার মধ্যে একটি স্থানের নাম কপোল, আর একটি স্থানের নাম গণ্ড। কপোল শব্দের অর্থ ঠিক গাল বা Cheek বটে; গণ্ড শব্দও আংশিক অর্থে গৃহীত হইলে কেবল গালকে বুঝায়; কিন্তু গণ্ডের পূর্ণ অর্থ—ললাটের পার্শ্বদেশ হইতে মুখের সমগ্র পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত অংশ। বট্‌লিং ও রোট্‌ প্রণীত সংস্কৃত কোষগ্রন্থে এবং আপ্তে পণ্ডিতের কোষগ্রন্থে দেখিতে পাইবেন যে গণ্ড অর্থ—The whole side of the face including temples. কবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গের ৮২ শ্লোকে আছে, যে, 'আচারধূম' গ্রহণ করায় বধূর মুখমণ্ডলের সমগ্র গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু গালটুকু যে রাঙা হইয়াছিল, তাহা নয়; কোষ-

কারেরাও এইস্থলের গণ্ডশব্দের প্রয়োগকে Temples সহ মুখের সমগ্র পার্শ্বদেশ বুঝিয়াছেন। Temple শব্দের কোন বাংলা কথা নাই; ঐ স্থানের শিরকে আমরা রগ বলিয়া থাকি; সেটা পারস্যদেশের কথা। কাজেই বিশেষ বিশেষ স্থান বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমবাবুকে সংস্কৃত গণ্ড শব্দটিকে কপোল হইতে ভিন্নভাবে প্রাচীন অর্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। প্রাচীন শব্দ ব্যবহারে যদি দোষ থাকে, তবে বঙ্কিমবাবু দোষ করিয়াছেন; কিন্তু অর্থ বুঝিবার ভুল অথবা কুপ্রয়োগ করেন নাই।

(৬) দুর্গেশনন্দিনীতে আছে যে, তিলোত্তমা কাদম্বরী, সুবন্ধুর বাসবদত্তা এবং গীতগোবিন্দ পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ-নাথ, কুমারীর সুরুচি এবং শিষ্টাচার রক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছেন যে তিনি বাসবদত্তা এবং গীতগোবিন্দ পড়েন নাই। গল্পের নায়িকারা কি কি পড়িয়াছিলেন তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু কাদম্বরী পড়িলে যদি কোন দোষ না হয়, তাহা হইলে বাসবদত্তা পড়িলেও দোষ হয় না। আমি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তার কথা বলিতেছি না, সুবন্ধুর কাব্যের কথাই বলিতেছি। সুবন্ধুর কাব্যে ব্রীড়াদিব্যঞ্জক কোন কথা বা বর্ণনা নাই। প্রেম এবং বিরহের যেরূপ বর্ণনা বাসবদত্তার আদর্শে কাদম্বরীতে লিখিত হইয়াছিল তাহা সুরুচি-সঙ্গত বিবেচিত না হইলে, কাদম্বরী প্রভৃতি সকল কাব্যই পরিত্যাগ করিতে হয়। সুবন্ধুর কাব্যে প্রত্যেক শব্দের এরূপভাবে নানা অর্থ কল্পিত হইয়াছে, যে শিবরাম ত্রিপাঠীর দর্পণ নামক টীকা না দেখিলে পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; এজন্য তিলোত্তমার পক্ষে বইখানি পড়িয়া উঠা শক্ত ছিল বলিতে পারি। কারণ কবি সুবন্ধু মুখবন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন :—

> সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদ-
> শ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ
> প্রত্যক্ষর শ্লেষময় প্রবন্ধ-
> বিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধির্নিবন্ধম।

স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের একালের বিবেচনায় গীতগোবিন্দে শ্লীলতা রক্ষিত হয় নাই। স্বয়ং কমলাকান্তই বলিয়াছেন, যে গীতগোবিন্দে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। কিন্তু প্রাচীনেরা যে ঐ গ্রন্থকে তিলমাত্র অশ্লীল মনে করিতেন না এবং পড়িতে পড়িতে ভক্তিভাবে মজিতেন, তাহা ভুলিলে চলিবে না। বৈষ্ণবদের কথা ছাড়িয়া দিয়া একালের অন্য শ্রেণীর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণদের বড় বড় ভদ্রঘরের সকল বয়সের মেয়েদিগকেই ভক্তিপূর্ণভাবে সুর করিয়া গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। সংস্কৃত না জানিলেও, মোটামুটি যে সকল কথা উচ্চারণ করিতে হয়, সেগুলির অর্থ ভাষায় অতি সহজ বলিয়া ভদ্রলোকের মেয়েরা গীত-গোবিন্দের অনেকস্থলের অর্থ অথবা ভাবটুকু অনায়াসে ধরিতে পারেন। এ অবস্থায় কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না যে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের মেয়েদের লজ্জাশীলতার অভাব আছে, অথবা গীতগোবিন্দ পড়েন বলিয়া পাপসঞ্চয় করিয়া থাকেন। কাজেই

সেকালের কুমারীর পক্ষে গীতগোবিন্দ অপাঠ্য বিবেচনা না করিলে চলিত।

চৌধুরী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, যে বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রথম বয়সের লিপিরীতি পরিহার করিয়াছিলেন, তখন সে রীতি অবলম্বিত হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ের লিপি-রীতিকে যে বঙ্গসাহিত্যে আদর্শ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সত্য বলিয়া স্বীকার করি। দুর্গেশনন্দিনী হইতে যেটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে সুগঠিত শব্দটি দেখিতে পাই; কিন্তু আদর্শ বলিয়া সীতারাম হইতে যেটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে গড়ন শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিমবাবুর যে ভাষা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সে ভাষার গড়ন শব্দটি ছাড়িয়া, এই বিচারিত প্রবন্ধটিতে বহুবার **গঠন** এবং গঠিত লিখিয়াছেন কেন? ভাষায় গড়া কথা আছে; এবং ঐ কথাটি ওড়িয়া এবং মহারাষ্ট্র প্রাকৃতেও আছে। পঠনের অপ-ভ্রংশরূপে আমাদের পড়া শব্দটি আছে; পড়া এবং গড়া একরূপ উচ্চারিত হয় বলিয়া, পঠ্ ধাতুর অনুকরণে কোন সাধারণ ব্যক্তি একটা মন-গড়া গঠ্ ধাতুর সৃষ্টি করিয়াছেন। গঠ্ নামে যখন একটা সংস্কৃত ধাতু নাই, তখন গড়া, গড়ন প্রভৃতিকে সাধু আকার দিবার প্রয়োজন কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সনেটের নিবেদন

বঙ্গবধূসম আমি অন্তঃপুরে সতত বন্দিনী,
বঙ্গবধূসম তবু মুখে বুকে ভরপুর সুখ।
পতি-সোহাগিনী বধূ করে যথা আনন্দ-কৌতুক,
কবি-সোহাগিনী আমি, লীলারঙ্গে সতত রঙ্গিণী।
শাখা-বাহু মেলিয়াছে আঙ্গিনায় যেমন কামিনী,
আমিও গো লীলাময়ী! লভিয়াছি কুসুম-যৌতুক,
দেবতার আশীর্ব্বাদে। হের মোর মধুময় মুখ,—
মধুর জীবন যেন মধুময়ী বাসন্তী যামিনী।
বঙ্গনারী নহে কভু সারী সম পিঞ্জর-বাসিনী;
পশি যবে পূজাগৃহে হয় ধনি—পূজায় বিভোর,
হরি-মুখচন্দ্র-সুধা পিয়ে যবে নয়ন-চকোর,
সেও হয় মুক্তাকাশে বিহঙ্গিনী, বন-বিহারিণী।
আমিও গো মুক্তাকাশে শুভ্র ডানা আনন্দে মেলিয়া,
করিতেছি নাম-গান—সুধারাশি পড়িছে ঝরিয়া।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

ট্যালিসম্যান

(গল্প)

কর্ণেল টড সাহেবের আদ্দালি ছিল পঞ্জাবি রণবীর; নামে, কাজে কিন্তু কাণ্ডারী। যত-রকম বিপদে আপদে সে তাঁহাকে রক্ষা করিত।

তীরবেগে মোটার না চালাইলে সাহেবের মন উঠিত না; মোটারে বসিয়া কল্পনা করিতেন, তিনি উড়িয়াছেন ব্যোমযানে। প্রভু চালাইতেন মোটার, পাশে বসিয়া থাকিত ভৃত্য রণবীর। রণবীরের ইঙ্গিত কৌশলে, বা 'অকাল্ট' প্রভাবে, ঠিক বলা যায় না, এমন বেগগতিতে অর্থাৎ বেগতিতেও চৌরাস্তা অতিক্রমকালে কোন একটি দিন সাহেবের হাতে accident হয় নাই, বা চৌরঙ্গির পথে তিনি পুলিস সারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। আর যে দিনটি রণবীর তাঁহার পাশে ছিল না—ঠিক সেই দিনই কিনা বাড়ীর রাস্তার মোড়ে একটি লোক তাঁহার মোটরে চাপা পড়িয়া গেল!

মেম-সাহেবের চাকর-মহলে বড় একটা সুনাম ছিল না। তিনি নাকি অন্যকে ন্যায্য আহার্য্য সঞ্চিতেও বঞ্চিত করিতেন, আর নিজে—পানাপানেও দোষ জ্ঞান করিতেন না। পান অর্থেই বা তাহাদের অভিধানে কি লেখে, আর অপান অর্থেই বা তাহারা কি ইঙ্গিত করিত সে কথাটা মেমসাহেবের লবণভোগী দলেরা স্পষ্ট করিয়া কখনো বলে নাই। তবে ঘটনাচক্রে তাঁহার ধূমপান প্রীতির কথাটাই বাজাররাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

কোন একটি বিশেষ মেল-দিবসে মেমসাহেব সিগারেট-খণ্ড মুখে লইয়াই নাকি লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন; কখন্ বা কেমন করিয়া বহ্নি হইতে ভস্ম বা ভস্ম হইতে বহ্নিকণা নির্গত হইয়া কার্পেটখানি যে ধূমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। সহসা পায়ের দিকটা গরম বোধ হওয়ায় নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন এ শুধু ধূম নয় তাঁহার ঘাগরাপ্রান্তটি অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই যদি না রণবীর তৎক্ষণাৎ আসিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিত, তবে তাঁহার এই নবনী-কোমল সুমূর্ত্তির যে কিরূপ বিদগ্ধ বিকৃতরূপ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সাজসজ্জার সময় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই এই চিন্তায় বহুদিন ধরিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটা আতঙ্ক-শিহরণ উঠিত।

টিম বাবা তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। তাহার জন্মদিনে জু-গার্ডেনে ছেলের দল লইয়া তাঁহারা গিয়াছেন পিকনিক করিতে। কতকগুলি মানবশিশু বানরশিশু দেখিতে ছুটিয়াছে, কোন দল বা সর্প কুম্ভীরের আড্ডায়, কেহ কেহ বা বাঘ সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়াইয়া ডাক শুনিবার অভিপ্রায়ে নির্ভয়ে লাঠির খোঁচা দিতে উদ্যত; কিন্তু গর্জ্জন শুনিবামাত্র সভয়ে পিঞ্জরের নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছে। এক এক ছেলের দলের সহিত দু-একজন সাহেব মেম বা ভৃত্য।

কয়েকটি বালক নৌকা করিয়া হ্রদ-ভ্রমণ করিতেছিল; হালী স্বয়ং বাবা টিম। রণবীর এ দলের নেতা, তাহার ইচ্ছা ছিল সে নিজেই কাণ্ডারী হইয়া ছেলেগুলিকে কম্পানীর হ্রদ পার করে। কিন্তু টিম বাবা পিতামাতার একটি সন্তান—জেদ ধরিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকেও তিনি হার মানাইতে চান, রণবীর ত সামান্য ভৃত্য। সে বেচারা হাল ছাড়িয়া ম্লান মুখে তীরে আসিয়াই দাঁড়াইল, কিন্তু নিশ্চিন্তমনে নহে। হায় রে! যা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল; অল্পদূর না যাইতেই নৌকাখানি উল্টিয়া পড়িল। যদি না রণবীর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে ধরিয়া ধোবার কাপড়ের মত ছেলেগুলাকে তীরে আছড়াইয়া ফেলিত তবে এই আনন্দের দিনে একটা শোকাভিনয় কাণ্ড ঘটাও বিচিত্র ছিল না।

এইরূপে জলে স্থলে, কর্ণেল সাহেবের শ্রীমধুসূদন ছিলেন আর্দ্দালি রণবীর। তাই প্রভু আদর করিয়া এই উপকারী 'পেয়ারে'র চাকরের নাম দিয়াছিলেন ট্যালিসম্যান।

(২)

তিন বৎসরের ফার্লো লইয়া সাহেব যখন বিলাতযাত্রা করিলেন তখন রণবীর আর অন্য কাহারও চাকরী গ্রহণ করিল না। প্রয়োজনও ছিল না, সাহেবের অনুগ্রহে সে বেশ দু পয়সা সংস্থান করিয়া লইয়াছিল। দেশে জমীজিরাৎ দুদশবিঘা যাহা ছিল তাহার চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া সে গৃহবাসী হইল। বিবাহ তাহার বাল্যকালেই হইয়াছিল।

রণবীর জাতিতে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত না হইলেও চলনসই লেখাপড়া জানিত, প্রত্যুৎপন্ন মতিও তাহার চমৎকার, পরের উপকারেও বিমুখ নহে, কাজেই গ্রামের মধ্যে সে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। চিঠিপত্র পড়াইতে, বিবাদে সালিসি মানিতে, মকদ্দমা মামলার পরামর্শ লইতে গ্রামের সকলেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে—এমন কি পাঁজিপুথি দেখাইতেও এখন বড় একটা কেহ গণকের নিকট যায় না।

গ্রামখানির নাম বামনিয়া, ব্রাহ্মণ-স্থান বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। নিজের এই ক্ষুদ্র বাসভূমিতে, গ্রামের লোকের আদর সম্মান এবং স্ত্রীপুত্রের প্রীতিযত্নের মধ্যে রণবীরের জীবন বেশ সুখেই কাটিতেছিল, এমন সময় ১৩১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইয়োরোপে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিল।

আশ্বিন মাস, আকাশে বাতাসে, বনে উপবনে দিগ্‌দিগন্তে শরতের প্রভাব—শরতের শোভা। আকাশে ঘননীলিমার ছটা, শস্যশীর্ষ ক্ষেত্রে, তরুঘন-বনপ্রান্তে, তৃণময় শুষ্ক প্রান্তরে স্তবকে স্তবকে, স্তরে স্তরে শুভ্রশ্বেত কাশপুষ্পের ঘটা!—প্রভাতে সন্ধ্যায় শেফালি পুষ্পের মধুর গন্ধ এই বর্ণলালিত্যের প্রাণে কি মোহ-উন্মাদনা জাগাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে কাহার অভিসার উদ্দেশে গমন করে—কে জানে?

এবার ক্ষেত্রের অবস্থা বড় ভাল, কৃষক পরিবারের আনন্দের সীমা নাই। সমস্ত ধান্য-ক্ষেত্রই প্রায় পীতশ্যামল, মাসখানেকের মধ্যেই হৈমন্তিক শস্য কাটিবার সময় আসিবে, এখন হইতেই তাহার আয়োজন চলিতেছে।

রণবীর ক্ষেত্র-কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া

অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিতেছিল। রবির আলো অস্ত যাইতেই পশ্চিমগগনে শুকতারা হাসিয়া উঠিয়াছে, মধ্যগগনে নবমীর চন্দ্রকলা ভাসমান, গ্রীষ্মের পর প্রথম শীতের বায়ুপ্রবাহ নবীন বসন্তের মতই সুখসঞ্চার করিয়া ফিরিতেছে।

আকাশের সেই স্নিগ্ধ আলো, ক্ষেত্রের সেই শ্যামল শোভা, বাতাসের সেই চঞ্চল পুলক রণবীরকে কি এক যেন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে অভিভূত করিয়া তুলিল। অতি সুখের বিহ্বলতায় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে ক্ষণকাল উর্দ্ধমুখ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এই চিত্রবিচিত্রা ধরণী যাঁহার শোভা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যাঁহার মহিমা, এই সুখদুঃখভোগী জীব যাঁহার সৃজন, ক্ষুদ্র মনুষ্যের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত অগম্য সেই বিশ্বপতি পরমকারণের উদ্দেশে সে পরিপূর্ণ প্রাণে বারবার নমস্কার করিয়া পুনরায় গৃহাভিমুখী হইল।

রণবীরের পত্রছায়িত মৃন্ময় গৃহে গোময়-লেপিত সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পাথরের একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির। গ্রামে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই পত্নী পার্ব্বতী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া স্বামীর অপেক্ষা করিতেছিল। রণবীর আসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া জয় মহাদেব জয় জয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিয়া দিতেই, সীতা সতী রুক্মিণী ভবানী প্রভৃতি আরও কয়েক জন স্ত্রীলোক দুই চারিটি বালকবালিকা সহ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে কেহ বা রণবীরের আশ্রিতা,—কেহ বা অল্পদিনের জন্য আত্মীয়-ভবনে আসিয়াছে, কেহ বা পাড়া প্রতিবাসী, একঘণ্টার জন্য দেখা শুনা করিতে আসিয়া সারাবেলাটা এইখানেই কাটাইয়া আরতির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তৎপূর্ব্বে বারবেলায় কি দ্বারের বার হইতে আছে? এতক্ষণ ইহাদের গানের ধূম লাগিয়াছিল রান্নাঘরের রোয়াকে। সেখানে দুই জনের হাতের ঘূর্ণায়মান চাকির সঙ্গ লয়ে সমবেত সকলের সম্মিলিত কণ্ঠতান এতক্ষণ বেশ সমজোরেই ঘুরপাক খাইতেছিল। তাহারা আসিলে সকলে মিলিয়া দীপারতি শেষ করিয়া দেব প্রণাম করিবার পর যে যাহার স্থলে গমন করিল।

পার্ব্বতী সাধারণ হিন্দুকন্যার ন্যায় সুগৃহিণী এবং নিষ্ঠাবতী পত্নী। পূজা শেষে স্বামীর পা ধুয়াইয়া দিয়া, তাহাকে খড়ম পরাইয়া সে গেল চা আনিতে। চা পানটা অনেক দিন হইতেই রণবীরের এমন অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে যে ভাত রুটি না পাইলেও বরঞ্চ একদিন চলে কিন্তু সকালে সন্ধ্যায় চা টুক্ না পাইলে প্রাণটা তার ঠোঁটের আগায় আসিয়া জমে।

রণবীর ততক্ষণ মাদুরপাটির উপর তৈলদীপের সম্মুখে বসিয়া পকেট হইতে একখানি হিন্দুস্থান কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুপরে স্ত্রী আসিয়া মস্ত একবাটী নাতিউষ্ণ চা তাহার সম্মুখে ধরিতেই কাগজখানা একবার নীচে রাখিয়া দুইহাতে চাপাত্র ধরিয়া এক নিশ্বাসে সমস্তটা নিঃশেষ পূর্ব্বক বাটীটা পার্ব্বতীর হাতে দিয়া পুনরায় পাঠে প্রবৃত্ত হইল।

পার্ব্বতী তখন ক্ষুদ্র একটী আলবোলা রণবীরের নিকটে রাখিয়া বসিল তাম্রাক

সাজিতে। রোয়াকের একপাশে ছোট একটি কড়ায় গুলের আগুন প্রস্তুত ছিল, সেইখানে বসিয়া সে টিকা ধরাইয়া তাহা কলিকার তামাকের উপর রাখিয়া ফুঁক পাড়িতে লাগিল। সে ফুঁক কৌশলে তামাক একদণ্ডও স্থির থাকিতে না পারিয়া অচিরাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তখন আলবোলার মাথার উপরে তাহাকে স্থানদান করিয়া নলটা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিবামাত্র, কাগজ পড়িতে পড়িতেই তিনি তাহাতে টান সুরু করিয়া দিলেন। তাহার শিশুপুত্র কিষণদাস আজ বাহিরের ছেলেদের সহিত সমস্ত তুপর বেলাটা মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়া ঠিক সন্ধ্যাবেলাতেই রোয়াকের একখানা খাটিয়াতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; আলবোলার শব্দে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে লাফাইয়া নীচে নামিয়া পিঠের দিক হইতে আসিয়া রণবীরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিল, "বাবুজি, পিতাজি"!

পিতা কিন্তু আজ এমন পাঠনিমগ্ন যে পুত্রের আদরের বিনিময়ে তাহার প্রতিদিনের ন্যায্য পাওনাটা পর্য্যন্ত তাহাকে দিতে ভুলিয়া গেলেন, এমন কি হাসিয়া তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

রণবীর পড়িতেছিল, একবিংশ পঞ্জাবী রেজিমেণ্টের নায়ক হইয়া কর্ণেল টড সাহেব ফ্রান্সে লড়াই করিতে যাইতেছেন। সমস্ত পঞ্জাবে সেজন্য নবসৈন্য সংগ্রহ চলিয়াছে। এই গ্রামে সৈন্য ভর্ত্তি হইবার শেষ দিন আগামী কল্য। এই সংবাদেই তাহাকে এতদূর বিমনা করিয়াছে। টড সাহেবের সঙ্গে সে যদি না থাকে তবে তাঁহাকে রক্ষা করিবে কে? সে যে তাঁহার ট্যালিসম্যান—রক্ষাকবচ! আর তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে ইংলণ্ডেরও ত সমূহ ক্ষতি। সে জানে তাহার কর্ণেল সাহেবই ইংলণ্ডের একটি মাত্র সেনাপতি যাঁহার জীবন মৃত্যুর উপর সমগ্র রাজ্যেরই জয়পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

রণবীরের মন তুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল। "কি করিবে সে? যাইবে না থাকিবে? কি তাহার কর্ত্তব্য?"

খোকা আরো তুএকবার পিতাজি—বাবুজি—বলিয়া ডাকিল, কিন্তু উপেক্ষিত হইয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রণবীর তখন কাগজখানা আছড়াইয়া নীচে ফেলিয়া শিশুকে বুকে টানিয়া লইয়া বারবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, তু একবিন্দু অশ্রুজল শিশুর মুখে পতিত হইল।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল—"লড়াই কা ক্যা খবর পতিজি?"

মুখ নত করিয়াই রণবীর উত্তর করিল "কুছ নেহি, কুছ নেহি।"

(৩)

"আরে ভাইজি রণবীর ডেরামে হো।"

তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা মহাবীর এইরূপে হাঁকিয়া পরদিন প্রায় বেলা দ্বিপ্রহরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন অসময়ে এত প্রখর রৌদ্রে, বাড়ীতে আরাম করিয়া নিদ্রা যাইবার পরিবর্ত্তে গ্রামের ডাকসাইটে অলস মহাবীরের এখন এখানে আসিবার অবশ্যই একটু নিগূঢ় কারণ ছিল। কারণটা এই,

তাহার গর্ভবতী পত্নীর মূর্চ্ছা হইতেছে, পাঁচজনে বলিতেছে ঝাড়ফুঁক কর। রণবীর যদি এ কার্য্যের ভারটা লয় তাহা হইলে আর অন্য ওঝার সন্ধানে যাইতে হয় না। তাহার মাথার একটা বোঝা নামে।

পার্ব্বতী এতক্ষণ উঠানের ছায়ার ধারটাতে বসিয়া বিচালি কাটিতেছিল, কাজটা শেষ করিয়া সবে মাত্র বঁটিখানা রোয়াকের গায়ে ঠেসাইয়া কাটা বিচালির রাশি থলির মধ্যে ভরিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কৃষাণ গরু লইয়া আসিয়াই যাহাতে জাব দিতে বিলম্ব না হয়, এমন সময় মহাবীরের আবির্ভাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "ঘরমে ত নেহি হ্যায়, ভাইজি, খবর ক্যা হো?"

খবর যে বড় ভাল নয়, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিয়া ক্ষুণ্ণহৃদয়ে সে অন্য ওঝার তল্লাসে চলিয়া গেল; কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল রণবীর আসিলেই তাহাকে যেন পার্ব্বতী পাঠাইয়া দেয়। ঝাড়ফুঁক না করিলেও সে সময়টা সেখানে তাহার উপস্থিত থাকাটা চাইই চাই।

পার্ব্বতী খবরটাতে বড় দুঃখিত ও চিন্তিত হইল। কাজকর্ম্ম শেষে সন্ধ্যাবেলাটা সেখানেই কাটাইবে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিচালি গুলা থলি বোঝাই করিয়া লইল; তাহার পর উঠানটি একবার পরিষ্কাররূপে ঝাঁটাইয়া শয়নগৃহের দিকে যাত্রা করিল। আজ বাড়ীর আর সকলেই কিষণদাসকে লইয়া শিবনারায়ণের কথা শুনিতে পার্ব্বতীর ভ্রাতৃ-ভবনে গিয়াছে। ভ্রাতা স্বয়ং আসিয়া তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কাজকর্ম্ম দেখিবার ছুতায় পার্ব্বতী কেবল যায় নাই, আসল কথা সে গেলে রণবীরের অসুবিধা হইবে যে। কিন্তু ভাইয়ের কাছে পার্ব্বতী কথা লইয়া ছাড়িয়াছে যে তিনি আজই কিষণ দাসকে আবার নিজে রাখিয়া যাইবেন। সে একটি রাতও ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না যে।

তখনো অনেকটা বেলা ছিল; কিষণ দাসের অভাবে আশ্বিনের বেলাও পার্ব্বতীর আষাঢ়ের বেলার ন্যায় সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল। কাজকর্ম্মেও কেমন মন লাগিতে ছিল না। কিষণদাস ঘরে থাকিলে সমস্ত বাড়ীটা গুলজার করিয়া রাখে, ছোটে, খেলা করে, দোলনায় দোলে, আর মায়ের সকল কর্ম্মের সহযোগী হইতে গিয়া প্রতিকর্ম্মে বাধা দেয়—তবুও সকল কর্ম্ম কত সহজে কত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়। আজ তাহার মা বেলায় বেলায় বিছানাপত্র ঠিক করিয়া লইয়া বেলায় বেলায় রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। উনুনে আগুন দিয়া সন্ধ্যার তরকারীটা কুটিয়া লইয়া রুটির ব্যঞ্জনটা প্রস্তুত করিয়া রাখিল, স্বামী আসিলে শুধু গরম গরম রুটি কয় খানা তৈয়ার করিয়া দিয়া তাঁহার আহারের পর দুজনে মহাবীরের স্ত্রীকে দেখিতে যাইবে। তরকারীটা নামাইয়া চায়ের জলটা উনুনে চড়াইয়া সে বাসনগুলা কূয়ার তলায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় দরজায় উঁকি মারিল নিহিল সিং, রণবীরের গ্রামবন্ধু। তাহার ছোট ভাইটির বরাত প্রেরণ উপলক্ষে সপরিবার রণবীরকে সে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। তাহারা কাল না যাইলে এ

কাজটা যে সুসিদ্ধ হইতেই পারে না, ভাবে ইঙ্গিতে, বাক্যে ভাষ্যে, তর্ক যুক্তিতে নানারূপে ইহা সপ্রমাণ করিয়া, রণবীরসহ পার্ব্বতী নিশ্চয়ই কাল সেখানে যাইবে, পার্ব্বতীর নিকট হইতে এই কথা লইয়া তবে শুভ গোধুলি লগ্নে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গোয়ালে তখন গরুগুলির হাম্বারব শুনিয়া পার্ব্বতী সেখানে গিয়া প্রত্যেক গরু বাছুরের নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিল; প্রতি গামলায় জাব ঠিক মত পড়িয়াছে কিনা দেখিল, দু একটা গামলা খালি রাখিয়া কৃষাণ জল আনিতে গিয়াছিল, কৃষাণ আসিতে না আসিতে পার্ব্বতী ভূষি বিচালি প্রভৃতি গামলায় ঢালিয়া ঠিক করিয়া রাখিল। তাহার পর গোশালে ধূঁয়া দিয়া দীপ হস্তে যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল তখন গ্রামে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার যে এখানে আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে সে বুঝিতেই পারে নাই। আকাশে চাহিয়া দেখিল, দিনের আলো একেবারেই নিবিয়া গিয়াছে; ঠিক মাথার উপরে সুনীল আকাশে মস্ত চাঁদখানা হাসিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে আলোকে তাহার হাতের দীপ একান্ত ম্রিয়মান।

এত দেরী হইয়াছে এখনো আজ রণবীরের দেখা নাই! আরতির যে বিলম্ব হইয়া যায়!

একেই ছেলেটা কাছে নাই বলিয়া মনটা খারাপ আছে; মহাবীরের পত্নীর খবরেও মনের উপর একটা চাপ পড়িয়াছে—এ সময় স্বামীকে অনাগত দেখিয়া কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা, অকারণ আকুলতা তাহার মনের মধ্যে যেন চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে কিনা একটা টিকটিকি গৃহকোণে টিক টিক করিয়া উঠিল! একটা বাদুড় পাখনার ঝাপটা দিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল! ইহা অলক্ষণ বা সুলক্ষণ! কি জানাইতে চাহে ইহারা?

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য দিবার আজ তাহার সময় নাই! সন্ধ্যা যে বহিয়া যায়। কষ্ট দুঃখ আশঙ্কা মনে চাপিয়া লইয়া একাকী সে সন্ধ্যারতি সমাপন করিল; রণবীর চাকরী ছাড়িয়া গৃহে আসিবার পর আজি এই প্রথম এ সময়ে সে ঘরে নাই। আরতির শেষে স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনায় একান্ত প্রাণে দেব প্রণাম করিয়া উঠিয়া আবার সে দরজার দিকে চাহিল। দূরে যেন নাগ্‌রা জুতার শব্দ শুনিল; শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল এতক্ষণে রণবীর আসিতেছেন। দরজা ভেজান ছিল আগন্তুকের হস্তস্পর্শে খুলিয়া গেল—কিন্তু উঠানে প্রবেশ করিল কে? রণবীর নহে; তাহার দেবরপুত্র রণজিৎ। নৈরাশ্যের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা খবর বেটা?"

ধীর কণ্ঠে রণজিৎ কহিল "পলটন চলা গিয়া।"

"যানে দেও বেটা! সরকারজিকা জয় জয়কার!"

"কাকাজি বি গিয়া।"

"কাঁহা?"

"পলটন্‌ কা সাৎ।"

"পল্টন কা সাৎ? কাঁহেরে?"

"লড়নেকো!"

"লড়নেকো! হমারা বেটাকো পিতাহীন করকে গিয়া! হা ভগবানজি!

এই বলিয়া মর্ম্মভেদী আকুল ক্রন্দনে ভূমিতলে সে লুটাইয়া পড়িল।

(৪)

ভারতসৈন্য ফ্রান্সে পৌঁছিয়া যেরূপ অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল তাহাতে যে মাথাগুলা তাহাদের পায়ের দিকে লুটাইয়া পড়ে নাই ইহাই আশ্চর্য্য। সংবাদপত্রে সে সময় ইহার যে বিশদ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে,—ফ্রান্সের নরনারী সিপাহী সৈনিকের উপর কেবল জয়ধ্বনি এবং ফুল বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অনেক প্রবীণা—এমন কি অনেক নবীনাও চুম্বন-আশীর্ব্বাদে তাহাদিগকে সমাদৃত করিয়া লইয়াছিল। উজ্জলকান্তি সুরূপ সুপুরুষ রণবীর প্রমুখদলের উপর যে এইরূপ সম্মান অতি মাত্রায় বর্ষিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। লজ্জাবতী স্ত্রীলোকের মতই এই আদর-ভারে রণবীর মুহ্যমান কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত আনন্দ উল্লাসের মধ্যে যখন সিপাহীর দল গম্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহাদের হর্ষহাসি "ট্রেঞ্চে"র অন্ধকারের মধ্যেই বিলীন হইয়া পড়িল।

যুদ্ধ কোথায়? যুদ্ধ কাহার সঙ্গে? কোথা হইতে গোলা গুলি পড়ে, কাহার উদ্দেশে কামান ছোটে? রণতূর্য্যই বা বাজায় কে? যুদ্ধের আহ্বান ইঙ্গিত কোথা হইতে ভাসিয়া আসে? সেনানায়কই বা কে তাহাদের?

রণবীর টড সাহেবের রেজিমেণ্টের সৈনিক কিন্তু এপর্য্যন্ত মুখামুখি ভাবে একটি দিনের জন্যও সে তাঁহার দেখা পায় নাই। এ কিরূপ দানব যুদ্ধ?

তবুও তাহাদের এ যুদ্ধে অভ্যস্ত হইতে খুব যে বেশী দিন লাগিয়াছিল তাহাও নহে। বলিতে গেলে যুদ্ধারম্ভেই তাহারা সুনাম অর্জ্জন করে। ভারতসৈন্য ইয়োরোপ পৌঁছে শীতের প্রারম্ভ কালে—অক্টোবরের প্রথমদিকে। মাসান্তেই ৩১শে অক্টোবরের যুদ্ধে সিপাহী গোলন্দাজ খুদদাদ এই সমরাগ্নি পরীক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ ভি সি উপাধি লাভ করিল। যখন তাহার দলের সকলেই নিহত আহত, একটি কেহ আর তাহার সহায় সম্বল নাই, তখনও চতুর্দ্দিকের সেই মৃত্যুবেষ্টনের মধ্যে একাকী বসিয়া দ্বিতীয় "কাশিবিয়ানকা" খুদদাদ অকুতোভয়ে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল—এক মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কামান ত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

কামানের প্রাণান্ত ধ্বনির মধ্যেও ১৩১৪ সাল নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছে। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। জর্ম্মানরা এখন কোথায়? যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহারা বেলজিয়ম ছারখার বিধ্বস্ত করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু একান্ত ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্বেও প্যারিসের ফটকে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নগরীর প্রায় ৬০ মাইল দূরে আইন নদীর ধারে আটকা পড়িয়া গিয়াছে।

মিত্রদল ছোটখাট যুদ্ধে তাহাদের হটাইয়া মাত্র রাখিয়া জর্ম্মাণ-নিপাত-যজ্ঞের আয়োজনে আপনাদিগের সর্ব্বশক্তি প্রায় ব্যাপৃত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। যুদ্ধারম্ভের প্রায় ৮ মাস পরে ২২শে মার্চ্চে মুভে-স্যাপলে যে যুদ্ধ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই ইংরাজের প্রথম জর্ম্মাণ আক্রমণ। এই আক্রমণে সিপাহীগণ যেরূপ অসম সাহস এবং অপূর্ব্ব পরাক্রম দেখাইয়াছিল তাহা ইতিহাসের চিরকীর্ত্তি। সিপাহী গণবীর সিং (গোবর সিং) এই যুদ্ধে V. C. উপাধির অধিকারী হন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ইহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই, সম্রাট এই সম্মান দ্বারা মৃতবীরের স্মৃতি ভূষিত করিয়াছিলেন।

অনুজ্ঞা পাইবা মাত্র এই মহাবীর বায়নেট হস্তে কতিপয় মাত্র সহচর অনুচর সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে জর্ম্মাণদিগের সর্ব্বপ্রধান (main) ট্রেঞ্চে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার প্রত্যেক বিভাগ এমন অসীম বলে ও কৌশলে আক্রমণ করেন যে শত্রুগণ অচিরাৎ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। যে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যের সহায়তায় গণবীর জর্ম্মাণদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, রণবীর তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

ইহার পর ষাট পাহাড়ের (Hill 60) যুদ্ধ। আমাদের এই ক্ষুদ্রগল্পের নায়ক রণবীরের ভাগ্য ইহারই সহিত বিশেষরূপে জড়িত।

(৫)

ওয়াইজার (Yzer) নদীর ধারে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষই নিজ নিজ কোটর-সদনে (trench) থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। জর্ম্মাণেরা প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, মিত্রদল হটাইয়া দিতেছেন। যদি কোন একটা অশুভ মুহূর্ত্তে শত্রুদল পার্শ্বের উচ্চস্থান Hill 60 অধিকার করে তবে তাঁহাদের সমূহ বিপদ, আর তাঁহারা যদি পূর্ব্ব হইতেই ইহা লইতে পারেন তবে তাঁহাদের সংস্থিতি (Position) অনেকটা নিরাপদ। এই অধিকারের চেষ্টায় কোন পক্ষেরই ছল বল কৌশলের ত্রুটি নাই।

ব্যোমযান উপরে উঠিয়া সৈন্যাবাসের সংবাদ লইতেছে, কামানসংস্থান লক্ষ্য করিতেছে। শত্রুদল মিত্রবেশ ধরিয়া ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে! মিত্রদল বনের মধ্যে লুকাইয়া অগ্রগামী। গ্রামপথে যুদ্ধ-ক্ষেত্র সহসা রাতারাতি বনে পরিণত হইতেছে। বিস্ফোটকপূর্ণ সুরঙ্গ প্রস্তুত হইতেছে। বারুদ-বিদীর্ণ ধরাতলে লুকাইয়া শত্রুর কাছে থাকিয়াও একপক্ষে আত্মরক্ষা সহজ হইবে, অন্যপক্ষে এই সুরঙ্গ পথে শত্রুর ট্রেঞ্চে অগ্নি দিতে পারিলে ত মহা মঙ্গল।

কত রকমের কামান, উভয়পক্ষের ট্রেঞ্চের স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে রক্ষিত। ইহার মধ্যে জর্ম্মানের হাউইটজার (howitzer) কামানই ধ্বংসসাধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার গোলা গুলি সঙ্কীর্ণ ট্রেঞ্চের মুখেও আসিয়া পড়ে, অন্য কামানের দ্বারা একার্য্য সাধিত হয় না। অথচ এই নিশ্চিত মৃত্যুও ব্যর্থ করিয়া কৌশলী সেনাদল অগ্রসর হইতেছে।

উভয়ের ট্রেঞ্চ-বাসভূমি সম্মুখাসম্মুখী, এত কাছাকাছি যে কোন কোন অংশ হয়ত বা ৫০ হাতও দূরে নয়। ট্রেঞ্চে লুকাইয়া বসিয়া অনুমানে অথচ অঙ্ক গণনার মত অব্যর্থ

সন্ধানে পরস্পরের আবাসের উদ্দেশে গোলাগুলি চলে। ট্রেঞ্চের পরিখায় বালির স্তূপ, ট্রেঞ্চের বাহিরে জালের বেষ্টন, তাহা ভেদ করিয়া শত্রুর অধিকারে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে।

তিনজন সৈনিক একটা সুরঙ্গ প্রস্তুত করিতেছিল। একজন ইংরাজ, একজন ফ্রেঞ্চ, একজন হিন্দুসিপাহী। তিনজনের অবস্থা অনেকটা একই রকম। ঘরে মরাইভরা শস্য, সুন্দরী স্ত্রী, নয়নমনোহারী শিশু। এমন সুখের গৃহবাস ছাড়িয়া তিন-জনেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতে আসিয়াছে। এখানে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ণের বা জাতির ভেদাভেদ নাই; তিনজনেই ইহারা অকৃত্রিম বন্ধু। রণবীরের প্রতি ইহাদের পরম শ্রদ্ধা, অসীম বিশ্বাস। ইহার প্রত্যুৎপন্নমতি, রণকুশ-লতা কত বার তাহাদিগকে আসন্ন মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কাজ করিতে করিতে ইহারা নীরব নির্ব্বাক ছিলনা। ফ্রেঞ্চ বলিতেছিল, গৃহের এত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া সে যে এখানে আসিয়াছে, তাহার কারণ তাহার দেশ, to sauver sa Patrie, la France, ইংরাজ বলিল, আর তাহার আসিবার কারণ, তাহার জাতি to save his Nation; এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর তাহাদের জাতীয় মান সম্মান প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। এই বলিয়া উভয়েই চাহিল তাহার হিন্দুসহযোগীর প্রতি। মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিল না কিন্তু ফরাসী সৈনিকের নীরব নয়নের প্রশ্ন রণবীরের কর্ণে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইল, "তুমি কেন আসিয়াছ? Pour quoi etes vous venu?" সে উত্তর কি দিবে এ প্রশ্নের? সত্যই ত সে কেন আসিয়াছে? তাহার দেশের জন্যও আসে নাই জাতির জন্যও নহে। সৈনিক কর্ত্তব্যপালনেও সে আসে নাই, কেননা সে, সৈনিক ছিলনা। তাহার কর্ত্তব্য ছিল স্ত্রীপুত্রপালন। তাহা অবহেলা করিয়াই সে আসিয়াছে, কি উত্তর দিবে তবে সে? সে উত্তর দিতে যাইতে-ছিল—"জানিনা কেন আসিয়াছি, প্রাণ দিতে আসিয়াছি শুধু এইটুকু জানি।"

কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, ভেরী বাজিল, ইহাই রণসজ্জার ইঙ্গিত। তিনজনে উঠিয়া ত্রস্ত গতিতে সৈন্যের সারিতে আসিয়া সারি দিঁয়া দাড়াইল।

অবিরাম গোলানিক্ষেপে শত্রুপক্ষ পর-স্পরকে সাদর বন্দনা জানাইল অর্থাৎ Bombardment আরম্ভ হইল।

(৬)

অনবরত গোলাগুলি পড়িতেছে, এক-স্থানে গোলা পড়িয়া সহস্রখণ্ডে ঠিকরিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, বিষাক্ত গ্যাসে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতেছে, জ্বলন্ত তৈল দ্রাবের পিচকিরি ছুটিয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, তবুও এই অসীম যন্ত্রণায় লক্ষ্যপাত না করিয়া অনুজ্ঞা পাইবামাত্র অকু-তোভয়ে সিপাহীর দল সম্মুখীন হইয়া সর্ব্ব প্রথমে বায়নেট উঠাইয়া শত্রুর দিকে ধাবিত হইল, ইহাকেই বলে বায়নেট charge। দলে দলে হতাহত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, দলে দলে পশ্চাতের সৈন্য তাহার স্থান পূরণ করিতে লাগিল। কিন্তু জর্ম্মাণ

হাউইটজার কামানের গোলায় অল্পক্ষণে লৌহপ্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়া যায়, মনুষ্য-প্রাচীর আর কতক্ষণ টিঁকিবে। এই মহাবিপদে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়, যদি ব্যাটারি নিস্তব্ধ করিতে পারা যায়। ব্যোমযান কিছু পূর্ব্বে জর্ম্মাণ ব্যাটারির সংস্থান কোথায় তাহার সংবাদ দিয়াছে। একবিংশ পঞ্জাব রেজিমেন্টের সেনাপতি আগুয়ান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তোমরা আমার সৈনিকেরা এই সাহসের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবে? শত্রু নিধন করিয়া জয় সম্মানের অধিকারী হইবে, এস, অগ্রসর হইয়া দাঁড়াও। কে তোমরা আমাদের রক্ষা করিয়া, ইংরাজ ফ্রেঞ্চ মিত্র-মণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিবে, এস, দাঁড়াও,—আমার বীর সৈনিকেরা, আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হও।"

প্রত্যেক দলের সেনানায়ক আপন আপন সৈন্যদলকে এইরূপে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দল হইতে দুইচারিজন সাহসী পুরুষ আসিয়া তাহাদের সেনানায়কের সম্মুখীন হইল। রণবীর আসিয়া দাঁড়াইল সর্ব্বাগ্রে। তাহার সেনাপতির সহিত, প্রভু টড সাহেবের সহিত মাঝে মাঝে ইতিপূর্ব্বে তাহার কয়েকবার দেখা হইয়াছে, কুচ করিবার সময়, রণে প্রবৃত্ত হইবার সময় সৈনিকশ্রেণীতে দাঁড়াইয়া কতবার সে তাঁহার দিকে চাহিয়া নীরবে অভিবাদন জানাইয়াছে, কিন্তু এত নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের আহ্বান-বাণী সে ইতিপূর্ব্বে আর শুনে নাই।

রণবীর অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই কর্ণেল সাহেবও তাহাকে যেন এই প্রথম চিনিতে পারিলেন, উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন,—"তুমি ট্যালিসম্যান! আমার brave follower, তুমি আছ এ-যুদ্ধে, আমার কোন ভয় নাই, আমাদের নিশ্চয় জয়।"

এক অপূর্ব্ব আনন্দে রণবীরের মনো-প্রাণ সহসা পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেহ অপরিমিত দৈববলে যেন বলীয়ান বোধ হইতে লাগিল। জয়-সম্মানে ভূষিত হইলে কি ইহার অধিক আনন্দ, ইহার অধিক আত্ম-প্রসাদ সে লাভ করিবে? রণবীর তাঁহার সাদর বাক্যের উত্তরে নীরব প্রফুল্ল হাস্যে পুনরায় সাহেবকে অভিবাদন করিল, ইহাই তাহার অন্তরের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

(৭)

অসাধ্য সাধিত হইয়াছে, গোলন্দাজগণ নিহত, বন্দী; ব্যাটারি নীরব। কিন্তু যাহারা একার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈনিকই জীবিত, আর কেহই প্রায় অনাহত নাই।

রণবীর যখন শেষ গোলন্দাজকে হত করিয়া রক্তাক্ত বায়নেট তাহার বক্ষ হইতে খুলিয়া লইল, তখন সহসা অস্ত্রখানা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। তুলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল তাহাতে সে অক্ষম, স্কন্ধমূল হইতে বাহুমূলে অসীম বেদনা, বস্ত্র বর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছে। তবুও বামহস্তে বায়নেট উঠাইয়া সে ধীর পদে অগ্রসর হইল। দুঃসাহসী বাহকদল ইতিমধ্যেই রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া নিহত, সংজ্ঞাহীন এবং চলৎশক্তি-

রহিত আহতদিগকে শিবিকার মধ্যে উঠাইয়া লইয়াছে, রণবীর তাহাদের পাশে পাশে চলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, শিবিকা দ্রুত চলিয়া গেল।

তখন মধ্যাহ্ন, কিন্তু সূর্য্য কোথায় কোন্ গগনে লুকাইয়া আছেন কিছুই বুঝা যায় না। আকাশ মেঘে ঘোলা, রাস্তা জলে কাদা, রাত্রি হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তাহার বিরাম যে কখন হইবে বা কবে,—কেহ বলিতে পারে না। জর্ম্মাণরা এ যাত্রা পরাজিত; ট্রেঞ্চও দূরে নয়; তবুও পথ নিরাপদ নহে, যে কোন মুহূর্ত্তে একজন জর্ম্মাণ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বায়নেট বিদ্ধ করিতে পারে, দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতেও পারে। সে এখন অক্ষম,—ছুটিয়া পলাইতে পারিবে না বা যুদ্ধ করিতে পারিবে না। রণবীর কৌশলে বন-পথে পড়িয়া কিছুক্ষণ একটা বৃক্ষতলে বসিল। আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেশের উজ্জ্বল সূর্য্যের মূর্ত্তি কল্পনা করিল। আর কি কখনো নিজের দেশের সেই মেঘশূন্য সূর্য্যচন্দ্র বিভাসিত নীলাম্বর সে দেখিবে? আর তাহার সেই সাধ্বী পত্নী—প্রাণাধিক পুত্র—কোথায় পড়িয়া রহিল তাহারা? একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্রেঞ্চে পৌছান চাই।

প্রায় তাহাদের ট্রেঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এই সময় এ কি দৃশ্য! একপদহীন টড সাহেব কোনরূপে আপনাকে বনমধ্যে টানিয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছেন,—এখান হইতে কেমন করিয়া কি উপায়ে এখন ট্রেঞ্চে যাইবেন? তাঁহার দলের লোক কেহ ত তাঁহার সন্ধান জানে না। সহসা রণবীরকে দেখিয়া তিনি বিস্ময় আনন্দে অবাক হইয়া গেলেন। সত্যই যে সে তাঁহার ট্যালিসম্যান। রণবীরের ডান হস্তে বল নাই, তথাপি কি এক দৈবশক্তিতেই প্রণোদিত হইয়া সে যে এক হস্তের সাহায্যেই তাঁহাকে পিঠে চাপাইয়া লইয়া গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিষাক্ত গ্যাসে ফুসফুস এখনো পরিপূর্ণ—কষ্টে সে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছিল, দ্রাবানলে গণ্ডদেশের কিয়দংশ বিদগ্ধ বিকৃত, বাহুমূল হইতে রক্তধারা প্রবাহিত কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা তাহার মনেও পড়িতেছে না, তাহার একমাত্র ভাবনা, সে যদি টড সাহেবকে লইয়া হাসপাতালে পৌছিতে না পারে।

কিন্তু পৌছিল—সে পৌছিল। হাস-পাতালের পাদদেশে আসিবা মাত্র, সেবকের দল যখন তাহার পৃষ্ঠ হইতে টড সাহেবকে নামাইয়া লইল তখনই সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল; তাহার আগে নহে। টড সাহেব ভিতরে যাইবার পূর্ব্বে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতায় দুইহাতে তাহার হাত ধরিলেন। রণবীরের কর্ত্তব্য সমাধা হইয়াছে, তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া সংসারনির্লিপ্ত সেই হিন্দু বীর, ভগবদ্‌গীতার আদর্শ কর্ত্তব্যসাধক—আনন্দের হাসি হাসিয়া তখনি প্রাণত্যাগ করিল।

* * * *

কর্ণেল টড সাহেব আরোগ্য লাভ করিয়া ভি সি সম্মানে ভূষিত হইলেন। সম্রাট যখন স্বহস্তে এই ক্রস্ অলঙ্কার তাঁহার বক্ষে পরাইয়া দিলেন, তখন সাহেবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

অন্ধকূপহত্যা

সে অনেক দিনের কথা,—প্রায় কুড়ি বৎসরের কথা। তখন "সাধনা" বন্ধ হইয়া গেলে, সিরাজদ্দৌলা-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মাসে মাসে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইত। যে মাসে অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীর সমালোচনা প্রকাশিত হইবার কথা, সেই মাসের লেখাটি ডাকঘরের গোলযোগে হারাইয়া যায়। নকল ছিল না; "ভারতী" প্রকাশিত হইবারও বড় বিলম্ব ছিল না। অগত্যা সে লেখাটিকে আবার তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইতে হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত "সিরাজদ্দৌলায়" তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে।

তখন অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী সম্বন্ধে তিনটি কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। (১) হলওয়েলের কাহিনীই অন্ধকূপহত্যার প্রধান কাহিনী,—সে কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন। (২) মিথ্যা হইলে কথাই নাই,—সত্য হইলেও, তাহার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে অপরাধী করা যায় না। (৩) উত্তরকালে অন্ধকূপহত্যার প্রতিহিংসাসাধনের জন্য পলাসীর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে যে কাহিনী স্থানলাভ করিয়াছে, সমসাময়িক কাগজপত্রে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যখন "ভারতী"তে এই লেখা বাহির হয়, তখন অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভটি বর্ত্তমান ছিল না;—১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাহা অপসারিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার কথাও লিখিতে হইয়াছিল।

তাহার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে,—অনেক তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হইয়াছে,—গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ও ব্যয়-বাহুল্যে তিনখণ্ড বৃহৎ পুস্তকে * সমসাময়িক কাগজপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, এবং লর্ড কর্জ্জনের বদান্যতায় অন্ধকূপহত্যার একটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্ম্মিত হইয়াছে।

এত কালের পর আবার অন্ধকূপহত্যা কাহিনীর সত্যমিথ্যার আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এবার শ্রীযুক্ত জে, এইচ, লিট্‌ল্ সাহেব ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া † জানাইয়া দিয়াছেন,—"অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী!"

ইহাতে আবার হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে অনেক সমালোচনা ও প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতেছে, এবং কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি একটি বিচার-সভায় ইহার আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া লিট্‌ল্ সাহেবকে ও তৎসঙ্গে আমাকেও আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই বিচারসভার ব্যবস্থা নূতন যুগের নূতন ব্যবস্থা,—ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের সরল পথ অবলম্বন করিবার লালসা-বিজ্ঞাপক প্রশংসনীয় ব্যবস্থা।

সিরাজদ্দৌলা শীর্ষক প্রবন্ধে "ভারতী"তে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে

* Hill's Bengal in 1756-57.

† Bengal Past and Present Vol, XI.

দুইটি কথা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। সিরাজদ্দৌলার অপরাধ ছিল না,—প্রতিহিংসা-সাধনের জন্যও পলাসীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই,—এই দুইটি কথা যে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রমাণ নূতন স্মৃতিস্তম্ভ। পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভে যে ফলক-লিপি সংযুক্ত ছিল, তাহাতে এই দুইটি কথা উল্লিখিত ছিল। নূতন স্মৃতিস্তম্ভে যে ফলক-লিপি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই দুইটি কথা স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

ইহা ইতিহাসের পক্ষে অল্প লাভ নয়। আরও একটি লাভের কথা এই যে, হলওয়েল পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভে যাঁহাদিগের অন্ধকূপে নিহত হইবার কথা ক্ষোদিত করাইয়া গিয়াছিলেন, নূতন স্মৃতিস্তম্ভ-রচনার সময়ে তথ্যানুসন্ধানে জানা গিয়াছে,—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্গজয়ের পূর্ব্বে বা সমসময়ে দুর্গরক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করেন,—তাঁহাদের পক্ষে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় ছিল না! সুতরাং হলওয়েলের মৃতের তালিকা যে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে, সে কথাও প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। হলওয়েল ঢাকার হত্যা-কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন,—তাহা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, সমসাময়িক ইংরাজ-দরবার তদন্ত করিয়া, সরকারী রিপোর্টে সে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন যাঁহারা অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাঁহারাও এক-বাক্যে বলিতেছেন,—"হল-ওয়েলের সকল কথা সত্য নহে।"

হলওয়েল

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান এইরূপে ক্রমে ক্রমে অন্ধকূপ-হত্যা-কাহিনীর বিরোধী নানা কথা স্বীকার করিবার পর, শ্রীযুক্ত লিট্‌ল্ সাহেব তাহাকে শেষ ধাক্কা দিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত হইবার যোগ্য হইলেও কেহ এ
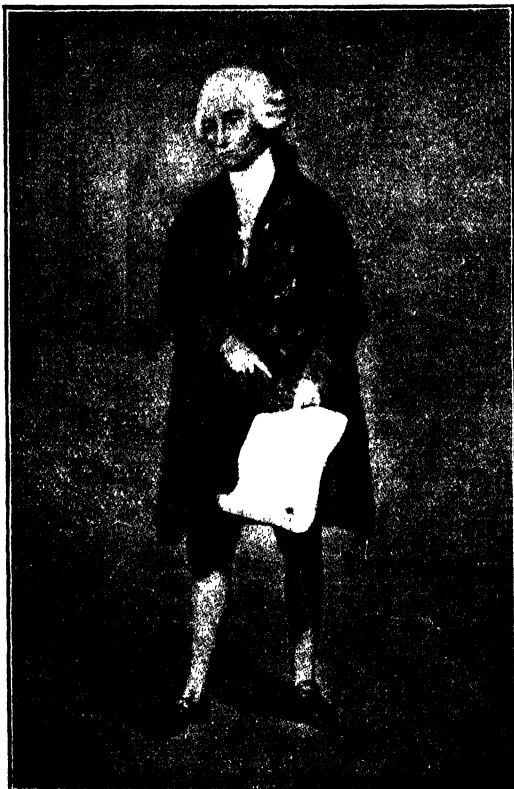
পর্য্যন্ত তাহার আলোচনামাত্রও করেন নাই।

শ্রীযুক্ত লিট্‌ল্ একটি নূতন কথা শুনাইয়াছেন। তিনি আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—যে-সকল ইংরাজ বীরপুরুষ দুর্গরক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, ইংরাজের পরাজয়কেও বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজ লেখকগণ অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী বিশ্বাস করিতে গিয়া, তাঁহাদিগের পুণ্য স্মৃতিকে অপমানিত করিতেছেন! ইহা অনুমান মাত্র হইলেও, ইহার অনুকূলে যে সকল কথা বলা যাইতে পারে, শ্রীযুক্ত লিট্‌ল্ তাহার উল্লেখ করিয়া, বিষয়টির পুনরালোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এতদিনের পর ইতিহাস ইংরাজ বীরপুরুষগণের আত্ম-বিসর্জ্জনের মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

এই ইংরাজ-লেখক অধুনা-প্রকাশিত সমস্ত কাগজপত্রের সহায়তায় যেরূপ নিপুণতার সঙ্গে বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইবার যোগ্য। হলওয়েলের করুণ কাহিনীকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া, এই লেখক প্রচুর সমালোচনা-কৌশলে দেখাইয়া দিয়াছেন,—সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী হইতে পারে না,—তাহা যে নিতান্ত রচা কথা, কাহিনীর মধ্যেই তাহার অনেক প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। হলওয়েলের রচনাভঙ্গী ভুক্তভোগীর অকৈতব রচনাভঙ্গী নহে,—তাহা আখ্যায়িকা-লেখকের সুকৌশল-বিন্যস্ত কৃত্রিম রচনাভঙ্গী। তাহার সাহায্যে কারাকক্ষের যে-সকল বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহাও অন্ধকার রজনীর যন্ত্রণাপূর্ণ কারা-কক্ষের বন্দীগণের নয়ন-গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না!

অধুনা যে-সকল কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—অনেক ইংরাজ দুর্গ-জয়-কালে বীরের ন্যায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মৃত্যু-কাহিনী দুর্গবাসী অন্যান্য ইংরাজ সহযোগিগণ বিলাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপে দুর্গরক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের নামও অন্ধকূপে নিহত ব্যক্তিগণের তালিকাভুক্ত করিয়া, হলওয়েল কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। এই তথ্য এত দিন অপ্রকাশিত ছিল; ইহা এখন হলওয়েলের কাহিনীকে আরও সংশয়পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

হত্যা-কাহিনী ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি উদ্দেশ্যে হলওয়েল এই কাহিনী-রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, কি উদ্দেশ্যে এই কাহিনীর প্রতিবাদ করিবার জন্য সেকালের কেহ কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই, শ্রীযুক্ত লিট্‌ল্ তৎসম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী ইউরোপীয়গণের মধ্যে প্রচারিত হইলেও, দেশের লোকে তাহার বিন্দু-বিসর্গ জানিত না। অন্য স্থানের লোকের কথা দূরে থাকুক, খাস কলিকাতার লোকেরাও তাহা জানিত না। চন্দননগরের ফরাসী ও হুগলীর ওলন্দাজ যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাও স্বাধীনভাবে জানিতে পারেন নাই,—"হলওয়েল

কোম্পানীর” নিকট হইতেই তাঁহারা ইহার কথা অবগত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কাগজপত্রে ইহার যাহা-কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জানা কথা নহে, শোনা কথা;—আখ্যায়িকা-রচয়িতা হলওয়েলের নিকট হইতে শোনা কথা!

এই সকল কারণে, হলওয়েলের কাহিনীর সমালোচনা করিতে গিয়া হয় তাহাকে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, না-হয় বিচার করিয়া সন্দেহপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা এই কাহিনী এখনও গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে,—হলওয়েলের কাহিনী সর্ব্বাংশে সত্য হইতে পারে না। একজন স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—“কলিকাতার দুর্গ-জয়কালে অনেকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, ইহা সত্য কথা। যদি তাহারা অন্ধকূপ-কারাগারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, তবে হলওয়েলের কাহিনী সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও, একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না।” এখন ইতিহাসের সকল তর্ক এই “যদির” উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ভ্রষ্টযাত্রা

সারাটা দিন গেল আমার হেলাফেলাতে,
আর কি এখন জম্‌বে পাড়ি সাঁঝের বেলাতে!
রোদ যা' ছিল গেছে সরে'
বাতাস কখন্ গেল মরে'
বনের আঁখি পড়্‌ছে ঢুলে' ঝাউয়ের শাখাতে—
তন্দ্রা নামে সন্ধ্যাপাখীর কাজল-পাখাতে!

প্রভাত যবে চাইল মুখে আবির ছড়িয়ে
পরশটি তার তপ্ত বুকে ধর্‌ল জড়িয়ে;
ছায়ালোকের আবেশ-পাশে
হৃদয় আমার হারিয়ে হাসে—
চম্‌কে দেখি, কখন বেলা বাড়্‌ল গগনে.
বন্ধ হ'ল যাত্রা আমার উষার লগনে।

দুপুর ধরে' ভাব্‌ছি বসে'—যাব এবারে,
আম্র-মুকুল নেশার মত ঘিরল দুধারে ;
পতঙ্গদের গুঞ্জরণে
গন্ধ ঘুমায় কুঞ্জবনে,
আঁখির পাতা আপ্‌নি কখন্ পড়্‌ল এলিয়ে
ভুলিয়ে দিল স্বপ্নাবেশের পরশ বুলিয়ে।

চাইনু জেগে—সূর্য্য তখন গড়িয়ে গিয়েছে,
নদীর পারে আঁধার তাহার আসন নিয়েছে ;
সর্ষে-ক্ষেতের হল্‌দে গায়ে
সোনার আলো যায় মিলায়ে,
হাঁসের মালা কাতার দিয়ে উড়ছে ওপারে,
নৌকা আমার দুল্‌ছে ধীরে সন্ধ্যা-আঁধারে।

সারাটা দিন কাট্‌ল যাহার এম্‌নি হেলাতে,
তবু তারে বলিস্ যেতে কাজের খেলাতে !
অন্ধকারে বাব্‌লা-বনে
কাঁটার কথাই জাগ্‌ছে মনে,
হায়রে, কোথায় পার সে পাবে রাত্রি-বেলাতে
একটিমাত্র যাত্রা যে তার মৃত্যু-ভেলাতে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ছন্নছাড়া

(অনুবাদ)

একদিন আমাদের বাড়ি মেলাই লোক এল। ব্যাটাছেলেদের দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন সব গির্জ্জেয় এসেছে—আর মেয়েরা কেমন গম্ভীর হয়ে বুকের উপর ক্রুশের মতো করে হাত রাখছিল।

আমি এদিক-ওদিক চেয়ে ফুস্ করে একবার মায়ের ঘরে ঢুকে পড়লুম। অবাক হয়ে দেখি মায়ের বিছানার পাশে একটা প্রকাণ্ড মোমের বাতি জ্বলছে। মায়ের পাস্তলার রেলিঙের উপর ঝুঁকে বাবা এক-

দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। মা ঘুমুচ্ছেন। হাত দুটি তাঁর বুকের উপর পড়ে আছে—একটির উপর আর-একটি।

আমাদের পাড়ার কোলা-গিন্নি সমস্ত দিন আমাদের আগ্‌লে রইলেন! মেয়েরা যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল কোলা-গিন্নি বল্লেন—"না আজকের দিনে আদর-করা, চুমু-খাওয়া চলবে না; রোগ যে খারাপ!" মেয়েরা আমাদের দিকে চাইলে আর রুমালে চোখ-নাক মুছলে। কোলা-গিন্নি বল্লেন—"এ অসুখে লোকের আর দয়ামায়া থাকে না!"

দিন-কয়েক পরেই আমরা একটা-করে নতুন পোষাক পেলুম,—বড় বড় সাদা-কালোর ড্যারা-কাটা।

কোলা-গিন্নি আমাদের নিজের হাতে খাওয়াতেন; তার পর খাইয়ে-দাইয়ে মাঠে খেলতে পাঠাতেন। আমার দিদি তখন মস্ত মেয়ে;—সে বেড়া টপ্‌কায়, গাছে ওঠে, পুকুর তোলপাড় করে। সমস্ত দিন এই করে দিদি রাত হলে বাড়ি ফিরত। পকেটে যে কত-রকমের পোকা-মাকড় আর বিদ্‌কুটে জানোয়ার সব নিয়ে আসত তার ঠিক নেই। সেগুলোর চেহারা দেখে আমার গা কাঁপত।

মাগো, আমি দুচক্ষে দেখতে পারতুম না ঐ কেঁচোগুলোকে! তাদের ঐ লাল-লাল রবরের দড়ির মত চেহারা দেখলেই আমার আতঙ্ক আসত। একবার মাড়িয়ে ফেল্লে আর রক্ষে ছিল না,—সমস্ত দিনটা শরীর-মন কেমন বিশ্রী হয়ে থাকত। আমার বুকে একবার বেদনা হতে কোলা-গিন্নি দিদিকে বল্লেন—দেখো, এখন আর খেলতে যেয়োনা, বোনটির কাছে থাক।" সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে আটকা থাকতে দিদি পারবে কেন? সে তার ভালো লাগত না। তার ইচ্ছে হত আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাইরে বেশ হুটোপাটি করে বেড়ায়। তাই সে করত কি—বাইরে থেকে কেঁচো কুড়িয়ে এনে আমার মুখের সামনে ধরত। বাপরে! আমি কোলা-গিন্নিকে তখনই বল্লুম, আমার বুকের বেদনা সেরে গেছে। অমনি আমরা বাইরে যাবার হুকুম পেলুম। একদিন দিদি একরাশ কেঁচো আমার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল, আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি যেই পিছিয়েছি অমনি এক টব গরম জলে পড়ে গেলুম। আমার ভিজে কাপড় ছাড়াতে ছাড়াতে কোলা-গিন্নি দিদির দিকে চোখ-রাঙিয়ে বল্লেন—"রোসো-না তোমায় দেখাচ্ছি মজা!" এই বলে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তিন জন চিম্‌নি-সাফ-করা লোক, তাদের ডেকে বল্লেন—নিয়ে যা ত এই মেয়েটাকে ধরে। তারা তিন জন দড়ি-দড়া আর থলি নিয়ে ঘরের মধ্যে হাজির হল। দিদি তাদের দেখে চীৎকার করে উঠল; "পায়ে পড়ি আর করব না!"—বলে কাঁদতে লাগল। গায়ে আমার একটিও কাপড় ছিল না, আমার এমন লজ্জা করতে লাগল!

(২)

বাবা আমাদের সঙ্গে করে এক-জায়গায় নিয়ে যেতেন—সেখানে বসে লোকেরা মদ খায়। টেবিলের উপর একরাশ গেলাসের মধ্যিখানে আমাকে বসিয়ে দিয়ে তিনি বলতেন—খুকী গান গা! লোকেরা সবাই খুব হাসত, আমায় চুমু খেত আর আমার মুখের সামনে মদের গ্লাস ধরত। আমরা

যখন বাড়ি ফিরতুম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে আসত। বাবা লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলতেন এবং এদিক-ওদিক করে টলতেন। কত-বার যে রাস্তার উপর টাউরে পড়তেন তার ঠিক নেই। কখনো কখনো তিনি ছেলেমানুষের মত কাঁদতে আরম্ভ করতেন; বলতেন, আমাদের বাড়ীটা কে চুরি করে নিয়ে গেছে! দিদি অমনি ভয়ে ডাক-ছেড়ে কেঁদে উঠত; তার পর কিন্তু সে-ই বাড়ী খুঁজে বার করত। একদিন কোলা-গিন্নি আমাদের উপর রাগ করে বলতে লাগলেন—"হতভাগীরা, যা, তোদের আমি আর খাওয়াতে পারব না। তোদের বাপ যেখানে মরতে গেছে সেইখানে যা!" বাবা যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছিলেন তা কেউ জানত না। তার পর যখন রাগ পড়ে গেল তখন কোলা-গিন্নি আমাদের ডেকে আবার খেতে দিলেন। কিন্তু এর দু-চার দিন পরেই, একটা বোঝাই গোরুর গাড়ির উপর আমাদের চাপিয়ে দেওয়া হল। গাড়িটা খড় আর ধানের বস্তায় ঠাসা! দুটো বস্তার একটু-খানি ফাঁকের মধ্যে আমাকে বসিয়ে দিলে। গাড়ীটা চলবার মুখেই পিছন দিকে কাৎ হয়ে পড়ল আর রাস্তার প্রত্যেক ঝাঁকানিতে আমি খড়ের গাদার উপর হুমড়ি-খেয়ে পড়তে লাগলুম।

সমস্ত পথটা ভয়ে আমার বুক ধুক্‌ধুক্ করছিল। এক-একবার যেমন পিছলে পড়ি আর অমনি মনে হয় বুঝি গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লুম, বুঝি-বা ধানের বস্তাগুলো হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ল! একটা সরাইখানার সামনে গাড়ি থামল। একজন মেয়েমানুষ এসে গাড়ি থেকে আমাদের তুলে নিলেন, গা থেকে খড়ের কুটিগুলো ঝেড়ে দিলেন এবং আমাদের একটু-করে দুধ খেতে দিলেন। শুনলুম তিনি গাড়োয়ান সিকঁকে জিজ্ঞাসা করছেন —"এদের বাপ কি খোঁজ খবর রাখে?" সিকঁ মাথা নাড়লে; তার তামাক খাবার পাইপটা একবার টেবিলের গায়ে ঠুকে নিলে; তার পর মজার-রকমের মুখ করে বল্লে—"কে জানে সে কোথায়! জেরার্দ-ছোকরা তো বলছিল পারির পথে তাকে দেখেছে।" খানিকক্ষণ পরে সিকঁ একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে আমাদের নিয়ে এল —রাস্তা থেকে লম্বা-লম্বা সব সিঁড়ির ধাপ দরজায় গিয়ে উঠেছে। একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে কথা কইতে লাগল। ভদ্রলোকটি হাত নেড়ে নেড়ে পরিশ্রমের মর্যাদা নিয়ে অনেক কথা বল্লেন। সে যে মাথামুণ্ড কি তা জানি না! ভদ্রলোকটি আমার মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে চাপড়াতে লাগলেন, থেকে থেকে বলতে লাগলেন—"কই, সে তো কখনো বলে নি তার মেয়ে আছে!" আমি বুঝলুম আমার বাবার কথাই হচ্ছে। আমি বাবাকে দেখতে চাইলুম। তিনি কোনো জবাব করলেন না, শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; সিকঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এর বয়স কত?" সিকঁ বল্লে—"বছর-পাঁচেক হবে।" এতক্ষণ দিদি একটা বিড়াল-ছানার সঙ্গে সিঁড়ির উপর-নীচে-করে দৌড়াদৌড়ি করছিল। আমরা আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলুম, আবার কোলা-গিন্নির কাছে ফিরে গেলুম। তিনি আমাদের উপর বিরক্ত হয়ে

ছিলেন এবং কেবলই আমাদের সরিয়ে দেবার মতলব করতেন। অল্প দিন পরেই তিনি আমাদের ষ্টেশনে নিয়ে গেলেন; সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা আমরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম—সেখানে দেখি অনেক ছোট ছোট মেয়ে।

সিস্‌টর গাব্রিয়েল তৎক্ষণাৎ আমাদের তফাৎ করে দিলেন। তিনি বল্লেন,—"দিদি বড় হয়েছে, সে মাঝারি মেয়েদের সঙ্গে থাকবে আর আমি ছোটদের সঙ্গে।" সিস্‌টর গাব্রিয়েল দেখতে ছোট্টটি, রোগা, বুড়ি থুড়্‌থুড়ি; একেবারে বেঁকে পড়েছেন। শোবার ঘর আর খাবার ঘরের ভার তাঁর উপর ছিল। একটি হল্‌দে-রঙের প্রকাণ্ড ভাঁড়ে তিনি কাঁচা-সবজীর চাটনি তৈরি করতেন। জামার আস্তিনটা কাঁধ পর্য্যন্ত তুলে দিয়ে চাটনির ভিতর তিনি হাত দিতেন আর তুলতেন। তাঁর হাত ছিল কালো—ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া। সেই হাত যখন চাটনির ভাঁড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত তখন তার রং চক্‌চক্ করত—তা থেকে রস ঝরতে থাকত। তাই দেখে আমার মনে হত ঠিক যেন বৃষ্টির সময়কার গাছের শুকনো ডাল!

(৩)

মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। সে লাফাতে লাফাতে আমার কাছে এসে দাঁড়াল—ভারি বাচাল! আমি যে বেঞ্চিটাতে বসেছিলুম তার চেয়ে মাথায় সে বড় নয়। আমার হাঁটুর উপর তার কনুই-দুটো রেখে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"চুপটি করে বসে আছ কেন?, খেলা করবে না?" আমি বল্লুম, "আমার বুকে যে ব্যথা!" সে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বল্লে—"হ্যাঁ, হাঁ! শুনেছি তোমার মায়ের ক্ষয়রোগ ছিল বটে! সিস্‌টর গাব্রিয়েল বলছিলেন, তুমি বেশি দিন বাঁচবে না।" সে বেঞ্চির উপর উঠে, নিজের ছোট্ট পা দুখানি মুড়ে আমার পাশটিতে বসল। তার পর আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে। সে বল্লে তার নাম ইস্‌মেরি, আমার চেয়ে সে বড়। ডাক্তারে বলেচে সে আর বাড়বে না; ঐ যিনি আমাদের ক্লাসে পড়ান তাঁর নাম মারি এমে! উনি ভারি কড়া;—একটু কথা কইলেই সাজা দেন। হঠাৎ দেখি সে বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে পড়ল, চীৎকার করে উঠল—"ওগিস্তিন্!" তার গলার স্বর যেন ছেলেদের গলার মতন; পা দুটো একেবারে বাঁকা! তার পর খেলাধুলার সময় যখন শেষ হয়ে এল তখন দেখি সে ওগিস্তিনের পিঠে চড়েছে; ওগিস্তিন্ তাকে কেবলই এক কাঁধ থেকে আর-এক কাঁধে ঘোরাচ্ছে—যেন তাকে ফেলে দেবে। আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় ইস্‌মেরি তার মোটা গলায় বল্লে—"তোমাকেও এমনি করে আমায় কাঁধে করতে হবে—বুঝলে?" ওগিস্তিনের সঙ্গেও আমার খুব ভাব হয়ে গেল।

(৪)

আমার চোখ ভালো ছিল না; রোজ রাত্রে চোখ এঁটে যেত, না ধুইয়ে দিলে চাইতে পারতুম না;—কাণা হয়ে থাকতুম। ওগিস্তিনের উপর ভার ছিল রোজ ভোরে শোবার ঘর থেকে হাঁসপাতাল ঘরে আমায় নিয়ে যাবে। ঘরে ঢোকবার আগেই আমি তার পায়ের

শব্দ শুনতে পেতুম। সে আমার হাত ধরে ঘর থেকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যেত —খাটের গায়ে যে আমার কেবলই ধাক্কা লাগত তা সে গ্রাহ্যই করত না। আমরা ঝড়ের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যেতুম—পড়ি কি মরি! সিঁড়ির সব ধাপগুলোর উপর আমার পা পড়ত না। যখন ওগিস্তিন্ আমায় সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনত তখন মনে হত যেন একটা কুয়োর ভিতর গড়িয়ে পড়ছি। তার হাতে খুব জোর ছিল, সে আমাকে বেশ শক্ত করেই ধরত। হাঁসপাতাল যাবার পথে উপাসনার ঘর, তার সামনে একটা ছোট্ট সাদা বাড়ি। একদিন আমি হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেলুম; ওগিস্তিন্ তাড়াতাড়ি আমায় টেনে তুলেই মাথায় একটা থাবড়া দিয়ে বল্লে—"চ, চ! এখানে কবর-ঘর!" সেই থেকে তার ভয় হত পাছে আমি আবার পড়ে যাই; কবর-ঘরের সামনে এলেই সে আমায় সাবধান করে দিত। তার এই ভয় দেখে আমারও কেমন ভয়-ভয় করত। অমন করে উর্দ্ধশ্বাসে যখন সে ছুটে পালায় তখন নিশ্চয় একটা ভয় আছে। হাঁসপাতালে গিয়ে যখন উঠতুম তখন আমার রীতিমত হাঁপ ধরত। কে-একজন এসে আমায় চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চোখ ধুইয়ে দিত। ওগিস্তিনই সঙ্গে করে আমাকে পড়বার ঘরে মারি এমের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকেই সে ভয়ে-ভয়ে আমতা-আমতা করে বল্লে —"এই একটি নতুন মেয়ে এসেছে।" আমারও কেমন ভয় করতে লাগল, মনে হল বুঝি তিনি আমাকে খুব ধমকাবেন কি মারবেন! কিন্তু তা নয়। মারি এমে আমার দিকে হাসিমুখে চাইলেন—আমাকে আদর করে বার বার চুমু খেতে লাগলেন, বল্লেন—"তুমি যে নেহাৎ ছোট, বেঞ্চিতে তো বসতে পারবে না, এস এইখানে বোসো!" বলে তাঁর ডেস্কের তলায় একটি ছোটো টুলের উপর আমায় বসিয়ে দিলেন। জায়গাটি এমন আরামের! তাঁর পশমী ঘাগরার কোমল স্পর্শ এবং তার গরমটুকু আমার গায়ে এসে লাগত—তাতে সকাল-বেলাকার সেই ছুটোছুটি ও পড়ে-যাওয়ার সব বেদনা জুড়িয়ে যেত। প্রায়ই দুখানি পা দুধার থেকে আমায় চেপে ধরত; সেই দুটি পায়ের উপর আমি ঠেসান দিতুম। মধ্যে মধ্যে একখানি কোমল হাতের স্পর্শ উপর থেকে আমার মাথায় এসে লাগত—সেই নরম হাতের চাপড়ানি আর বালিসের গরম পেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম। জেগে উঠে দেখতুম বালিসটা টেবিল হয়ে গেছে আর তারই উপরে সেই হাতখানি থেকে কেকের টুকরো, মিছরির টুকরো এবং কখনো কখনো মিষ্টি খাবার এসে পড়চে। চারিদিকেই গোলমাল! কেউ কাঁদতে কাঁদতে বলছে—"না দিদি, আমি করিনি!" আর-একজন অমনি সরু বাঁশির সুরে ফুকরে উঠছে—"হাঁ দিদি, ঐ করেছে!" এই গোলমালের মধ্যে আমার মাথার উপর থেকে শুনতুম একটি স্নেহ-মাখা স্বর—"চুপ! চুপ!" তার পরেই ডেস্কের উপর রুলের ঘা পড়ত—সেই শব্দ ডেস্কের তলায় আমার কাছে গম্‌গম্ করে উঠত। কখনো কখনো আমার টুল থেকে সেই পা দুখানি সরে যেত—হাঁটু দুটি এক হয়ে

আসত, চেয়ারখানা হটে যেত আর আমার সেই ছোট্ট নীড়টিতে মাথার কাপড়ের ছুটি কোণ এসে ঠেকত; সঙ্গে সঙ্গে একখানি হাসিমাখা মুখ দেখতে পেতুম—ভিতর থেকে মুক্তোর মতো দাঁতগুলি চিক্ চিক্ করতে থাকত। সব-শেষে দেখতে পেতুম ছুটি স্নিগ্ধ চোখ, মনে হত সেই চোখছুটি যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আদর ঢেলে দিচ্চে, আমার মনে আর এতটুকুও অসোয়াস্তি থাকত না।

(৫)

আমার চোখের অসুখ সেরে যেতে কেক ও মেঠাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাতে একখানা বর্ণপরিচয় পেলুম। বইখানি ছোট—কথার পাশে পাশে ছবি দেওয়া। একটা বড় জাতের ষ্ট্রবেরি ফল আঁকা ছিল; সেইটে দেখতে আমার ভারি ভালো লাগত—তার দিকে আমি প্রায়ই চেয়ে থাকতুম;—দেখতে দেখতে, একখানা গোল-পাঁউরুটি যত-বড় সেটাকে আমার তত-বড় বলে মনে হত। পড়বার ঘরে যখন তেমন ঠাণ্ডা বোধ হত না তখন মারি এমে আমাকে বেঞ্চির উপর বসিয়ে দিতেন—ইস্‌মেরি ও মারি রেনো এই ছুজনের মধ্যিখানে। শোবার ঘরেও এরা ছুজনে আমার ছু-পাশের ছুই বিছানায় শুত। মধ্যে মধ্যে মারি এমে আমার সেই ছোট্ট নীড়টিতে আমায় নিয়ে যেতেন—সেখানটা আমার ভারি ভালো লাগত। ছবির বই পেতুম—তাই দেখতে দেখতে সময় যে কোথা দিয়ে চলে যেত জানতেও পারতুম না।

একদিন সকালে ইস্‌মেরি আমাকে এক-কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বল্লে—"মারি এমে আর আমাদের পড়াবেন না—তিনি সিস্‌টর গাব্রিয়েলের বদলে খাবার-ঘর আর শোবার-ঘরের তদারক কর্ব্বেন।" এ কথা সে কার কাছে শুনেছে তা বল্লে না, শুধু বল্লে—"এ বড় খারাপ হল কিন্তু।" সে গাব্রিয়েলকে বড় ভালোবাসিত—গাব্রিয়েল তাকে খুকীর মতো করে আদর-যত্ন করতেন কি না! সে দুচক্ষে দেখতে পারত না—"ঐ মারি এমেটাকে!" মারি এমেকে সে ঐ-রকম করেই সম্বোধন করত—অবশ্য আমরা-ছাড়া যখন আর-কেউ সেখানে থাকত না! সে বলত, মারি এমে তাকে কারুর পিঠে চড়তে দেয় না, আর গাব্রিয়েলের সঙ্গে যেমন ফষ্টিনাষ্টি হয় মারি এমের সঙ্গে তা চলবে না। গাব্রিয়েল সিঁড়ি-ওঠবার সময় রেলিঙের দিকে মুখ-করে এঁকে-বেঁকে উঠতেন—তাই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে ভারি মজা হত। মারি এমে এমনধারা বেয়াদবী তো সহ্য করবেন না!

সন্ধ্যার সময়, উপাসনার পর সিষ্টর গাব্রিয়েল আমাদের বল্লেন, তিনি চলে যাচ্ছেন। আমাদের সকলকে তিনি চুমু খেলেন—সব-চেয়ে ছোট থেকে আরম্ভ করে। আমরা ভয়ানক গোল করতে-করতে সিঁড়ি দিয়ে শোবার ঘরে উঠে যেতে লাগলুম। বড়-মেয়েরা ফিস্-ফিস্ করে বলতে লাগল, মারি এমের কাছে আমরা কিছুতেই থাকব না! ছোটো মেয়েরা তো কান্না জুড়ে দিলে—যেন কি একটা বিপদ এসেছে। ইস্‌মেরিকে আমি পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছিলুম—সে তো চেঁচিয়েই কাঁদছিল। তার সরু সরু আঙুলগুলো আমার টুঁটির উপর জোরে চেপে বসেছিল—আর তার

চোখের জল আমার ঘাড়ের উপর টস্‌টস্‌ করে পড়ছিল। সিস্‌টর গাব্রিয়েলও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঠুক্‌-ঠুক্‌ করে সিঁড়ি উঠছিলেন, কিন্তু তাই নিয়ে সেদিন ঠাট্টা করবার কথা কারও মনেও ওঠে নি। তিনি কেবলই বলছিলেন—"আরে চুপ কর! চুপ কর!" কিন্তু গোল তাতে কমছিল না। শোবার-ঘরের দাসীর চোখেও জল দেখলুম। সে কাপড় ছাড়াতে-ছাড়াতে আমার গায়ে একটা নাড়া দিয়ে বল্লে—"তোমার মারি এমেকে পেয়ে তুমি খুব খুসি, না!" তাকে আমরা "বন্‌ এস্‌তার" বলে ডাকতুম। তিনজন দাসীর মধ্যে তাকেই আমার সব-চেয়ে ভালো লাগত। সময় সময় সে উগ্রমূর্ত্তি ধরত বটে কিন্তু সে আমাদের ভালোবাসত। রাত্রিবেলা আমার কাশি হলে সে উঠে এসে মিছরির টুকরো আমার মুখে দিত; আর আমার বেশী শীত লাগলে, নিজের বিছানাটিতে নিয়ে গিয়ে আমায় গরম করে রাখত।

(৬)

পরদিন সকালে আমরা সবাই গম্ভীর ভাবে খাবার ঘরে গেলুম—টুঁ শব্দটি নয়। দাসীরা বল্লে, বোসোনা কেউ, দাঁড়িয়ে থাক সব। কয়েকজন বড় মেয়ে বুক-ফুলিয়ে সটান সোজা-হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যেন মস্ত-কেউ! বন্‌ জিস্তিন্‌ টেবিলের এক-কিনারায় মাথাটি নীচু করে দাঁড়িয়েছিল—মুখখানি তার ম্লান! বন্‌ নেরঁ—ঠিক যেন পাহারা-ওয়ালা—ঘরের মধ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে সে ঘড়ির দিকে চাচ্ছিল আর একটা বিরক্তির সঙ্গে কাঁধটা কোঁচকাচ্ছিল। দরজা ঠেলে মারি এমে প্রবেশ করলেন। দরজা খোলাই পড়ে রইল। তাঁর ঘাগরার উপর সাদা কাপড়ের ঢাকা, আর জামার সাদা হাতা দেখে তাঁকে যেন আরও লম্বা বোধ হতে লাগল। আমাদের সবাইয়ের দিকে চাইতে চাইতে তিনি এক-পা এক-পা করে এগতে লাগলেন; তাঁর বুকের উপরে জপের মালা;—সেটা টুকটুক্‌ টুকটুক্‌ করে শব্দ করতে লাগল; তাঁর চলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাগরার কিনারাগুলি দুলে-দুলে উঠছিল। তিনটে ধাপ উঠে তিনি ডেস্কে গিয়ে বসলেন—এবং আমাদের সবাইকে বসতে ইসারা করলেন। বৈকালে তাঁর সঙ্গে আমরা গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। সে দিন বেশ গরম। একটি ছোট পাহাড়ের উপর আমি তাঁর পাশটিতে গিয়ে বসলুম। তিনি একখানি বই-হাতে পড়তে বসলেন এবং মেয়েরা নীচে একটা মাঠে খেলা করছিল সে-দিকে নজর রাখতে লাগলেন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল—তিনি তাই দেখছিলেন; আর মাঝে মাঝে বলে উঠছিলেন—"কি চমৎকার! কি সুন্দর!"

সে দিন সন্ধ্যাবেলা দেখলুম শোবার ঘরে সিস্‌টর গাব্রিয়েল যে বার্চ্চ-গাছটি রেখেছিলেন সেটি উঠিয়ে রাখা হয়েছে, আর খাবার ঘরে দুখানা বড় কাঠের চামচ দিয়ে চাটনি মাখা হচ্ছে—বদলের মধ্যে এই হল। ন'টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত আমরা ক্লাসে থাকতুম, তার পর বিকেলে আমাদের বাদাম ভাঙতে হত। এই বাদাম একজন তেলি এসে কিনে নিয়ে যেত। বড় বড় মেয়েরা হাতুড়ি দিয়ে বাদামগুলো

ফাটিয়ে ফেলত আর আমরা খোলা ছাড়াতুম। বাদাম খাওয়া আমাদের মানা ছিল। লুকিয়ে-চুরিয়ে খাবারও যো ছিল না; খেলেই মেয়েদের মধ্যে কেউ-না-কেউ অমনি বলে দিত;—কারণ তাদেরও খাবার লোভ ছিল এবং কেউ খাচ্ছে দেখলে তাদের হিংসা হবার কথা। এস্‌তার মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের মুখ খুলে দেখত আর পেটুক মেয়েদের দিকে চোখ-পাকিয়ে মাঝে মাঝে বলত—"আমি দেখচি সব! দেখচি সব!" আমাদের কাউকে কাউকে সে বিশ্বাস করত। "দেখি, মুখ দেখি!"—বলে সে কখনো কখনো আমাদেরও হাঁ করতে বলত; যেন কতই পাহারা দিচ্ছে এম্নি ভাব দেখাত। আমরা হাঁ করে থাকতুম। সে বলত—"ঠোঁট বোজ, ময়না!" বলে হাসতে থাকত।

বাদাম খাবার এমনি লোভ হত আমার! কিন্তু এস্‌তারের জন্য পারতুম না; তাকে ঠকাবো—একথা ভাবতেও লজ্জা হত—সে যে আমায় বিশ্বাস করে! কিন্তু কিছু দিন পরে লোভ আমার এমনি বেড়ে উঠল যে এসব লজ্জাসরমও রইল না। প্রতিদিনই আমি খালি সুযোগ খুঁজতুম কেমন করে সবাইয়ের চোখে ধূলো দিয়ে বাদাম খাবো—ধরা পড়ব না। কখনো কখনো দু-চারটে বাদাম নিয়ে জামার হাতার ভিতর ফেলে দিতুম; কিন্তু আমি এমনি অলবড়ে যে সেগুলো ঠিক করে রাখতে পারতুম না, টপ্ টপ্ করে পড়ে যেত। তা ছাড়া ঐ দু-চারটে বাদাম নিয়ে আমার হবে কি?—আমার ইচ্ছে হত এক-গাদা বাদাম খাই —এক বস্তা! একদিন কয়েকটা হাতিয়ে ছিলুম। সেদিন এস্‌তার আমাদের শুইয়ে দিতে যাবার সময় একটা বাদামের খোলায় পা-হড়কে পড়ে গেল—হাতে ছিল আলো, সেটা ছিট্‌কে পড়ে নিভে গেল; আমি অমনি, সেই অন্ধকারে, সামনের একটা বাটি-থেকে একমুঠো বাদাম নিয়ে পকেটে পূরে ফেল্লুম। সকলে যখন শুয়েছে, পকেট থেকে বাদামগুলো বার করলুম; চাদরে মুখটা ঢেকে সেগুলো মুখের মধ্যে ঠেসে দিলুম। মনে হতে লাগল ঘরে যত লোক শুয়ে আছে সবাই আমার চোয়াল-নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে! আমি যতদূর পারি একটু-একটু-করে আস্তে-আস্তে চিবুতে লাগলুম কিন্তু তবুও তার শব্দ আমার কানের কাছে মুগুরের ঘায়ের মত ধপ্ ধপ্ করতে লাগল।

এস্‌তার উঠল, বাতি জ্বাললে; তার পর সবাইয়ের বিছানার কাছে কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। আমার কাছে যখন এল তখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত! সে চুপি-চুপি একবার বল্লে—"তুমি এখনও ঘুমোও নি!" তার পর বিছানা দেখতে-দেখতে চলে গেল। ঘরের একেবারে কিনারায় গিয়ে দরজাটা সে একবার খুললে, আবার বন্ধ করলে। তারপর এসে আলো নিভিয়ে শুয়েছে মাত্র আর অমনি খট্ করে দরজায় একটা শব্দ হল—মনে হল কে যেন দরজা খুল্লে! এস্‌তার আবার আলো জ্বাললে; এদিক-ওদিক চেয়ে বল্লে—"দরজা খুল্লে কে? বেড়ালে তো হাণ্ডিল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে পারে না!" তার কথার সুরে মনে হল সে ভয় পেয়েছে। আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলুম সে বিছানায় উস্‌খুস্ করছে। হঠাৎ

সে চীৎকার করে উঠল—"বাবারে!" ইস্‌মেরি বলে উঠল—"কি হয়েছে, কি হয়েছে?" এস্‌তার বল্লে—"কার একখানা হাত এসে দরজা খুল্লে!—আমার মুখে কার নিশ্বাসের হাওয়া লাগল!" সেই আলো-আঁধার;—তার মধ্যে দেখলুম সত্যি দরজাটা একটু খোলা রয়েছে। আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠল। আমার মনে হতে লাগল যেন ঘরের মধ্যে সেই অন্ধকারে একটা বিকট দৈত্য এসেছে— আমায় ধরে নিয়ে যাবে! আমি কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। এস্‌তারের বিছানার কাছেই বাতিটা জলছিল; সে উঠল না, সে বল্লে—"ওগো, তোমরা কেউ উঠে আলোটা নিভিয়ে দাও না!" কেউ কোনো সাড়া দিলে না। তখন সে আমাকে ডাকলে। আমি উঠলুম। সে বল্লে— "তোমার মতো লক্ষী-মেয়েকে ভূতেরা কিছু বলে না!" আমি দেখি সে সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি দিয়েছে। আলো নিভিয়ে দিলুম। যেমন অন্ধকার হওয়া অমনি আমার চোখের সামনে হাজার-হাজার আগুনের ফুল্‌কি কিল্‌বিল্‌ করতে লাগল! আর রক্ষা নেই! দৈত্য-দানারা সব এসে পড়েছে! ঐ তাদের নিশ্বাসের আগুন! তাদের লম্বা-লম্বা ধারালো নখের আঁচড় আমার পায়ে এসে লাগতে লাগল;—আমার চারিদিকে আগুনের ঝলকা! কেমন মনে হতে লাগল আর দাঁড়াতে পারছি না—বসে পড়ি। যখন বিছানায় গিয়ে উঠলুম তখন ভাবছি—যাঃ পা-দুখানা আর নেই—নিশ্চয় কেটে নিয়ে গেছে! সাহস হল না হাত দিয়ে দেখি। অনেকক্ষণ পরে যখন বুক-ঠুকে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিলুম তখন দেখি পা একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা। পা-দুখানাকে হাত দিয়ে আঁকড়ে পড়ে রইলুম; থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালবেলা উঠে দেখা গেল বেড়ালটা দরজার পাশে এক বিছানায় শুয়ে আছে,— রাত্রে সে বাচ্ছা পেড়েছে। মারি এসে রাত্রের কথা শুনে বল্লেন—"বেড়ালটাই নিশ্চয় হাণ্ডিলের উপর লাফিয়ে দরজা খুলেছে।" কিন্তু কথাটা আমাদের কারো মনে ঠিক লাগল না। ছোট মেয়েরা এই রাত্রের কাহিনী অনেক দিন ধরে চুপিচুপি বলাবলি করতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মৃত্যুঞ্জয়

আপনি সন্ন্যাসী তুমি, সর্ব্বত্যাগী শিব,
ভোলা ব্যোমকেশ!
তাই নিজ ভক্ত পেলে তারেও সন্ন্যাসী
সাজাও মহেশ!
আপনি শ্মশানবাসী, অঙ্গে মাখ ছাই,
ভিক্ষাপাত্র সার,—
শ্মশান-বহ্নির দাহ, বক্ষে দাও তাই,
ভক্তে আপনার।

উন্মাদ তাণ্ডব খেলা তব,—প্রলয়ের
গরজন গান—
তোমার আনন্দ-গীত তাই ভকতের
রোদনের তান।
কালকূট কণ্ঠভরা তবু মৃত্যু-জয়ী,
তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
অসীম দুঃখের বিষে জর্জ্জরিত নর
তবু বেঁচে রয়।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

স্তব্ধ তরু
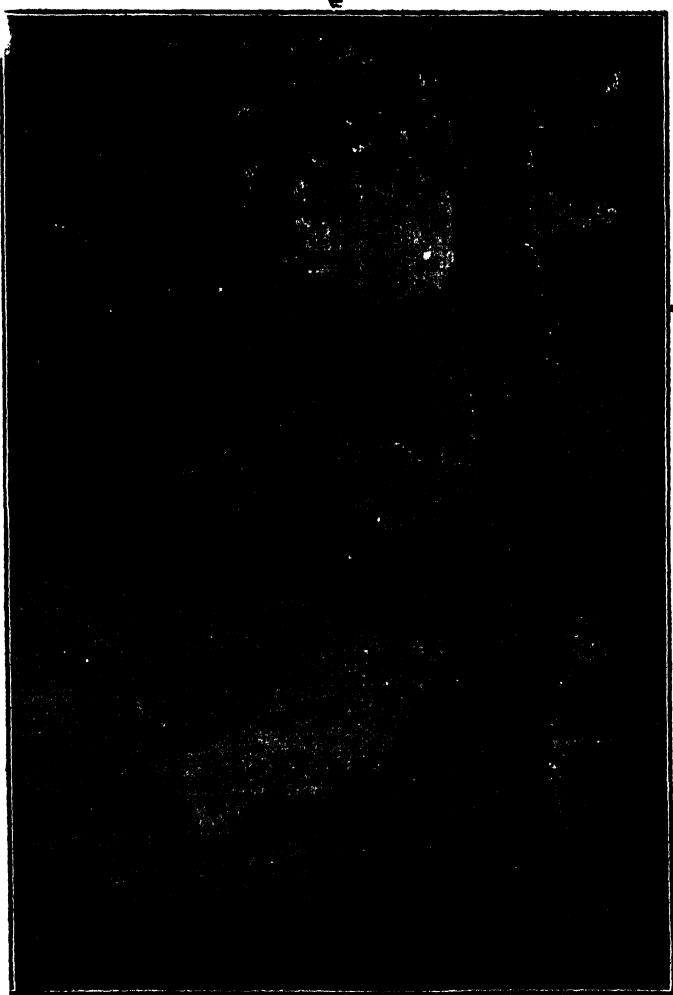
শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে-অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতের কৃষিকার্য্য*

কৃষি-সাহিত্য

ভারত আবহমানকাল কৃষিপ্রধান দেশ। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত যে বিশাল উর্ব্বর ভূমিভাগ আমরা বহুপুণ্যফলে মাতৃভূমি-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার কর্ষণে চিরদিনই সোনা ফলিয়াছে ও ফলিবে। শিল্প-বাণিজ্যে ভারত এককালে সমগ্র জগতের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ ছিল ; ভারতের ভূমিজাত অন্ন চিরকালই ভারতের কেন, বহু দেশ-বিদেশের নরনারীর প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছে ও করিবে।

অধুনা ভারতের শতকরা আশিজন ব্যক্তির উপজীবিকা কৃষি। কৃষিই ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিল্প। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বিজ্ঞানে কতগুলি পুস্তক বঙ্গভাষায় লিখিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সেই সময়ে দেখি যে বঙ্গসাহিত্যের কৃষিবিভাগে পুস্তকাদি খুব বেশী নাই। অথচ আধুনিক উন্নত কৃষিবিদ্যায় লব্ধ তথ্যগুলি মাতৃভাষায় প্রত্যেক গৃহস্থকে জ্ঞাত করাইতে পারিলে অনেক সুফল মিলিতে পারে। সরকার বাহাদুর কৃষিবিদ্যার আলোচনার জন্য পুসা, স্যাবোর, পুনা প্রভৃতি স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন বাঙ্গালা দেশে ঢাকা, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, রংপুর প্রভৃতি সহরে কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে (Experimental farm) কৃষির উন্নতির জন্য বহু পরীক্ষা করিতেছেন। এই সকল স্থানে পরীক্ষায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেগুলি ইংরাজিতে কৃষি-বিভাগের রিপোর্টে এতদিন আবদ্ধ থাকিত ; যাহার জন্য সেগুলি আবিষ্কৃত হইল সেই গৃহস্থকে সেগুলি মাতৃভাষায় জানাইবার এতদিন কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুখের বিষয় গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সকল পরীক্ষার ফল "কৃষি সমাচার" নামে প্রকাশিত হইতেছে। আশা করি, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে বহু পুস্তকাদি রচনা করিয়া একদিকে মাতৃভাষার দৈন্য দূর করিবেন এবং অপর দিকে দেশের উন্নত কৃষি-শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ও কৃষি

আজ-কাল এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে স্বভাবতই চাকুরি-সম্বল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি শিল্পোন্নতির দিকে পড়িয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষির দিকে এখনও পড়ে নাই। বিশ-পঁচিশ টাকার কেরাণীগিরিতে আর চলে না, বি, এ, এম এর বাজার-দর মাসিক পঞ্চাশ ষাট টাকা দাঁড়াইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আয়ের অন্যবিধ পন্থা উন্মুক্ত না হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক দৈন্য ঘুচিবে কি করিয়া বুঝিতে পারি না। উপরন্তু যখন দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যাও উত্তরোত্তর

* রঙ্গপুরে নবম উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কৃষি-বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ।

বৃদ্ধি পাইবে, তখন কৃষি-শিল্প প্রভৃতি আয়ের নূতন নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত না হইলে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বাজার-দর আরও কমিতে থাকিবে। শিল্পোন্নতির জন্য অধিকাংশ স্থলেই হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধনের প্রয়োজন; তদুপরি শিল্পশিক্ষা ব্যবসাবুদ্ধি প্রভৃতি অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। এ-সকল সংগ্রহ করা দুরূহ। বড় রকমের কৃষি-কারবার চালাইতেও এই-সকলের প্রয়োজন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মাসিক যে পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার জন্য আমরা লালায়িত, তাহা কৃষি-কার্য্যের সাহায্যে অর্জ্জন করিতে শিক্ষিত গৃহস্থের পুঁজিপাটা ও বুদ্ধিই যথেষ্ট। যে সকল শিক্ষিত যুবক পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকার চাকরীর জন্য অফিসের দ্বারে দ্বারে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন "go back to the land"! এ বিষয়ে কৃষি-বিষয়ক রিপোর্টাদি পাঠ করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন কোন কৃষিজাত দ্রব্যের চাষ করিতে পারিলে যুবকগণ স্বল্পায়াসে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন।

বঙ্গদেশে ধান ও পাট প্রধানতম শস্য। উপজীবিকা-হিসাবে ইহাদের চাষ খুব অধিক বিঘা করিতে না পারিলে শিক্ষিত গৃহস্থের পোষাইবে না। অবশ্য অন্যবিধ চাষ বা পেশার সহিত এ-সকল চাষ চলিতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিসের আবাদ সম্ভবপর যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে বিঘা-প্রতি খুব বেশী লাভ হইতে পারে। ইহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

(১) ইক্ষুর চাষ—ইক্ষুর চাষ খুব লাভজনক। তাহার উপর যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার দেওয়া হয় এবং বার-বেডোজ, মরিশস, জাভা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আনীত আখের চাষ করা যায়, তাহা হইলে এক এক বিঘা-জাত আখ হইতে চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত গুড় উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার মূল্য ন্যূন-কল্পে ২৫০৲ টাকা এবং খরচ প্রায় বিঘা-প্রতি বড়-জোর ৮০৲ টাকা হইতে পারে। অতএব বিঘা-প্রতি লাভ অন্ততঃ ১৫০৲ টাকা দাঁড়ায়। এ-বিষয়ে কৃষি-বিভাগের বাঙ্গালা ১৩১৯—১৩২০ সালের বার্ষিক বিবরণী হইতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন কৃষি ফার্ম্মে প্রাপ্ত ফসলাদির বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

ঢাকা বিভাগে গেণ্ডারি নামক ইক্ষুর চাষই সমধিক প্রচলিত কিন্তু ঢাকা কৃষি ফার্ম্মে বিঘা-প্রতি ১০ মণ চুণ, ১০০ মণ গোবর ও ৬⅔ মণ সরিষার খোল সার দিয়া বিঃ ১৪৭ ও ডোরা ট্যানা নামক বিদেশী ইক্ষু হইতে গেণ্ডারিজাত গুড় অপেক্ষা প্রায় ডবল গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

নাম	তিন বিঘায় কত মণ গুড় পাওয়া গিয়াছে
বিঃ ১৪৭	১২৩
ডোরা ট্যানা	১১২
হরিদ্রা ট্যানা	১০৬
ঢাকা গেণ্ডারি	৭৮

বিঃ ১৪৭ হইতে বিঘা-প্রতি ৪০ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। রংপুর ফার্ম্মেও

ইংরাজি ১৯১২—১৩ সালে একই প্রকারে আবাদ করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছিল—

সাদা টেনা	তিন বিঘায়	১৩০ মণ গুড়
ডোরা টেনা	"	১২০ " "
মরিশ্যস	"	১০৪ " "
গেণ্ডারি	"	৭১ " "

রাজসাহী ফার্ম্মেও গত কয়েক বৎসর এই বিঃ ১৪৭ ও ডোরা টেনার চাষ হইতেছে, আমি সেগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি, লম্বায় ৮।১০ হাত ও দেখিতে খুব মোটা। সেখানেও বিঘায় ৪০ মণ ভাল গুড় উৎপন্ন হইতেছে। রাজসাহী ফার্ম্মের অধ্যক্ষ তিন-বিঘা-প্রতি নিম্নলিখিত সার দিতে উপদেশ দেন।

২০০ মণ গোবর
১০ মণ রেড়ীর খোল
৬ মণ হাড়ের গুঁড়া।

চুঁচুড়ার ফার্ম্মেও জাভা ইক্ষু হইতে বিঘা-প্রতি ৩০ মণের উপর গুড় হইয়াছে। যাহারা বেশী সার দিতে পারিবেন না তাঁহারা যেন এই সকল বিদেশী আখের চাষ না করেন—ঢাকার ফার্ম্মের এই মত। আমাদের দেশী আখের চাষে অত ফলন হয় না, বিঘা-প্রতি ২০।২৫ মণ গুড় হয়, কিন্তু সার কম লাগে বলিয়া উহার চাষেও বিঘা-প্রতি প্রায় ১০০৲ হইতে ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। বিঘা-প্রতি কেবল ১০০ মণ গোবর-সার দিয়া ও বিনা-সিঞ্চনে রাজসাহী ফার্ম্মে ১৯১১—১২ সালে নিম্ন-লিখিত পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভেল্লামুখী নামক ইক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আখের নাম	প্রতি বিঘার খরচ	প্রতি বিঘার উৎপন্ন গুড়	প্রতি বিঘার লাভ
গেণ্ডারী	৪০৲	২৪	১১৫৲
শ্যামসারা	৩২৲	২৭	১৪১৲
ভেল্লামুখী	৩৫৲	২৮	১৪৮৲
দেশীয় খাগড়ী	৩১৲	২১	১০৯৲

তবেই দেখা যাইতেছে যে ইক্ষুর চাষে খরচ-বাদে বিঘা প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ হইবার খুবই সম্ভাবনা। ১৫০৲ টাকার জায়গায় ১০০৲ টাকা লাভ হইলেও ১২ বিঘা জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষুর চাষ করিলে বৎসরে ১২০০৲ টাকা অথবা মাসে ১০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। এই ১২ বিঘা জমির চাষের খরচের জন্য চারি-পাঁচশত টাকা মূলধন হইলেই চলিতে পারে। যাঁহারা বেশী উপার্জ্জন করিতে চাহেন তাঁহারা ১০০ বিঘায় চাষ করিলে মাসে ৪০০।৫০০ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। (বিদেশী আখের cuttings পাইতে হইলে রাজসাহী ডিভিসনের অধিবাসীরা Superintendent of Agriculture, Rajshahi Divisionএর নিকট আবেদন করিলে পাইবেন। অন্যান্য ডিভিসানের অধিবাসীরা তত্রত্য কৃষি-বিভাগের Superintendentএর কাছে আবেদন করিতে পারেন।)

(২) তামাকের চাষ—তামাকের চাষ আর একটি লাভজনক কৃষিকার্য্য। রংপুরের বুড়ির হাটে কৃষি ফার্ম্মে বিভিন্ন জাতীয় তামাকের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছে যে সুমাত্রা দেশ হইতে আনীত চুরুটে বহিরাবরণের উপযোগী

তামাকের চাষ বঙ্গদেশে অন্ততঃ রংপুর জেলায় খুব ভাল হইতে পারে। উপযুক্ত সার দিয়া ১৯১০—১১ সালে তিন বিঘায় ১৪১৮-॥৵০ আনার সুমাত্রা তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল এবং মাত্র ২২৪৶০ আনা খরচ হইয়াছিল, সুতরাং খরচ-বাদে ১১৯৪৶০ আনা লাভ হইয়াছিল। ১৯১১—১৯১২ সালেও তিন বিঘা-প্রতি খরচ-খরচা বাদে ৬২৪৲ টাকা লাভ হইয়াছিল। খুব কম করিয়া ধরিলেও এইরূপ তামাকের চাষে এই সকল রিপোর্ট পড়িয়া বিঘা-প্রতি ১৫০৲ টাকা লাভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে।

(৩) আলুর চাষ—আলুর চাষে অত লাভ না হইলেও বিঘা-প্রতি পঞ্চাশ ষাট টাকা হইতে পারে। বিভিন্ন কৃষিফার্ম্মে পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে অনেক স্থানে দার্জ্জিলিংএর আলুর বীজ হইতেই আলুর সমধিক ফলন হয়। ১৯১১—১২ সালে রাজসাহী ফার্ম্মে তিন প্রকার আলুর বীজ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ লাভ হইয়াছিল।

আলুর নাম	প্রতি বিঘায় খরচ	প্রতি বিঘায় উৎপন্ন আলু	প্রতি বিঘায় লাভ
ইটালীয়	২৯৲	৩৮ মণ	৪৯৲
দার্জ্জিলিং	২৩৲	৪৮ „	৭৬৲
নৈনিতাল	৩০৲	২২ „	১৫৲

দেখা যাইতেছে যে দার্জ্জিলিংয়ের আলু হইতে লাভ সব-চেয়ে বেশী। রংপুর আদর্শ কৃষি ফার্ম্মে ১৯১১ সালে বরবটীর সবজি সারের (Green manne) ব্যবহারে প্রতি তিন বিঘায় ২৫৫ মণ দার্জ্জিলিং আলু উৎপন্ন হইয়াছিল এবং খরচ-বাদে তাহাতে ১৯৩ টাকা লাভ হইয়াছিল।

উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে ফার্ম্মে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অন্ততঃ এই তিন দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন এক বা ততোধিক দ্রব্য চাষ করিতে পারিলে উদরান্নের ব্যবস্থা কৃষি হইতেই হইতে পারে। আরও সুবিধা এই যে ঐ তিন দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য আদৌ ভাবিতে হইবে না। কারণ আমাদের দেশে গুড়, আলু ও তামাকের কাট্‌তির অভাব নাই। যাঁহার যেরূপ পুঁজি ও সামর্থ্য তিনি পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ বা একশত বিঘা চাষ করিয়া দেখিতে পারেন। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা আছে—নিজে খাটিতে হইবে। পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, নিজেকে সব দেখিতে-শুনিতে হইবে। পরিশ্রম করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাঠে যাইতে হইবে। তাহার উপর যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা কৃষি-বিভাগের অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশেরই কৃষির উন্নতির জন্য দেশের স্থানে স্থানে ফার্ম্ম খুলিয়া বিবিধ পরীক্ষা করিতেছেন। সেই সকল পরীক্ষিত ফল যদি আমরা কার্য্যক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে না পারি তাহা হইলে বাস্তবিকই আমরা কৃপার পাত্র। এ কথা কেহ যেন মনে না করেন যে এই সকল ফার্ম্মে ঘোড়ার দ্বারা, ষ্টিম বা বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রে কার্য্য হয়। সেখানেও সাধারণ লাঙ্গলাদি যন্ত্র অথবা তাহাদের কোন উন্নত সংস্করণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে সার প্রভৃতি যেরূপ ও যে পরিমাণে দিবার উপদেশ থাকিবে

তাহার যেন ব্যতিক্রম না হয়। প্রথমেই জমির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ফল কৃষি-বিভাগের কোনও কর্ম্মচারীকে জানাইলে তিনি সেই জমিতে কোন্ দ্রব্যের চাষ প্রশস্ত এবং কি কি সার কত পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ চাষ করিতে পারিলে ফার্ম্মে প্রাপ্ত ফসলের সমান পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইবে, নচেৎ সস্তায় সারিতে যাইলে আশানুরূপ ফসলের অপ্রাপ্তিতে বেচারি কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীগণকে যেন গালি না দেন। জমির জন্য যে খুব বেশী চিন্তিত হইতে হয় তাহা নহে। দশ পঁচিশ বিঘা জমি, ক্রয় করিয়া না হউক, খাজনা করিয়া লওয়া কিছু শক্ত নহে; চারি পাঁচ শত টাকা মূলধন অন্ততঃ ধার করিয়া সংগ্রহ করাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব নহে।

মাঠে কৃষি-প্রদর্শন।

এইত গেল শিক্ষিত সমাজের কথা। দেশের কৃষকেরাত নিরক্ষর। তাহারাত কৃষি-বিভাগের রিপোর্ট পড়িয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে উন্নত কৃষিবিস্তার কথা মুখে বলিয়া দিলেও তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিবে না। সেই জন্য রাজা মান্ধাতার আমলে যে কৃষি-পদ্ধতি. ও যন্ত্রাদি প্রচলিত ছিল, তাহাই এতাবৎ কাল চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য কৃষিকার্য্যে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা তাহার সহায়; কিন্তু অনেক বিষয়ে উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভবপর। উপযুক্ত সার-প্রয়োগে উন্নত কৃষি-বিস্তার (Intensive cultivationএর) তথ্যগুলি, নূতন যন্ত্রাদির ক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে গিয়া তাহাকে হাতে-কলমে না দেখাইয়া দিলে সে কিছুই বিশ্বাস করিবে না। এই জন্য হাতে-কলমে কৃষি-শিক্ষাদান (Field demonstration) একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয়, গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া এ-বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন; বঙ্গদেশের এক এক ডিভিশানে এক-একজন বিশেষজ্ঞ Superintendent of Agriculture, নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে কয়েকজন District Inspector আছেন এবং তন্নিম্নে অনেকগুলি Dimonstrators নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের কার্য্য মাঠে গিয়া হাতেকলমে কৃষকগণকে উন্নত কৃষি দেখাইয়া এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করাইয়া দেওয়া। কৃষি ফার্ম্মে এতদিন কেবল পরীক্ষাই চলিতেছিল। ইঁহাদের পরীক্ষার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই, ইঁহারা পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি আনিয়া কৃষকের মাঠে পঁহুছিয়া দিবেন। বলা বাহুল্য দেশে কৃষির উন্নতি করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ভারত-গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কৃষি-বিভাগের যে কনফারেন্স বসাইয়া ছিলেন তাহাতেও এই মাঠে-কৃষি-শিক্ষাদানের প্রথার সমধিক চলন ভারতের কৃষির উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক কৃষক যদি স্বচক্ষে দেখে যে উপযুক্ত সার দিয়া তাহার ফসল দ্বিগুণ বা তিনগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা হইলে তাহার চিরানুসৃত পন্থা সে নিশ্চয়ই বদলাইবে। বাঙ্গালা দেশের কৃষি-বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে অবগত হই যে, ইহার মধ্যেই এই উপায়ে

অনেক উপকার দর্শাইতেছে। এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বিঘা-প্রতি একমণ হাড়ের গুঁড়া সার দিলে ধানের ফলন অনেক বাড়ে, এমন কি স্থলবিশেষে দুই গুণেরও বেশী ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আরও সুবিধা এই যে হাড়ের গুঁড়ার সার একবার ব্যবহৃত হইলে তিন বৎসর আর সার লাগে না। কৃষি-বিভাগ হইতে প্রথমতঃ বিনামূল্যে বা নাম-মাত্র মূল্যে হাড়ের গুঁড়া অনেকগুলি কৃষককে দেওয়া হইয়াছিল এবং কৃষি-প্রদর্শকেরা তাহার ব্যবহার দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফল ক্রমশঃ এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে হাজার হাজার মণ হাড়ের গুঁড়া জমিতে এখন সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং লোকে অগ্রিম টাকা দিয়াও কৃষি-বিভাগ হইতে হাড়ের গুঁড়া পাইতেছেন না।

পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষ বড় বেশী প্রচলিত ছিল না। সম্প্রতি কৃষি-বিভাগ কয়েক বৎসর ধরিয়া দার্জ্জিলিং-আলুর বীজ আনাইয়া নাম-মাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে প্রজা-দিগকে দিতেছেন এবং কৃষিপ্রদর্শকগণ উহার চাষ দেখাইয়া দিতেছেন। তাহার ফলে এই কয় বৎসরে ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় এখন আলুর চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষিবিভাগ আশা করেন যে আলুর চাষ অদূর-ভবিষ্যতে পূর্ব্ববঙ্গে একটি সাধারণ কৃষি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এইরূপে নানাবিষয়ে ইতিমধ্যে উন্নতি দেখা যাইতেছে ও আশা হয় ভবিষ্যতে সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে। আমার নিবেদন এই যে, সরকার-বাহাদুরের নিযুক্ত এই সকল কৃষি-প্রদর্শককে যেন আমরা উপযুক্তরূপে খাটাইয়া লইতে পারি। যদি আমরা নিজ নিশ্চেষ্টতার ফলে এই সকল প্রদর্শকের সাহায্য পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশে উন্নত কৃষির প্রচলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়টি আমাদেরই দোষে প্রসার লাভ করিতেছে না।

প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষিবিদ্যা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষি আমাদের দেশের সার্ব্বজনীন শিল্প। সেই জন্য কৃষির উন্নতি-কল্পে সার্ব্বজনীন কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বলাবাহুল্য কৃষিশিক্ষাও শিক্ষা। পুসা, সাবোর, পুনা ও নাগপুরে কৃষিশিক্ষার জন্য বড় বড় কলেজ আছে, সেখানে অধ্যয়ন করিলে কৃষিবিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারা যায়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কৃষিবিদ্যার প্রচলন নাই বলিলেই হয়। দেশের সার্ব্বজনীন শিক্ষা যদি দেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্পের শিক্ষা হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সেটা নিতান্ত অন্যায় হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমি সেই জন্য মনে করি যে অন্তত পল্লীগ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে কৃষি-শিক্ষা অল্লাধিক প্রচলিত হওয়া উচিত। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় ছেলেরা পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করে। জানি না যাহারা পরে কলেজে না পড়িবে, এ বিদ্যা তাহাদের কোন কাজে

আসিবে। কিন্তু উন্নত কৃষিবিদ্যা যদি কিয়ৎ-পরিমাণে মাতৃভাষায় নিম্ন-স্কুল-সমূহে পঠন-পাঠনের বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহা অন্ততঃ কৃষি-জীবীর পুত্রের পরে কাজে আসিতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ; প্রথম ছাত্রের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন, দ্বিতীয় অন্ন-সংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণ। যে শিক্ষা নিভাঁজ সাহিত্যিক ধরণের (literary) তাহাতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সাধারণের মধ্যে কৃষি-শিক্ষা-বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা একমত নহেন দেখিতেছি। লক্ষ্ণৌয়ে গত তৃতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলনের কৃষি-বিভাগের সভাপতি ও পুসা কৃষি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কভেন্টি্ সাহেব এইরূপে শিক্ষা-প্রচলনের সমধিক পক্ষপাতী; কিন্তু যে কৃষি কনফারেন্সের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এরূপ শিক্ষায় কোন লাভ হইবে না। এই কনফারেন্সে শিক্ষা-বিভাগের লোক খুব কম থাকাতে শিক্ষার দিকটা ভাল করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। বাস্তবিক জাতীয় শিক্ষা জাতীয় অভাব পূরনেরই জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। সেজন্য এ ক্ষেত্রে জাতীয় সর্ব্ব-প্রধান জীবিকার উপায়কে বাদ দিয়া কোন প্রকার শিক্ষা ফলপ্রদ হইতে পারে না।

কৃষক-সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা

কৃষিশিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও কৃষিজীবী ও কৃষকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ত অন্ততঃ চাই-ই। আমাদের দেশের কৃষকগণ একেবারে নিরক্ষর। কৃষির উন্নতির কথা ত দূরে থাক্, সামান্য হিসাব-নিকাশ পর্য্যন্ত ভাল করিতে না পারায় বহু নীচপ্রকৃতি মহাজন তাহাদিগকে ঠকাইয়া থাকে, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। কৃষককুলের ঋণভার (indebtedness of peasants) তাহার অজ্ঞতার প্রধান কুফল। ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে তিন কোটি ষাট লক্ষ বালকবালিকা স্কুলে যাইবার বয়সপ্রাপ্ত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ অর্থাৎ শত-করা কুড়িজন মাত্র শিক্ষার্থী। মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভদ্রসন্তান, কারণ ভদ্রসমাজে শিক্ষা আইনতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ বাধ্যকরী। অবশ্য যতদিন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয়মুক্ত ও বাধ্যকরী না হইতেছে ততদিন কৃষক-সন্তানের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইবে না। তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন কৃষক-সন্তানগণের শিক্ষার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? আসামের চা-বাগানের অথবা কয়লার খনির কুলিদের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাহেব-ম্যানেজারেরা বিস্তর স্কুল স্থাপন করিয়াছে, আর যাহারা স্বীয় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অন্ন উৎপাদন করিয়া দিতেছে, তাহাদের সন্তানগণকে সামান্য শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষিত-সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে কি দায়ী নহেন? আমার মনে হয় অন্ততঃ যদি প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত

হয় তাহা হইলে অনেক কৃষকসন্তান শিক্ষা লাভ করিতে পারে। চারি পাঁচ গ্রাম পার হইয়া কৃষকসন্তান যে শিক্ষা করিতে যাইবে না ইহা নিশ্চিত; অতএব আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে নিজ নিজ গ্রামে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরূপ স্কুল স্থাপন করিতে ও তাহা চালাইতে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না, গ্রামবাসীরা একটু চেষ্টা করিলেই হয়। এ সম্বন্ধে আমার একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব আছে। স্কুল-কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ সন্নিকট। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে কলেজের ছাত্রেরা তিন মাস ও স্কুলের ছেলেরা দেড়মাস ছুটি পায়। এইরূপ কলেজের ছয় ক্লাসের ও স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত যুবক এই গ্রীষ্মাবকাশে তাহাদের স্বগ্রামে ফিরিয়া যায়। এই সময়টা যদি তাহারা তাস পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ায় ব্যয় না করিয়া গ্রামে অন্ততঃ একটি স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে তাহা হইলে মনে হয় অনেক কাজ হইতে পারে। তাহাদিগকে অর্থ দিতে হইবে না, তাহারা কেবল চাঁদা প্রভৃতি যোগাড় করিয়া স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। চাঁদা দিতে অনেকে প্রস্তুত, কিন্তু যোগাড় করিবার লোকের অভাব। যুবকেরা যদি এরূপ চেষ্টা করেন তাহা হইলে পঞ্চাশ জনের মধ্যে মাত্র এক জনও কৃতকার্য্য হইলে বৎসরে এক হাজার প্রাথমিক স্কুল আমরা নিজেরাই স্থাপিত করিতে পারি। এ বিষয়ে ছাত্রেরা কি একটু মনোযোগ করিবেন? আমাদের মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ভারতীয় শ্রমজীবীগণের শ্রম মধুময় করিবার জন্য, এইরূপ বহু বিদ্যালয় (a network of schools) স্থাপিত হইতে দেখিলে নিতান্তই সুখী হইবেন।

কৃষকের কর্ম্মশক্তি ও ম্যালেরিয়া

কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষিজীবী ও কৃষকের কর্ম্মশক্তির প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া। ভদ্র-সন্তানকে কৃষিজীবী হইতে হইলে তাঁহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, কিন্তু বঙ্গের গ্রামগুলি ক্রমশঃ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার শতকরা অন্ততঃ নব্বই জন হয় কৃষিজীবী ভদ্রসন্তান না হয় কৃষক; কারণ সহরে ম্যালেরিয়া কমই হইয়া থাকে। তাহার পর মনে রাখিতে হইবে যে, যে-স্থলে এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশ জন। এই কাল-ব্যাধিতে বঙ্গের কৃষককুলের স্বাস্থ্য এবং সেই জন্য কর্ম্মশক্তি (efficiency of labour) কত নষ্ট হইতেছে, তাহা পল্লীগ্রামের কৃষকগণের শীর্ণ দেহ ও প্লীহাযকৃৎসংযুক্ত উদর দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। প্রভূত সারসংযোগে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া কি লাভ, যদি কৃষকের কর্ম্মশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে? সেই জন্য, মনে হয়, দেশের কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে অগ্রে এই ব্যাধির নিরাকরণ করিতে হইবে।

সুখের বিষয় আজকাল দেশের ও দশের দৃষ্টি এই বিষয়ে পতিত হইয়াছে:

ফলে এ সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করিতে হইলে দেশের সমস্ত পুকুর ভরাট করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, নদীর মোহানা খুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা বহু ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। তাহা যত দিন না হইতেছে ততদিন আমরা বঙ্গের পল্লী-বাসী গৃহস্থেরা নিজেকে ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে যাহাতে ম্যালেরিয়ামুক্ত রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা কি করিব না? বিশেষজ্ঞেরা যেমন একদিকে পুকুর ভরাট ও জঙ্গল পরিষ্কার করিবার উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তিগতভাবে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কতকগুলি উপায়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেগুলি পালন করিয়া নিজেকে সুস্থ রাখিতে সচেষ্ট হই না কেন? এ সম্বন্ধে আমার দুই-একটি বক্তব্য আছে —নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ—বিশেষজ্ঞেরা বহু পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিয়াছেন যে দূষিত বায়ুর দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয় না, এনোফিলিস নামক মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তিমূলক এই বৈজ্ঞানিক তথ্য গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। মশা কামড়াইলে ম্যালেরিয়া হয় একথা স্বগ্রামে গিয়া কাহাকেও বলিলে তিনি তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। এই অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলে পল্লীগৃহস্থ ও কৃষক মশক-কুল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে শিখিবে। সুখের বিষয় নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার Social Service League এই বিষয়ে বঙ্গভাষার প্রবন্ধ লিখিয়া অনেককে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে যে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, এ প্রবন্ধ পড়িবে কয় জন? আমার মনে হয় আলোকচিত্রের (lantern slides) সাহায্যে গ্রামে গ্রামে যাহাতে এ বিষয়ে বক্তৃতাদি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন এম, বি, ডাক্তারকে এইরূপ আলোকচিত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও নিবারণ সম্বন্ধে দেশের যাবতীয় সরকারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজসাহীতে গত বৎসর এবং এ বৎসর আমি এই বক্তৃতা শুনিয়াছি। দেখিলাম, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দেশের অজ্ঞতা দূর করিবার পক্ষে এইরূপ বক্তৃতাই প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ শ্রোতৃবর্গ আলোকচিত্রের সাহায্যে দেহে ম্যালেরিয়া বিষ কিরূপে সংক্রামিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং কোন্ কোন্ প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্ত থাকিতে পারি তাহা সম্যক বুঝিতে পারেন। গ্রামে গ্রামে যদি এইরূপ বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ বক্তৃতার জন্য এম, বি, ডাক্তার নিযুক্ত করা বহুব্যয়সাপেক্ষ; কারণ অনেক ডাক্তার প্রয়োজন। স্বল্পশিক্ষিত ডাক্তার এমন কি পাশ করা কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে

জ্ঞাতব্য বিষয় শিখাইয়া এবং এক এক সেট আলোকচিত্র দিয়া যদি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার জন্য পাঠান যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার নিদান ও নিবারণ সম্বন্ধে পল্লী-গৃহস্থ ও কৃষকের অজ্ঞতা অতি অল্পদিনেই দূরীভূত হইতে পারে। Social Service League এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখিলে ফল মন্দ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়—বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে মশক-দংশন নিবারণের জন্য রাত্রে মশারি ব্যবহার ও কুইনিন ঔষধ প্রতিষেধকরূপে সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। আমরা কুইনিন ম্যালেরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহার করি, কিন্তু উহা যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক তাহা সকলে অবগত নহি। সপ্তাহে বারো গ্রেন কুইনিন সেবন করিলে উহা প্রতিষেধকের কার্য্য করে এবং যে সকল সাহেব কর্ম্মোপলক্ষে পল্লীগ্রামে থাকেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কুইনিন এইরূপে প্রতিষেধক-রূপে সেবন করেন বলিয়া প্রায়ই ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হন না। দেখা যায়, বর্ষার শেষে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। সেই সময় যদি পল্লীগ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মশারি ব্যবহার ও কুইনিন সেবনের দ্বারা কৃষকগণকে কার্য্যতঃ দেখাইতে পারেন যে ঐ উপায়ে নিজেকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে কৃষকগণও ক্রমশঃ তাঁহাদের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিলে ম্যালেরিয়া-সমস্যার নিরাকরণ হইবে না, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া সুস্থ থাকিয়া অশিক্ষিত কৃষক-সম্প্রদায়কে কার্য্যতঃ স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কৃষকগণের স্বাস্থ্যের উপরই তাহার কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

ভারতীর ইতিহাস

(সংক্ষিপ্ত)

এইবার "ভারতী" চল্লিশ বৎসরে পড়িল।

চল্লিশ বৎসর! বাঙ্গলার মাসিক সাহিত্যে এ-এক অভাবিত ঘটনা! যে দেশে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নব-জীবন, সাধনা, জন্মভূমি ও প্রদীপ প্রভৃতি বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র-পত্রিকা বঙ্কিম-কথিত 'জলবুদ্বুদে'র মতই উদয় ও বিলয় লাভ করিয়াছে, সেই মরণ-সুলভ দেশে "ভারতী" যে এতকাল আপন সাহিত্য-ব্রতে অবিচল থাকিতে পারিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। "ভারতী" সুধু বাঁচিয়া নাই, উত্তপ্ত যৌবনের

স্ফূর্ত্তিতে এখনো তাহার অন্তর-আত্মা উচ্ছ্বসিত। এক বসন্তের ফুল-সম্ভার সে চিরকালের সম্বল করে নাই—"ভারতী"র চির-শ্যামল কুঞ্জবনে বহু-বসন্তের পুষ্পিত আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে। সে কখনও আপন অঞ্চলে কেবলই পুরাতনের ঝরা ফুল সঞ্চয় করিয়া বসিয়া থাকে নাই—বরাবরই সে নূতনকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছে! ইহাই তাহার সার্থকতার গুপ্তমন্ত্র।

"ভারতী"র অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা দুইখানি মাসিক-পত্রিকা বঙ্গভাষায় আছে,—তত্ত্ব-বোধিনী ও বামাবোধিনী। কিন্তু "ভারতী"র সঙ্গে সে দুখানির ধরণ-ধারণ, গতি ও ভঙ্গী ঠিকমত মেলে না।

মাসিকপত্রের দুটি বড় গুণ আছে। প্রথম, তাহা সমসাময়িক যুগের দর্পন;—দ্বিতীয়, তাহা দ্বারা আবর্জ্জনা সরাইয়া সাহিত্য গড়িতে পারা যায়।

গত উনচল্লিশ বৎসরের "ভারতী"র ভিতরে প্রবেশ করিলে আমাদের দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের কত বিস্মৃত স্মৃতির সন্ধান পাওয়া যায়! "ভারতী"র প্রথম-প্রকাশ-কালে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য শৈশব-দশা পার হয় নাই। সেই শৈশব হইতে সাহিত্যের আজিকার এই যৌবন পর্য্যন্ত, তাহার প্রাণে যত আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহার জীবন-গতি যখন যেদিকে ফিরিয়াছে, বাঙ্গলা ভাষা লইয়া যখন যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, যখন যে আন্দোলন হইয়াছে, "ভারতী"র পত্রে পত্রে সে-সমস্ত চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে! সমসাময়িক যুগের সমাজনীতি, রাজনীতি, ললিতকলা, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের কথা এবং সর্ব্ববিধ চিন্তার অনাহত ধারা গত উনচল্লিশ বৎসরের "ভারতী"তে পাওয়া যায়—অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে এত-বড় মিলন-সেতু বাঙ্গলার মাসিক-সাহিত্যে এই একটি-বৈ ৩টি নাই।

তাহার পর, সাহিত্য-গঠন। উনচল্লিশ খণ্ডের "ভারতী"তে কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কথা-সাহিত্য, ভ্রমণ-কাহিনী, রাজনীতি, সমাজনীতি, ললিত-কলা, শিল্প, অর্থশাস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নীতি ও ধর্ম্ম প্রভৃতি মানব-চিন্তার অধিগম্য সকল বিষয় লইয়াই বিস্তৃত বা ধারাবাহিক আলোচনা আছে। "ভারতী" হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া অসংখ্য পুস্তক সাহিত্যক্ষেত্রে যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি পুস্তকের প্রকাশ-কালে সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। "ভারতী"র কয়েকজন নিজস্ব লেখক বিশ্বসাহিত্যে বা বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু "ভারতী"র পসরা এখনও খালি হইয়া যায় নাই; সেখানে এখনও এমন অনেক মাণিক লুকানো আছে, যেগুলিকে পুনঃপ্রকাশ করিলে আমাদের স্থায়ী-সাহিত্য অলঙ্কৃত হইবে। (প্রবন্ধ-শেষে পাদটীকা দেখুন)

এদেশী পাঠকদের রুচি কখন্ কেমনধারা ছিল, "ভারতী"র লেখা ও আলোচিত বিষয়-গুলিতে তাহার প্রমাণ আছে। "ভারতী" যখন প্রথম বাহির হয়, তখনকার পাঠকদের গল্প পড়িবার বা ছবি দেখিবার নেশা এখনকার মত এতটা রঙ্গিন ছিল না। তখনকার প্রতি সংখ্যার মাসিকের

লঘুসাহিত্যে থাকিত দু-একটি কবিতা ও একখানি উপন্যাস (তাহাও ক্রমপ্রকাশ্য), বাদ-বাকী সমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ হইত। সে যুগের তুলনায় এ যুগের পাঠকদের রুচি যে কতটা বিস্তৃত হইয়াছে, প্রথম-সংখ্যার "ভারতী"র সঙ্গে এখনকার যে-কোন এক সংখ্যার "ভারতী" মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। এখনকার "ভারতী" আকারে দ্বিগুণেরও বেশী, বিষয়ে বিচিত্র, গল্প-উপন্যাসে পরিপূর্ণ ও চিত্র-মালায় রমণীয়,—কিন্তু পাঠকদের তৃষ্ণা যেন তবুও বলিতেছে, "আরও দাও—আরও দাও!"

প্রথম-সংখ্যার "ভারতী"র পত্র-সংখ্যা ছিল ৪৮। আলোচিত বিষয়গুলি এই :—

১। ভূমিকা

২। ভারতী (কবিতা)

৩। তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক (ক্রমশঃ)

৪। মেঘনাদবধ কাব্য (সমালোচন—ক্রমশঃ)

৫। জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা (ক্রমশঃ)

৬। বঙ্গসাহিত্য—(ক্রমশঃ)

৭। গঞ্জিকা অথবা তুরিতানন্দ বাবাজির আক্‌ড়া—(রস-রচনা—ধারাবাহিক)

৮। ভিখারিণী—(উপন্যাস—ক্রমশঃ)

৯। স্বাস্থ্য—(ক্রমশঃ)

১০। সম্পাদকের বৈঠক—(বৈদেশিক সাহিত্য)

এই ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধে পূর্ণ, চিত্রহীন, গল্পশূন্য "ভারতী" যদি একালে বাহির হইত, তবে প্রথম-সংখ্যাতেই বোধ করি তাহার পরমায়ু শেষ হইয়া যাইত! আসল কথা, তখনকার পাঠকেরা এখনকার চেয়ে ঢের-বেশী ধৈর্য্যশীল ও অল্পে-তুষ্ট ছিলেন। মাসিক-পত্রে সাহিত্যের ভাগ বেশী করিয়া পাইলেই তাঁহারা যে খুসী হইতেন, সমালোচন-মূলক প্রবন্ধগুলিতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। সে-যুগে পাঠকদের রুচি খুব বিস্তৃত না হইলেও যে বেশ উন্নত ছিল, প্রথম-সংখ্যার 'ভারতী'র সূচীপত্র দেখিলে তাহাও বুঝা যায়।

"ভারতী"র যোগাসনে বসিয়া একজন-মাত্র পুরোহিত বঙ্গবাণীর আরতি করেন নাই। "ভারতী"র সুদীর্ঘ জীবনে কয়েকবার সম্পাদক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঙ্গলার আর কোন সাহিত্য-পত্রিকায় এতবার সম্পাদক বদল হয় নাই। নিম্নলিখিত সম্পাদক ও সম্পাদিকার তত্ত্বাবধানে "ভারতী" যথাক্রমে পরিচালিত হইয়াছে।

সম্পাদক		সাল
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১২৮৪-১২৯০
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	১২৯১-১৩০১
শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী	...	১৩০২-১৩০৪
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৩০৫
শ্রীমতী সরলা দেবী	...	১৩০৬-১৩১৪
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	১৩১৫-১৩২১
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়		১৩২২—

দেখা যাইতেছে, গত উনচল্লিশ বৎসরের ভিতরে ত্রিশ-বৎসর-কাল, "ভারতী"র পালন-

ভার বঙ্গমহিলার হস্তে ন্যস্ত ছিল। "ভারতী"র মত এত-বড় একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রিকা যে প্রধানত বঙ্গ-মহিলার প্রতিভা ও শক্তির প্রসাদে এত কাল পরিপুষ্ট হইতে পারিয়াছে এ-কথা মনে করিলেও প্রাণে আনন্দ হয়। যে-দেশে যোগ্য পুরুষ-সম্পাদক দুর্লভ, সে-দেশে স্ত্রী-শিক্ষার অনাদর-সত্ত্বেও যে এমন গুণবতী তিনজন মহিলা-সম্পাদক পাওয়া গিয়াছে এ-বড় আশ্চর্য্য কথা! বিশেষ, আমাদের দেশে মহিলার পক্ষে প্রথম-শ্রেণীর একখানি মাসিক নিয়মমত চালানো যে কত-বড় শক্ত কথা, ভুক্তভোগী ভিন্ন আর-কেহ তাহা বুঝিবেন না।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সর্ব্বশুদ্ধ আঠারো বৎসর কাল 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছেন;—অর্থাৎ 'ভারতী'র গত-জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশকাল তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হইয়াছে। মাঝে 'ভারতী'র সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলেও 'ভারতী'র সেবাব্রত তিনি কথনই ত্যাগ করেন নাই। 'ভারতী'র প্রায় সমগ্র গত-জীবনই তাঁহার নিপুণ হস্ত-চিহ্নে সমুজ্জ্বল। তিনি যে সুধু 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা নহে;—বঙ্গবাণীর চরণে তিনি যতগুলি সাধনার ফুল নিবেদন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সর্ব্বাগ্রে 'ভারতী'র কমল-বনেই মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। নানা কারণে 'ভারতী'র দুইবার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল; সেই সঙ্গিন মুহূর্ত্তে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী যদি 'ভারতী'র লালন-ভার না লইতেন, তাহা হইলে "বঙ্গদর্শন" "আর্য্য-দর্শন", "বান্ধব" ও "নবজীবনে"র মত "ভারতী"ও আজ কাল-স্রোতে বাসি ফুল-মালার মত ভাসিয়া যাইত। সুতরাং "ভারতী" যে আজ এমন দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের এতটা উন্নতি করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর প্রতিভা, এ-কথা বলিলে কিছু বেশী-বলা হইবে না। কিন্তু এই মাননীয় মহিলা-সম্পাদকের অপূর্ব্ব সম্পাদন-প্রতিভার কথা লইয়া আজ পর্য্যন্ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কাহাকেও কিছু বলিতে শুনি নাই অথবা সাহিত্য-পরিষদেও তাঁহার জন্য কোন সংবর্দ্ধনার আয়োজন হয় নাই—বাঙ্গালীর এ অকৃতজ্ঞতা মার্জ্জনীয় নহে।

১২৮৪ সালে আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ যথন "ভারতী"র জন্মদান করেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন একালের মত মাসিক কাগজের 'হরির লুট' ছিল না। বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" তখন মৃত; সঞ্জীবচন্দ্র সবে তাহাকে আবার সঞ্জীবিত করিয়াছেন। বঙ্কিম "বঙ্গদর্শনে" প্রথম যে সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সে সুর তখন কতকটা নামিয়া পড়িয়াছে। দেশে প্রথম-শ্রেণীর মাসিকপত্র আরও দুই-তিনখানি ছিল,—"বান্ধব" তাহাদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু পাঠক-সাধারণের চিত্তক্ষুধা কেবল তাহাদের দিয়া মিটিত না—সে-সময়ে "বঙ্গদর্শনে"র মত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আর-একখানি মাসিকপত্রের প্রয়োজন ছিল, তাই "ভারতী"র প্রকাশ।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে "ভারতী"র প্রথম আবির্ভাব। শ্রাবণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত নয় মাসে প্রথম বর্ষ শেষ করিয়া পরবৎসরের বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ-গণনা করা হয়। বিচিত্র-নূতন সুরে ও প্রতিভাবান লেখক-গণের রচনায় "ভারতী" অবিলম্বে সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। 'বঙ্গদর্শনে'র আসরে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি নূতন লেখকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার মাসিকসাহিত্য এতদিন প্রধানত তাঁহাদের সাহায্যেই চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। একদল নবীন ও প্রতিভাবান লেখক "ভারতী"র বীণাঝঙ্কারে সাড়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী। এই নূতন লেখক-সম্প্রদায়ের কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্র-নাথ বঙ্গবাসীকে যে সঙ্গীত শুনাইলেন,—যেমন তাহার মোহন ছন্দ, তেমনি তাহার অপূর্ব্ব রাগিণী! "ভারতী"র লেখার ধরণ নূতন, ভাষার ভঙ্গী নূতন, ভাব নূতন,—দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী'র স্বাতন্ত্র সকলদিকে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিলেন।

"বঙ্গদর্শনে" বাঙ্গলার কথাসাহিত্য সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। 'ভারতী'র আসরে বাঙ্গলার নবযুগের গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। নবযুগের গীতিকাব্যের কবি বিহারীলালের সঙ্গে গান ধরিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী অক্ষয়কুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও কবিপুত্র অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উদীয়মান কবিগণ। তাহার কিছু পরে আনন্দের কবি দেবেন্দ্রনাথ ও হাসির কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আসিয়া নব গীতিকাব্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক, সে কি যুগই গিয়াছে! 'ভারতী'র পদ্মাসনে তখন সবে প্রভাত-'রবি'র প্রথম আলোর রেখাটি আসিয়া পড়িয়াছে। তরুণ কবির প্রাণে তখন নূতন আশা, তাঁহার গানে তখন নূতন যুগের নূতন ভাষা!—গুরুগম্ভীর 'মেঘনাদে'র ধ্রুপদ বাজিয়াছে যে আসরে, সেখানে যে তত-শীঘ্র মুরলীর কোমল গুঞ্জন জমিয়া উঠিবে, সে-কথা তখন কেহ ভাবিতেও পারে নাই! নব-যুগের মাহেন্দ্রক্ষণে সে বিচিত্র স্তোত্র বঙ্গসাহিত্যে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

আর, সাহিত্যে তখন প্রাণের যে বিশুদ্ধ আনন্দ, যে গভীর আবেগ, যে একাগ্র সাধনা দেখা যাইত, একালে তাহাও বোধ হয় দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে!

সাত বৎসর ধরিয়া যোগ্যতার সহি

"ভারতী" সম্পাদন ও বাঙ্গলার মাসিক-সাহিত্যে নবজীবনের ধারা আনয়ন করিয়া প্রতিভাধর দ্বিজেন্দ্রনাথ অবসর লইলেন। এই সময়ে 'ভারতী'র প্রথমবার জীবন-সংশয় হয়। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী যদি সে-সময়ে 'ভারতী'র গুরুভার গ্রহণ না করিতেন, তবে সেই

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

শৈশবেই 'ভারতী'র অকাল-মৃত্যু ঘটিত। সম্পাদন-ভার লইয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী বলিয়াছিলেন ঃ—"আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দররূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্য কার্য্যবশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। আমাদের দেশের এবং বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকাল মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এইরূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। * * * * অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিজ্ঞান, দর্শন, কবিতা, আর উপন্যাসাদি এই সকলগুলিই মাসিক-পত্রিকার সাধারণ আলোচ্য বিষয় এবং এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীতে এই সকল বিষয়ই (অধিকই হউক কি অল্পই হউক) আলোচনা হইয়া আসিয়াছে। আমরাও এখন এ সকল বিষয়ে ভারতীর প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি—আমাদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজকাল এ দেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে। ইত্যাদি।"

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ১২৯১ সালে 'ভারতী'র ভারগ্রহণ করিয়া ১৩০১ সাল পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য-পালন করেন। ১২৯৩ সালে 'ভারতী'র সঙ্গে "বালক"ও এক হইয়া যায়। আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের আমোলে বঙ্গসাহিত্যে 'ভারতী' যে অতুল গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছিল, সম্পাদিকার যত্ন ও পরিশ্রমে তাহার সে গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" ইতিমধ্যে উঠিয়া যায়। ফলে, এ-সময়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'ভারতী'র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ রহিল না,—'ভারতী' বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রধান মাসিক পত্রে পরিণত হইল।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী যে বৎসর 'ভারতী'র সম্পাদিকা হন, সেই বৎসরের শেষভাগে প্রচারিত একখানি বিজ্ঞাপন-পত্রে দেখিতে পাই, "ভারতী অষ্টমবর্ষ অতিক্রম করিয়া

নবম বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মিত-প্রকাশ বঙ্গদেশের আর কোন সাময়িক পত্রিকার ভাগ্যে ঘটে নাই। * * কোন ভারতমহিলা কর্ত্তৃক ভারতীর ন্যায় সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকতা বঙ্গে কেন—ভারতবর্ষে এই প্রথম উদ্যম। * * সকল শ্রেণীর সমালোচকেরই এই মত যে, ভারতীর প্রবন্ধগুলি—বিষয়টি যতই কঠিন হউক না কেন,—লেখার গুণে এত প্রাঞ্জল ও সরল হয় যে তাহা সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারেন।"

উদ্ধৃত স্থল হইতে আমরা জানিতে

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

পারি যে।ঃ—(১) "ভারতী" সেকালে নিয়মিত প্রকাশে সকলের অগ্রণী ছিল। (২) "ভারতী", সমালোচকবৃন্দের প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছিল। (৩) "ভারতী" লেখার সরলতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

১৩০২ সালে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর সুযোগ্য বিদুষী কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী 'ভারতী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী'তে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইঁহারা পাঠক-সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। এখন 'ভারতী'র ভার লইয়া ইঁহারা আপনাদের সম্পাদকীয় কৃতিত্বেরও পরিচয় দিলেন। ইঁহাদের সময়েও 'ভারতী'র নানাদিকে উন্নতি হইয়াছিল। কবিতায় শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর হাত বড় মিষ্ট ছিল। সরলতায় ও ভাবমাধুর্য্যে তাঁহার কবিতাগুলি সকলেরই প্রাণস্পর্শ করিত। দুঃখের কথা, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী তাঁহার কাব্য-চর্চ্চা সম্পূর্ণ করেন নাই।

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র ভার নেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে আসিয়া 'ভারতী'র সুর ও আকার নূতনতর হইয়া উঠিল। "সাধনা" তখন উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ পত্রিকার অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যসেবীরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সুযোগে "সাধনা"র ছাঁচে 'ভারতী'কে নূতনভাবে গড়িয়া তাহার সহিত প্রধানত 'সাধনা'রই সুরসংযোগ করিলেন। বাস্তবিক, এ-বৎসরের 'ভারতী'র সর্ব্বাঙ্গে 'সাধনা'র স্মৃতি এমনভাবে মাখানো, যে, উপরে 'ভারতী'র ছাপ না থাকিলে তাহাকে সহজেই "'সাধনা' বলিয়া ভ্রম হইত।

এক বৎসর পরে, ১৩০৬ সালে শ্রীমতী সরলা দেবী একাকী আবার 'ভারতী'র সম্পাদকের আসন গ্রহণ করেন। এ-সময়ে ছোটগল্পে "ভারতী" বাঙ্গলার আর-সকল মাসিক কাগজকেই হারাইয়া দিয়াছিল। শ্রীমতী সরলাদেবী 'ভারতী'র সুরে আর-একটি নূতন বৈচিত্রের সঞ্চার করিলেন,—তাহা জাতীয়তা। দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে 'ভারতী'র ভেরী-'তে যে দীপক রাগ ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেমন জ্বলন্ত, তেমনি আবেগ-আকুল!

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ-সময়ে 'ভারতী'র সঙ্গে যাঁহারা ভিতরে-ভিতরে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, কেবল তাঁহারাই জানেন যে, 'ভারতী'র সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে শ্রীমতী সরলা দেবীর কিরূপ আগ্রহ, যত্ন ও চেষ্টা ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিভিন্ন সময়ে 'ভারতী'-সম্পাদনে, সম্পাদিকাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী এখনকার সম্পাদকদের মত দীন ছিলেন না। সম্পাদকেরা এখন অনেক সময়ে লেখকদের ভয় করিয়া চলেন। কিন্তু সম্পাদকীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে শ্রীমতী সরলা দেবী অনেক ক্ষমতাবান লেখকের অনধিকার চর্চ্চাকেও মার্জ্জনা করিতেন না,—আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে তিনি বজ্রের মতই কঠোর ছিলেন!

শ্রীমতী সরলা দেবীর সম্পাদকতার শেষ-ভাগে 'ভারতী'র অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। সম্পাদিকা পারিবারিক কারণে বিদেশে বাস করিতেন,—সুতরাং 'ভারতী'র কাযকর্ম্ম দেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যদি

এই সঙ্কট-সময়ে নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির ভিতরেও নিঃস্বার্থভাবে 'ভারতী'র সেবা না করিতেন, তাহা হইলে 'ভারতী'র অবস্থা কি দাঁড়াইত, বলা যায় না।

১৩১৫ সালে 'ভারতী'র অবনতি দেখিয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আবার তাহার ভার গ্রহণ করেন। "ভারতী" আবার পুরাতন আকার ধরিয়া বাহির হয়। ১৩১৬ সালে নূতন যুগের পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাচীনা "ভারতী" চিত্র-রঙ্গিন্ হইয়া উঠে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'কে নূতন শ্রী-ছাঁদ ও নূতন উৎসাহ দিয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৩২১ সাল

শ্রীমতী সরলা দেবী

পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে 'ভারতী'র জন্য পরিশ্রম করিয়া শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় তিনি সম্পাদন-ব্রত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৩২২ সালে নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী'র সম্পাদকীয় আসন পাইয়াছেন।

এক বাদলের ধারা সম্বল করিয়া পুষ্করিণী কখনও পূর্ণ থাকিতে পারে না; বার-বার নব-বর্ষার প্রচুর বারিধারায় পরিপুষ্ট হয় বলিয়াই সে মৃত্তিকা-সার হইয়া যায় না। এইরূপ বারংবার নূতন সম্পাদকের নূতন প্রাণের সংস্পর্শে আসিয়া "ভারতী"র যথেষ্ট উপকার হইয়াছে; অন্য-অন্য অনেক কাগজের মত "ভারতী" তাই বৈচিত্রহীন, নির্জ্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই।

"ভারতী"র কাছে বাঙ্গলার স্থায়ী সাহিত্য অনেক বিষয়ে ঋণী। এ-কালের বঙ্গ-সাহিত্য যাঁহাদের কলমের জোরে টিঁকিয়া আছে, তাঁহাদের অনেকেরই প্রতিভা ও শক্তি "ভারতী"র পদচ্ছায়ালীন পদ্মপত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই দিনে-দিনে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। "ভারতী" যত লেখক গড়িয়াছে, যত নূতন লেখককে উৎসাহ দিয়াছে, এমন আর কেহ নয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত

জলধর সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রতিভা দেবী, সরলাদেবী, ইন্দিরা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, নিস্তারিণী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী প্রভৃতি লেখক-লেখিকাগণ হয় "ভারতী"র আশ্রয়ে প্রাথমিক সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিয়াছেন, নয় "ভারতী"তে লিখিয়াই পাঠকসমাজে পরিচিত হইয়াছেন। এ যুগের অনেক উদীয়মান নবীন লেখকও "ভারতী"রই শিষ্য। "ভারতী"র কমলকাননে আরও কয়েকটি নবীন লেখকের প্রতিভা জলবিন্দুর মত তৃণদণ্ড টলমল করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। যেমন শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, সুকবি শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুকবি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। লেখনীত্যাগ না করিলে ইঁহাদের রচনাগুণে বাঙ্গলা আলো হইয়া উঠিত। (১)

বাঙ্গলাদেশে এখন এমন মাসিক আর নাই,—যাহাতে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি জীবন্ত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—এই দুই সাহিত্য-সম্রাটকেই "ভারতী" আপন লেখকরূপে পাইয়াছে—এ-বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। (২)

(১) ইঁহারা ছাড়া বাঙ্গালার অন্যান্য বিখ্যাত লেখকগণের মধ্যেও প্রায় অধিকাংশেরই লেখা "ভারতী"তে বাহির হইয়াছে। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যে যখন যে লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, "ভারতী"র দেহে তখনই তাঁহাদের হস্তচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। যথা,—বঙ্কিমচন্দ্র, কবিবর হেমচন্দ্র, কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রত্নতাত্বিক রামদাস সেন, চন্দ্রনাথ বসু, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুকবি বরদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, কালীবর বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দেশনায়ক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি। সকলকার নাম করা অসম্ভব। আসল কথা, "ভারতী"তে যেমন নবীন ও প্রবীণ লেখকের সম্মিলন দেখা যায়, তেমন বাঙ্গলার আর-কোন মাসিকপত্রে নহে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের নামে এখানে একটি কথা মনে পড়িল। "প্রচারে" বঙ্কিমচন্দ্র ও "ভারতী"তে রবীন্দ্রনাথ,—এই দুই প্রতিভাবানের মধ্যে পূর্ব্বে একবার মসীযুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্য-রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি এবং রবীন্দ্রনাথ নবীন অতিথিমাত্র। সেই অসম-যুদ্ধে দুইপক্ষই কিছু অসংযত হইয়া রূঢ় বাক্যব্যয় করিয়াছিলেন।

এতদিন পরে, এখনো নিন্দুকেরা সে পুরানো কথাটা ভুলিয়া যান নাই,—এই উপলক্ষ্যে

সাহিত্যের সকল বিভাগই "ভারতী"র ভিতরে স্থানলাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় এখন ভেড়ার লোমের মত মাসিকপত্রের সংখ্যাও অগুণ্তি। সে-সকল কাগজে নানা বিচিত্র বিষয় বাহির হয়। অনেক সম্পাদক আপনাদের নিজস্ব দেখাইবার জন্য নূতন নূতন নামে প্রতিবারেই কতকগুলি বিশেষ বিষয় প্রকাশ করেন; কিন্তু আমরা যদি পুরাতন "ভারতী"র জীর্ণ পাতাগুলি একবার উল্টাইয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিব যে, একালের সম্পাদকেরা অনেক সময়েই নূতনত্বের ছাপ্ মারিয়া "ভারতী"র ব্যবহৃত পুরাণো মালই বাজারে আবার বাহির করিতেছেন।

আমরা এখানে "ভারতী"র নিজস্ব বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি ।:—

১। হেঁয়ালিনাট্য (ভারতীর সম্পূর্ণ নিজস্ব)

২। স্বরলিপি—(ঐ)

৩। ভৌগলিক প্রশ্ন—(ঐ)

৪। কুড়ানো (চুটকী গল্প)

৫। সম্পাদকের বৈঠক

(দ্বিজেন্দ্রনাথের আমোলে "ভারতী"তে নিয়মিত বাহির হইত। এই বিভাগে বিদেশের স্থায়ী ও সাময়িক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণগুলি ধারাবাহিকরূপে উদাহৃত হইত। বাঙ্গলা মাসিকসাহিত্যে সঙ্কলনের নিয়মিত চেষ্টা, এই প্রথম। এখন সঙ্কলন, সকল মাসিকপত্রেরই একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।)

৬। বিবিধ প্রসঙ্গ—(সুচিন্তিত ছোট ছোট প্রবন্ধ)

৭। সম্পাদকের চিত্রচয়ন

("সম্পাদকের বৈঠকের"ই রূপান্তর। এ বিভাগটি আজকাল "চয়ন" নামে "ভারতী"তে বাহির হইতেছে।)

৮। কাব্যজগৎ

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই বিভাগটিতে এদেশী পাঠকদের সঙ্গে নিয়মিতরূপে বিদেশী বিখ্যাত কবিগণকে পরিচিত করিয়া দিতেন।)

৯। সাময়িক প্রসঙ্গ (পরে "সাময়িক কথা")

১০। সমসাময়িক সাহিত্য—

(রবীন্দ্রনাথ যখন "ভারতীর" সম্পাদক, "ভারতী"তে তখন মাসিক-সাহিত্যের সমালোচনা বাহির হইত। অবশ্য, নিয়মিত মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা "ভারতী"র নিজস্ব হইলেও, "ভারতী"ই এ-পথের প্রথম পথিক নহে।)

১১।—রাজ্যের কথা।

তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি চোখা চোখা বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়েন না। অথচ, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সে হাল্‌কা ব্যাপারটি একেবারেই মনের ভিতরে পুষিয়া রাখেন নাই। কারণ, "ভারতী"তে সেই মসীযুদ্ধের ঠিক পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম 'ভারতী'র লেখক-তালিকায় পাই। এই সামান্য ঘটনা হইতে একালের অনেক শূন্যগর্ভ অভিমানী সাহিত্যসেবী যথেষ্ট শিক্ষা পাইতে পারেন। সাহিত্যক্ষেত্র সত্য-নির্দ্ধারণের ক্ষেত্র; এখানে মতভেদ ও সেই সূত্রে দু-চারিটা কটু-বাক্যের ব্যবহার নর-প্রকৃতিতে খুবই স্বাভাবিক!—কিন্তু সেজন্য যাঁহারা শত্রুতার সৃষ্টি করেন, তাঁহারা একান্ত ঘৃণিত জীব। কোন কাগজে কারণবিশেষে অপ্রিয় সমালোচনা হইয়াছে বলিয়া, যাঁহারা সে কাগজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হন, তাঁহারা যেন সাহিত্য-সম্রাটের এই উদারতার দৃষ্টান্ত মনে রাখেন।

এখন অন্যান্য মাসিকপত্রে দেশের কথা বাহির হয়। দেশের কথায় যাহা থাকে, "রাজ্যের কথা"য় তাহাই থাকিত।

১২।—রাজনৈতিক আলোচনা (এখন "নিষিদ্ধ ফলে" পরিণত।)

১৩। জিজ্ঞাসা-উত্তর

কেহ কোন "প্রশ্ন" পাঠাইলে "ভারতী"র এ-বিভাগে ছাপাইয়া তাহার উত্তর দেওয়া হইত।

১৪। খেয়াল-খাতা (বিবিধ বিষয়ের বিচিত্র আলোচনা—হাল্‌কা ধরণের লেখা। গদ্য ও পদ্য দুই-ই থাকিত।)

১৫। বাঙ্গলা রঙ্গালয় (বা অভিনয়-সমালোচন)

১৫। আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার (এ-বিভাগে বঙ্গের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পদের সংগ্রহণ হইত।)

"ভারতী"র এতগুলি নিজস্ব আছে।

আগেই বলিয়াছি এ-যুগের গীতিকাব্য "ভারতী"র কুঞ্জেই প্রথম ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। গীতিকাব্য ও ছোটগল্প নূতন যুগের নূতন জিনিষ। অনেকেই বোধ করি জানেন না যে, মৌলিক ছোটগল্পও সর্ব্বপ্রথমে "ভারতী"তেই বাহির হইয়াছে। প্রথম বৎরের প্রথম সংখ্যায় "ভিখারিণী" নামে একটি গল্প এবং তৃতীয় বৎসরে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "মালতী" প্রকাশিত হয়। এই দুইটিই অনেকটা ছোট-গল্প-ঘেঁষা; কিন্তু ঠিক ছোট গল্প কিনা তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। "ভারতী"র অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ ১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের "ঘাটের কথা" বাহির হয়। তাহার ভিতরে ছোট গল্পের যথেষ্ট লক্ষণ আছে।

পরবৎসরে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "সুলোচনা" একটি চমৎকার ছোটগল্প। তাহার পর অন্য-কোন মাসিকপত্রে ছোটগল্প বাহির হইবার আগে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির লিখিত ছোটগল্প "ভারতী"তে বাহির হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম ছোটগল্প বাহির হয় "সাহিত্য" পত্রে। আমাদেরও পূর্ব্বে সেই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, এ-কথাটি একেবারেই ঠিক নয়। কারণ "সাহিত্য" যখন জন্মায় নাই, "ভারতী"তে তখন একটি-দুটি নয়,—অনেকগুলি ছোটগল্প প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আবার ছোটগল্পে এখন যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহাদের সকলকার লেখাই "ভারতী"তে আছে।

পুরাতন "ভারতী"তে, প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য-প্রবন্ধ দেখিতাম,—একালের সকল মাসিকেই এদিকটি একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এজন্য সম্পাদকেরা দায়ী,—না, নবরুচির পাঠকেরা?—দায়ী যে-পক্ষই হউন, সাহিত্যের পক্ষে এ-বড় সুসংবাদ নহে। "ভারতী"তে পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্পর্কীয় কত সরস লেখাই থাকিত,—ভাষার কথা, কাব্যের কথা, কবির কথা, সাহিত্য লইয়া আলোচনা, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের বিচার, স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের প্রসঙ্গ এবং সমালোচনা প্রভৃতি এম্‌নি-কত-কি!—এ-সব বিষয়ে তখনকার লেখকদের যেমন আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল, তেমনি বিচার-নিপুণতা ও লিপিকুশলতাও প্রকাশ পাইত। এ-বিভাগে "ভারতী"তে সাধারণত লেখনীচালনা করিতেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ও

শ্রীমতী সরলাদেবী প্রমুখ লেখকলেখিকাগণ। কেবল "ভারতী" বলিয়া নয়,—সে-যুগের আর-আর মাসিকেও সাহিত্য-প্রবন্ধের আধিক্য দেখিয়া বুঝা যায় যে, এখন যেমন গল্প নহিলে কাগজ অচল, তখন তেমনি এ-ধরণের লেখা না থাকিলে কোন কাগজ চলিত না। বলেন্দ্রনাথের প্রাচীন বাঙ্গালী কবির কাব্য-আলোচনা ও শ্রীমতী সরলা দেবীর সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতি একসময়ে "ভারতী"র প্রধান বিশেষত্ব ও বিশেষ লোভনীয় বিষয় ছিল। সাধারণ সাহিত্যপত্রে তাম্রশাসনের এই বিষম শাসনের দিনে, "ভারতী"র সাহিত্য-অংশটি আবার যদি পূরন্ত হইয়া উঠে তবে অনেকেই যে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি!

দলাদলি ও নীচতার জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে বরাবরই নানারূপ অপ্রিয় আন্দোলন হইয়াছে। মাসিকপত্রের একটি প্রধান গুণ হইতেছে তাহার অসাম্প্রদায়িকতা। মাসিক-পত্র কোন দলের বা ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে—সকলের আগে তাহার উপর সর্ব্বসাধারণের অধিকার। মাসিকের সম্পাদক, সকল শ্রেণীর মতামত প্রকাশ করিতে বাধ্য,—কারণ তিনি মধ্যস্থমাত্র। আমরা এ-কথা বলিতেছি না যে, সম্পাদক তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। সম্পাদক যেমন আপনার বা স্বপক্ষের মতও প্রকাশ করিবেন, বিপক্ষের মতও তেমনি নির্ব্বিকার-চিত্তে প্রকাশ করিবেন। এই নীতি যিনি মানিয়া চলেন, তিনিই আদর্শ-সম্পাদক।

"ভারতী" কখনও দলাদলির পঙ্কিল কূপে পড়িয়া আপনার গায়ে কাদা মাখে নাই —অথচ আপন স্বাতন্ত্র্য বরাবর বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। "ভারতী"র পবিত্র সাহিত্য-সাধনার মধ্যে কখনও কোন বিশেষ সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে নাই।

"ভারতী"র নির্ভীকতা ও স্বাধীনতার একাধিক দৃষ্টান্ত তাহার সমালোচনার মধ্যে পাওয়া যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন প্রবল প্রতাপ, তাঁহার বিরুদ্ধে যখন কেহ একটি আঙ্গুল তুলিতেও ভরসা করিতেন না, তখন তাঁহার কবিতাবলীর সমালোচন-প্রসঙ্গে "ভারতী"র সমালোচক স্পষ্ট ভাষায় দেখাইয়াছিলেন যে, কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুই গুণপনা নাই। এইরূপ নির্ভীকতার জন্য "ভারতী" তাহার নিজের-হাতে মানুষ-করা অনেক প্রসিদ্ধ লেখককে শত্রু করিয়াছে. এখানে সে-সব কথা প্রকাশ না করিলেও চলে।

"ভারতী" জনসাধারণের কাগজ; সাধারণের কাছে যাহার আদর, 'ভারতী'ও তাহার আদর করিয়াছে। এদেশের রঙ্গালয়গুলি নানাকারণে শ্রেণীবিশেষের কাছে অনাদৃত ও অপমানিত হইয়া থাকে। ফলে বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের কতগুলি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অনেকে তাহার ভাল দিকটাও অবহেলা করেন। বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের কথা লইয়া যে ভদ্রসমাজে সঙ্গত ও শ্রীল আলোচনা হইতে পারে, নব্যশিক্ষিতেরা তাহা কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। অথচ বাঙ্গলা রঙ্গালয় সাধারণ বাঙ্গালীকে আনন্দ ও শিক্ষা দিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করে না। 'ভারতী'র সূক্ষ্মদর্শী সম্পাদক বুঝিলেন যে, বঙ্গের রঙ্গালয়গুলিতে যখন সাধারণের

গতায়াত আছে, তখন তাহাদের দোষ-গুণের প্রতি উদাসীন থাকিলে সাধারণের অপকার করা হইবে। বিশেষ, অভিনয়-কলা সভ্যতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ,—তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। এইজন্য 'ভারতী'র আবির্ভাবকাল হইতেই তাহাতে বঙ্গ-রঙ্গভূমি লইয়া আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। ফলে জনকত শুচিবায়ুগ্রস্ত নীতিবাগীশ নাসাকুঞ্চন করিলেও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যসাধন ও উদারতার জন্য 'ভারতী' সর্ব্বসাধারণের সমাদর-লাভ করিয়াছিল।

আমরা এইখানেই 'ভারতী'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম। প্রাচীনা 'ভারতী' যখন বাঙ্গলার এই ক্ষণজীবী মাসিক-সাহিত্যের মধ্যে এত ঝড়-ঝাপটা সহিয়াও এতকাল বাঁচিয়া আছে, তখন তাহার জীবন নিশ্চয়ই অনাবশ্যক নহে; অতএব, ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, বর্ষীয়সী হইলেও 'ভারতী' যেন চিরজীবিনী ও চিরযৌবনা হইয়া উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে পারে। (৩)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

(৩) 'ভারতী'র প্রথম প্রকাশকাল হইতে তাহাতে যে-সকল রচনা বাহির হইয়াছে, তাহার সকলগুলি পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের বিখ্যাত দার্শনিক প্রবন্ধ ও তাঁহার কবিতাময়ী রসরচনাগুলি পুরাতনের জীর্ণ কবল হইতে এখনও কেহ উদ্ধার করেন নাই। তা-ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা এখনও "ভারতী"র অজ্ঞাত পৃষ্ঠায় লিপ্ত আছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে;—বিশেষ করিয়া তাঁহার সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি, প্রকাশিত হওয়া উচিত। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কতক লেখা, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলাদেবী'র অসংখ্য উপাদেয় প্রবন্ধাদি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কবিতাবলী, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতিরও বিবিধ রচনা এখনও পুনঃপ্রকাশের দাবি রাখে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এ-গুলি বইএর আকারে বাহির করিলে বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়িবে। শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর গানের স্বরলিপিগুলিও গ্রন্থকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব অসামান্য; শিল্প-কলার একটি দিক তাঁহারা পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। "ভারতী"র পাতায় পাতায় আরও কত ভাল লেখকের কত-যে প্রাণের জিনিষ লুকানো আছে, এখানে সে-সকলের নামমাত্র উল্লেখ করাও অসম্ভব।

"ভারতী"র মধ্যস্থতায় ও সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য যে-সকল রত্নলাভ করিয়াছে এবং যেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-সমাজে অল্পবিস্তর আন্দোলনের সূত্রপাত অথবা লেখককে জনসাধারণের সহিত পরিচিত করিয়াছিল, এখানে তাহার একটি অসম্পূর্ণ (সম্পূর্ণ তালিকার স্থানাভাব) তালিকা দিলাম। -শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বউঠাকুরাণীর হাট, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহের পদাবলী, চিরকুমার সভা, নষ্টনীড় ও গদ্যেপদ্যে বিবিধ রচনা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রায় সমস্ত উপন্যাসই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "লীলা" ও ছোট গল্প। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "ফুলজানি"। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বোম্বাইচিত্র" প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ-সাহিত্য প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকাংশ রচনা। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু রচনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহের অধিকাংশ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। স্বর্গীয়

সাহিত্যিক স্মৃতি

(১)

আজ ১২।১৪ বৎসরের কথা। ভারতী তখন শ্রীমতী সরলা দেবীর হাতে ছিল। তখনকার নানাবিধ আন্দোলন ও সভা-সমিতির সঙ্গে জড়িত থাকিয়া তিনি পত্রিকাখানির জন্য চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন না, আমার উপর প্রায় সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতাম ও নিজে লিখিতাম, তাহা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে "মহতাশ্রমের" পার্শ্বে একখানি দোতালা বাড়ীর উপরে বসিয়া তিনি বেলা ৩টা হইতে ৫½ টা পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই দিন শুনিতেন; এই বাড়ী হইতে বাবু কেদারনাথ দাসগুপ্ত তাঁহার "ভাণ্ডার" নামক মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। বাড়ীটিতে ভারতীর কাজ-কর্ম্মের জন্য একখানি ঘর ছিল, এই ঘরে কোন কোন সময় সাহিত্যিক সুহৃদ্বর্গের মিলন হইত। এইখানে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি ভারতী-সম্পাদিকার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই ঘরে কেদারবাবু প্রায়ই আসিয়া রবিবাবুর কবিতা নানা ভঙ্গীতে আবৃত্তি করিয়া আমার মন বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন বলিয়া আমি সম্পাদিকাকে কহিয়া তাঁহার প্রবেশ মানা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। নানারূপ ফল ও উপাদেয় সন্দেশাদির উপঢৌকন লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিতেন ও আমাদের আইন-কানুন রদ করিয়া দিতেন।

রামদাস সেনের অনেক রচনা। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের হিমালয়। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্র প্রভৃতি। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অনেক কবিতা। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনেক কবিতা ও "দগ্ধকচু।" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উড়িষ্যার চিত্র। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনেক ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী ও রমাসুন্দরী নামে তাঁহার প্রথম উপন্যাস। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের অনেক কবিতা। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রথম উপন্যাস নারায়ণী। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসুর "শারীর-স্বাস্থ্যবিধান। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অনেক কবিতা। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর অনেক কবিতা। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস "স্রোতের ফুল"। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবীর প্রথম উপন্যাস অন্নপূর্ণার মন্দির এবং পোষ্যপুত্র ও বাগ্দত্তা। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস বড়দিদি। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনেক কবিতা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনেক কবিতা। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ রচনা,—প্রভৃতি।

দেখা যাইতেছে, ঔপন্যাসিকরূপে অনেকেরই প্রথম পরিচয় "ভারতী"র আসরে। ইহার কারণ বুদ্ধিমানেরা অনুমান করুন!—লেখক।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় নিজের হাতে নিজের নাম বসাইয়া দিতে সঙ্কোচ করিয়াছেন; তাঁহার নাম উল্লিখিত তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। তিনি অন্তরালে থাকিয়া ভারতীর সেবা করিতেছেন; তাঁহার নিকট আমরা নানারূপে ঋণী। আমরা এই সুযোগে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।—ভারতী-সম্পাদক।

এতদূরে আসিয়া সম্পাদিকার ভারতীর কাজ করিবার কারণ এই যে, তাঁহার বাড়ী বালিগঞ্জ আমার বাড়ী শ্যামবাজার হইতে বহুদূর; এজন্য প্রথম কয়েক মাস বালিগঞ্জ ঘন ঘন যাতায়াত করার পর বালিগঞ্জ যাওয়ার পক্ষে আমার অসুবিধা জানাইয়াছিলাম; এ-জন্যই এই নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

ভারতী-সম্পাদিকা কাজের ভার প্রায় সমস্তই আমার উপর ছাড়িয়া দিলেও পত্রিকা-খানির উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রবন্ধ লিখিবার বেশী অবসর পাইতেন না, -কিন্তু আয়-ব্যয়ের খবরটা তিনি রাখিতেন; —এ সম্বন্ধে ভার ছিল কেদারবাবুর উপর। যেটুকু লিখিতেন, তাহা চমৎকার হইত। কোন কোন সময় পুস্তক সমালোচনা করিতেন। তিনি অতি অল্প কথায় ভাবের সমাবেশ করিতে জানেন, তাঁহার লেখায় বাক্যপল্লব ও বৃথা কথার আড়ম্বর আদৌ নাই, হঠাৎ ছবির মতন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য তাঁহার রচনায় ভাসিয়া উঠে। যাহাতে তাঁহার এই লিপিকুশলতায় ভারতীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, এজন্য আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে তাগিদ্ করিয়া বিরক্ত করিতাম, এই বিরক্তির ফলে তিনি ক্রমাগতঃ প্রতিশ্রুতি দান করিয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতেন। কিছু লিখিতে বসিয়াছেন, অমনই রাণী মৃণালিনী আসিলেন কিংবা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী আসিলেন, নিদেনপক্ষে জোড়াসাঁকোর তলব্ বা চৌধুরী-বাড়ীর নিমন্ত্রণ ত আসিবেই। এই ভাবে অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত।

নূতন সাহিত্যিক দলের মধ্যে শ্রীমান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বালিগঞ্জের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন। তখন মণি তরুণ বালক। মণিকে যেদিন আমি প্রথম দেখি, সেই দিনই আমি তাহার প্রতিভাদীপ্ত মুখখানি ও সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হই। মণিলাল সরলা দেবীকে ভয় করিতেন। তাঁহার কয়েকটি কবিতা তিনি গোপনে আনিয়া আমাকে দেখান, তাঁহার আশঙ্কা ছিল সরলাদেবী কবিতা লেখার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন। সেই সন্তর্পিত, অতি-লজ্জিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কয়েকটি কবিতা আমার বেশ ভাল বলিয়া মনে হইল। একটি ভারতীতে ছাপাইলাম। সরলাদেবী ছাপার পর তাহা দেখিয়া বলিলেন, "আপনি করিয়াছেন কি, ছেলেটির আখের নষ্ট করিতে দাঁড়াইয়াছেন! ইহার পর এ'কে কবিতার রোগে পাইয়া বসিবে।" কিন্তু মণির কতকগুলি কবিতা আমি সম্পাদিকাকে পড়িয়া শুনাইলাম! তাঁহার মুখে প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তা' আমি আগেই জানিতাম, মণির রচনা-শক্তি আছে, কিন্তু সে এখনও বালক, ইহা স্মরণ রাখিবেন।" কিন্তু ইহার পর হইতে প্রায় প্রতি মাসেই মণির কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। আজ শ্রীমান মণিলাল ভারতীর সম্পাদক। তাঁহার রচনার সরল মাধুর্য্য এখন অনেক লেখক অনুকরণ করিতে প্রয়াসী; আমি এই ঘটনায় বিশেষ প্রীত, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতীর অন্যতম সম্পাদক সৌরীন্দ্রবাবু কলেজে পড়ার সময় ভবানীপুরের সাহিত্য-সমিতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য আমাকে প্রায়ই লইয়া যাইতেন, তখন জানিতাম

না—ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। সেই সময় প্রিয়দর্শন, সদাপ্রফুল্ল চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীর পতাকার নীচে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই তরুণের দল এখন লিপি-চাতুর্য্যে প্রবীণের দলকে ছাপাইয়া উঠিতে প্রয়াসী। কিন্তু যেদিন ইঁহারা উদ্দাম উৎসাহ লইয়া সবিনয়ে সাহিত্যিক দলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিনের কথা মনে পড়িলে আনন্দ হয়!

(২)

এই সময় নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শনের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল। রবিবাবু অনেক সময় বোলপুর থাকিতেন; শৈলেশবাবু মাঝে মাঝে কাগজের তাড়া লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইতেন। রবিবাবুর উদ্যোগে বঙ্গদর্শন চালাইবার জন্য ও সাহিত্যিক চর্চ্চার নিমিত্ত আমরা মজুমদার লাইব্রেরীর উপরে একটা সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। রবিবাবু যখন অনুপস্থিত থাকিতেন তখন এই আড্ডায় যতীনবাবু অনেক সময় তাঁহার কীর্ত্তন ও কথকতার নকল শুনাইয়া আমাদিগকে হাসাইতেন। শৈলেশবাবুর নধর কান্তি আজ আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। তাঁহার মুখ হইতে সোজা লাইন নীচের দিকে টানিলে ভুঁড়িটি অন্তত এক ফুট দূরে প্রমাণিত হইত। এই ভুঁড়ি দোলাইয়া হাসি-মুখে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন, তখন বন্ধুবর্গের আহ্লাদের সীমা থাকিত না। কি জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে সকলের বিদ্রূপের লক্ষ্য হইতেন শৈলেশবাবু। বোধ হয় তাঁহার অমায়িক চরিত্র ও নিরীহতা এই বিদ্রূপ আমন্ত্রণ করিত; কেহ বা তাঁহার দেহের পরিসর লক্ষ্য করিতেন, কেহ বা তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, বিশেষ হিসাব রক্ষার বন্দোবস্ত লইয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন। শৈলেশবাবু উত্তর দিতে ছাড়িতেন না, তিনি সকল ঠাট্টাতেই আমোদ অনুভব করিতেন, যেগুলি নিতান্ত তীব্রভাবে তাঁহার গায়ের উপর পড়িত তাহাতেও তিনি হাসিতেন। এমন উদারচেতা ভোলা-মহেশ্বর সংসারে কমই আছে। বঙ্গদর্শনের লেখকবর্গকে তিনি মুক্তহস্তে টাকা দিতেন,—অর্থাৎ যখন হাতে টাকা থাকিত। এই ব্যক্তি অদৃষ্টের কি রহস্যে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন জানিনা, হিসাব-সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান একবারে ছিল না। বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করিতে তাঁহার মত মুক্তহস্ত প্রায় দেখা যায় না। ধার দিলে তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাওয়া বড় শক্ত ছিল, নিজের হউক, পরের হউক টাকা পাইলে তাহা খরচ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না, অথচ যাঁহাদের নিকট হইতে ধার করিতেন, তাঁহারা কিছুতেই নির্ম্মম হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে চাহিতেন না। একজনকে আমি জানি তিনি শৈলেশবাবুকে ৩০০০৲ টাকা ধার দিয়াছিলেন; শৈলেশবাবুর কাছ হইতে কোন ক্রমেই তিনি তাহা আদায় করিতে পারিলেন না, অথচ মেয়াদ চলিয়া যায়। ঋণদাতার অবস্থাও খুব সম্পন্ন ছিল না,—কিন্তু তথাপি তিনি নানা লোকের উত্তেজনা পাইয়াও টাকার জন্য নালিশ করেন নাই, তিনি যাহা আমাকে বলিয়া

ছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। "শৈলেশ কাহাকেও ঠকাইবার মতলব করে না, পরের উপকারের জন্য সে সর্ব্বদা উদ্যত, তাহার দেবচরিত্রের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহার হাতে টাকা না থাকিলে কোথা হইতে দিবে? আমি এরূপ লোককে লাঞ্ছনা করিতে কখনই অগ্রসর হইব না।"

শৈলেশবাবুর "দাদার কাণ্ড" যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার গল্প লিখিবার কেমন সুন্দর ক্ষমতা ছিল, তাঁহার "চিত্র-বিচিত্র" অতি চমৎকার পুস্তক। আমার মনে হয় তাঁহার দাদা শ্রীশ মজুমদার মহাশয় হইতে তাঁহার নিজের লিপি-শক্তি কম ছিল না। ভগবান তাঁহাকে বেশ উচ্চদরের প্রতিভা দিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক আসরে শৈলেশবাবু এমন নিরীহ ভাবে, এমন বিনীত হইয়া থাকিতেন, যেন তিনি সকলের চেয়ে কত নীচু! এই অনাড়ম্বর ভাবটিতে তাঁহার চরিত্র বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার শৈলেশবাবু একটা বড় সাহসিকতার কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু বঙ্গদর্শনের সম্পাদক; তাঁহার নামটার ঠিক্ নীচে শৈলেশ ভায়া নিজের নামটি "সহ-সম্পাদক" বলিয়া ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু হাসিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"সহ-সম্পাদক" নহে, "দুঃসহ সম্পাদক।" আমি তাঁহার ঠাট্টাটি মনে গাঁথিয়া রাখিলাম এবং যখন-তখন তাঁহাকে "দুঃসহ সম্পাদক" বলিয়া পরিহাস করিতাম। শৈলেশবাবু যথারীতি মুখে হাসিতেন বটে, কিন্তু ঠাট্টাটি তিনি বেশ আমোদকর বলিয়া বোধ হয় মনে করিতেন না, কারণ এই উপাধিটি যিনি দিয়াছেন, তাঁহার কথা পাছে এই প্রসঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সভয়ে তিনি কথা অন্য-দিকে পাড়িতে চেষ্টা করিতেন।

একবার শৈলেশবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমি বড় জব্দ হইয়াছিলাম। যেদিন খাওয়াইবার কথা ছিল তাহার দুই তিন দিন আগে আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলাম। নানা কার্য্যের বাহুল্যে আমি একবারে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে দিন বেলা ১২ টার সময় খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আমি আমার গল্পের বই "তিনবন্ধুর" প্রুফ দেখিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম "ধীর কুঞ্জর, গতি মন্থর" শৈলেশবাবু বাহু এবং দেহ দোলাইতে দোলাইতে আসিতেছেন। গৃহ-দ্বারে তাঁহাকে দেখিয়াই আমার নিমন্ত্রণের কথা মনে হইল এবং মুখ শুকাইয়া গেল। তখন বাড়ীর সকলেরই খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। যে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাঁড়ির একটি শাককণা লইয়া বিপদে তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আতঙ্কিত চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে বলিলাম, "এই যে শৈলেশবাবু, আসুন, এত দেরি হইল যে?" শৈলেশ-ভায়া আমার মুখ দেখিয়াই মৌখিক ভদ্রতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া বাজারের লুচি সন্দেশ খাওয়াইয়া বিদায় করিলাম। শৈলেশবাবু ইহার একদিন প্রতিশোধ লইতে চাহিয়াছিলেন। তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অম্ল-মধুর

প্রবীণা ভারতী চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে কিছু বলিবার জন্য বর্ত্তমান সম্পাদক এই অক্ষম ভারতী-সেবককে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতী এককালে আমাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি ঋণী আছি। বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় সেই ঋণ পরিশোধে আমার সামর্থ্য নাই। দুই চারিটা কথা বলিয়া শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষা করিব মাত্র।

শৈশবেই বাঙ্গলা মাসিক-পত্রিকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। আমাদের বাড়ীতে বঙ্গদর্শন যাইত। লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পড়িতাম। সব বুঝিতাম না। বিষবৃক্ষের অধ্যায়ের হেডিং-গুলা,—নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা, কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন-দর্শন, পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে?—ইত্যাদি হেডিংগুলা কিরূপে মনের উপর একটা চমক দিত। তখন বিষবৃক্ষের রস আস্বাদনের ক্ষমতা জন্মায় নাই—অথচ পড়িতাম, লুকাইয়া পড়িতাম।

ক্রমে আর্য্যদর্শন বাহির হইল। তাহাতেই প্রথম জানিলাম যে আমরা আর্য্যজাতি, জানিয়া একটা অহমিকা জন্মিয়াছিল, তাহা মনে আছে। পরে বান্ধব বাহির হইল। বয়স্কদের মুখে প্রভাত-চিন্তার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলার প্রশংসা শুনিতাম, কিন্তু পড়িয়া আয়ত্ত করিতে পারিতাম না। এই পর্য্যন্ত মনে আছে, যখন এগার বৎসর বয়স, তখন আর্য্যদর্শনে ও বান্ধবে নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা পড়িয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলাম। ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সহপাঠীদের মধ্যে চারি পয়সা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একখানা "পলাশীর যুদ্ধ" কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া আনাই।

আর একটু বয়স হইলে পুরাণ বঙ্গদর্শনের, পুরাণ বান্ধবের, পাতা উল্টাইয়া পুরাতন কবিতা, পুরাতন প্রবন্ধ, পড়িতাম; পড়িয়া আনন্দ পাইতাম। ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তকে যে রসের সন্ধান মাত্র পাওয়া যাইত না, তাহার আস্বাদন পাইয়া পুলকিত হইতাম। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনিত। "ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ, এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, এ যজ্ঞের দক্ষিণা মান।"—"তোমার মণিমুক্তার মোহনমালা দূরে রাখ, আমি মনুষ্যের নয়নবিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই।"—"অশ্রু ঝরে কার? না, যার হৃদয় আছে। মনুষ্য কে? না, যে হৃদয়বান্"—প্রভৃতি বাক্যাবলীর ভাষার ঝঙ্কার ও ভাবের মোহ এখনও আমাকে অভিভূত করে।

বয়স হইল, সাহিত্যের রস-পিপাসা বাড়িল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি ক্রমে অদৃশ্য হইল। অল্পজীবী মাসিক সাহিত্যের প্রতি রাগ হইতে লাগিল।

যখন কলিকাতায় আসিয়া কালেজে পড়িতেছি, তখন ঢাক বাজাইয়া নবজীবন বাহির হইল। সংবাদপত্রে ঘোষণা বাহির হইবামাত্র, দেহে নবজীবন সঞ্চারের স্ফূর্ত্তি লাভ করিলাম; ঘোষণামাত্র ৫১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে কার্য্যালয়ে গিয়া মূল্য দাখিল করিয়া গ্রাহক হইয়া আসিলাম। মাসের পয়লা তারিখে নবজীবনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া বসিয়া থাকিতাম; সূর্য্য অস্ত যাইত, রাত্রি নয়টা বাজিত, পত্রিকা না পাইয়া হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা কেবলই অসময়ে পত্রিকা বাহির করিবেন, ইহা মনে করিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি হইত, মনে মনে গালি পাড়িতাম; ঘরে বসিয়া আমার নিষ্ফল ক্রোধ তাঁহাদের গায়ে লাগিত না; তাঁহাদের সহিষ্ণুতা টলাইত না।

নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাসিক-পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না; বেনামিতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতুর সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধলেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজ নামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল। সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহির হইয়াছিল; তাহাতে আমি উপকৃত হইয়াছিলাম,। গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের মত উহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমার গুরুমহাশয়ের সেই শাসন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিব।

তারপর নবজীবনে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি,—কতক স্বনামী, কতক বেনামী। এইরূপে আমার সাহিত্য-সেবার সূত্রপাত।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন চারি বৎসরের পর বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। নবজীবনও চারি বৎসরেই অন্তর্দ্ধান করিল। সাময়িক পত্রিকার উপর আমারও রাগ বাড়িল। কয়েক বৎসর গোসা করিয়া বাঙ্গলা মাসিক পড়া ছাড়িয়া দিলাম।

কালেজ হইতে বাহির হইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন্ কাগজ পড়িব? বাঙ্গলা মাসিকের তুলনায় ভারতী তখন বয়ঃস্থা হইয়া পড়িয়াছে; হয়ত উহা হঠাৎ ফাঁকি হইয়া অন্তর্দ্ধান করিবে না। অতএব ভারতীর গ্রাহক হইলাম। মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী তখন সম্পাদিকা। ভারতীতে হেঁয়ালি-নাট্য তখনও বোধ করি বাহির হইতেছে। ভারতীতেই আমি বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রথম পরিচয় পাইলাম —ইহা একটা পরম লাভ মনে করিয়াছিলাম।

তখন কংগ্রেসের নূতন অভ্যুদয়—আমি তখন ঘরে বসিয়া উৎকট কংগ্রেস-ওয়ালা। কংগ্রেসের খবর পাইবার জন্য মন আন্‌চান্ করিত। ভারতীতে কংগ্রেসের আলোচনা থাকিত;—ভারতীর প্রতি আকর্ষণের ইহাও একটা প্রধান কারণ।

নূতন বেশ-ভূষায় সাধনা বাহির হইল। সাধনায় আমার নূতন করিয়া হাতে-খড়ি হইল। তখন আমি রিপণ কালেজে আসিয়াছি—সম্পাদকের দল আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক আমাকে একবারে বাঁধিয়া ফেলিলেন। অনেকের

আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম। ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আশা করি এতদিন পরে এ কথা শুনিয়া অন্যে রাগ করিবেন না।

তদবধি কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীর সাধ্যমত সেবা করিয়াছি। যখন যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছি, ভারতীতে তাহা স্থান পাইয়াছে—লোকে পড়িয়াছে কি না, জানি না; পড়িবার যোগ্য হইয়াছে কি না, তাহাও জানি না। ভারতী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্থান দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি অদ্যাপি ভারতীর নিকট ঋণী।

চারিবৎসর বয়সে সাধনাও লুপ্ত হইল—ইহাতেও নৈরাশ্য আসিয়াছিল। ভারতী অনেক চারি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন;—এখন দশ চারি অতিক্রম করিতে চলিলেন ইহাতে আমি সুখী। ভারতী এখন প্রৌঢ়া—ভারতী আয়ুষ্মতী হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করুন—ইহা প্রার্থনা করি। প্রৌঢ়া ভারতীর প্রৌঢ়া সম্পাদিকা সম্প্রতি ভারতীর কর্ণধার-কর্ম্মে বিদায় লইয়াছেন—তিনিও আয়ুষ্মতী হইয়া অন্তরালে থাকিয়া ভারতীর নূতন সম্পাদকের কোমল কর্ণ ধরিয়া থাকুন, ইহা প্রার্থনা করি। নূতন সম্পাদক ভারতীর এই অতি পুরাতন ভৃত্যকে আজ স্মরণ করিয়াছেন, এজন্য আমি আহ্লাদিত। নূতনের সহিত পুরাতনের এই "অম্ল-মধুর" সম্পর্কে নূতন ভারতী-সম্পাদক সৌভাগ্যবান্, আমিও সেই সৌভাগ্য দর্শনে পুলক অনুভব করিতেছি। আশা করি, আমার ঝাঁঝাল জীবনের বাকি কয়টা দিন ভারতীর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সাহিত্যের "অম্ল-মধুর" রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই উপদেশ পালন করিয়া যাইতে পারিব।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

গাজিপুরে গোলাপক্ষেত্র

["ভারতী"-সম্পাদক মহাশয়গণ-সমীপেষু। আপনারা জানেন কিনা বলিতে পারি না, পূর্ব্বে আমি একজন কবি ছিলাম এবং সেকালে "ভারতী"তে আমার বহু কবিতা ছাপা হইয়াছিল। "ভারতী"র চত্বারিংশত্তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে, "ভারতী"র পুরাতন-লেখক হিসাবে আমার কাছেও আপনারা লেখা চাহিয়াছেন। নিম্নে যে কবিতাটি পাঠাইলাম, তাহা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রচিত। কবিতাটি "ভারতী"তে পাঠাইবার জন্য নকল করিয়া রাখিয়াছিলাম, এমন সময় নূতন "ভারতী" আসিলে মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের "গাজীপুর" শীর্ষক এক কবিতা বাহির হইয়াছে, তাহাতেও গোলাপক্ষেত্রের বর্ণনা রহিয়াছে (আপনারা সেটি দেখিয়াছেন কি?—না, আপনারা উভয়েই

তখন বোধ হয় অতি বালক)। দেবেন্দ্রবাবুর সে কবিতার তুলনায় আমার কবিতাটি, হংস-পার্শ্বে বকো-যথার মত আমার মনে হইল, তাই সেটি আর "ভারতী"তে পাঠাই নাই। লেখক]

গোলাপ—গোলাপ শুধু দিগন্ত অবধি!
কোন্ রত্ন-ব্যবসায়ী নানা কার্য্যে ভুলে
এ শোভা-বিপণিখানি ফেলে গেল খুলে
বহাইয়া দিকে দিকে সৌন্দর্য্যের নদী!
অজস্র গোলাপ-বালা মন্দ মন্দ দুলে
কুহক অঞ্জন এ কি চক্ষে দিল আনি—
যেন হায় প্রেয়সীর প্রেমলিপিখানি,
ফুটিয়াছে ভাব-পুষ্প মাধুরী হিল্লোলে।
এ কি সুষমার মেলা!—বসন্ত প্রভাতে
সুবিস্তৃত পুষ্পরাজ্য। কিন্তু ঐ হায়,
শিশির তপন-তাপে শুকাইলে গায়*—
বাহিরিল মালীগণ পাত্র হাতে হাতে।
ভাঙ্গিল শোভার হাট;—সারাদিন ধরি
কাঁদে কালো গাছগুলি গুমরি গুমরি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চিত্র-পরিচয়

১। গৌরীর তপস্যা

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

"কুমারসম্ভবে"র পঞ্চম স্বর্গে আছে, মদনভস্মের পর ভগ্নমনোরথা গৌরী পিণাক-পাণি শ্মশানেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। হিমবর্ষী শীত-রাত্রে তিনি গৌরী-শিখরের ছায়াসুপ্ত তুষার-শীতল সরোবরে আপনার কোমল তনু ডুবাইয়া মুদিতনেত্রে প্রিয়-ধ্যানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শীতের পরশে তখন সরোবরের পদ্মের ঝাড় শুকাইয়া গিয়াছে; —কিন্তু তুষার-বৃষ্টিতে সুমধ্যমা পার্ব্বতীর শীতার্ত্ত মুখখানি যখন জলের উপরে কমলদলের মতই থরথর কাঁপিত থাকিত, তাঁহার মুখের কমলগন্ধে নিশার বাতাস যখন ভরিয়া উঠিত, তখন মনে হইত, সরোবরের পদ্ম বুঝি এখনো পরিম্লান হইয়া যায় নাই! যত্নাভাবে গৌরীর মোহন কেশমালা আজ জটাসদৃশ, নয়নপ্রান্তে কজ্জলরেখা বিলুপ্ত—তপঃক্লেশে তাঁহার আনন শীর্ণ ও পাণ্ডুর! তাঁহার চম্পক-অঙ্গুলীতে শুষ্কপদ্মবীজের জপমালা, ক্ষীণ কটিতটে মুঞ্জতৃণের মেখলা।

* শিশির না শুকাইলে সেখানে মালীরা গোলাপ তোলে না।—লেখক।

২। অন্ধ বাউল

চিত্রকর:—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্ধ বাউল রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী"র একটি চরিত্র।—"বাউল চোখে দেখ্‌তে পায় না, সে গান গেয়ে বিজনের মধ্যে পথ অবিষ্কার করে। * * অন্ধতার অন্ধকারে সে যে পরম বন্ধুকে লাভ করেছে; তাঁরই চরণশব্দ সে আপনার হৃৎ-স্পন্দনে শুন্‌তে পায়, সেই চরণশব্দ বরণ করে সে চলে। * * সে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে * * মনের-পাওয়াই এখন তার সর্ব্বস্ব। * * এই অন্ধ দুঃসহ দুঃখের আঘাত সহ্য করে অটল নিষ্ঠা লাভ করেছে— * * চির-বসন্তের বীণা তার হাতে।"

৩। দোদুল দোলা

চিত্রকর:—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ-ছবিখানিও "ফাল্গুনী"র।

বসন্তের দক্ষিণা বাতাসে পথের ধারের বেণুবন মর্ম্মরোল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

বেণুবণ গায়িতেছে—

"ওগো দখিন হাওয়া, (ও) পথিক-হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে,

* * * *

আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু
আহা, এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে!"

নিপুণ চিত্রকর তুলির দু-একটি টানে ভাবের রূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

৪। মৃগয়া

প্রাচীন চিত্র হইতে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত। নবাবী আমলের মৃগয়া-ব্যাপার লিখিত।

৫। স্তব্ধ তরু

চিত্রকর:—শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে

এখানি নিসর্গ-চিত্র এবং ইহার ব্যাখ্যাও অনাবশ্যক মনে করি। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার। নিসর্গ-চিত্রে কেবল আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, নদী বা গাছ পালার হুবহু নকল দেখিলেই ছবি-দেখা শেষ হইয়া যায় না। ভাল চিত্রকরেরা ছবির প্রকৃতির ভিতর দিয়া নানা রস ও নানা ভাবের প্রকাশ দেখান। ভোরের সূর্য্যোদয়ে, দুপুরের প্রখর প্রভায়, সন্ধ্যার বর্ণ-বৈচিত্র্যে রাত্রির জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে, গাছের আলোকছায়ায়, জনশূন্য ধূ-ধূ মাঠে, বিজন শৈল-শিখরে বা সমুদ্রের তরঙ্গ-নৃত্যে,—চিত্রকরেরা গম্ভীর বা চপল, শান্ত বা রুদ্র হাস্য বা করুণ রসের সৃষ্টি করেন;—গাছ মাটি-পাথরকে তাঁহারা নির্জ্জীব ভাবিতে পারেন না; তাহাদের ভিতরও প্রাণের যে লীলা চলিতেছে তাহার তরঙ্গ তাঁহাদের হৃদয়কে আঘাত করে। শিল্পীর এই অনুভূতি দর্শকের মনে রসের সঞ্চার করিতে পারিলে নিসর্গ-চিত্রের সার্থকতা।

প্রসাদ।
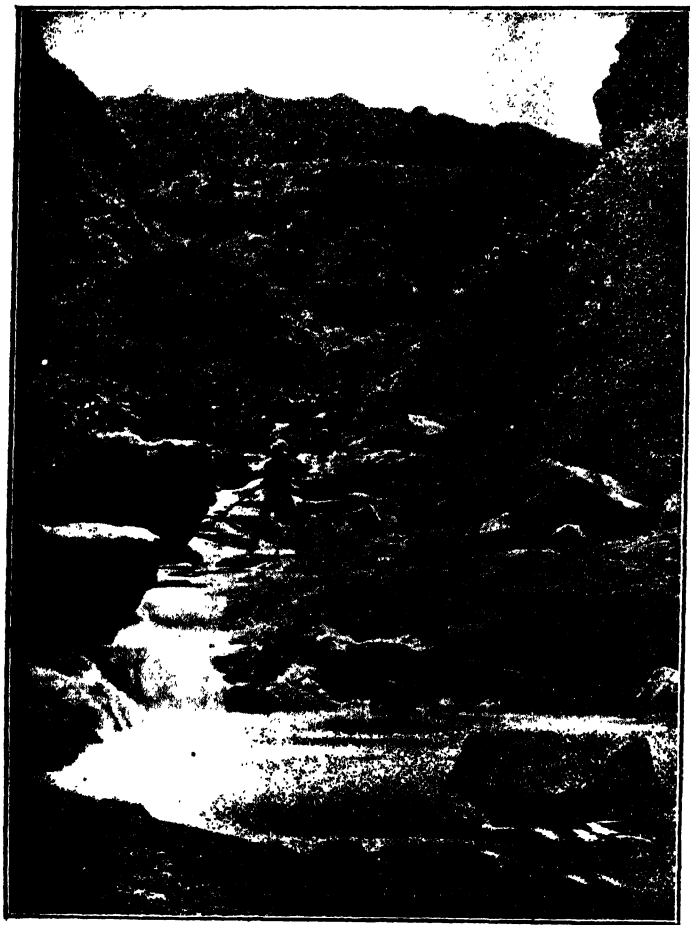
শৈলসুতা

গোড়ায় গাফিলি

আমার দুর্গতির কাহিনী কাকে শুনাই ? কোন্ মুখে শুনাই ! নাঃ, শুনাতেই হবে। লজ্জা খোয়াতেই হবে ! স্বার্থপর হয়ে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না।

না আছে পাঁজিপুঁথি, না জানি দিন বা তিথি। ইংরিজী ক্যালেণ্ডার যত চাও মজুদ, —এক এক ঘরে তিন তিন খানা লম্বমান, কিন্তু দিশী মাস তারিখের উদ্দেশ তাতে পাওয়া যায় না।

আমি নিশ্চিন্ত আছি—এখনও হাতে সময় রয়েছে। হঠাৎ এক বান্ধবী রাণীর বার্ত্তা-বাহক এলেন—"রাণীসাহেব আপনাকে আজ তাঁর গৃহে চা-পানের অনুরোধ করছেন। পরশু রাণীসাহেব অমৃতসর চলে যাবেন।"

—"এই সময়ে অমৃতসর কেন ?"

—"বৈশাখীর জন্য।"

বৈশাখী ! অর্থাৎ ১লা বৈশাখ ! এই যাঃ ! এত শীঘ্‌ঘির এসে পড়্‌ল ! পঞ্জাব-টঞ্জাব ডিঙিয়ে মনখানা চট্ করে ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে সম্পাদকীয় অফিসে গিয়ে পড়ল। লেখা ত কিছু তৈরি হয়নি ! লজ্জা রাখি কি করে ?

পঞ্জাবী ১লা বৈশাখ ও বাঙ্গলা ১লা বৈশাখে একদিনের মাত্র তফাৎ, এ জেনে শুনেও কেমন ভরসা হল এ বছর বাঙ্গলা বৈশাখ, পঞ্জাবী বৈশাখকে ফাঁকি দিয়ে আমার তরফদারি করবে—অনেকটা আগে সরে যাবে।

কেননা, এ পর্য্যন্ত গোটা আষ্টেক চিঠি ও কার্ড এসেছে বটে, কি তাগাদার তার ত এখনও আসে নি।

হরি হরি ! কেন এমন অলুক্ষণে ভাবনা মনে আনলুম। কেননা সর্ব্বনেশে টেলি-প্যাথির জোরে যেমনি ভাবা অমনি ঘণ্টা কতক পরেই তার এসে উপস্থিত ! নাঃ বাঙ্গলা বৈশাখও পেরে উঠ্‌লে না ;—সম্পাদককে ফাঁকি দিয়ে লেখকের সহায়তা করা ? অসম্ভব !

মাস যদি চলে গাছে গাছে, সম্পাদক চলেন পাতায় পাতায় !

*   *   *

চারিদিকের হাওয়ায় বৈশাখীর আগমন-বার্ত্তা ! সহরে সহরে মেলার উদ্যোগ, ছেলেদের ছুটী, স্কুল-কাছারী বন্ধ, সকলের মনে আনন্দ ;—আমারি মাথায় শুধু লগুড়াঘাত। মাথা-ধরায় মাথা ফেটে গেল, কিন্তু লেখা বেরোল না।

কি করি ? কি লিখি ? সম্পাদকের প্রতি সদ্ব্যবহার, পাঠকের প্রতি শিষ্টাচার ও নিজের প্রতি সুবিচার একদিনে একাধারে তিনটে জিনিষ কি করে সম্পন্ন করে ফেলি ?

সে রাত্রে ঘুম নেই, লোকের বাড়ী চা খেয়ে তৃপ্তি নেই, বাড়ী ফিরে হাঁফ ছেড়ে বসে শান্তি নেই!—লেখা হয় নি!

ছেলেবেলায় রয়াল রিডারে ডিকন্সের একটা গল্পের খানিকটা আমাদের পাঠ্য ছিল। তাতে থেকে থেকে ফি প্যারার শেষে পড়তুম—"লিট্‌ল্ নেল্ ইজ্ ডেড!—আর আমাদের কান্না আস্‌ত।

আজ থেকে-থেকে আমার মন আমায় পড়াচ্ছে—"লেখা হয়নি!"—আর আমার চোখে জল আস্‌ছে।

হায়! আমার মত গোড়ায় গাফিলি করে পাপের দণ্ড কেউ যেন না ভোগে।

উত্তম পাঠকেরা আমার এই আত্ম-কাহিনী থেকে শিক্ষালাভ করে উপকৃত হবেন এই আশা করে কৃতার্থম্মন্য হচ্ছি। কারণ অধম লেখক আমি ভুক্তভোগী হয়েও যে ভবিষ্যতে শোধরাতে পারব সে আশা বিরল। *

শ্রীসরলা দেবী।

*শ্রদ্ধাস্পদা লেখিকা কিন্তু আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন যে এই "গোড়ায় গাফিলি" কাটাইয়া এইবার তিনি আমাদের রীতিমত লেখা পাঠাইবেন। পঞ্জাবে বাংলা তারিখের হিসাব ঠিক থাকে না বলিয়া তাঁহার সময়-মত লেখার চাড় হয় না। সে জন্য তিনি একখানা বাংলা পাঁজি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এ অনুরোধ আমরা রক্ষা করিয়াছি। অতএব এখন আর কোনো ভয় নাই।—সম্পাদক।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

আর্ম্মাডা ধ্বংশের পরে রাজ্ঞী এলিজাবেথের শোভাযাত্রা
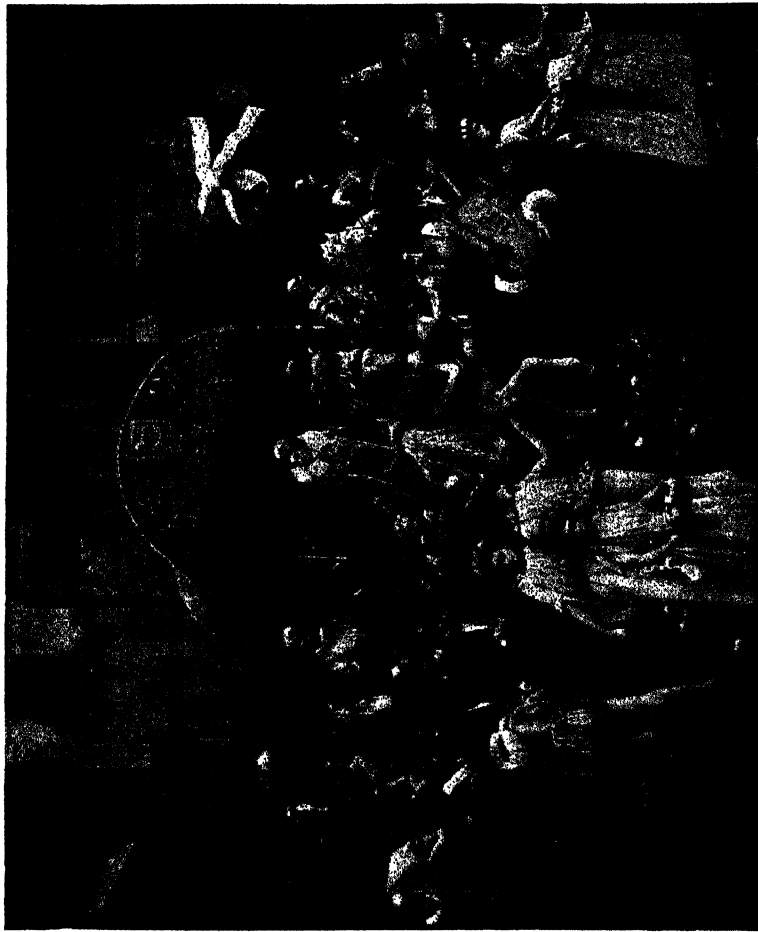
৪০শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ [২য় সংখ্যা

জন্মস্মর

১

জন্মান্তর যে প্রামাণ্য, তাহা যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হইতে পারে, সাংখ্যকারিকায় বাচস্পতিমিশ্র তাহা অতি সংক্ষেপে একটি বাক্যেই নিষ্পন্ন করিয়া দিয়াছেন—"কপিলাদিবৎ"। কপিলাদি মুনিরা জন্মস্মর হইয়াছিলেন, সুতরাং জন্মান্তর আছে এবং তাহার স্মৃতিও অনুভবগম্য।

চল্লিশবৎসরের ভারতীর প্রথমসংখ্যাতেই নবীন সম্পাদকও তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বৈশাখের ভারতীতে ভারতীর কাণ্ডারী-পরম্পরার জন্মস্মরতা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার মত বিশ্বাসহীন ভূতপূর্ব্বের যৌগিক দৃষ্টিও অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। নতুবা চৈত্রে যখন "সম্পাদকীয় স্মৃতি"র জন্য প্রথম অনুরোধ আসিয়াছিল একটা মস্ত ফাঁকায় মন ঠেকিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে সম্পাদকীয় জন্মের কোন স্মৃতি, কোন ছবি, কোন ঘটনায় সে ফাঁকা ভরিয়া উঠে নাই। তাই 'গোড়ায় গাফিলি' করিয়া ফাঁকি দিতে হইল।

'মানসী'র ঐতিহাসিকপ্রবর নাটোররাজ লিখিয়াছেন—"সেই সকল সুদিনে দুর্দ্দিনে দেবী স্বর্ণকুমারীর বিদুষী কন্যাদ্বয় (শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী) 'ভারতী'র প্রতি মাতার অক্লান্ত স্নেহ-পরিচর্য্যায় গুরুশ্রম লাঘব করিবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছেন।"—ইহাতে যতটুকু ওজন আছে আমার দ্বাদশবর্ষব্যাপী সম্পাদন ঘটনা এর চেয়ে বেশী ওজন লইয়া আমার স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে নাই। নাটোর-মহারাজের ঐ ব্র্যাকেটটা ঠিক আমার মনের মাপেই কাটা। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম সকলের স্মৃতির মাপ এক নয়। এই নববর্ষের 'ভারতী' ব্যক্ত করিতেছে আমি ভাবি আর নাই ভাবি, সময়ের ও সমসাময়িক অনেকের মনে একটা কুলুঙ্গী আমি দখল করিয়া আছি। তাই সম্পাদকের দৌরাত্ম্যে

ব্র্যাকেট খুলিতে হইল, ব্র্যাকেটের বেণীবন্ধন মুক্ত করিয়া সনির্ব্বন্ধ মণিবন্ধনে ধরা দিতে হইল।

২

ভারতীর সঙ্গে আমার প্রথম প্রণয় সেই কোন্ শৈশবে,—দশ-এগারো বৎসর বয়সে। আহা সে কি মধুময় সাহিত্য-রসাস্বাদের দিন গিয়াছে! মায়ের শেল্‌ফ্ হইতে পুরাণ বাঁধান ভারতীগুলি লইয়া গ্রাস করিতাম—

শুধাই অয়ি গো ভারতি তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর মা বাজেনা কেন?

প্রথম ভারতীর এই প্রথম কবিতার তুলনা আমার কাছে আজ পর্য্যন্ত কোথাও নাই। যে সত্য চল্লিশ বৎসর আগে ইহার ভিতর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সে সত্য আজও ভারত-প্রেমিকের বুকখানা টন্‌টনাইয়া দেয়। এই বছর চল্লিশের মধ্যে নানা কবি ও শিল্পীর হাতে ভারত-মাতার নানা রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে মধুরিমা, যে করুণিকা এই প্রথম মাতৃবন্দনায় বিকশিত হইয়াছিল তাহা নিরুপম। আমার দশ-বৎসরের ছোট প্রাণখানি ইহাতে অভিষিক্ত হইয়া অলক্ষ্যে মাতৃভূমি-প্রেমে জাগিয়া উঠিল।

আর-একটি গান সেকালের ভারতীর কোন-এক পৃষ্ঠার পাদদেশে ছিল যেন মনে পড়ে—

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি প্রেমে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান॥
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে॥
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা পারি তা' ঢালিতে
একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা॥
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণার কিছু নাহিক বল।
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান॥

কতবার আপনা-আপনি পিয়ানোর সাম্‌নে বসিয়া এই গানটি ভাবে ভোর হইয়া সাধনা করিতাম। কারো দেওয়া নয়—নিজেরই খুঁজে-পেতে লওয়া জপমন্ত্রের বীজ হইয়াছিল এ গানটি আমার। "বন্দেমাতরং" গানটি পড়িবার শুনিবার বা শিখিবার বহু পূর্ব্বেই রবি-মামার কতকগুলি কবিতায় ও গানে দেশের মাতৃরূপ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় আরও অনেকের মনেও এইরূপ হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমের আনন্দমঠের বহু পূর্ব্বেই রবি-মামার এ সকল কবিতা রচিত হয়। সুতরাং দেশমাতৃপূজার প্রধান পূজারী তিনিই। আজ "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের অতি ব্যবহার ও অপব্যবহারের উপর রাগ করিয়া "ঘরে-বাইরে" গল্পে নিখিলেশের মুখে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনার বিপক্ষে রবিমামা মত

ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের দোহাই দিয়া ছেলেরা যে-সব কুকর্ম্ম করিয়াছে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বন্দেমাতরং গানটিকে দেশের অঙ্গ হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইলে রবিমামার জাতীয় বা দেশ-সঙ্গীত ও কবিতার অধিকাংশই ছাঁটিতে হয়। আমি ত তাহাতে রাজী নই।

প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ড ভারতীর আর একটি রচনা আমায় নিতান্ত পাইয়া বসিয়াছিল—সে "সম্পাদকের বৈঠক"-এর অন্তর্গত "রামিয়াড," একটি ব্যঙ্গ নাটিকা। হাসিয়া হাসিয়া নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইত। একলা হাসিয়া সুখ সম্পূর্ণ হইত না। তাই মাকে ও মামাদের ধরিয়া ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আগাগোড়া সেটা পড়িয়া শুনাইতাম—"দেখ দেখ কি চমৎকার লেখা আগে বেরিয়েছিল। এখন কেন হয় না?" সেটা বড়মামার লেখা কিম্বা জ্যোতিমামার, কি শুনিয়াছিলাম তখন, ঠিক মনে পড়ে না; রবিমামার যে নয় এটা মনে আছে। কিন্তু যাঁরই হোক্ এ তিনজনের কেহই আমার মুখে সেটার আবৃত্তি শ্রবণ হইতে পরিত্রাণ পান নাই। হাস্য-সাহিত্যের সহিত আমার সেই প্রথম পরিচয়, এবং পরিচয় হওয়া মাত্র সখ্য। সেই সখ্যবলেই দশবারো বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হাসির কবিতা"গুলিকে খাস্ মজ্‌লিসের কয়েদ খানা হইতে মুক্ত করিয়া আমসাহিত্যের দরবারে অকুতোভয়ে পেশ করিয়া দিয়াছিলাম। পুরাণ ভারতী কাছে নাই, নয়ত আমার শিশুমনোহারী রত্নগুলি উদ্ধার করিয়া দেখাইতাম।

৩

ভারতীর সহিত দ্বিতীয় সম্বন্ধ আমার সেবক সম্বন্ধ। মায়ের সাহায্যের জন্য প্রথমে মাঝে-মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতাম; ক্রমে অন্যের প্রবন্ধের উপর হাত চালাইতে লাগিলাম। প্রকাশ্যতঃ মা সম্পাদিকা থাকিলেও বস্তুতঃ আমিই সব করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে জলধর সেনের হিমালয়-ভ্রমণবৃত্তান্তের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসিয়া পড়ে। তাঁহার লেখায় খাঁটি সাহিত্যের রূপ দেখিয়া আমি আনন্দে ভরপূর হইয়া গেলাম। পাণ্ডুলিপি দীনেন্দ্রকুমার রায় অতি সভয়ে পাঠাইয়াছিলেন। যদি পছন্দ না হয়, যদি প্রকাশযোগ্য মনে না করি, তবে তাঁর লাজুক বন্ধুর লেখা-কুমারীটি বন্ধুর বাক্সবন্দিনী করিয়া রাখিবার জন্য ফেরৎ পাঠানর কষ্ট স্বীকার করিব কিনা এই ধরণের সসঙ্কোচ অনুনয়ের উত্তরে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া লিখিলাম, এ দুর্লভ জিনিষ প্রত্যর্পণের যোগ্য নহে। খনিগর্ভের হীরাকে যতটুকু মাজিয়া ঘষিয়া তোলার আবশ্যক ছিল ততটুকু মাত্র কারিগরি করিয়া ভারতীর প্রদর্শনীতে সাজাইয়া দিলাম। আর প্রতি মাসে সেই খনি হইতে নূতন মাণিক্যের জন্য লোলুপ হইয়া রহিলাম। জানি না আর কাহার কত ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু আমি ত জলধর সেনের দেরাদুন, সহস্রপাণি, টপকেশ্বর, কাকঝোড়া এবং হৃষিকেশ হইতে বদ্রিনারায়ণ পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাটুকুর বর্ণনায় তাঁর নিকট চির আনন্দ-ঋণে বাঁধা আছি।

"সাধনা" লইয়া রবিমামা যত মগ্ন

হইতে লাগিলেন, মায়ের ভারতী সম্পাদন-কার্য্য যত দুরূহ হইতে লাগিল, আমার ভারতী সেবাও তত প্রখর করিতে হইল। মায়ের শরীর একবার খারাপ বোধ হইতেছিল, আমি তাঁকে দিদির সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে পাঠাইয়া একাই সম্পূর্ণ বোঝা নিজের ঘাড়ে লইলাম। দুই-তিন বৎসর এইরূপে সেবক-ভাবে পরোক্ষে ভারতী সম্পাদন করিয়াছি।

৪

ইহার পর দিদির সঙ্গে যুক্তনামে প্রকাশ্য সম্পাদকও তিন বৎসর ছিলাম। কিন্তু ভারতীর সাধক হইলাম ১৩০৬ সালে। তখন আমি মহীস্থর-প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। মহীস্থর-প্রয়াণে ঘরের বাহিরে গিয়া ভারতবর্ষকে দেখিয়াছি, হিন্দুজাতিকে দেখিয়াছি, হিন্দুসভ্যতা দেখিয়াছি। খাঁচার পাখীর ছটফটানি প্রশমিত হইয়াছে, বিশ্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছি এবং আপনাকেও দেখিয়াছি। আত্মীয়স্বজনের স্নেহকোমল নীড়ে আপনার সহিত পরিচয় হয় না। আপনাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একবার সব বন্ধন হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। মহীস্থরে প্রথম আত্মসন্দর্শন আজও মনে পড়ে।

প্রলয়ের ঝড় আজ বহিতেছে বেগে ;,
ভীষণ নিনাদে বজ্র হুঙ্কারে কঠিন ;
গৃহভিত্তি উঠে কেঁপে ;—আমি সঙ্গীহীন,
সারা গৃহে একা নারী বসে আছি জেগে।

কবাট অর্গল নাহি মানে, দুমদাম
উঠে পড়ে ; দীপ নিভে ; বাত্যা গৃহ ভরে ;
বিদ্যুৎ ঝলসে আঁখি ;—একা আমি ঘরে ;
—বাহিরে প্রলয় মেঘ গর্জ্জে অবিশ্রাম।

অজস্র প্রপাতে কভু বৃষ্টিধারা ঝরে,
ভীমরবে তরুশাখা ভাঙ্গে দিশে দিশে ;
একা আমি নারী হেথা বসি নির্নিমিষে
—আঁধারে চৌদিকে শত বিভীষিকা ঘুরে।

একা আমি ভয়শালা, কম্পিত, চকিত !
একা আমি ভয়হীনা, আত্মবলীয়ান !
একা আমি ক্ষুদ্রতম বৃহৎ-পীড়িত,
একা আমি বিশ্বকেন্দ্র, অতি সুমহান !

১৩০৫ এর শেষে রবিমামা বলিলেন —"তুই যদি নিস আমি আশ্বস্ত থাক্‌ব। আর কারো প্রতি বিশ্বাস নেই। তুই ঠিক চালাবি।"

তাঁহার বিশ্বাসে আমার বিশ্বাস বল পাইল, আমি মানিলাম। এবার শুধু ভারতীর প্রেমিক নয়, মালিক বনিতে হইবে, শুধু সেবক নয়, সাধক হইতে হইবে ;—মায়ের অঞ্চলের আড়ালে নয়, দিদির হাত-ধরাধরি করিয়া নয়—একা বিশ্বের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে ; উত্তাল তরঙ্গমুখে সমুদ্রে নৌকা ভাসাইতে হইবে, চালাইতে হইবে, গন্তব্যে পৌঁছাইতে হইবে—একলা। ভয় হইল, কিন্তু ভরসাও হইল। মন "আহি-তাগ্নিকার" গীত গাহিয়া উঠিল :—

সর্ব্বদেব সাক্ষী করি এ কি ব্রত করিলে গ্রহণ !
পথ যে দুর্গম একায়ন !
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্ব্বরী,
অপ্রকম্প্য চিত্তে সর্ব্ব ভয় পরিহরি,
পারিবে কি যেতে ? তুমি বিক্লববচনা !
অশ্রু-আবিললোচনা

দৃষ্টি-বিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ আকার !
করে নিত্য গরল উদ্গার !
ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক,
ফিরিছে গোপনে ; আছে কণ্টক শতেক !
পারিবে সহিতে সব ? রে সুখ-লালিতা !
দুরাশা-চালিতা !

ঊর্জ্জস্বল দ্বিজসম হইবে কি সত্যসঙ্গরা !
অতন্দ্রিতা ! চিরলক্ষ্যপরা !
পারিবে সাধিতে শক্তি রিপুনিবর্হণা ?
লোকহাস, ভয়লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা
সহিবে প্রশান্তচিতে ? হে আহিতাগ্নিকা !
অতি সাহসিকা !

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি চিরদীপ্ত রহিবে কি তাহা !
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা !
প্রাণাহুতি দিবে তায় ! আত্মবিসর্জ্জন
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন !
সংকল্পে অটল রবে ! হবে চিরধন্যা !
অয়ি বীরম্মন্যা !

পুষ্পবাসে গন্ধবহ যদি আনে মোহ অভিনব,
নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব,
ময়ূর-বিরুত-মধু বনভুবচ্ছায়,
পুলকসমুথ কম্প যদি শিহরায়,
রবে অকম্পিতা তুমি ! হে আত্ম-ঈশানা !
চির-অতৃষাণা !

যদি ঝড় ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ মাঝে অঞ্চল আবরি,
অগ্নি রাখি দিও জাগি, সারা বিভাবরী !
আর সব নারী ভুবে প্রিয়-পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ-ব্রতপরায়ণা !
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোরজপা !
দৃঢ় পরন্তপা !

* * *

এবারকার ভারতীর গন্তব্য মনে মনে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেই দিকে তরীর মুখ ফিরাইলাম, আর আমার হাতের প্রথম সংখ্যায় "মৃত্যুচর্চ্চায়" সকলকে আহ্বান করিলাম—

"হে সাহিত্যকর্ণধারগণ ! বেলা হইয়াছে, জীবনের কূলে কূলে, সুখসেব্য সুগম তীর্থে তরী অনেকবার ভিড়িয়াছে, এবার বাহিয়া চল মৃত্যুসাগরসঙ্গমে, শুনাও সেখানকার জলদগম্ভীর সঙ্গীত, দেখাও সে রাজ্যের অভয় প্রতিষ্ঠা।"

দেশের নবযুগে যাহা ক্রমে ভৈরবরাগে নাদিত হওয়া নিরূপিত ছিল, কালের অলক্ষ্য নির্দ্দেশে আমারি অঙ্গুলিতে প্রথমে তাহা ললিতে বাজিল।

এই সময়ে নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে তাঁদের দলে টানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন আমি যদি হিন্দুনারীর প্রতিভূরূপে বিলাতে গিয়া লেক্‌চার দিই অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। আমি সে কথা বুঝিলাম না, ভারতীর সেবা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলাম না, কিন্তু এই সূত্রে তাঁহাদের সঙ্গে মিত্রতা ও ভাবের বিনিময়ে লাভবান হইলাম। আবার এই সময় স্বামী শিবনারায়ণ পরমহংস 'ভারতী-মা'র পুত্রী "সরলা-মা"র ভিতর হঠাৎ এমন কিছু দেখিতে পাইলেন যাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল, আমি যদি তাঁহার দলভুক্ত হইয়া সূর্য্যনারায়ণের উপাসক বনি ও নিত্য হোম করি তবে ভারতবর্ষকে হেলাইয়া দিব।

আসল কথাটা এই, একটা বেকার লোক দেখিয়া বেগার-খাটাইবার লোভ সকলেরই জাগিয়া উঠিল। আমি ভারতী-সেবাতেই তন্ময় রহিলাম।

কিন্তু যিনি নিজ হাতে এবার আমায় ব্রতদান করিয়াছিলেন এবং ব্রত-উদ্‌যাপনে সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ব্রতসাধনা করিতে করিতে তাঁহারই হাতে ধাক্কা খাইলাম। কোথাও কিছু নাই, অকস্মাৎ ভারতীর প্রতি স্নেহবিমুখ করিয়া শৈলেশ মজুমদার তাঁহাকে বঙ্গদর্শন-এর পুনরাবির্ভাবের প্রলোভনে ভুলাইল।

শ্রীমতী সরলা দেবী

"কাঁহা যূসফ, কাঁহা জুলেখা হ্যায়"! কোথায় বঙ্কিম, কোথায় তাঁহার বঙ্গদর্শন! নূতন বঙ্গদর্শন টিকিল না। শুধু আমার নামাটি

পরকে আপন করে'
আপনারে পর

আমার বুকের মধ্যে একটা মস্ত চিরা দিয়া দিলেন।

বাহিরের আঘাতে সাধনা ভঙ্গ হয় নাই, ঘরের লোকের ঘায়ে তপোশৈথিল্য হইল। তখন দীনেশ সেনাদির তলব পড়িল। যখন অন্তরে উত্তাপের অভাব, তখন বাহিরে নানা কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের আয়োজন করিতে হয়, নহিলে শরীর রক্ষা হয় না। ভারতীর শরীর এইরূপে রক্ষা করিতে থাকিলাম।—আহিতাগ্নিকার অগ্নি না নিভিয়া যায়!

অনিয়মিত বাহির হওয়া সেকালের মাসিক পত্রের একটি প্রধান সংক্রামক রোগ ছিল। ভারতীও তাহাতে আক্রান্তা ছিলেন। সে রোগ দূর করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, কৃতকার্য্যও হইয়াছিলাম। সময়ের কাঁটা ঠিক রাখার জন্য আড্ডির ছাপাখানার গলির সাম্‌নে, এমন কি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা গলির মোড়ে দপ্তরী মিঞার বাড়ীর সন্নিকটেও গাড়ীতে বসিয়া ধর্ন্না দেওয়া মাসের শেষ কটা দিন আমার একটা নিত্যনিয়মিত ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল।

'ভারতী'র ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

না হইলেও লেখকমাত্রকেই কিছু না কিছু প্রণামী বা আশীর্ব্বাদী নিবেদন করা আমার আর-একটি উচ্চ লক্ষ্য ছিল। যিনি কিছুই লইতে স্বীকৃত নন, তাঁকে অন্ততঃ একটি স্বর্ণলেখনী গ্রহণে বাধ্য করিতেও চেষ্টার ক্রটী করিতাম না।

ভারতী-সেবা স্মরণ করিয়া ভাবি—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই!

যে মণিলাল আজ ভারতীর সম্পাদক হইয়া ভারতীকে নূতন আয়ুদান করিয়াছেন, তাঁর ভক্তি ও সেবায় ভারতী দুইবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন—আজ মা যখন ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর দশ-এগার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন না ছাড়িয়াও প্রায় ছাড়ি। বঙ্গবিভাগের দুর্য্যোগে স্বদেশী যখন বয়কটে বিষাক্ত হইয়া উঠে আমি তখন বঙ্গের বাহিরে। সেদিন আহিতাগ্নিকার অগ্নি এই বালক ভক্তই প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন।

শ্রীসরলা দেবী।

স্মৃতি

ঐ ডাক পড়িয়াছে! নিমন্ত্রণ নয়—মহানিমন্ত্রণ। এই মহানিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন এইবেলা করিয়া রাখি।

মহাপ্রাণ নচিকেতা পূর্ণমাত্রায় আয়োজন করিয়া এই মহানিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যমালয়ে তিন দিন অভুক্ত থাকিয়া, যমরাজ-প্রদত্ত আঙ্গুর, পেস্তা, বাদাম্, আক্‌রোট্ প্রভৃতিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অমৃত-ফলের আস্বাদে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমার সে অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় কোথায়? যৌবনে গোলাপফুলের পাপ্‌ড়ির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দবিভোর হইতাম। এক্ষণে দেহে শক্তি নাই, চক্ষুতে জ্যোতিঃ নাই। চারিদিকেই সরিষার ফুল দেখিতেছি। আয়োজন করিবার উপযোগী আমার দেহ-ভাণ্ডারে সে ঐশী সম্পত্তি কোথায়?

তবে ইংরাজিভাষায় এক মহাবাক্য আছে,—"Better late than never"। এই সদুপদেশের অনুসরণ করিয়া আমার চিত্তের গুপ্ত-কক্ষে বহুদিন হইতে পোষিত কতিপয় সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবান আমাকে সফলকাম করুন—করযোড়ে সনির্ব্বন্ধে ইহাই তাঁহার রাতুল চরণে ভিক্ষা করিতেছি।

আমার চিরপোষিত সঙ্কল্পগুলির মধ্যে অন্যতম সঙ্কল্প এই, যে বঙ্গসাহিত্য-কণ্ঠহার মনীষী ও মনস্বিনীদিগের সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু জানি তাহা লিপিবদ্ধ করিব। সেতুবন্ধন-কার্য্যে কাঠবিড়ালিও সহায়তা করিয়াছিল, আপনারা হাসিবেন না। আমি বহুকাল ওকালতি-ব্যবসায়ী ছিলাম। বুড়া-বয়সে সব ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এই

কাঠবিড়ালির নজিরটি ভুলিতে পারি নাই।

আজ পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্বন্ধে যাহা যাহা জানি তাহা সানন্দে লিখিতেছি।

শুনিতে পাই—স্বর্ণকুমারী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্রী (Favourite) ছিলেন। মহর্ষি এই প্রতিভাশালিনী কন্যার রচনার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যখন-তখন বলিতেন, "স্বর্ণ, তোমার রচনার উপর দেবতার পুষ্পবৃষ্টি হউক।"

যখন স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স আঠার কি উনিশ হইবে। আমিও তখন খুব ছোট। সে বহুকালের কথা। আমি হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের কবিতা মুখস্থ করিতাম, নিজেও খুব কবিতা লিখিতাম, ও কোন নূতন সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সে সময়ে মহিলা-কবি অথবা মহিলা-ঔপন্যাসিক কেহ ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বর্ণকুমারী দেবীই পথপ্রদর্শিকা।

যখন "দীপনির্ব্বাণ" বাহির হয়, বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। সব কাগজের সম্পাদকেরা এই নবীনা লেখিকার সুখ্যাতি শতমুখে করিয়াছিলেন। আমিতো অবাক্ স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আনন্দে বিভোর হইয়া উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছিলাম।

তাহার পর "গাথা" নামক তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য-উপন্যাস প্রকাশিত হয়। আমার বেশ মনে আছে তাহা আমি যতবার পাঠ করিতাম ততবারই বিমুগ্ধ হইতাম। কবিতাগুলির ছন্দের ঝঙ্কার বড়ই সুন্দর। আমি লোভ সামলাইতে না পারিয়া ঐ ছন্দের অনুকরণে, পাপিয়া, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল প্রভৃতি পাখীর উপর অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম। আমার কাব্যের নাম রাখিয়াছিলাম "আস্‌মানে বাউল"। কবিতাগুলি হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাক্ সে কথা—সহৃদয় পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করিবেন। কথায় বলে "ধান্ ভান্‌তে শিবের গীত"। আমি গৌরী-গীত গাইতে গাইতে মধ্যে মধ্যে ধান্ ভানিতেছি।

তাহার পর বহুবর্ষ, বহুবর্ষ চলিয়া গেল। প্রায় ত্রিশবৎসর অতীত হইয়াছে—আমি তখন গাজিপুরে অবস্থান করি। একদিন শুনিলাম কবিবর রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে আসিয়াছেন। রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্ম্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার নির্ঝরিণী কাব্যের "আঁখির মিলন" কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও, পত্রের দ্বারায় পরিচয় ছিল। তিনি আমার উর্ম্মিলা কাব্যের সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্ত কণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি" ইত্যাদি। গাজিপুরে অবস্থানকালে রবিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সে এক মহা-আনন্দের—আমার জীবনের দোলপূর্ণিমার দিন ছিল। নিত্য উৎসব, নিত্য পার্ব্বণ! আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতাম—তিনি আনন্দিত হইয়া শুনিতেন। তিনি

আপনার অপ্রকাশিত নূতন কবিতাগুলি আমাকে শুনাইতেন। আমি হর্ষবিহ্বল হইয়া শুনিতাম। তখনকার রবিবাবুর যেমন দেবকান্তি, তেমনই সুন্দর কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি। আমরা দুইজনে একপ্রকার mutual Adulation Society করিয়া তুলিয়াছিলাম।

একদিন রবিবাবু আমাকে বলিলেন, "ভারতীর সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এখানে আছেন। আপনার কতকগুলি কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইবার জন্য দিন"। অনুরোধ শুনিয়া আমিও কৃতার্থ হইলাম। কারণ ইতিপূর্ব্বে আমার কোন কবিতা অথবা কোন প্রবন্ধ কোন প্রখ্যাত পত্রিকায় বাহির হয় নাই। তখন স্বর্ণকুমারী দেবীর খুব নাম—"ভারতী"র খুব নাম। সম্পাদিকা অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। যেমন তাঁহার নিজের রচনাপটুতা, তেমনি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে দক্ষতা। খুব খাঁটি জিনিস্ না হইলে পত্রিকায় স্থান পাইত না। আমিও ভ্যাজাল্ চালাইতে পারি নাই।

সেই সময়ে আমার "অদ্ভুত সুখ", "অদ্ভুত দুঃখ", "অদ্ভুত বহুরূপী", "অপূর্ব্ব অভিসার", "নাগাসন্ন্যাসী", "গাজিপুর" ও "গোলাপ-সুন্দরী" নামক কবিতাগুলি ভারতীতে স্থান পাইয়াছিল। আমার "অদ্ভুত সুখ" নামক কবিতাটি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ভারতী-সম্পাদিকা আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "শিশুর কান্না দেখিয়া হাসি আসিতে পারে কিন্তু বিধবার রোদন দেখিয়া হাসা অস্বাভাবিক। উহা কবিজনোচিত সহানুভূতির অভাব জ্ঞাপন করে"। তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী আমি নিম্নোক্ত পরিবর্ত্তন করি ও তাহার পর আমার কবিতাটি যথাসময়ে "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়:—

"হেরি সে পবিত্র দুখ
উপজে অপূর্ব্ব সুখ
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে"।

আমার "গোলাপসুন্দরী" কবিতার এক-স্থলে ছিল—

"ক্ষম মোরে দেবপাতঞ্জল।
চাহিনা করিতে আমি যোগশিক্ষা"।

সুদক্ষা সম্পাদিকা আমাকে পত্রের দ্বারায় জানাইলেন, "এ দুটি ছত্রে মহর্ষি পাতঞ্জলকে অসম্মান-প্রদর্শন করা হইয়াছে"। কথা ঠিক! সুতরাং ঐ দুটি ছত্রকে বাদ দিতে হইল। কবিতাটির আর একস্থলে ঠিক্ অশ্লীল না হউক, দুটি-একটি সুরুচি-বিরুদ্ধ শব্দ ছিল। তাহাও বাদ দিতে হইল। এ বিষয়ে সম্পাদিকার খুবই দৃষ্টি ছিল। তিনি রুচিবাগীশ ছিলেন না। তাঁহার কোনো phobia ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অশ্লীলতার ছায়ারও তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

সে সময়ে রবিবাবু, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি গাজিপুর হইতে তিন মাইল দূরে একটি বাঙ্গলায় থাকিতেন, বাঙ্গলাটি গঙ্গায় তীরে অবস্থিত। একদিন গ্রীষ্মকালে সেই বাটীতে গিয়া আমি আমার "কবিপঞ্জিকা"র কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি যুবক আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। ইনিই বঙ্গসাহিত্য-কর্ণধার

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। যথাবিহিত পরিচয়ের পর জ্যোতিবাবু আমার মাথা Examine করিলেন। শুনিলাম তিনি একজন খুব ভাল phrenologist।

Phrenology বিদ্যায় এখন আমার খুব আস্থা ও বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু তখন আমি ঘোরতর অবিশ্বাসী ছিলাম। আমার মাথার বহুস্থলে হাত দিয়া জ্যোতিবাবু বলিলেন, "কবিত্বশক্তি আছে—সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিতা আছে—খুব originality আছে—ইত্যাদি"। আমি তাঁহার কথাগুলি বেদবাক্যরূপে মানিয়া লই নাই—মুখের উপরেই বলিলাম, "এ Science-এ আমার বিশ্বাস নাই"। তিনি আরও নিবিষ্টচিত্তে আমার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিলেন ও ইহাও বলিলেন, "আপনার Sense of veneration টা কিছু কম"। আমরা হাসিতে লাগিলাম।

তিনি আমাকে ও রবিবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা আকাশের—শূন্যমার্গেরই বেশি খবর রাখ। আমি কিছু practical"।

এ ঘটনার বহু বর্ষের পর কলিকাতায় জ্যোতিবাবুর সহিত দুই তিন বার দেখা হইয়াছিল। বালিগঞ্জের বাটীতে একদিন আমাকে সাদরে নিজের কাছে বসাইয়া পাঁচমিনিটে আমার চেহারা আঁকিয়াছিলেন। হুবহু ঠিক! অপূর্ব্ব pencil-sketch।

গাজিপুরে অবস্থিতি কালে পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী গাজিপুর সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা লেখেন। তাহা ভারতীতে পত্রাকারে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রগুলির রচনাভঙ্গি এমন সুন্দর যে বোধ হয় যেন উপন্যাস পাঠ করিতেছি! অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে সাজাইয়া মহিমান্বিত করিতে স্বর্ণকুমারী দেবী সিদ্ধহস্তা। যে সব অতিসামান্য বস্তু সামান্য লোকের দৃষ্টি আদপেই আকর্ষণ করে না, তাহা এই উজ্জ্বলচক্ষু লেখিকার দৃষ্টি এড়াইতে অসমর্থ। হিন্দুস্থানী দাসী জাঁতা পিষিতে পিষিতে যে গান গাহিয়াছে তাহাও তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে এই অলোকসামান্যা মহিলার প্রতিভাবলে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

গাজিপুরে কিছুদিন থাকিয়া স্বর্ণকুমারী দেবী ও রবিবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া যান্। আমি "গাজিপুর", "হরশিঙ্গার", "নাগা সন্ন্যাসী", "সোহাগিনী ইথে তব এত অভিমান" প্রভৃতি কবিতাগুলি ভারতীর জন্য পাঠাই। "গাজিপুর" নামক কবিতাটির আরম্ভ-ভাগ এইরূপ :—

এবে, গোলাপে গোলাপে, ছাইয়ে ফেলেছে,
এ মধু কানন দেশ।
সখি, তুমিও আইস, গোলাপি অধরে,
ধরিয়া গোলাপি বেশ!
গোলাপের ক্ষেত্, গোলাপি বিহানে
হেরি হারাইবে জ্ঞান,
হেথা, ফুল কি ফুটিছে? ছুটিছে ফোয়ারা
ভেদিয়া বিশ্বের প্রাণ!

কবিতাটির নিম্নে আমার নাম ছিল না। কবি-ভগ্নী সরোজকুমারী দেবী প্রভৃতি মনে করিয়াছিলেন কবিতাটি স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা। "হরশিঙ্গার" নামক কবিতার নিম্নে "শ্রী—উকিল" মাত্র ছিল। "কবির

album" কবিতায় ও "দগ্ধকচু" উপন্যাস প্রভৃতিতেও আমার নামের উল্লেখ ছিল না। এজন্য অনেকেই প্রতারিত হইয়াছিলেন। কাহার লেখা কেহ ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, একবার সাহিত্যসম্রাট রবিবাবুও জব্দ হইয়াছিলেন। যেমন political secrets থাকে, স্বর্ণকুমারী দেবীরও literary secrets থাকিত। "দগ্ধকচু"র লেখক শ্রীমেঘনাদ শক্র কে, ইহা কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করেন নাই। রবিবাবু দেখিলেন যে, "দগ্ধকচু"তে রঙ্গব্যঙ্গ উপহাসের প্রাচুর্য্য আছে—অতএব ইহা নিশ্চয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর লেখা—ইহা ঠাওরাইয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রবাবুকে একখানি প্রশংসাপূর্ণ পত্র লেখেন। তাহারপর যখন শুনিলেন যে উহা আমার লেখা, তখন যারপর-নাই বিস্মিত হন ও বলিয়াছিলেন, "দেবেন্দ্রবাবু গম্ভীর-প্রকৃতির লোক—তিনি "দগ্ধকচু"র প্রণেতা, কেমন করিয়া বুঝিব"?

আমি গাজিপুর পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন লক্ষ্ণৌতে বাস করি। সেস্থান হইতে রাশি রাশি কবিতা ভারতীর জন্য পাঠাই। আমি একখানি পত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনাকে দেখি নাই বটে, কিন্তু আমি আমার হৃদয়-মন্দিরে একটি আদর্শ নারীমূর্ত্তির পূজা করি। উহা আপনারই মূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি। তদুত্তরে পূজনীয়া সম্পাদিকা আমাকে "ভ্রাতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া পত্র লেখেন। এত অকৃত্রিম যত্ন ও এত সুমিষ্ট আদর! তাঁহার পেটে এক, মুখে আর এক নাই। তিনি artificialityর আদপেই ধার ধারেন না। আমি তাঁহাকে "দিদি" বলিয়া পত্রাদি লিখিতাম। তাঁহার সহিত পরিচয় ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি শোলাপুরে পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতিকালে আমাকে লিখিয়া পাঠান, "আপনাকে যখন ভ্রাতা বলিয়াছি তখন আপনিও আমাদের আত্মীয়। আমার দাদা এখানকার Session Judge —আপনি আসিলে আমরা আপনাকে খুব যত্ন করিব—। আপনার শরীর ভাল থাকে না। এখানে আপনি আসিলে বায়ুপরিবর্ত্তনে নিরাময় হইবেন। আপনি নিঃসঙ্কোচে এখানে আসুন, ইত্যাদি।" দুঃখের বিষয় যে, অনেকগুলি অপরিহার্য্য কারণবশতঃ এই স্নেহপূর্ণ মধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই।

প্রতি সপ্তাহেই স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্র পাইতাম ও নিয়মিতভাবে আমিও উত্তর দিতাম।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, স্বর্ণকুমারী দেবী কোন্ কবিতা সাচ্চা আর কোন্ কোন্ কবিতা ঝুঠা, যেমন বোঝেন এমন অল্পলোকেই বাঙ্গলাদেশে বোঝে। তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তি অসাধারণ।

আমি লক্ষ্ণৌতে অবস্থানকালে তাঁহার সমুদয় গ্রন্থগুলি এক set উপহার পাই। আমি তাঁহার উপন্যাসগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হই ও তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসের নায়িকাগুলির উপর কবিতা লিখি। আমি সেই কবিতাগুলি ভারতীতে প্রকাশিত হইবার জন্য সম্পাদিকাকে অনুরোধ করি।

"নিজের পত্রিকায় নিজের প্রশংসার কথা কেমন করিয়া মুদ্রিত করি?" এই বলিয়া তিনি আমাকে পত্রের দ্বারায় নিজ অসম্মতি প্রকাশ করেন। আমিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাঁহার হার ও আমারই জিৎ হইল। তিনি সমস্ত কবিতা-গুলিকেই ভারতীতে স্থান দিলেন ও foot-noteএ লিখিলেন, "কবি দেখিতেছি আমার উপন্যাসগুলিকে সূতা করিয়া কবিতার হার গাঁথিয়াছেন। ইহাতে যদি কিছু গুণপণা থাকে, তাহা মাল্যকারের—সূতার নহে"। কি মধুর বিনয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নবপত্রিকায় ভারতী

ভারতীর বয়স চল্লিশ বছর!—শুনিয়া কেবল বিস্মিত হই নাই, আকাশ হইতে যেন একেবারে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলাম। বলে কি? ভারতীর বয়স এত অল্প! দিদিমার মুখে, দাদা-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—কত দিন, কত পক্ষ, কত মাস, কত বছর, কত যুগ চলিয়া গিয়াছে,—ভারতীর বয়সের কেহ খবর পায় নাই। পৃথুর নামেই ত' পৃথিবী, ভগীরথের নামেই ত' ভাগীরথী, কুরুর নামেই ত' কুরুক্ষেত্র, আর ভারতীর নামেই ত' ভারতবর্ষ। আরাঙ্গজেব জন্মিবার আগেই কি আরেঙ্গাবাদের নাম আরেঙ্গাবাদ হইয়াছে? ব্যাসের মহতী ভারতী হইতে মহাভারতের জন্ম; তাই মহাভারতের নাম মহাভারত। সবাই জানে,—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যে দেবীসূক্ত আছে, তাহার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্—ভারতী; ভাবিয়া দেখ—সে কত দিনের কথা। ধরিতে গেলে অনন্তকালের হিসাবে সেও সেদিনের কথা। মানুষে যখন পৃথিবী ভরিয়া গেল, বনের ফলে যখন মানুষের আর আহারে কুলায় না; তখন পৃথুরাজা প্রথম এই পৃথিবীর মন্থন করিলেন। সেই মন্থন এখনও চলিতেছে। সেই মন্থনের ফলে আজও মানুষ খাইয়া বাঁচে। অবশ্য সেও সেদিনের কথা। সেইরূপ বহু পূর্ব্বে দেবাসুরে মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিয়াছিলেন,—সমুদ্রের তল হইতে লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন। মিথ্যা কথা, সমুদ্রের তলে আর কতটুকু লক্ষ্মী আছে, বরং সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়া গেলে লক্ষ্মীলাভ হয়। লক্ষ্মী নয়,—লক্ষ্মী নয়, সরস্বতী উঠিয়াছিলেন,—সমুদ্র হইতে।

লক্ষ্মী সরস্বতী দুইই যে নারায়ণের পত্নী। নারায়ণের পত্নী ভাবিয়া ভুলিয়া পুরাণকার লক্ষ্মী বলিয়া ফেলিয়াছেন। বোধ হয়, পূর্ব্বে লক্ষ্মী-সরস্বতীতে প্রভেদ ছিল না, তাই এক "শ্রী"নামে লক্ষ্মীকেও বুঝায়, সরস্বতীকেও বুঝায়। সরস্বতীর উপাসকেরাই ত' লক্ষ্মী লাভ করে। উপাসনা করিল একের, অন্যে আসিয়া তাহার বর দেয়,—এ কেমন, বুঝি না। মূক দেবাসুর মনোমন্দরের উপরে বিশ্ববিধাতা বিষ্ণুকে বসাইয়া ভাবের সমুদ্রকে

অনবরত মন্থন করিলেন, সেই মন্থনের ফলে অমৃত কলস কক্ষে করিয়া ভারতী উঠিলেন। দেবাসুরের মুখ ফুটিল, সেই কলসী লইয়া প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ, পরে হাতাহাতি, লাঠালাঠি। বলে পরাস্ত হইয়া অসুরেরা "হেলয়ঃ হেলয়ঃ" বলিতে বলিতে সিন্ধুর পরপারে বা পাতালে পলাইলেন, অমৃত-কলসও ভারতী-দেবতাদিগের হইল। অমৃতপানে দেবতারা অমর হইলেন। সেই অমৃত পান করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া বাল্মীকি অমর হইয়াছেন, ব্যাস অমর হইয়াছেন, কালিদাস অমর হইয়াছেন, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতিও অমর হইয়াছেন। সেই অমৃত-ভাণ্ডটিকে উঠাইয়া দেবাধিদেব পঞ্চানন মস্তকে রাখিয়াছেন বলিয়া অতি-মন্থনের ফলে উত্থিত হলাহল পান করিয়াও অমর হইয়াছেন। সেই বিষের ফল মাহেশ ব্যাকরণ, অমৃতের মাহাত্ম্যে দেবতারা সে বিষ হজম করিতে পারিয়াছিলেন, মানুষ পারিল না; কাজেকাজেই তাহার ছায়াবলম্বনে পাণিনীয় রচিত হইল। তাহাতেও মাহেশ্বর বিষের সম্বন্ধ রহিল; গোড়াতেই "অ, ই, উ, ঋ, ৯ ক" হইতেই আরম্ভ। আবার নাগরাজ অনন্ত আসিয়া সহস্রমুখে যত পারিলেন—তাহাতে বিষ ঢালিলেন। বঙ্গ সহ্য করিতে পারিল না, উৎকল সহ্য করিল না, নেপাল, কাশ্মীর, মারওয়ার সহিতে না পারিয়া পাণিনীয়কে বিদায় দিল, কলাপকে আদর করিয়া লইল, লঙ্কা ও তিব্বত বঙ্গের অনুকরণে তাহাই করিল। যাউক এ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা, জানা আবশ্যক ভারতীর বয়স কত।

সরস্বান্‌ সমুদ্রের নাম, সরস্বতী যদি স্ত্রী-সমুদ্র হয়, তবে সরস্বতীর কূল-কিনারা পাওয়া অসম্ভব; সমুদ্রের কি কূল-কিনারা পাওয়া যায়?

জৈমিনি জেঠা-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি—ভারতী নাকি নিত্য; তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। প্রমাণের বিচার তুলিয়া পাঠক-পাঠিকাকে ফাঁফরে ফেলিতে চাই না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি,—লাঠিয়াল যখন লাঠি ঘুরাইতে থাকে, দড়ির মুখে একটি বল বাঁধিয়া যদি সেই দড়িগাছ ঘুরানো যায়, তবে ভন্‌ ভন্‌ শন্‌ শন্‌ শব্দ শুনা যায়। রেলের গাড়ীর চাকা, ঘোড়ার গাড়ীর চাকা, গরুর গাড়ীর চাকা ঘুরিলেই একটা-না-একটা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই যে অসীম আকাশে সূর্য্য-মণ্ডলকে সমগ্র গ্রহ-চক্র প্রবল বেগে অচিন্ত্য দ্রুতগতিতে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহাতে কি শব্দ নাই? ভারতী নাই?

আমরা জানি,—নৌকার মাঝীরা সারি গাহিয়া দাঁড় টানে, শকটচালক গান গাহিয়া গাড়ী চালায়, হলচালক গান গাহিয়া জমি চষে ও নিড়ায়, রাখালেরা গান গাহিয়া তৃণপূর্ণ মাঠে গরু লইয়া যায়, পাল্কীবাহক ও ভারবাহক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হুঁ হুঁ শব্দে ছুটে, মেয়েরা গান গাহিয়া তালে তালে ঢেঁকি ভানে ও যাঁতা ঘুরায়। চেতন জগতের এ নিয়ম অচেতন জগতেও আছে; সকলেই শব্দের সাহায্যে ভারতীর উপাসনায় কার্য্য করিয়া যাইতেছে। অচেতনও শব্দের সহায়তা না লইয়া খাটিতে পারে না।

হিন্দুত সর্ব্বত্র বিশ্বরূপের বিশ্বরূপ দেখিতেছে, কাহাকেও অচেতন বলিতে পারে না। ছান্দোগ্যে আছে—সূর্য্য গান গায়িতে গায়িতে উদিত হয়েন। গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিলেও সূর্য্য অচল নহেন, তাঁহারও আপন কক্ষায় ঘূর্ণন আছে, সুতরাং সূর্য্য-মণ্ডলেও ভারতীর অধিষ্ঠান, ভারতীর অবস্থান আছে। সূর্য্যের তুলনায় অগাধ-অসীম সমুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই ক্ষুদ্র জলবিন্দু যখন জোয়ার ভাটা খেলিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ কাচ-স্বচ্ছ তরঙ্গ তুলিয়া সাত বজ্রাঘাতের মত গভীর গর্জ্জনে অনবরত উথলাইতেছে, তখন উষ্ম তরল প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল যে নীরবে নিয়ত উথলাইবে ও অনবরত ঘূর্ণনে নীরবে নিয়ত গ্রহ প্রসব করিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। বিশ্বের শব্দ চলিতেছে, যখন বিশ্ব ছিল না তখন শব্দ ছিল কিনা কে বলিবে? পৌরাণিক ঋষি বলিতেছেন ভগবান্ শেষ শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন লক্ষ্মী চরণ সংবাহন করিতেন, সরস্বতী চামর ব্যজন করিতেন; সরস্বতীর হাতে চামর ব্যজনের ভার, সুতরাং শব্দ আছে, বায়ুরাশি আন্দোলিত হইলেই শব্দ আছে। নৈয়ায়িকেরা সুদৃঢ় প্রমাণের বলে শব্দকে আকাশের গুণ স্থির করিয়াছেন,—বায়ুর গুণ নয়—সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "দোধূয় মানা স্তিষ্টন্তি প্রলয়ে পরমানবঃ" নৈয়ায়িকের এই কথা যদি ঠিক হয়, মীমাংসকের প্রদর্শিত যুক্তির বলে শব্দ যদি নিত্য হয়; তবে বলিতে হইবে—প্রলয়ের শব্দ ছিল, প্রলয়ের বক্ষেও সরস্বতীর আসন পাতিত ছিল, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় মৃতপ্রায় পরম শিবের বুকে মা, নীল সরস্বতী অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

তবে কি ভারতীর চল্লিশ বছর বয়স, এ কথা মিথ্যা? না, মিথ্যা নয়। আমরা প্রতিষ্ঠা পণ লইয়াই বয়সের কল্পনা করি। আমি যে বলিতেছি, আমি সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক, তুমি যে বলিতেছ,—আমি ষষ্ঠিবর্ষ বয়স্ক; এই আমার কথা, তোমার কথা কি মিথ্যা? আমি শব্দের অর্থ আত্মা, তুমি শব্দের অর্থও আত্মা। হিন্দুত আত্মার উৎপত্তি মানে না!—তবে কি করিয়া সত্তোর বৎসর বয়স ও ষাট্ বৎসর বয়স হয়? বলিতে হইবে, এই শরীরে আত্মার প্রতিষ্ঠা লইয়াই বয়সের বিচার। মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা লইয়াই দেবতারও বয়সের বিচার। ঋষিবৃন্দ যাঁহাকে ওঁরূপে, বংরূপে, হ্রীঁরূপে, ক্রীঁরূপে, ক্লীঁরূপে, স্বাহা, স্বধা, বষট্‌রূপে দেখিয়াছেন; প্রতিষ্ঠা লইয়াই সেই ভারতীর বয়সের বিচার।

পবিত্র ব্রহ্মবাদী ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহর্ষির ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া তত্ত্বদর্শী দ্বিজেন্দ্র সম্মোহিতচিত্তে পত্রিকামন্দিরে "পঞ্চাশল্লিপিভি বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্য স্থলা" মৃণালগৌরী বীণাপাণি ভারতীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যখন মৃদুমধুর শুভ্র জ্যোৎস্না ছড়াইতে ছড়াইতে পূর্ব্বগগনে বর্দ্ধনোন্মুখ বঙ্কিমচন্দ্র হাসিতে হাসিতে দেখা দিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শন যখন রসে উচ্ছ্বসিত; সেই সময়ে সেই আপূর্য্যমাণ শুক্লপক্ষে বলিতে হইবে,—বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চমী তিথিতে এই ভারতীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই প্রতিষ্ঠা

লইয়াই এই ভারতীর চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। এই চল্লিশ বৎসর কম নয়, এই চল্লিশ বছরের ভিতরে, কত সুদৃঢ় দেব-প্রাসাদ ভূমিকম্পের তাড়নায় ভূগর্ভে বিলীন বা ইষ্টকস্তূপে পরিণত, কত সুরম্য হর্ম্ম্য প্রচণ্ড তৃণাবর্ত্তের অপ্রতিহত-প্রবলবেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ, কত অট্টালিকা জলপ্লাবনে জলধি-গ্রস্ত! আশ্চর্য্য, বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় যে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহার নির্ম্মাণ হইয়াছে, ভারতীর সেই পত্রিকারূপ মন্দির-খানি, পাতার ঘরখানি ঠিক পূর্ব্ববৎ নিখুঁৎভাবে আজও দণ্ডায়মান, আজও সকলের চোখের সামনে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, চুলের আগার মত একবিন্দু অপচয়ও হয় নাই। এ একলা দ্বিজেন্দ্রের সৌভাগ্য নয়, তোমার-আমার সৌভাগ্য, সমস্ত বঙ্গের সৌভাগ্য, সমস্ত ভারতের সৌভাগ্য। গৃহকর্ত্তা বয়সের সীমায় দাঁড়াইলে আর সে বাহ্য পূজা লইয়া সময় কাটাইতে পারে না, জপ, ধ্যান, মানস-পূজায় তাহার সময় কাটিয়া যায়; প্রতিষ্ঠিত গৃহ-দেবতার পূজার জন্য আর তাহার তিলার্দ্ধ সময় থাকে না। তাই দ্বিজেন্দ্র ক্রমে ভগিনীর হস্তে, ভাগিনেয়ীর হস্তে, ভ্রাতার হস্তে, এই কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া সমাধিস্থ হইয়া-ছিলেন। প্রাণপণে গুরুজনের আজ্ঞা প্রতি-পালন করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহারাও প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজায় দীক্ষিত ও ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। যখন যে পুষ্প যে ফল পাওয়া যায়, রাশি রাশি সেই সকল উপাদেয় ফল পুষ্প আহরণ করিয়া নিজের গৃহজাত সূক্ষ্ম সুচিক্কণ শুভ্র সুরভি শালি তণ্ডুলে প্রকাণ্ড নৈবেদ্য সাজাইয়া তাঁহারা এ পর্য্যন্ত মহা আড়ম্বরে দেবীর পূজা চালাইয়াছেন। ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুলের সৌরভে অগুরু চন্দন কুঙ্কুম কস্তূরী সুবাসিত সুরভিকুসুম রাশির ও বিবিধ সুপক্ক ফল মিষ্টান্নে সুসজ্জিত নৈবেদ্য-সম্ভারের সৌগন্ধ্যে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত হইতেছিল—সেই প্রসাদি-মহামূল্য নৈবেদ্য ভক্তসাধকদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রেরিত ও সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছিল, দীন, হীন, কাঙাল বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোন যাচক উপেক্ষিত হয় নাই। প্রসাদি-নৈবেদ্য পাইয়া সকলে ধন্য হইয়াছে—ও ধন্য ধন্য করিয়াছে। অধিকাংশ মাতৃভক্ত সাধক এই মহাপূজায় যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বৃদ্ধের পক্ষে এ পর্য্যন্ত সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। পুত্রের ভাগে ঘটিয়াছে। কিশোর পুত্র গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া পূতদেহে পূতমনে ভারতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে। আজও সেই ক্ষুদ্র-পাণিতলের অঞ্জলির ফুলগুলি বাসি হয় নাই, শুকায় নাই, মায়ের চরণে ফুটিয়া রহিয়াছে। "দেবোভূত্বা দেবং যজেত" কাহাকেই বা বলি? কেবা এই তত্ত্বের অনুভব করিতে পারে? সাধকভক্ত দেখিয়াছ কি? রবিকরে উদ্ভাসিত হইয়া দ্বিজেন্দ্র-সেবিত যে ভারতী লোকলোচনের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে; তাহাকে পূজা করিবার জন্য সেই ভারতীরই স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্বর্ণকুমারী পবিত্র আসনে বসিয়াছেন, হিরণ্ময়ী প্রতিমা ধ্যানমগ্না হইয়াছেন; সরলা প্রতিমা বাছিয়া বাছিয়া নবনব পুষ্পদল

অঞ্জলি ভরিয়া মায়ের চরণে অর্পণ করিতেছেন, আর ভক্ত সাধকগণ যথাশক্তি অবিশ্রাম শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্য, করতাল বাজাইতেছেন; সে কেমন সুন্দর দৃশ্য, সে কেমন জগদ্বিমোহন ঐকান্তিকতা, সে কেমন নিজে কার্য্য করিয়া জগতে শিক্ষা দান। মায়ের নিকটে খাইতে শিখিয়াছি, শুইতে শিখিয়াছি, বসিতে শিখিয়াছি, পরিতে শিখিয়াছি, কথা কহিতে শিখিয়াছি, সেইজন্য মায়ের আদরের কোমলশিক্ষা বড় আদরের, মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া আজও শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে।

মা সন্ধ্যাবেলা দুইটি উপযুক্ত পূজারীর হস্তে পূজার ভার দিয়া তাহাদিগের উপরে চক্ষু রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পূজারিদ্বয়ের হাত পাকিয়াছে। তাঁহাদের নিপুণ হস্তের দীপ-চালনায়, আরতির ইঙ্গিতে, ঘণ্টা-নাদের ভঙ্গীতে নিজের নিজের ভেট মাথায় করিয়া দর্শকবৃন্দ ছুটিয়া মণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এই আরতির সূত্রপাতেই বুঝিতেছি—অব্যাহতভাবে ভারতীর পূজা চলিবে। চিন্ময়ী মায়ের চরণে প্রার্থনা করি,—ভারতী এই মন্দিরে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগতের পূজা গ্রহণ করুন। প্রণব যেমন অতি প্রাচীন হইলেও প্রকৃষ্টরূপে নয়; সেইরূপ আমাদিগের এই প্রাচীন পত্রিকাখানি নিত্য নব নব ভাব লইয়া জগতের সমক্ষে নবীন রূপে প্রতিভাত হউক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

শিল্পী রেঁদা

(১)

সিন-নদীর তীরে, একটি ছোট পাহাড়ের উপর শিল্পী রেঁদার বাস,—সেখান হইতে, আকাশ-পৃথিবীর বিলীয়মান মিলন-রেখায় সভ্যতার রাণী প্যারিকে দেখা যায়। প্রকৃতির এই মুক্ত-শ্রীর মধ্যে, আপন নিভৃত ভবনে বসিয়া এ-যুগের শিল্প-সম্রাট রেঁদা শুভ্র শিলা-পটে বিচিত্র ভাবের কাব্য ফুটাইয়া তুলেন।

রেঁদা, আধুনিক শিল্প-রাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছেন। ললিতকলাকে তিনি যেমন তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার ভিতরের গূঢ় কথা যেমন ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহার উপরে যেমন নূতন আলোকপাত করিয়াছেন—একালের আর-কেহ তেমন পারেন নাই।

শিল্প-জীবনের আরম্ভে তিনি চলিত রীতি-পদ্ধতির কোন ধার-না-ধারিয়া আপনার উপযোগী একটি বিশিষ্ট পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম-প্রথম কেহ তাঁহার শিল্পের আসল সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিত না,—লোকে ভাবিত, এই অক্ষম শিল্পী শিব গড়িতে বসিয়া বানর গড়িয়া ফেলিতেছে! সকলেই তাঁহাকে ঠাট্টা-তামাশা করিত—সময়ে-সময়ে গালি দিতেও ছাড়িত না।—রেঁদা কিন্তু সে অনাদর-অবহেলা একেবারেই গায়ে

মাখিলেন না—আপন সাধন-পথে তিনি পাথরের মতই অটল হইয়া রহিলেন! কারণ, তিনি জানিতেন যে, প্রতিভার ফুল ত ফুরফুরে বাতাসে ফোটে না,—সে ফোটে ঝড়ের ঝাপটায়, সহস্র বাধা-বিঘ্নের আঘাতে!

প্রাণের সাধনা কখনো বিফলে যায় না।—একে-একে কতকগুলি বিখ্যাত ও সমজদার লোক রোঁদার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। রোঁদা যে যথার্থ সত্যপথই অবলম্বন করিয়াছেন—এই কথাটি তাঁহারা সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ধীরে ধীরে সাধারণের চোখ ফুটিতে লাগিল।

রোঁদা এখন অতি-বৃদ্ধ। পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রের মহাবিপ্লবে জীবন-সন্ধ্যায় তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া প্রবাসী হইয়াছেন। তাঁহার শান্তিসুপ্ত সাধনকুঞ্জে আজ রক্তের ঢেউ বহিতেছে।

কিছুদিন আগে শিল্পাচার্য্য রোঁদা, ললিত কলা সম্বন্ধে আপন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই মত-প্রকাশের ফলে শিল্পী-সমাজ বেশ-একটা নাড়া পাইয়াছে। আমরা এখানে তাঁহার মতামতের কতক-কতক পরিচয় দিলাম। তাঁহার এই অভিমতগুলি মন-দিয়া পড়িয়া দেখিলে কি শিল্পী, কি সাহিত্যসেবী, আর কি সাধারণ পাঠক,—সকলেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন।

"আজকাল যাঁরা শিল্পী ও শিল্প-রসিক তাঁরা যেন সেই মান্ধাতা আমলের মানুষ। এখনকার যুগ হচ্ছে যন্ত্রনির্ম্মাতা আর ব্যবসায়ী কারিকরের যুগ—এখানে কলাবিদের ঠাঁই নাই।

একেলে জীবন সুধু দেখিতে চায়, কোন্‌টা কেজো আর কোন্‌টা অকেজো—বিষয়াসক্তিই এখন আমাদের সর্ব্বস্ব। বিজ্ঞান এখন মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নূতন সহজ উপায় আবিষ্কার করিতেছে—শস্তায় রদ্দী মালের আমদানি করিয়া জনসাধারণের ভিতরে বিকৃত বিলাসের প্রচার করিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে যে সংসারের দৈনিক অভাব অনেকটা পূরণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে মনের স্ফূর্ত্তি, ভাবের মাধুর্য্য ও কল্পনার বৈচিত্র্য কোথায়?—ললিত-কলা মরিয়া গিয়াছে!

মানুষ এখন মনে করে, ললিতকলাকে ছাড়িয়া সে অনায়াসে নিজের কাজ নিজে সারিয়া লইতে পারে। মানুষের মন হইতে ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার রঙ্গিনতা ছুটিয়া গিয়াছে;—সে চায় বাস্তব, সে চায় শরীর দিয়া উপভোগ করিতে! মানবজাতি এখন জড়বৎ—এ উপাদানে কলাবিদের গঠন হয় না।

আর্ট আর রুচি, এক। কলাসৃষ্ট বিষয়ের উপরে শিল্পীর হৃদয়ের যে ছায়াপাত হয়—ললিতকলা তাহারই প্রতিবিম্ব। মানব-আত্মার হাস্য আর্টের রূপ ধরিয়া আমাদের ঘর-দুয়ার আলো করিয়া তুলে! কিন্তু আমাদের ক-জন বুঝেন যে, ঘর-দুয়ার সাজাইতে হইলে রুচির দরকার? সেকালে আর্ট ছিল সর্ব্বত্র। সামান্য চাষা-ভুষারাও এমন-সব জিনিষ ব্যবহার করিত যে, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। তাহাদের বাসন-কোসন, বসিবার আসন ও জলের

অভিশপ্তা

তরুণী

কলসগুলি পর্য্যন্ত সুডৌল-সুন্দর হইত। আজ কিন্তু দৈনিক জীবন-যাত্রায় আর্টের সঙ্গে দেখা হয় না। লোকে বলে কাজ চলিলেই হইল—সুন্দরে কি দরকার? সবই এখন কদাকার, তাড়াতাড়িতে যেমন-তেমন করিয়া তৈরি-করা, সব জিনিষই কলের ছাঁচে পড়িয়া বেঢপ। কলাবিদ এখন সকলকার শত্রু।"

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, পাশ্চাত্য শিল্পীরা জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রাঙ্কন বা মূর্ত্তিগঠন করেন। এই আদর্শ-স্বরূপ পুরুষ বা রমণী, শিল্পীর স্বেচ্ছামত ভঙ্গীতে তাঁহার সুমুখে দাঁড়াইয়া, বসিয়া বা শুইয়া থাকে,—তাহাই দেখিয়া শিল্পী আপন পরিকল্পনাকে শরীরিণী করিয়া তুলেন।

রোঁদাও আদর্শ দেখিয়া মূর্ত্তিগঠন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র। যাহারা তাঁহার আদর্শ হয়, সাধারণত তাহাদিগকে তিনি কোন-এক নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হুকুম দেন না;—তাহারা তাঁহার সম্মুখে স্বাধীনভাবে নানান্ ভঙ্গিমায় চলা-ফেরা ওঠা-বসা করে—সেই বিবিধ অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে যেটি বেশী পছন্দসই, স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়, রোঁদা তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বলেনঃ—

"আমার সহযোগী শিল্পীরা যে প্রণালীতে কাজ করেন, হয়ত তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু প্রকৃতির উপরে এমন স্বেচ্ছাচার ও মানুষের প্রতি এমন গোলামের মত ব্যবহার করিলে, শিল্পীর কাজ কৃত্রিম ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িবার ভয় আছে।

ইভ

আমি সত্য-সন্ধানী,—এমনভাবে আমি কাজ করিতে পারিব না। সজীবতার ভিতরে আমি যে গতিবিধি দেখি, তাহা আমি গ্রহণ করি—কিন্তু আমার মনের-মত হইবার জন্য আদর্শকে আমি বাধ্য করি না।

প্রকৃতিকে আমি সকলতাতেই মানিয়া চলি; তাঁহার উপরে হুকুমজারি করা আমার স্বভাব নয়—আমার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে,—প্রকৃতির কাছে আমি যেন দাসের মত বিশ্বস্ত হইতে পারি।

প্রকৃতিকে আমি যেমন দেখি, তেমনি ফুটাই—পরিবর্ত্তন করি না। তবুও যে আমার গঠিত মূর্ত্তি দেখিতে অন্য রকম হয় তার মানে প্রকৃতির যে বাহিরের রূপ তাকে অতিক্রম করিয়া আর-এ কটি সত্য রূপ আমার মূর্ত্তিতে থাকে। আমি ত শুধু বাহির লইয়া কারবার করি না, আমার যে ভিতরটিও চাই—এবং ঐ ভিতরটি প্রকৃতিরই নিজস্ব সামগ্রী। ভিতর বাহির এক-করিয়া প্রকৃতির যে রূপ তাহাই আমার শিল্প।

শিল্পী প্রকৃতিকে সে চোখে দেখেন না—সাধারণে যে চোখে দেখে। বাহিরের আকারের আড়ালে যে লুকানো সত্য আছে, আপন আবেগে শিল্পী তাহা দেখিতে পান।

আর্টে একটি কথাই মূলকথা—তুমি যেমন দেখিবে, তেমনি নকল করিবে। প্রকৃতির উপরে হাত চালাইয়া তাঁহাকে তুমি বেশী-সুন্দর করিতে পারিবে না।

প্রকৃতিকে দেখার-মত-দেখাই হচ্ছে আসল কথা।

অল্প যার শক্তি,—প্রকৃতিকে নকল করিয়া সে কখনও আর্টের বিকাশ করিতে পারে না; কারণ, সে না-দেখিয়া সুধু চাহিয়াই থাকে। সে যদি প্রকৃতির সমস্ত খুঁটিনাটি হুবহু নকল করিয়াও যায়, তাহা হইলেও কোনই ফল হইবে না। শিল্পীর ব্যবসা ক্ষুদ্রশক্তির জন্য নহে।

কলাবিদ দেখার-মত দেখেন। মানস-নেত্রে তিনি প্রকৃতির গোপন মর্ম্মটি দেখিতে পান। শিল্পীর প্রধান নির্ভর—তাঁহার দৃষ্টি।"

La Vieille Heanlmére নামে রোঁদার গঠিত একটি মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি এক বৃদ্ধা রমণীর। বয়সের ভারে সে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং আপনার বিগত-যৌবন লোলচর্ম্ম কদাকার দেহের দিকে চাহিয়া সে যেন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ললিতকলায় বৃদ্ধবয়সের এমন ছবি আর একটি-বৈ দুটি নাই। তাহা St. Magdeleneএর মূর্ত্তি—ফ্লোরেন্সের প্রাচীন শিল্পী Donatello তাহা গঠন করিয়াছেন। সে মূর্ত্তিও উলঙ্গ—কেবল দীর্ঘ কেশদাম বস্ত্রাকারে তাহার লুপ্ত-শ্রী দেহকে বেষ্টন করিয়া আছে। Saint Magdelene পূর্ব্বজীবনে আপন: পার্থিব দেহের প্রতি যে মিথ্যা যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মরুভূমিতে গিয়া তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন,—Donatelloর মূর্ত্তিটি সেই তপস্বিনী Magdeleneরই প্রতিরূপ। Magdelene-এর মুখে স্বর্গীয় ভাবের আবেশ আছে—নশ্বর দেহের জন্য যে তিনি কিছুমাত্র

বৃদ্ধা
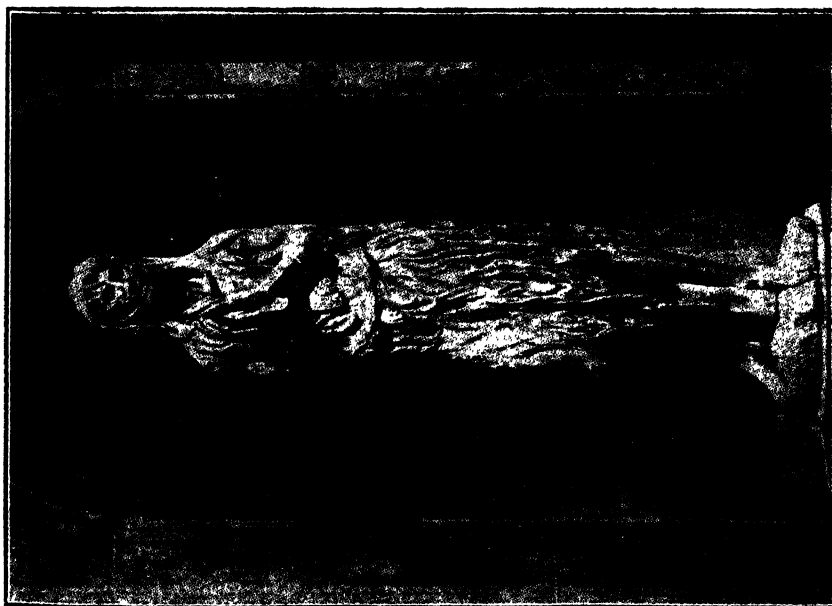
ম্যাগডেলিন

আকুল, তাঁহার মুখে এমন কোনই চিহ্ন নাই। কিন্তু রোঁদার বৃদ্ধা রমণী যেন আপনার শবের মত গলিত দেহ দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে। এইখানেই দুইযুগের দুই শিল্পীর মধ্যে প্রভেদ।

রোঁদার গঠিত এই বৃদ্ধা রমণীর মূর্ত্তিটি দেখিলে দর্শকেরা—বিশেষত মহিলা-দর্শকেরা অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া থাকেন। সেই উপলক্ষে রোঁদা বলিতেছেন, "এ মূর্ত্তিটি কুশ্রী—সাধারণে তাই ইহাকে দেখিতে চায় না। ইহার কাছে আসিলে মহিলারা তাড়াতাড়ি হাত-দিয়া আপনাদের চোখ ঢাকিয়া ফেলেন। ইঁহারা সত্যকে ভয় করিয়া চলেন।

আমি সুধু গুণজ্ঞের মুখ চাহিয়া কাজ করি। আমি হচ্ছি সেকালের সেই রোমীয় গায়কের মত,—জনতার বিদ্রূপের উত্তরে যিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি সুধু গুণীকে গান শুনাই!'

যারা অবোধ, কেবল তারাই মনে করে, এই দৃশ্যমান বিশ্বে যাহা-কিছু কুশ্রী, কলাবিদের পক্ষে তাহা গ্রহনীয় নহে। কি ভ্রম!

সচরাচর যাহাকে বলা হয় অসুন্দর, আর্টে তাহাই অপূর্ব্ব-সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে। বাস্তবজগতে যাহা-কিছু বিকৃতাঙ্গ, যাহা-কিছু অস্বাস্থ্যকর, যাহা-কিছু রোগ বা অক্ষমতা বা যন্ত্রণার সূচক, যাহা শৃঙ্খলার পরিপন্থী (কারণ শৃঙ্খলাই হচ্ছে স্বাস্থ্য ও শক্তির নিদর্শন),—সে-সমস্তকেই কুৎসিত বলিয়া ধরা হয়। কুব্জ কুশ্রী, খঞ্জ কুশ্রী, দরিদ্রের ছিন্নকন্থা কুশ্রী।

কুৎসিত হচ্ছে নীতিহীন নারকী ও সমাজ-শত্রু নিয়মভ্রষ্ট মানবের স্বভাব; কুৎসিত হচ্ছে গুরুঘাতক, বিশ্বাসঘাতক এবং অধার্ম্মিক দুরাকাঙ্ক্ষীর আত্মা।

যাহাদের নিকট হইতে কেবল অমঙ্গলের আশা করা যায়, তাহাদিগকে যে ঘৃণার্হ উপাধি দেওয়া হয়, তাহা কিছু অন্যায় নহে। কিন্তু একজন প্রতিভাধর লেখক বা শিল্পীকে ঐ-সকল কদর্য্যতার মধ্য হইতে কোন-একটিকে লইয়া ব্যবহার করিতে দাও, দেখিবে এক মুহূর্ত্তেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তাঁহার যাদুযষ্টির একটি স্পর্শেই যাহা কুরূপ, তাহা সুরূপ হইয়া যাইবে;— এ যেন মহামায়া!

Velasquez, রাজসভার বামন সিবাষ্টিয়ানের ছবি আঁকিয়াছেন। বামনের চক্ষে তিনি এমন-এক মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি অর্পণ করিয়াছেন যে, আমরা দেখিবামাত্র তাহার মধ্যে সেই যাতনাদায়ক গুপ্তকথা জাজ্জ্বল্য হইয়া উঠে,—যাহার জন্য সেই হতভাগ্য জীব, বাধ্য হইয়া আপন মানবতার সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, এবং একটি জীবন্ত ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে।

Beandelairc যদি একটি সপূঁজ, কীটদষ্ট, অপরিষ্কার ও গলিত শবের বর্ণনা করেন এবং কল্পনায় যদি তাঁহার প্রাণ-প্রিয়তমাকে এই ভীষণ অবস্থায় নিরীক্ষণ করেন, তবে তাঁহার সে সৌন্দর্য্যের চিত্র অতুলনীয় হইয়া উঠিবে। সেক্স্‌পিয়ারের ইয়াগো বা তৃতীয় রিচার্ডের ছবি এবং Racineএর অঙ্কিত নিরো ও নার্সিশাসের মূর্ত্তিও এই হিসাবে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

ললিতকলায় কেবল তাহাই সুন্দর, যাহার মধ্যে স্বভাব আছে।

সুশ্রী বা কুশ্রী—প্রকৃতির সকল বিষয়েরই সারসত্য হইতেছে, স্বভাব। এই স্বভাবে, ভিতরের সত্য বাহিরের সত্যের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। বাহিরে, মুখের আকারে মানুষের ভাব-ভঙ্গী-কার্য্যে, আকাশের রঙ্গে, চক্রবালের রেখার টানে ভিতরের এই আত্মা, বোধ বা ভাব ফুটিয়া ওঠে।

শক্তিমান শিল্পী, প্রকৃতির সর্ব্বত্রই স্বভাবকে দেখিতে পান; তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্য সকল পদার্থেরই গুপ্ত অর্থ ধরিতে পারে। এবং সুন্দর বলিয়া কথিত জিনিষে যতটুকু স্বভাব প্রকাশিত হয়, যাহাকে আমরা কুৎসিত বলিয়া ভাবি, শিল্পীর শক্তিতে তাহাতে তার-চেয়ে ঢের-বেশী স্বভাব ফুটিয়া ওঠে। কারণ, রুগ্নের সঙ্কুচিত আকারে, পাপীর মুখের রেখায় রেখায়, বিকৃত দেহের মধ্যে, অধঃপতনের মধ্যে ছায়ার পাশে আলোর মত স্বভাবকে যতটা উজ্জ্বল দেখায়, স্বাস্থ্যের মধ্যে, সুনিয়মের মধ্যে ততটা দেখায় না। এই স্বভাবের গুণেই প্রকৃতিতে যাহা যত-বেশী কুশ্রী, আর্টে তাহা তত-বেশী সুশ্রী। আর্টে কুশ্রী বলি তাহাকে, যাহার মধ্যে স্বভাবের অভাব আছে—যাহাতে ভিতরের বা বাহিরের কোন সত্যই পাওয়া যায় না।

বামন

যাহা-কিছু মিথ্যা, যাহা-কিছু কৃত্রিম, যাহা-কিছু ভাবপ্রকাশ না করিয়া আপনাকে কেবলই পরিপাটি করিয়া তুলিতে চায়, যাহা খামখেয়ালী ও জমকালো, যাহা পাগলের মত হাসে, যাহা অকারণে দেমাকে ডগমগ হইয়া চলা-ফেরা করে; যাহাতে আত্মাও নাই, সত্যও নাই, যাহাতে সুধু সৌন্দর্য্য ও মোহন-শ্রীর নির্জ্জীব সমাবেশ আছে—এক কথায় যাহা-

কিছু ধ্রুবের পরিপন্থী, ললিতকলায় সে-সমস্তই অসুন্দর।

যখন কোন শিল্পী প্রকৃতির উৎকর্ষ বিধানের জন্য বসন্ত-শ্রীর উপরে গাঢ়তর সবুজ রং ঢালিয়া দেয়, সূর্য্যোদয় দৃশ্যকে আরও রক্তরাঙ্গা দেখাইবার জন্য তাহার উপরে বেশী-করিয়া গোলাপের রস নিংড়াইয়া দেয়, তরুণ ওষ্ঠাধর আল্‌তা দিয়া অধিক রঙ্গিন করিয়া তোলে, তখন সে কুৎসিতের সৃষ্টি করে—কেননা, তখন মিথ্যাকে অবলম্বন করা হয়।

যখন কোন শিল্পী যন্ত্রণার মুখভঙ্গীকে বার্দ্ধক্যের আকারহীনতাকে স্বেচ্ছায় কোমল করিয়া আনে, যখন কোন শিল্পী মূর্খ জনসাধারণের বাহবা পাইবার জন্য প্রকৃতিকে কৃত্রিম বেশে সাজায়-গুছায়, তখন সে কুৎসিতের সৃষ্টি করে—কেননা, সত্য দেখিলে সে ভয় পায়।

যাঁহারা 'কলাবিদ' নামের যোগ্য, তাঁহাদের সকলকার কাছেই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্তই সুন্দর।

শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্—অর্থাৎ কবি, চিত্রকর ও ভাস্কর,—ইঁহারা সকলেই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও, প্রিয়জনের মৃত্যুর মধ্যেও, বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাসহীনতার মধ্যেও এমন-কিছু দেখিতে পান, হৃদয়-বিদারক হইলেও যাহা তাঁহাদিগকে আনন্দদান করে। অনেক সময়ে তাঁহাদের নিজের প্রাণও দুঃখের পীড়নে ভাঙ্গিয়া পড়ে বটে, কিন্তু যখন তাঁহারা আপনাদের প্রাণের যাতনা বুঝিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে বসেন, তখন দুঃখের চেয়ে দৃঢ় এক তিক্ত সুখের প্রসাদে তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া যায়। সকল অস্তিত্বের মধ্যে তিনি নিয়তির ইঙ্গিত দেখিতে পান। প্রাণের আত্মীয় ছলনা করিলে কলাবিদ্ সে আঘাতে নুইয়া পড়েন; কিন্তু তারপরেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বিশ্বাস-ঘাতককে আপন সৃষ্টির মধ্যে স্থানদান করেন। তিনি মনে করেন, এই অকৃতজ্ঞতা হইতে তাঁহার এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল। তাঁহার ধ্যানের এই উল্লাস সময়ে-সময়ে ভীতিপ্রদ বটে—কিন্তু তাঁহার কাছে ইহা অসীম সুখ ভিন্ন আর কিছুই নহে—কারণ, এ যে অবিরত সত্যের আরাধনা!

যখন তিনি দেখেন, সর্ব্বত্রই সকলে আপনা-আপনির মধ্যে যোঝাযুঝি করিতেছে, যখন তিনি দেখেন যৌবন, জরায় পরিণত হইতেছে, ক্ষমতার ক্ষয় হইতেছে, প্রতিভার লয় ঘটিতেছে, যখন তিনি এই শোচনীয় ধ্বংসের যিনি নিয়ামক,—তাঁহার সামনে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ান, তখন তিনি আপনার জ্ঞানে আপনিই আনন্দ অনুভব করেন এবং সত্যলাভের জন্য নূতন আবেগে অভিভূত হইয়া পড়েন,—তখন তিনি সুখী!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞান

সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দিত হয় না এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। সৌন্দর্য্যের জ্ঞান স্বাভাবিক হইলেও ইহার বিজ্ঞান তেমন সহজ নহে। এই বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্যই আমাদের এই আলোচনা।

সৌন্দর্য্যের প্রকৃত বিজ্ঞান নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তির কথা আলোচনা করিতে হয়। প্রকৃতিই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত সৃষ্টিকারিণী। প্রকৃতির সৃষ্টি কখনও উদ্দেশ্যহীন বা অনিয়ন্ত্রিত নহে। প্রকৃতি যেমন সৃষ্ট পদার্থের রূপ-বিকাশের অনুরোধে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই আপনার প্রজাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্যও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'রূপ' বলিতে আমরা আকার ও সৌন্দর্য্য বুঝি; তাহা হইতেই আকার-ধারণের সঙ্গেই যে সৌন্দর্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 'রূপংরসোগন্ধ স্পর্শশব্দাশ্চ বিষয়া অমী",—এখানে রূপের অর্থ আকার —আবার 'রূপং দেহি, যশো দেহি' প্রভৃতি প্রার্থনায় রূপশব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য। অভিধানে সৌন্দর্য্যের মূল 'সুন্দর' শব্দের পর্য্যায়ে আমরা 'মনোরম', 'মনোজ্ঞ' প্রভৃতি অর্থ দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হয়, চিত্তবিনোদনও সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে, সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাদান কি? আমরা জানি, সাংখ্য-দর্শনের মতে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণেরই আশ্রয়ভূতা। এই তিনটি গুণ সহযোগেই তিনি সৃষ্টির অশেষ বৈচিত্র্য সাধন করিয়া থাকেন। সুতরাং গুণই যে সৌন্দর্য্যের উপাদানভূত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু সকল গুণই সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদানভূত হইতে পারে না। গুণবিশেষই ইহার প্রধান উপাদানভূত।

আমরা রজোগুণকেই সেই প্রধান উপাদান বলিয়া মনে করি। রজো-গুণটীর প্রধান লক্ষণই এই যে, ইহা রাগাত্মক; যথা—

> "রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
> তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।" গীতা।
> "হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে রাগাত্মক অর্থাৎ অনুরাগাত্মক এবং তৃষ্ণা (অভিলাষ) ও সঙ্গ (আসক্তি) হইতে উৎপন্ন জানিও। তাহা দেহীকে কর্ম্ম-সকলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।"

রাগ বা অনুরাগই সৌন্দর্য্যানুভবের মূল বলিয়া রাগমূলক রজোগুণই যে সৌন্দর্য্যের প্রধান অবলম্বন, তাহা বুঝা যাইতেছে।

রজোগুণ কর্ম্মপ্রবৃত্তিজনক। রজোগুণ হইতে যে রাগ বা অনুরাগের ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহা ইহার কর্ম্মপ্রবর্ত্তকতা হইতেই হইয়া থাকে। এই প্রকারে কার্য্য কারিতার সহিত অনুরাগের সম্বন্ধ হইয়াছে। যাহা আমরা অধিক কার্য্যকরী বলিয়া মনে করি, তাহাতেই আমাদের অধিক অনুরাগ হয়—তাহাতেই আমরা অধিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিস্ এই

ভাবেই উপযোগিতার (utility) সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কর্ম্মদ্বারাই সকলে জগতে উন্নতি ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রজোগুণ কর্ম্মের মূলে থাকিয়া এই সমস্তেরই মূলীভূত হইতেছে। উন্নতি ও পূর্ণতা বিকাশেরই উৎকর্ষ। সৌন্দর্য্য এই বিকাশেরই ফল। বিকাশের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা-সাধনের জন্য পদার্থ সকলের মধ্যে যতক্ষণ রজোগুণের ক্রিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণই তাহাদের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। রজোগুণের অল্পতা বা ইহার ক্রিয়ার মন্দীভূত ভাব হইলেই সৌন্দর্য্যের হ্রাস ঘটিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতে প্রত্যেক পদার্থের বর্দ্ধন-কালই যে তাহার সৌন্দর্য্য-বিকাশের কাল এবং ক্ষয়ের কালই যে সৌন্দর্য্য-হ্রাসের কাল, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই, পুষ্প পত্র প্রভৃতির যখনই সতেজ সজীব ভাব প্রকটিত হয়, তখনই তাহাদের সৌন্দর্য্য উচ্ছলিত হইতে থাকে, কিন্তু যখনই এই ভাবটী তিরোহিত হইতে থাকে—তখনই ইহারা শ্রীহীন হইতে আরম্ভ করে। সেইজন্য যৌবনকালই সৌন্দর্য্য-বিকাশের সময়। কথায়ও বলে, "যৌবনকালের কাকটাও সুন্দর।" যৌবনকাল আমাদের জীবনের বৃদ্ধির কাল, এই সময়ে আমাদের জীবনী-শক্তি ও কার্য্যশক্তি উচ্চমাত্রা প্রাপ্ত হয়। সৌন্দর্য্য তাহারই বাহ্যপ্রকাশ।

কর্ম্মের সহিত যে সৌন্দর্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার দৃষ্টান্তও আমরা নিত্য আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি-রাজ্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইয়া যেন আনন্দে হাসিতে লাগিল। এই হাসির মধ্যে কিন্তু ইহার বংশ-রক্ষারই প্রকৃত আয়োজন চলিতে থাকিল। বীজ বা ফলে সেই বংশ-রক্ষার কার্য্য যখন সম্পন্ন হইল, তখন ইহার আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই। তখন ইহা নিমীলিত ও শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িল। তখন এই পুষ্পই আনন্দের সঞ্চার ক'রত, এখন আর ইহাকে উপেক্ষায় পদদলিত করিতেও কেহ হয় ত কুণ্ঠিত হইবে না।

নব পল্লব হরিদ্বর্ণের আভায় দর্শকের নয়ন-মন হরণ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে রস ও বায়ুগ্রহণদ্বারা বৃক্ষের পুষ্টিসাধন চলিতে থাকিল। যখন ইহার পোষণ-কার্য্য শেষ হইল, তখন আর ইহার সে নধর স্নিগ্ধ ভাব নাই। ইহা বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বৃন্তে শুকাইয়া গেল এবং অবশেষে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত ও ক্রমে পদতলে মর্দ্দিত হইতে লাগিল।

এমন কি নির্জ্জীব জল-ধারাতেও কর্ম্ম-শীলতার সৌন্দর্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়। তর্ তর্ বেগে কুল্ কুল্ রবে স্রোতস্বিনী সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। বর্ষার জলরাশিতে তীর প্লাবিত করিয়া নদী যখন ছুটিয়া যায়, তখন তাহার বিশাল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যখন কোন কারণে জলপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া ইহার বেগ রহিত হয়, তখন সেই ক্ষীণ নিশ্চল জলধারা হইতে স্রোতস্বিনীর সমস্ত সৌন্দর্য্যই উবিয়া যায়। তাহাতেই সাধারণ কথায় লোকে 'মরা নদী' বলিয়া ইহার কর্ম্মহীন ও সৌন্দর্য্য-হীন জীবনেরই পরিচয় দিয়া থাকে।

যতক্ষণ রজোগুণের আধিক্য থাকে ততক্ষণই কার্য্যশীলতা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধির বিকাশ, ও তৎফলে সৌন্দর্য্যের উন্মেষ। এই রজোগুণের অপগম হইলেই তমোগুণের প্রবলতা হয়, তাহারই ফলে বিবর্ণতা ও সৌন্দর্য্যের হানি। আবরণই তমোগুণের ধর্ম্ম। এই আবরণ সমস্ত রূপেরই বিরূপতা সম্পাদন বা একেবারে তাহার বিলোপ সাধন করে। তাহাতেই তমোগুণাত্মক অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে সর্ব্বরূপই তিরোহিত হইয়া যায়। উজ্জ্বল দিবালোক যখন মেঘাচ্ছন্ন হয়, তখন আমরা উহাকে 'দুর্দ্দিন' বলিয়া থাকি। ইংরাজিতেও এইপ্রকার দিনকে foul day, foul weather বলিয়া কদর্য্য কুৎসিতভাব বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আবার উজ্জ্বল দিনকে fine day, fair weather বলিয়া সুন্দর দিনরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কৃষ্ণবর্ণকে যে সর্ব্ববর্ণেরই উপসংহারকারী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহাতেও তমঃ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বক্তব্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

আমরা সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্বন্ধে রজোগুণের কার্য্যকারিতার বিষয় আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে আমরা সৌন্দর্য্যের উপভোগ সম্বন্ধেও রজোগুণের কার্য্যকারিতার বিষয় আলোচনা করিব।

রাগ বা অনুরাগ রজোগুণেরই কার্য্য। মনে সেই রাগ বা অনুরাগের ভাব থাকিলে তবেই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপভোগ সম্ভবপর হয়। মনে বিরক্তির ভাব থাকিলে কোন বিষয়ই আমাদের প্রীতিকর হয় না। বিরক্তি, অনুরক্তি বা অনুরাগেরই বিপরীত অর্থাৎ মনে রাগাত্মক রজোভাবের আধিক্য না থাকিলে আমাদের পক্ষে সৌন্দর্য্যের আনন্দানুভব সম্ভবপর হয় না। যখন আমরা শোক দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হই, তখন আমাদের মনে যেমন কোন স্ফূর্ত্তির ভাব অনুভব করিতে পারি না, তেমনই অপর কোন পদার্থ হইতেও কোন স্ফূর্ত্তির ভাব গ্রহণ করিতে পারি না। এই রাগ বা অনুরাগ ভাবের দ্বারাই অনুরাগীর নিকট অনুরাগের পাত্র নিত্য-নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া থাকে। আবার বিরহের বিরাগদ্বারা আক্রান্ত হইলেই চন্দ্রও অগ্নির অপেক্ষা সন্তাপ-দায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমরা বহির্জগতের সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমরা অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিব। বহির্জগতের সৌন্দর্য্যের অবলম্বন যেমন রজোগুণ, সত্ত্বগুণ তেমনই অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্যের অবলম্বন। এই সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম গীতায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

> "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
> সুখসঙ্গেনবধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥"

হে অপাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্বহেতু প্রকাশক মঙ্গলময় সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসম্বন্ধ ও জ্ঞান সম্বন্ধ দ্বারা বদ্ধ করে।"

রজোগুণ যেমন 'রাগাত্মক', সত্ত্বগুণ তেমনই 'প্রকাশাত্মক'। রজোমূলক বহিঃ-সৌন্দর্য্য যেমন অনুরাগের দ্বারা উপলব্ধি হয়, সত্ত্বমূলক অন্তঃসৌন্দর্য্য তেমনই জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি হয়। বহিঃসৌন্দর্য্যের

উপভোগে যেমন মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়, অন্তঃসৌন্দর্য্যের উপভোগেও তেমনই চিত্তে সুখের উদ্রেক হয়। কর্ম্মে যেমন বহিঃসৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়, অনাময় বা মঙ্গলময় ভাবে তেমনই অন্তঃসৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়। পবিত্র উজ্জ্বলভাব, ইহাই অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন,

"Small is the worth
of beauty from the light retired."
Waller.

"আলোক-বিরহিত সৌন্দর্য্যের মূল্য অতি সামান্য।"

এই পবিত্র উজ্জ্বল ভাব হইতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের বিকাশ হয়।

'সত্ত্ব' শব্দের অর্থানুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি, কি প্রকারে অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিকাশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব-শব্দ 'সৎ' শব্দের উত্তর 'ত্ব'-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। সতের ভাব—ইহাই 'সত্ত্ব'-শব্দের অর্থ। সুতরাং সত্ত্ব-শব্দের অর্থ স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতভাব হইতেছে। সত্ত্বগুণের দ্বারা এই স্বভাবের উৎকর্ষ-সাধনেই অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। বহুস্থলে অন্তঃসৌন্দর্য্যই বহিঃসৌন্দর্য্যের উদ্বোধক হয়। "যত্রাকৃতিস্তত্র-গুণাবসন্তি।" এই বাক্যটী—অভ্যন্তর-গুণ-যোগই যে বহিঃসৌন্দর্য্য-বিকাশের কারণ—এই সত্যই ব্যতিরেকী মুখে প্রচার করিয়া থাকে। ইংরাজ-কবি লিখিয়াছেন,

"Deprived of virtue where is beauty's power?" R. Fergusson.

"সদ্‌গুণ-বিবর্জ্জিত সৌন্দর্য্যের প্রভাব কোথায়?"

এই প্রকারেই সত্ত্বগুণদ্বারা বহিঃসৌন্দর্য্য অনুপ্রাণিত হয়। বহিঃসৌন্দর্য্যে সত্ত্বগুণের এইপ্রকার আধিক্য হইলেই তাহাতে একটী সর্ব্বাভিভবকারী ভাব আবির্ভূত হয়। তাহা হইতেই সৌন্দর্য্যের গম্ভীর, সৌম্য, উগ্র প্রভৃতি ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ রোমান্ বাগ্মী সিসেরো এই সম্বন্ধে অতি সারবান্ মত প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"I am of opinion that there is nothing so beautiful but there is something still more beautiful of which this is the mere image and expression, something which can neither be perceived by the eyes, the ears, nor any of the senses, we comprehend it merely in the thought of our minds." Cicero.

"আমার মত এই যে, বস্তু যত সুন্দরই হউক না কেন তদপেক্ষাও সুন্দরতর এমন বস্তু আছে যে উহা তাহারই প্রতিমা ও অভিব্যক্তি মাত্র। এই সুন্দরতর বস্তু চক্ষু বা কর্ণ বা কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারাই গ্রাহ্য নহে। আমরা ইহা কেবল মনের চিন্তা-দ্বারাই উপলব্ধি করিয়া থাকি।"

আকাশের অনন্ত সৌম্যভাব, সমুদ্রের বিরাট্ গম্ভীরভাব, অন্ধকারময়ী চন্দ্র-নক্ষত্রাদি-খচিত বিভাবরীর উগ্রভাবে আমরা যেন কোন অসাধারণ অতীন্দ্রিয় অসীম সত্তার বিকাশ দেখিয়া ভক্তি, সম্ভ্রম, ভয় ও বিস্ময়ের ভাবে অভিভূত হই। এই সত্তা অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, সর্ব্ববিভবশালী ভগবানের সত্তা—পরম দিব্য সত্তা। অর্জ্জুনের নিকট এই সত্তারই বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা দিব্যরূপের যে আভাষ উপরে প্রদান করিলাম, গীতার বিশ্বরূপ দর্শনাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত ছত্র-গুলিতে তাহারই সমর্থন দেখা যাইবে:—

"ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রম্।
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রপতন্তি বিষ্ণো ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ ॥"
"অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বম্।
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসিসর্ব্বঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদম্।
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা।
ভয়েনচ প্রব্যথিতং মনোমে ॥"

তৎপরে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর অর্জ্জুন দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন :—

"হে বিষ্ণো! তোমার উগ্রপ্রভা সমগ্র বিশ্ব-তেজের দ্বারা আপূরিত করিয়া বিকীর্ণ হইতেছে।"

"উগ্ররূপ, আপনি কে? আমাকে বলুন। হে দেবশ্রেষ্ঠ,আপনাকে নমস্কার করিতেছি—প্রসন্ন হউন।"

"তুমি অনন্ত-শক্তি অনন্ত-পরাক্রম—তুমি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ। তুমি সর্ব্বস্বরূপ।"

"হে মহাসত্ব! তোমার এই অদ্ভুত বিরাটরূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইয়াছে।"

"এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি যেমন হৃষ্ট হইয়াছি—তেমনই আমার মন ভয়েও অতীব আক্রান্ত হইয়াছে।

ভগবান্ বলিতেছেন :—

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদম্।
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যম্।
যন্মে ত্বদন্যেন নদৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥
মাতেব্যথা মাচ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বারূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বম্
তদেবমেরূপমিদং প্রপশ্য ॥

ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুংচতত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥"

"হে অর্জ্জুন! আমি তোমার যোগবল-প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত এবং আদ্য পরমরূপ দেখাইলাম—যাহা তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই!"

"আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা যেন না হয়; বিমূঢ় ভাবও যেন না হয়। ভয়হীন ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই সেই রূপই দেখ।"

"হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার প্রতি অনন্যভক্তি দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।"

ভক্তিকেই দিব্যরূপ উপলব্ধির প্রধান উপায় বলিয়া এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ভক্তি সত্ত্বগুণেরই কার্য্য। সুতরাং সত্ত্বগুণের দ্বারা যেমন দিব্যসৌন্দর্য্যের বিকাশ—তেমনই আবার সত্ত্বগুণের দ্বারাই এই দিব্য সৌন্দর্য্যের উপভোগ। একজন ভক্ত ইংরাজ কবি বিরাট্ দিব্যসৌন্দর্য্যের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাও প্রদর্শন করিতেছি। ইহা হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সাদৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন।

"Thou art O God! the life and light
Of all this wondrous world we see,
Its glow by day, its smile by night,
Are but reflections caught from thee;
Where'er we turn, Thy glories shine,
And all things fair and bright are Thine.

* * * *

When night with wings of starry gloom,
O'ershadows all the earth and skies,

Like some dark, beauteous bird,
whose plume
Is sparkling with unnumbered eyes,
That sacred gloom, those fires divine
So grand, so countless,
Lord ! are Thine," Moore.

"হে পরমেশ্বর! এই দৃশ্যমান বিচিত্র জগতের আপনিই প্রাণ ও আলো। ইহার দিবার বিভা ও রাত্রির দ্যুতি আপনারই নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবিম্ব। যে দিকে দেখি না কেন আপনার মহিমাই দীপ্তি পায়। সমস্ত সুন্দর ও উজ্জ্বল বস্তু আপনারই ঐশ্বর্য্য।"

"যখন নিশা অসংখ্য অক্ষিরূপ চিহ্ন দ্বারা জাজ্বল্যমান পক্ষযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষের ন্যায় নক্ষত্রাদি মণ্ডিত অন্ধকাররূপ পক্ষদ্বারা সমস্ত পৃথিবী ও আকাশকে সমাচ্ছাদিত করে, তৎকালের সেই পবিত্র তমিস্রা, সেই মহিমাময় অগণ্য জ্যোতিষ্কসকল আপনারই বিভূতি!"

আমরা সৌম্য দিব্য সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অতীব প্রাঞ্জল একটি শাস্ত্রোক্তি প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহা এই—"সত্যং শিবং সুন্দরম্।" ইহার অর্থ আমরা এইরূপ বুঝি—"যাহা সত্যস্বরূপ ও শিবস্বরূপ, তাহাই সুন্দর।" এইটিকে আমরা সাধারণ সৌন্দর্য্যেরও মূল-সূত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি।

'সত্ত্বে' যেমন আমরা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের মূল উৎস দেখিতে পাই, তেমনই 'সত্যে' আমরা সর্ব্বসৌন্দর্য্যেরই মূল উৎস দেখি। 'সত্ত্বে' যেমন সতের ভাব বুঝায়, 'সত্যে'ও তেমনই সতের ভাবই বুঝায়। সত্ত্বে স্বাভাবিক গুণ বুঝায়, সত্যেও স্বাভাবিক ভাব বুঝায়। স্বাভাবিক গুণের উৎকর্ষসাধনে যেমন অন্তঃসৌন্দর্য্য উদ্ভূত হয়; স্বাভাবিক ভাবের উৎকর্ষদ্বারাও তেমনি সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়। যাহার যাহা প্রকৃত ভাব, উৎকর্ষদ্বারা তাহা প্রাপ্তিই তাহার সৌন্দর্য্য। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, "Excellence is true beauty" উৎকর্ষই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। ইহাতে আমরা সত্যে বা প্রকৃত উৎকর্ষেই যে যথার্থ সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারি। ইংরাজীতে আর একটি কথা দেখিতে পাই, "Truth is stranger than fiction"—সত্য কল্পনা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যজনক। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ন্যায় আর কোন সৌন্দর্য্যই মনোরম হইতে পারে না। ইংরাজীতে যে একটি কথা আছে,"Beauty unadorned is adorned the most"—সৌন্দর্য্যে কৃত্রিম ভূষার প্রয়োজন হয় না, তাহাই উৎকৃষ্ট ভূষিত সৌন্দর্য্য—ইহা দ্বারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিকতর মনোহর তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

সত্যই যে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত আত্মা, জগৎকবি সেক্সপীয়র তাহা এই কয় ছত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Oh, how much more doth beauty
beauteous seem,
By that sweet ornament
which truth doth give !
The rose is fair, but fairer we it deem
For that sweet odour
which doth in it live."

"অহো! সত্যের কমনীয় ভূষায় সৌন্দর্য্য কিরূপ সুন্দরতর প্রতীয়মান হয়! গোলাপ সুন্দর বটে—কিন্তু ইহাতে যে মধুর সুগন্ধ বর্ত্তমান আছে, তাহাতেই ইহাকে আমরা সুন্দরতর বলিয়া বিবেচনা করি।"

সৌন্দর্য্যের কবি কীট্‌স্ (Keats) অমর ভাষায় সত্য ও সৌন্দর্য্যের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

"Beauty is truth, truth beauty—that is all
Ye know on earth, and all ye need to
know." Ode to a Grecian Urn.

"সৌন্দর্য্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য্য—পৃথিবীতে ইহাই জানিয়া রাখ এবং ইহাই জ্ঞাতব্য।"

শিব বা মঙ্গল সৌন্দর্য্যের আর একটি লক্ষণ। "শান্তং শিবং সুন্দরম্‌" এই সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদুক্তিই তাহার প্রমাণ। মঙ্গলাত্মক হইলেই সৌন্দর্য্যের যথার্থ সার্থকতা হয়। সৌন্দর্য্যের বাচক যে 'শোভা' শব্দ আছে, তাহার মূল অর্থ বিবেচনা করিলেও আমরা এই মঙ্গলার্থই তাহাতে বিদ্যমান দেখিতে পাই। 'শোভা' কথাটি 'শুভ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'শুভ' শব্দ এই শুভ ধাতুদ্বারাই নিষ্পন্ন। সুতরাং শোভা শব্দের যে মূলে শুভ বা মঙ্গলের সহিতই যোগ, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"Handsome is he that handsome does"—সে-ই সুন্দর, যার কাজ সুন্দর; ইহাতেও আমাদের এই মতের পোষকতা দেখিতে পাই।

বর্ণের সহিত সৌন্দর্য্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে আমরা কোন্ কোন্ বর্ণ সৌন্দর্য্যের বিশেষ প্রকাশক, তাহারই আলোচনা করিব। রক্তবর্ণ যে রজোমূলক বা বহিঃসৌন্দর্য্যের প্রকাশক, তাহা 'রক্ত' ও 'রজঃ' উভয় শব্দের এক মূল বা ধাতু হইতেই প্রমাণিত হয়। রক্তবর্ণই যে বিশেষরূপে সৌন্দর্য্যের উদ্বোধক, রঞ্জধাতুজাত রঙ্গ ও তদপভ্রংশ রঙ্ শব্দ যে বর্ণমাত্রেরই বোধক হইয়াছে, তাহাতেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রঞ্জন শব্দ দ্বারা বর্ণযোগে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ভাব প্রকাশ পায়, তাহাতেও রক্তবর্ণেরই সহিত সৌন্দর্য্যের যোগ প্রতিপাদিত হয়।

সত্ত্বগুণটি নির্ম্মল ও প্রকাশক তাহা আমরা গীতার বর্ণনা হইতে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাহইতে শ্বেতবর্ণই যে সত্ত্বগুণের বিশেষরূপ দ্যোতক, তাহা বুঝিতে পারি। এই শ্বেতবর্ণের এক নাম 'শুভ্র'। শুভ্র শব্দের মূল এবং 'শুভ' ও 'শোভা' শব্দের মূল একই। ইহা হইতে শুভ্রবর্ণ যেমন সৌন্দর্য্যের প্রকাশক, তেমনই ইহা যে মঙ্গলাত্মকও, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণমূলক হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও শ্বেতবর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ ইহা যে অপর সমস্ত বর্ণেরই সংমিশ্রণ, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

হরিদ্বর্ণ প্রকৃতি রাজ্যের বর্ণ। 'হরিৎ' শব্দটি 'হৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ যাহা হরণ করে অর্থাৎ মন হরণ করে। বিশেষরূপে মনোহারী বলিয়াই 'হরিৎ' নাম হইয়াছে। এই প্রকারে শ্বেত, রক্ত ও হরিদ্বর্ণই যে বিশেষরূপে সৌন্দর্য্যের অনুকূল বর্ণ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম।

মনহরণই যে সুন্দরের প্রমাণ, তাহা সুন্দরের 'মনোহর', 'মনোরম', 'মনোজ্ঞ',

'সুমন' প্রভৃতির নামে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। A thing of beauty is a joy forever. 'সুন্দর বস্তু চির-আনন্দের উৎস' ইংরাজ কবি কীটসের (Keats) এই প্রসিদ্ধ উক্তির তাৎপর্য্যও আমরা আমাদের সুন্দরের পূর্ব্বোক্ত 'মনোহর', 'মনোরম' প্রভৃতি নামেই দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পরিচয়

এই ধরণীর পরাণের চির পরিচয়,
সে কি শুধু তার শ্যাম শোভা তৃণ পত্রচয় ?
পুষ্প ফল উৎসজল,
নদীর আনন্দ ভরা গতি অবিরল ?
সে কেবলি তার চির ধীর নভোনীলিমায়,
পাখীর কূজনে, জলধির লহরী-লীলায় ?
সে কি তার বার বার
ফিরে আসা, জাগরূক আলোক উষার ?
সে কি চন্দ্রকর সুখালসে সুষুপ্ত প্রান্তর,
গোধূলির গৈরিকে বিরাগী উদাসী অম্বর ?
ক্ষণে ক্ষণে ভূকম্পনে
বক্ষ দীর্ণ নহে তার অসহ্য বেদনে ?
সে কি উচ্ছ্বসিত দ্রবধাতু অনল ঝরায়,
অট্ট বজ্র হাসে, বিদ্যুতের বাতুল প্রভায়
বাসনারে অধিকারে
অনাহুত প্রকাশ করে না বারে বারে ?
সে কি উন্মূলিত দ্রুমে, ছিন্ন লতিকার জালে
অকস্মাৎ ধেয়ে-আসা ঝড়ে, বৈশাখের কালে,
গিরিমূলে, নদীকূলে
বন্যার অন্যায় মাঝে দেখায় না খুলে
গোপন মনের করাল কালিকা ভয়ঙ্করী
দীর্ঘ দাহে ওঠে যবে প্রাণ অসংযমে ভরি !

হায় মানবের জীবনের চির পরিচয়,
সে কি হবে এই বাহিরের ব্যর্থতা নিচয় ?
ম্লান করা, অশ্রু ঝরা
প্রতি দিবসের এই দুখের পসরা ?
এই ব্যর্থ শ্রম, ছিন্ন আশা, দীন অপারগ
কর্ম্মের দুর্গতি, নিরন্তর লজ্জা ভয় ভোগ,
পথে পথে, মনোরথে
ভগ্ন করি, পঙ্গু হয়ে চলা কোন মতে!
আপন আশার ধনে আপনি ভাঙ্গিয়া ফেলে,
সুদূরে কাঁদিয়া শুধু ফেরা শূন্য আঁখি মেলে !
লজ্জা ভয়ে, বুকে লয়ে
যে চেতনা আগুসার হয় মৃত্যু-জয়ে
সেকি কারো পড়িবে না চোখে, এ অমর লোকে
জীবনের কাব্য লেখা হবে উদ্ভটের শ্লোকে ?
দেহভার সুষমার
পরিচয়, সে কি মৃত কঙ্কালে তাহার
রবে না কি চিরদিন বেঁচে জনমে জনমে
প্রণয়ের মুগ্ধ প্রাণ ভরা দেখার সম্ভ্রমে ?
সুশ্যামল, সুকোমল
পাষাণ বিদীর্ণ করা অঙ্কুরের দল,
পরিচয় নহেক তাদের মৃদুতার মাঝে,
আলোকের অলৌকিক বল মনে যা বিরাজে !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বেচ্ছাচারী

৫

এ বৎসর ভীষণ বর্ষায় শিবরামপুর ও তন্নিকটস্থ বহু গ্রাম ডুবিয়া যাওয়ায় প্রজারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। জলের জন্য ধান্যাদির আবাদের ত যথেষ্টই ক্ষতি হইয়াছিল; তাহার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খাদ্যের অভাবে দলে দলে গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটায় জমিদার কালিকামোহন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের আমলাদের মধ্যেও অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া খাজনা-আদায়াদি কার্য্যের অসুবিধা ঘটাইয়াছে। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ পাইক ও দরোয়ানদের মধ্যেও অনেকে শিবরামপুরের "বিউ-রোটীর" মায়া ত্যাগ করিয়া দেশে পলাইয়াছে। কেবল তাঁহার প্রধান শরীর-রক্ষী মনবরণ সিং দুই-তিনবার উল্টান্-পাল্টান্ খাইয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। অন্তঃপুরেও অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। শৈলজা স্বয়ং দুইবার শয্যাগ্রহণ করিয়া এখন তাহার মাতার সেবা করিতেছে। কালিকাবাবু একাকী সমস্ত গ্রামের তত্ত্বাবধায়ন ও স্বীয় গৃহে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে করিতে আজ দুইদিন হইতে ক্রমাগত কুইনিন সেবন করিয়া কোন প্রকারে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় কোথা হইতে এক বেনামী পত্র আসিয়া তাঁহার কপালের চিন্তা-রেখাটিকে স্পষ্টতর করিয়া তুলিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিবচন্দ্র আসিলে তাঁহাকে সে পত্র দেখাইবামাত্র তিনি বলিলেন, "এ কোন শত্রুর কাজ। কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর উন্নতিতে যারা হিংসান্বিত, তারাই এরূপ পত্র লিখতে পারে। মনোহর বাবুর ছেলেটি কি ইতিমধ্যে কোন পত্র দেয়নি?" কালিকাবাবু বলিলেন, আজ কয়মাস হইতে তাহারও কোন পত্র পাওয়া যায় নাই। শিবচন্দ্র বলিলেন, শশিভূষণকে পত্র লিখিয়া না হয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হোক। কালিকাবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এ বিষয়ে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতেছে। তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ করাও তাঁহার মতে অন্যায়। তথাপি অভিভাবকের কর্ত্তব্যানুসারে এ বিষয়ে অনুসন্ধান না করাও অন্যায়, এই জন্যই তিনি তাঁহার এটর্ণি শ্যামসুন্দর বাবুকে পত্র দিবেন স্থির করিয়াছেন। শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নেরও তাহাই সমিচীন বলিয়া বোধ হইল।

ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবী কিন্তু বেনামী পত্রের কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "কার্ত্তিককে যারা সন্দেহ করে বা তার বিরুদ্ধে যারা কুৎসা রটায়, হোক্ না কেন তারা যত বড় মারণ-উচাটন-বশীকরণ-পটু সাধু-সন্ন্যাসী, তবু তাদের মুখ খসে যাবে।" তাঁহার এই অভিমত কোন গূঢ় উপায়ে দেওয়ান-পত্নী নিস্তারিণী দেবীর শ্রুতিগোচর হইলে তিনিও গম্ভীরভাবে বলিলেন, যদি সে পাপিষ্ঠা এই কথা

বলিয়া থাকে, তাহা হইলে শঙ্করানন্দের ক্রোধানলে শীঘ্রই যেন সে ভস্মীভূতা হয়!

কিন্তু কালিকাবাবু তাঁহার এটর্ণির নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন, তাহা মোটেই আশাপ্রদ হইল না। তিনি লিখিয়াছেন, আজকাল সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিকের পড়াশুনায় বিশেষ অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে এবং তাহারা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে সমস্ত সময়টুকুই বাহিরে কাটায়। কোথায় যায় সে সংবাদ এখনও 'টোর্ণি' মহাশয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবে শীঘ্রই সে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করিবেন, এমন আশাও দিয়াছেন।

কালিকাবাবু এ পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। সন্দেহ ক্রমশঃ বিশ্বাসে পরিণত হইতে চলিল, কারণ ইতিমধ্যে আরও একখানি বেনামী পত্রে কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দর গতিবিধির বিষয়ে সঠিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক ও সর্ব্বানন্দ বাগবাজারের কোন এক দ্বিতল গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই গৃহের সমস্ত ব্যাপারই সন্দেহ-জনক।

কালিকাবাবু আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি সেইদিনই দুইখানা পত্রে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিয়া কার্ত্তিক ও শশিভূষণের নামে তাহা পাঠাইয়া দিলেন। দুই-তিন দিনের মধ্যে উত্তর আসিল। কার্ত্তিক লিখিয়াছে—সংবাদ সমস্তই সত্য, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই; সর্ব্বানন্দ ও কার্ত্তিক কোন-এক পরোপকার-ব্রতে ব্রতী আছে। কিন্তু সে বিষয়ে কাহাকেও কোন কথা খুলিয়া বলিতে সে অনিচ্ছুক। তবে কালিকাবাবু বা পিতা যদি স্বয়ং আসিয়া এই বিষয় জানিয়া যাইতে চাহেন, তাহাতে কোন বাধা নাই। এ-বিষয়ে কোন কথা কর্ণান্তর করিবার ইচ্ছা তাহার নাই; অপরের সন্দেহভঞ্জন করিবারও প্রবৃত্তি নাই। তবে পিতৃস্থানীয় কালিকাবাবুকে এবং পিতাঠাকুর মহাশয়ের কাছে তাহার গোপনীয় কিছুই নাই।

কালিকাবাবুর উৎকণ্ঠা দূর হইল; এবং সেই কারণে তাঁহার যে জ্বরভাব দেখা গিয়াছিল, তাহারও শান্তি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন যে, ও-বিষয়ে আর তিনি কিছুই জানিতে চাহেন না। তবে পড়াশুনার পক্ষে ক্ষতিকর অত্যধিক পরোপকারের কার্য্য এখন একটু কমাইয়া অধ্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করাই তাহাদের উচিত। কারণ পরোপকারের সময় বিদ্যার্জ্জনের কালের পরে আসাই যুক্তি-সঙ্গত। বিশেষতঃ ছাত্রদের বিদ্যার্জ্জনই এক প্রকার তপস্যা।

কিন্তু কার্ত্তিককে পত্র পাঠাইয়া দেওয়ার একদিন পরেই শশিভূষণের পত্র পাইয়া কালিকাবাবু আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শশিভূষণ লিখিয়াছে, কার্ত্তিককে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মফঃস্বলের যে কোন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা না হইলে সে কিছুতেই এবার পাশ করিতে পারিবে না। যদিও তাহার বর্ত্তমান কার্য্যে নৈতিক অবনতির কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ সে যাহা করিতেছে, তাহা সকল উচ্চমনা ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য; তথাপি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাই যখন তাহার পক্ষে বিশেষ

প্রয়োজনীয়, তখন তাহাকে বর্ত্তমান পরোপকার-ব্রত হইতে নিবৃত্ত করাই আবশ্যক। তবে সর্ব্বানন্দর কথা স্বতন্ত্র। সে পিতৃ-মাতৃহীন ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহাকে যে কার্য্যে শশিভূষণ নিয়োজিত করিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বানন্দর আর্থিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতিই সম্ভবপর। অতএব তাহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহাতে একমাত্র কার্ত্তিককে সরানো যায়, সেই ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

কালিকাবাবু মহা সমস্যায় পড়িয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আবার শিবচন্দ্রের ডাক পড়িল এবং বহু জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হইল যে পরীক্ষার ফল দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে, তবে ইতিমধ্যে বড়দিনের ছুটীতে অথবা লেকচার শেষ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় কার্ত্তিক যেন শিবরামপুরে চলিয়া আসে, এই মর্ম্মে তাহাকে পত্র দেওয়া হোক।

কালিকাবাবুর মাতা ইতিমধ্যে মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, অরক্ষণীয়া কন্যা যে গৃহে এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, সে গৃহের অন্ন-জল তিনি গ্রহণ করিতে অক্ষম; অতএব শীঘ্র যদি শৈলজার বিবাহ না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে অগত্যা বাধ্য হইয়া ৺কাশীধাম যাইতে হইবে। না-হয় তিনি স্বয়ং যে-কোন উপায়ে শৈলজার বিবাহ দিয়া শিবরামপুরের জমিদার বংশের সম্মান রক্ষা করিবেন। পুত্র কালিকামোহনের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, নহিলে সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুর অনুনয়, বিনয় ও ভয়-প্রদর্শনেও সে কেন অবিচলিত রহিয়াছে? সেদিন কালিকামোহনের মাতুল-পুত্র ত স্পষ্টই বলিয়া গেল যে ইহার পর আসিয়া শৈলজাকে যদি সে অবিবাহিতা দেখে, তাহা হইলে সে আর কালিকামোহনের গৃহে জলগ্রহণ করিবে না। ইহাতেও যদি কালিকাবাবুর চেতনা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার মাতা আর অমন পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না।

কালিকাবাবু বহু প্রকারে মাতাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, সমস্তই যখন ঠিক হইয়া আছে, তখন এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি! বাগ্‌দত্তা হওয়াও যা, ব্রাহ্মণ-কন্যার পক্ষে বিবাহ হওয়াও তাই। এখন কার্ত্তিকের বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসারই কেবল অপেক্ষা! জগদম্বা দেবী কিন্তু বুঝিতে চাহিলেন না। কালিকাবাবু তখন বাধ্য হইয়া শিব-চন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, "এখন এর উপায় কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "উপায় আর কি! তাহলে এই অঘ্রাণেই বিয়ের সমস্ত ঠিক-ঠাক করুন, আর আমিও কার্ত্তিককে সমস্ত কথা বুঝিয়ে পত্র দি।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কিন্তু কার্ত্তিক যদি অমত করে? সে বলে গিয়েছে, এফ-এ পরীক্ষায় পাশ না হয়ে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। সে যে-রকম একগুঁয়ে, তাতে আমার ভয় হয়, পাছে কি করতে কি হয়!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "যদি তাই হয়, এমন কুসন্তানই সে হয়, যে, বাপ-মায়ের কথা বা আপনার মত হিতৈষীর কথা ঠেলে নিজের জেদ বজায় রাখে,

তাহলে কোন্ সাহসে তার হাতে আপনার মেয়েকে আপনি তুলে দিতে চাচ্ছেন? আমার কথা যদি সে না শোনে, তাহলে আমি তার মুখ দর্শন করব না।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “কি জানেন ন্যায়রত্ন মশায়, আপনার কার্ত্তিকটি আমায় যেন পেয়ে বসেছে! সদাই ভয় হয়, যদি তাকে না পাই! তার আশা ত্যাগ করতে হবে মনে হলে আমার সমস্তই যেন তিক্ত বোধ হয়। সেই ভয়ে আমি এতদিন পর্য্যন্ত চুপ করেই আছি। ও যখন আমার স্নেহটার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে, তখন, আমার ধারণা আছে যে ও নিজেই এসে আমাকে আত্ম-সমর্পণ করবে। আমি সেই আশায় বসে আছি।”

শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “বৈবাহিক, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি স্বয়ং কার্ত্তিককে আপনার পায়ে এনে ফেলে দেব।”

৬

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও যখন নিদ্রা আসিল না, তখন বিরক্ত হইয়া কার্ত্তিক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিন্ন শয্যায় পাঠ-রত সর্ব্বানন্দকে বলিল, “সব্বদা, আমি ছাতে চল্লুম, তোমার পড়া হয়ে গেলে ডেকো।” সর্ব্বানন্দ পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল, “আচ্ছা।” কার্ত্তিক উপরে চলিয়া গেল।

কলিকাতার অবিশ্রাম কর্ম্মকোলাহল ক্রমশ থামিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণাষ্টমীর গাঢ়-অন্ধকার আকাশ প্রকাণ্ড একটা বাটির মতই মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। কার্ত্তিক ছাদের আলিসার উপর হস্তদ্বয় রাখিয়া আপনার নিদ্রাহীন ক্লান্ত ললাট তদুপরি স্থাপিত করিল।

অন্ধকার! অন্তহীন রহস্যময় অন্ধকার! এই অন্তহীন অন্ধকার ভেদ করিয়া উহার অন্তরের লুকানো রহস্যকে জানিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? আলোক-প্রবেশে অন্ধকারের রহস্য কোথায় মিশাইয়া যায়! তাহার অন্ধকারত্ব, রহস্যময়তা বজায় রাখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? আলোক চঞ্চল, গতিশীল। অন্ধকার স্থির, অবিচল; অথচ আলোকের সমস্তই স্পষ্ট, অন্ধকারের সমস্তই অজ্ঞাত। আলোক আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া জানাইতে চাহে, অন্ধকার আপনার গোপন রহস্য লুকাইয়া রাখে। যাহা চঞ্চল, যাহা অস্থির, তাহাই হইল জ্ঞানের কারণ, তাহাই হইল প্রকাশের উপায়, আর যাহা স্থির, যাহা অচঞ্চল, তাহাই মৌন, তাহাই নির্ব্বাক্! এ কি অপরূপ রহস্য!

আলোক সূচির মত বিঁধিয়া, তরবারির ন্যায় চিরিয়া, সকল বস্তুর অণু-পরমাণুকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যাহা-কিছু অজ্ঞাত, যাহা-কিছু মৌন, তাহাকে কথা কহাইয়া, স্পষ্টতার কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আর অন্ধকার নীরবে অতি-সন্তর্পণে আপনার হৃদয়ের গোপন কথাটুকু জ্ঞানের বাহিরে লইয়া গিয়া সযত্নে রক্ষা করে। সে কাহাকেও ব্যস্ত করে না, কাহাকেও কিছু বলিতে চাহে না, অথচ আলোক চলিয়া গেলেই ধীরপদে আসিয়া সে নির্ব্বাক ধ্যানে বসিয়া যায়।

কিন্তু যদি কান পাতিয়া থাকি, তাহা

হইলে শুনিতে পাই, অন্ধকারের গোপনতম প্রদেশ হইতে একটা মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কে যেন আপনাকে জানাইতে চাহিতেছে, অথচ তাহার বাহিরে আসিবার জো নাই, যেন তাহার স্পষ্টতর স্ফুটতর হইবার উপায় নাই! কে তুমি? কি তুমি? কে তুমি আপনাকে জানাইতে চাও,—অথচ আলোর মধ্যে নয়, স্পষ্টতার মধ্যে নয়, কোলাহলের মধ্যে নয়, কেবল তোমার গভীর অতল অন্ধকারময় রহস্যের মধ্যে, তোমার সীমাহারা দিশাহারা অন্তহীনতার মধ্যে, তোমার নির্ব্বাক স্থির অবিচল শান্তির মধ্যে? তোমাকে কেমন করিয়া জানিব? আমি আলোকের জীব, স্পষ্টতার প্রাণী, তোমার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলেই যে তোমার রহস্যের অন্তরালটুকু নিষ্ঠুর হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলি! কেমন করিয়া তোমার কাছে পৌঁছিব? আমি তোমার নিকটে যাইলেই আমার সঙ্গী রহস্যহীনতা, স্পষ্টতা, আলোকপূর্ণতা তোমার রহস্যকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। হে অজ্ঞেয়, হে অন্ধকারের গোপনতা, হে অনির্ব্বচনীয়ের অপ্রকাশ, তোমায়-আমায় মিলন কেমন করিয়া সাধিত হইবে?

কার্ত্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা তুলিয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিল। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই; তথাপি তাহায় পূর্ব্বাভাস পূর্ব্বদিক-চক্রবালস্থ ভাসমান মেঘখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রের উত্থানের পথে সোপানশ্রেণী রচনা করিতেছে। হঠাৎ কার্ত্তিকের মনে হইল, যদি তাহার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে হাত দিয়া চাঁদকে ঠেলিয়া নামাইয়া দিত। তাহার কেবলি ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া বলে, আলো চাই না, অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার দাও। সব ডুবাইয়া, সব ভুলাইয়া, নেমে এস, হে অন্ধকার, হে চির-অজ্ঞাত, তুমি নেমে এস! আমার বাক্য থামাইয়া আমার সমস্ত চেষ্টাকে শান্ত করিয়া, আমার এই জন্ম-জন্মান্তের সঞ্চিত বিশালতাকে অভিব্যাপ্তিকে নিবিড় পেষণে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতন করিয়া সূক্ষ্মতম করিয়া আমায় তোমার আপন করিয়া লও। আমায় তোমার মধ্যে হারাইয়া যাইতে দাও। আমি আর কিছু চাহি না, কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য এক নিমেষের জন্য তোমার রহস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাই, তোমার অন্ধকার গোপনতার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে চাই। ভুলাও, আমায় ভুলাও।

কার্ত্তিকের বিলম্ব দেখিয়া সর্ব্বানন্দ উপরে আসিয়া বলিল, "কার্ত্তিক, তুমি দিনেও পড়বে না, রাতেও বৈ ছোঁবে না, শেষে যদি ফেল হও, তখন কি কৈফিয়ৎ দেবে?"

কার্ত্তিক আলিসার উপর মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, "একজামিন পাস করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। যা সহজেই জানতে পারা যায়, তাকে জেনে কি হবে? যাকে জানতে কেউ পারে না, যাকে সহজে কেউ ধরতে পারে না, আমি তাকেই ধরতে চাই!"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "অর্থাৎ কোন একটী স্ত্রীলোকের হৃদয়-রহস্য জানাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! আর সব মিছে! কার্ত্তিক, তুমি আমার কথা শোনো, তোমার

লেকচার শেষ হয়েছে, তুমি বাড়ী গিয়ে একজামিনের জন্য তৈরি হওগে। এ-সব পাগলামি আর কতদিন চালাবে?"

পাগলামি! কার্ত্তিক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পাগল কে নয়? তুমি পাগল, ঠাকুরদা পাগল, বাবা পাগল, কালিকাবাবু পাগল, দুনিয়া পাগল! পাগল সকলেই! কেউ-বা এই জিনিষটার জন্য পাগল, কেউ-বা ঐ জিনিষটার জন্য পাগল। পাগলা-গারদে বসে তুমি আমায় পাগল বলছ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "মিছে তর্ক করে কি হবে? কিন্তু তোমায় বারবার সাবধান করে দিচ্ছি, কার্ত্তিক, কেবল আপন খেয়ালে চলো না। এতে যে তুমি কেবল আপনারই ক্ষতি করবে, তা নয়, আরও দশজনকে জড়িয়ে নিয়ে তুমি অধঃপাতে যাবে। তোমার পতনে যদি আর কারও ক্ষতি না হত, তাহলে কোন কথা কইতুম না! কিন্তু—"

কার্ত্তিক কহিল, "থাম, একটু বুঝে বল দেখি, এই যে আর কারও কিছু-কিঞ্চিৎ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, এতেই কি তুমি এত ব্যস্ত হয়ে ওঠো নি? তোমার আর-কেউ যদি মিছিমিছি আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার জীবনটাকে দাসত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলবার চেষ্টায় না থাকতেন, তাহলে তুমি কথাটি কইতে না।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কার্ত্তিক, তুমি ত আমায় ভালবাসতে!"

কার্ত্তিক কহিল, "এখনও বাসি, যদি তুমি তার প্রমাণ চাও, বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তা প্রমাণ করতে পারি।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "প্রমাণ কর।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি আজই বাবাকে চিঠির উত্তর দিয়েছি। তিনি লিখেছিলেন: এই অগ্রাণ মাসে শৈলজার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি শৈলজাকে বিবাহ করব না, সর্ব্বদাদা প্রস্তুত আছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করুন।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তুমি খুড়োমশায়ের কথা ঠেলে এই কথা লিখেছ? কার্ত্তিক, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি, তুমিও ঠিক করে বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, এই যে কাজটা করে বসেছ, তোমার জন্মদাতা, জ্ঞানদাতা, তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুর এই যে অপমান করেছ, এ কি শুধু আমারই জন্য? ঐ দেখ, চাঁদ উঠছে,—ঐ চাঁদকে সাক্ষী করে বল যে এই কাজটি আমার জন্য করেছ, না, একটা অন্ধ রমণীর অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে স্থান পাবার জন্য? কি দেখেছ ঐ রমণীর দৃষ্টি-শক্তি-হীন চোখে, যে তার জন্য নিজেকে এতদূর অধঃপতিত করেছ? কি আছে, কি পেয়েছ সরোজের কাছে? সেও মানুষ, তার হৃদয় ত তোমারই মত বাসনা-কামনার আবাস-ভূমি। সেও তোমারই মত সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে,—তবে কি হিসেবে সে এত লোভনীয় হল?"

কার্ত্তিক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "এক দিন তোমাকেও আমি এই প্রশ্ন করেছিলুম, কিন্তু তুমি কি কোন উত্তর দিতে পেরেছিলে? এ ক্ষেত্রে আমিই বা পারব কি করে? তবু তোমায় একটা উত্তর আমি দেবো, কারণ, এই এতদিন ধরে আমি বৃথাই সরোজের

কাছে যাই নি। তার মধ্যে এমন জিনিষের আভাস আমি পেয়েছি, যার বর্ণনা সহজে করা যায় না। তবু সেটা কি, শুনবে? সেটা হচ্চে ওর অবোধ্যতা। যা সহজ, যা হাতের তেলোর মত নিতান্তই আমার কাছে স্পষ্ট এবং পরিচিত, তা আমি অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করি। যা দুষ্প্রাপ্য, যা রহস্যময়, চিরদিন আমি তাই চাই। যা পাব না, তাকেই আমি পেতে চাই! না পাই, নাই পেলুম! আর না পাওয়াই আমার দরকার, কারণ পেলে হয়তো তাকে আর আমি চাইব না। তাই যা পাব না, তাকেই পাবার ইচ্ছা করব, তাকেই মন-প্রাণ দিয়ে চাইব। এই জন্য যা সহজলভ্য, তা আমি অনায়াসে তোমার ভাগে ফেলে দিয়ে যা আয়াস-লভ্য, তার দিকে আমি ছুটে চলেছি। তোমার কি সাধ্য আমায় ফেরাবে? সরোজ যদি অন্ধ না হত, সরোজ যদি আমার জন্য হা-পিত্যেশ বসে থাকত, তাহলে ওর ত্রিসীমা আমি মাড়াতুম না। কিন্তু যেদিন প্রথম ওকে দেখলুম, সে-দিনকার প্রথম সহজ ব্যবহারে, একেবারে আমাকে তুচ্ছ করে, সামান্যের মত, অতি-যৎসামান্য একটা লোকের মত ব্যবহার দেখিয়ে ও আমায় আকৃষ্ট করেছে। বাহ্যতঃ ওর কিছুই গোপন নেই, লুকোনো কথা নেই, তাই ওকে পরম রহস্যময় বলে আমি বুঝতে পেরেছি। ওর অন্ধকার চক্ষুর অন্তরালে কি যে লুকানো আছে, ওর অতি-সরল অতি-স্পষ্ট ব্যবহারের মধ্যে একটা গভীরতম অন্ধকারের মত কি যে লুকানো আছে, তাই আমি জানতে চাই। তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ভাবে প্রতিদিনকার ভাত-ডালের মত করে আমি কিছুই পেতে চাই না। জানিনা, হয়তো তুমি আমার কথা কিছুই বুঝছ না, তবে ঠাকুরদাকে একদিন বুঝিয়ে ছিলুম। যদিও সে কেবল অবাক হয়ে আমার পানে চেয়েছিল, তবু বোধ হয়েছিল যেন, সে আমায় কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে, তাই সে দিন থেকে সরোজের কাছ থেকে আমায় দূর করে দেবার চেষ্টাও সে ছেড়ে দিয়েছে। আজ তোমায় বল্লুম, এখন তোমার যা অভিরুচি, তাই কর।"

কার্ত্তিক ফিরিয়া দূর আকাশে একটা নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বানন্দ কার্ত্তিকের স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল, "তবুও তোমায় ফিরতে হবে।"

কার্ত্তিক না ফিরিয়া বলিল, "হয়তো হবে, তাই বলে বর্ত্তমানকে ত্যাগ করতে পারিনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমার সমস্ত কথা সরোজের কাছে প্রকাশ করে বলব। তারপর—"

কার্ত্তিক কহিল, "তোমার সেটুকু কষ্টও স্বীকার করবার দরকার নেই, আমি নিজেই বলব। আমায় তুমি কি মনে কর? আমি কি—"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি মনে করি, তুমি স্বেচ্ছাচারী, পিতৃদ্রোহী, মনুষ্যনামের অযোগ্য প্রাণী! কি বলব তোমায়—"

কার্ত্তিক কহিল, "কিছু বলার প্রয়োজন নেই সব্বদা, আমি যা, তাই।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি যে, তোমায় যদি না ফেরাতে পারি, তাহলে এ জীবন ত্যাগ করব।"

সর্ব্বানন্দ নামিয়া গেল। কার্ত্তিক কিছুক্ষণ ছাদের উপর পায়চারি করিয়া শেষে নামিয়া গিয়া বলিল, "সর্ব্ব-দা তোমার রাগ কাল সকালেই দেখো থাকবে না, সব ভুলে তুমি বৈ পড়তে লেগে যাবে।"

সর্ব্বানন্দ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

৭

পরমহংস শঙ্করানন্দ আজকাল পরম দয়ালু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার দয়ায় আজ কাল অনেক পাপী-তাপী উদ্ধার লাভ করিতেছে। তাঁহার এই জীবোদ্ধার-কার্য্যের জন্য আজ-কাল প্রতি সন্ধ্যায় একটি বৈঠক বসিয়া থাকে। এবং সেই সভায় শাস্ত্রীয় বহু গূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় শিব-রামপুরের বহু নর-নারী যোগদান করায় আজ-কাল পোড়া বাঙ্গলার অন্ধকার কোণগুলি আলোক-মালায় শোভিত ও উপদেশার্থীর কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। এমন কি এ কথাও রটিয়া গিয়াছে যে কমবখৎপুরের একজন পাকা বিষয়ী লোক তাঁহার বিষয়-আশয় পুত্রকে দান করিয়া শঙ্করানন্দের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—তবে এখনও সমস্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হয় নাই বলিয়া তিনি এতাবৎকাল কাশীবাসী হইতে পারেন নাই, এবং কবে যে হইবেন, তাহারও স্থিরতা নাই।

এই সুনামের জন্য স্বামীজি কেবল মাত্র তাঁহার শিষ্যাবলীর নিকটই নহে, তাঁহার রত্নগর্ভা জগজ্জননীর অংশরূপিনী জননী নিস্তারিণী দেবীর নিকটও বিশেষভাবে ঋণী। তিনি নানা উপায়ে পুত্রের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ জগৎসমক্ষে বহু গূঢ়ার্থ-বোধক কথাবার্ত্তায় প্রচারিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই জন্য কালিকাবাবুর অতি-নিষ্ঠাবতী মাতাও ক্রমশ শঙ্করানন্দের দিকে আকৃষ্টা হইয়াছেন। এমন কি তিনিও মধ্যে মধ্যে জপমালা হস্তে লইয়া একজন দাসী বা অন্য কোন আশ্রিতাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে উপরোক্ত ভাগবত-কথা-বৈঠকে যোগদান করিতে আসিতেন।

অদ্যকার বৈঠকে স্ত্রীলোকের কিরূপ স্বামী হওয়া উচিত, বেদী হইতে সেই বিষয়েই অমৃতময়ী উপদেশাবলী বর্ষিত হইতেছিল। ব্যাসদেবের ন্যায় সন্তানের জন্য পরাশরের ন্যায় যোগীর প্রয়োজন, এই কথা কয়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা আকারে প্রচারিত হইতেছিল। যে স্বামী সংসারকে যোগবলে স্বর্গ করিয়া তুলিতে পারিবে, সমস্ত পাপকে যে সমাধি-নির্দ্ধৃত বুদ্ধিবলে পুণ্যে পরিণত করিতে পারিবে, যে সর্ব্ব দ্রব্য উপভোগ করিতে করিতে সতেজে বলিতে পারিবে, 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।' একমাত্র সেই লোকই সৎপাত্র; তাহাকে কন্যাদান করাই প্রকৃত কন্যাদান। সেই সৎপাত্রের ঔরসে যে কুলপ্রদীপের জন্ম হইবে, সেই পুত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সক্ষম। নহিলে সংসারে থাকিয়া আর উদ্ধারের কোন পন্থা নাই! নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—অয়নায় কি না, সংসারে চলিবার অর্থাৎ সংসার-ধর্ম্ম করিবার আর কোন পন্থা নাই—নাই!

জগদম্বা দেবী যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার ভক্তিতে আপ্লুত হৃদয়ের মধ্যে

কেবলি জাগিতে লাগিল, সংসার-ধর্ম্মের আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই! সৎপাত্রে কন্যা দান না করিলে সংসারের উদ্ধার নাই। কিন্তু কোথায় পাই এমন সৎপাত্র? কেন, এই শঙ্করানন্দ কি সৎপাত্র নয়? সে ত অবিবাহিত, তাহার পিতামাতাকে ধরিয়া কি এই স্বামীজীর দ্বারা শিবরামপুরের জমিদার বংশের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করা যায় না? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি!

জগদম্বা দেবীর যে চিন্তা, সেই কাজ। কিন্তু প্রভুপাদ শঙ্করানন্দ সে সংবাদ শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "মা, যদি বিবাহই করব তবে জীবোদ্ধার করব কিরূপে? আমার যদি বিবাহ করাই প্রয়োজন হত, তা হলে কোন্‌দিন তোমার কোলে মাথা রেখে আবার ঐ সংসারের মধ্যে ডুবে যেতুম। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে শৈলজার মত "শক্তিই" আমার সহধর্ম্মিণী হবার উপযুক্ত। যা হোক, আমায় চিন্তা করবার অবসর দাও, ভগবানের প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করতে পারি না। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর। তার পর যদি আমার প্রকৃত মাতা পরমা-প্রকৃতির আদেশ পাই, তা হলে বিবাহ করলেও করতে পারি।"

জগদম্বা দেবী অন্তরাল হইতে এই আশা ও নিরাশাময়ী বাণী শুনিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে শঙ্করানন্দকে লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার না হইলেও একেবারে দুরাশা নহে। তবে এখন কেবল তাঁহার পুত্রের মতের প্রয়োজন। তিনি সেই কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; এবং অন্নজল-পরিত্যাগাদি বহুবিধ সদুপায়ে পুত্রের মত আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শৈলজা তাহার পিতামহীর রকম-সকম দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। জগদম্বা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "অত হাসি কিসের?"

শৈলজা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি এই বুড়ো বয়সে না কি আবার বিয়ে করবে?"

জগদম্বা কহিলেন, "তা বর জুটলেই করি, কিন্তু আমার দিদি থাকতে ত আর আগে আমার বিয়ে হতে পারে না, তাই তোর আগে একটা জুটিয়ে দি, তার পর আমার যা হয় হবে।"

শৈলজা কহিল, "ঠাক্‌মা তোমার পায়ে পড়ি, বল না, কেন, আবার তোমার বিয়ে করবার ইচ্ছে হল? আচ্ছা, তা না হয় নাই বল্‌লে, কি করে বরের কাছে ঘোমটা দিয়ে বসবে, তাই দেখাও না! আচ্ছা, তোমার বর যদি বলে, ছোলাভাজা খেতে হবে, তা হলেই বা তুমি কি করবে?"

জগদম্বা কহিল, "আ গেল যা বেহায়া! তোর জন্যে আমি মরছি, আর তুই আমাকে গালাগাল সুরু করলি?"

শৈলজা কহিল, "গালাগাল কি রকম! তোমার আবার নতুন করে ছোলাভাজা মটরভাজা খাবার সখ হল, আর আমি তা মুখে বলতে পাব না!"

জগদম্বা কহিলেন, "দেখ্ শৈল, তোরা যতই পাগলামি কর্ না কেন, আমি কিন্তু

কিছুতেই এই অঘ্রাণ মাস পার হতে দেব না। কেন? কার্ত্তিক ছাড়া কি সংসারে সুপাত্র নেই? কার্ত্তিকের না হয়—"

শৈলজা কহিল, "ঐ নামের ঠাকুরের মত চেহারা, ঐ রকম গায়ে জোর, ঐ রকম তেজ, ঐ রকম দেব-সেনাপতি হবার মতই লোক চাই।"

জগদম্বা কহিলেন, "থাম্, থাম্, বেহায়া মেয়ে! এখনো যে তোর ওর সঙ্গে বিয়ে হয় নি লো! এর মধ্যেই এত!"

শৈলজা কহিল, "বামুনের মেয়ের বাক্‌দত্তা হওয়া যা, বিয়ে হওয়াও তাই। তোমায় যদি বলি, আবার বিয়ে করবে, তা হলে তুমি কি আর বিয়ে কর?"

জগদম্বা কহিলেন, "আমার সঙ্গে তোর তুলনা?"

শৈলজা কহিল, "কেন নয়? তুমিও মেয়ে মানুষ, আমিও তাই। তুমি যদি ঠাকুর দাদার উদ্দেশ করে এখনো বেঁচে থেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে পার, আমিই কেন পারব না?"

জগদম্বা কহিলেন, "কুলীনের মেয়ের কথা দিলেই কিছু বিয়ে হয়ে যায় না। আমার খুড়িমার ছান্‌লাতলা থেকে বিয়ে ফিরে গিয়েছিল।"

শৈলজা কহিল, "তোমার খুড়িমা! সে তো সত্যি যুগের কথা! কলিযুগে তা হয় না। তোমায় বলে রাখছি, ঠাক্‌মা, যদি তুমি মণিশঙ্করের কাছে আর কোন দিন ভাগবত শুনতে যাও, তাহলে তোমায় কাশী পাঠিয়ে দেব।"

জগদম্বা কহিলেন, "আমার মরণ হয় ত বাঁচি! এ বাড়ীর কেউ আমার কথা শুনবে না! মা গঙ্গা কবে আমায় নেবেন?"

শৈলজা কহিল, "তোমার একশো তেরো বছর পরমায়ু হোক! তুমি হরিনাম করতে করতে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ কর। আর কেন এ সব ব্যাপারে যোগ দিতে আসছ? দু' দণ্ড তুলসী তলায় বসে হরিনাম করগে যে কাজ হবে।"

জগদম্বা কহিলেন, "হায়, হায়, তিন দিনের মেয়ে! গাল টিপলে দুধ বেরোয়! সে আমায় উপদেশ দিতে এল! হায়রে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!"

শৈলজা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল; আর জগদম্বা দেবীও জপ ভুলিয়া মালা গাছটী লইয়া বারবার মাথায় ঠেকাইতে লাগিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

ব্রাহ্ম সমাজ

য়ুরোপের অব্যবহিত প্রভাব, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন-একটা আন্দোলন উত্তেজিত করিল যাহা আরও সমধিক ফলগর্ভ। রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিলেন; এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিলেন। উপনিষদের

ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন রায় নিজ অভিপ্রায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"আমার ধর্ম্মবুদ্ধি ও অকপটতার পথ অনুসরণ করিতে গিয়া, জাতাংশে ব্রাহ্মণ যে আমি,—আমাকে আত্মীয়দের অভিযোগ ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের বদ্ধমূল কুসংস্কার এবং তাঁহাদের বৈষয়িক সুবিধা বর্ত্তমান প্রণালীর স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাঁহারা যতই আমাকে তিরস্কার করুন না কেন, আমি তাহা শান্তভাবে সহ্য করিব। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এমন দিন আসিবে যখন লোকে আমার এই সামান্য চেষ্টাকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিবে অথবা হয়তো কৃতজ্ঞতার দ্বারা পুরস্কৃত করিবে। তাছাড়া, লোকে যাহাই মনে করুক না কেন, আমার একটা সান্ত্বনা থাকিবে,—তাহা হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবে না :—যিনি আমাদের অন্তরের গুপ্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহার যোগ্যতা অনুসারে, প্রকাশ্যে পুরস্কার দান করেন, তিনি অবশ্যই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।" (১)

আরও এই কথা বলিয়াছেন :—

"কুসংস্কারের বশীভূত না হইয়া, যে-কেহ এই গ্রন্থখানি এবং বেদান্তের অন্য গ্রন্থাদি পাঠ করিবেন তাঁহার এই ধ্রুববিশ্বাস হইবে যে, ঐ সকল গ্রন্থ মুখ্যরূপে ঈশ্বরের একত্বই প্রতিপাদন করে। কি করিয়া আধ্যাত্মিক-ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে মানুষকে তাহাই শিক্ষা দেয়। অবশ্য বেদ মূর্ত্তিপূজাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে না—উপেক্ষা করে মাত্র। যাহাদের চিত্ত অদৃশ্য ঈশ্বরের ধ্যান করিতে পারে না, তাহারা কি মূর্ত্তিপূজায় ব্যাপৃত হইবে না? কিন্তু অনেক স্থলেই বেদ মূর্ত্তিপূজা পরিহারের উপদেশ দিয়াছেন, একটা বিশুদ্ধতর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন; বেদ ইহাই প্রতিপাদন করেন যে, মূর্ত্তি-পূজার অনুষ্ঠানাদিতে কখনই মোক্ষ লাভ হয় না।" (২)

আরও কিছুকাল পরে, রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্মের কাছাকাছি অগ্রসর হইলেন। নিম্নলিখিত লেখায় তাহা অবগত হওয়া যায় :—

"ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য, দীর্ঘকাল অবিরাম চেষ্টা করিয়া তাহার পর জানিলাম,—যতগুলি ধর্ম্ম আমার জানা আছে, তন্মধ্যে খৃষ্টের ধর্ম্মমতই অধিকতর ফলগর্ভ, এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসমন্বিত জীবদিগের পক্ষে অধিকতর উপযোগী···মানুষের মতামত উন্নীত করিবার পক্ষে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সম্বন্ধে উদার ধারণা পোষণ করিবার পক্ষে, এই ধর্ম্ম ও নীতির সহজ গ্রন্থটি চমৎকার উপযোগী; ঈশ্বরের প্রতি, প্রতি-বেশীর প্রতি, আপনার প্রতি বিবিধ কর্ত্তব্য সাধনপক্ষে মানুষের আচরণকে পরিচালন করিবার উহার এতটা যোগ্যতা আছে যে, আমার আশা হয়, উহার বিস্তৃত প্রচারে অধিকতর শুভ ফল লাভ হইবে।" (৩)

---

(১) Dutt—Literature of Bengal (P. 141)

(২) Brahmanism and Hinduism (P. 481)

(৩) (Brahmanism and Hinduism)

তথাপি রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই; তিনি খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

"আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল বিভিন্ন দেবদেবীর কথা আছে—সেই বহু দেবদেবীর ধারণা, আমি বহুকাল হইতে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাই, খৃষ্টধর্ম্মের যে মতটি এই ধরণের (আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা এই মতটির একটু দোষ কাটাইলেও) আমার অন্তরাত্মা ও আমার ধর্ম্মবুদ্ধি ঐরূপ মত গ্রহণ করিতে আমাকে নিষেধ করে। বহু দেববাদের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি-প্রয়োগ হয়, ঈশ্বরের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধেও ঐ একই যুক্তি প্রয়োগ হইতে পারে। এবং ঈশ্বরের বহু-ব্যক্তিত্বের স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, বহু দেববাদের পক্ষে সেই একই যুক্তি প্রয়োগ হইতে পারে।" (৪)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন; খৃষ্টান্ ও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি হিন্দুদিগকে সমবেতভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিবার রীতি শিখাইলেন। এই সমাজমন্দির, সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তথায় "ব্রহ্ম" এই নামে এক ঈশ্বরের উপাসনা হইতে লাগিল। উপাসনার কার্য্য চারিভাগে বিভক্ত:—বৈদিক মন্ত্রপাঠ, উপনিষদ্ হইতে শ্লোকাদির ব্যাখ্যান, বক্তৃতা, ধর্ম্মসঙ্গীত। এই সমাজমন্দির কোন মূর্ত্তির দ্বারা বিভূষিত ছিল না।

কিন্তু রামমোহন রায়ের জীবনে, ধর্ম্ম-সংস্কার অপেক্ষা সমাজসংস্কারই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল:—তিনি সমস্ত জাতি বর্ণের সমতা ঘোষণা করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই হিন্দুধর্ম্মের কৌলিক পুরোহিত; তিনি নারীজাতির দুরবস্থা প্রশমনের চেষ্টা করিলেন, এবং বিশেষত সতীদাহ-প্রথা নিবারণ-কল্পে সহায়তা করিলেন।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার মতাবলম্বীরা বিভক্ত হইয়া পড়িল। দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম) প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ঘেঁসিয়া রহিলেন; পক্ষান্তরে কেশবচন্দ্র সেন, (১৮৩৪-৮৪) উহা হইতে একেবারে তফাৎ হইয়া পড়িলেন। কেশব চন্দ্র পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ প্রকারের মত অবলম্বন করেন।

প্রথমে, উদার-মতাবলম্বী প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টসম্প্রদায়ের মতানুযায়ী, একটা অস্পষ্ট (deism) একেশ্বরবাদ:—ঈশ্বর জগতের আদি কারণ, আত্মার অমরত্ব, অবতার-বাদের প্রত্যাখ্যান। ঈশ্বর-প্রেরিত কেবল দুইটি গ্রন্থ আছে;—বিশ্বপ্রকৃতি, ও মানবাত্মা।

তাহার পর কেশব, ভারতীয় যোগ-রহস্যবাদে ফিরিয়া আসিয়া, ১৮৭৮ অব্দে তাঁহার সমাজের (১৮৬৬ অব্দে প্রতিষ্ঠিত) সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে "নিত্য-স্ত্রী-তত্ত্বের"

(৪) Brahmanism and Hinduism.

যোগ্যতর রূপ—ভারতের "ভগবতী মাতা," —সেই "মাতার" আরাধনা তাঁহার সমাজে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ১৮৭৯ অব্দে, তাঁহার কোন প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় তিনি Renan-ব্যাখ্যাত যিশুখৃষ্টের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন। "কোন-এক উচ্চতর শক্তি তোমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, জয় করিয়াছে। সে শক্তিটি কি? আমি কি তাহার উল্লেখ করিব? সে শক্তি—স্বয়ং খৃষ্ট। ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে, একটা বিপুল নৈতিক শক্তি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে কোন্ শক্তি? প্রবক্তা খৃষ্টের যে-জীবন, যে-চরিত্র এই বিশাল সাম্রাজ্যকে জয় করিয়াছে, ও রক্ষা করিতেছে,—ইহা সেই শক্তি। ভারতরূপ রাজমুকুটের অধিকারী কেবল একজন হইতে পারেন—তিনি যিশু যিশু যিশু।"

অবশেষে ১৮৮১ অব্দে, কেশব নব-বিধানের সমাজ স্থাপন করিলেন। এই নববিধানের মতগুলি অনেকটা থিয়সফিষ্টদের মতাদি স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রকৃত দেশীয় ধরণে সম্পন্ন হয় এবং এই সর্ব্বপ্রথম একজন বাঙ্গালী সমস্ত ভারতকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিল।

যদিও রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের সংখ্যা কখনই বেশী ছিল না, কিন্তু তিনটি দৃষ্টি-ভূমি হইতে তাঁহাদের সংস্কার-কার্য্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্যতা লাভ করে। ইংরাজি স্কুলে শিক্ষিত হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সমাজ-সম্বন্ধীয় মতামতের উপর এই সকল সংস্কার পরোক্ষভাবে একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিবার যে চেষ্টা উহা, ঐ সকল চেষ্টারই একটা বাহ্য লক্ষণ মাত্র; ফলতঃ হিন্দু-ধর্ম্মঘটিত ক্রমবিকাশের একটা মুখ্য কাল উহার দ্বারা পরিচিহ্নিত হয়। বিশ্বব্রহ্মবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুর মন একেশ্বর-বাদী হইয়া উঠিল; কিন্তু ব্যবহারে, এখনো পৌত্তলিক অনুষ্ঠানই সমধিক প্রচলিত।

রামমোহন রায়ের ন্যায় ঐকান্তিক সংস্কারকেরাও জনসাধারণের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নমনীয় প্রকৃতির লোকদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন; এবং এইরূপ অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ সকল লোক হীন কুসংস্কারাদি পরিত্যাগ করিতে এবং অতীত মূর্ত্তি-পূজাকে রূপকে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে।

এই একটা জায়গা যেখানে, য়ুরোপের প্রভাব, ও হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক বিকাশ —এই উভয়ের কার-কতটা অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে পরিচিহ্নিত করা বড়ই কঠিন। কেননা, চিরকাল শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরা, পৌরাণিক কথাগুলিকে রূপক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন; এবং সাত শত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ, হিন্দুধর্ম্মকে একেশ্বর-বাদের দিকেই লইয়া যাইতেছে। (৫)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(৫) আধুনিক একেশ্বরবাদীদিগের আদিম সম্প্রদায়গুলি:—রামচরণকর্ত্তৃক স্থাপিত (১৭১৯-৯৪) "রামসনেহি" সম্প্রদায়; ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রথম-তৃতীয়াংশে রামবল্লভকর্ত্তৃক স্থাপিত "রামবল্লভী" সম্প্রদায়।

কাব্য সৌন্দর্য্যে শীল ও শ্লীলতা

দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, পদার্থের সম্বন্ধে এইটি গোড়ার কথা। যে উপাদানে ও যে কৌশলে মনুষ্যের চক্ষু-যন্ত্র রচিত, তাহাতে কোন বর্ণ বা চক্ষুর তৃপ্তিদায়ক, এবং কোনটি বা তাহার পক্ষে যন্ত্রণা-উৎপাদক। যেমন সকল শব্দই সঙ্গীত নহে, সকল গন্ধই সুবাস নহে, সকল রসই মধুর নহে, এবং সকল স্পর্শই কমনীয় নহে, তেমনি

রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাধানগরে (হুগলী জেলা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্ষুদ্র এক জমিদারের পুত্র। তিনি ফার্সি, আর্বি, সংস্কৃত, ইংরাজি শিক্ষা করেন, ভারত ও তিব্বতে ভ্রমণ করেন। ১৮০০ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করেন। উপনিষদের উপদিষ্ট এক ও অদৃশ্য ঈশ্বরের আরাধনার জন্য ১৮১৪ অব্দে "আত্মীয় সভা" এবং ১৮৩৩ অব্দে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৩৩ অব্দে বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৮৩৩, ২৭ সেপ্টেম্বরে ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৮ অব্দে কোন ধনাঢ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৩ অব্দে, রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে অবনতিগ্রস্ত ব্রাহ্ম-সমাজকে পুনর্গঠিত করেন; অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গলা মাসিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির করেন (১৮৪৩ অব্দে সভ্যের সংখ্যা ৮৩ ছিল, ১৮৪৭ অব্দে ৫৭৩ জন সভ্য হয়)।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৫ অব্দে "কলুটোলা ইভ্‌নিং স্কুল" এবং ১৮৫৭ অব্দে Good-will Fraternity স্থাপন করেন। ১৮৫৭ অব্দে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন, ১৮৫৯ অব্দে "ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়" স্থাপন করেন; ১৮৬২ অব্দে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদ গ্রহণ করেন।

১৮৬২ অব্দে, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। তখন হইতে "আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের" পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন। "আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ" শীঘ্রই অবনতিগ্রস্ত হইল। দ্বিতীয়—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"। যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে পরামর্শ-সভা (১৮৬৬)। পাশ্চাত্যাভিমুখে মুখ ফিরাইলেন। কেশবকে গুরু বলিয়া ও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশিত (১৮৬৮)। ইংলণ্ড-যাত্রা (১৭৭০)।

১৮৭৯ অব্দে কেশব কুচবেহারের মহারাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ-অনুষ্ঠান হইল। ইহা হইতেই ভারতর্ষীয় সমাজের মধ্যে একটা পার্থক্য উপস্থিত হইল।

একপক্ষে—কেশবের "নববিধান" সমাজ। কেশবের মৃত্যু (১৮৮৪)। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার পদের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সমাজের অবনতি হইল।

অন্যপক্ষে—প্রতিবাদকারী সমাজ (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ), ২৯টা প্রাদেশিক সমাজের সম্মতিক্রমে এবং ৪২৫ ব্রাহ্মের ঘোষণা-ক্রমে ১৮৭৮, ১৫ মে তারিখে স্থাপিত হইল। ১৮৯১ অব্দে সভ্য সংখ্যা—১৬৯১; তন্মধ্যে ১৫৩৯ জন বাঙ্গালী। ঐ একই আদম-সুমারে দেখা যায়, সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-সংখ্যা—৩০৫১; তন্মধ্যে ২০৫৬ জন বাঙ্গালী।

দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৭ অব্দে লাহোরে আর্য্যসমাজ স্থাপন করেন। ৩০ অক্টোবর ১৮৮৩ অব্দে আজমীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ অব্দে আদম-সুমার:—৩৯,৯৫২জন আর্য্য; তন্মধ্যে ২২০৫৩ জন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এবং ১৫,৫৯৯ পাঞ্জাবের। আর্য্যেরা বেদের উপর নির্ভর করে, কিন্তু স্বপ্রদত্ত আধুনিক অর্থে উহারা বেদের ব্যাখ্যা করে।

এ জগতের সকল দৃশ্যই রূপ নহে। উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণে, বা প্রদীপ্ত রক্তবর্ণে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; কিন্তু হরিৎ ও নীলবর্ণ চক্ষুর স্নিগ্ধতা বিধান করে। এই জন্যই শ্যামল-পত্র-শোভিত উদ্ভিদ্-জগৎ সুন্দর, নীলিমাময় আকাশ সুন্দর, সমুদ্রে নীলাম্বুরাশি সুন্দর। কিন্তু যত সুন্দর বা স্নিগ্ধতা পূর্ণ হইলেও, নিরবচ্ছিন্ন একই রূপ মানসিক জড়তা, অতৃপ্তি ও বিরক্তি বিধান করে। একঘেয়ে হইলে কিছুই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। এইজন্য সৌন্দর্য্যের আর একটি উপাদান বিচিত্রতা। পঞ্চমের সুর মিষ্ট বটে, কিন্তু আগাগোড়া একই পঞ্চম তৃপ্তিদায়ক নহে। নরম বিছানায় শুইয়া সুখ আছে বটে, কিন্তু অবিরত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, কঠোরতা অপেক্ষাও কঠোর। অতিরিক্ত মিষ্টরসের পর একটু চাট্‌নির প্রয়োজন হয়। তাই রূপ গোস্বামীঠাকুর হংসদূতে, গ্রাম্য-রমণী-প্রেম-বিস্মিত, পুরবধূ-বিভ্রম-মুগ্ধ, সুধাপূর্ণ-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একটুখানি তক্র বা ঘোলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "বড় বড় রাঙ্গা শিমূলের ফুল, গাছ আলো করিয়া থাকে", কিন্তু গাছটি না কি একেবারে নেড়া, তাই শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন যে "ফুলগুলি পাতা ঢাকা হইলে ভাল হইত, কারণ পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সে সুন্দর।" এইজন্য বিবিধবর্ণ সমাবেশে সৌন্দর্য্য বিহিত হয়।

বহিরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে, যখন কোন দৃশ্য বা শব্দ, মানসিক ভাবেরও তৃপ্তিসাধন করে, তখন তাহা অধিকতর সুন্দর বা মনোহর হইয়া উঠে। প্রথমে শব্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি। সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগিণী বা সুর, মানসিক হর্ষ-বিষাদের মূর্ত্ত প্রতিকৃতিমাত্র। বালকের হর্ষ হইলে, সে তালি দিয়া চীৎকার করিয়া আনন্দ-প্রকাশ করে; শোকের সময় প্রবীণও করুণস্বরে বিলাপ করিয়া মানসিক যাতনা প্রকাশ করে। সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর এই সকল বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। যখন কোন সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তি রাগিণী আলাপ করিতে থাকেন, তখন অর্থযুক্ত কোন পদ ব্যবহার করেন না; তবু সেই সুরটুকুর মাধুরীতে আমরা বিমুগ্ধ হই। এস্থলে কেবল কর্ণের পরিতৃপ্তিই, আমাদের মোহের কারণ নয়। সেই সুরের পরদায় পরদায়, কত যে সুখ-দুঃখের স্মৃতি আধ আধ জাগিয়া উঠে; কত যে হারাণ প্রেমের মাধুরী পুনরুদ্দীপ্ত হয়; কত যে কি, যাহা চাহিয়া পাই নাই—আজিও চাহিতেছি, তাহারই হর্ষ-বিষাদময় আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কত যে অতীত, কত যে ভবিষ্যৎ অজ্ঞাতে প্রাণের রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিয়া যায়; তাহা বুঝিয়াও বুঝি না বলিয়া সঙ্গীত এত মধুর। গানের সুরে এই চমৎকার যাদুটুকু, কবি কালিদাস, অতি সুকৌশলে শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্কে বুঝাইয়াছেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন হংসপদিকার গানের সুরে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছেন,—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যত সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

আবার দেখ, সকলেই সুকণ্ঠ নহে; অথচ স্নেহ প্রীতি ভালবাসা বা ভক্তিপ্রসূত আদর-সম্ভাষণাদির কথাগুলি কত মিষ্ট! জগতের সমগ্র বাদ্যযন্ত্রের মিলিত সুস্বর একদিকে, আর অতি কর্কশ কণ্ঠ হইলেও, পিতা-মাতার আদরের একটি ডাক, বা পুত্র কন্যার অনুরাগের একটি কথা, বা বন্ধুর একটু সম্ভাষণ, বা প্রণয়িনীর একটু-খানি মমতাময় কথা, আর এক দিকে। এ সকল স্থলেই শব্দের পশ্চাতে একটা ভাবের ছায়া আছে বলিয়াই, শব্দে এত মোহ।

শব্দ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, রূপসম্বন্ধেও তাহাই। চক্ষুর তৃপ্তির কথা ভুলিয়া গিয়া, ভাবের তৃপ্তিতেই আমরা কত পদার্থ সুন্দর দেখি। হরিৎবর্ণ চক্ষুর আনন্দ বিধান করে বলিয়া বৃক্ষাদি সুন্দর। তাহা ছাড়া আবার যখন একটি সজীব, সতেজ বৃক্ষ দেখি, তখন তাহার দৃশ্যে স্বাস্থ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাই। সুস্থতা আমাদের পরম প্রার্থনীয়, তাই সেই স্বাস্থ্যের ছবি দেখিয়াই আনন্দ হয়। এই জন্য কোমলতা ও সুস্থতা-ব্যঞ্জক বালকের সুপুষ্ট দেহ, রমণীর যৌবনশ্রী, আমাদের চক্ষে এত সুন্দর। অবশ্য এই শেষ দৃষ্টান্তের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের মূলীভূত আরও কতকগুলি কারণ আছে, যাহা এখানে উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু যে দিক্ দিয়াই দেখ, দেখিবে, সৌন্দর্য্যের মূলে, কতকগুলি স্বীয় মানসিক ভাবের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। গল্পে আছে, যে একজন রাজা, তাঁহার সভাস্থ সকলকে পৃথিবীর মধ্যে পরম সুন্দর যাহা, তাহাই আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সভাসদ্-গণের মধ্যে কেহবা ফুল, কেহবা চিত্রিত পক্ষী, কেহবা অন্য কিছু লইয়া, রাজার সমক্ষে আসিলেন। রাজসভার কোণে এক পেঁচা বাসা করিয়াছিল, রাজার আদেশ শুনিয়া পেঁচাটি আপনার কদাকার ছানাগুলি আনিয়া দেখাইল। বাস্তবিক সেই পেঁচার চক্ষে তাহার ঘনীভূত স্নেহ-মমতার ছবিস্বরূপ, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকগুলি অপেক্ষা অধিক-তর সুন্দর পদার্থ আর কিছুই ছিল না প্রবাসী কবি, প্রকৃতির কাম্যকাননে বাস করিয়াও তাঁহার ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহের কথা মনে করিয়া লিখিয়াছেন,—

প্রিয়স্মৃতিবিজড়িত, কাঁটাবনে, মুগ্ধচিত,
তাই ভাল লাগে ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গণ;
শোভাহীন হেরি এই বন্য-উপবন।

মানুষের মুখ-চোখ দিয়া, সারল্য, প্রফুল্লতা, অনুরাগ প্রভৃতি ফুটিয়া পড়িলেই মুখশ্রী সুন্দর হয়। আর যদি চক্ষুর দৃষ্টি ঘৃণার বাণ বর্ষণ করে; অধর আত্মাভিমানে কুঞ্চিত থাকে; তবে সেই চক্ষু ও অধর, চিত্রকরের আদর্শবস্তু হইলেও রমণীয় হয় না।

তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর গড়ন, সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইল কেন? ইহার বিচার করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয়। সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নীচশ্রেণীর জন্তুদিগের ক্রম-বিকাশে মনুষ্যের জন্ম। মনুষ্য যতটা

পরিমাণে পশুদিগের অপেক্ষা ভিন্নরূপ হইয়া উঠিতে পারেন, এবং যতটা পরিমাণে সেই বিভিন্নতায়, তাঁহার মস্তিষ্কের ব্যাবৃতি ও স্নায়ুচক্রের জটিলতা বাড়িয়া উঠে, ততই তিনি উন্নতি লাভ করিতেছেন, বলা যায়। এই কারণে অতি পূর্ব্বকাল হইতে, আমাদিগের প্রতি অস্থিমজ্জায়, এই সংস্কার-টুকু সংজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, পশুপ্রকৃতি এবং পশু-আকৃতি হইতে, মনুষ্য প্রকৃতি ও আকৃতি, যত বিভিন্ন ভাব অবলম্বন করে, ততই ভাল। কেবল মুখ দিয়া, একটি পশুকে কত কার্য্যই না করিতে হয়। ঘাস-পাতা হউক, মাংস হউক, যাহা কিছু আহার্য্য, তাহারা তাহা সমুদায়ই, মুখের সাহায্যে সংগ্রহ করে, আহারোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করে, এবং পরে আহার করে। এই সকল কারণে তাহাদের হাঁ খুব বড় হয়। এবং হাঁ বড় বড় হইতে হইলেই হনু দীর্ঘ হয়; এবং মুখের মাংসপেশীতে ক্রমাগত টান লাগিয়া, নাক খাঁদা হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মানুষকে এতটা অধিক পরিমাণে মুখ খাটাইতে হয় না বলিয়া, হনু খর্ব্ব হয়, নাসিকা উন্নত হয়, হাঁ ছোট হয়। কাজেই আমাদিগের স্বাভাবিক সংস্কারের ফলে, আমরা শেষোক্ত প্রকারের গড়নকেই সুন্দর গড়ন বলিয়া মনে করি। মুখের সম্বন্ধে যাহা কিঞ্চিন্মাত্র বলা গেল, সমগ্র শরীরাবয়বের সম্বন্ধে তাহা যে সম্পূর্ণ খাটে, তাহা দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আয়ত্তাধীন নহে। যাহা হউক, দেখা গেল যে, বাহ্যিক সৌন্দর্য্যও ভাবযোগজনিত।

মানুষ মাত্রেরই চোখ, কান প্রভৃতি যে উপাদানে ও যে ভাবে রচিত তাহাতে জড়-সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে মানুষে মানুষে বিশেষ পার্থক্য ঘটে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের মানসিক ভাব, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও শিক্ষায় বিকশিত হয় বলিয়া, প্রত্যেকেরই মানস-সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে বিভিন্নতা জন্মে। যাহার মন যেমন, যাহার আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা যেমন, তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিও তদনুরূপ। যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, সে রমণীর ইন্দ্রিয়-লালসাসূচক হাবভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়। এবং তাহার চক্ষে সরলতা ও পবিত্রতার স্ফূর্ত্তি, সতীত্ব ও সংযমের ছবি, নীরস ও বিরক্তি-উৎপাদক।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার ফলেই কবিদের সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে প্রভেদ দেখিতে পাই। যে সময়ে এ দেশের বড় অধঃপতন হইয়াছিল, যখন অনায়াসেই মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া প্রভুতা বিস্তার করিতে পারিয়াছিল, সে যুগের সাহিত্যে* যাহা সুন্দর বলিয়া চিত্রিত, এখন তাহা কুৎসিত বলিয়া উপেক্ষিত। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তের সংস্কৃত সাহিত্যে রমণীর আত্মা বা প্রাণের চিত্র নাই, কেবল সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইবার মত শরীরের বর্ণনা আছে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ দময়ন্তীকে "মান্মথ রথ" রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তর্জগৎ কবির হৃদয়-দর্পণে যেরূপ প্রতিফলিত হয়, সেইরূপই অঙ্কিত হইয়া থাকে। আমরা আমাদের আদর্শ বা দর্পণকে কিরূপ শিক্ষায় মাজিয়াছি, তাহা আমাদের কাব্য

দেখিয়াই ধরিতে পারা যাইবে। নিজের অবস্থার ফলে কবি যে সৌন্দর্য্যকে মনোহর মনে করেন, এবং কাব্যের উপযোগী মনে করেন তাহা অনেক পাঠকের নিকট উপেক্ষিত হইতে পারে; এমন কি কোন কোন যুগের সামাজিক বিশিষ্টতায়, কবির সৃষ্টি একেবারেই ঘৃণ্য বলিয়া নির্ব্বাসিত হইতে পারে।

প্রাচীন কালের কবিতার এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যে এক সময়ে যাহা বড়ই আদৃত হইয়াছিল, তাহা এখন উপেক্ষিত হইতেছে; এক সময়ে যাহা উপেক্ষার সামগ্রী ছিল, এখন তাহা আদরের সামগ্রী হইয়াছে। এ অবস্থা দেখিয়া, হয়ত কেহ বা বলিতে পারেন, যে কাব্য-সৌন্দর্য্যের যখন কোন বাঁধা আদর্শ পাওয়া যাইতেছে না, তখন যে কবির চক্ষে যাহা সুন্দর, তিনি তাহাই করুন, এবং যাহার যাহা ভাল লাগে সে তাহাই পড়ুক। অর্থাৎ 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' এই কথাটির দোহাই দিয়া সকল শ্রেণীর কাব্যই সমান অধিকারে বাঁচিয়া থাকুক। এই কথাটি ঠিক নহে। কাব্যে এমন সৌন্দর্য্য চিত্রিত হইতে পারে, যাহা কালের কোন পরিবর্ত্তনেই মলিন হইতে পারে না। কোন্ শ্রেণীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকল সময়েই মনোহর হইতে পারে অর্থাৎ কাব্যে কি গুণ থাকিলে উহা সর্ব্বজনীয় ও সর্ব্বজনীন হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতেছি।

স্বাভাবিক ভাবে যাহা আমাদের চক্ষে সুন্দর, তাহাকেও যে 'মোহন' হইতে হইলে ভাবের মোহে জড়াইয়া যাওয়া চাই তাহা বলিয়াছি। যে ভাবগুলি মোহ রচনা করিয়া জগৎকে নূতন সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে, একটি নূতন ভাব-রাজ্যের সৃষ্টি করে, সেই ভাব-গুলির মূলে একটা বড় রকমের স্থায়ী ভাব প্রতিষ্ঠিত আছে; এই মৌলিক ভাবটি আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই বলিয়াই স্বাস্থ্য চাই, আরাম চাই, তৃপ্তি চাই। যাহা আমাদের স্থিতির বিরোধী তাহা আমাদের কাম্য হয় না; যাহা কাম্য নহে তাহা হইতে মোহ বা আকর্ষণ জন্মে না। কোন মানুষই একাকী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; তাই আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা স্বার্থ এবং পরার্থপরতায় রচিত। যাহাদের শিক্ষা অল্প, যাহারা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, যাহাদের ভাবের প্রসার বাড়ে নাই, যাহারা যথার্থ স্বার্থ কি ধরিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারা অনেক সময়ে এমন সৌন্দর্য্যের অনুধ্যান করে, অথবা জীবনের তৃপ্তিকর ও কল্যাণকর মনে করিয়া এমন সকল ভাবের মোহে পড়িয়া যায়, যাহা জীবন-ক্ষয়কর, ও সমাজ-ক্ষয়কর। ইন্দ্রিয়ের চপলতা যে মানুষকে ক্ষয়ের দিকে টানে, এবং সমাজকে ধ্বংস-প্রবণ করে, ইহা পূর্ণভাবে অনুভূত হইলেই সংযমের আদর বাড়ে, এবং চপলতা ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়। পাপ-পুণ্যের শাস্ত্রীয় দোহাই না দিয়া কেবল জীবন-বিজ্ঞানের চিরস্থায়ী অটল সত্যকে অবলম্বন করিয়াই বুঝিতে পারা যায়, যে 'রভস-লালসা' যমের সহচরী মাত্র। যে কাব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মনের ঐ লালসা বাড়াইতে পারে, তাহা অতি নীচ শ্রেণীর কবিতা। যাহা

Sensual বা নীচ-ভোগাত্মিকা, তাহা প্রাকৃতিক কোমল সৌন্দর্য্যে ভূষিতা হইলে মৃত্যুদায়িনী কবিতা হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ পাঠক উহার সৌন্দর্য্যে ভুলিতে পারেন, কিন্তু যাহাদের যথার্থ দৃষ্টি আছে তাহারা দেখিতে পায়ঃ—

বিবসনা বাসনার হাসি নাই মুখে.
নয়নেতে দীপ্তি নাই তৃপ্তি নাই বুকে।
অবশা লালসা সদা অনবগুণ্ঠিতা,
বাঁধিয়া গলায় ফাঁশ ধূলায় লুণ্ঠিতা।
'মার'-পূজ্যা লজ্জাহীনা রহিয়াছে রতি,—
বিষ্ন-পঙ্কে নগ্ন-তনু কঙ্কাল মূরতি;
বীভৎস উৎসব-শব, টেনে ছিঁড়ে খায়,
গৃধিনী প্রেতিনীসম ক্ষুধার জ্বালায়।

যাহা যথার্থ সৌন্দর্য্য নয়, তাহা একসময়ে মনোহর হইলেও স্থায়ী হইতে পারে না। আপনার স্থিতির জন্য ও সমাজের স্থিতির জন্য উৎসাহ, উদ্যম ও পরিশ্রম চাই; আমাদের বিশ্রাম ও চিত্ত-বিনোদন, মনুষ্যত্ব-লাভের পরিশ্রমের সময়ে নূতন বলের জন্য প্রয়োজন। কোমল সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া কবি দেখাইয়া দেন ঃ—"শুভ্র শুভ্র যুঁই দুটি, ঐ যে রয়েছে ফুটি, সেকি তব অতি শুভ্র ভালবাসা নয়?"—তখন জীবনে সরসতা অনুভব করি। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কোমল সৌন্দর্য্যের মোহে যদি একেবারে মজিয়া যাইতে হয়, যদি কেবল সম্ভোগের সামগ্রী মনে করিয়া কোমল সৌন্দর্য্যকেই জড়াইয়া ধরিতে হয় তাহা হইলে অলস ও কর্ম্ম-বিমুখ হইয়া সুকোমল ভাব-রাজ্যেই পড়িয়া থাকিতে হয়। যাহাতে শরীরকে ক্ষয় করে, সেই নীচ আসক্তি না থাকিলেও, অমিশ্র রূপ-ভোগাত্মিকা সৃষ্টি (sensuous creation), উচ্চশ্রেণীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বা কবিতা নহে। উহা কবিতা বটে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কবিতা; কাজেই উহাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সাধারণ লোকের কাছে উচ্চশ্রেণীর কবিতা অপেক্ষা এই শ্রেণীর কবিতা সর্ব্বদাই অধিক আদরণীয়।

যাহারা বলেন, যে কবিতার জন্যই কবিতা, artএর জন্যই art সাধনা, এবং যাহা (morality) শীল (১), তাহার সহিত কবিতার কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহাদের চিন্তায় দার্শনিক জড়তা বড় অধিক। টাকার জন্যই যে টাকা নয়, তাহা আমরা অনেক কষ্টে বুঝিয়া থাকি কিন্তু পরনিরপেক্ষ হইয়া যে কিছু বাড়িতে পারে না, জীবনের প্রয়োজনে না লাগিলে যে ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য জন্মিতে পারে না তাহা দর্শন-শাস্ত্রের আশীর্ব্বাদে একেবারেই সুবোধ্য হয়

(১) Morality শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ 'শীল'। পাঠকেরা St. Petersburg Dictionaryতে এবং অন্য ভাল কোষ-গ্রন্থে, শীল শব্দের ঐ প্রাচীন অর্থ পাইবেন; আমাদের ভাষার জননী বা মাতামহী পালিতে যে ঠিক ঐ অর্থ পাওয়া যায়, Childer's Dictionaryতে এবং D. Andersenএর সুলভ Pali glossaryতে পাইবেন। ধর্ম্ম বলিলে শীল ব্যতীতও অনেক অন্যান্য কথা বুঝায়, কিন্তু 'শীল' শব্দটি কেবল Morality বুঝায়। ৭ম শতাব্দীর ভর্ত্তৃহরির রচনাতেও স্ত্রীলোকের সতীত্ব প্রভৃতি গুণের কথায় লিখিত হইয়াছে, 'শীলং পরমভূষণং'; এখানেও ঠিক ঐ অর্থ। আমাদের 'কুলশীল' কথার ঐ ভাবই ছিল, তবে আমরা তাড়াতাড়ি Moralityর অনুবাদে 'নীতি' লিখিয়া বসিয়াছিলাম।

না। এদেশের এবং বিদেশের অনেক নামজাদা বড়লোক, এই ভ্রান্তির সমর্থন করিয়া থাকেন। গভীর প্রাণের টানে কোন কাজ করিতে গেলে সে কাজে প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিবার সময় থাকে না। এই প্রকার গভীর প্রাণের টান যথার্থই ভাল কাব্য-সৃষ্টির অনুকূল। বড় কবিরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মাথা না ঘামাইয়া ভাল কবিতা লিখিলেই ভাল হয়; তাঁহারা যেন অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া মনোহর ভাষায় ভুল কথা প্রচার না করেন।

যাঁহাদের চিন্তা দার্শনিক ছাঁচে ঢালা, এইরূপ কয়েকজন নামজাদা ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে কাব্যের সহিত শীলের কোন সম্পর্ক নাই, একযুগে যাহা 'শীল' বলিয়া আদৃত, অন্য যুগে তাহা উপেক্ষিত; শীলের নামে এখন যে বিবাহ-প্রথা চলিয়াছে, উহা একটা সামাজিক কৃত্রিম কায়দা (convention); কৃত্রিম কায়দার বাঁধন ছিঁড়িয়া কাব্যকে স্বাধীন করাই কবির উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার নামে একটা ফাঁকা আওয়াজ শুনিলেই যাঁহাদের মাথা ভোঁ ভোঁ করে, তাঁহারা এ-কথায় মাতিয়া উঠিতে পারেন; কিন্তু এ উক্তিগুলি বিচারের ভর সহিতে পারে না। এ-কথা সত্য, যে প্রাচীন কালের অনেক সামাজিক কায়দা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং নূতন কায়দা গড়িয়া উঠিতেছে; একযুগে যাহার প্রয়োজন ছিল অন্য যুগে তাহা গৃহের জঞ্জালমাত্র। এই অজুহাতে একেবারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কেহ গড়িতে পারে কিনা, বিশ্বে কিছু চিরস্থায়ী আছে কি না, তাহা একটু বুঝিয়া লইতে হয়। কোন শ্রেণীর নিয়ম বা বিধি, যদি আমাদের স্থিতির মূলসূত্র হইতে অভিন্ন হয়, অর্থাৎ যদি কোন বিধি বা নিয়ম আমাদের জীবনের অঙ্গ বা আমাদের 'স্ব' বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সেই 'স্ব'-এর অধীনতাই যথার্থ স্বাধীনতা হইবে, এবং উহার প্রত্যাখ্যানে আত্মহত্যা সাধিত হইবে। জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) তথ্য হইতে বুঝিতে পারি, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় যে চপল হইয়া উঠে সে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়, এবং যাহার সংযম আছে সে-ই জীবনী-শক্তিকে বাড়াইতে পারে। জীবন এবং সমাজ রক্ষার প্রাকৃতিক গতিতেই সামাজিক কায়দা গড়িয়া উঠে এবং সংযম লাভ করিবার প্রবৃত্তিটির স্বাভাবিক গতি হইতেই অজ্ঞাতসারে বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। গাছে যেমন ফুল ফোটে, সমাজেও তেমনি নানা পদ্ধতি-অনুষ্ঠান ফুটিয়া উঠে। এক সময়ের প্রথা-পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া গিয়া নূতন প্রথা-পদ্ধতির জন্ম হয় বটে, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি না বুঝিলে, ভাঙ্গার অর্থ বুঝিতে গোল হয়। মনে করুন, সোনা দিয়াই গহনা গড়াইতে হয় ও হইবে; এ-স্থলে যদি আমাদের সোনাটুকু একসময়ে 'নথ' রূপে গড়িয়া উঠে এবং অন্য যুগে পরিবর্ত্তিতরূপে মাথার 'টায়রা' হইয়া গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে গহনার রূপে ও কায়দায় পরিবর্ত্তন ঘটে বটে কিন্তু মূল ধাতুটি পরিত্যক্ত হয় না। নিত্য নিত্য নূতন করিয়া সঙ্গিনী লাভের অধিকার থাকিলে যে প্রবৃত্তির চপলতা বাড়িয়া যায়, এবং ঐ চপলতার

ফলে যে আত্মশাসন-ক্ষমতা (inhibition) নষ্ট হইয়া মানুষকে কর্ম্মে অপটু করে, এই শারীরিক নিয়মটি কোন প্রকারের যুগের পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যে প্রাকৃতিক নিয়মের সোনা, আমাদের স্থিতি বজায় রাখিবার জন্য বিবাহরূপ অলঙ্কারে দেখা দিয়াছে উহাই যদি অন্যবিধ অলঙ্কার-রূপে গড়িয়া উঠে, তাহা হইলেই চলিতে পারে; নহিলে সোনাটুকু ফেলিয়া শূন্য আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিলে ফল হইবে না।

ধরিয়া লইলাম, যে William Morrisএর Nowhere রাজ্য আসিয়াছে, পার্লেমেণ্ট গৃহটি গোবর বেচিবার আড্ডা হইয়াছে, এবং প্রাচীন বিবাহ-প্রথা আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাতেও যে সংযমের আবশ্যকতা চলিয়া যায় নাই, প্রজাপতির মত ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইলে যে আত্মস্থিতি ও সমাজস্থিতি রক্ষিত হয় না, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। এ কালের সমাজেই হউক অথবা Nowhere রাজ্যেই হউক, যে ব্যক্তি নিজের তৃপ্তিসাধনের জন্য পরের সুখকে পায়ে দলিতে পারে, সে মানুষ কি রাক্ষস তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃত্রিম নিয়মের ফলে হউক অথবা যে কারণেই হউক, একজোড়া পুরুষ ও স্ত্রী যদি পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া এক সঙ্গে বাস করিয়া সুখে থাকে, তবে তাহাদের সেই সুখটুকু ভাঙ্গিবার প্রয়াসে কোন পক্ষেরই মনুষ্যত্ব বাড়িবে না। কোন স্বাধীনতার ধূয়াতেই নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতার পৈশাচিক মূর্ত্তিকে সুন্দর করিতে পারা যায় না।

কাব্যের সহিত শীলের সম্পর্ক নাই; আমরা কেবল নিঃস্বার্থ ভাবে সৌন্দর্য্যের অনুধ্যানই করিতেছি; এ সকল কথা কেহ কেহ মনকে চোখ ঠারিয়া বলিতে পারেন বটে, কিন্তু সে কথায় সকলে ভুলিবে না। মনকে সংযত করিলে সকলেই সুস্পষ্ট দেখিতে পারিবেন, যে সৌন্দর্য্য যেখানে শীলে অনুপ্রাণিত নহে, সেখানে তাহার দৃশ্য অতি কুৎসিত। যে শীলের মূল মনুষ্যের শরীরে প্রাকৃতিক ও চিরস্থায়ী, জীবন-বিজ্ঞানের তথ্যে যাহার মহিমার কথা জানিতে পারি, আমি সেই শীলের কথাই বলিতেছি। নবমীর লাউ, গ্রাম্যকুক্কুট ও যবনের অন্ন যেখানে সংযম, আর্জ্জব ও সত্যনিষ্ঠার সহিত মিলিয়া একসঙ্গে শীল ও ও ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে সেদিকে কাহাকেও তাকাইতে বলিতেছি না। বহুযুগ ধরিয়া আমাদের সমাজের ঘর ঝাঁটাইয়া যত জঞ্জাল সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি আমাদের এক সময়ে অতি প্রয়োজনের সামগ্রীর ধ্বংস-শেষ হইলেও, সেগুলিকে ফেলিয়া দিতে হইবে। উহার বাধায় বিশুদ্ধ বাতাস লাভ করিতে না পারিয়া সাহিত্য চিরদিনই স্বাধীনতা খুঁজিয়াছে এবং খুঁজিবে। কিন্তু জঞ্জাল ফেলিবার অভ্যাসে হাতের কাছে যাহা কিছু পাইলেই জঞ্জাল বলিয়া ফেলিয়া দিবার কু-অভ্যাস যেন না জন্মে। কোন্‌টি জঞ্জাল এবং কোন্‌টি যথার্থই শীল, তাহা কোন প্রকার শাস্ত্রের বিচারে নির্ণীত হইবে না। এখন জীবন-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াই পাপ-পুণ্য বুঝিতে হইবে এবং উহার সাহায্যেই সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্যে যাহা

যথার্থ শ্লীল তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। যে সকল কথা ব্যবহার করিলে পরোক্ষ-ভাবেও শ্লীলের সহিত বিরোধ ঘটে, অর্থাৎ অসৌন্দর্য্য সৃষ্ট কিংবা ধ্বনিত হয়, তাহাই অশ্লীল। কাব্যে এই অশ্লীলের স্থান নাই। কাব্য আমাদের জীবন ছাড়া কিছু নহে; জীবনের সকল অনুষ্ঠানই যখন শ্লীলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই সুন্দর ও জীবনপ্রদ হইতে পারে, তখন কাব্য-সৌন্দর্য্যে অটল এবং চিরস্থায়ী ভিত্তি শ্লীলের উপরই প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভারতের অন্যান্য ধর্ম্ম

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে,—হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া আরও কতকগুলি ধর্ম্ম সমুদ্ভুত হয়। আধুনিক যুগের কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্বে যে-ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপিত হয় এবং মধ্যযুগে যাহার প্রসার-প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেই জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো ১৫ লক্ষ ভক্তবৃন্দ পরিগণিত হইয়া থাকে। সচরাচর জৈনেরা হিন্দুদের সহিত বেশ সদ্ভাবেই একত্র বাস করে। উহারাও কতকগুলি জাত গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং পৌরোহিত্যের জন্য প্রায়ই উহারা ব্রাহ্মণ-দিগের শরণাপন্ন হইয়া থাকে; গুজরাটের জাতগুলি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, এবং দাক্ষিণাত্যের জাতগুলি কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। সমস্ত বড় বড় সহরে জৈনেরা প্রায়ই কুঠিওয়ালার কাজে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সন্ন্যাস-প্রবণতা জৈনদিগকে বৌদ্ধদের দারুণ শত্রুরূপে পরিণত করিয়াছিল, এখন জৈন ভক্তদের মধ্যে সেই সন্ন্যাস-প্রবণতা আদৌ লক্ষিত হয় না। কিন্তু জৈন-ভিক্ষুরা একেবারে বিবস্ত্র হইয়া একত্র আহার করিতে বসে। পাছে কোন জীবের প্রাণ-হানি হয় এই ভয়ে উহারা কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখে এবং যে ভূমি মাড়াইয়া চলিতে হইবে, সেই ভূমিটাকে ঝাড়ু দিয়া ঝাঁট্‌ দেয়। (১)

*

* *

জৈনধর্ম্মের সমসাময়িক ও তদপেক্ষা প্রবল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত

(১) জৈনেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত:—যতী ও শ্রাবক। শ্রাবকদিগের ব্যয়ে স্থাপিত মঠগৃহে যতীরা বাস করে। কিন্তু উহারা এখন আর ভিক্ষা করে না এবং উহাদের মঠের নিয়ম-ব্যবস্থা কঠোর নহে। এখন ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ও আর নাই। জৈনদের দুই দল:—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। দিগম্বর দলটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু শ্বেতবস্ত্রধারী শ্বেতাম্বরেরাই বেশী প্রভাবশালী।

হইয়াছে। উহার অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে কেবল হিমালয়ের উপত্যকাভূমিতে—বিশেষ নেপালে। কিন্তু উহার আকারটায় একটু খিচুরী পাকাইয়া গিয়াছে : উহার মধ্যে লামা-ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস একত্র মিশিয়াছে। ব্রহ্মদেশজয়ের ফলে, ভারত-সাম্রাজ্য, ৯০ লক্ষ প্রকৃত বৌদ্ধপ্রজা লাভ করিয়াছেন। বর্ম্মীরা "হীন-যান" পন্থাবলম্বী। উহাদের মধ্যে ভিক্ষু ও সাধারণ ভক্ত—দুই দলই আছে। ভিক্ষুরা, গৌতমের শিক্ষার বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিয়াছে। সাধারণ লোকে নৈসর্গিক দেবতাদিগকে আরাধনা করিয়া থাকে। কিন্তু এই নৈসর্গিক দেবতাদের সহিত উহারা কতকগুলি বিশুদ্ধতর বিশ্বাসও যোগ করিয়া দিয়াছে। কেননা, যুবকেরা কোন এক মঠে অন্তত এক বৎসর কাল শিক্ষানবীশী করিতে বাধ্য—;উহারা সেখানে সাধারণ শিক্ষাও লাভ করে, ধর্ম্ম-শিক্ষাও লাভ করে। শিক্ষাবিস্তার-পক্ষে ভিক্ষুরা বিস্তর সাহায্য করিয়াছে। পর-মত-সহিষ্ণু বৌদ্ধধর্ম্ম য়ুরোপীয় সভ্যতার বিস্তার-পথে কোন প্রতিবন্ধক স্থাপন করে না; কিন্তু সমস্ত বাসনার প্রতি, সমস্ত চেষ্টার প্রতি অবজ্ঞা-দৃষ্টি থাকায় বর্ম্মীরা কাজকর্ম্মে উদাসী ও অলস হইয়া পড়িয়াছে। (২)

*

* *

হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপ্রসূত অন্যান্য ধর্ম্মমতের সহিত, ভারত আর-দুইটি বিদেশীধর্ম্মকেও নিজবক্ষে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। মনস্তত্ত্বঘটিত মতামত ও ধর্ম্ম-নৈতিক মতামতের পুষ্টিসাধনের উপর ঐ দুই ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল : এক জোরোয়াস্তার ধর্ম্ম—আর এক ইসলাম ধর্ম্ম। একথা সত্য, জোরোয়াস্তার ধর্ম্মের ভক্ত-সংখ্যা (১৯০১ অব্দে ৯৪,১৯০) খুবই কম। ইহারা ভারতে আশ্রয়-লব্ধ পারসীক-দিগের বংশধর। জোরোয়াস্তার ধর্ম্মই ইহাদের জাতীয়ধর্ম্ম। অন্যজাতীয় লোক এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে না।

যদিও আজকাল পার্সিরা গুজরাটী ভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু উহাদের প্রার্থনা মন্ত্রাদি জেন্দভাষাতেই পঠিত হয়। পার্সি পুরোহিত-শ্রেণী দুইভাগে বিভক্ত :—এক "দস্তুর" (প্রধানাচার্য্য); আর এক, "মোবেদ" (উপাচার্য্য)। উহাদের প্রাচীন শাস্ত্রমতের বিরুদ্ধে, পুরোহিত-বৃত্তি এক্ষণে বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িয়াছে। এই কথা লইয়া গৃহস্থ-শ্রেণী ("বেহদিন") ও পুরোহিত-শ্রেণীর ("অন্দিয়ারু") মধ্যে কতবার গুরুতর বিবাদ বাধিয়াছে।

যেখানে বিধর্ম্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ সেই-সব মন্দিরে ধূপ ও চন্দন-কাঠিতে পূর্ণ একটা রজত ধূপাধারে পূণ্যাগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে : অগ্নিই "অর্মজ্‌দের" প্রতিমূর্ত্তি। বিশুদ্ধ চিন্তা, বিশুদ্ধ বাক্য, বিশুদ্ধ কর্ম্ম—এই মহৎ গুণত্রয়ের সাংকেতিক বিগ্রহস্বরূপ এই অগ্নি। (৩)

(২) ১৮৯১ অব্দে আদম-শুমারের গণনায় ব্রহ্মদেশে ১৫,৩৭১ মঠ ছিল। ব্রহ্ম-মঠের ভিক্ষুগণ "ফুঙ্গী" বলিয়া অভিহিত হয়। য়ুরোপীয়েরা সচরাচর উহাদিগকে ইতর ভাষায় "তালাফোয়া" বলে।

(৩) পার্সিদের ৩০ দিনের নাম যথা :—হর্মজ্‌দ, বামন, আর্দিবেহেস্ত, শূরভেব, অস্পুন্দাদ, খোর্দাদ,

শিক্ষিত পার্সিরা য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবের বশবর্ত্তী, অশিক্ষিত পার্সিরা হিন্দু অন্ধবিশ্বাস ও উপধর্ম্মের বশবর্ত্তী; কিন্তু সকলেই গার্হস্থ্যজীবনের প্রাচীন অনুষ্ঠানাদি বজায় রাখিয়াছে। ৭ ও ৯ বৎসরের মধ্যে পার্সি বালকের উপনয়ন-সংস্কার হয়। নগ্ন বালককে একটা প্রস্তর-আসনের উপর বসান হয়, একজন পুরোহিত তার মাথায় জল ছিটাইয়া দেয়। তাহার পর, মুক্ত আকাশের তলে, আর-একটি প্রস্তর-আসনে বসিয়া ঐ বালক দুইটি ডালিমের পাতা ভক্ষণ করে, একটা সাদা ষাঁড়ের গোমূত্র পান করে (ধার্ম্মিক পার্সিরা প্রতিদিন প্রাতে গোমূত্র দিয়া গা ধোয় এবং উহার কয়েক ফোঁটা গাত্রে শোষণ করিয়া লয়)। মন্দির-সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে, নবদীক্ষিত বালক একটি নূতন কামিজ পরিধান ও একটি যজ্ঞোপবীত কটিদেশে ধারণ করে ("সদ্‌রা" ও "কুস্তি")।

উহাদের অন্ত্যেষ্টির ক্রিয়াকলাপও কম অদ্ভুত নহে। পার্সিরা শবকে অশুদ্ধ বিবেচনা করে; পবিত্র পঞ্চভূতকে পার্সিরা শব-স্পর্শে কলুষিত না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে শবকে শকুনী গৃধিনীর কবলে সমর্পণ করে। উত্তরাভিমুখে, "ব্যাক্-বে" পরিবেষ্টিত মালাবর-গিরির উপর পাঁচটি "নিস্তব্ধতার স্তম্ভ" সমুত্থিত হইয়াছে। জমকাল দৃশ্য। ঘাটগিরি-শ্রেণীর পশ্চাদ্‌ভাগে,—উহার কঠিন পঞ্জর-অস্থিবিশিষ্ট অপূর্ব্ব বিচিত্রাকৃতি শৈল-দুর্গ-প্রাসাদগুলি—অস্তমান সূর্য্যরশ্মির কিরণে প্রথমে স্বর্ণাভ, তাহার পর গোলাপী, তাহার পর বেগ্‌নী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। আরও নিকটে দেখা যায়—"ত্রম্বে" ও "এলেফাণ্টার" পাহাড়গুলি (ততটা সহসা খাড়া হইয়া উঠে নাই) "সাল্‌সেটে"র বৃহৎ দ্বীপ, "বোম্বায়ে"র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দ্বীপ—যাহা সমুদ্রের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে। "ব্যাক্-বে-র" বিপরীত তটে, "সিয়ন", "সিউরী", মাজগাঁও বন্দরস্থ জাহাজাদির মাস্তল; "ব্যাক্-বে"-র তটে, বৃক্ষপুঞ্জের দ্বারা কতকটা প্রচ্ছন্ন বোম্বাইনগর; দ্বীপের শেষপ্রান্তে, রোমীয় ও গথিক-ধরনের কীর্ত্তিমন্দিরাদি-সমেত, ক্যাথিড্রাল-গির্জ্জা, গভর্ণমেণ্ট-প্রাসাদ, আর-একটি গির্জ্জা ও দীপ-মন্দির। নগরের এক অংশ হইতে অপরাংশে,—যেখানে ছায়া ও আলোক পরস্পরকে খণ্ডিত করিয়াছে—দুই উপসাগরের জল-আস্তরণ সমুদ্‌ভাসিত। "বাক্-বে"-র চতুর্দ্দিকে তালীবন—যাহার

অমেরদাদ, দেপাদুর, অদুর, অস্ত, খোর্শেদ, স্কর, তির, দেপ্‌মেতুর, মেহের, সেরশ, রশ্‌সে, ফুরবুর্দ্দিন. বেহরাম, রাম, গুবদ্‌, দেপ্‌দিন, দিন্‌, অশাশং, অস্তাদ, আস্‌মান, জেমিয়াদ্‌. মহরেশ্‌সন্দ, অনিরন্‌। মাসের নাম যথা:—মেহের, অবন, অদ্দর, দেহ; বেহমান, অস্পেন্দাদ্‌মদ্‌।

পার্সিদের সব-চেয়ে বড় উৎসব-পর্ব্ব—নব-বর্ষের দিন ("পপ্পটি") "শশনিদ্‌" বংশের শেষ-রাজা "ইয়েস্‌দের্জেদ্‌"-এর সময় হইতে পার্সি যুগের আরম্ভ ৩৬৫ দিনে বৎসর হয়। অন্যান্য উৎসব;. যথা:—"খের্দাদ্‌শাল'; (জোরোয়াস্তারের জন্মবাসর); "ফুরোহর্দ্দিন সসন" (মৃতদিগের সম্মানার্থ); "নওরোজ" (মহাবিষুব সংক্রান্তি) "আদব যসন" (অগ্নি-উৎসব) ইত্যাদি।

পার্সিদের দুই সম্প্রদায়:—"কুদ্‌মী" ও "শোনসোই"। "শেন্‌শোই"দের সংখ্যাই বেশী।

মধ্য হইতে উদ্যান-বাটিকা-সমূহের সাদা দাগগুলা ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। ম্যালাবার গিরির চূড়াদেশে একটি গ্রীষ্মমণ্ডল-সুলভ উদ্যান; তালজাতীয় বৃক্ষকুঞ্জ; সাইপ্রেস্‌ ঝাউ, কুসুমিত গুল্মরাজি। যে সময় অস্তমান সূর্য্যকিরণে বোম্বায়ের কীর্ত্তি-মন্দির-গুলি, অদ্ভুত-বিচিত্র-আকৃতি ঘাটগিরিশ্রেণী, প্রথমে স্বর্ণাভ পরে রক্তিমাভ হইয়া উঠে, তখন কতকগুলি সাদা মূর্ত্তি সারিবন্দী হইয়া, বৃক্ষপুঞ্জের তলদেশ-দিয়া বিসর্পিত একটা রাস্তা দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে উক্ত উদ্যানের দ্বার পার হইয়া যাইতেছে দেখা যায়। সকলেই লম্বা আচ্‌কান পরিহিত, সকলেরই মাথায় সাদা ধুচ্‌নী-টুপী। প্রথমে একটা বস্ত্রখণ্ডে ঢাকা রুটি-হস্তে একজন লোক। তাহার পর, চারি-জন বাহকযুক্ত একটি খাটিয়া। খাটিয়ার উপর নগ্ন শব-দেহ একটা চাদর দিয়া আচ্ছাদিত; উহাদের পশ্চাতে দুইজন শ্মশ্রুধারী লোক ("নস সালার"); কেবল উহারাই শব-দেহ স্পর্শ করিতে পারে। কয়েক কদম পরে পুরোহিতের দল। আরও দূরে, আত্মীয়-স্বজনেরা দুইজন দুইজন করিয়া, একটা রুমালের খুঁট ধরিয়া আছে। এই উদ্যানের মধ্যখানে আসিয়া শোক-যাত্রার দল বিভক্ত হইয়া পড়িল; পুরোহিত ও ভক্তবৃন্দ অগ্নির ("সাগ্রী") মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে লাগিল; "নস-সালারেরা" একটা স্তম্ভ-মন্দিরের নিকটে আসিল; ইহা একটি গ্রেনিট্‌-পাথরের বড় ইমারৎ। অভ্যন্তরটা একটা বৃত্তাকার রঙ্গভূমির মত; একটা কূপ; তিন-সারি মঞ্চ; মঞ্চের গায়ে কসি-রেখাশায়ী কুলঙ্গী। এই দেখ—কতকগুলি শকুনি গৃধিনী স্থূল পক্ষ-সঞ্চালনে চারিদিক হইতে উড়িয়া আসিয়া প্রাচীরের উপর বসিল। "নস-সালারেরা" নিম্নদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক শব-দেহ একটা কুলঙ্গীতে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। দুইটা, তিনটা, দশটা শকুনী প্রাচীর হইতে নামিয়া শব-দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। উহারা নিজ-অংশের মাংস-টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া, অপরের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিল। কোন-প্রকার ত্বরা নাই, যুঝাযুঝি নাই। আহারান্তে প্রত্যেকেই ধীরভাবে আসিয়া বসে; গায়ের পালকে ঠোঁট পুঁছিয়া, ন্যাড়া মাথাটা ডানায় ঢাকিয়া, বেশ আরামে নিদ্রা যায়। সোয়া ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যেই, শব-দেহের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বাকী হাড়গুলা সূর্য্যদেবের কবলে যায়। তিন সপ্তাহের মধ্যে "নস-সালার"গণ শবের দেহাবশেষ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। পুরোহিত ও আত্মীয়গণ শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া—যেখানে ধনী-দরিদ্র উভয়েই মৃত্যুর সমদৃষ্টি উপলব্ধি করে সেই শব-মন্দির হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল,—এদিকে, নীল সমুদ্রের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াও সূর্য্যদেব আরও কতকগুলা লম্বা লম্বা রশ্মিবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই রশ্মি-পাতে নগরের কাচগুলা, কুঝটিকা-বিলীন ঘাট-গিরিশ্রেণীর বিক্ষুব্ধ শৈলখণ্ডগুলা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরাতন কথা

ভারতীর সহিত আমার পরিচয়, সে ত আজিকার কথা নয়, সে যে বহুদিনের কথা—প্রায় ২৬ বৎসর।

ভারতীর অনেক পাতায় আমার হাতের ছাপ আছে—আমার হৃদয়ের অনেক ভাব সেখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ভারতী-সম্পাদিকার স্নেহ-সলিলে সিঞ্চিত হইয়া তবে সেই ভাবের মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার স্নেহঋণে আমি চিরঋণী। আজ সেই পুরানো কথার আলোচনাতেও মনে আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছে। এখন আর জীবনে সে চপলতা নাই, সে আশা, উদ্যম, উৎসাহ নাই, সবই এখন স্থির, ধীর। তবুও সেই অতীতের কথা স্মরণ করিতে এখনো প্রাণে যেন সেই উৎসাহ ফিরিয়া আসে।

ভারতী-সম্পাদিকার সহিত আমার প্রথম দেখা সেই প্রথম সখি-সমিতির শিল্প-মেলায়। তখন আমাদের বাড়িতে বিবাহের পর মেয়েদের বাহিরে যাইবার অনুমতি ছিল না। আমি বাল্যকালে বেথুনস্কুলে পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য বেথুনস্কুলে শিল্প-মেলা হইবে শুনিয়া জিদ ধরিয়া বসিলাম, আমিও যাইব। আমার তখন বিবাহ হইয়াছে, কাজেই হুকুম পাইলাম না; কত দিন ধরিয়া সাধা-সাধনা চলিতে লাগিল। আমার মায়ের কোনো আপত্তি ছিল না; তিনি শিক্ষিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে কোন কার্য্যই হইত না। শেষে মুন্নি-দার (খুল্লতাত-পুত্র সিভিলিয়ান মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত) চেষ্টায় আমরা শিল্প-মেলায় যাইতে পাইয়াছিলাম। সেজন্য উপর-ওয়ালাদের কত খোসামোদই না করিতে হইয়াছে!—কত আশা-নৈরাশ্যের তুফান বহিয়া গিয়াছে। শৈশবের সেই পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার যে কি আনন্দ হইল তাহা বলিতে পারি না। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই প্রবেশপথে মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখিলাম, তিনি সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। বেথুনে পড়িতাম বলিয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত পরিচয় ছিল;—কবি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগিনী বলিয়া আমাকে তাঁহারা সকলেই জানিতেন। সেই সময়ে আবার আমার প্রথম কবিতাটি ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। শ্রীমতী সরলা দেবী তাঁহার মায়ের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমার সেই কবিতাটির কথাও উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। এখনো বেশ মনে পড়ে, আমায় দেখিয়া সেদিন মাননীয়া ভারতী-সম্পাদিকা কিরূপ স্নেহের হাসি হাসিয়াছিলেন। সেদিন যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, ইহজীবনে ভুলিব না। সেই মায়ার খেলা নাট্য-অভিনয় এখনো যেন স্বপ্নের মত চোখে ভাসিতেছে। তখন ঠাকুর-বাড়ীর কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না। কাজেই কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করিবেন, তাহা জানিতে ভারি ব্যস্ত হইয়াছিলাম। আমার জীবনের প্রিয় বন্ধু

শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীও এই অভিনয়ের মধ্যে ছিলেন। অবশ্য তখন তাঁহাকে জানিতাম না; পরে তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। সেই মায়া-কুমারীগণের গান এখনো যেন কানে লাগিয়া আছে। শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী সকলেই অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী শান্তা ও শ্রীমতী অভিজ্ঞা দেবী প্রমদা সাজিয়া তাঁহাদের সেই সুমিষ্ট কণ্ঠের গীত-ধারায় সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। সেরূপ সুন্দর অভিনয় আর যে কখনো দেখিয়াছি, এমন মনে হয় না। এখনো যেন সেই-সব দৃশ্য বিচিত্র চিত্রপটের মত মানসপটে চিত্রিত রহিয়াছে। মায়ার খেলা নাট্য-অভিনয়ের পর আমি গৃহে ফিরিবার পথে সোপান-শ্রেণীর নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম; ভারতী-সম্পাদিকা আমায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলে, বেশ ভাল লাগিল ?"

আমি এমন আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম! তিনি আমার সহিত কথা কহিলেন! তিনি ভারতীর সম্পাদিকা, কত তাঁর নাম, কত বড় তিনি! আর আমি সামান্য বালিকা; আমার সহিত তাঁর আলাপের ইচ্ছা দেখিয়া আমি ত একেবারে অবাক! এই বিস্ময় ও তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের গর্ব্বের আনন্দ লইয়া সেদিন গৃহে ফিরিলাম।

আমাদের বাড়ীতে তখন চারিদিকে কবিতার উচ্ছ্বাস। সেই আবহাওয়ায় নব-প্রভাতের কাকলীর মত আমার হৃদয় হইতেও কবিতার অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠিয়াছে; তারই উৎসাহে জীবন তখন চঞ্চল। যিনি লেখার সাধনা করিয়াছেন তিনিই জানেন যে এই প্রথম উচ্ছ্বাস জীবনে কি-প্রকার চঞ্চলতা আনিয়া দেয়;—সে কত আশা, কত উৎসাহ! কিছু হোক আর নাই হোক, সেই আকাশ-কুসুমের স্বপ্নেই সময় কাটিয়া যায়। তখন আমাদের মেজদাদা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের স্বপ্নসঙ্গীত থামিয়া গিয়া উপন্যাস আরম্ভ হইয়াছে। মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা-সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস আমাদের বাটীতে যেমন বহিয়াছিল এমন বোধ হয় কোথাও নয়। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতা আমাকে যতবার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে বোধ হয় খুব কম লোকেই তত করিয়াছে। এই সেদিন আমার স্কুলের একটি মেয়েকে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে শিখাইতেছিলাম—"এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা দুলিতেছে আকাশ-সাগরে।" আমার এখনো সমস্ত কবিতাটি কণ্ঠস্থ দেখিয়া মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। তখন প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, রাজা ও রাণী এবং কড়ি ও কোমল আমার আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ছিল। বাল্যকালে আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল বলিয়া, যখন শৈশবে বেথুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম, (আমার ঐ অবধি স্কুলের বিদ্যা) তখন উপর-ক্লাসের মেয়েরা আমায় কাছে ডাকিয়া কবিতা শুনিতেন। সেই উপলক্ষে শ্রীমতী সরলা দেবীর (তিনি প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন) সহিত পরিচয় হইয়াছিল।

* * *

১২৯৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী

যেদিন আমার হাতে আসিল, সেদিন আমার কি আনন্দ! আমার সেই ছেঁড়া খাতায় লেখা কবিতা ছাপার হরফে বাহির হইয়াছে—এ আনন্দ রথিবার ঠাঁই নাই। মুন্নিদার সেদিনকার উৎসাহের কথা এখনো মনে হয়; তিনিই জোর করিয়া কবিতাটি ভারতীতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই আমি লেখিকা বলিয়া পরিচিত হইলাম।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন ষ্টার-থিয়েটারে ভারতী-সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে প্রথম দিন দেখিয়াই, মনে মনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন আমরা যে ভাবে থাকিতাম তাহাতে আমাদের নিজ-সমাজভুক্ত কয়েকটি পরিবার ব্যতীত অন্যত্র যাইবার কোনও সুযোগ ছিল না। সেইজন্য তাঁহার সহিত দেখাশুনা হইত না। সহসা সেদিন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমার ভারি আনন্দ হইল। লৌহ ও চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি মনুষ্যের মধ্যেও আছে। নতুবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা কেন এমন প্রবল হয়? সেদিন অভিনয়ের বিশেষ কিছুই দেখা হইল না;· নানাপ্রকার গল্পগুজবে সময় কাটিয়া গেল।

একবৎসর পরে আমার আবাল্য বন্ধু শ্রীমতী হেমলতা দেবীর পিত্রালয়ে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আমরা আবার মিলিত হইয়াছিলাম। তখন তাঁহার স্নেহলতা উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে ভারতীতে বাহির হইতেছে। উপন্যাসের শেষটা কি হইবে তার আলোচনা হইল। তিনি বলিলেন—"শেষটা এখন বলিবনা; দেখে নিজে বোলো কেমন হয়েছে।" সেদিন সেখানে তিনি নিজের রচিত দুইটি গান গাহিয়াছিলেন। তাঁহার গান যিনিই শুনিয়াছেন তিনিই জানেন তাঁহার গাহিবার ক্ষমতা সামান্য নহে।

ইহার পর আমরা বাঁকিপুরে চলিয়া যাই, সে সময় তাঁহার নিকট হইতে প্রায়ই পত্র পাইতাম। এই পত্র-ব্যবহারে আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। এই পত্রের ভিতর কত মনের কথা, কত উপদেশ আশ্বাস, কত সান্ত্বনা সমবেদনা, কত সাহিত্য-আলোচনা থাকিত! সব উদ্ধৃত করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়,—কাজেই দুই-চারিখানির একটু-আধটু অংশ প্রকাশ করিলাম। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আমায় কবিতা লিখতে বলেছ, আমার কি আর সেদিন আছে; এখন গলাভাঙ্গা—কখনো কখনো কষ্টে এক-আধটা বার হয় বইতো নয়—

"আমি নীরব বীণা
অতি দীনা
ভাঙ্গা হৃদয়খানি, ;
আমার ছেঁড়া তার,
নাহি আর
মধুর বাণী।
প্রাণের কথা যত
আগে—গেয়েছি ত
সকলি,
মনে নাহি যার
এখন—তারে আর
কি বলি?

গান গাহে যারা
গাক্ তারা
জানাক ব্যথা,
আমার নাহি ভাষা
নাহি আশা
শুধু আকুলতা।
সবাই বোঝে হেথা
বলা কথা
কে বোঝে নীরব প্রাণে
কেহ কি বুঝিবেনা, একো জনা?
কে জানে?

* * *

"আমরা ইতিমধ্যে পুনা বেড়িয়ে এসেছি। পুনা আমার বড় ভাল লাগে। পুনার বাঁধের বাগানের মত সুন্দর জায়গা খুব কম দেখেছি। বাঁধ ডিঙ্গিয়ে প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস কল কল তানে নীচে পড়ছে। শতধারায় তরঙ্গভঙ্গে পাষাণ-বক্ষ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে। একপাশে পাহাড় আকাশের গায় উঁচু হয়ে রয়েছে। সম্মুখে বাগান, নানাবৃক্ষ নানারকমে সুশোভিত, মধ্যে ফোয়ারা খেলছে। সুন্দর সুন্দর পার্সি ছেলে-মেয়েরা চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গাছের ভিতর দিয়ে দিয়ে সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছে—বড়ই সুন্দর। পুনায় আমরা একদিন রমাবাইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছি। রমাবাই আমার অনেকদিনের বন্ধু—মানে এবারের শুধু আলাপী নন।

* * *

"তোমার শেষ চিঠি পেয়ে যে কি কষ্ট হল, বলতে পারিনে। আহা, তোমার কোলের ছেলে তোমার কাছ থেকে চলে গেল। তোমার সেই বুকফাটা কষ্ট আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমারো একটি ৬ বছরের মেয়ে মারা গিয়েছিল, সে আজ ১২ বছর, তবু যখন মনে পড়ে কি ভয়ানক কষ্ট হয়। তোমার এই প্রথম সন্তান, আর এমন সুস্থ, কখনো ওরূপ মনেও হয়নি, হঠাৎ কি হোল? যাহোক সবি তাঁরি হাত, জীবন মৃত্যু আমরা কি কাউকে দিতে পারি? আমাদের কেবল মনের ভ্রান্তি। ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি তোমায় সান্ত্বনা দিন, এই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।"

* * *

কয়েকবৎসর পরে আমি কলিকাতায় যাই। সে সময় ভারতী-সম্পাদিকা কাশিয়া-বাগানের বাগান-বাটীতে থাকিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়া আমায় লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি সেবার প্রায় মাসখানেক কলিকাতায় ছিলাম। সপ্তাহে দুই-তিন বার তাঁহার সহিত দেখা হইত। দুপুরে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে থাকিতাম, অনেক উপদ্রব করিতাম, বড়বোনের মত তিনি আমার সব উপদ্রবই সহ্য করিতেন। তাঁর সেই ছাদটিতে বিকালে বসিয়া কত গল্প করিতাম, কত আবলতাবল বকিতাম। তারপর আমার 'হাসি ও অশ্রু' বই বাহির করিবার সময় তিনি আমায় সকল রকমে সাহায্য করিয়াছেন। আমি মোটেই প্রুফ দেখিতে জানিতাম না, তিনি নিজেই সব করিয়াছেন।

আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি। কলিকাতায় গেলে কালেভদ্রে কখনো দেখা হয়। নইলে

চিঠিতে আলাপ চলে। এই সময় তিনি দার্জ্জিলিং থেকে একবার লিখিয়াছিলেন—

"আজ সকাল থেকে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে, এ সময় একেলা কি-রকম লাগে। তুমি যদি এখানে থাকতে ত নাজানি তোমার কিরূপ ভাব হত। ভাবতে ভাবতে একটা গান লিখলুম, দেখো-দেখি মনের মত হয়েছে কিনা—

"এমন বারি ঝরে এমন থরে থরে
আকাশ ঘনঘোরে ছেয়েছে,
এমন বরষায়, সে মোর আজি হায়
কোথায় কোন্ দূরে রয়েছে।
নিঝর সচকিত মিলন জাগরিত
চমকি উথলিত পুলকে,
চাতক তৃষা ভরি অমিয়া পান করি
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি দ্যুলোকে।
বনানী নুয়ে নুয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
গাহিছে প্রাণ খুলে প্রেমগান,
ফুলের রূপরাশি উঠে হাসি
শুভ্র হিম-নীরে করি স্নান।
এ হেন বরষায় কাহার ভরসায়
দিবস যাপি,
কাহার কথা শুনে, কাহার প্রেমাগুনে
হৃদয় তাপি।
কাহার আঁখি-তারা মাতোয়ারা
করে এ প্রাণ মোর,
কাহার সুধা চুমে এক ঘুমে
জীবন করি ভোর।
কাহার প্রাণে গিয়ে লুকাইয়ে
জুড়াই সব ব্যথা,
এমন ঘন ঘটা এমন বারি-ছটা
ওগো সকলি বৃথা।"

* * *

এই রকম করিয়া চিঠিতে তিনি কত যে কবিতা, গান আমাকে পাঠাইতেন— আর আমার আনন্দ ধরিত না।

তাঁর পারিবারিক জীবনের সহিত আমি বিশেষভাবে পরিচিত। যখনই দেখিয়াছি, তাঁহাকে সর্ব্বসুখে-সুখী বলিয়াই মনে হইয়াছে। কোনও রমণীই স্বামীর ভালবাসা ভিন্ন অমন সুখী হইতে পারেন না। তাঁর প্রতি তাঁর স্বামীর ব্যবহার দেখিবার জিনিস ছিল বটে;— মনে হইত যেন পূজা করিতেছেন। একবার ভারতী-সম্পাদিকার অসুখের সময় গিয়াছিলাম, সেই সময় তাঁর স্বামীর সেবা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যে স্বামী তাঁর জীবনের সকল উন্নতির মূল, যাঁর চেষ্টায় যত্নে তিনি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া জীবনে এমন যশস্বিনী হইয়াছেন, সেই স্বামী হারাইয়া তাঁহার জীবন যে শূন্য হইয়া গিয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বামী-বিয়োগের পর তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার চিঠিখানি পড়ে চোখের জল আর থামতে চায় না। কতদিন ধরে মনে করছি উত্তর দেব, পারিনি। সত্যি এমন স্বামী পাওয়া বহু পুণ্যের ফল; চিরদিন আমার সুখ কিসে হবে তাই দেখেছেন, মৃত্যুর সময়ও আমার কথা ভাবতে ভাবতেই গেছেন, ছেলে-মেয়ে আর কাউকে চাননি। এমন স্বামীকে কি-করে ভুলবো। তবুও ত তাঁকে ছেড়ে বেঁচে আছি, —আশ্চর্য্য বলেই মনে হয়!"

* * *

স্বামী-বিয়োগের পর তিনি যথার্থই পৃথিবীর সব কাজ থেকে বিদায় লইয়া একেবারে একাকিনী শূন্য-হৃদয়ে সেই অনন্তের পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁর মুখের ভাব দেখিলে যেন তাই মনে হয়।

তাঁহার মস্ত গুণপণা—তাঁহার কন্যাদের জীবন এমন উজ্জ্বল করিয়া তোলা। তাঁহারই চেষ্টার ফলে আজ শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমতী সরলা দেবীর ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করিয়া বঙ্গনারীকে কত উপকৃত করিতেছে, তাহা ক্রমশঃই সকলে বুঝিবেন। শ্রীমতী সরলা দেবী যে এই কার্য্যে অমূল্য সহায়-রূপে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসকে পাইয়াছেন তাহাও বঙ্গনারীর সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর 'বিধবাশ্রম' তাঁহারই অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল। এই সকলের মূলমন্ত্র তাঁহারা ভারতী-সম্পাদিকার নিকটই পাইয়াছেন। ভারতী-সম্পাদিকা শুধু লেখার আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন নাই। তিনি মহিলাদিগের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সখি-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলকার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

যখন ভারতী-সম্পাদিকা প্রথম গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন বঙ্গদেশে এত স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ছিল না বা স্ত্রী-জাতির শিক্ষার এখনকার মত এমন উপায়ও ছিল না। তখন ত দূরের কথা,—আমাদেরই সময়ে ছিল না,—আমাদের জীবনেই তাহা দেখিয়াছি। আমাদের পরিবারের মধ্যে যখন প্রথম আমি ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করি তখন তাহাতে কত বাধা-বিঘ্ন পাইতে হইয়াছিল। ইংরাজী পড়িলেই খৃষ্টান বা মেম হইবার আতঙ্ক। আমার ঠাকুমা যে এ-বিষয়ে কিরূপ প্রতিবন্ধক হইতেন এখনো তাহা বেশ মনে পড়ে। এখনো অধিকাংশ হিন্দু-পরিবারের মধ্যে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই সব বিদ্যা শেষ হইয়া যায়। অথচ আমি দেখিতেছি, বঙ্গদেশের বালিকা-দিগের জ্ঞানের পিপাসা এত অধিক, তাহারা এত বিদ্যানুরাগিনী যে বলা যায় না; শুধু উপায় নাই বলিয়াই কেহ শিখিবার সুযোগ পায় না। যে দেশের স্ত্রীশিক্ষার এই অবস্থা এবং যে অবস্থা পূর্ব্বে আরো ভয়ঙ্কর ছিল, সেই দেশে সেই কালে স্বর্ণকুমারীর মত বিদুষী গড়িয়া-ওঠা বড় সোজা কথা নহে। এত লেখাপড়া জানিয়া, এত সুশিক্ষিতা ও অমন উচ্চবংশের কন্যা হইয়াও (পৃথিবীতে লোকে যাহা কিছু চায়,—বংশ রূপ গুণ কিছুরই অভাব তাঁর নাই) তাঁর স্বভাব কখনো গর্ব্বিত দেখি নাই, এইটেই আমার সব-চেয়ে ভাল লাগে। তিনি যখনি আমাদের বাটীতে আসিতেন, হিন্দু-বাড়ীর মেয়েরা সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, তিনি সকলকার সহিত সমভাবে কথা কহিয়াছেন, যখনি কেহ গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছে গান গাহিয়াছেন। আমার সকল আত্মীয়েরাই তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে মোহিত হইয়াছেন; সকলেই বলিয়াছেন এমন মেজাজ কখনো

দেখি নাই। অমন করিয়া সকল পরিবারে না মিশিলে তিনি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন না। সকল অবস্থার পরিবারের সঙ্গে এমন প্রাণ দিয়া মিলিতে মিশিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁর অঙ্কিত উপন্যাস-চিত্র এত জীবন্ত।

আমার লেখা যাহাতে ভাল হইয়া ওঠে তার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ! তিনি আমায় সেই ছেলেবেলা হইতে কত উপদেশ, কত পরামর্শই না দিয়া আসিয়াছেন। কোথাও আমার প্রশংসা হইলে তাঁহার আনন্দ ধরে না। তাঁহার এ স্নেহ ভুলিবার নহে। কেবল আমারই প্রতি যে তাঁহার অনুগ্রহ তাহা নহে; আমাদের দেশের মেয়েরা সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করুক, ইহা তাঁহার অন্তরের কামনা।

এই কয়েক মাস আগে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আর সে মূর্ত্তি নাই, সে শ্রী নাই, শোকে-দুঃখে তাঁর মুখে কি-এক বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। ভাল অবস্থায় সুখের সময়ও কখনো তাঁকে চঞ্চল দেখি নাই, কখনো বেশী কথা কহিতে দেখি নাই, আমি আপনার মনে বকিয়া গিয়াছি আর তাঁর সেই এক উত্তর "তার পর!" এখনো তাঁর সামনে গেলে আমি যেন ছেলেমানুষের মত হইয়া যাই;—কোথা হইতে সেই ছেলেবেলার চঞ্চলতা আসিয়া পড়ে।

এখন আর পূর্ব্বের মত চিঠি-পত্র দিতে পারি না, তবু তিনি যে আমার চির-শুভাকাঙ্ক্ষিণী তা বেশ বুঝিতে পারি। সেদিনও তাঁর চিঠিতে লিখিয়াছেন—

"অনেক দিন পরে তোমার চিঠি পেলুম বটে। যৌবনের সে উচ্ছ্বাস আমাদের চলে গেছে। বিরহ মিলনের সে হাসি কান্না মানাভিমান-স্রোত বন্ধ, কিন্তু তবুও বন্ধুত্ব কি আমাদের প্রাণ থেকে সরে পড়েছে? না, ভালবাসা এখন স্তব্ধ ভাব ধারণ করেছে। এ বয়সের ভালবাসার বোধ হয় ধর্ম্মই এই।"

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।
সম্বলপুর।

চয়ন

ষ্ট্রিণ্ডবার্গের নাটক

গত বৎসরের ফাল্গুন মাসের "ভারতী"তে আমরা লিওনিড আণ্ড্রীভের ভাবাত্মক নাটকাবলীর কিছু-কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম; অগষ্ট্ ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, ভাবাত্মক নাট্যসাহিত্যের আর-একজন মহারথ। এবার তাঁহার সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলিব।

আধুনিক রঙ্গালয় অধঃপাতে যাইতেছে;—রঙ্গালয় যাহাতে বর্ত্তমান ভাবধারার

অনুসারী হইতে পারে এবং বিচিত্র অসামঞ্জস্যের মধ্য হইতে মানবের আত্মাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ষ্ট্রিণ্ড্বার্গ নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাহিরের গঠন ও আকার হিসাবে ডি, গন্‌কোর্ট ও আধুনিক ভাবাত্মক নাটকের স্রষ্টা ইব্‌সেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

মানবের মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ষ্ট্রিণ্ড্বার্গ, এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার রূপক নাটকগুলির ভূমিকা অভিনয় করা, একরকম অসাধ্য ব্যাপার।—এমন-কি, সাধারণ পাঠকদের কাছে তাঁহার নাটকের পাত্র-পাত্রীদের অবাস্তব বলিয়াও ভ্রম হয়। অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাক্—জার্মানিতেও তাঁহার আত্মীজীবনীমূলক নাটক "To Damascus, অদ্যাবধি অভিনীত হইতে পারে নাই।

এড্গার পো, ডি-গন্‌কোর্ট, নিট্‌শে, ইব্‌সেন এবং সর্ব্বশেষে মেটারলিঙ্ক—সকলেরই অল্পবিস্তর প্রভাব ষ্ট্রিণ্ড্বার্গের উপরে পড়িয়াছে। কিন্তু ষ্ট্রিণ্ড্বার্গ যাঁহাদের নিকট হইতে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, আপনার প্রতিভাগুণে তাঁহাদের সকলকেই তিনি ছাড়াইয়া উঠিয়া যথেষ্ট নিজস্ব ও নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দর্শনের দিক্ হইতে দেখিলে বলিতে হইবে যে, মেটারলিঙ্ক ও ষ্ট্রিণ্ড্বার্গের মধ্যে বিপুল ব্যবধান। ষ্ট্রিণ্ড্বার্গ যেমন-বেশী দুঃখবাদী, মেটারলিঙ্ক তেমনি-বেশী আশা-বাদী। মেটারলিঙ্ক আনন্দোচ্ছাসে বলিতেছেন, "মৃত্যু? মৃত্যু নাই, সবাই জীবন্ত!",—কিন্তু ষ্ট্রিণ্ড্বার্গ To Damascus-এ আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা এই দু-কথায় বর্ণনা করিতেছেন,—"আমি তোমাকে 'সুখে থাক' এ-কথা বল্‌তে চাই-না—কারণ, এ দুনিয়ায় সুখ কোথায়? কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তুমি যেন অটল থাক্‌তে পার, এই আমার কামনা!"

মেটারলিঙ্ক আনন্দের কবি; কিন্তু ষ্ট্রিণ্ড্বার্গের কাছে এই পৃথিবী, জীবন ও মানব—"কিছু নয়—কিছু নয়, সুধু একটা ছায়া, একটা ভুয়ো ঠাট, একটা স্বপ্নের ছবি!"—এবং মিথ্যা জগৎ হইতে মানব যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহার উপরে জ্বালা-যন্ত্রণার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে! যন্ত্রণা আমাদের সখী, কারণ সে মুক্তিদায়িনী। ষ্ট্রিণ্ড্বার্গের মনের এই ভাবটি বুঝিয়া তাঁহার নাটকগুলি পড়িতে বসা উচিত।

"জীবন হচ্ছে পার্থিব নরক!" এই বিষাদ-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া ষ্ট্রিণ্ড্বার্গ ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর নিরাশার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন। এইখানেই তাঁহার 'আর্টে'র দুর্ব্বলতা। নিরাশা তাঁহার চারিদিকে যে মায়ার গণ্ডী কাটিয়া দিয়াছিল, জীবনে আর তিনি তাহার বাহিরে আসিতে পারেন নাই; ফলে তিনি 'ঢালের এক পৃষ্ঠ'ই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার The Dream Playতে Daughterএর মুখে শুনি: "সুবিচার, বন্ধুত্ব ও শান্তি—ও-সব সুধু কথার কথা, ধাপ্পাবাজী!" —"বয়ার মত আশা খালি নিজেকে জলের উপর ভাসিয়ে রাখে, বিপন্ন তার সুমুখে অসহায় হয়ে ডুবে মরে!" তাই তাঁহার

The Spook-Sonataর শোচনীয় সমাপ্তি-কালে 'ছাত্রে'র মুখে মরণাহত প্রিয়জনকে বলিতে শুনি, "অভাগা শিশু!—এই প্রতারণা দুঃখ, ত্রুটি ও মৃত্যু পূর্ণ বিশ্বের শিশু; —এই চির মোহ, পরিতাপ ও পরিবর্ত্তন পূর্ণ বিশ্বের অভাগা শিশু!" তাই তাঁহার Damascus-এ পূর্ব্বপত্নীর সহিত পুনর্দর্শন-কালে তীর্থযাত্রীকে বলিতে শুনি, "আমরা ভালবাসি। হ্যাঁ, আবার আমরাই ঘৃণা করি। আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, কারণ আমরা পরস্পরকে ভালবাসি; আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, কারণ আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধনে বাঁধা আছি; আমরা বাঁধনকে ঘৃণা করি, প্রেমকে ঘৃণা করি; ভালবাসার বস্তুকে ঘৃণা করি—কারণ, যা বড় ভালবাসার, তাই আবার বড় কটু; আমরা সেই সর্ব্বোত্তমকে ঘৃণা করি—যা থেকে এই জীবন আমরা পেয়ে থাকি!" এম্‌নি বিষম দুঃখবাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই।

Father ও The Dance of Death, ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের দুইখানি ভয়ানক নাটক। Fatherএর সর্ব্বত্র ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গের হতাশ হৃদয়ের ছায়াপাত হইয়াছে। এই Father বা "পিতা",—নর ও নারীর মধ্যে যে অনন্ত সংগ্রাম চলিতেছে, তাহারই উজ্জ্বল চিত্র। ইহার ভিতরে ষ্ট্রিণ্ডবার্গ আপনাকে 'পিতা' রূপেই পরিচিত করিয়াছেন, 'পতি' রূপে নহে। নাটকের পুরুষ বা 'পিতা' দুর্ব্বলচরিত্র, বাতিকগ্রস্ত; রমণী বা 'মাতা' শক্তিশালিনী, নীচচাতুর্য্যে নিপুণা এবং অন্ধের মত আপন পথ ধরিয়া নির্দ্দয় অটলভাবে আপনি চলে।—রমণী এখানে আপন সন্তানকে নিজের বশে রাখিতে চাহে,—পুরুষ তাহাকে মাতার কাছ থেকে তফাতে রাখিতে চাহে; —পুরুষ ও রমণীর এই সংগ্রামের উপরেই নাটকের ভিত্তি। পুরুষ সন্দেহ করিতেছে যে, সে তাহার সন্তানের যথার্থ পিতা কিনা? এই বাতিকগ্রস্ত পুরুষের চঞ্চল মনের উপরে রমণী অশেষ চতুরতার সহিত আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া যাইতেছে। পরিশেষে পুরুষ স্থির করিল যে, সে তাহার সন্তানের পিতা নহে; এবং এইখানে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। তাহার পত্নী বন্দী স্বামীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া যে পুরুষকে সে চায় তাহাকে ও আপন সন্তানকে গ্রহণ করিল।

নর ও নারীর মধ্যে অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলের মত যে সন্তান,—সেই সন্তানের জন্য কাতর আর্ত্তনাদ Fatherএর সর্ব্বত্র ধ্বনিয়া উঠিতেছে। মূলে ইহা নৈতিক নাটক; এবং ইহার বাস্তবতার উপরে রূপকের প্রচ্ছাদন আছে। সন্তানের বিষয়ে আর-কোন মানব এমন মর্ম্মভেদী কাতর স্বরে কথা কহিতে পারেন নাই।

The Dance of Deatth নামক নাটকখানিতে ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ তাঁহার প্রতিভার সম্পূর্ণতায় ও 'আর্টে'র চরম সীমায় গিয়া পৌছিয়াছেন। ইব্‌সেনের Hjamar, আধুনিক সভ্যতার একটি বিচিত্র সাহিত্য-চরিত্র; ষ্টিণ্ড্‌বার্গের এই নাটকের "the Captain," ইব্‌সেনের উক্ত চরিত্রের ঠিক পাশেই আসন পাইতে পারে। The Dance of Death, ইবসেনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের

সমকক্ষ। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলেও ষ্ট্রিণ্ডবার্গের There are Crimcs and Cri.nes নামে নাটকখানিই সকলের চেয়ে বেশী জনপ্রিয় হইয়াছে।

মোঁপাসা সাহিত্যের আসরে যেমন ছোট গল্পের একটি স্থায়ী আসন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গও তেমনি এক-অঙ্কের নাটক লিখিয়া নাট্যসাহিত্যে একটি নূতন রসের ঝরণা খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার রচিত এগারোখানি একঅঙ্কের নাটকেই নাট্যরসসৃষ্টির সুচারু কৌশল দেখা যায়। এই কয়খানি নাটকে হৃদয়ের সকল ভাবেরই নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। ইহার মধ্যে Miss Julietএর নাম সারা য়ুরোপে পরিচিত।

ষ্ট্রিণ্ডবার্গের প্রতিভা-বৈচিত্র অপূর্ব্ব! চল্লিশখানিরও বেশী নানাশ্রেণীর নাটক লেখার পর, প্রাচীন বয়সে তিনি ঐতিহাসিক নাটক-রচনায় মন দেন। এখানে সেগুলি লইয়া আলোচনা চলিবে না, তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি জার্ম্মানির মত দেশেও প্রশংসা ও সম্মান পাইয়াছে।

ষ্ট্রিণ্ডবার্গের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ভাষা যতদূর সরল হইতে হয়! ঐতিহাসিক নাটকগুলির পাত্র-পাত্রীদের থিয়েটারী ঢঙ্গে না আঁকিয়া, যাহাতে তাহারা জীবন্ত রক্ত-মাংসের মানুষের মত হইতে পারে, ষ্ট্রিণ্ড-বার্গ সকলের আগে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। তাঁহার Eric XIV., জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক নাটক-গুলির মধ্যে অন্যতম।

ষ্ট্রিণ্ডবার্গের প্রতিভার বিপুলতাকে অস্বীকার করিতে পারে, তাঁহার শত্রুপক্ষের মধ্যেও বোধ করি এমন ব্যক্তি কেহ নাই। অনেক স্থানে তিনি মেটারলিঙ্ককে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন ও ইবসেনের সমকক্ষ। তাঁহার Miss Julietএ এক নূতনতর নাট্যসৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যে তিনি রমণীর দেবী ও দানবী, দুই রূপই আঁকিয়াছেন। প্রেম ও ঘৃণা, শোক ও করুণা এবং বিক্ষুব্ধ মানব-আত্মার উপরে তাঁহার চেয়ে ভাল-করিয়া রং ফলাইতে আর কেহ পারেন নাই। এমন-কি, সুকঠিন জার্ম্মান সমালোচকেরাও ঐতিহাসিক নাটকে সেক্স্‌পিয়ারের পরেই তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নাট্যজগতে তিনি একেবারে-অজানা নূতন ভাবের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার Damascus গেটের Faustএর কাছে ম্লান নহে। তাঁহার রচনায় বর্জ্জনযোগ্য জিনিষ অনেক আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে অমরত্বের উপাদানেরও অভাব নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী-সাহিত্য

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর ভিক্টর হুগোর অতিরঞ্জিত দার্শনিকতার বিরুদ্ধে একদল প্রত্যক্ষবাদী লেখক আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিত্বশূন্য সাহিত্যের দিকে। সুধু গদ্যে নয়, কাব্য-সাহিত্যেও ইঁহারা আপনাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতেন না। এই নূতন সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন Leconte de Lisle।

Prudhomme, Heredia ও Coppée প্রভৃতি লেখকেরা এই নব-পদ্ধতি অনুসারে সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম কাব্য-পুস্তক প্রকাশ করিয়াই Prudhomme স্বদেশে কবি-নামে বিখ্যাত হন। বড় হাল্‌কা যে ভাব, অন্য-কেহ সহজে যা ধরিতে-ছুঁইতে পারেন না, বিচিত্র নিপুণতার সহিত Prudhomme সে সব অতি-লঘু ভাবকেও আপন লেখার বাঁধনে বাঁধিতে পারিতেন। তর্ক-বিচারের উপরে তিনি বিশ্বাসের আসন দিতেন; তাঁহার সমগ্র কাব্যে হৃদয়ের জয়ঘোষণা শোনা যায়।

নবসম্প্রদায়ের অন্যান্য কবির অপেক্ষা Herediaর উপরেই Leconte de Lisleর প্রভাব পড়িয়াছে অধিক। তাঁহার কবিতার ছন্দ পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ; কাব্যের রং ফলাইতে তিনি বড় পটু ছিলেন। সব জিনিষের বাহিরের দিক্‌টাই তিনি ভাল করিয়া দেখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার এক-একটি সনেট যেন শব্দের এক-একখানি চারু চিত্র। নিস্ফল মানব-জীবনের তিক্ত রসে ও দুঃখবাদে তাঁহার সনেটগুলি অতি করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

Coppée, পূর্ব্বজীবনে কেরাণীগিরির অবকাশকালে কবিতা ও নাটক রচনা করিতেন। কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত Le Passant নামক নাটকেই ভূমিকা লইয়া সারা বার্নার্ড যশের প্রথম জয়মাল্য লাভ করেন। এ নাটকখানি সুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, জনসাধারণের দ্বারাও পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

Coppéeর আসল মৌলিকতা তাঁহার বিষয়-নির্ব্বাচনে। দীন-দুঃখীর অশ্রু ও হাস্যে, নেহাৎ-সাদাসিধে হট্টগোলে বা নগর-প্রান্তের নির্জ্জনতার মধ্যেও তিনি কাব্যের প্রকাশ দেখিতে পারিতেন। এইজন্য তাঁহার রচনায় বাস্তবতার ছায়াপাত হইয়াছে। মধ্যস্থ গৃহস্থ-পরিবারের ছবি আঁকিতে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। কোন ছবিতে দেখি, রুগ্ন ভাইয়ের সেবায় এক বৃদ্ধা চিরকুমারী আপন জীবন, যৌবন ও সৌন্দর্য্য কিরূপে উৎসর্গ করিয়াছে; কোন ছবিতে দেখি, রাস্তার এক কোণে যুবতী ফুলওয়ালী কন্‌কনে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার থর্‌থরে আড়ষ্ট হাতে এক-গোছা ভায়োলেট ফুল। Coppée কখনো নিজের ভাবে বিভোর হইয়া সীমা ছাড়াইয়া যাইতেন না। তিনি একজন প্রতিভাবান নাট্য-সমালোচক ও ঐতিহাসিক নাট্যকার ছিলেন। লিখন-ভঙ্গীর গুণে তাঁহার নাটকের

অনেক বড় বড় দোষও ঢাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেবল কবি, নাট্যকার ও সমালোচক-রূপে তিনি বিখ্যাত নন,—উপন্যাসেও তিনি একজন ওস্তাদ লেখক। তাঁহার উপন্যাস-গুলিতে রোমান্সের আভাস যথেষ্ট থাকিলেও তাহাদের ভিতরে নূতন বাস্তব ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই নবসম্প্রদায়ের পরে আসিলেন Gustave Floubert,—তিনি রোমান্স ও বাস্তবতার মধ্যবর্ত্তী। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সাহিত্য-সাধনায় সর্ব্বতোভাবে আপন জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Madame Bovary নামে উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। Floubert কখনো রোমান্স, আবার কখনো-বা বাস্তবতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনো এ-দুইয়ে একাকার করিয়া ফেলিতেন না। তিনি যখন বিষয় বদ্‌লাইতেন তখন লিখন-ভঙ্গীও বদ্‌লাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ঔপন্যাসিক কোন মত জাহির করিতে অধিকারী নন। যদিও বাস্তবতা অপেক্ষা রোমান্সের উপাদানই তাঁহার রচনায় বেশী দেখা যায়, তথাপি তাঁহার Madame Bovary হইতেই ফরাসী-সাহিত্যে প্রকৃত বাস্তবতার সূত্রপাত। এই উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ অতি চমৎকার এবং ইহার অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বাস্তব জীবন হইতে গৃহীত। Floubertএর অসীম ধৈর্য্য, শক্তি ও প্রতিজ্ঞা ছিল। লেখার কায়দা বজায় রাখিতে তাঁহার মত পরিশ্রম করিতে আর কোন লেখক পারেন নাই। একটি পাতা লিখিতে তাঁহার একটি সপ্তাহ লাগিত।

Madame Bovaryর দৃষ্টান্তে আর-একদল নূতন লেখক আত্মপ্রকাশ করিলেন। সকলের চেয়ে Emile Zolaর উপরেই এই উপন্যাসের বেশী প্রভাব পড়িয়াছিল। Zolaর স্বভাব-বাদের বিকাশ হয় তাঁহারই জড়বাদ ও দুঃখবাদের মধ্যে। সত্যের খালি এক-দিকটাই তাঁহার চোখে পড়িত,—শরীর ও মনের অন্যান্য ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া তিনি সুধু লালসার ছবি আঁকিতে ভাল-বাসিতেন। দুঃখবাদের মহিমায় তিনি মানব-জীবনের নীচতা ও শোক-দারিদ্র, আপনার উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু করিয়াছিলেন। স্বভাববাদী হইলেও মনে-মনে Zolaর ঝোঁক ছিল রোমান্সের প্রতি। যতই তাঁহার দোষ থাকুক, এ-কথা মানিতেই হইবে, তিনি অদ্বিতীয় শব্দচিত্রকর।

Zolaর পরে আমরা M. M. Edmond ও Jules de Goncourtকে স্বভাববাদ অবলম্বন করিতে দেখি। তাহার পর Alphonse Daudet,—ইঁহার উপরে Zola ও Goncourt, উভয়েরই প্রভাব পড়িয়াছিল। প্রথমে তিনি কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত হন। তৎপরে দুইখানি নাটক ও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া Letters de Mon Moulin নামে সুন্দর এক ছোট-গল্পের বই বাহির করেন। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে Doudet বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মধ্যে ঔপন্যাসিক প্রতিভা আছে। অতঃপর তিনি স্বক্ষেত্রে থাকিয়া অনেক ছোটগল্প ও তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস-গুলি লিখিয়াছিলেন।

লেখা হইতে আপনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন

করিতে পারিতেন না বা মনের ভাব ঢাকা দিতেও জানিতেন না; এইজন্যই তাঁহার লেখার সুর যেন পাঠকের প্রাণের সঙ্গে একেবারে গাঁথিয়া যায়। প্রত্যেক নূতন রচনায় তাঁহার নূতন নূতন গুণ ও শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

দশবৎসর পরে Floubertএর ধর্ম্মপুত্র ও ছাত্র Guy de Moupassant আসিয়া স্বভাববাদীদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। Moupassantএর আর্টে ব্যক্তিত্বের ছায়ামাত্র নাই। তিনি যাহা চোখে দেখিতেন, অনুভব করিয়া তাহাই লিখিতেন। স্বচিত্রিত চরিত্রগুলি এমন স্পষ্টভাবে তাঁহার চোখের সামনে ভাসিত যে, লেখার মধ্যেও তাহারা যেন ঠিক জীবন্ত হইয়া থাকিত! তাঁহার রচনায় কোন নৈতিক বিশ্লেষণ নাই। কারণ, তাঁহার কাছে কল্পনা ও বাস্তব জগতের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। তিনি মন্দকে ত্যাগ বা ভালকে প্রশংসা করেন নাই।

শেষজীবনে টলষ্টয়

দীর্ঘজীবী টলষ্টয়ের জীবন নানা অবস্থা ও নানা ঘটনার মধ্য দিয়া গঠিত হইয়াছিল; জীবনে তিনি অনেকবার মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বহুমতের ভিতরে অসঙ্গতি দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলে চলিবে না; কারণ তাঁহার জীবনকে দেখিতে হইবে সমগ্রভাবে,—খণ্ডভাবে নহে।

দীর্ঘায়ু হইয়া তিনি ভাবিবার অনেক অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিত। রাজা বা ধর্ম্মের অনাচার দেখিলে তিনি নির্ভীকভাবে অপ্রিয় সত্য বলিতেন,—অথচ রাজদণ্ড বা পুরোহিতের অভিশাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারিত না।

টলষ্টয়ের জীবনব্যাপী ব্রতের অর্থ কি?—তিনি তাঁহার পাঠকের মনে মানুষ হইবার ইচ্ছা জাগাইয়া দিতেন। পাঠককে তিনি তাঁহার সত্য আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেন।

যৌবনে তিনি হাল্কা-প্রাণ, ফূর্ত্তিবাজ মানুষ ছিলেন। রাজসভায় আদর পাইতেন, যুদ্ধোৎসব ও শীকারে মাতিতে ভালবাসিতেন, আপনার মস্ত জমিদারীর কাজকর্ম্ম নিয়মমত দেখিতেন। তারপর সাহিত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আপনার প্রতিভাগুণে কয়খানি ভাল ভাল বই লিখিয়া সাহিত্যজগতে তিনি পরিচিত হইলেন। তাঁহার War and Peace হইতে Anna Karénina পর্য্যন্ত পুস্তকগুলি এই সময়কার লেখা। তিনি নিজে বলেন: "নিরর্থক আমোদের জন্য লাভের জন্য অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয়ে আমি বই লিখ্‌তে সুরু করেছিলাম। ফলে আমি টাকা রোজগার করেছি, প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি পেয়েছি, রাজার হালে থাকতে পেরেছি।" সে-সময় কে কোথায় তাঁহার বিষয়ে কি বলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। প্রাণে তিনি খাঁটি সাহিত্যসেবী ছিলেন না। তিনি কুলীন-

তন্ত্র (Aristocracy) ভালবাসিতেন এবং লেখককুলকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ভিতরে তখন সাধারণ রুশ-প্রকৃতি গোপন ছিল।

কিছুদিন পরে তিনি সাহিত্যের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। পৃথিবীর বড় বড় লেখক ও শিল্পীকে তিনি যা-মুখে-আসে, তাই বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "গেটে হচ্ছে চোর! দান্তে, মিলটন ও সেক্‌স্‌পিয়ার হচ্ছে অশিষ্ট, অসভ্য আর নির্ব্বোধ! বীথোভেন ও ওয়াগনারের গান হচ্ছে অস্বাভাবিক!" সকলের-চেয়ে তিনি বেশী খুসি হইতেন Uncle Tom's Cabin পড়িয়া।

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে সংসারের ঝালাপালায় তিনি জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। সভ্যতার হট্টগোলকে তিনি বলিতেন, "পাগ্‌লা-গারদের কারখানা।" শেষে তিনি সাদাসিধে জীবন-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, খৃষ্টের উপদেশকে জীবনের সার করিলেন। তাঁহার মতে "যে লোক সার সত্য জেনেছে, ক্ষেতের চাষ করাই হবে তার উপজীবিকা।" টলষ্টয় তখন সহর ও গোলমাল ছাড়িয়া সপরিবারে দক্ষিণ রুশিয়ায় গ্রাম্য কৃষকের জীবন যাপন করিতে গেলেন। যাহাতে সরলতা নাই, তাহা তাঁহার চোখের বালি হইয়া উঠিল।

টলষ্টয় নিজের সকল সম্পত্তি বিলাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আইনের সাহায্যে স্বামীর সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই। তিনি তাঁহার কোন পুস্তকের সত্ব রক্ষা করেন নাই—পৃথিবীর যে-কোন দেশের প্রকাশক, অনায়াসে তাঁহার পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিত। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে টলষ্টয় আপন প্রাপ্যের এক পয়সাও চাহিতেন না। অথচ তাঁহার পুস্তকের আয় ছিল অসাধারণ।

টলষ্টয় গরিবের পোষাক পরিয়া থাকিতেন। আপনাকে তিনি সামান্য এক চাষা বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কারণ তাঁহার সাধ্বী পত্নী স্বামীর সুখসাচ্ছন্দের দিকে সব-সময়েই খর-নজর রাখিতেন। টলষ্টয়ের গায়ে, গরিবী পোষাকের তলায় থাকিত খুব ভাল কাপড়-চোপড়; তাঁহার খাবার জিনিসগুলি সাদাসিধে হইলেও এত ভাল আর দামী ছিল যে, অনেক বড়মানুষের ভাগ্যেও সর্ব্বদা তাহা জুটিত না।

তিনি মুখে যখন বলিতেন,—

"আমি গরিব। আমার হাতে এক-পয়সাও নাই। কারুকে কিছু দান করবার ক্ষমতাও আমার নাই।"

তখন সত্যকথাই বলিতেন। কারণ বৃদ্ধবয়সে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ভালবাসার অত্যাচার ধরিতে পারিতেন না।

পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে শত শত নর-নারী তাঁহাকে দেখিতে আসিত। যাহারা ভক্তিভরে তাঁহার কথা শুনিত, তাহাদের সঙ্গে তিনি সদয়ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। যাহারা আসিয়া তাঁহার দোষ দেখাইত, তিনি অধীরভাবে তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন। একবার

আমেরিকার একটি বিখ্যাত ও প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহুদর্শী ও সুপণ্ডিত প্রেসিডেণ্ট তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বিদায় হইবার পর একটি লোক টলষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মতে এই পণ্ডিতটি কেমন লোক?"

"কিছু নাঃ! ভারি অসভ্য!"

টলষ্টয় আর যাহাই হউন,—তিনি আশ্চর্য্য রকমের সরল। তাঁহার অকৃত্রিম বিশ্বাস, পবিত্রতা ও সত্যপরায়ণতা অশ্রদ্ধার যোগ্য নহে। তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট পৃথিবীকে বাস্তব জগতে আমরা কখনো দেখিব না বটে, কিন্তু তাঁহার মানবতার আদর্শ এবং শিক্ষার উচ্চতা অনেক হতাশের শ্রবণে দৈববাণীর মত আশার প্রেরণা আনিয়া দিবে। আদর্শ জীবনের জন্য তাঁহার প্রাণে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল,—সে আকাঙ্ক্ষা বিশ্ববাসীর পূজার যোগ্য।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

গদ্য ও পদ্য

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠীবাটার সময় শ্বশুরবাড়ী হইতে দুই মেয়ে আসিয়া বিধবা মাকে ধরিয়া বসিল, ভাইয়ের বিবাহ দাও। মা বলিলেন, "এখন লেখাপড়ার সময় বিয়ে দিলে ও কি আর পাশ করতে পারবে! আর একটা বছর যাক্—বি-এটা পাশ করুক, তখন বিয়ে হবে।"

বড় মেয়ে টেঁপি বলিল, "আমরা দু'জনে তোমার কাছে থাকতে পারি না—তুমি একলা থাকো, বৌ এলে তোমার আর কষ্ট হবে না।"

মা বলিলেন, "আমার একটু কষ্ট ঘোচাবার জন্যে ছেলের ভবিষ্যৎ মাটি করতে পারি না ত!"

ফুলি কহিল, "না হয় বৌদিকে বাপের বাড়ীতেই রেখো, যতদিন না দাদা পাশ হয়!"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তাহলেও বই খুলে দিন-রাত বৌয়ের মুখই ভাববে—পড়া কি এগুবে আর? জানই ত ওর ধরণ!"

ধরণটার সম্বন্ধে মার মনে সম্প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তিন মাস পূর্ব্বে দোলের সময় ফুলি আসিয়া মাকে জানাইয়াছিল, দাদা বড় চমৎকার পদ্য লিখিতে পারে! ধোপার বাড়ী কাপড় দিবার সময় জামার পকেটে প্রাপ্ত টুকরা কাগজে দুই-একটা পদ্যও তিনি পড়িয়া ছিলেন। পদ্যের ভাব দেখিয়া ফুলি চমৎকৃত হইলেও মার কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়াছিল। লেখা-পড়া ঠেলিয়া রাখিয়া ছেলে যে বসন্ত আর কোকিলকে

লিখিয়াছিলেন, "ভারতীতে প্রকাশিত 'গ্রাম্য ছবি' পাঠ করিয়াই আমি তপোবন লিখিয়াছি।" এ-সকল কথা আমি সম্পাদিকার পত্রেই অবগত হই। কত-রকমে তিনি যে আমায় উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা বলিবার নয়। আমাদের ভারতীর মাসিক সমালোচনা পত্রমধ্যেই হইত। সে সব লিপির বহরই-বা কত! আমি স্বামীকে যে-সকল চিঠি লিখিতাম, তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া তাঁহার এক বন্ধু কতকগুলি পত্র 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' নামে ছাপাইয়া দেন। তারপর মৎপ্রণীত 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম' ও জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হয়। ইংরাজী সাময়িকপত্রে "কবিতা-হারের" সমালোচনা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার এই "জনৈক"এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার এই সাহিত্যিক রহস্য-অবগুণ্ঠন দুষ্টা ভারতী-সম্পাদিকাই উন্মুক্ত করিয়া দেন।

আমার এই ভারতীর স্মৃতিতে "বালক"-সম্পাদিকার প্রসঙ্গও অনিবার্য্য। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনীর মত সরল, অমায়িক, আন্তরিকতাপূর্ণ উদার-হৃদয়, মধুর-প্রকৃতি রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। মনের মত লোক পাইলে, এক মুহূর্ত্তের আলাপে একেবারে আপনার করিয়া লইতে তাঁহার জোড়া কেহ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমাদের বর্ত্তমান কৃত্রিম সভ্যতার ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ ব্যবহার ইঁহার নিকট গোঁটেই আমল পায় না। ইঁহার সুমধুর অথচ সপ্রতিভ তৎপরতায় সঙ্কোচ সহজেই দূর হয়। ইঁহার ব্যবহারের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয় যে ইঁহাকে অদেয় বা অস্বীকার করিবার কিছুই থাকে না। এই সম্পর্কে বোধ হয় দু-একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মিলনের কাসিয়াবাগানের বাটীতে প্রায় মাসে মাসেই মিলন-সমিতির বা সখি-সমিতির অধিবেশন হইত। ভদ্রমহিলাগণের সম্মিলন ও কথাবার্ত্তার মধ্যে গল্পচ্ছলে সাহিত্যচর্চ্চা সামাজিক প্রসঙ্গ প্রভৃতি ও সেই সঙ্গে গীত-বাদ্য এবং জলযোগের আয়োজন থাকিত। আমি সেদিন কাসিয়াবাগানে সখি-সমিতিতে গিয়া-ছিলাম। কখনো পরিচ্ছদে আমি 'সেফ্টী' ব্যবহার করিতাম না। একখানি থান ও তদুপরি একখানি মোটা চাদর ব্যবহার করিতাম। মনে পড়ে, সেদিন মাথায় কাপড় টানিতে চুল খুলিয়া গিয়াছিল; চুল বাঁধিতে চাদর খসিয়া যাইতেছিল; আমি তাহাতে একটু সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া মাননীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাড়াতাড়ি আসিয়া নিজের কবরী হইতে কাঁটা খুলিয়া আমার চুলগুলি আঁটিয়া ও চাদর কাপড় প্রভৃতি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া কিরূপে আমার লজ্জারক্ষা করিয়া-ছিলেন! এই মেজবধূ ঠাকুরাণীর সরলতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আর একদিনের কথা। সেদিন অপরাহ্নে আমি তাঁহার পার্কষ্ট্রীটের বাটীতে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ফটো আছে কি না?" আমি 'না' বলাতে তিনি বলিলেন, "আপনার একখানা ফটো থাকা খুব দরকার।" বলিতে বলিতে

বলিলেন, "একটু বেড়াতে যাবেন? দেখি হয় কি না, পাঁচটাও বাজে।" আমি ভালরূপে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতেই আমাকে লইয়া একেবারে ফটোগ্রাফের দোকানে উপস্থিত হইলেন, এবং আমার ফটো তোলাইলেন। আমার আপত্তি করিবার অবসর অবধি মিলিল না। তারপর সাহেব বোধ হয় যখন বলিলেন, আমি বড় গম্ভীর হইয়া আছি, তখন তিনি সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া এমনভাবে 'একটু হাসুন না' বলিলেন যে, আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমার পরিণত বয়সের যে ছবি মাসিকপত্রিকাদিতে বাহির হইয়াছে, তাহা এই ফটোরই প্রতিলিপি।

আমার সেকালের বালিকার শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিবার দিকে তাঁহার যে আগ্রহ দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার নিকট আমি ঋণী ও তাঁহার জ্ঞানদা নামের সার্থকতারও পরিচয় পাইয়াছি। আমার চিত্রকলানুরাগ বৃদ্ধির মূলেও তিনি। অপরাধের মধ্যে গড়ার উপর সেক্সপীয়রের একখানি ও রবির একখানি ছবি বুনিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে ও রবির স্ত্রীকে উপহার দি। পশমে তোলার হিসাবে উক্ত চিত্রিত ব্যক্তিদের সৌসাদৃশ্য না কি একটু বিশিষ্টভাবেই ধরা দিয়াছিল; এই উপলক্ষে মেজবধূ ঠাকুরাণীর উৎসাহ আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে পাইয়া বসিল এবং সে উৎসাহ সংক্রামক হইয়া আমাকেও আক্রমণ করে। মেজবধূ ঠাকুরাণী রহস্যেও অতুলনীয়া। আমাকে গান শুনাইবার জন্য আজিকার স্তর রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে একদিন একটী পয়সা পেলা দিয়াছিলেন, তাহাও এই মধুর স্মৃতির হিসাবে টোকা আছে।

আমার তখনকার সঙ্কোচপূর্ণ ও অবরোধ-শাসিত সঙ্কীর্ণ ব্যবহারে হয়ত কতদিন তাঁহার মনে অন্যায় ব্যথা দিয়াছি, কিন্তু তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা, স্নেহময়ী ভগ্নীর মত তাহা সহ্য করিয়াছেন। ইঁহার প্রসঙ্গে লিখিত আমার কবিতাও আছে।

আমার পুত্র শ্রীমান প্রকাশচন্দ্রের বাঙ্গালা সাহিত্যে হাতে-খড়িও তাঁহার "মিলন-মা"র প্রদত্ত এবং ভারতীর পত্রেই তিনি প্রথম মক্স করিতে শিখেন। এখন ইংরাজি বাঙ্গালা পত্রিকাদি সম্পাদন-কার্য্যে প্রকাশ সিদ্ধহস্ত; কিন্তু সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও দায়িত্বে 'মিলনই' তাঁকে প্রথম দীক্ষিত করেন। পাহাড়ে যাইবার সময় একবার ভারতীর সমস্ত ভার, আমার বারণ সত্ত্বেও, তিনি উঁহার হাতে দিয়া যান। প্রকাশের বয়স তখন বিংশতি বর্ষ মাত্র। ভারতী-সম্পাদিকার গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য এবং এ বিষয়ে তাঁহার ভরসা ও আত্মবিশ্বাস দুঃসাহসিক রকমের হইলেও তাঁহাকে কখনও নৈরাশ্য ভোগ করিতে দেখি নাই।

ইংরাজীতে না কি প্রবচন আছে, "ঘনিষ্ঠতা ঘৃণার প্রসূতি", কিন্তু আমাদের উভয়ের এ ঘনিষ্ঠতায় এ যাবৎ কেবল শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহানুভূতিই দেখিয়া আসিয়াছি। ইংরাজী ১৮৮২ সালে আমার স্বামীর যত্নে ও উদ্যোগে 'রেইস এণ্ড রায়েৎ' পত্রিকা আমাদের হাতে আসে ও স্বনাম-ধন্য পূজ্যপাদ ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদক-

কতায় তাহা প্রকাশিত হইতে থাকে। মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিবারের নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমাদের বৈঠক-খানা বাড়ীতেই থাকিতেন এবং ত্রিপুরার মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগের পর হইতে তাঁহার দেহান্ত পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকা-পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। সুশিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী থাকিলেও তিনি বিশেষ রক্ষণশীল এবং তৎকালীন হঠ-প্রকৃতির সংস্কারের প্রতিকূল ছিলেন; এবং ঠাকুর-পরিবারে তখন যে সকল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদের সকল-গুলির তিনি অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

সেও আজ অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী তখন স্বর্গীয়। আমার মনে আছে, কি এক প্রসঙ্গে "বঙ্গবাসী" পত্রিকা 'ভারতী' সম্পাদিকাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দেন। উক্ত লেখার প্রতি আমি মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে "বঙ্গবাসী"কে পুনঃপুনঃ সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সুনিপুণ লেখনীর তাড়না ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে লেখার মধ্যে ভারতী সম্পাদিকার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার যে নিদর্শন বিদ্যমান তাহা ভুল করিবার নহে। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে রেইসের সম্পাদকীয় ভার আমার ভাসুর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হাতে পড়ে। "মিলনে"র "ভারতী"-ত্যাগ-উপলক্ষে 'রেইসে' (১৫ই মে ১৯১৫) যে প্রবন্ধ বাহির হয়, বাহুল্য-ভয় সত্ত্বেও তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রবন্ধের মধ্যে বাঙ্গালা কবিতাও একটি ছিল।

A Journalistic Retirement.

The retirement of Mrs. Ghosal, better known by her maiden name of Srimati Swarna Kumari Devi, from the editorship of BHARATI is a distinct loss to vernacular journalism. With the traditions of a cultured family, and of varied culture and accomplishment herself, she was eminently fitted by her training, temper and acquirements to hold the post she has hitherto so nobly filled. Besides editing the journal which was started in her father's family with her eldest brother as the first editor, she has contributed largely to Bengali literature; and those contributions, of no mean order, have considerably helped to enrich the language. And she has made the BHARATI what it is on this its fortieth year. How far she has succeeded in gaining one of her objects, namely, the moulding of men of letters it is, as she herself observes, for posterity to say. In the domain of letters many owe her allegiance, and those that do, know that it is a pleasure to do so, and are proud of it. Her encouragement, though lost on many, has been cosmic generally and has made many young men take to literature as a profession and some of them successfully. The present editor of the BHARATI to whom she makes over charge may be cited as an instance. That editor shares with a friend the

burden of responsibility. Of considerable go and regular business habits, she possesses in abundance all the womanly virtues which distinguished her class in the happy by-gone days and are now treasured up in the museum of memories. She is, to use a pleasant line of Locksley Hall Sixty Years after, 'Feminine to her inmost heart and feminine to her tender feet." That is the impression, one who has known her intimately, carries of her. Her manners have a dignity of simplicity, peculiarly striking and her conversation a charm peculiarly free from pedantry. Her kindliness is as genuine as motherliness and her hospitality, homely joys. The words of adieu with which she takes leave of her readers and colleagues are as touching as they are true :

"When I took up the sacred task of editing I did not persuade myself to do so with a view to results ; nor did I calculate its profit and loss. It was the pleasure of work which encouraged and inspired me to action. Those days of inspiration and encouragement are now ended and I feel lonely and helpless. My done-up body and mind now earnestly seek cessation."

Here is an appreciation of her by a young graduate admirer which has come to our hands and which we publish with pleasure. The verses are the maiden attempt of the young writer and are therefore the more deserving of encouragement.

পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি

কেন ভাব সাঙ্গ দেবি, জীবনের কাজ ?
কেন বৃথা ত্বরা এত ? রয়েছে ত বেলা।
এখনো রয়েছে বহু যাত্রী হতে পার ;—
কিসে হবে বিনা তব ভারতীর ভেলা ?
এখনো নীবার পড়ে যজ্ঞভূমি পরে ;
এখনো জ্বলিছে হের বহ্নি সুমঙ্গল,
কে বল তোমার মত হোত্রী মাতঃ আর
রাখিতে সে পুণ্য-বহ্নি চির-সমুজ্জ্বল ?
ভারতী-পূজার কল্পে নানা উপচারে
সাজালে যতনে যেই নৈবেদ্যের থালা ;
সে নির্ম্মাল্য কেবা লবে পাতিয়া অঞ্জলি ;
কাহারে শোভিবে সেই নিবেদিত মালা।
পারিবে কি তোমা-সম যুগল দায়াদ
অক্ষুণ্ণ রাখিতে কীর্ত্তি প্রাচীন মন্দিরে ?
হারায় না যেন কভু বিবেক মহিমা ;
বরিষ আশীষ-ধারা তাহাদের শিরে।
বিদায়ের কালে দেবি, নমি শতবার।
মাঝে মাঝে দিবে দেখা সেই আশা চিতে।
নাশিয়া তমসা-জাল বঙ্গের অঙ্গনে
করিও প্রদীপ্ত তুমি মেঘান্তর হতে।

কবিতাটি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ৺ কালীপ্রসাদ ঘোষের বংশীয় ও আমার আত্মীয় শ্রীমান সুশীলকুমারের লেখা।

সুবিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং "আলোচনা"র অন্যতম সম্পাদক আমার দেবর শ্রীমান গোবিন্দলাল দত্তের সহিত ঠাকুর-পরিবারের অনেকের আলাপ ছিল এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের সহিতও সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে, মনে পড়ে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর

"সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" ও রবীন্দ্রের "অকালকুষ্মাণ্ড" প্রভৃতি রচনা পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন জোড়াসাঁকোর মেয়ে-পরিবারের সহিত আমাদের মেয়ে-পরিবারের পরিচয় ছিল না। গোবিন্দলাল অবরোধের মধ্যে শাস্ত্র-সম্মত স্ত্রী-শিক্ষার পাণ্ডা ছিলেন, এবং সাবিত্রী লাইব্রেরীকে উপলক্ষ করিয়া, নারী-রচনা পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। কঠোর রক্ষণশীল দলের "সেনানায়ক" উপাধি ও তদুপযোগী শিরোপা আমি তাঁহাকে অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলাম এবং কোন দিন ভাবি নাই অবরোধের বাহিরে তিনি গুণের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে আমার সহিত ভারতী-সম্পাদিকার আলাপের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ক্রমে তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ভক্ত হইয়া উঠেন এবং আমাদের এই মিলন-যজ্ঞের অন্যতম উত্তরসাধক ছিলেন।

ভারতী-সম্পাদিকার প্রতি আমাদের বৃহৎ পরিবারের পারিপার্শ্বিক সাহিত্য-অনুরাগী বন্ধুবৃন্দের এই যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, বলা বাহুল্য, তাহা তাঁহার সহিত আমার এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই ফল। তাই বলিতেছিলাম, আমরা নিতান্ত বাঙ্গালী, আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে ইংরাজি প্রবচন সার্থক হয় নাই। চল্লিশ বৎসরের সিকির সিকি কাল মাত্র "জাহ্নবীর" সম্পাদকতা করিয়া বুঝিয়াছি, কত ধানে কত চাল! তাই আজ ভারতী-সম্পাদিকার অসাধারণ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়কে অভিবাদন করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

একে সেকালের কথা, তায় বুড়ার লেখা; সুতরাং লিখিবার আছে অনেক। একালের নাতি-নাতিনীরা যে আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে চাহেন, এইটুকুই বৃদ্ধের গৌরব, সান্ত্বনা ও আনন্দ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ছন্নছাড়া

(৭)

পরের সপ্তাহে আটবছরের মেয়েরা সব বড় শোবার ঘরটায় চলে গেল। আমার বিছানা ছিল জানলার ধারটিতে—মারি এমের ঘরের ঠিক পাশে। আমার একধারে ইস্‌মেরি, আর-একধারে মারি রেনো। রাত্রে আমরা শুয়ে পড়লে মারি এমে আমাদের বিছানায় এসে বসতেন, আমার হাতখানা ধরে চাপড়াতেন; আর জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন।

একরাত্রে পাড়ার মধ্যে আগুন লাগল;—সে ভয়ানক আগুন! আমাদের শোবার ঘরটা একবারে আলোয় আলো হয়ে গেল। মারি এমে তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে আমায় ঠেলে তুলে দিলেন; বল্লেন—"দেখবি আয়, আগুন লেগেছে।"

আমার ঘুম আর ভাঙতে চায় না। তিনি

হাত দিয়ে আমার চোখদুটো একবার রগড়ে দিলেন। তার পর কোলে তুলে নিয়ে ঠেলা দিয়ে-দিয়ে বলতে লাগলেন—"দেখ, দেখ! ঘুমোস্‌নি;—আগুন লেগে কেমন দেখতে হয়েছে দেখ।"

আমি তখন ঘুমে একেবারে ন্যাতা;—আমার মাথা কেবলই তাঁর বুকের উপর ঢুলে ঢুলে পড়ছে। তিনি বল্লেন—"আ রে হাবাতে মেয়ে!"—বলে আমার কানের ডগাটা ধরে একবার সজোরে নেড়ে দিলেন। আমি ঘুম-ভেঙে চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম। তিনি অমনি আমায় কোলে করে বসলেন, বুকের মধ্যে চেপে ধরে দোলা দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন। তাঁর মুখখানি দেখাচ্ছিল যেন স্বচ্ছ ফটিক-দিয়ে গড়া, আর চোখদুটি আলোর আভায় ভরা!

মারি এমে জানলার কাছে এলেই ইস্‌মেরি আগুন হয়ে উঠত। কারণ তাহলে যে তাকে মুখ বন্ধ করতে হয়! সে এত বকতেও পারে!—কথা তার আর থামতে চায় না। আর কী চীৎকার! ঘরের ও-কোণ থেকে তার গলা শোনা যায়। মারি এমে বলতেন—"ঐ আরম্ভ হয়েছে ইস্‌মেরির বক্‌বকানি!" ইসমেরি অমনি ঠোক্কর দিয়ে বলত—"এই আরম্ভ হল মারি এমের বকুনি!"

কী তার সাহস! মুখের উপর তার এই চোপা দেখে আমার বুক দুরদুর করত! কিন্তু মারি এমে এমনি ভাব দেখাতেন যেন সে কথা তাঁর কানেই যায় নি।

একদিন তিনি ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—"বাঁট্‌লি কোথাকার! ফের যদি চোপা করবি ত দেখাব মজা!"

ইসমেরি বল্লে—"ঈস্‌!"

মারি এমে বেতগাছটা হাতে করে এসে দাঁড়ালেন। আমার ভয় হল ইস্‌মেরি এইবার খেলে বেত! কিন্তু ইস্‌মেরি যেমন সেই বেত দেখা অমনি ছুটে এসে মারি এমের পায়ের কাছ উপুড় হয়ে পড়ল! সে কী তার ছটফটানি আর কাতরানি!

মারি এমে হাত থেকে বেতগাছটা ফেলে দিলেন; তার পর পায়ের একটা ঠোক্কর দিয়ে ইস্‌মেরিকে সরিয়ে দিলেন, বল্লেন—"নচ্ছার মেয়ে!"

এর পর থেকে দেখতুম তিনি ইস্‌মেরিকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলেন; সে কি বলে, না বলে কানে তোলেন না। কিন্তু এইবার থেকে একেবারে বারণ হয়ে গেল যেন কেউ আর ইস্‌মেরিকে পিঠে না করে।

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। ইস্‌মেরি বাঁদর-ছানার মত আমার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠত। আমার সাহস হতনা যে তাকে ঠেলে ফেলে দিই। আমি নীচু হয়ে তাকে ভালো করে চড়ে-বসতে দিতুম। শোবার ঘরে যেতে হলেই সে পিঠে চাপত। কারণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা তার পক্ষে সহজ ছিল না। নিজের চলার ভঙ্গী নিয়ে সে নিজেই ঠাট্টা করে বলত—"আমার চলা যেন ব্যাঙের থপ্‌থপানি।"

মারি এমে আগে-আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতেন, আমি একটু দাঁড়িয়ে শেষ-দলের মেয়েদের সঙ্গে পিছে পিছে যেতুম।

হঠাৎ একএকদিন মারি এমে পিছন ফিরে চেয়ে দেখতেন; ইস্‌মেরি অমনি চোখের নিমেষে সড়াৎ করে আমার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ত। মারি এমের সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়তুম। ইস্‌মেরি বলত—"তুই ভারি বোকা! অমন অপ্রস্তুত হলি কেন? তাইত আবার ধরা পড়লি।"

মারি রেনো কিন্তু ইস্‌মেরিকে কিছুতেই পিঠে উঠতে দিত না। সে বলত তাহ'লে তার কাপড় ছিঁড়ে নোংরা হয়ে একাকার হয়ে যাবে!

(৮)

ইস্‌মেরি ছিল বাচালের একশেষ! কিন্তু মারি রেনো ঠিক তার উল্টো; মুখে তার কথাটি নেই।

রোজ সকালে আমার বিছানা-পাতার সময় মারি রেনোই সব করে দিত। চাদরখানার উপর হাত চালিয়ে চালিয়ে এমন চোস্ত করে দিত—ঠিক যেন ইস্ত্রি-করা। তার নিজের বিছানা ঠিক-করবার সময় কিন্তু সে আমাকে হাত দিতে দিত না; বল্‌ত—"না; তুই সব কুঁচকে-মুচকে একাকার করে দিবি।" ঘুম থেকে ওঠবার পরও তার বিছানা যে কেমন করে অমন চোস্ত থাকত আমি কিছুতেই বুঝতে পারতুম না। একদিন সে প্রকাশ করে বল্লে যে চাদর ও কম্বলখানা সে মাতুরের সঙ্গে পিন্‌ দিয়ে গেঁথে রাখে।

তার যে কতরকম টুকিটাকি জিনিষ আর কত যে লুকোনো জায়গা ছিল! খেতে বসে সে আগের দিনকার মেঠাই বার করে খেত; আর সেই-দিনকার মেঠাই তার পকেটে জমা হত। ঘুরচে ফিরচে আর পকেট থেকে হাত বেরিয়ে মুখে উঠচে।

প্রায়ই দেখতুম এককোণে বসে সে লেস্‌ বুনছে। ক্রস্‌ করা, ভাঁজ করা, জিনিষপত্র সব ভালো করে গুছিয়ে রাখা—এই সব করতে পেলে সে আর কিছু চাইত না। তারই জন্যে আমার জুতো অমন পরিষ্কার চকচকে আর আমার রবিবারের পোষাক অমন সুন্দর করে পাট-করা থাকত।

একদিন একটা নতুন দাসী এল। নাম তার মাদলিন। সে এসেই আমার অলবড্ডেগিরি ধরে ফেল্লে। চটে আগুন। বল্লে, আমি কুড়ের ধাড়ি। যেন নবাবপুত্রী। নিজের হাতে জলটি গড়িয়ে খেতে পারি না—হাতে ব্যথা লাগে! তাই আমার সঙ্গে-সঙ্গে সব দাসী-বাঁদীরা ঘুরচে!

সে বলতে লাগল—"ছি ছি ছি লজ্জা করে না এমন করে বাছা রেনোকে খাটিয়ে নিতে।"

বন্‌ নের্ঁ বল্লে—"ও মেয়েটা ঐ রকম! গুমরে ওঁর মাটিতে পা পড়ে না। উনি মনে করেন যে উনি কি আর-সবাইয়ের মতন? তাই ওঁর ধরণ-ধারণ আলাদা।"

তারা দুজনেই বল্‌তে লাগল যে আমার মতো এমন মেয়ে তারা কোথাও দেখেনি! —কোথাও না!—এমনি করে দুজনে এক-সঙ্গে আমার মুখের কাছে পড়ে চীৎকার করতে লাগল। তাই দেখে আমার মনে পড়ল সেই দুটো গণ্ডগোলে পরীর কথা—যাদের একজন কালো, একজন সাদা!

মাদলিন দেখতে পরিষ্কার, সুন্দর, কিন্তু

হাঁ বড়, দাঁত ফাঁক-ফাঁক! তার জিব ছিল চওড়া, পুরু; কথা-কইবার সময় ঠোঁটের কোণে এসে লাগত।

বন্‌ নের্‌ঁ চড় উঁচিয়ে আমায় বল্লে—"চোখ নামা।" আমি শুনলুম সে মাদ‌লিনকে বলতে বলতে গেল—"মেয়েটার ঐ রকম চাহনিতে কেমন যেন অস্বস্তি হয়।"

অনেক দিন থেকে আমার মনে হত বন্‌ নের্‌ঁ যেন একটা ষাঁড়। কিন্তু মাদলি্ন যে কোন্‌ জানোয়ারের মতন তা ঠিক করতে পারতুম না। অনেক ভেবেছি—যত জানোয়ার জানতুম সবাইয়ের চেহারা মনে মনে ওলট-পালট করেছি—শেষে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

সে ছিল মোটাসোটা—থপথপে। কিন্তু তার গলার স্বর ছিল এক্কেবারে সরু—বাঁশির মত।—ভারি আশ্চর্য্য কিন্তু! গির্জ্জেয় গান করবার তার ভারি সখ ছিল কিন্তু একটি স্তোত্রও সে জানত না। মারি এমে আমায় বলে দিয়েছিলেন তাকে শেখাতে।

এর পর থেকে আমার জিনিষ ঝাড়-পোঁচ করাতে মারি রেনোর আর কোনো বাধা রইল না;—কেউ আর সেদিকে লক্ষ্যই করত না। এতে মারি রেনো এত খুসি হয়ে উঠল যে রুমাল আটকাবার জন্য একটা পিন্‌ সে আমায় উপহার দিয়ে ফেল্লে। আমার হাতের রুমাল প্রায়ই হারিয়ে যেত। দুদিন না যেতে-যেতেই সেই পিন্‌-সুদ্ধ রুমালও যে কোথায় গেল খুঁজে পেলুম না! উঃ রুমাল! সে একটা প্রচণ্ড বিভীষিকা! সে কি কিছুতেই আমার হাতে থাকবে না—প্রতি সপ্তাহে একখানা করে যাবেই! ময়লা রুমালের বদলে মারি এমে একখানা করে পরিষ্কার রুমাল আমাদের দিতেন—তাঁর সাম্‌নে ময়লা রুমাল-খানা মাটিতে ফেলতে হত। সেই শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার কোনো হুঁস থাকত না—তার পর হঠাৎ চমকে উঠে পকেট হাতড়াতুম। কিন্তু হায় কোথায় সে! ছোট্‌, ছোট্‌;—শোবার-ঘর দেখ, পথের ঘর খোঁজ, বিছানাপত্র ওলট-পালট কর—কিন্তু হায় সব জিনিষ আছে কেবল আমার রুমালখানিই নেই। মন উতলা হয়ে উঠত। কোথায় পাই রুমাল—কে দেবে রুমাল! পাগলের মত ছুটোছুটি করতুম। দেবী মেরীর ছবিখানার সামনে দিয়ে যাবার সময় হাত-যোড় করে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করতুম—"ওগো দয়াময়ী, দয়া কর, আমার রুমাল যেন খুঁজে পাই।" কিন্তু সেই হারানো রুমালের কোনো চিহ্নই পাওয়া যেত না। তার পর ছুটতে-ছুটতে হাঁপাতে-হাঁপাতে মুখ লাল করে নীচে নেমে আসতুম,—মনের দুঃখে আমার কান্না পেত। মারি এমে যে সাফ্‌ রুমালখানি দিতেন সেখানি হাতে করে নিতে আর সাহস হত না;—সেই সঙ্গে যে বকুনি আমার প্রাপ্য তার সুর আগে থাকতেই আমার কানে বাজতে থাকত। মারি এমে কোনো কোনো দিন মুখে যদিবা কিছু না-ও বলতেন ত তাঁর চোখের বিরাগ আমার বুকে এসে বিঁধত—এবং সেই নীরব তিরস্কারের কঠোর দৃষ্টি সমস্ত দিন আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকত। লজ্জায় আমি মরে যেতুম,—হাত পা আমার খেলত না। একটা কোণ পেলে সেইখানে মুখ

এই নূতন অতিথিটির এতটুকু পরিচয় পাইবার লোভে সে একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, আর ও-পক্ষে একটুও আগ্রহ নাই!

হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল, কাহার হাতের চুড়িতে রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে, পাখার বাতাস গায়ে লাগিতেছে! সুবোধ পাশ ফিরিল—ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। পরি বিছানায় বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে! ঘোমটার মাত্রা একটুও কমে নাই। পাখাটা কলের পুতুলের মতই নড়িতেছে। সুবোধ উঠিয়া বসিয়া পরির হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইল এবং তাহার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া একেবারে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

সে রাত্রে বিস্তর বাজে কথার জালের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া যে কয়টি কাজের কথা সুবোধ বধূর কাছ হইতে উদ্ধার করিল, তাহা এই :—

১। পরি দ্বিতীয় ভাগ ভুলিয়া গিয়াছে—তবে অক্ষরগুলা এখনও মনে আছে।

২। বাপের বাড়ীতে পড়িবার একেবারেই সুবিধা হইবে না। ঠাকুরমার নিষেধ সেখানে এখন পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে বই খুলিতে দেখিলে অনর্থপাত হইবে; তবে এখানে যখন সে ঘর করিতে আসিবে, তখন সুবোধের কাছেই নিশীথের স্তব্ধ গোপন অবসরে লেখা পড়া শিখিতে তাহার কোন আপত্তি নাই।

৩। সুবোধকে পরির খুব পছন্দ হইয়াছে। সুবোধ বেশ সুন্দর। পরির ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন, পরির বরের রূপে সভা আলো হইয়া গিয়াছে।

আনন্দের আবেগে বধূর অধরে সুবোধ কৃতজ্ঞতার ছাপ মারিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহের আসর ভাঙ্গিলে বোনেরা শ্বশুড়বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় টেঁপি বলিল, "দেখিস্, যেন পড়ায় অবহেলা করিস্‌নে,—পাশ না হলে বৌয়েরই সকলে দোষ দেবে।" ফুলি চুপি চুপি বলিল, "দাদা, মা কাল বলছিল, আমি লিখে দিচ্ছি, দেখে নিস্, সুবোধ কখ্‌খনো এবার পাশ হবে না। দেখো দাদা, পড়ায় গাফিলি দিয়ো না ভাই, ক'টা মাস বৈ ত নয়!"

ওদিকে শ্বশুরবাড়ী হইতেও এই ধুয়াই সে শুনিয়া আসিয়াছে। দিদিশাশুড়ী বলিয়াছেন, "বাঙলা বিয়ে চট্ করে যেমন পাশ করলে, তোমাদের ইংরিজি বি,এটাও তেমনি পাশ করে আমাদের পরির পয়টা রেখো দিকিন্!" শাশুড়ী জমিদারী বংশের প্রথা মানিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না—আড়াল হইতে বিধবা কন্যা অপর্ণার মারফৎ জানাইলেন, এ বৎসর ভাল করিয়া পড়িয়া পরীক্ষাটা চুকাইয়া দাও—ইত্যাদি।

সুবোধ জ্বলিয়া গেল। পাশ! পাশ! পড়া আর পড়া! জীবনটার সৃষ্টি হইয়াছে কি কেবলই কতকগুলা বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-পাশের জন্যই! আর কোন কাজ নাই—উদ্দেশ্য নাই! এই যে বিশাল মানবচিত্তে কত সাধ-আশার পুলক-নৃত্য চলিয়াছে

—তাহার পানে কেহ চাহিবে না! আনন্দ-রস বিশ্ব-ভুবনে অজস্র ধারায় উছলিয়া পড়িতেছে, তাহার এক ঝলকও পান করিবে না! ষ্টীম-রোলারের মতই কতকগুলা ভারী কেতাব তাহাদের মামুলি বুলিটুকুকে মনের উপর পিষিয়া গাঁথিয়া দিলেই মানুষ চতুর্ভুজ হইয়া যাইবে না কি!

তাহার পর সুবোধের সুকঠিন বিরহ-তপ আরম্ভ হইল। দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ মাস ধরিয়া পরির ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকুকে অবলম্বন করিয়াই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। চিঠি লিখিয়া ফল নাই—ওদিক হইতে কোন স্পন্দনই মিলিবে না! লিখিলেও পরি সে চিঠির মর্ম্ম বুঝিবে না—ঐক্য-বাক্যের বানানই সে ভুলিয়া গিয়াছে! আর-কেহ চিঠি পড়িয়া যদি জবাব লিখিয়া দেয়? কিন্তু হায়, সে পরের লেখায় পরির হৃদয়ের কতটুকুই বা সন্ধান মিলিবে! অপরের মারফতে হৃদয়-ভাব জানানো—সে ত প্রহসনের অভিনয় করা! কাজেই চিঠি লিখিয়া যখন ফল নাই, তখন সে নূতন করিয়া খাতা বাঁধিয়া তাহারই সাদা পৃষ্ঠায় বিরহের ঢেউ তুলিল।

মার পানে চাহিয়া আবার পাঠ্যগ্রন্থ-গুলাকেও এ দুর্দ্দিনে খুলিয়া বসিতে হয়। কিন্তু চোখ যখন ইংরাজী হরফগুলার উপর শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, মন তখন কল্পনার রঙীন ফানুষে চড়িয়া কোথায় সুদূরে এক অজানা পল্লীর গৃহের কিনারে উড়িয়া বেড়ায়। অজানা পথে, অজানা ঠাঁইয়ে অবলম্বন কিছুই মিলে না! ব্যর্থতার ঘা খাইয়া কল্পনার ফানুষ ছিঁড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়—মনটাও ক্ষতবিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন একটু সুরাহার সম্ভাবনা ঘটিল। মার আদেশে শ্বশুড়বাড়ীতে সে পূজার নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। অনেক-খানি আশা লইয়াই সে গিয়াছিল, কিন্তু ফিরিল, নিরাশার তীরে বুক ছিঁড়িয়া। সেখানে যেদিন সে পৌঁছিল, সেদিন দিনের বেলায় পরির দেখা মিলিল না, বাড়ীর বাহিরের লোক তাহাকে লইয়া অস্থির! রাত্রিটা যাত্রার আসরে 'রাবণ-বধে'র পালা দেখিয়াই কাটিল। দ্বিতীয় দিনে দুপুরবেলায় সে আশা করিয়াছিল, পরির দেখা মিলিবে—শেষে অধীর প্রতীক্ষায় মধ্যাহ্ন যখন অপরাহ্ণের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে, তখন অর্পণা আসিয়া কৈফিয়ৎ দিল, কাল সারারাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিয়া পরি আজ ঘুমে কাদা হইয়া ঢুলিয়া পড়িয়াছে—মুখে অবধি কিছু দেয় নাই! সুবোধের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক মারিল। এই তাহার স্ত্রী! ইহারই উদ্দেশে সে পড়া ফেলিয়া রাত্রি জাগিয়া কবিতা রচনা করিয়াছে! রাগে অভিমানে সেই রাত্রেই সে বাড়ী ফিরিল। আসিবার সময় নিমেষের জন্য পরির সঙ্গে দেখা হইলে সে অভিমানের দুইটা ফাঁকা গর্জ্জন ছাড়িয়াছিল; কিন্তু পরির মৌনতার বর্ম্মে ঠেকিয়া সে গর্জ্জন শুধু শূন্যে মিশাইয়াছে, চিত্তে তাহার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য তুলিতে পারে নাই।

মাঘ মাসে ফুলির শ্বশুরবাড়ীর সকলে পশুপতিনাথ-দর্শনে বাহির হইল। অনঙ্গও ভগ্নীপতির সঙ্গে বোম্বাই বেড়াইতে গেল। ফুলিকে তাহার শাশুড়ী বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ফুলি আসিলে মা কিন্তু প্রথমেই সুবোধের সম্বন্ধে অনুযোগ তুলিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। ছেলের পড়ার ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া ইচ্ছা থাকিলেও বধূকে তিনি এখানে আনেন নাই—কিন্তু ছেলের অন্যমনস্ক উদাস ভাব তাহার সতর্কতা-সত্ত্বেও তাঁহার নজর এড়ায় নাই। বই খুলিয়া ছেলে যে আকাশের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তাহাও মার চোখে পড়িয়াছে। তাঁহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে। এখন যাহা হোক, সুবোধের বয়স হইয়াছে, ভাল-মন্দও বিলক্ষণ সে বুঝিতে শিখিয়াছে। বৌ ত আর পলাইবে না, এ কথা কেন সে বুঝিতে পারে না! অথচ এ অবহেলা তাহার পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রান্তিতে উসুল করিতে ছাড়িবে না ত! আর তিনি কি চিরদিনই এমন গোয়েন্দাগিরি করিয়াই কাটাইবেন! পূর্ব্বে তাহা বেমানান ছিল না—এখন যে মাঝখানে বৌ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভাল দেখায় না। এখন কোন কথা বলিতে গেলে বৌয়ের গায়ে ঠেশ লাগিবে! তিনি মা, কাজেই তাঁহাকে এখন নিরুপায়ে চুপ করিয়া চোখেই শুধু সব দেখিয়া যাইতে হয়—অস্বস্তি ধরে, গা নিষপিষ করে, তবু কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলা চলে না! ছেলে পাছে ভাবে, বৌয়ের উপরই বুঝি মার যত-কিছু আক্রোশ!

দুপুরবেলা সুবোধ আপনার উপরের ঘরেই চোখের সম্মুখে মার্টিনো খুলিয়া খাটে শুইয়া ছিল। নীতিবিজ্ঞানের বড় বড় উপদেশগুলা মনে ঢুকিবার দিকে যখন কোন স্পৃহা দেখাইতেছিল না, তখন ফুলি আসিয়া ডাকিল, "দাদা—"

সুবোধ বই মুড়িয়া কহিল, "কি ফুলি, —আয়। ইস্, তুই যে বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্ রে। কোন অসুখ করেছিল?"

ফুলি কহিল, "না।"

সুবোধ এই ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিল। সে জানিত, ফুলি এ ঘরে আসিবেই। তাই সে আহার সারিয়া আজ আর বাহিরে যায় নাই, একেবারে উপরের ঘরে উঠিয়াছিল।

ফুলি কহিল, "বৌদির খপর কি, দাদা? চিঠিপত্র লেখে?"

সুবোধ হতাশের হাসি হাসিয়া বলিল, "লেখাপড়া কি জানে যে লিখবে!" তারপর সুবোধ একেবারেই আপনার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা পাড়িয়া বসিল। স্ত্রী বাপের বাড়ীতে আছে, ইহাতে কিছু আসিয়া-যায় না; কিন্তু লেখাপড়া শিখিবার পক্ষে এই যে তাহার যোগ্য কোমল বয়সটুকু ঔদাস্যে অবহেলায় কাটিয়া যাইতেছে, ইহার উপায় কি হইবে! বেশী বয়সে লেখাপড়া শেখা কি সহজ ব্যাপার—বিশেষ যাহাকে বানান মুখস্থ করিয়া পড়িতে হইবে! সে স্পষ্টই বলিল, এখনও যদি চেষ্টা করা যায় ত পরির কিছু আশা আছে, কিন্তু সেখানে বই খুলিলে বিষম গোল বাধিবার আশঙ্কা! আর দুই-এক বছর পরে তাহাকেও কাজের মধ্যে বিব্রত থাকিতে হইবে, তখন পড়াইবার বা পড়িবার কাহারও অবসর মিলিবে না! সুতরাং পরি যে মূর্খ, সেই মূর্খই রহিয়া যাইবে এবং তাহারও ভবিষ্যৎ একেবারে শোচনীয়। এই ভবিষ্যতের

ভাবনায় তাহার নিজের জীবনটাও বুঝি বা একদম বিফল হইয়া যায়!

ফুলি কহিল, "তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? যদি পাশ করতে না পারো, তাহলে আমাদের দুই বোনের আর মুখ থাকবে না কিন্তু। জানই ত, মার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না।"

রোগীর মুখের হাসির মতই সুবোধ ম্লান হাসি হাসিল, কহিল, "সে এক রকম হচ্ছে, মন্দ নয়। মোদ্দা তুই এখানে কদ্দিন আছিস্ এবার?"

"বোধ হয়, মাস দুয়েক থাকতে পাব। ফাল্গুনের শেষে আমার শাশুড়ী তীর্থ থেকে ফিরে আমাকে নিয়ে যাবেন।"

"তাহলে—" কি, তাহলে? কথাটা সুবোধের মুখে বাধিয়া গেল। ফুলি বুঝিয়া লইল। সে কহিল, "বৌদিকে আনাব, মাকে বলে? দিদিও নেই, না হলে একলাটি এ একমাস থাকি কি করে! বৌদি এলে তবু একজন সঙ্গী পাব। কিন্তু তোমায় একটা কথা দিতে হবে, এবার পাশ করবে তুমি, বল, আর বৌদির সঙ্গে দিনের বেলায় মোটে দেখা-শোনা হবে না।"

সুবোধ অবাক হইয়া ফুলির পানে চাহিল। সেও এমন কঠিন কথা কয়! ফুলি দাদার ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, "তা বলে মোটেই কি দিনের বেলা দেখা হবে না, তা নয়। তবে এগজামিনের আগে খুব কম, সে—কচিৎ! কি বল?"

সুবোধ তখন মরিয়া হইয়া ভগ্নীকে বুঝাইল, এই যে বাঙ্গালীর দাম্পত্য জীবনে এত দুঃখ—এতটুকু কাব্য নাই, সরসতা নাই—এ শুধু এই বর্ব্বর প্রথার ফলেই! কেন, স্ত্রীর সহিত দিনের বেলায় দেখা হইলে কি এমন অপরাধ হয়! সেই কখন্—রাত্রে সকলে শয়ন করিলে নিভৃত অবসরে মুখর নূপুর খুলিয়া ফেলিয়া স্ত্রী নিতান্তই নীরব গতিতে স্বামি-সম্ভাষণে আসিবে! এ প্রথা যে নেহাৎ কুৎসিত, অত্যন্ত বর্ব্বর, সমস্ত নারীজাতির প্রতি দারুণ অসম্মান যে এই প্রথায় স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, তাহারও ইঙ্গিত দিতে সে ছাড়িল না। রাত্রে উভয়ের কতটুকু পরিচয়ের সম্ভাবনা! সংসারের সহিত সারা দিন সংগ্রাম করিয়া দুখানি হৃদয় যখন একান্ত শ্রান্ত, বিশ্রামের কোলে মাথা রাখিবার জন্য ব্যাকুল, তখন তাহারা আপনাদের স্ফুটনোন্মুখী সাধ-আশার কতটুকু পরিচয় পরস্পরকে দিতে পারে! সে ক্ষুদ্র অবসরে কতটুকুই বা সম্ভব হয়! ইহারই ফলে এক সংসারে বাস করিয়াও দুইটি প্রাণী চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক থাকে, সহানুভূতির এক তারে হৃদয় দুটি বাঁধা পড়ে না, প্রাণের পরিচয়ও চির-অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়! কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনে বাঙ্গালীর অশান্তির আর সীমা থাকে না।

এই দীর্ঘ বক্তৃতায় দাদার মনের সবটুকুই ফুলির চোখে পড়িয়া গেল। অহরহ এক তীব্র ব্যাকুলতায় দাদা যে ছট্‌ফট করিতেছে, তাহা সে বুঝিল! ইহাও বুঝিল, দূরে থাকিয়া দাদার মনের দ্বারে বৌদি এমন ঠাঁইজোড়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছে যে বেচারা মার্টিনো-সেক্সপীয়র মনের মধ্যে ঢুকিতে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে ইঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া পলাইয়া যায়! দাদার পাশের জন্য তাহার ভাবনা হইল.

নৈরাশ্যে দুঃখও যে না হইল, এমন নয়!

কিন্তু তাহার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ! কাব্যটুকুও তাহার জীবনে এতদিনে থিতাইতে পারিয়াছে। জীবনের গন্ত ও পন্ত—দুইটা দিকই সে এখন বুঝিত ভাল। তাই সে মাকে ধরিয়া ফাল্গুনের প্রথমেই বৌদিকে আনাইয়া ফেলিল। সুবোধ পূর্ব্বাহ্নেই একখানি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ সংগ্রহ করিয়াছিল।

বহির্জগৎ তখন হিম-জর্জ্জর শীতের শেষে নব বসন্তের অপরূপ শ্যামশোভায় ভরিয়া উঠিতেছে। পাখীর গানে, ফুলের গন্ধে, নবপল্লবের চিক্কণ বর্ণে চারিধার উজ্জ্বল। সুবোধের হৃদয়-রাজ্যেও নব বসন্ত দেখা দিল। রঙীন ফুলে প্রাণটা রাঙিয়া উঠিল, রাজ্যের কোকিল-শ্যামা সেখানে গান ধরিল। দ্বিতীয়ভাগের ঐক্য-বাক্য-মাণিক্যের বানানগুলাতেও প্রতি রাত্রে অজস্র হীরা-মাণিক্য ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চারিদিকে ফাল্গুন জাগিল!

সারাদিন গারদের কয়েদীর মতই বড় বড় বইয়ের আড়ালে হাঁপাইয়া মরিতে হয়—কিন্তু সে কষ্ট কষ্ট বলিয়া তাহার মনেও হয় না। কারণ এই দীর্ঘ গন্তময় দিনের পর যে রাত্রি আসে, তাহা পন্তের মিলে ভরা! যেমন বিচিত্র সে পন্তের ছন্দ, তেমনই মধুর তাহার ভাব!

কিন্তু দুই নৌকায় যাহারা পা দিয়া চলে, তাহাদের যেমন তলাইয়া যাইতে বিলম্ব হয় না—সুবোধেরও সেই দশা ঘটিল। গন্ত ও পন্তের মাঝে পড়িয়া সেও একদিন তলাইয়া গেল, অর্থাৎ সেবার বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গেজেটে সুবোধের নামটা কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফেলের খবরে বোনেরা দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিল, শ্বশুর সান্ত্বনা দিলেন, আশা দিলেন; মা কিন্তু ভাল-মন্দ কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার এই মৌন তিরস্কার সুবোধের গায়ে কাঁটার মত বিঁধিল। ইহার চেয়ে মা যদি কতকগুলা রূঢ় ভর্ৎসনা করিতেন, তাহা হইলে তাহার নিজের মনের সঙ্গে সে একটা বোঝা-পড়া শেষ করিয়া ফেলিতে পারিত। বৃষ্টি ও ঝড় প্রচণ্ড হইলেও সহ্য যায়, গুমট একেবারেই অসহ্য!

যেদিন ফেলের খবর আসিল, সে-রাত্রে যথাসময়ে শয়নকক্ষে ঢুকিয়া সুবোধ দেখে, পরি বালিশে মুখ গুঁজিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সে নিতান্ত অপরাধীর মত তাহার কাছে গিয়া বসিল, ও গলাটাকে যথাসম্ভব কাঁপাইয়া ডাকিল, "পরি—"

পরি মুখ তুলিয়া কহিল, "যাও, কেন তুমি ফেল হলে?" পরি কাঁদিয়া ফেলিল।

এত দুঃখেও সুবোধের হাসি পাইল। সে কহিল, "ইচ্ছে করে ফেল হই নি।"

"তবে কেন হলে?"

এ কেন'র জবাব দেওয়া কঠিন। সুবোধ কহিল, "যাক্, যা হয়ে গেছে, তা

নিয়ে ভেবে আর কি হবে? এখন তোমার বই আর খাতা নিয়ে এসো।"

পরি আঁচলে চোখ মুছিয়া অভিমানের সুরে বলিল, "না, আমি কখ্‌খনো পড়ব না, কখ্‌খনো না—যতদিন না তুমি পাশ কর।"

সুবোধ কহিল, "সে ত এখন পূরো এক বছরের কথা। এই এক বচ্ছর তুমি বই খুলবে না, মোটে?"

"না।"

এ 'না'র অর্থ সুবোধ বুঝিত। পরি একবার যেটাতে 'না' বলিত, সেটাতে তাহাকে 'হাঁ' বলানো বড় কঠিন। সুবোধ ভাবিল, এই সুদৃঢ় 'না'র পিছনে নিশ্চয় আর কাহারও নেপথ্য-ইঙ্গিত আছে! সে কহিল, "মা কি বললে?"

পরি কহিল, "কিছু না। ও বাড়ীর গিন্নি বলছিল, তাই ত অমুক ফেল হল! তা মা বললেন, তিনি ত আর পড়া গিলিয়ে দিতে পারেন না। এখন ও বড় হয়েছে, যা ভাল বুঝবে, তাই করবে!"

"হুঁ—" বলিয়া সুবোধ বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। পরি কহিল, "কি ভাবছ?"

সুবোধ কহিল, "আমি ফেল হয়েছি বলে আমার উপর তোমাদের খুব ঘৃণা হয়েছে, না?"

পরি এই ঘৃণা কথার অর্থটা ঠিক আয়ত্ত করিতে পারিল না, তাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিরুত্তরেই স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

সুবোধ কহিল, "বল—"

পরি বলিল, "আমার মনে বড্ড কষ্ট হয়েছে। শুনেছি, ঠাকুর জামাইয়েরা কখনও ফেল হন্‌নি। আর তুমি ফেল হলে!"

সুবোধ কহিল, "আমি একা নই, আমার মত আরও ঢের হতভাগা ফেল হয়েছে।"

পরি এমন ভঙ্গীতে সুবোধের দিকে চাহিল যে সুবোধের মনে হইল, কথাটা পরি বিশ্বাস করে নাই! পরি স্বরে একটু ঝাঁজ দিয়া বলিল, "আমায় পড়বার জন্যে বকো—নিজে ত এই পড়া করতে পার না।"

কথার হুলটা সুবোধের বুকে বিঁধিল। ঘরে ঢুকিয়া পরির চোখে জল দেখিয়া সে অনেকখানি আনন্দ পাইয়াছিল—এমন প্রাণ-ভরা সমবেদনা ঘরের কোণে সঞ্চিত থাকিলে হাজার বার সে পরীক্ষায় ফেল হইতে পারে—কোন দুঃখ নাই! ফেল হইয়া সে ভাবিয়াছিল, রাত্রে আজ আপনার নিভৃত গৃহের কোণটিতে করুণ রসের দিব্য অভিনয় জমাইয়া তুলিবে। পরির চোখের জল তাহার আভাষও বেশ দিয়াছিল! কিন্তু এই শ্লেষ—তাহার অক্ষমতায় এই বিদ্রূপ! না, অশ্রুটা তবে কপট,—তাহার কোন মূল্যই নাই! হায়!

ইতিমধ্যে ফুলি একদিন বেড়াইতে আসিয়া দাদাকে গোপনে বলিল, এবার ভাল করিয়া পড়িয়া তাহাকে পাশ করিতেই হইবে। ঘরে-বাহিরে সকলে বধূকেই নিন্দা করিতেছে—এতদিন তবু সে যা-হোক ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া পাশ করিয়া আসিতেছিল, আর যেই বৌ আসিল—

সুবোধ ফোঁস করিয়া উঠিল, "লোকের এ অন্যায়। বৌ ত আর আমার বই কেড়ে রাখেনি!"

ফুলি কহিল, "মা বলছিল, মা আর

কোন কথায় থাকবে না। লেখাপড়ার সম্বন্ধে কিছু বলবেও না।"

সুবোধ স্থির করিল, আর সে অন্দরে ঢুকিবে না, পরির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করিবে না—এবং এই সকল কঠোরতা অবলম্বন করিয়া আবার ফেল হইয়া দেখাইবে যে বধূর সহিত এ ব্যাপারের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই! পরমুহূর্ত্তেই আবার তাহার মনে হইল, ফেল হইয়া ফল কি! কেহ ত তাহার দুঃখে সহানুভূতি জানাইবে না। ঘৃণায় লজ্জায় নিজেই সে মাটি হইতে থাকিবে! তাহার চেয়ে—বেশ, শুধু সে বই লইয়াই একটা বৎসর পড়িয়া থাকিবে, বউয়ের ত্রিসীমা মাড়াইবে না। ফুলি কহিল, "এবার ভাল করে পড়বে ত?"

সুবোধ কহিল, "এবার পাশ করবই। না পারি, সংসার ত্যাগ করব।" এই সব বৈরাগ্যের বক্তৃতা ফুলির যেন বিষ বোধ হইত। সে আর-কিছু না বলিয়া বৌদিকে কি-কতকগুলা উপদেশ দিতে চলিয়া গেল।

সুবোধ কঠোর হইল। জীবনটা শুধুই গদ্য, যতিহীন, ছন্দহীন গদ্য! এই গদ্যের চাপেই সে আপনার প্রাণের পদ্যটুকুকে পিষিয়া চূর্ণ করিবে। এই পাশের ফাঁস লাগাইয়া জীবনের যা-কিছু মাধুরী সব সে হত্যা করিবে!

সে রুটিনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিল। পড়া,—আর পড়া! সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার শুধু গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হয়—রাত্রে সকলে শয়ন করিলে যখন সে বই মুড়িয়া শয্যায় আসিয়া আশ্রয় লয়, তখন পরি নিদ্রায় অচেতন! বাতাসে তাহার সুন্দর মুখে অলকগুচ্ছ উড়িয়া পড়ে, কখনো বা জ্যোৎস্না মাখিয়া সে মুখ অপূর্ব্ব রমণীয় দেখায়, সুবোধ নির্নিমেষ নেত্রে সে শোভা নিরীক্ষণ করে। তাহার বুকের মধ্যে চঞ্চল রক্তস্রোত তোলপাড় করিতে থাকে, কিন্তু সজোরে আপনার মনকে চাবকাইয়া সে এই দুর্ব্বলতাটুকুকে তাড়াইয়া দিয়া একেবারে অন্য দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে ক্ষোভে তাহার সারা চিত্ত টনটন্ করিয়া উঠে। তাহার এই মৌন অভিমান পরির চিত্তে এতটুকু চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করে না! সাধিয়া সে নিজে কোনদিন সোহাগ করিতে আসে না! তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছে! হায়রে, এত বড় দুঃখ সংসারে থাকিয়া কে কবে সহ্য করিয়াছে!

তবুও থাকিয়া থাকিয়া তাহার দুর্ব্বল মন কাঁপিয়া উঠে! মাঠে বেড়াইতে গিয়া যখন সে দেখে, ইংরাজ প্রেমিক-প্রেমিকা হাতে-হাতে মালা গাঁথিয়া প্রাণে অপরূপ কাব্য ফুটাইয়া ধীর-মন্দ গমনে বেড়াইতেছে, তখন আপনার দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া সে আগুন হইয়া উঠে। সব থাকিয়াও তাহার কিছুই নাই! আহা, ইহাদেরই জন্ম সার্থক—জীবনের মূল্য ইহারাই শুধু বুঝিয়াছে! আর অধম বাঙ্গালী তরুণ বয়স হইতেই কাব্যের পুষ্পময় পথটাকে দূরে রাখিয়া ভীষণ গদ্যের পথে জীবনটাকে ছিঁচড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে!

সেদিন মন তাহার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল! মাঠে বন্ধু সুরেশের সঙ্গে দেখা

হইল। স্ত্রীকে লইয়া মাঠে সে প্রায়ই বেড়াইতে আসে। জ্যোৎস্নায় চারিধার যখন ভরিয়া যায়, দুইজনে তখন একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়ে—স্ত্রী বনলতা মৃদু কণ্ঠে প্রেমের গান গায়—আর তাহারই কোলে শ্রান্ত শির রাখিয়া সুরেশ স্বপ্নলোকে উধাও হইয়া যায়! স্ত্রীকে লইয়া এই বয়সে এ কাব্যটুকু যদি উপভোগ করা না গেল ত এ বয়স, আর এ শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল কেন!

ঠিক! সুবোধ ভাবিল, একদিন ছুটি চাই, একদিন ছুটি। পড়ার চাপে প্রাণটা যে গুঁড়াইয়া ধূলা হইয়া গেল! সে স্থির করিল, পরিকে বলিয়া-কহিয়া রাজী করাইয়া একদিন সে মাঠে আনিয়া জীবনকাব্যটুকু পরিপূর্ণ উপভোগ করিবে। পরিকে সে স্পষ্টই বলিবে, একটা দিন শুধু আমার পানে ফিরিয়া চাও। তারপর আবার আমি কেতাবের গহন-বনে ব্রহ্মচারী সাজিয়া প্রবেশ করিব! যদি পরি এ কথা না রাখে, তাহা হইলে? তাহা হইলে সে এমন উৎকট প্রতিশোধ লইবে যে সারা বিশ্ব তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে!

বাড়ী আসিয়া সুবোধ দেখিল, চাঁদের আলোয় নীচের দালান ভরিয়া গিয়াছে আর দালানের একধারে বসিয়া জ্যোৎস্না-টুকুকে উপহাস করিয়াই পরি আনাজ কুটিতেছে! মা তাহার পদশব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "ওরে তুই ত পড়াশোনা এখন বেশ করছিস্—আমার চৌকিদারির আর দরকার নেই। বেশ, এমনি করে পড়্ দেখি। তা শোন্, ও বাড়ীর ওঁরা এই জন্মাষ্টমীতে জগন্নাথ দেখতে যাচ্ছেন। আমিও যাই ওঁদের সঙ্গে,—কি বলিস?"

সুবোধ ভাবিল, বাঃ, চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে ত! প্রথমে একটু অনুযোগের সুর তুলিয়া মাকে সতর্কতার উপদেশ দিয়া সহজেই সে রাজী হইয়া গেল। মা খুসী হইয়া বলিলেন, "এখানকার সব গোছ-গাছ আমি করে রেখে যাচ্ছি। বৌমা শুধু ভাঁড়ার বের করে দেবে, তরকারীগুলো কুটে দেবে—বামনীই সব দেখে-শুনে নেবে'খন। কোন কষ্ট হবে না। আমি তিন দিনের মধ্যেই ফিরব। কাল রাত্রের গাড়ীতে যাব—তা কাল হল শনিবার—আবার সোমবার রাত্রে বেরিয়ে মঙ্গলবার সকালে এখানে এসে পৌঁছুব। কোন ভাবনা নেই।"

মা চলিয়া গেলে পরিকে নিজের মতে আনিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না। সুবোধ বুঝাইল, একটা দিন শুধু সে ছুটি চায়! ইহার পর পড়ায় মনটাকে আরও বেশী করিয়া সে লাগাইতে পারিবে। পরি বই ছাড়িয়া বাঁচিয়া ছিল, তাহাকে যে আবার ঘুম-চোখে দ্বিতীয় ভাগের বানান মুখস্থ করিতে হইবে না, ইহাতে সে বর্ত্তাইয়া গেল। এ প্রস্তাবে সে রাজী হইল।

রাত্রি দশটার সময় বাড়ীর সকলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শয্যায় ঢুকিলে সুবোধ চুপি চুপি যাইয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিল। বাড়ীর একটু দূরে গাড়ী রাখিয়া সে পরির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। গাড়ী সদর্পে গড়ের মাঠের দিকে ছুটিল।

গাড়ীতে বসিয়া মাঠ • প্রদক্ষিণ করিয়া

পরে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে গাড়ী রাখিয়া সুবোধ পরিকে লইয়া মাঠে চলিল। গভীর রাত্রি! কোথাও কেহ নাই, তবুও পরির পা জড়াইয়া যাইতেছিল। মুখের ঘোমটা দীর্ঘভাবে টানিয়া সুবোধের হাত ধরিয়া সে একরকম ঝুলিয়াই মাঠে চলিল। সুবোধের বুকের মধ্যে কে যেন ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া মুগুরের ঘা মারিতেছিল। গাড়ী হইতে দূরে আসিয়া গাটাও একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল।

উভয়ে একখানা বেঞ্চে আসিয়া বসিল। চারিধারে বড় বড় গাছ ছায়া-নিবিড় কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। পাতায়-ঘন শাখায় দুই একটা পাখী তখনও ঝট্-পট্ শব্দ করিতে-ছিল। সুবোধ কহিল, "মাঠের মধ্যে আবার এতখানি ঘোমটা দিলে কেন? কে আছে এখানে? ছি!"

পরি কহিল, "না বাবু, আমার ভয় কচ্ছে। এ কোথায় এসে বসলে! তার চেয়ে গাড়ী করে বেড়ালেই ত চল্‌ত! চল, বাড়ী যাই।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "বাঃ, আমি রয়েছি, ভয় কি!"

কিন্তু সুবোধেরও যে একটুও ভয় হয় নাই, এমন নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে সে "বাবু" প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিল, তাই সে ভাবিতেছিল, হঠাৎ যদি একটা মাতাল গোরা কোন দিক হইতে আসিয়া পড়ে! ঐ ত কেল্লা! পথ হইতে এতটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে! তাই ত! ডাক দিলে কেহ সাড়াও পাইবে না যে! এই রাত্রে এত দূরে আসিয়া বসাটা ঠিক হয় নাই। স্তব্ধ বিজন মাঠ! তাহার উপর আকাশে চাঁদ নাই—খণ্ড মেঘগুলা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। সুদূর পথ হইতে গ্যাসের আলোগুলা শুধু ঈষৎ সঙ্কোচে চোখ মেলিয়া এই তরুণ বাঙালী দম্পতীর অপূর্ব্ব প্রেমলীলার অভিনয় দেখিতেছে!

সুবোধ পরির হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "এসো, একটু বেড়াই।" পরির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, ভয়ে জিভ শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহার মুখে কোন কথা সরিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দূরে বির্জ্জিতলার গির্জ্জার ঘড়িতে ঢঙ্ করিয়া একটা বাজিল। সুবোধ কহিল, "একটা! এস তবে, গাড়ীতে উঠি।"

পথের ধারে আসিয়া গাড়ীর দেখা মিলিল না। সুবোধের রাগ হইল। ষ্ট্যাণ্ডেও আর গাড়ী নাই! সে তখন প্রমাদ গণিল। তাই ত, উপায়? হাঁ, এক উপায় আছে! ধর্ম্মতলার দিকে অগ্রসর হইলে গাড়ী মিলিতে পারে। সুবোধ তখন পরিকে লইয়া ধর্ম্মতলায় চলিল।

মিউজিয়মের সম্মুখে এক বিপদ ঘটিল। পুলিশের এক জমাদার আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কে তাহারা—এত রাত্রে মাঠের ধার দিয়া কোথায় চলিয়াছে? কৈফিয়ৎ চাই! জমাদারের কঠোর স্বরে পরি ভয়ে কাপড়ের আবরণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। সুবোধ কম্পিত কণ্ঠে পরিচয় দিল—এবং এ পথে আসিবার উদ্দেশ্যও কতক বাদ-সাদ দিয়া খুলিয়া বলিল।

পাকা লোক বলিয়া জমাদারের মনে একটা অহঙ্কার ছিল। সে হাসিয়া বলিল,

স্ত্রীকে লইয়া কোন বাঙালী ভদ্রলোককে এত রাত্রে মাঠে বেড়াইতে—এত বছর সে পুলিশে চাকরি করিতেছে—কখনও চক্ষে দেখে নাই। সে স্পষ্টই বলিল, তাহার সন্দেহ হইয়াছে; এবং উভয়কেই সে থানায় লইয়া যাইবে!

ভূমিকম্পের বেগে পৃথিবীখানা দুলিয়া উঠিল। থানায় যাইতে হইবে? কেন! সে কি চোর না বদমায়েস! জমাদার হাসিয়া বলিল, এত রাত্রে স্ত্রীকে কাপড়ে মুড়িয়া পথে হাওয়া খাইয়া বেড়ানোর কেশ সে আরও দুই-চারিটা ধরিয়াছে। তাহার চোখে ধূলা দেওয়া সহজ নহে। যে-সব বাবু স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, তাহারা এত রাত্রি অবধি মাঠে থাকে না, তাহাদের স্ত্রীর পায়ে জুতা থাকে এবং এতখানি আবরণেরও তাহাদের প্রয়োজন হয় না! এ জ্ঞানটুকু খোট্টা হইলেও চাকরির কল্যাণে তাহার বিলক্ষণ আছে।

সুবোধ জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, এক চড়ে এই বর্ব্বরটার দাঁতের পাটি সে উড়াইয়া দেয়! তাহার এ কুৎসিত সন্দেহেরও তাহা হইলে সমুচিত শাস্তি হয়! কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। সঙ্গে পরি আছে—এখনই তাহা হইলে একটা হুলস্থূল বাধিবে—আর কাল বাঙ্লা খবরের কাগজে টী-টী পড়িয়া যাইবে। থানা-গারদ-আদালতের ভীষণ ছবিও চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। তবে এ বিপদে সুবোধ একেবারে যে ধৈর্য্য হারাইল না, তাহার প্রধান কারণ, জমাদারটা কথা বলিতেছিল হিন্দীতে—পরি সে ভাষা মোটেই বোঝে না।

সুবোধ জমাদারকে কহিল, "বেশ, সন্দেহ হয়, আমার বাড়ীতে এস, তদন্ত কর।"

জমাদার কহিল, থানায় গিয়া আগে কেশ্ লিখাইতে হইবে, পরে কোন ইন্‌স্পেক্টর হুকুম দিলে তদন্ত হইবে। রাত্রি বারোটার পর যে সব কেশ ধরা পড়ে, তাহার রিপোর্ট একদিন পরে করিতে হয়। সুতরাং তদন্তের তেমন জরুরি প্রয়োজন নাই!

এমন সময় "ক্যা হুয়া" বলিয়া এক সাহেব ইন্‌স্পেক্টর সেই স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। জমাদার তাহার সন্দেহের কথা খুলিয়া বলিল। সুবোধও সাফাই দিল, সে ভদ্রলোক, স্ত্রীকে লইয়া মাঠে বেড়াইতে আসিয়াছিল—স্ত্রী পর্দ্দানশীন, পথ জনহীন না হইলে মাঠে আসিতে চাহে না—তাই এত রাত্রি হইয়াছে। গাড়ী করিয়াই সে আসিয়াছিল। এখন গাড়োয়ান ফেরার, কাজেই এ দুর্দ্দশা! ইন্‌স্পেক্টর একটা চকিত দৃষ্টিতে সুবোধের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইল, ও জমাদারকে গাড়ী আনিবার আদেশ দিয়া সুবোধকে বলিল, আপনার ভয় নাই! আমি এখান হইতে এখনই আপনার বাড়ীতে যাইব—থানায় যাইতে হইবে না। যদি সন্তোষজনক প্রমাণ পাই, তাহা হইলে কোন গোলযোগেরই আশঙ্কা নাই! পরে বস্ত্রাবৃতা পরির পানেও মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া কহিল, I see, you are a gentleman, and the lady, oh, she is a decent lady. I do not suspect her.

জমাদার দুই পা আগাইয়া যাইতেই এক চলন্ত গাড়ীর দেখা পাইল। তখনই সে তাহাকে দাঁড় করাইল। গাড়োয়ান কহিল,

সে এক বাবুকে লইয়া মাঠে আসিয়াছে; পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে সে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় দুইটা মাতাল সাহেব আসিয়া জোর করিয়া তাহার গাড়ীতে সওয়ারি হইয়া বেলগেছিয়া অবধি তাহাকে দৌড় করাইয়াছে, ভাড়াও দেয় নাই। কে জানে, বাবু এখন মাঠে আছেন কি না!

জমাদার তাহাকে ছাড়িল না—টানিয়া ইন্‌স্পেক্টরের কাছে আনিল।

সুবোধ ও পরিকে দেখিয়া গাড়োয়ান তখনই চিনিতে পারিল; কহিল, "এই সে বাবু—"

গোলটা তখন সহজেই মিটিয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সুবোধের কাছে মাপ চাহিয়া, লেডির কাছে মাপ চাহিয়া জমাদারকে ভৎর্সনা করিল। আরও বলিল, পুলিশের এই সন্দেহ করা রোগটুকু কত সময় যে নিরীহ ভদ্রলোককে বিপন্ন করিয়া তুলে, তাহার আর ঠিকানা নাই। তবে উপায়ও নাই। মেষের চর্ম্ম গায়ে দিয়া সমাজের পথে বিস্তর হিংস্র পশুও দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের জন্যই না এতখানি সতর্কতা! কাজেই পুলিশের সন্দেহ-রোগও সারিতে পারে না। জমাদারের আর দোষ কি? তবে ভাগ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই এত সহজে সব মিটিয়া গেল। নহিলে থানা অবধি বাবুর টান পড়িত। সঙ্গিনীটি যে বাবুর বিবাহিতা স্ত্রী, পুলিশে তাহার দস্তুরমত প্রমাণ দিতে হইত! যদিও ইহাতে ভয়ের কিছু ছিল না, কারণ হীরা চিরদিনই হীরা—তবে দুঃখ শুধু এই যে এই 'লেডি' কি মনে করিলেন! যাহা হোক বাবু, All's well that [illegible] ell.

সাহেবের [illegible] করিয়া সুবোধ গাড়ীতে উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গাড়ী ছাড়িলে পরিও মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ গা, ওরা পুলিশের লোক বুঝি? খুব ভাল ত! নিজে থেকে গাড়ী করে দিলে। কিন্তু যাই বল, আর কখনও আমি তোমার সঙ্গে রাত্রে বেরুচ্ছি না বাবু, এত লোকের সামনে বে-আব্রু, ছি!'

সুবোধ কোন কথা কহিল না। স্ত্রীর নির্ব্বুদ্ধিতায় এই প্রথম সে খুসী হইল। তাহার মনে হইল, ভাগ্যে পরি কথাগুলা কিছুই বোঝে নাই। বুঝিলে ঐ মাঠের মধ্যেই ধড়াস্ করিয়া সে হয়ত অজ্ঞান হইয়া পড়িত! তাহা হইলে কি বিপদই না ঘটিত! ওঃ, ভগবান খুব রক্ষা করিয়াছেন! কিন্তু সান্ত্বনা সে যতই পাক্, একটা নির্ম্মম সত্যের আঘাত সেই সঙ্গে তাহার বুকে তীক্ষ্ণ ছুরির মতই বিঁধিতেছিল, 'কাব্যং সুছন্দ ভং লোকে—' হায়রে, জগতে শুধু গল্প, ভীষণ গল্পই গদা উচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বেচারী পদ্য ঐ কেতাবের পাতার আড়ালটিতেই কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মিলন-কথা

আজ "ভারতী" চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। সেই "ভারতী",—যাহার সংশ্রবে আমার জীবনের একটী অধ্যায় ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। তাহার কথা আজি বড় মনে পড়িতেছে, তাই সে পুরানো কাহিনী আজি কিছু বলিব। "ভারতী" উপলক্ষে কিরূপে আমাদের দুইটী হৃদয় এক হইয়া যায়; কিরূপে একটী চির-রক্ষণশীল একান্ন-বর্ত্তী হিন্দু পরিবারের অভেদ্য দুর্গ-প্রাকারে আমাদের মিলন-মঙ্গল-পতাকা উড্ডীন হয়; তাহা আজ ভারতীর চল্লিশ বৎসর উপলক্ষে ভারতীর নবীন সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায্য প্রাপ্য-বোধে উপহার দিতেছি।

সেকালের কথার অবতারণা করিতে হইলে, ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধূলার হাত এড়ানো যায় না, তেমনি নিজকে বাদ দেওয়া যায় না; সে প্রসঙ্গ আগেই আসিয়া পড়ে। সেকালের সাহিত্যের ইতিহাস এবং কোন্ সময় হইতে ও কত বয়সে ভারতীর সহিত আমার পরিচয় হয় তাহা বলা কর্ত্তব্য। মনে পড়ে, সন ১২৭৯ সালে আমার প্রথম গ্রন্থ "কবিতা-হার" বাহির হয়; ১২৮০ জ্যৈষ্ঠের "বঙ্গদর্শনে" উহার সমালোচনা বাহির হয়; তখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। তখন "বঙ্গদর্শনে"র কাল। পরে পরে "আর্য্যদর্শন" "হিন্দুদর্শন" "জ্ঞানাঙ্কুর" "মধ্যস্থ" প্রভৃতি কতই প্রচার হয়; সে সকল কিছুদিন সাহিত্য-গগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া, একে একে সকলেই অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু "ভারতী"র সম্পাদকদ্বয় ঠিক বলিয়াছেন, ভারতী কখনও পিছনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে নাই, কাজেই "ভারতী" চির-নবীন। তৎকালে প্রচলিত পত্রিকাবলীর মধ্যে ভারতীর বিশেষত্বই তাই। ভারতীর অগ্রজ-অগ্রজা অবশ্য অনেকই ছিল—"কত এল গেল চলে সে"। তন্মধ্যে বামাবোধিনী দীর্ঘজীবিনী। তত্ত্ববোধিনী এক বাড়ীর ও "ভারতী"র দিদি হইলেও একেবারেই স্বতন্ত্র; ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা; তাহা সকলেই জানেন। সচিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" তখনকার সাহিত্যিক-গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। এইখানে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন, ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদিকার কোমল করে বলয়ের মিষ্ট-মধুর আহ্বান-ধ্বনিই চির মুখরিত হইত, কখনও সে হস্ত সমালোচনার কঠোর আঘাতে নবীন লেখকের উদ্যম ভঙ্গ করে নাই। বলিতে কি এখনকার অনেক প্রথিতযশা লেখকদের তিনিই গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই মনে হয় আজি তাঁহার বিশ্রাম-বাসরে তাঁহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার প্রসূনাঞ্জলি তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য। মনে আছে, ভারতী প্রকাশিত হইলে সে সময়ে ভারতীর ভাষাকে অনেকে 'ঠাকুরি' ভাষা বলিয়া উল্লেখ করেন। রুচি-বৈচিত্র্য যেমন চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে, তাহা দোষের নহে; সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও তেমনি; তাহাও উপেক্ষার নয়। সত্য বলিতে কি আমার 'গদগদনদেগোদাবরী বারয়োঃ,' যেমন ভাল

লাগে, আবার ঠাকুরমার মুখে শ্রুত 'টুপুর টাপুর বৃষ্টি পড়ে নদী এলো বান' ইহাও তেমনি ভাল লাগে; আবার চাষা বৌয়ের মুখে "ঝরোকায় গলা বেড়িয়ে ডেঁড়িয়ে ছ্যালো' এও তেমনি মিষ্ট লাগে। মূল কথা, যেখানে যেমন, সেখানে তেমনটি হইলেই শোভন, সুন্দর হয়"।

এইবার ভারতী-সংশ্রবে কিরূপে আমাদের মিলন সংঘটিত হয়, তাহাই বলিব। প্রথম যেদিন স্বামী আসিয়া বলিলেন, "আজ একটী নূতন খবর দিব। তোমাদেরই স্বজাতীয়া একজন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা হইলেন। তুমি ত পারিলে না।" (ইহা বলিবার অর্থ, তিনি আমাকে সংবাদ-প্রভাকর অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রে ধারাবাহিকরূপে লিখিতে অনুরোধ করেন।) সেই দিন আনন্দ-কৌতূহলের মধ্য দিয়া নবীনা সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রবল হয়। তার পর ঘটনাসূত্রে যেদিন তাঁহার সহিত ঈপ্সিত মিলন ঘটিল, হায়! সেদিন তিনি, যিনি আনন্দের সহিত স্ত্রী-সম্পাদিকার সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি আর ইহজগতে ছিলেন না। আমাদের বাটী চিররক্ষণশীল হইলেও স্বামী স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মিস্ তরু দত্ত ও অরু দত্তের উল্লেখ করিয়া আমাকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহেই তখন 'কবিতা-হার' 'ভারত-কুসুম' রচিত হইয়াছিল। আমার পিতৃদেবও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' ও 'দীপনির্ব্বাণ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এমন সুন্দর লিখিতে পারিয়াছেন ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। তিনি মেয়েদের বিজ্ঞান-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পড়াইয়া ছিলেন। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিতাম। মনে পড়ে, আমার সংস্কৃত অধ্যাপকের জ্যোতিষের পুঁথি কাড়িয়া রাখিতাম। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তারাই আবার (অর্থাৎ খনা প্রভৃতি) ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।" কিন্তু মেয়েদের জ্যোতিষ-শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, জ্যোতিষী নির্ব্বংশ হয়; এবং আশ্চর্য্যের কথা, তিনি বহুপুত্রক হইয়াও পরে নিঃসন্তান হইয়াছিলেন।

তারপর বহুদিন পরে, সিমুলিয়ায় আমার পিতৃভবনে সেই "পৃথিবী" ও "দীপনির্ব্বাণ" রচয়িত্রীর সহিত যেদিন আমার প্রথম চাক্ষুষ মিলন হয়, সেদিন আমার স্নেহময় পিতৃদেবও পরলোকে। অদৃষ্টের পরিহাস এমনি নিষ্ঠুর !

আমাদের মহিলা-সমাজে নূতন সৃষ্টি এই "সখি-সমিতির" প্রস্তাব ভারতীতে বাহির হয়। সেই আহ্বান-সূত্রে আমাদের প্রথম পরিচয়। আমি উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখি। লিপি-দূতীর সে কি আনাগোনা! তখনকার লিখিত পত্রের একখানির পত্রের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—"আপনি লিখিয়াছেন 'আমাদের শিক্ষা পুরুষদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁহাদের ইচ্ছা-ব্যতিরেকে আমাদের কিছুই করিবার যো নাই'। ইহা সত্য। তবে তাঁহারা কখনো আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার আবশ্যক বুঝিবেন কি না তাহা জানি না। পুরুষেরা আমাদের যতটুকু শিক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা আমরা পাইয়াছি, অর্থাৎ ধোবার বাড়ীর ফর্দ্দ মিলানো, আর কায়-ক্লেশে একখানা পত্র লিখিতে পারা। আমার মনে হইতেছে, একজন লেখক তাঁহার প্রবন্ধে শিক্ষা-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, 'বাহিরে কোম্‌টী, মিল্, স্পেন্সর লইয়া জ্বালাতন, আবার ঘরেও তাই'। ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, অধিক বলিবার আবশ্যক কি ?"

এখন যে সখি-সমিতি উপলক্ষে আমাদের মিলন হয়, তাহার কথা কিছু বলা আবশ্যক। এই সখি-সমিতি তিনি কিরূপ উৎসাহ পরিশ্রম ও যত্নে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মহিলামাত্রেই অবগত আছেন। সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রচার-কল্পেই এই মিলন-সমিতির সৃষ্টি। অসূর্য্যম্পশ্যা অবরুদ্ধা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ইহা এক বিশুদ্ধ 'নরোজা'র দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাঁহারা আর কখনো ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না! "রমণীতে বেচে রমণীতে কেনে লেগেছে রমণী রূপের হাট।"

আমার মনে আছে, বেথুনে প্রথম উদ্‌ঘাটিত শিল্প-মেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্ত্তৃক মায়ার খেলার অভিনয় হয় এবং মেয়েরা পুরুষদের মত সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করেন, সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন! মনে আছে, আমারই পার্শ্বোপবিষ্টা একটী মেয়ে বলিয়াছিলেন, "এঁরা যদি সকলে চরিত্রবতী হন, তাহা হইলে এরূপ সুচারু অভিনয়-ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসা ও বাহাদুরির বিষয়!" হায়,

হায়, যে দেশে মহিলাদের মধ্যে চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য স্ত্রীশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল, যে দেশের সতী বেহুলা ইন্দ্র সভায় নৃত্যগীত করিয়া মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, এখন কোন নারীকে কলা-কুশলা দেখিলে, সেই দেশের মহিলাদেরই এইরূপ মনে হয়!

মনে আছে, সখি-সমিতির এই প্রথম সম্পাদিকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কয় মায়ে-ঝীয়ে স্বহস্ত-নির্ম্মিত নানাবিধ বিচিত্র শিল্প-সম্ভার শিল্পমেলার প্রদর্শনীতে পাঠাইতাম। আজ সে দিনও নাই, সে উৎসাহও নাই!

তারপর যখন পত্র-ব্যবহারের মধ্য হইতে 'আপনি' 'আপনার' প্রভৃতি উঠিয়া গেল, যখন

রচয়তি শয়নং
সচকিত নয়নং

পশ্যতি তবপন্থানং-এর অবস্থা, তখন গলির ভিতর পাল্কীর শব্দ হইলেই মনে হইত—

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!

পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া কতদিন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে উভয়ে উভয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের প্রেমের অভিধানে 'আদব-কায়দা' বলিয়া কোন কথা ছিল না। আমাদের এই প্রণয়াভিসারকে শ্রীমতীর অভিসার হইতে কিছুতেই ছোট বলিতে পারি না। কতদিন আষাঢ়ের সেই ঘনঘোর, সেই মেঘ-আঁধিয়ার, সেই মৃদু বর্ষণ, সেই কনক নিকষ বিদ্যুৎ দীপ্তি আমাদের এই অভিসারকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে! বাস্তবিক টিপি টিপি মেঘান্ধকারে স্নিগ্ধ দিবস দেখিলেই উভয়ের হৃদয় যে উভয়কে চাহিত, তাহা একদিনকার একটী ঘটনায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন মেঘ-মেদুর দিবসে উভয়েই উভয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছি, শেষে পথে পথে সাক্ষাৎ।

দুঁহু লাগি দুঁহু জনে বাহিরায় পন্থ।
জনু চাঁদ লাগি ফিরে রাহু. রাহু লাগি চন্দ॥

আমরা সেকালের; সুতরাং 'পাতান' রোগের হাত এড়াইতে পারি নাই। এই মিলন-সূত্রে আমরা "মিলন" পাতাইয়াছিলাম।

তারপর আর একদিনকার কথা। তিনি তখন তাঁর পিতৃদেবের শুশ্রূষার্থে পিতৃগৃহে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি 'টডের' রাজস্থান পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বইখানি মুড়িয়া ফেলিলেন। সেদিনের কথা ভুলিবার নয়। সে কি দামিনী-চমক, কি হওয়ার দমক, কি ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জন, কি মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা দুই জনেও দারুণ গল্পে নিমগ্না হইয়া গিয়াছিলাম। কখন্ যে আমার স্খলিত-কবরী লোহার কাঁটাদুটী তাঁহার শয্যায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কিছুই টের পাই নাই! পরদিন কাঁটাদুটী সমেত এই মধুময়ী পত্রিকাখানি পাই,

"অধরে মোহন হাসি নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে!
কইরে মিলন কোথা, সে কি হেথা আছে আর?
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল-পরশ তার!
ফুলটি সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে;
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রুজল গেছে দিয়ে!

সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারা ;
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটী সে নিয়ে গেছে, ফেলে গেছে কাঁটাদুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।"

মনে পড়ে, উত্তরে লিখিয়াছিলাম—

দূর হতে কাছে আনা স্বভাব আমার।
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটি।
জগৎ রয়েছে দূরে হইতে আমার —
আনিতে পরাণে তায় করি ছুটাছুটি।
প্রেমের জগতে আমি মধ্য-আকর্ষণ ;
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ মিলন।

১৩০৩ সালে মৎ-প্রণীত 'শিখা' প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থ আমি 'মিলন'কেই উপহার দিই। তাহাতে আমাদের সুমধুর সম্বন্ধের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আজ আবার যুগান্ত পরে নূতন করিয়া ভারতীর পত্রে উপহার দিলাম।

সখি,

বদ্ধ মুকুলের মাঝে সুরভির মত
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি হৃদে করে বাস ;—
কি অভিশম্পাতে কার জানিনাক তাহা,
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।
বিরহের কারাগারে বটে বাস করে,
নিশিদিন চেয়ে তবু মিলনের পানে—
কে করে বন্ধন মুক্তি, কে ফুটাবে তারে—
নির্দ্দয় মিলন সেত শত ব্যবধানে।
কিবা দেখ যদি ফেলে সূত্র তল নাহি পাবে কুত্র
এ হৃদয় অকূল সলিলে ;
বিরহের পাশাপাশি, মগ্ন হেথা প্রেমরাশি
তন্দ্রামগ্ন গভীর অতলে ;
অর্ণব মন্থন করে পার যদি নিও তারে
পূত সেই একবিন্দু সুধা ;
কিন্তু, বিরহ গরল আছে তাই ভয় হয় পাছে
যদি তোর নাহি মিটে ক্ষুধা।

ওয়ালটেয়ারে সুদীর্ঘ প্রবাস যাপনের সময় যতদিন না তেলেগু ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, ততদিন সেখানকার লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে বিশেষ কষ্ট হইত। সেই সময়ে আমি যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, ইহাতে সহৃদয় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

ভাবিতাম ভাষার দুয়ারে হয় সদা চিত্ত-বিনিময়,
ঐ দূতী হয়ে অগ্রসর মাঝে থেকে করে পরিচয়!
শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে
ঘটেছে যা, তোমায় আমায় ;—
মনে পড়ে সে দিনের কথা
দুই যুগ পূর্ণ হলো প্রায়!
লিপি দূতী করে আনাগোনা
দুটি হৃদি করিল বন্ধন,
দেখিবার আগেই দোঁহার
ঘটাইল অপূর্ব্ব মিলন।
কুসুমের পরাগ যেমন
সমীরণে হইয়া বাহিত,
ঘটায়ে ফুলের পরিণয়
দূরে হতে করে সম্মিলিত।
বসে এই সুদূর প্রবাসে
স্মরি সেই ভাষার প্রভাব,
মূক যেথা সুনিপুণ দূতী
নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।"

এমন রাশি রাশি ছিল। মধুর যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও আজ-কাল সাগরে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতীতে আমার 'গ্রাম্য ছবি' নামে কবিতা পাঠাইয়া ভাবিয়াছিলাম, ভারতী-সম্পাদিকা কখনই সেটি মনোনীত করিবেন না। কিন্তু খুব আদরের সহিতই তাহা ভারতীতে গৃহীত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু

লিখিয়াছিলেন, "ভারতীতে প্রকাশিত 'গ্রাম্য ছবি' পাঠ করিয়াই আমি তপোবন লিখিয়াছি।" এ-সকল কথা আমি সম্পাদিকার পত্রেই অবগত হই। কত-রকমে তিনি যে আমায় উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা বলিবার নয়। আমাদের ভারতীর মাসিক সমালোচনা পত্রমধ্যেই হইত। সে সব লিপির বহরই-বা কত! আমি স্বামীকে যে-সকল চিঠি লিখিতাম, তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া তাঁহার এক বন্ধু কতকগুলি পত্র 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' নামে ছাপাইয়া দেন। তারপর মৎপ্রণীত 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম'ও জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হয়। ইংরাজী সাময়িকপত্রে "কবিতা-হারের" সমালোচনা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার এই "জনৈক"এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার এই সাহিত্যিক রহস্য-অবগুণ্ঠন দুষ্টা ভারতী-সম্পাদিকাই উন্মুক্ত করিয়া দেন।

আমার এই ভারতীর স্মৃতিতে "বালক"-সম্পাদিকার প্রসঙ্গও অনিবার্য্য। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনীর মত সরল, অমায়িক, আন্তরিকতাপূর্ণ উদার-হৃদয়, মধুর-প্রকৃতি রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। মনের মত লোক পাইলে, এক মুহূর্ত্তের আলাপে একেবারে আপনার করিয়া লইতে তাঁহার জোড়া কেহ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমাদের বর্ত্তমান কৃত্রিম সভ্যতার ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ ব্যবহার ইঁহার নিকট মোটেই আমল পায় না। ইঁহার সুমধুর অথচ সপ্রতিভ তৎপরতায় সঙ্কোচ সহজেই দূর হয়। ইঁহার ব্যবহারের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয় যে ইঁহাকে অদেয় বা অস্বীকার করিবার কিছুই থাকে না। এই সম্পর্কে বোধ হয় দু-একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মিলনের কাসিয়াবাগানের বাটীতে প্রায় মাসে মাসেই মিলন-সমিতির বা সখি-সমিতির অধিবেশন হইত। ভদ্রমহিলাগণের সম্মিলন ও কথাবার্ত্তার মধ্যে গল্পচ্ছলে সাহিত্যচর্চ্চা সামাজিক প্রসঙ্গ প্রভৃতি ও সেই সঙ্গে গীত-বাদ্য এবং জলযোগের আয়োজন থাকিত। আমি সেদিন কাসিয়াবাগানে সখি-সমিতিতে গিয়া-ছিলাম। কথনো পরিচ্ছদে আমি 'সেফ্টী' ব্যবহার করিতাম না। একথানি থান ও তদুপরি একথানি মোটা চাদর ব্যবহার করিতাম। মনে পড়ে, সেদিন মাথায় কাপড় টানিতে চুল খুলিয়া গিয়াছিল; চুল বাঁধিতে চাদর খসিয়া যাইতেছিল; আমি তাহাতে একটু সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া মাননীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাড়াতাড়ি আসিয়া নিজের কবরী হইতে কাঁটা খুলিয়া আমার চুলগুলি আঁটিয়া ও চাদর কাপড় প্রভৃতি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া কিরূপে আমার লজ্জারক্ষা করিয়া-ছিলেন! এই মেজবধূ ঠাকুরাণীর সরলতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আর একদিনের কথা। সেদিন অপরাহ্নে আমি তাঁহার পার্কষ্ট্রীটের বাটীতে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ফটো আছে কি না?" আমি 'না' বলাতে তিনি বলিলেন, "আপনার একখানা ফটো থাকা খুব দরকার।" বলিতে বলিতে

বলিলেন, "একটু বেড়াতে যাবেন? দেখি হয় কি না, পাঁচটাও বাজে।" আমি ভালরূপে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতেই আমাকে লইয়া একেবারে ফটোগ্রাফের দোকানে উপস্থিত হইলেন, এবং আমার ফটো তোলাইলেন। আমার আপত্তি করিবার অবসর অবধি মিলিল না। তারপর সাহেব বোধ হয় যখন বলিলেন, আমি বড় গম্ভীর হইয়া আছি, তখন তিনি সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া এমনভাবে 'একটু হাস্থন না' বলিলেন যে, আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমার পরিণত বয়সের যে ছবি মাসিকপত্রিকাদিতে বাহির হইয়াছে, তাহা এই ফটোরই প্রতিলিপি।

আমার সেকালের বালিকার শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিবার দিকে তাঁহার যে আগ্রহ দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার নিকট আমি ঋণী ও তাঁহার জ্ঞানদা নামের সার্থকতারও পরিচয় পাইয়াছি। আমার চিত্রকলানুরাগ বৃদ্ধির মূলেও তিনি। অপরাধের মধ্যে গড়ার উপর সেক্সপীয়রের একখানি ও রবির একখানি ছবি বুনিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে ও রবির স্ত্রীকে উপহার দি। পশমে তোলার হিসাবে উক্ত চিত্রিত ব্যক্তিদের সৌসাদৃশ্য না কি একটু বিশিষ্টভাবেই ধরা দিয়াছিল; এই উপলক্ষে মেজবধূ ঠাকুরাণীর উৎসাহ আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে পাইয়া বসিল এবং সে উৎসাহ সংক্রামক হইয়া আমাকেও আক্রমণ করে। মেজবধূ ঠাকুরাণী রহস্যেও অতুলনীয়া। আমাকে গান শুনাইবার জন্য আজিকার স্থর রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে একদিন একটী পয়সা পেলা দিয়াছিলেন, তাহাও এই মধুর স্মৃতির হিসাবে টোকা আছে।

আমার তখনকার সঙ্কোচপূর্ণ ও অবরোধ-শাসিত সঙ্কীর্ণ ব্যবহারে হয়ত কতদিন তাঁহার মনে অন্যায় ব্যথা দিয়াছি, কিন্তু তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা, স্নেহময়ী ভগ্নীর মত তাহা সহ্য করিয়াছেন। ইঁহার প্রসঙ্গে লিখিত আমার কবিতাও আছে।

আমার পুত্র শ্রীমান প্রকাশচন্দ্রের বাঙ্গালা সাহিত্যে হাতে-খড়িও তাঁহার "মিলন-মা"র প্রদত্ত এবং ভারতীর পত্রেই তিনি প্রথম মক্স করিতে শিখেন। এখন ইংরাজি বাঙ্গালা পত্রিকাদি সম্পাদন-কার্য্যে প্রকাশ সিদ্ধহস্ত; কিন্তু সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও দায়িত্বে 'মিলনই' তাঁকে প্রথম দীক্ষিত করেন। পাহাড়ে যাইবার সময় একবার ভারতীর সমস্ত ভার, আমার বারণ সত্ত্বেও, তিনি উঁহার হাতে দিয়া যান। প্রকাশের বয়স তখন বিংশতি বর্ষ মাত্র। ভারতী-সম্পাদিকার গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য এবং এ বিষয়ে তাঁহার ভরসা ও আত্মবিশ্বাস দুঃসাহসিক রকমের হইলেও তাঁহাকে কখনও নৈরাশ্য ভোগ করিতে দেখি নাই।

ইংরাজীতে না কি প্রবচন আছে, "ঘনিষ্ঠতা ঘৃণার প্রসূতি", কিন্তু আমাদের উভয়ের এ ঘনিষ্ঠতায় এ যাবৎ কেবল শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহানুভূতিই দেখিয়া আসিয়াছি। ইংরাজী ১৮৮২ সালে আমার স্বামীর যত্নে ও উদ্যোগে 'রেইস এণ্ড রায়েৎ' পত্রিকা আমাদের হাতে আসে ও স্বনাম-ধন্য পূজ্যপাদ ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদক-

কতায় তাহা প্রকাশিত হইতে থাকে। মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিবারের নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমাদের বৈঠক-খানা বাড়ীতেই থাকিতেন এবং ত্রিপুরার মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগের পর হইতে তাঁহার দেহান্ত পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকা-পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। সুশিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী থাকিলেও তিনি বিশেষ রক্ষণশীল এবং তৎকালীন হঠ-প্রকৃতির সংস্কারের প্রতিকূল ছিলেন; এবং ঠাকুর-পরিবারে তখন যে সকল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদের সকল-গুলির তিনি অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

সেও আজ অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী তখন স্বর্গীয়। আমার মনে আছে, কি এক প্রসঙ্গে "বঙ্গবাসী" পত্রিকা 'ভারতী' সম্পাদিকাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দেন। উক্ত লেখার প্রতি আমি মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে "বঙ্গবাসী"কে পুনঃপুনঃ সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সুনিপুণ লেখনীর তাড়না ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে লেখার মধ্যে ভারতী সম্পাদিকার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার যে নিদর্শন বিদ্যমান তাহা ভুল করিবার নহে। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে রেইসের সম্পাদকীয় ভার আমার ভাসুর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হাতে পড়ে। "মিলনে"র "ভারতী"-ত্যাগ-উপলক্ষে 'রেইসে' (১৫ই মে ১৯১৫) যে প্রবন্ধ বাহির হয়, বাহুল্য-ভয় সত্ত্বেও তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রবন্ধের মধ্যে বাঙ্গালা কবিতাও একটি ছিল।

A Journalistic Retirement.

The retirement of Mrs. Ghosal, better known by her maiden name of Srimati Swarna Kumari Devi, from the editorship of BHARATI is a distinct loss to vernacular journalism. With the traditions of a cultured family, and of varied culture and accomplishment herself, she was eminently fitted by her training, temper and acquirements to hold the post she has hitherto so nobly filled. Besides editing the journal which was started in her father's family with her eldest brother as the first editor, she has contributed largely to Bengali literature; and those contributions, of no mean order, have considerably helped to enrich the language. And she has made the BHARATI what it is on this its fortieth year. How far she has succeeded in gaining one of her objects, namely, the moulding of men of letters it is, as she herself observes, for posterity to say. In the domain of letters many owe her allegiance, and those that do, know that it is a pleasure to do so, and are proud of it. Her encouragement, though lost on many, has been cosmic generally and has made many young men take to literature as a profession and some of them successfully. The present editor of the BHARATI to whom she makes over charge may be cited as an instance. That editor shares with a friend the

burden of responsibility. Of considerable go and regular business habits, she possesses in abundance all the womanly virtues which distinguished her class in the happy by-gone days and are now treasured up in the museum of memories. She is, to use a pleasant line of Locksley Hall Sixty Years after, 'Feminine to her inmost heart and feminine to her tender feet." That is the impression, one who has known her intimately, carries of her. Her manners have a dignity of simplicity, peculiarly striking and her conversation a charm peculiarly free from pedantry. Her kindliness is as genuine as motherliness and her hospitality, homely joys. The words of adieu with which she takes leave of her readers and colleagues are as touching as they are true :

"When I took up the sacred task of editing I did not persuade myself to do so with a view to results ; nor did I calculate its profit and loss. It was the pleasure of work which encouraged and inspired me to action. Those days of inspiration and encouragement are now ended and I feel lonely and helpless. My done-up body and mind now earnestly seek cessation."

Here is an appreciation of her by a young graduate admirer which has come to our hands and which we publish with pleasure. The verses are the maiden attempt of the young writer and are therefore the more deserving of encouragement.

পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি

কেন ভাব সাঙ্গ দেবি, জীবনের কাজ ?
কেন বৃথা ত্বরা এত ? রয়েছে ত বেলা।
এখনো রয়েছে বহু যাত্রী হতে পার ;—
কিসে হবে বিনা তব ভারতীর ভেলা ?
এখনো নীবার পড়ে যজ্ঞভূমি পরে ;
এখনো জ্বলিছে হের বহ্নি সুমঙ্গল,
কে বল তোমার মত হোত্রী মাতঃ আর
রাখিতে সে পুণ্য-বহ্নি চির-সমুজ্জ্বল ?
ভারতী-পূজার কল্পে নানা উপচারে
সাজালে যতনে যেই নৈবেদ্যের থালা ;
সে নির্ম্মাল্য কেবা লবে পাতিয়া অঞ্জলি ;
কাহারে শোভিবে সেই নিবেদিত মালা।
পারিবে কি তোমা-সম যুগল দায়াদ
অক্ষুণ্ণ রাখিতে কীর্ত্তি প্রাচীন মন্দিরে ?
হারায় না যেন কভু বিবেক মহিমা ;
বরিষ আশীষ-ধারা তাহাদের শিরে।
বিদায়ের কালে দেবি, নমি শতবার।
মাঝে মাঝে দিবে দেখা সেই আশা চিতে।
নাশিয়া তমসা-জাল বঙ্গের অঙ্গনে
করিও প্রদীপ্ত তুমি মেঘান্তর হতে।

কবিতাটি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষের বংশীয় ও আমার আত্মীয় শ্রীমান সুশীলকুমারের লেখা।

সুবিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং "আলোচনা"র অন্যতম সম্পাদক আমার দেবর শ্রীমান গোবিন্দলাল দত্তের সহিত ঠাকুর-পরিবারের অনেকের আলাপ ছিল এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের সহিতও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে, মনে পড়ে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর

"সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" ও রবীন্দ্রের "অকালকুষ্মাণ্ড" প্রভৃতি রচনা পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন জোড়াসাঁকোর মেয়ে-পরিবারের সহিত আমাদের মেয়ে-পরিবারের পরিচয় ছিল না। গোবিন্দলাল অবরোধের মধ্যে শাস্ত্র-সম্মত স্ত্রী-শিক্ষার পাণ্ডা ছিলেন, এবং সাবিত্রী লাইব্রেরীকে উপলক্ষ করিয়া, নারী-রচনা পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। কঠোর রক্ষণশীল দলের "সেনানায়ক" উপাধি ও তদুপযোগী শিরোপা আমি তাঁহাকে অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলাম এবং কোন দিন ভাবি নাই অবরোধের বাহিরে তিনি গুণের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে আমার সহিত ভারতী-সম্পাদিকার আলাপের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ক্রমে তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ভক্ত হইয়া উঠেন এবং আমাদের এই মিলন-যজ্ঞের অন্যতম উত্তরসাধক ছিলেন।

ভারতী-সম্পাদিকার প্রতি আমাদের বৃহৎ পরিবারের পারিপার্শ্বিক সাহিত্য-অনুরাগী বন্ধুবৃন্দের এই যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, বলা বাহুল্য, তাহা তাঁহার সহিত আমার এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই ফল। তাই বলিতেছিলাম, আমরা নিতান্ত বাঙ্গালী, আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে ইংরাজি প্রবচন সার্থক হয় নাই। চল্লিশ বৎসরের সিকির সিকি কাল মাত্র "জাহ্নবীর" সম্পাদকতা করিয়া বুঝিয়াছি, কত ধানে কত চাল! তাই আজ ভারতী-সম্পাদিকার অসাধারণ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়কে অভিবাদন করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

একে সেকালের কথা, তায় বুড়ার লেখা; সুতরাং লিখিবার আছে অনেক। একালের নাতি-নাতিনীরা যে আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে চাহেন, এইটুকুই বৃদ্ধের গৌরব, সান্ত্বনা ও আনন্দ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ছন্নছাড়া

(৭)

পরের সপ্তাহে আটবছরের মেয়েরা সব বড় শোবার ঘরটায় চলে গেল। আমার বিছানা ছিল জানলার ধারটিতে—মারি এমের ঘরের ঠিক পাশে। আমার একধারে ইস্‌মেরি, আর-একধারে মারি রেনো। রাত্রে আমরা শুয়ে পড়লে মারি এমে আমাদের বিছানায় এসে বসতেন, আমার হাতখানা ধরে চাপড়াতেন; আর জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন।

একরাত্রে পাড়ার মধ্যে আগুন লাগল;—সে ভয়ানক আগুন! আমাদের শোবার ঘরটা একবারে আলোয় আলো হয়ে গেল। মারি এমে তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে আমায় ঠেলে তুলে দিলেন; বল্লেন—"দেখবি আয়, আগুন লেগেছে।"

আমার ঘুম আর ভাঙতে চায় না। তিনি

হাত দিয়ে আমার চোখদুটো একবার রগড়ে দিলেন। তার পর কোলে তুলে নিয়ে ঠেলা দিয়ে-দিয়ে বলতে লাগলেন—"দেখ, দেখ! ঘুমোস্‌নি;—আগুন লেগে কেমন দেখতে হয়েছে দেখ।"

আমি তখন ঘুমে একেবারে ন্যাতা;—আমার মাথা কেবলই তাঁর বুকের উপর ঢুলে ঢুলে পড়ছে। তিনি বল্লেন "আ রে হাবাতে মেয়ে!"—বলে আমার কানের ডগাটা ধরে একবার সজোরে নেড়ে দিলেন। আমি ঘুম-ভেঙে চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম। তিনি অমনি আমায় কোলে করে বসলেন, বুকের মধ্যে চেপে ধরে দোলা দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন। তাঁর মুখখানি দেখাচ্ছিল যেন স্বচ্ছ ফটিক-দিয়ে গড়া; আর চোখদুটি আলোর আভায় ভরা!

মারি এমে জানলার কাছে এলেই ইস্‌মেরি আগুন হয়ে উঠত। কারণ তাহলে যে তাকে মুখ বন্ধ করতে হয়! সে এত বকতেও পারে!—কথা তার আর থামতে চায় না। আর কী চীৎকার! ঘরের ও-কোণ থেকে তার গলা শোনা যায়। মারি এমে বলতেন—"ঐ আরম্ভ হয়েছে ইস্‌মেরির বক্‌বকানি!" ইসমেরি অমনি ঠোক্কর দিয়ে বলত—"এই আরম্ভ হল মারি এমের বকুনি!"

কী তার সাহস! মুখের উপর তার এই চোপা দেখে আমার বুক দুরদুর করত! কিন্তু মারি এমে এমনি ভাব দেখাতেন যেন সে কথা তাঁর কানেই যায় নি।

একদিন তিনি ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—"বাঁট্‌লি কোথাকার! ফের যদি চোপা করবি ত দেখাব মজা!"

ইসমেরি বল্লে—"ঈস্‌!"

মারি এমে বেতগাছটা হাতে করে এসে দাঁড়ালেন। আমার ভয় হল ইস্‌মেরি এইবার খেলে বেত! কিন্তু ইস্‌মেরি যেমন সেই বেত দেখা অমনি ছুটে এসে মারি এমের পায়ের কাছ উপুড় হয়ে পড়ল! সে কী তার ছটফটানি আর কাতরানি!

মারি এমে হাত থেকে বেতগাছটা ফেলে দিলেন; তার পর পায়ের একটা ঠোক্কর দিয়ে ইস্‌মেরিকে সরিয়ে দিলেন, বল্লেন—"নচ্ছার মেয়ে!"

এর পর থেকে দেখতুম তিনি ইস্‌মেরিকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলেন; সে কি বলে, না বলে কানে তোলেন না। কিন্তু এইবার থেকে একেবারে বারণ হয়ে গেল যেন কেউ আর ইস্‌মেরিকে পিঠে না করে।

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। ইস্‌মেরি বাঁদর-ছানার মত আমার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠত। আমার সাহস হতনা যে তাকে ঠেলে ফেলে দিই। আমি নীচু হয়ে তাকে ভালো করে চড়ে-বসতে দিতুম। শোবার ঘরে যেতে হলেই সে পিঠে চাপত। কারণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা তার পক্ষে সহজ ছিল না। নিজের চলার ভঙ্গী নিয়ে সে নিজেই ঠাট্টা করে বলত—"আমার চলা যেন ব্যাঙের থপ্‌থপানি।"

মারি এমে আগে-আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতেন, আমি একটু দাঁড়িয়ে শেষ-দলের মেয়েদের সঙ্গে পিছে পিছে যেতুম।

হঠাৎ একএকদিন মারি এসে পিছন ফিরে চেয়ে দেখতেন; ইস্‌মেরি অমনি চোখের নিমেষে সড়াৎ করে আমার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ত। মারি এসের সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়তুম। ইস্‌মেরি বলত—"তুই ভারি বোকা! অমন অপ্রস্তত হলি কেন? তাইত আবার ধরা পড়লি।"

মারি রেনো কিন্তু ইস্‌মেরিকে কিছুতেই পিঠে উঠতে দিত না। সে বলত তাহ'লে তার কাপড় ছিঁড়ে নোংরা হয়ে একাকার হয়ে যাবে!

(৮)

ইস্‌মেরি ছিল বাচালের একশেষ! কিন্তু মারি রেনো ঠিক তার উল্টো; মুখে তার কথাটি নেই।

রোজ সকালে আমার বিছানা-পাতার সময় মারি রেনোই সব করে দিত। চাদরখানার উপর হাত চালিয়ে চালিয়ে এমন চোস্ত করে দিত—ঠিক যেন ইস্ত্রি-করা। তার নিজের বিছানা ঠিক-করবার সময় কিন্তু সে আমাকে হাত দিতে দিত না; বল্‌ত—"না; তুই সব কুঁচকে-মুচকে একাকার করে দিবি।" ঘুম থেকে ওঠবার পরও তার বিছানা যে কেমন করে অমন চোস্ত থাকত আমি কিছুতেই বুঝতে পারতুম না। একদিন সে প্রকাশ করে বল্লে যে চাদর ও কম্বলখানা সে মাদুরের সঙ্গে পিন্ দিয়ে গেঁথে রাখে।

তার যে কতরকম টুকিটাকি জিনিষ আর কত যে লুকোনো জায়গা ছিল! খেতে বসে সে আগের দিনকার মেঠাই বার করে খেত; আর সেই-দিনকার মেঠাই তার পকেটে জমা হত। ঘুরচে ফিরচে আর পকেট থেকে হাত বেরিয়ে মুখে উঠচে।

প্রায়ই দেখতুম এককোণে বসে সে লেস্ বুনছে। ক্রস্ করা, ভাঁজ করা, জিনিষপত্র সব ভালো করে গুছিয়ে রাখা—এই সব করতে পেলে সে আর কিছু চাইত না। তারই জন্যে আমার জুতো অমন পরিষ্কার চকচকে আর আমার রবিবারের পোষাক অমন সুন্দর করে পাট-করা থাকত।

একদিন একটা নতুন দাসী এল। নাম তার মাদলিন। সে এসেই আমার অলবড্ডেগিরি ধরে ফেল্লে। চটে আগুন। বল্লে, আমি কুড়ের ধাড়ি। যেন নবাবপুত্রী। নিজের হাতে জলটি গড়িয়ে খেতে পারি না—হাতে ব্যথা লাগে! তাই আমার সঙ্গে-সঙ্গে সব দাসী-বাঁদীরা ঘুরচে!

সে বলতে লাগল—"ছি ছি ছি লজ্জা করে না এমন করে বাছা রেনোকে খাটিয়ে নিতে।"

বন্ নের্ঁ বল্লে—"ও মেয়েটা ঐ রকম! গুমরে ওঁর মাটিতে পা পড়ে না। উনি মনে করেন যে উনি কি আর-সবাইয়ের মতন? তাই ওঁর ধরণ-ধারণ আলাদা।"

তারা দুজনেই বল্‌তে লাগল যে আমার মতো এমন মেয়ে তারা কোথাও দেখেনি! —কোথাও না!—এমনি করে দুজনে এক-সঙ্গে আমার মুখের কাছে পড়ে চীৎকার করতে লাগল। তাই দেখে আমার মনে পড়ল সেই দুটো গণ্ডগোলে পরীর কথা—যাদের একজন কালো, একজন সাদা!

মাদলিন দেখতে পরিষ্কার, সুন্দর, কিন্তু

হাঁ বড়, দাঁত ফাঁক-ফাঁক! তার জিব ছিল চওড়া, পুরু; কথা-কইবার সময় ঠোঁটের কোণে এসে লাগত।

বন্‌ নের্‌ঁ চড় উঁচিয়ে আমায় বল্লে—"চোখ নামা।" আমি শুনলুম সে মাদলিনকে বলতে বলতে গেল—"মেয়েটার ঐ রকম চাহনিতে কেমন যেন অস্বস্তি হয়।"

অনেক দিন থেকে আমার মনে হত বন্‌ নের্‌ঁ যেন একটা ষাঁড়। কিন্তু মাদলিন যে কোন্‌ জানোয়ারের মতন তা ঠিক করতে পারতুম না। অনেক ভেবেছি—যত জানোয়ার জানতুম সবাইয়ের চেহারা মনে মনে ওলট-পালট করেছি—শেষে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

সে ছিল মোটাসোটা—থপথপে। কিন্তু তার গলার স্বর ছিল একেবারে সরু—বাঁশির মত।—ভারি আশ্চর্য্য কিন্তু! গির্জ্জেয় গান করবার তার ভারি সখ ছিল কিন্তু একটি স্তোত্রও সে জানত না। মারি এমে আমায় বলে দিয়েছিলেন তাকে শেখাতে।

এর পর থেকে আমার জিনিষ ঝাড়-পোঁচ করাতে মারি রেনোর আর কোনো বাধা রইল না;—কেউ আর সেদিকে লক্ষ্যই করত না। এতে মারি রেনো এত খুসি হয়ে উঠল যে রুমাল আটকাবার জন্য একটা পিন্‌ সে আমায় উপহার দিয়ে ফেল্লে। আমার হাতের রুমাল প্রায়ই হারিয়ে যেত। দুদিন না যেতে-যেতেই সেই পিন্‌-সুদ্ধ রুমালও যে কোথায় গেল খুঁজে পেলুম না! উঃ রুমাল! সে একটা প্রচণ্ড বিভীষিকা! সে কি কিছুতেই আমার হাতে থাকবে না—প্রতি সপ্তাহে একখানা করে যাবেই! ময়লা রুমালের বদলে মারি এমে একখানা করে পরিষ্কার রুমাল আমাদের দিতেন—তাঁর সাম্‌নে ময়লা রুমাল-খানা মাটিতে ফেলতে হত। সেই শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার কোনো হুঁস থাকত না—তার পর হঠাৎ চমকে উঠে পকেট হাতড়াতুম। কিন্তু হায় কোথায় সে! ছোট্‌, ছোট্‌;—শোবার-ঘর দেখ, পথের ঘর খোঁজ, বিছানাপত্র ওলট-পালট কর—কিন্তু হায় সব জিনিষ আছে কেবল আমার রুমালখানিই নেই। মন উতলা হয়ে উঠত। কোথায় পাই রুমাল—কে দেবে রুমাল! পাগলের মত ছুটোছুটি করতুম। দেবী মেরীর ছবিখানার সামনে দিয়ে যাবার সময় হাত-যোড় করে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করতুম—"ওগো দয়াময়ী, দয়া কর, আমার রুমাল যেন খুঁজে পাই।" কিন্তু সেই হারানো রুমালের কোনো চিহ্নই পাওয়া যেত না। তার পর ছুটতে-ছুটতে হাঁপাতে-হাঁপাতে মুখ লাল করে নীচে নেমে আসতুম,—মনের দুঃখে আমার কান্না পেত। মারি এমে যে সাফ্‌ রুমালখানি দিতেন সেখানি হাতে করে নিতে আর সাহস হত না;—সেই সঙ্গে যে বকুনি আমার প্রাপ্য তার সুর আগে থাকতেই আমার কানে বাজতে থাকত। মারি এমে কোনো কোনো দিন মুখে যদিবা কিছু না-ও বলতেন ত তাঁর চোখের বিরাগ আমার বুকে এসে বিঁধত—এবং সেই নীরব তিরস্কারের কঠোর দৃষ্টি সমস্ত দিন আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকত। লজ্জায় আমি মরে যেতুম,—হাত পা আমার খেলত না। একটা কোণ পেলে সেইখানে মুখ

লুকোতে ইচ্ছে করত। কিন্তু এত করেও যে-কে-সেই!—পরের দিনেই সেই রুমাল আবার হারিয়ে ফেলতুম।

মাদলিন আমার দুঃখে মৌখিক সমবেদনা দেখাত বটে; কিন্তু আমার যে গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত তার এই মনের ইচ্ছা সে সব সময়ে গোপন রাখতে পারত না।

মারি এমেকে সে খুব ভালোবাসত। দিন রাত তাঁর সেবাতেই লেগে থাকত। এবং তিনি একটু কড়া কথা বল্লেই সে কেঁদে ফেলত। তখন তার গালে মুখে হাত-বুলিয়ে মারি এমে তাকে ঠাণ্ডা করতেন। সে-সময়ে রৌদ্র ও বৃষ্টির মত তার একসঙ্গে হাসি ও কান্না চলতে থাকত—এবং কাঁধটা ফুলে ফুলে উঠে তার সেই সাদা ধবধবে গলাটা বার করে দিত। নের্ঁ বলত তাকে দেখায় ঠিক যেন বেড়ালের মতন।

(৯)

একদিন দুপুরবেলা খাওয়ার সময় বন্ নের্ঁ রাগারাগি করে চলে গেল। সব যখন নিস্তব্ধ এমন সময় ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ নের্ঁ চীৎকার করে উঠল—"যাবো না ত থাকব না কি! আমি কিছুতেই থাকচি না।" মারি এমে অবাক হয়ে তার দিকে চাইলেন। অমনি নের্ঁ চোখ-পাকিয়ে মাথাটা নীচু করে তাঁকে যেন গুঁতোতে এল। চীৎকার করে বলতে লাগল যে, সে কি একটা খুকীর হুকুমে চলবে না কি! সে চেঁচাতে চেঁচাতে দরজার দিকে পিছু-হটে যেতে লাগল; দরজার কাছে পৌঁছে এক-টানে দরজাটা খুলে ফেল্লে; তারপর মারি এমের দিকে তার লম্বা একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে—সপ্তমে চেঁচিয়ে বল্লে—"ও খুকি না ত কি! এখনো পঁচিশ হয়নি।"

ছোট মেয়েদের কেউ কেউ ভয়ে কুঁকড়ে গেল; কেউ হী-হী করে হেসে উঠল। মাদলিন যেন পাগল। সে মারি এমের পায়ের তলায় একেবারে আছাড় খেয়ে পড়ল;—তাঁর ঘাগরার খুঁট ধরে, তাঁর পা জড়িয়ে, তাঁর হাত দুখানা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে কী যে করতে লাগল বলতে পারি না। এম্‌নি চীৎকার করছিল যেন কি একটা ভয়ানক কাণ্ড!

মারি এমে তাকে কিছুতেই ছাড়াতে পারছিলেন না। শেষে তিনি ভারি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মাদলিন অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মারি এমে তার কাপড় খুলে দিতে দিতে আমাদের দিকে ইসারা করলেন। আমি ভাবলুম তিনি আমায় ডাকছেন। আমি ছুটে গেলুম। তিনি বল্লেন—"না, তোমায় নয়, তুমি যাও। মারি রেনো।"

মারি রেনোর হাতে তাঁর চাবির গোছাটা দিলেন, সে নিয়ে চলে গেল। সে কস্মিন কালেও মারি এমের ঘরে যায়নি কিন্তু যে জিনিষটি মারি এমে চেয়েছিলেন ঠিক সেই স্মেলিং সল্টের শিশিটা মুহূর্ত্তের মধ্যে বার করে নিয়ে সে ফিরে এল।

(১০)

মাদলিন্ শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠল। বন্ নের্ঁর জায়গা সে দখল করলে। আমাদের উপর এখন তার অসীম কর্ত্তৃত্ব। মারি এমেকে কিন্তু সে ভারি ভয় করত;—তাঁর কাছে একেবারে জড়সড়। যত জারিজুরি আমাদের উপর। থামকা সে যখন-তখন চীৎকার

করে বলে উঠত যে, সে আমাদের দাসী নয়, আমাদের দেখা-শোনার ভার তার উপর!

যে দিন সে মূর্চ্ছা যায় সেই দিন তার ধবধবে সাদা গলাটি আমি ভালো করে দেখতে পেয়েছিলুম—ভারি চমৎকার। কিন্তু সে ছিল বড় হাঁদা। সে আমায় কত-কি বলত, আমি গ্রাহ্য করতুম না। তাতে তার রাগ আরো বাড়ত। সে আমায় যাচ্ছে-তাই করত—এবং প্রত্যেক কথার শেষে ঠেস্ দিয়ে বলত—"নবাব-পুত্রী!"

মারি এমে যে আমায় ভালোবাসতেন এ তার সহ্য হত না। আমাকে আদর করতে দেখলে সে রেগে লাল হয়ে উঠত।

আমি বড় হয়ে উঠছিলুম—এবং আমার শরীর মন্দ ছিল না। মারি এমে বলতেন আমায় নিয়ে তাঁর একটা গর্ব্ব আছে। এক একসময় আদর করে আমায় এমন জোরে বুকে চেপে ধরতেন যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। তখন আমার কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে আদর করতে-করতে তিনি বলতেন—"লক্ষ্মী আমার! মণি আমার!"

ছুটির সময় আমি তাঁর পাশটিতে এসে বসতুম তাঁর বই-পড়া শুনতুম। গম্ভীর স্বরে তিনি পড়ে যেতেন। বইয়ের মধ্যেকার কোনো লোককে যদি তাঁর ভালো না লাগত, তিনি রেগে বইখানা মুড়ে ফেলতেন—তারপর আমাদের খেলায় যোগ দিতেন।

তিনি চাইতেন যে আমার যেন কোনো দোষ, কোনো খুঁত না থাকে। তিনি প্রায়ই আমায় বলতেন—"তোমায় একেবারে নিখুঁত হতে হবে—বুঝলে?"

একদিন তাঁর ধারণা হল আমি মিথ্যা কথা বলেচি। খানিকটা জমি পড়েছিল—তার মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা বাদাম গাছ। সেইখানে তিনটে গোরু চরত। তার মধ্যে সাদা গোরুটা ছিল ভারি দুষ্টু—তাকে আমরা সবাই ভয় করতুম। একদিন একটা মেয়েকে সে গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছিল। সেদিন দেখলুম লাল গোরু দুটো সেইখানে ঘাস খাচ্ছে আর বাদাম গাছটার তলায় একটা প্রকাণ্ড কালো গোরু। আমি ইস্‌মেরিকে বল্লুম—"দেখ্ ভাই, সেই সাদা গোরুটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—সেটা যে দুষ্টু!" ইস্‌মেরির মেজাজ সেদিন ভালো ছিল না। সে চীৎকার করে বলে উঠল যে ঐ রকম করে লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করা আমার অভ্যাস; ঐ রকম মিছে কথা বলে লোককে আমি ভুলোই। আমি বল্লুম—"মিছে কথা কেন? ঐ দেখনা কালো গোরু!" সে বল্লে—"ওটা কালো নয়, ওটা সাদা।" আমি বল্লুম—"না ওটা কালো।" মারি এমে পাশে ছিলেন তিনি আমার কথা শুনে রেগে উঠে বল্লেন—"অ্যাঁ, তুমি এই রকম মিছে কথা বল!"

গোরুটা সরে এল। দেখি তার খানিকটা কালো, খানিকটা সাদা। বুঝলুম আমি ভুল করেছি। সেই প্রকাণ্ড বাদমগাছটার ঘন ছায়া পড়ে সাদা গোরুকে কালো দেখাচ্ছিল। আমি এমন আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম যে একেবারে হতভম্ব—মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। মারি এমে আমাকে ধরে খুব কসে একটা নাড়া দিয়ে বল্লেন—"তুমি মিছে কথা কেন বল্লে?" আমি বল্লুম—"আমি

বুঝতে পারিনি!” তিনি এক কোণে আমায় দাঁড় করিয়ে দিলেন, বল্লেন—“আজ একটুকরো রুটি ও একটু জল ছাড়া আর কিছু খেতে পাবে না।”

আমি তো মিছে কথা বলিনি, কাজেই শাস্তির জন্য আমার মনে কোনো দুঃখ হলনা।

সেই কোণটায় কতকগুলো পুরোনো আলমারি দাঁড় করানো ছিল, তার মধ্যে বাগানের কাজের সব যন্তর-পাতি থাকত। আমি এটার উপর, ওটার উপর চড়ে চড়ে বেড়াছিলুম—শেষে সবচেয়ে বড় আলমারিটার মাথার উপর গিয়ে উঠে বসলুম। আমি তখন দশ বছরের। জীবনে এই প্রথম আমার একলা থাকা। সে আমার বেশ লাগছিল! আমি সেখানে পা ঝুলিয়ে চুপটি করে বসেছিলুম—এবং মনে মনে একটা অদৃশ্য জগতের কল্পনা করছিলুম। মরচে-ধরা তালা-দেওয়া সেই ভাঙা আলমারিটা যেন একটা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। আমি যেন একটি চমৎকার ছোট মেয়ে—আমাকে একটা পাহাড়ের চুড়োয় ফেলে দিয়ে গেছে। পরীর মতো সুন্দরী একজন মেয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিতে আসচেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরচে তিন চারটে সাদা ধবধবে হাঁস। যেমন তারা আমার কাছে এসেছে অমনি দেখি মারি এমে সেইখানে;—চারদিকে আমায় খুঁজে বেড়াচ্চেন। আমার তখনো হুঁস হয়নি যে আমি সেই আলমারিটার মাথায় বসে আছি—আমি ভাবছি আমি তখনও সেই পাহাড়ের চুড়োয়! আমার ভারি রাগ হতে লাগল,—মারি এমের যেমন আসা অমনি সেই সুন্দর রাজপ্রাসাদ, সেই পরীর মতো সুন্দরী মেয়ে সেই সাদা হাঁস—সব কোথায় মিলিয়ে গেল! মারি এমে দেখতে পেলেন—আমার পা দুটো ঝুলছে। যেমন তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া অমনি আমার মনে পড়ে গেল আমি আলমারির চালে বসে আছি। তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর পকেট থেকে নানা রকম খাবার জিনিষ বার করতে লাগলেন, একটার পর একটা দেখিয়ে রাগের সঙ্গে বল্লেন—“এসব তোমার জন্যে ছিল, বুঝলে!” সেই জিনিষ-গুলো আবার তিনি পকেটের মধ্যে পুরে নিয়ে চলে গেলেন। একটু পরে মাদলিন আমার জন্যে একটুকরা রুটি ও একটু জল রেখে চলে গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি সেই-খানে রইলুম।

(১১)

মারি এমে দিন দিন বিমর্ষ থেকে আরো বিমর্ষ হয়ে উঠছিলেন। তিনি আর আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেন না; আমাদের খাওয়ার সময় আসতেও তাঁর ভুল হয়। উপাসনা-ঘর থেকে তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে মাদলিন আমায় পাঠিয়ে দিত। গিয়ে দেখতুম তিনি হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে রয়েছেন। আমি তাঁর কাপড় ধরে টানলে তবে তিনি মুখ তুলতেন। আমার মনে হত তিনি কাঁদচেন, কিন্তু মুখের কাছে গিয়ে দেখতে সাহস হতনা—যদি রেগে ওঠেন! কিসের এক ভাবনায় তিনি যেন সর্ব্বদা ডুবে থাকতেন;

কথা কইলে বিরক্তির সঙ্গে হাঁ আর না এই দুটি উত্তরে সেরে দিতেন।

ইষ্টর পর্ব্বের যে ভোজ প্রতিবৎসর হত তাতে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। তিনি কেক আনতে বলতেন, আমরা সেগুলো টেবিলের উপর রেখে একখানা সাদা কাপড় চাপা দিতুম—পাছে পেটুক মেয়েরা নজর দেয়। ভোজের দিনে আমাদের যতখুসি কথা কইবার কোনো বাধা ছিল না—আমরা ভয়ানক কোলাহল জুড়ে দিতুম। মারি এমে আমাদের পরিবেষণ করতেন, এবং সকলকার সঙ্গেই কিছু না কিছু কথা কইতেন।

সেদিন তিনি নিজের হাতে কেক বিতরণ করবেন। মাদলিন তাঁর সাহায্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সে কেক-ঢাকা কাপড়টা উঠিয়ে নিতেই একটা বিড়াল সেই কাপড়ের ভিতর থেকে তড়াক করে লাফিয়ে পালিয়ে গেল। মারি এমে ও মাদলিন দুজনেই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন—"ওঃ।" মাদলিন বল্লে—"পাজি বেড়ালটা কেকগুলো এঁটো করে দিলে!" মারি এমেও দেখলুম বিড়ালটার উপর খুব বিরক্ত। তিনি খানিকক্ষণ গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর কোণের দিকে ছুটে গিয়ে একটা লাঠি নিয়ে বিড়ালটাকে তাড়া করলেন। উঃ সে ভয়ানক দৃশ্য! বিড়ালটা ভয়ে সারা হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে একবার এদিকে ছোটে, একবার ওদিকে ছোটে—লাঠির কাছ থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে আকুল। মারি এমে ক্রমাগত লাঠিটা বেঞ্চের উপর, দেয়ালের উপর ঠক্‌ঠক্ করছিলেন। ছোটো মেয়েরা সব ভয় পেয়ে উঠল—ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেল। মারি এমে বাধা দিয়ে বল্লেন—"না, কেউ যেতে পাবে না!"

আমি তখন তাঁকে মারি এমে বলে চিনতে পারছিলুম না। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপা, মুখ একেবারে সাদা, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরচ্ছে! আমি ভয়ে মুখ ঢেকে ফেল্লুম। কিন্তু বেশীক্ষণ পারলুম না, আবার চোখ খুল্‌লুম। বিড়াল-তাড়ানো তখনও চলচে। মারি এমে লাঠি-হাতে তখনও ছুটোছুটি করচেন—মুখে তাঁর কথা নেই। ঠোঁট তাঁর ঝুলে পড়েচে—ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো চিক্‌চিক্ করে উঠচে। একবার বেঞ্চির উপর, একবার টেবিলের উপর—এমনি করে তিনি ছুটোছুটি করতে লাগলেন। বিড়ালটাকে একবার বাগে পেয়ে যেমন লাঠি উঠিয়েছেন অমনি সেটা লাফিয়ে একটা জানলার উপর গিয়ে বসল। মাদলিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, সে বল্লে—"একটা বড় লাঠি নিয়ে আসি।" মারি এমে বল্লেন—"না, কাজ নেই। বেঁচে গেল; ওর অদৃষ্ট ভালো।"

বন্ জিস্তিন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে চোখ ঢেকে বলতে লাগল—"ছি ছি কি লজ্জা!" আমারও মনে হল সত্যি এ বড় লজ্জার কথা। আমার কেমন মনে হত লাগল মারি এমে যেন আগের চেয়ে দেখতে ছোট হয়ে গেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল তিনি কখনো কোনো মন্দ করেন না। আজকের এই ঘটনার সঙ্গে আর-একদিন—যে দিন ভয়ানক ঝড় উঠেছিল সেদিনকার কথা তুলনা করতে লাগলুম।

সেদিন তাঁকে মনে হয়েছিল দেবী। যখন তিনি বিড়ালটাকে তাড়া করেছিলেন তখন আমার সেই সেদিনকার তাঁর বেঞ্চির উপর উঠে সুন্দর হাতখানি তুলে অতি ধীরে ধীরে জানলা বন্ধ করার মূর্ত্তি আমার মনে পড়ছিল। তাঁর চওড়া আস্তিন কাঁধের উপর উল্টে এসে পড়েছিল। বিদ্যুতের চমকানিতে বাতাসের গর্জ্জনে ভয়ে যখন আমরা অধৈর্য্য তখন তিনি অতি শান্তভাবে আমাদের শুধু বল্লেন—"ঝড় উঠেছে!"

মারি এসে মেয়েদের সবাইকে ঘরের একদিকে দাঁড়াতে বল্লেন। তারপর দরজাটা খুলে দিলেন। বিড়ালটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পদ্মের পাপড়ি

র‍্যামিয়াড্

অথবা ডাক্তার বাল্মীকি এল্ এল্ ডি, এফ্ আর সি এস্ কৃত
ঊনবিংশ শতাব্দীয় রামায়ণ

পুণ্যতীর্থ তমসা নদীর তীরে ডাক্তার বাল্মীকির তপোবন। তার-কণ্ঠী কুক্কুট কুক্কুটী বিহঙ্গেরা মনের উল্লাসে গান করিতেছে; কোথাও বা আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ সুখে অস্থি-দূর্ব্বা রোমন্থ করিতেছে। ডাক্তার বাল্মীকি আশ্রম-কুটীরে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ফায়ের-সাইড্-অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঈজিচেয়ার-বেদীতে হেলান দিয়া ম্যানিলা পত্রের ধূমপান করিতেছেন; চুরট প্রান্ত হইতে ঘন ধূমরাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, সেই ধূপধূনার পুণ্য গন্ধে আশ্রম-কুটীর আমোদিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মুনিবর পার্শ্বস্থিত বোতল-কমণ্ডলু হইতে শ্যামপেনের সোম পান করিতেছেন; এমন সময়ে কুটীর-দ্বারে ঘা পড়িল। মুনি-কুমার মাষ্টর ভরদ্বাজ, ডাক্তার বাল্মীকির নিকটে আসিয়া সমাচার দিল—"রেবেরেণ্ড মিষ্টর নারদ আসিয়াছেন।" ধ্যানমগ্ন বাল্মীকির চমক্ ভাঙিয়া গেল, অমনি তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন এবং হাইচার্চ্চ মিসনরি সোসাইটির পরিব্রাজক মিসনরি, সঙ্গীতের অধ্যাপক, সহস্র চুরট ভস্মকারী গোখাদকদিগের অগ্রগণ্য রেবেরেণ্ড নারদের সহিত চটুল-ভাবে হস্তালোড়ন পূর্ব্বক "কেমন করিতেছ" বলিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ উত্তর করিলেন, "সম্পূর্ণ ভাল—ধন্যবাদ তোমাকে।" অতঃপর বাল্মীকি নারদকে আহ্বানপূর্ব্বক কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি ধুচুনি-উষ্ণীষ মস্তক হইতে অবতারণ পূর্ব্বক চেয়ারে উপবেশন করিলেন, পরে চেয়ারের নিম্নে উষ্ণীষ স্থাপন

করিয়া বলিলেন, "বাল্মীকি! তোমায় আজ এত ভাবিত দেখিতেছি কেন?" বাল্মীকি উত্তর করিলেন, "প্রিয় খুড়া, সত্য বলিয়াছ, আমি কিছু ভাবিত আছি; অনেক দিন হইতে আমি মনে করিতেছি একটি মহা-কাব্য লিখিব—কে নায়ক হইবার উপযুক্ত তাহাই এতক্ষণ আমি এই অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম; বুদ্ধিকে সতেজ করিবার জন্য গ্যালন্ গ্যালন্ সোম-পান করিয়াছি, তথাপি তাহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে, খুড়া, তুমি কি এত দয়ালু হইবে যে, ইহার একটা সৎপরামর্শ দিয়া আমাকে বাধিত করিবে?" সুবিজ্ঞ নারদ আজানুলম্বিত পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিলেন—"দেখ বাপু বাল্মীকি, মহাকাব্য, ভাষায় যাহাকে এপিক্ পোয়েম বলে, তাহা অতি দুরূহ ব্যাপার, তাহা লেখা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। এক যা' লিখিয়াছিলেন মহর্ষি হোমর; তেমন এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ লিখিতে পারে নাই, পারিবেও না; তুমি সে দুরাশা পরিত্যাগ কর।" বাল্মীকি বলিলেন, "খুড়া অমন আশীর্ব্বাদ করিও না—মনুষ্য যাহা করিয়াছে, মনুষ্য তাহা করিতে পারে। হোমর ইলিয়াড্ লিখিয়াছেন আমি কি কিছুই লিখিতে পারি না? হোমর ইলিয়াড্ লিখিয়াছিলেন, আমি রামিয়াড্ লিখিব! আমার ইন্‌স্‌পিরেষণ আসিয়াছে, তোমার হার্প টা আমাকে দেও, আমি রামিয়াড্ গান করি।" এই কথা বলিয়া বাল্মীকি হার্প বাদনপূর্ব্বক গর্দ্দভ-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে উনবিংশ-শতাব্দীয় রামায়ণ গান আরম্ভ করিলেন। বাল্মীকির স্বহস্ত-পালিত আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ প্রভু-প্রসাদ গো-অস্থি রোমন্থ করিতেছিল—গীত-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক ভেউ ভেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। উভয় স্বর মিলিয়া একটি মধুর সঙ্গীত-লহরী গগনতলে সমুত্থিত হইল।

রাম নামে একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার দেহ মধ্যমাকার, হর্কু-লিসের ন্যায় দৃঢ় গঠন, নাসিকা রোমীয় ছাঁদের, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ চাপা, ইহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সূচিত হইতেছে। তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তল আবলুষ-কাষ্ঠ-বিনিন্দিত মসৃণ ললাটে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বোধ হইতেছে যেন বিশাল ওকগাছে আইবি লতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই লোক-পূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে নেষ্টরের ন্যায়, ধৈর্য্যে আল্প গিরির ন্যায়, বীর্য্যে এথিলিসের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে ক্যুপিডের ন্যায়, ক্ষমায় যীশুখৃষ্টের ন্যায়, ধনে রথচাইল্-ডের ন্যায়, শাস্ত্র-জ্ঞানে মোক্ষমূলারের ন্যায় অসাধারণ ছিলেন। তিনি রাজা দশরথের প্রিন্‌স্ অফ্ ওয়েল্‌স্। একদিন রাম মৃগয়ার্থ মিথিলা-সন্নিহিত কোন অরণ্যে খ্যাঁকশেয়ালী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী। নীলাভ উৎকৃষ্ট বনাতের কোট্ ও নব্যতম ঢপের চোস্ত পেন্‌ট্‌লুন পরিধান, মস্তকোপরি সোলার হ্যাট্, পদদ্বয়ে শীকারোপযোগী ওয়েলিংটন বুট্, আজানু-সমুত্থিত, এবং উইস্কির বোতল ও কাট্‌লেট্ সম্বলিত চর্ম্মঝুলি চর্ম্মোপবীতে আলম্বিত রহিয়াছে। শিঙ্গার নিনাদে, কুক্কুরের চীৎকারে, শীকারীগণের হুর্‌রে রবে, অশ্বের

হ্রেষাধ্বনিতে কানন-প্রদেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র বর্শা উদ্যত করিয়া শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া একেবারে কাননের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। শৃগাল দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল। রাম নিরাশ হইয়া একটা বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। সহসা রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর চীৎকার-ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাম একজন গ্যালাণ্ট্ লোক। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ধ্বনির অভিমুখে ধাবিত হইলেন!

কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, একটি চত্বারিংশৎ বর্ষীয়া বালিকা মূর্চ্ছিতা। রাম অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন—তাঁহার ব্যাগের মধ্যে আঘ্রাণ-লবণ খুঁজিলেন কিন্তু পাইলেন না। পরে উইস্কির বোতলে যে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ ছিল তাহার এক ডোজ বালিকাটির মুখে ঢালিয়া দিলেন—দিবা মাত্রই সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল—ক্রমে ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত হইল, চক্ষু মেলিতেই সম্মুখে রামকে দেখিতে পাইলেন—অমনি "O my!" বলিয়া দুই হাতে পুনর্ব্বার চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। রাম বলিলেন, "ভয় নাই, আমি আপনার রক্ষা-হেতু আসিয়াছি। কি জন্য আপনি ভয় পাইয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকা উত্তর করিলেন, "আমি আরণ্যক দৃশ্যের স্কেচ তুলিতেছিলাম আর আমার গাউনের আঁচল ঘেসিয়া কেমন একটা জন্তু—বোধ হয় শৃগাল -দৌড়িয়া চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি।"

রাম। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আছেন কেন?

বালিকা। আমার ভয় হইতেছে পাছে আবার শৃগালটা আসে—আমাকে যদি কেউ, এই অরণ্য-পথের রক্ষক হইয়া, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন, তবে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

রাম। তার জন্য চিন্তা কি?

এই বলিয়া বালিকাকে উঠাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি কি আপনাকে বাহুদান করিতে পারি?" সীতা বলিলেন "ধন্যবাদ আপনাকে।" রাম হস্ত বাড়াইয়া দিলেন, বালিকা ঈষৎ ব্লষ্ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি যে আমাকে এই মহা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহার ঋণ আমি কিরূপে পরিশোধ করিব?"

রাম। আমি যে উপকার করিলাম তাহা অতি সামান্য।

বালিকা। ও-কথা বলিবেন না—আপনার ন্যায় বীর পুরুষ উপস্থিত না থাকিলে নিশ্চয়ই আজ শৃগালের হস্তে প্রাণ হারাইতাম।

রাম। আমি থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই। এক্ষণে পরস্পরের নিকট আর অপরিচিত থাকা কর্ত্তব্য নয়। আমার নাম রাম—আপনার নাম জিজ্ঞাসার স্পর্দ্ধা কি মার্জ্জনা করিবেন?

বালিকা। আমার নাম মিস্ সীতা জনক।

রাম। ও! আপনি হিজ্ ম্যাজেষ্টী জনকের কন্যা? তিনি খুব একজন এন্‌লাইটেণ্ড লোক। আমার বলিতে সাহস

হইতেছে না—প্রথম দৃষ্টিতেই আপনাকে আমি ভাল বাসিয়াছি। এ ভক্ত কিঙ্কর কি আপনার পাণি গ্রহণের আশা করিতে পারে?

সীতা। (সলজ্জভাবে) সে পিতা জানেন।

রাম। তাঁর কাছে কি আমি প্রস্তাব করিতে পারি? তিনি সম্মত হইলে আপনার কোন আপত্তি থাকিবে না?

সীতা ব্লষ্ করিয়া নিরুত্তর হইলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে জনক রাজার প্রাসাদে পৌঁছিলেন।

রাম জনক রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক আপনার কুলের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আপনার কন্যার হস্তের নিমিত্ত আমি উমেদার।" জনক রাজা বলিলেন, "অতি উত্তম! কিন্তু আমার একটি বন্দুকভঙ্গ পণ আছে, তাহার আমি অন্যথা করিতে পারি না। আমি টাইম্‌স্-সংবাদ-পত্রে দেখিয়াছিলাম যে, কোন পর্য্যটক আফ্রিকাবাসী গরিল্লা নামক বীর-চূড়ামণিকে বন্দুক মারিতে যাওয়াতে তিনি তাঁহার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া এক মোচড়ে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরত্বের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমি আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমি দেশ-বিদেশে প্রচার করিলাম যে, গরিল্লা বীরকে আদর্শ মানিয়া, তাঁহার ন্যায় যিনি বন্দুক ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিব।" রাম বলিলেন, "আচ্ছা, আমি প্রস্তুত আছি।" অমনি এক জন তৈয়ার ভৃত্য দ্রুতগতি একটা মার্টিনি রাইফেল আনিয়া রামের সম্মুখে ধরিয়া দিল। রাম তাহা দুই হস্তে ধরিয়া একটি মোচড়েই কর্ম্ম নিকাশ করিয়া সাত হাত হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। জনক রাজা এবং পারিষদ্‌গণের তাক লাগিয়া গেল। জনক রাজা আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি যেরূপ অসামান্য বলবীর্য্য দেখাইলে, কন্যা-সম্প্রদানের অগ্রে, তাহার উপযুক্ত একটি উপাধি তোমাকে আমি প্রদান করিতে অভিলাষ করি। অনেকের অনেক প্রকার উপাধি আছে, যথা নর-ব্যাঘ্র, নর-পুঙ্গব, নর-র্ষভ, কিন্তু সে সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তুমি আজ হইতে লোকে নর-গরিল্লা নামে খ্যাত হইবে। এক্ষণে মিস্ জনকের সম্মতির কেবল অপেক্ষা, অতএব যাও তাঁহাকে রাজি কর গিয়া!" রাম সদ্য সদ্যই কোর্টসিপ্ সুরু করিলেন। সীতা যদিও চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকা বই নয়, কিন্তু তিনি সকল গুণেই গুণবতী ছিলেন। জনক রাজা একজন এন্‌লাইটেণ্ড্ লোক ছিলেন; তিনি বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অনেক সভায় বক্তৃতা দিতেন। তিনি আপন কন্যাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সীতা তাঁহার যত্নে সর্ব্বগুণে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। তিনি কার্পেট বুনানি কার্য্যে অতিশয় নিপুণা ছিলেন। ফরাশীশ্ ভাষায় নবেল পাঠ করিতেন। পল্কা এবং ওয়াল্‌টস্ নাচিতেন। প্যারিস নগরের নব্যতম ফেসিয়ানের গাউন পরিতেন —সহজে ব্লষ্ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলেই মূর্চ্ছা যাইতে পারিতেন। এমন রূপ-গুণে বিভূষিতা চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়া রাম যে মুগ্ধ হইবেন ইহাতে আর

বিচিত্র কি! তিনি শীঘ্রই কোর্টসিপ শেষ করিয়া ফেলিলেন এবং বিবাহের পর এক্ষণে তিনি মনের সুখে মধুচন্দ্র ভোগ করিতেছেন। ইতি সাত ক্যান্তো রামিয়াডের হনিমূন নামকোঽয়ং প্রথমঃ ক্যান্টো সমাপ্তঃ।

ছিটওয়ালা সিবিলিয়ান সাহেব

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, হুষ্টন (Houston) সাহেব নামক একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। ইনি উচ্চ কুলোদ্ভব ও একজন গবর্ণর জেনেরেলের স্ব-সম্পর্কীয়। ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি বাঙ্গালা, হিন্দি, পারসী, আরবী এই সকল ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন এবং এদেশের রীতিনীতি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। ইনি কার্য্যেও পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর ছিট্ ছিল। সে ছিট্ ছিট-মান যন্ত্রের ঠিক উনপঞ্চাশ সংখ্যা পর্য্যন্ত না পৌঁছাক, তাহার কাছাকাছি বটে।

যখন তিনি মেদিনীপুর জিলায় স্পেশল কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ঐ জেলার একজন চাষা জমীদারকে একবার একটী পরোয়ানা লিখেন। তখনকার রীত্যনুসারে ঐ পরোয়ানা পারসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। সে পরোয়ানার প্রথমে এই পাঠ ছিল। "ঈশপন্‌হা লাঙ্গল দস্তগা বাদো বয়েল বআফিয়ৎ বাশন্দ" "হে হলযন্ত্র ফলকপ্রতিপালক! হে হলযন্ত্রধারী! দুইটী বলীবর্দ্ধ লইয়া তুমি কুশলে থাক।" একদা ঐ জিলায় জমীদারী নিলামের দিন একটি তালুক লইয়া দুইজন জমীদারের প্রতিনিধি দুই মোক্তারের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন মোক্তারের নাম তুলসী, অপরের নাম দামোদর। তুলসীর চেষ্টা তালুকটি আপনার প্রভুর জন্য ক্রয় করে। দামোদরের চেষ্টা তাহার প্রভুর জন্য ক্রয় করে। দুইজনে নিলামের ডাক ডাকিতে ডাকিতে তুলসী কিছু ঘাটিয়া গেল। তখন হুষ্টন সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তুলসী! তোম কিস্‌ওয়াস্তে ঘট যাতে হো, দামোদরকা উপর চড়্ বইঠো।" হুষ্টন সাহেব অবগত ছিলেন যে আমরা শালগ্রামের উপরে তুলসী দিই। এই রীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

হুষ্টন সাহেব ভারতবর্ষকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কালীকা বিলাত, শিওকা বিলাত, জগন্নাথকি বিলাত। বিলাত শব্দে পারসীতে দেশ বুঝায়। কালীঘাটের কালী বঙ্গদেশের প্রধান দেবতা, এইজন্য বঙ্গদেশকে তিনি কালীকা বিলাত বলিয়া ডাকিতেন। কাশীর বিশ্বেশ্বর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান দেবতা, এইজন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে তিনি শিওকা বিলাত বলিয়া ডাকিতেন। জগন্নাথ উড়িষ্যার প্রধান দেবতা, এইজন্য উড়িষ্যা প্রদেশকে তিনি জগন্নাথের বিলাত বলিয়া ডাকিতেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণস্থিত অনার্য্য দেশ বলিয়া বোধ হয় তিনি তাহা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

তিনি ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত মান্য করিতেন, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীনকে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করিতেন। তিনি প্রত্যেক উমেদারের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া, বিশেষতঃ চাটুর্য্যে, বাঁড়ুর্য্যে, মুকুর্য্যে অথবা গাঙ্গুলী বলিয়া পরিচয় দিত; তাহা হইলে তাহার শীঘ্র কর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। নিকৃষ্ট জাতি হইলে ছয় বৎসর ধরিয়া ঘোল খাইতে হইত।

যখন তিনি মেদিনীপুর জিলায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন একজন সুবর্ণবণিক তাঁহার সেরিস্তাদার ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার উপরওয়ালা যে কমিশনর সাহেব ছিলেন, তিনি বিলাতের এক ধোপার ছেলে। সেরিস্তাদারের সহিত হুণ্টর সাহেবের সর্ব্বদা টক্-ঝক্ হইত, কিন্তু সে ব্যক্তি কমিশনর সাহেবের প্রিয়পাত্র বলিয়া তাহার কিছু করিতে পারতেন না। একদিন তিনি সেরিস্তাদারের উপর কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমারা পাণি কোই ছোঁতা নেই, তোমারা মনিবকা পাণিভি কোই ছোঁতা নেই।"

যখন তিনি কৃষ্ণনগর জেলায় বদলি হইলেন, তখন সেখানে গিয়া প্রথম কর্ম্মের চার্জ্জ লইবার সময় প্রত্যেক আমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমলাদিগের মধ্যে বেচারা সেরিস্তাদার চট্টগ্রামবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে হুণ্টন সাহেব বলিলেন, "হিয়া কাঁহাসে একঠো মগ্ আয়ারে?" চট্টগ্রাম জেলা ব্রহ্মরাজ্যের সন্নিকট প্রযুক্ত তাহার দক্ষিণভাগে অনেকগুলি মগের নিবাস আছে, এইজন্য হুণ্টন সাহেব সিরেস্তাদারকে মগ্ বলিয়াছিলেন।

উক্ত জিলায় কর্ম্ম করিবার সময় তিনি একবার একটী মোক্তারের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ রূলে হাত দিয়াছিলেন। মোক্তারকে মারিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল ভয় দেখাইবার জন্য ঐ প্রকার করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার মাত্র তাঁহার সেই রূল-স্পর্শের ফল অতিশয় ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। মোক্তার মনে করিল, সাহেব বুঝি তাঁহাকে মারিতে যাইতেছেন সেইজন্য সে পলাইল! সে যদি পলাইল আমলারাও পলাইল। মোক্তার-আমলারা যদি পলাইল তবে কাছারীর বাহিরে অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে উপবিষ্ট মকদ্দমাকারী ব্যক্তিগণও পলাইল। নগরের লোক দেখিল দুই তিন শত লোক কেবল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। কি খবর, না, সাহেব খেপিয়াছেন।

একজন ব্রাহ্মণ-পুত্র হুণ্টন সাহেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়া শেষে একটী কর্ম্ম করিয়া দেন। সে ব্যক্তি পরে ক্রমে ডেপুটি কলেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। সাহেব যখন হুগলীতে বদলী হইলেন, তখন সেই ব্যক্তি হুগলী জিলায় ঐ কর্ম্ম করিতেছিলেন। হুণ্টন সাহেব তথাকার কালেক্টর হওয়াতে তিনি তাঁহার অধীনস্থ হইলেন। সাহেব একদিন তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া চাপরাসীকে তাঁহার কান ধরিয়া ঘোড়দৌড়

করাইতে হুকুম দিলেন এবং সেই হুকুম-অনুসারে কার্য্যও হইল। হুষ্টন সাহেব এতদ্দেশে থাকিয়া প্রায় এতদ্দেশীয় লোক হইয়া গিয়াছিলেন। যখন ঐ হুকুম দিয়াছিলেন, তখন সে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; এবং এতদ্দেশীয় লোকে বাটীর চিরপ্রতিপালিত অন্নদাসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনিবেন কেন? তাঁহারা তাঁহাকে অস্বাস্থ্যকর চট্টগ্রাম জেলায় বদলি করিয়া দিলেন, 'সেইখানেই তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

বঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আমাদের পক্ষে একটী কঠোর কর্ত্তব্য বিশেষ। প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের শুদ্ধমাত্র, প্রাপ্তি স্বীকার করিলে গ্রন্থকার মহাশয়েরা কখনই তৃপ্ত হইবেন না, আবার তাহাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে গেলে ভারতীতে স্থান কুলাইবে না। সুতরাং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থের মোট দোষ-গুণ ব্যক্ত করা ব্যতীত বিস্তৃতরূপে দোষ-গুণ প্রদর্শন করিতে পারি না! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে এরূপ প্রণালী-অনুসারে অনেক সময়ে আমরা অনেক গ্রন্থকারের প্রতি অনিচ্ছাক্রমেও অন্যায় করিয়া ফেলি। একখানি পুস্তক সমস্তটা পড়িয়া হয়ত আমরা মোটের উপর প্রীতিলাভ করি, আর একখানি পুস্তকের সমস্তটা পড়িয়া হয়ত মোটের উপর আমরা বিরক্ত হই, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অনেক স্থল হয়ত খুব কদর্য্য হইতে পারে, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অনেক স্থানে হয়ত সুন্দর হইতে পারে। আমরা সংক্ষিপ্ত সমালোচন-স্থলে এই দোষ-গুণের সমন্বয় করিতে যতদূর-সাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইদানীন্তন গ্রন্থসমূহে দোষের ভাগ এত অধিক যে সরলভাবে সমালোচনা করিতে গেলে ইচ্ছা না থাকিলেও কতকটা কঠোর হইয়া পড়িতে হয়। যদিও আমরা জানি যে ক্ষেত্রমাত্রই নব উর্ব্বরতা লাভ করিলে তাহাতে ভাল দ্রব্যের সহিত আগাছাও উৎপন্ন হয়—ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত নব স্বাধীনতার সময় অনেক ভাল কার্য্যের সহিত অনেক জঘন্য কার্য্যও সম্পাদিত হইয়াছিল—ইংরাজি সাহিত্যে ড্রাইডেন ও পোপ কর্তৃক নব প্রণালী উদ্ঘাটিত হইলে থিওবোল্ড্ ও সিবর প্রভৃতিও কবিতা রচনা করিয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়াছিল, তথাপি ঐ সকল অশুভ অপরিত্যজ্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে দমনীয় নহে তাহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্য নব-জীবন পাইয়া যে সকল অসার প্রলাপে

দিক্‌বিদিক্ ধ্বনিত করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত অন্যায় নহে।"

* * *

কিন্তু সময়ে সময়ে এমন সুন্দর পুস্তকও প্রাপ্ত হইয়াছি যে তাহার সুরভি পাঠক মণ্ডলে বিকীর্ণ করিতে উৎসাহ ও উল্লাস পর্য্যন্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ অবসর আমাদের অদৃষ্টে অতি অল্প সময়ই ঘটিয়াছে। বঙ্গ সাহিত্য-উদ্যান আজ কাল নানা ফুল-ফলে সুশোভিত সন্দেহ নাই। সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ, ইংরাজি কাব্য-নাটকের অনুকরণে উপন্যাস ও কাব্য, নাটক ও নাট্য-গীতি প্রভৃতি দেশী বিলাতী সগুণ নির্গুণ নানা প্রকার "ইত্যাদিতে" চারিদিক সমাকীর্ণ। গ্রন্থকার হইবার উগ্র লালসায় কেহ পৈতৃক বিভব বিনষ্ট করিতেছেন, কেহ বা বিদ্যালয়ে পাঠ পরিত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছেন, এবং কেহ-বা রোরুদ্যমান সন্তান-সন্ততিকে প্রবঞ্চনা করিয়া যন্ত্রালয়ের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। অথচ গ্রন্থকার হইতেই হইবে। গ্রন্থকার না হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই—রাজ-কাছারিতে উত্তম পেশাদারীর সম্ভাবনা নাই, এমন কি, সময়ে সময়ে মনোমত বিবাহ হইবারও সম্ভাবনা নাই—সুতরাং গ্রন্থকার না হইলে আর উপায় নাই। সরস্বতী দেবীর উত্তেজনাতে না হউক, আবশ্যকতার উপরোধে বঙ্গ-যন্ত্রালয় অনন্ত-প্রসব-বেদনায় অস্থির। ইহার ফলস্বরূপ দেখিতে পাই, কোথাও হিড়িম্বা—কোথাও হিড়িম্বক। সময়ে সময়ে আমরা দু-একখানি প্রকৃত প্রশংসার গ্রন্থ প্রাপ্ত হই কিন্তু তাহা বঙ্গদেশীয় সুন্দর বনের বন-ফুলের মত অতিশয় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মভেদী ঔপন্যাসিক কবিত্ব, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর গভীর উচ্ছ্বাস, হেমচন্দ্রের নূপুর-নিক্কন, নবীনচন্দ্রের ইংরাজী বীরভাব, ও আরও দু-একজন প্রশান্ত কবির জ্যোৎস্নাময় কল্পনা-লহরীর কথা যদি উল্লেখ না করি, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের বাস্তবিক অবস্থা কি? কেহ বা চর্ব্বিত-চর্ব্বণের উপর চাক্‌চিক্যের আলেপন দিয়া, কেহ-বা স্বকপোল-কল্পিত বট্‌তলা উচ্ছ্বাসের তুফান তুলিয়া গ্রন্থকার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাসনা করেন। সমালোচকেরই মহা বিভ্রাট। তিনি বঙ্গ সাহিত্যে প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কখনই মিথ্যা চাটুবাক্যে অকিঞ্চিৎকর লেখক দিগকে স্ফীত করিতে চাহেন না, অথচ সত্য কথা বলিতে গেলে সরস্বতীর কৃত্রিম পোষ্যপুত্রেরা ক্রোধের বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকেন।

পথনির্দ্দেশ

বৈশাখে ভারতী চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। 'ভারতী'র সহিত আমার সম্বন্ধ অনেক দিনের, এজন্য সম্পাদকমহাশয়-কর্ত্তৃক ভারতীর পূর্ব্বস্মৃতি সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। যে-বয়সে শৈশব ও বাল্যের কথা অস্পষ্ট হইয়া আসে আমি এখন বয়সের সেই সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ভারতী যখন পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সম্পাদকতার অধীনে ছিল, তখনকার কথা সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে না। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রথম-হইতেই ভারতীর গ্রাহক ছিলেন; ইহার প্রচ্ছদ-পটে পদ্মবনের পদ্মাসনে আসীনা যে বীণাপাণির ছবিটা থাকিত তাহা বেশ মনে পড়িতেছে। সে সময়ে বোধ হয় আমি নূতন বাঙ্গলা পড়িতে শিখিয়াছি। কাগজ আসিলেই আমার পিতৃব্যমহাশয় তাহা দখল করিয়া বসিতেন, কেমন করিয়া কাগজখানি তাঁহার হাত হইতে লইব আমি তাহারি সুযোগ খুঁজিতাম; কাগজ হাতে পাইলে তাহা অনর্গল পড়িয়া যাইতাম। তখন আমার বয়স হয় ত আট বা দশ,—বলা বাহুল্য পড়িয়া কিছুই বুঝিতাম না। বেশ মনে পড়ে, সে সময়ে "তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক" নামে একটা দার্শনিক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে প্রকাশিত হইত, সেটাও আমার পঠিতব্য ছিল। কবিতা উপন্যাস কিছুই বাদ পড়িত না। কিন্তু কোন প্রবন্ধেরই অর্থ বুঝিতাম না। তখন মাসিক-পত্র বেশি ছিল না, ভাল বই হাতে পাইতাম না; দ্বিপ্রহরে মায়ের কাছ হইতে কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" লইয়া "কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ" প্রভৃতি সরস অংশগুলি বটতলার সেই ছবির সহিত মিলাইয়া পড়িতাম, কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি হইত না; বোধ হয় এইজন্যই ছাপানো বাংলা পুঁথি পাইলে আদ্যন্ত না পড়িয়া ছাড়িতাম না।

এই সময়ের একদিনের ঘটনা বেশ মনে পড়িতেছে। ভারতীতে তখন প্রায়ই কবিতা বাহির হইত, কে লিখিতেন তাহা মনে নাই। হঠাৎ একদিন খেয়াল হইল কবিতা লিখিব। চার-পাঁচ মাসের ভারতী একত্র করিলাম; এক কবিতায় দুই ছত্র আর-এক কবিতায় চারি ছত্র লইয়া এবং তাহাদের কথা ওলট্-পালট্ করিয়া কবিতা রচনা করিলাম। আমিই পরিবারস্থ বালক-বালিকাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম, যাহারা বয়সে ছোট তাহাদিগকে এই কবিতা শুনাইতে ইচ্ছা হইল না। দুই পয়সার টিকিট সঙ্গে দিয়া সেটি ভারতীর সম্পাদক-মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। সম্পাদকমহাশয় যে এই অমূল্য কবিতা কাগজে ছাপাইবেন, ইহাতে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না; সেজন্য বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন "স্থানাভাব" এই সম্পাদকীয় মন্তব্য-সহ তাহা আবার আমার হাতে ফিরিয়া আসিল তখন বড় দুঃখ পাইয়াছিলাম। আমি যে এই কাণ্ড করিয়াছি, আমার অভিভাবকেরাও

তাহা জানিতেন না। ডাকঘর বাড়ীর কাছে ছিল না। ডাক-পিওন প্রতিদিনই চিঠি বিলি করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিত, অনেক খোসামোদ করিয়া কবিতাটি তাহারি হাতে দিয়া ডাকে পাঠাইয়াছিলাম। এই দুর্ঘটনার পর আর কবিতা লেখার চেষ্টা করি নাই।

ইহার অনেক পরে যখন আমরা বেশ বড় হইয়াছি, তখন "দেওঘরে ভূতের অত্যাচার" বা এই রকমের একটা কিছু প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি রাজনারায়ণবাবুর লেখা। ইহা লইয়া আমাদের পরিবার-মধ্যে যে একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার মনে পড়িতেছে। সেই ভারতীখানি প্রায় মাসখানেক ধরিয়া সকলের হাতে হাতে ঘুরিয়াছিল; যাঁহারা ভূতে অবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারাও বোধ হয় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নিজের নামটা ছাপার অক্ষরে দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এক সময়ে এই ইচ্ছাটা আমাকে বড়ই পাইয়া বসিয়াছিল। তখন "বালক" প্রকাশিত হইতেছে, আমরা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সুহৃদ্বর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র তখন আমার সহপাঠী। সত্যেন্দ্রের একখানি "বালক" আসিত। সে যেদিন কাগজখানি কলেজে আনিত, সব কাজ ফেলিয়া সেদিন "বালক" পড়িতেই আমরা সময় কাটাইয়া দিতাম। "বালকে" কতকগুলি ভৌগোলিক হেঁয়ালি প্রকাশিত হইত এবং উত্তর-দাতাদের নাম কাগজে ছাপানো হইত। একদিন দেখিলাম সত্যেন্দ্রের নাম কাগজে ছাপা হইয়াছে। বড় ইচ্ছা হইল, নিজের নামটাও কাগজে উঠে। কতকগুলি হেঁয়ালির উত্তর করিয়া পাঠাইলাম; পরের মাসে কাগজে নাম ছাপা হইল, সেদিন খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম। ইহার পরে ভারতীতে প্রকাশিত অনেক হেঁয়ালির উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছি, নিজের নাম কাগজে বার বার ছাপা হইয়াছে।

আমরা যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে এফ, এ, পড়িতে আরম্ভ করি, তখন বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায় আমাদের সহপাঠী ছিলেন। দীনেন্দ্র তখন বেশ ভাল বাংলা লিখিতে পারিতেন, হঠাৎ একদিন দেখিলাম "দে-পাড়ার মেলা" নামে দীনেন্দ্রকুমারের একটা রচনা ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। দে-পাড়া কৃষ্ণনগরেরই নিকটবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম,—বৈশাখী পূর্ণিমায় সেখানে নৃসিংহ দেবের পূজার মেলা হয়; দীনেন্দ্র তাঁহার রচনায় ঐ মেলারই বর্ণনা করিয়াছেন। কতবার নৃসিংহদেবের মেলা দেখিতে গিয়াছি কত লোকের মুখে তাহার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর বিবরণ কেহ এমন ভাবে বলিতে পারেন নাই। খুব বিস্মিত হইলাম, বোধ হয় একটু হিংসাও হইল। দীনেন্দ্রকে প্রশংসা করিলাম, সে আরও মাসিক-পত্র হইতে তাহার রচনা আমাকে দেখাইল। যে একখানি পোষ্টকার্ডে "পদ্যমালা" নামক পুস্তকখানির সমস্ত কবিতা সে নিজের হাতে লিখিয়াছিল, তাহাও আমাকে দেখাইল। খুব তারিফ্ করিলাম। সেদিন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম আমিও একজন লেখক

হইব। কিন্তু লিখিব কি? দীনেন্দ্রের মত আমি কবি ছিলাম না, এবং ভাষার উপরেও আমার অধিকার ছিল না। সময়ই বা কোথায়? কলেজের পড়া মুখস্থ করিতেই সময় যাইত। কাজেই চেষ্টা শীঘ্র সার্থক হইল না। বোধ হয় ইহারি বৎসর-খানেক পরে, "সূর্য্য" সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কোন-গতিকে রচনা করিয়া ভারতীতে পাঠাইয়া দিলাম, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইল না। ইহাতে দমিলাম না,—পুরানো ইংলিশম্যান্ ষ্টেট্স্ম্যান ঘাঁটিয়া "কৃত্রিম রেশম" সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ খাড়া করিলাম। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত লইয়া তখন খুব আন্দোলন চলিতেছিল। প্রবন্ধটি ভারতীতে প্রকাশিত হইল,—দেখিলাম সম্পাদিকা-মহাশয়া অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া লেখাটি ছাপাইয়াছেন। ইহাই আমার প্রথম রচনা। তার পরে "অঙ্গারক শর্করা," "অঘোরপন্থী," ও "ফোনোগ্রাফ" প্রভৃতি অনেক লেখা একে-একে ভারতীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। গল্প স্বেচ্ছায় লিখি নাই, "বিপ্রলব্ধ" নামক একটা গল্পও ভারতীতে বাহির হইয়া গেল।

ইহাই ভারতী-সম্পর্কে আমার সাহিত্য-চর্চ্চার সূচনা। এই সময়ে পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে সদুপদেশ দিয়া যে-সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কথা জীবনে ভুলিব না,—ভারতীর আশ্রয়ে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ না করিলে, সূচনাতেই আমাকে এই পথ ত্যাগ করিতে হইত। মাতা যেমন শিশু পুত্রের অক্ষর-পরিচয়ের সাহায্য করেন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ঠিক সেইপ্রকারেই আমাকে লেখার সাহায্য করিয়াছেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-মহাশয়ের আবিষ্কার সম্বন্ধে আমি একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। ইহার মূলেও ভারতীর সম্পাদিকাদিগের সদুপদেশ বর্ত্তমান। বসু-মহাশয় যখন কলিকাতায় বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন, তখন বোধ হয় আমি কৃষ্ণনগর কলেজে বি, এ, পড়ি। তাঁহার বৈদ্যুতিক গবেষণার কথা আমরা জানিতাম না। শ্রীমতী সরলা দেবীই বসুমহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার আবিষ্কারের মুদ্রিত বিবরণী সংগ্রহ করিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম এবং সেগুলি ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই আমি বসু-মহাশয়ের আবিষ্কারগুলির সহিত পরিচিত হইয়া আসিতেছি।

সাহিত্যিকদিগের মধ্যে একা আমাকেই যে "ভারতী" পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে তাহা নয়। আজকালকার অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ভারতীর নিকটে ঋণী। শুনিয়াছি পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার পুত্রকন্যাদের বলিয়া থাকেন,—"কেবল তোরাই আমার পুত্রকন্যা নয়, আমার পুত্রকন্যা সাহিত্যিকের মধ্যেও অনেক আছে।" তাঁহার সাহিত্যিক সন্তানবর্গের মধ্যে আমিও স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

নূরজহান

[সমালোচনা]

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সহৃদয়তাপূর্ণ বদান্যতাগুণে পুরাতন বর্দ্ধমানের এক নিভৃত পল্লীনিহিত একটি জরাজীর্ণ মুসলমান-সমাধির সংস্কার সাধিত হইয়াছে। একটি সুবৃহৎ সরোবর-তীরে এই পুরাতন সমাধি অবস্থিত, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে পুরাকালে যে সকল অট্টালিকাদি বর্ত্তমান ছিল, তাহার যৎসামান্য চিহ্নমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাধিটির সঙ্গে যে সকল জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। তাহা ধীরে ধীরে বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে পাবনা-জেলার তাঁতিবন্দনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী-মহাশয় তাহাকে কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তখন আমাদের দেশে ইতিহাসের আদর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বলিয়া সে কাব্যের কথা অনেকেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সে অতীত ঘটনাবলী অভিনীত হইতেছে, এবং একাধিক লেখক গদ্য-প্রবন্ধেও তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহা এখন নূরজহানের কাহিনী নামে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের হিসাবে সে কাহিনী যেমন চিত্তাকর্ষক, ইতিহাসের হিসাবেও তাহা সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ।

'বাঙ্গলার বেগম'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের হিসাবে সেই

শের আফ্‌কনের সমাধি

অতীত কাহিনী অবলম্বন করিয়া, একখানি সচিত্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম—নূরজহান।* ঐতিহাসিক নিখিলনাথ তাহার 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়াছেন;—বর্ষীয়ান জলধর ও স্বনামখ্যাত অধ্যাপক যদুনাথ এই নবীন গ্রন্থকারকে "রচনাকালে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন" অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ "গ্রন্থাদি সাহায্য করিয়া উৎসাহান্বিত করিয়াছেন।" এরূপ গ্রন্থ যে উৎসাহ লাভের যোগ্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

নূরজহানের ইতিহাস বহু বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাহাকে জীবনচরিত না বলিয়া, ইতিহাস বলাই সঙ্গত। কারণ ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিহাসের একটি বিস্ময়পূর্ণ অধ্যায় কেবল নূরজহানের জীবন-কাহিনীতেই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহার সহিত একসময়ে বাঙ্গালাদেশের যাহা-কিছু সম্পর্ক ছিল, তাহার নীরব সাক্ষীরূপে বর্দ্ধমানের মুসলমান-সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান। গ্রন্থকার কোন্ কোন্ পুরাতন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রচনা-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, গ্রন্থ-শেষে একটি "প্রমাণ-পঞ্জী" সংগ্রহ করিয়া, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থ ক্ষুদ্র হইলেও, 'প্রমাণ-পঞ্জী' ক্ষুদ্র নহে। যাঁহারা অধিক কথা জানিতে চাহিবেন, তাঁহারা "প্রমাণ-পঞ্জীতে" উল্লিখিত বিবিধ গ্রন্থে তাহার সন্ধানলাভ করিতে পারিবেন।

মোগল বাদশাহ পুণ্যশ্লোক অকবর শাহ শাসন-নীতি গুণের সমাদর করিতে জানিতেন;—ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যও যথাসাধ্য আয়োজন করিতেন। ইতিহাসে ইহার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নূরজহানের কাহিনীতেও ইহার উদাহরণ দেদীপ্যমান।

পারস্যদেশের খোরাশান প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা গিয়াসুদ্দীন ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দেশত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সমভিব্যাহারে ভাগ্যান্বেষনার্থ ভারতবর্ষাভিমুখে আসিবার সময়ে কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী কান্তার মধ্যে কপর্দ্দকহীন গিয়াসের গর্ভভার-মন্থরা প্রিয়তমার গর্ভে নূরজহানের জন্ম হয়। বালিকার পিতা ও ভ্রাতা বাদশাহ অকবর শাহের কৃপায় উচ্চপদ লাভ করিয়া, মোগল রাজধানীতে বাস করিবার সময়ে, তাঁহাদের স্নেহের পুত্তলী মেহেরুন্নিসার অপরূপ রূপ-লাবণ্যে শাহজাদা সেলিম আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ন্যায়পরায়ণ অকবর শাহ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার আশায়, যুবক যুবতীকে পৃথক করিবার অভিপ্রায়ে, মেহেরুন্নিসাকে শের অফ্‌কন্ নামক এক বীরপুরুষের সহিত বিবাহ দিয়া, নবদম্পতীকে বর্দ্ধমানের "জাগির" দান করিয়াছিলেন। এইখানে মেহেরুন্নিসা সংসার পাতিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন।

"সলিমের হৃদয়ে বরবর্ণিনী মেহেরের চিত্র প্রস্তরাঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বদা দৃঢ়াঙ্কিত ছিল;—দূরত্ব বা কালের ব্যবধান তাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই।" অকবর শাহের পরলোকগমনের পর শাহজাদা সেলিম জহাঙ্গীর নাম-ধারণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, মেহেরুন্নিসাকে হস্তগত করিবার

* নূরজাহান্—মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও মিত্র-কোম্পানী (কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিংস, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

উপায় অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শের অফ্‌কন্‌ নিহত হইলেন, মেহের মোগল রাজ-প্রাসাদে আনীতা হইলেন,—

"এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে, যাহা করিয়া থাকে, তিনি তাহাই করিলেন;—তিনি সম্রাটের নিকট স্বামি-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিলেন।" বিচার হইল না;—চারি বৎসর পরে,—সম্রাটের সহিত মেহেরের বিবাহ হইয়া গেল;—তখন হইতে তিনি "নূরজহান্‌"-নামে ভারতের অধীশ্বরী হইলেন।

এই সময় হইতে নূরজহানের কথা বলিতে হইলে, জহাঙ্গীরের রাজত্বের কথা বলিতে হয়। সে রাজত্বের সমুদয় রাজকার্য্যের ভার ক্রমে ক্রমে নূরজহানের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"ইহা কি রূপের মোহ, না গুণের প্রতি সম্মান? ঐতিহাসিক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ।"

রূপের মোহ থাকিলেই গুণের প্রতি সম্মান নষ্ট হইতে পারে না—এক্ষেত্রে দুইটি চিত্ত-বৃত্তিই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। নূরজহান্‌ও তাঁহার কার্য্যকলাপে তাঁহাকে প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রীরূপে প্রকাশিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে তাঁহার কার্য্যকলাপের পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থশেষ করিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ করা কঠিন হইলেও, লেখক সেই কঠিন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, রচনা-ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসা লাভের যোগ্য। অলমতি বিস্তরেণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

দুই সন্ধ্যা

ললিত সকালবেলা স্ত্রীর মৃতদেহ দাহ করিয়া আসিয়া দোকান খুলিয়া বসিল।

মনোহারীর দোকান। আজ চার দিন দোকান খোলা হয় নাই;—স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে বসিয়া সময় গিয়াছে,—দোকান কি করিয়া খোলে?

দোকানের এক অংশে ঝাঁপ লাগাইয়া তারা স্বামী-স্ত্রীতে বাস করিত—পাশে একটু জায়গা ছিল সেইখানে তোলা উনুনে রান্না-বান্না হইত।

এই দোকানটি ললিতের শ্বশুরের ছিল। আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ললিত কলিকাতা সহরে নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, গ্রামের হরি-কাকার সঙ্গে চাকরির চেষ্টায় আসিয়া চারিদিক আঁধার দেখিতেছিল,—কোথায় একটু মাথা-গুঁজিয়া থাকে, কেই-বা দুমুঠা খাইতে দেয়, সেই সময় এই দোকানের মালিক নিতাই তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল।

নিতাই বৃদ্ধ,—ভক্ত বৈষ্ণবের মত তার চাল-চলন। সে তার মেয়েটিকে লইয়া এই দোকানে বাস করিত। বুড়া মানুষ;

একা দোকান চালাইতে পারে না, সে মনে মনে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজিতেছিল। ললিতকে দেখিয়া তার মনে হইল ছেলেটি চালাক, এবং অমন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি চাহনি যার সে কখনো নেমকহারামি করিতে পারে না। তার উপর সে যখন শুনিল ললিত বৈষ্ণবের ছেলে তখন সে একেবারে গলিয়া গেল।

পাঁচ টাকা মাহিনায় ললিতের চাকরি হইল। ঐ অল্প উপার্জ্জনে তো বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতায় থাকা চলে না, কাজেই নিতাই তাকে দোকান-ঘরেই রাখিবার বন্দোবস্ত করিল। রাত্রে সে সেইখানেই শুইয়া থাকিত। এবং হাঁড়িতে চাল দিবার সময় বেশী এক কুন্‌কের বরাদ্দ হইল।

নিতাই-বৈষ্ণবের মনে মনে বড় সাধ ছিল শ্রীবৃন্দাবনের ধূলায় পড়িয়া সে একবার গড়াগড়ি দেয় এবং যদি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা হয় ত ঐ ধূলার মধ্যেই মরিয়া জীবন এবং মরণ উভয়কেই সার্থক করিয়া তোলে। কিন্তু পথের কাঁটা ছিল কন্যা রাধামতী। তাকে কোথায় রাখিয়া যায়? সঙ্গে লইলে তো সেই মায়ার বন্ধনেই জড়াইয়া থাকিবে!

ললিত যখন এক-বৎসর তার দোকানে কাটাইল তখন সে তার ঘরের ছেলের মতো হইয়া গেছে। ললিতকে নিতাইয়ের গোড়া-থেকেই ভালো লাগিয়াছিল এবং সে ভালো-লাগাটা দিন দিন বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। প্রথম প্রথম সে ললিতের দিকে খুব খর দৃষ্টি রাখিয়াছিল কিন্তু কিছু দিন যাইতেই তার মনে হইল এতটা দৃষ্টি রাখিবার দরকার নাই—তার চেয়ে সেই দৃষ্টিটা যদি শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সমর্পণ করা যায় ত দৃষ্টিরও মাহাত্ম্য বাড়ে এবং এই চর্ম্ম-চক্ষের দৃষ্টি লইয়া অন্ধের মতো অন্ধকারে—সংসারের ঘানি-গাছে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না।

শ্রীবৃন্দাবনের দিকে মন যখন ছুটিয়াছে তখন তার পথও সেই বৃন্দাবনবিহারী তৈরী করিয়াছেন। এই ত তাঁর লীলা! ভক্তের জন্য তিনি ত কোল-পাতিয়া বসিয়াই আছেন। নিতাই হঠাৎ একদিন এই সত্যটা লাভ করিল। ললিতকে কে তার কাছে পাঠাইল? কেনই বা সে আসিল? চাকরির চেষ্টায় সে এখানে না আসিয়া অন্যত্র ত যাইতে পারিত—কলিকাতায় ত দোকানের অভাব নাই। এই রহস্যের মধ্যে নিতাই শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানের ইঙ্গিত দেখিতে পাইল—যে আহ্বানে যমুনা উজানে বহিয়া যায়, যে আহ্বানে গোপিকারা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে।

নিতাই বুঝিল বাঁশির ডাক তার কানে আসিয়া লাগিয়াছে, মন তার উতলা হইয়া উঠিল, সে বৃন্দাবনে ছুটিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। পথের যে বাধা ছিল এখন ত তার উপায় হইয়াছে, আর ভাবনা কিসের! সে আর ভাবনা-চিন্তা করিল না; চিন্তামণি যখন চিন্তা করিয়া সব ঠিক করিয়া দিয়াছেন তখন তার আর ভাবনা কিসের? সে স্থির করিয়া ফেলিল ললিতের হাতেই কন্যাটিকে সমর্পণ করিয়া সে বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবে।

ললিত প্রস্তাবটা শুনিয়া প্রথমে চমকাইয়া উঠিয়াছিল; এমন ঘটনা তার কল্পনাতেও

কখনো আসে নাই। সে ভয়ে-ভয়ে ছিল বুড়াটা মরিয়া গেলে তার অবস্থা কি হইবে! এই ভাবনায় অনেক রাত্রে তার ভালো করিয়া ঘুমই হইত না। কলিকাতা সহরকে তার মহাসমুদ্র মনে হইত। দুই দিন মাত্র চাকরির ধান্দায় ঘুরিয়া সে যেন এর কূল-কিনারা দেখিতে পায় নাই ;—অগাধ জলের মধ্যে মানুষ যেমন স্থির হইয়া দাঁড়াইবার অবলম্বন পায় না, কলিকাতার মধ্যে ঘুরিয়া তার ঠিক তেমনি অবস্থা হইয়াছিল—এক-একটা প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতো ভয়ের ধাক্কা, দুশ্চিন্তার ধাক্কা কেবলই ঘাড়ের উপর পড়িয়া নাকানি-চোবানি খাওয়াইয়াছিল। বুড়া মরিয়া গেলে পাছে আবার সেইরূপ হয় মনে মনে অত্যন্ত আতঙ্ক ছিল।

এই মনোহর দ্রব্যসম্ভারে সাজানো মনোহারী দোকানখানি ছিল বিবাহের যৌতুক। এ প্রলোভন এড়ানো ললিতের পক্ষে শক্ত ছিল। এই মনোহারী দোকানখানি চোখের সাম্‌নে একটি নিশ্চিন্ত জীবনের সুখস্বপ্ন সৃজন করিয়া ললিতকে তন্ময় করিয়া দিল। বুড়ার কথায় সে এতটুকু আপত্তির আভাস পর্য্যন্ত তুলিতে পারিল না।

যথানিয়মে বিবাহ হইয়া গেল।

নিতাই যেদিন বৃন্দাবন যাত্রা করিল ললিত ও রাধামতী তাহাকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল। রাধামতীর চোখের জল আর থামেনা,—ললিত হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সে রাধামতীর হাত ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া আনিল।

ললিত যেখানে ভৃত্য ছিল সেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিল। ছেলেবেলায় সে এইরূপ একটা গল্প শুনিয়াছিল—এবং মনে মনে সেই গল্পের নায়কের প্রতি তার হিংসা হইয়াছিল। আজ সেই নায়কের সহিত তার নিজের অবস্থার সাদৃশ্য দেখিয়া সে ভারি আনন্দ ও আমোদ বোধ করিতে লাগিল। রাধামতী প্রথম-প্রথম কয়েকদিন বাপের শোকে মন-মরা হইয়া ছিল; তার সে ভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল। যে চিরজন্মের পরিচিত সে মনের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তার পরিবর্ত্তে এক নবপরিচিত আসিয়া সামনেটা দখল করিয়া বসিল।

দোকানের আয় মন্দ ছিলনা—দুটি প্রাণীর পক্ষে যথেষ্ট।

ললিত সাম্‌নে বসিয়া দোকানের বেচা-কেনা করিত, রাধামতী ঝাঁপের আড়ালে গৃহ-কর্ম্ম করিত। কিছুকাল পূর্ব্বে আর-একটি দম্পতি ঠিক এমনি করিয়া এইখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—তাহারা আজ কোথায়? তখন রাধাই বা কোথায় ছিল, ললিতই বা কোথায় ছিল!

এই দম্পতির জীবন একটানা স্রোতের মতন—দিনের পর দিন সমানভাবে কাটিয়া যায়। প্রভাতের আলো প্রতিদিন সেই অন্ধকার ঘরখানির কাছে একবার একটু হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং সন্ধ্যার সময় এই নবদম্পতিকে আড়াল করিয়া একটি কালো পর্দ্দা টানিয়া চলিয়া যায়। এদের সেই জীবনস্রোতে বিশেষ কোনো চঞ্চলতা ছিলনা—কেবল মধ্যে একদিন বৃদ্ধ নিতাইয়ের মৃত্যুসংবাদ আসিয়া দুজনকেই একবার নাড়া দিয়া গিয়াছিল।

তারপর এই তিনবৎসর পরে ললিত বড়-রকমের ধাক্কা খাইল স্ত্রীর পীড়ায়! ইতিমধ্যে একটু-আধটু গোলমাল গিয়াছে বটে,—দোকানে ধার পড়িয়া দুর্ভাবনা উঁকি মারিয়াছে, কিছু কিছু লোকসান হইয়া মন খারাপ হইয়াছে কিন্তু ভবিষ্যতের আশা সে আঘাতগুলিকে তেমন-করিয়া গায়ে বিঁধিতে দেয় নাই। কিন্তু এইবার একাদিক্রমে তিন মাস স্ত্রীর পীড়ায় সে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হাতে যা-কিছু সঞ্চয় ছিল একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেছে—এমন কি মহাজনের কাছে দেনা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এত করিয়াও স্ত্রীর যদি একটু সুরাহা হইত ত সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিত কিন্তু তারও কোনো আশা দেখা যায় না।

এদিকে মহাজন তাগাদা দিতেছে, ঘর-ভাড়া প্রায় চার মাসের বাকি পড়িয়াছে—বাড়িওলার দরোয়ান রোজ আসিয়া যাচ্ছে-তাই করিয়া যায়, দোকানের যে-সব জিনিষ ফুরাইয়াছে তাহা আর পূর্ণ করা হইতেছে না,—অর্থ নাই, স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া যাইবারও যো নাই—কাজেই দোকানের বিক্রি কমিয়াছে। ললিতের অবস্থা একেবারে নাজেহাল। চতুর্দ্দিক হইতে সে বিব্রত। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে নিরাশ্রয়তার তুফানে পড়িয়া সে দিশেহারা হইয়াছিল—এবং এই দোকানঘরটিতে কূল পাইয়া হাঁফ-ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তার মনে হইতে লাগিল, এই ছোট্ট ঘর-খানির ভিতরকার তুফান তার চেয়ে বড় কম নয়—বরং এ আরো ভয়ানক! * * *

গতরাত্রে তার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন এমন অবস্থা যে সৎকার করিবার মতো অর্থটুকুও ঘরে নাই। মৃত স্ত্রীর হাত হইতে রূপার চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া সে-অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

এই চার দিন তার কোথা-দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়াছে সে মনে করিতে পারে না। আজ স্ত্রীর দাহকার্য্য শেষ করিয়া সে যখন দোকান খুলিয়া বসিল তখনও শোকের ধাক্কা সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। বরং ভিতরে ভিতরে সে একটা নিশ্চিন্ততা বোধ করিতেছিল।

চার দিন দোকান খোলা হয় নাই। জিনিষপত্রে ধূলা জমিয়াছে! সে অন্যমনস্কে সেই ধূলা ছাড়িতে লাগিল। বেলা তখন প্রায় বারোটা—এই সময় প্রতিদিন সে খাইতে যাইত;—রাধামতী ঝাঁপের পিছন হইতে টোকা-মারিয়া জানাইয়া দিত খাবার তৈরি। জিনিষ ঝাড়িতে ঝাড়িতে হঠাৎ ঝাঁপের গায়ে একটা শব্দে সে অন্যমনস্কে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর তার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। একটা টিক-টিকি ঝাঁপের উপর দিয়া দৌড়িয়া গেল।

সে ফিরিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তামাক-সাজা শেষ হইলে মনে হইল—যাই ভিতর হইতে একটু আগুন লইয়া আসি; ঝাঁপের কাছ-বরাবর গিয়া সে ফিরিয়া আসিল। এমন সময় এক খরিদ্দার হাজির। খরিদ্দার দেখিয়া ললিতের মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি খরিদ্দারের চাওয়া জিনিষটি তুলিয়া ধরিল। দাম ঠিক করিয়া সে একটা টাকা

জলপ্রপাত

বাহির করিল। টাকার পয়সা চাই, ললিত হাতবাক্সটা টানিয়া আনিল। কিন্তু চাবি কোথায়? ওঃ চাবিটা ত আনা হয় নাই; রাধার কাছে আছে বটে! সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চাবি আনিতে গেল—ঝাঁপের কাছে গিয়া যেন একটা ধাক্কা খাইল। ফিরিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে বলিল—"টাকার পয়সা তো নেই, আপনার কাছে কি খুচরা হবে না?" খরিদ্দার বলিল—"না!" ললিত তার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। খরিদ্দার খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল, তারপর জিনিষটি রাখিয়া চলিয়া গেল। ললিত অনেকক্ষণ শূন্য-দৃষ্টিতে তার চলিয়া-যাওয়ার দিকে চাহিয়া রহিল। আজ চারদিন পরে একটিমাত্র খরিদ্দার—তাও ফিরিয়া গেল।

সে হিসাবের খাতাখানা টানিয়া বাহির করিয়া দেখিতে বসিল। হঠাৎ একবার মনে হইল ভয়ানক তৃষ্ণা পাইয়াছে—কিন্তু দোকানঘরের মধ্যে জলের কলসী খুঁজিয়া পাইল না। ওঃ সেটা যে—।

দেয়ালে ঠেসান্ দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ললিতের তন্দ্রা আসিতেছিল। বোধ হয় সে একটু ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিল। হঠাৎ একটা গোলমালে সে চমকিয়া উঠিল। দোকানের সামনে রাস্তার উপর কয়েকটা লোক হল্লা করিতেছে—বাড়িওলার দরোয়ান-টাও সেখানে আছে। দরোয়ানকে দেখিয়া তার বুকটা একবার ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে উঠিতে পারিল না, অবসন্নভাবে বসিয়া রহিল। লোকগুলা একেবারে তার দোকানের উপর উঠিয়া আসিল। দরোয়ানটা একবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ সেই শালা!" তারা দোকানের জিনিষপত্র ঘাঁটিয়া, নামাইয়া ওলট-পালট করিয়া একাকার করিতে লাগিল। লোকে যেমন নাটক-অভিনয় দেখে ললিত তেমনি করিয়া বসিয়া সব দেখিতে লাগিল। সে যেন কেমন-তর হইয়া গিয়াছিল; তার যে কিছু বলিবার আছে, করিবার আছে এমন কোনো উত্তেজনা তার মনের মধ্যে উঠিতেছিল না। তবে তারা যখন ঝাঁপ ঠেলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিতে যায় তখন সে একবার চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই আবার ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

দোকানের চারিদিকে একটা গোলমাল চলিতেছিল,—ললিতের কানে আসিয়া লাগিতেছিল কিন্তু মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল না। এমনি করিতে করিতে শীতের অকাল-সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিল। একজন জমাদার আসিয়া ললিতকে বলিল—"এখান থেকে বেরো!" ললিত তার দিকে হতভম্বের মত চাহিয়া বলিল— "অ্যাঁ!" সে ধমক দিয়া বলিল—"এখান থেকে বেরো!" ললিত আমতা-আমতা করিয়া বলিল—"কোথা যাবো?" একজন পিছন হইতে চীৎকার করিল—"যমের বাড়ি!" তারপর ললিতকে হাত ধরিয়া দোকান-ঘর হইতে বাহির করিতে লাগিল। ললিত বলিল—"আমার জিনিষপত্র?" জমাদার বলিল—"ওসব ক্রোক হয়েছে, নিলাম হবে!" ললিত তেমনি কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"নিলেম হবে কেন?" একজন বলিল—"ন্যাকা! ঘরের ভাড়া দিসনি -জানিসনে!" ললিতের যেন ভোলা-

কথা মনে পড়িয়া গেল, সে শুধু বলিল—"ও!"

সে ধীরে ধীরে দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন শীতের সন্ধ্যা আকাশে কুয়াসার জাল ছড়াইয়া দিয়াছে। রাস্তায় নামিয়া ললিতের মনে হইতে লাগিল সে এমনি এক সন্ধ্যায় এই ঘরটিতে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

চিত্র-পরিচয়

"আর্ম্মাডা" ধ্বংসের পরে রাজ্ঞী এলিজাবেথের শোভাযাত্রা

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও স্পেনে বহুবর্ষব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। স্পেন নানারূপে ইংলণ্ডকে পরাভূত ও রাজ্ঞী এলিজাবেথকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। অবশেষে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্পেন এক সুবৃহৎ রণতরী-বাহিনী গঠিত করিয়া ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। "অপরাজেয়" বা "আর্ম্মাডা" (Armada) নামে এই বাহিনী অভিহিতা হয়। জুলাই মাসের ১৯শে তারিখে আর্ম্মাডা ইংলিশ চ্যানেলে উপনীত হয়। প্রায় এক সপ্তাহের যুদ্ধের পরে ক্ষুদ্র ইংরাজ-বাহিনী এই দুর্জ্জয় আর্ম্মাডা-পরাজয়ে সক্ষম হয়। এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভে রাজ্ঞী ও ইংরাজজাতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই জলযুদ্ধে পরাজিত হইলে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা হারাইবার বিশেষ ভয় ছিল। যুদ্ধজয়ান্তে রাজ্ঞী এলিজাবেথ পারিষদ-বেষ্টিত হইয়া গির্জ্জায় গমন করিতেছেন, ইহাই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সমালোচনা

কয়েকটি কবিতা। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দাসবর্ম্মা, বি, এ প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কয়েকটি খণ্ড কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতার মধ্যে সত্যকার কবিত্ব আছে। ভাব বিচিত্র, সুন্দর; ভাষা সহজ, স্বচ্ছ; ছন্দেও লীলা-মাধুর্য্য আছে। এই লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

আশাচন্দ্র শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা কর্ত্তৃক মাতৃনিকেতন হইতে প্রকাশিত। ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। গ্রন্থের কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই—আয় "শ্রীকেশব মাতৃভাণ্ডারের অনাথ বালক বালিকা, অসহায় বিধবা ও সাধু-সেবার্থ উৎসর্গীকৃত।" এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ৺কেশবচন্দ্র সেন-মহাশয়ের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভাষায় কোন আড়ম্বর নাই, পাণ্ডিত্য-সমাবেশের প্রয়াস নাই অথচ তথ্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থখানি সুপাঠ্য।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

মৃগ-তৃষা

৪০শ বর্ষ]　　　আষাঢ়, ১৩২৩　　　[৩য় সংখ্যা

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বঙ্গসাহিত্যের পুনরুদ্দীপন হয়। এই সময়ে বিদ্যাসাগর-মহাশয় জীবিত—ভূদেব, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র কলম ধরিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন স্ফুটনোন্মুখ। বঙ্গকুলকামিনীগণও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধানা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী। এই সকল লেখকদিগের মধ্যে দুই-চারিজন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় সমবেত হইলে তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইত, কেহ যদি তাহা বিবৃত করিতে পারিত, তাহা হইলে উহা যে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সাদরে পঠিত হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কথোপকথনে দেশী ও বিদেশী কাব্য ও নানাশাস্ত্রের আলোচনা এবং নূতন পুস্তকাদির সমালোচনাও হইত। ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায়গণ উপস্থিত থাকিলে চুটকি-বিচারও চলিত। আবার এই কথোপকথনের মধ্যে শান্তিপুরের একটা ভূত কিরূপ সমারোহে তাহার বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, সে গল্পও থাকিত; দীনবন্ধুর গল্প এবং নানাপ্রকার রহস্যের কথাও থাকিত। আমি কখনও এই কথোপকথন-বিষয়ে কিছু লিখিবার চেষ্টা করি নাই। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে বসিতাম, তাহা হইলে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে সময় আমার অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন বঙ্কিম-প্রসঙ্গ দুই-চারিটা প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কেবল তাঁহার জীবনের ঘটনা অবলম্বনে মাত্র।

কথিত আছে যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের জীবনী লিখিত হয়, প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের দুই একটা ঘটনা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কোন

উদ্দেশ্য লইয়া লিখি নাই। এ বয়সে সে সব কথার আলোচনায় নিজে তৃপ্তি পাই, তাই লিখি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়, বন্ধু ও পাঠকগণের সে সকল প্রসঙ্গ ভাল লাগিতে পারে, এইজন্য লিখি।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। পিতৃদেব তখন ঐ স্থানে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেডমাষ্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাশ-পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময় তাঁহার যে এক বেলার মধ্যে বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। টিড্ সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং পরে তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে বৈকালে টিড্ সাহেবের বিবি লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন। আমাদের বাসার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠে স্কুল ছিল। ঐ স্কুল-বাটীতেই তাঁহাদের বাসা ছিল। এখন সেখানে স্কুল নাই, সে মাঠে সরকারী বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে ঐ স্থানে যাইতেন। এই সময়ে মলেট সাহেব নামে একজন হ্যালুবরি সিভিলিয়ান মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। টিড্ সাহেবের বিবির সহিত তাঁহার বিবির বিশেষ প্রণয় ছিল। টিড্ সাহেবের বিবি তাঁহার ছেলেদের ও বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া প্রতিদিন বৈকালে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে যাইতেন। মলেট সাহেবের বাটী আমাদের বাসার উত্তরে, মধ্যে কেবল একটা মাত্র উচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান। শুনি[illegible], বঙ্কিমচন্দ্র বসিয়া বিবিদের সহিত গল্প করিতেন, ও তাঁহাদের ছেলেরা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিত। বঙ্কিমচন্দ্র দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিতেন না, সেজন্য কখনও বলিষ্ঠও ছিলেন না।

এইরূপ প্রায় তিনবৎসর কাল বৈকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। হঠাৎ একটা ঘটনায় যাতায়াত বন্ধ হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় মলেট সাহেবের কুঠির মাঠে টেবিল-চেয়ার পড়িল, বিবিরা চা প্রস্তুত করিতে উঠিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে কুঠির ভিতর হইতে একজন অপরিচিত সাহেব আসিয়া ছেলেদের ডাকিয়া লইয়া চা খাইতে গেলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকেন নাই। বালক বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন; পরে আর ঐ কুঠিতে যান নাই—টিড সাহেবের কুঠিতে গিয়াছিলেন বটে। ইহার দিনকয়েক পরেই পিতৃদেব কলিকাতার আলিপুরে বদলি হইলেন। এই

সময় মলেট সাহেবের সহিত পিতৃদেবের দেখা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কুঠিতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া সাহেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিনবৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিলাতী পরিবারের সংস্রবে আসায় তাহার কোন ফল ফলিয়াছিল কি না, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই।

মেদিনীপুর ত্যাগ করিবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বের কথা আমার মনে পড়ে। মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁঠাল পাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজের নূতন Session খুলিলে, তথায় ভর্ত্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট্ টিউটর নিযুক্ত হইল।

কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা কবিতা শিখিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বিস্তর ভদ্রলোক আসিতেন। তন্মধ্যে একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। যেটি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন এবং ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করাইয়া লইতেন। আর বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত। তখন তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের বাটীতে "প্রভাকর" ও "সাধুরঞ্জন" পত্রিকা আসিত; উহার মধ্যে যে কবিতাগুলি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র সে-সমস্তই কণ্ঠস্থ করিতেন।

একালে যেমন recitationএর একটা হুজুগ উঠিয়াছে, পুরস্কারের জন্য ছাত্রেরা ঘরে ঘরে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতা তেমনি আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার আবৃত্তির সময়াসময় ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সুলেখক বলিয়া সাধারণে পরিচিত, কিন্তু তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলেন, তাহা অনেকে জানেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতন সৃষ্টি হইলে উহার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিত, কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে "মেঘনাদ বধ" কাব্য পাঠ করিতে শুনিলাম, সেইদিন হইতে আমি এই কাব্যের গোঁড়া হইলাম। কতবার উহা পড়িয়াছি, তাহার ঠিক নাই! বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে পড়িতাম। তিনি যখন পুস্তক পাঠ করিতেন, সকলে নিঃশব্দে শুনিতেন। বাল্যকালে তিনি যখন কবিতা বা শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তখন আশে-পাশে লোক দাঁড়াইয়া শুনিত। একদিন তিনি তাঁহার পড়িবার ঘরে বসিয়া "পদাঙ্কদূতে"র "গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা-কচিৎইন্দুবরাক্ষি" ইত্যাদি শ্লোকটির আবৃত্তি করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ ঘরে অনেকগুলি পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে দেশবিখ্যাত পরমপূজ্য পণ্ডিত ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ছিলেন। ইঁহারা পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি এই পড়িবার ঘরে থাকিতাম, পড়ি না পড়ি, একখানি পুস্তক হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর সময়-সময় ঢুলিতাম,

বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ঢুলিতে ঢুলিতে ঐ স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িতাম। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একজন প্রতিভাবান্ ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বোধ হয় ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভিন্ন তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বসাইলেন ও তর্কচূড়ামণি-মহাশয়ের অনুরোধে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পর হইতে চূড়ামণি মহাশয় মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে আসিতেন, ও মহাভারতের অনেক কথা শুনাইতেন। তাঁহারই নিকট "নলোপাখ্যান" ও "শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান" আমি প্রথম শুনি। আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা চূড়ামণি-মহাশয়ের প্রতিভাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নতুবা এই অসাধারণ পণ্ডিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য এত চেষ্টিত হইবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় পিতৃদেবের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু বালক দুইটা ভাষা একসঙ্গে শিখিতে পারিবে না, এই উত্তরে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে সর্ব্বদা শুনিতাম, "বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়, সাপিনী তাপিনীতাপে বিবরে লুকায়।" যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের ছন্দবন্ধের বড় প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বের বড় করিতেন না। দুর্গেশনন্দিনীর আসমানির রূপবর্ণনা পাঠ করিলে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার এই মত চিরস্থায়ী ছিল কি না জানি না, কেন না তাঁহার মতামত চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল ছিল, সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রতি সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইত। এমন কি তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে "ইন্দিরা" উপন্যাসটি rewrite করিবেন এমন ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

জয়দেবের "ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" কবিতাটি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, এই কবিতাটি তাঁহার মুখে শুনিতাম, যখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিতেন, বাহিরের লোক কেহ ঘরে থাকিত না, তখন উহা আওড়াইতেন। ঐ কবিতাটি যে তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহার স্মৃতি "আনন্দ-মঠে" রাখিয়া গিয়াছেন, যথা ঃ—

> "ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
> মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমনবিলম্বন অতিবিধুরা সুকুমারী।"

আর একটি গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বাল্যকালে আপনি এই গীতটিতে মাতিয়াছিলেন, পরে আনন্দমঠের সন্তানদিগকেও এই গীতে মাতাইয়াছিলেন। একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে এই গীত তিনি প্রথম শুনিলেন। মাঘমাসের—প্রথমেই এক রাত্রিশেষে এক বৈষ্ণব খঞ্জনি বাজাইয়া সদর রাস্তায় এই গানটি গাহিতেছিল, আমি তখন জাগ্রত—মধুর কণ্ঠে এই রাত্রে কে গীত গাহিতেছে শুনিয়া অগ্রজকে উঠাইলাম; গান শুনা যাইতেছিল না, অগ্রজ একটা জানালা খুলিয়া দিলে গীতটি শুনিতে পাইলাম—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।" বৈষ্ণব এই গীতটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুর বাটীর দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র "হরে

মুরারে মধুকৈটভারে” আওড়াইতে আওড়াইতে জানালা বন্ধ করিলেন। পর রাত্রে ঠিক ঐ সময়ে আসিয়া বৈষ্ণব সেই গীতটিই গাহিল! এইরূপ কয়েক রাত্রি ধরিয়াই তিনি গানটি শুনিলেন। ইহার পর অষ্টপ্রহর এই গীতটি তাঁহার মুখে শুনিতাম।

দোলের পূর্ব্বরাত্রে আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে বড় ধুম হইত, নেড়াপোড়া হইত, অনেক বাজি পুড়িত, রাত্রে যাত্রা অথবা কীর্ত্তন হইত। এই উপলক্ষ্যে অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইতেন, ইতরলোকের ত কথাই ছিল না! মেদিনীপুর হইতে আসিবার পর প্রথম দোলযাত্রার এই দিন আমার বিশেষ স্মরণ আছে। ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত্রি—মধুযামিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চির-দিনই স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে ভাল-বাসিতেন, আজ রাত্রে তাঁহার ভারি স্ফূর্ত্তি,—কখনও অর্জ্জুনা পুষ্করিণীর ধারে, কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও বা এখানে-ওখানে বেড়াইতেছেন—অবশেষে ঠাকুর-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরবাড়ী লোকারণ্য, ভিড় ঠেলিয়া মন্দির-মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কীর্ত্তন হইবে, চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে। একস্থানে অনেকগুলি ভাটপাড়ার পণ্ডিত পৃথগাসনে বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তিনি ডাকিয়া কাছে বসাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি এই যে, যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ইতর-ভদ্র মেয়ে-পুরুষ সকলেই জপ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি ষোলশ’ গোপিনীর ভর্ত্তা ছিলেন? তিনি গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন?—বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিবা-মাত্র সমবেত পণ্ডিত ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইলেন। চূড়ামণি-মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর করিতে করিতে বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে পরে দিব, এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে না, তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ-চরিত্র।

এই প্রশ্নে কি প্রাচীন, কি যুবা সকলেই সে রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কেন না সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত! তাঁহারা জানিতেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলাখেলা করিয়া ছিলেন! ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সামান্য ঘটনা, সামান্য কথা বহুদিন ধরিয়া আন্দোলিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা লইয়া কিছুদিন বিস্তর আন্দোলন চলিয়াছিল। সেইজন্যই কথাটা আমার স্মরণ আছে। আক্ষেপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পরম বন্ধু চূড়ামণি-মহাশয় ইহার অল্পকাল পরেই স্বর্গারোহণ করিলেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কালো ছায়া

(গল্প)

যাহা থাকিলে মানুষকে সুন্দর বলা যায় সুকুমারের তাহার অভাব ছিল না। বেশ লম্বা, রং ফর্সা, চোখদুটি বড়বড়, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, নাকটি টিকলো। কিন্তু তাহার শরীরের মধ্যে কিসের একটা গুরুতর অভাব ছিল যাহাতে তাহাকে অত্যন্ত কুশ্রী এবং কেমন-এক-রকম দেখাইত; —এ সব থাকিয়াও না থাকার সমান হইয়াছিল।

সুকুমারের এই চেহারা আমার কাছে প্রহেলিকার মতো ঠেকিত। আমি অনেক দিন এই প্রহেলিকা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই। চোখের সাম্নে তাহার দেহের যে দোষ ধরা পড়িত তাহা অতিক্রম করিয়াও এমন-একটা-কি ছিল যাহা তাহার চেহারাকে অমন-ধারা অদ্ভুত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সেটা যে কি তাহা বলা বড় শক্ত।

প্রথমেই আমার চোখে যেটা তার সব-চেয়ে বড় দোষ ধরা পড়িয়াছিল তাহা এই যে, সে অত্যন্ত রোগা। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের যে ছবি দেখিয়াছি তার পাশে সুকুমারকে অনায়াসে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়—মোটেই বেমানান হয় না। এই অতি-ক্ষীণতা যে তাহার দেহের সৌন্দর্য্যকে গিলিয়া ধরিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চোখ-দুটি বড়-বড় বটে—কিন্তু তারই নীচে যে ডোবর তাহাতে ডুবিয়া থাকাতে সে চোখের কোনো মাধুর্য্যই প্রকাশ পাইত না; সে চোখ যদি ভাসিতে পাইত আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তার জোড়া মেলা ভার। নাকটি টিকলো—কিন্তু তার দুপাশের গাল এমন ভাঙিয়া পড়িয়াছে যে মনে হয় একটা সরল রেখা যেন শূন্যে ঝুলিতেছে। মাথার চুল কোঁকড়া—কিন্তু দেহের তুলনায় মাথাটা এমনি বড় যে সে কুঞ্চিত কেশ মাথার শোভা না হইয়া ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু সুকুমারকে ভালো করিয়া দেখিলে বোধ হয়, শুধু এই রুগ্নতা নয়, কুশ্রীতার আরও-একটু কিছু কারণ ভিতরে আছে।

সুকুমারের সঙ্গে আমরা এক মেসেই থাকিতাম। সে কোন্-এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে কাজ করিত। আমাদের মেসে সবাই বিবাহিত, কেবল একমাত্র সুকুমারেরই বিবাহ হয় নাই। এ সম্বন্ধে মেসের সকলেই কৌতূহলী হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিত। সে বলিত, সামান্য রোজগার, বিবাহ করিয়া সংসার পুষিব কি করিয়া! অন্যেরা বলিত তাহারাই বা কি এমন নবাব খাঞ্জা খাঁ, তবু ত একরকম-করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সুকুমার এ-কথার কোনো উত্তর করিত না, চুপ করিয়া থাকিত। আর কেহ লক্ষ্য করিত কি না জানি না, আমি বুঝিতাম সুকুমারের এই-

খানটায় একটা ব্যথা আছে। বিবাহের প্রসঙ্গে তাহার মুখে এমন-একটা বেদনা ঘনীভূত হইয়া আসিত যাহা তাহার সেই ক্ষীণ শরীরের সমস্তটাতে ছড়াইয়া পড়িয়াও শেষ হইত না। মনে হইত সহ্যের অতিরিক্ত বেদনা তাহাকে আঘাত দিয়াছে।

সেই জন্য মেসের আর-সবাই তাহাকে লইয়া মজা করিতে থাকিলেও আমি পারিতাম না; আমি তার জন্য একটা সমবেদনা অনুভব করিতাম।

এক-একটা মানুষের ভিতরে কি থাকে যাহাতে অন্যের পরিহাসের প্রবৃত্তি উস্কাইয়া দেয়। সুকুমারও সেই রকম লোক। কিন্তু তার এই গুণ ছিল যে, তাহাকে লইয়া পরিহাস করিলে সে চটিয়া উঠিত না; বোধ হয় চটিয়া-ওঠার মতো তেজ তার রক্তের মধ্যে ছিল না। কিম্বা সে নিজের প্রতি এত উদাসীন যে মান-অপমান তার গায়ে লাগিত না। আমি কিন্তু তাহা ভাবিতাম না; আমি ভাবিতাম, সেই ক্ষীণজীবী মানুষটি অপমানের বিষ রাগের আগুনে ছাই করিয়া দিতে না পারিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে সেই বিষের জ্বালা নীরবে সহ্য করে। আমার দেখিয়া মায়া হইত। আমি তাহার পক্ষ লইতাম, কিন্তু অতগুলির বিপক্ষে একা পারিয়া উঠিব কেন? তাহাকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম না। বেশী ঘাঁটাইলে লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িবে বলিয়া আমিও অনেক সময় চুপ করিয়া থাকিতাম। একদিন সুকুমারকে গোপনে ডাকিয়া বলিলাম —"তুমি এ মেস ছেড়ে অন্যত্র যাও।" সে কোনো উত্তর করিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পর আবার যখন ঐ একই কথা বলিলাম তখন সে তার দৃষ্টি দিয়া আমাকে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল যেমন ভীত শিশু তার মাকে আঁকড়াইয়া ধরে। আমি বুঝিলাম সে বলিতে চাহে, অন্য মেসের লোক যে এর-চেয়ে ভালো ব্যবহার করিবে এমন ভরসা তার নাই,—এখানে একজনও যে দরদী লোক আছে এই ঢের!

আমি যে তার দিকে টানিয়া কথা বলি এর জন্যে একটা কৃতজ্ঞতা তার মুখে-চোখে উথলিয়া উঠিত কিন্তু মুখ-ফুটিয়া সে কিছু বলিত না। সে আর কাহারও ঘরে যাইত না; রোজ সন্ধ্যাবেলা চুপটি করিয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিত। তার এমনি ভাব যে মনে হইত যেন এ-সংসারে তার প্রবেশ-অধিকার নাই—সে চুরি করিয়া আসিয়াছে।

আমি তার কাছে অনেক-রকম কথা পাড়িতাম। সে অল্পই উত্তর দিত; মধ্যে মধ্যে হঠাৎ-কখনো তার সেই চাহনির নীরবতার ভিতর হইতে একটু-আধটু উত্তরের আভাস ফুটিয়া উঠিত। তার মুখ ছিল বোবা, সেই জন্য তার চোখ বোধ হয় কথা কহিবার চেষ্টা করিত। তার সেই চোখের ভাষা আমার কাছে যেন সহজ হইয়া আসিতেছিল।

সে একটু সকাল-সকাল অফিস হইতে ফিরিত। আমার দেরী হইত। আমি প্রতিদিন দেখিতাম, আমার লিখিবার টেবিলের পাশে, প্রদীপের ঘোলাটে আলোয় দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সে বসিয়া আছে। পলকহীন নিরর্থক

দৃষ্টি;—অমন চাহনি আমি কারো দেখি নাই! সে চাহনির কোনো কাজ নাই, কোনো উৎসাহ নাই, কোনো উপলক্ষ্য নাই;—সে চাহনি যেন একেবারে মরা! আমার ঘরে প্রবেশ করিবার শব্দে তার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখিতাম না, সে যেমন স্থির ছিল তেমনি বসিয়া থাকিত; চাহনিরও কোনো পরিবর্ত্তন হইত না। তখন তার সেই চোখের দিকে চাহিতে আমার কেমন অস্বস্তি হইত। ঘরের সেই নিস্তব্ধতায়, প্রদীপের সেই স্বল্প আলোর অস্পষ্টতায় আমার মনে হইত এ যেন মরা-মানুষের সঙ্গে ঘর-করা। তাই শব্দ দিয়া প্রাণের সাড়া জাগাইবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি কথা পাড়িয়া ফেলিতাম।

সে আমার পাশের ঘরেই শুইত। আমাদের ঘরের সামনে একটা ছোট্ট বারান্দা। হঠাৎ এক-একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া আমার গা-টা ছাঁৎ করিয়া উঠিত,—ঐ যেন একটা প্রেত বারান্দার অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;—এম্‌নি চলা যে সন্দেহ হইত মাটিতে পা পড়িতেছে কি না—যেন শূন্যের উপর দিয়া চলিয়াছে—সে চলার কোনো শব্দ নাই, কোনো ভার নাই।

মেসের সকলেরই বাড়ি হইতে চিঠি আসিত। সেই চিঠি আশ্রয় করিয়া কত হর্ষ-শোকের ছোটো-বড় তুফান মেসের উপর দিয়া বহিয়া যাইত। এক-একদিন এক-একখানা চিঠি লইয়া এমন কাণ্ড ঘটিত যে মেসসুদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিত। বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের মেসের যে কোনো সম্পর্ক আছে সচরাচর এমন বোধ হইত না—বাহিরের জগত যে ছন্দে বা তালে চলিতেছে আমাদের মেসের গতির সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না; হঠাৎ এক-একখানা চিঠি আসিয়া এই অবরুদ্ধতার বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া যাইত। সেইজন্য চিঠি-আসাটা আমাদের মেসে সামান্য ব্যাপার ছিল না;—তার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যে একটা তুমুল তোলাপাড়া চলিত তাহা ভুলিবার নহে। কারো বাড়ির অসুখের খবর আসিলে তখন মেসের অন্ধকার ঘরগুলো যেন আরো অন্ধকার হইয়া আসিত এবং নবপরিণীত বান্ধবের প্রেমলিপি লইয়া যে কাণ্ডটা ঘটিত তাহাতে পিনাল-কোডের ধারা অনুসারে মকদ্দমা চলিতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সুকুমারের কখনো কোনো চিঠি আসিতে দেখি নাই। তারই আপিসে হরিদাস কাজ করে, সে বলে আপিসেও তার চিঠি আসে না। এই জীবটির কি জগতের কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই? এ জগতের কি কোনো বন্ধন ইহাকে জড়াইয়া ধরে নাই? এ কি অন্য জায়গার মানুষ না কি! সত্য বলিতে কি, সন্ধ্যাবেলা তার মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া আমার মনে হইত এ যেন এখানকার কেউ নয়—প্রেতলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে। যেন একটা প্রেত কোন্‌-একটা মরা-মানুষের দেহ আশ্রয় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ কোন্‌দিন এই দেহ ফেলিয়া পালাইবে।

জানিনা এই ভাবটা আমার মনে কেমন করিয়া কোন্ দিন প্রথম প্রবেশ করে—কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহা যে আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। থাকিয়া-

থাকিয়া আমার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিত—এক-একসময় এ সন্দেহ এমন ঘনাইয়া আসিত যে সুকুমারকে মানুষ বলিয়া আমার মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিত না।

কি ভয়ানক! একটা জীবন্ত মানুষকে প্রেত বলিয়া ভাবিতেছি এ-কথা যে কাহারো সামনে বলাও যায় না। অথচ এই অস্পষ্ট চিন্তাটা নিজের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইয়া-খাইয়া ক্রমেই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

আমি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সুকুমারের আত্মীয়-স্বজন-সম্বন্ধে নানাপ্রশ্ন নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু কোনো উত্তরই পাইতাম না; মুখ ত কিছু বলিতই না, চোখও এমন নিভিয়া আসিত যে সেখান হইতে উত্তরের কিছুমাত্র আভাসও দেখা যাইত না। আর সে-সময় সে এমন করিয়া চাহিত যে সে-চোখের দিকে চোখ রাখিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত;—সেই মরা চাহনি! আমার প্রশ্নের উৎসাহ দমিয়া আসিত; আর জের টানা চলিত না।

যতই দিন যাইতে লাগিল সুকুমারকে লইয়া একটা অস্বস্তি আমার বাড়িতে লাগিল; অথচ সুকুমারের প্রতি একটা টানও আমার ছিল, আমি তাকে ত্যাগ করিতে পারিতাম না। তার সেই অসহায়তা, সেই নীরবতা আমাকে এমন করিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল যে মনে হইত তাকে অবহেলা করা নিষ্ঠুরতা।

দিনের বেলায় সুকুমারকে লইয়া কোনো গোল বাধিত না; কিন্তু ঐ সন্ধ্যাবেলাটা সে যে কেমন-একরকম হইয়া আসিয়া আমার ঘরে বসিত তাতেই আমার সব গোলমাল হইয়া যাইত। এই-রকম একটা মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটা যে কি ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহ বুঝিবেন না। আমার তো আর-কিছু করিবার জো ছিল না; সে আশপাশের বাতাসটাকে এমন-একটা মন-মরা ভাব দিয়া ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত যে, সে আবহাওয়ার মধ্যে কিছু করিবার উৎসাহ একেবারেই থাকেনা। কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। নিস্তব্ধতা ক্রমেই গভীর হইয়া আসিত; মনে হইত যেন একটা শব্দহীন অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছি। আর বাতির আলো কি কিছুতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে না! ঘরের সেই ঘোলাটে আলো যেন ক্রমেই চোখের উপর ম্লান হইয়া আসিত—আর দেয়ালের গায়ে তার দেহের সেই প্রকাণ্ড কালো ছায়াটা যেন বিশ্বের সমস্ত অন্ধকার আকর্ষণ করিয়া পুষ্ট ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। পাশ থেকে একটা ঠাণ্ডা নিশ্বাস গায়ে আসিয়া লাগিত। সামনে সেই মানুষের কালো ছায়া আর পাশে সেই ছায়ার মানুষ—এমনি করিয়া সময় কাটানো উঃ সে ভয়ানক!

আর না পারিয়া আমি একদিন ঘর ছাড়িয়া সমস্ত সন্ধ্যাটা এবং খানিকটা রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত ক্ষণটা তার জন্য আমার মন-কেমন করিয়াছিল। বাহিরের বাতাসে, রাস্তার আলোয় আমার ঘরের ভিতরকার সেই অস্বস্তিটাকে অত্যন্ত ছেলেমানুষী বলিয়া মনে হইতে লাগিল—আমি আপনার-মনে একটা ফুৎকার দিয়া উঠিলাম!

তখনি ফিরিয়া গিয়া তার কাছে বসিবার জন্য মন ছটফট করিতে লাগিল! কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আবার কেমন সন্দেহ হইল—এ কি প্রেত-মায়ার আকর্ষণ না কি!

সন্ধ্যাবেলায় মেসের অন্য ঘরে তাস-পাশার আড্ডা বসিত। আমাদের ঘরে কেহ আসিত না। ঐ সব খেলা আমি জানি না, কাজেই সে আড্ডায় গিয়া বসিবার আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। আমি চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া থাকিতাম, শেষে যখন ঠাকুর আসিয়া খাবারের খবর দিত তখন চট করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতাম। ছায়ার মত সে ধীরে ধীরে আমার পিছন পিছন আসিত।

অফিসের সাহেবের কাছে একদিন অপমানিত হইয়া আসিয়া আমি অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়াছিলাম। পিছন হইতে আসিয়া সে নিঃশব্দে আমার পিঠে ধীরে ধীরে হাত রাখিল। উঃ সে কী শীতল স্পর্শ! মনে হইল পাঁচআঙুলসুদ্ধ একখানা বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা হাত আমার দেহের উপর হইতে নামিয়া গিয়া একেবারে পাঁজরার ভিতরে গিয়া ঠেকিল! আমার সমস্ত রক্ত যেন হিম হইয়া আসিল। মানুষের হাত এত ঠাণ্ডা! উঃ সে এত ঠাণ্ডা যে তার শীতলতা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া সে আমার ঘরে বসিয়াছিল। আমি দেয়ালে তার ছায়াটার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলাম। মিট-মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। তখন বৈশাখ মাস। সামনের জানলাটা খোলা। আকাশ অত্যন্ত ঘোলা; —একটা গুমটে ভাব সমস্ত আকাশ-খানাকে থমথমে করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। জানলার ফাঁক দিয়া কয়েকটা নারিকেল গাছের মাথা দেখা যাইতেছিল। সেগুলা একেবারে স্থির—পাতার উপর একটুও কাঁপন নাই। মনে হইতেছিল, কতকগুলো ধূমকেতুর ছায়া যেন অন্ধকারের গায়ে ল্যাজ ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া ঘরটাকে কাঁপাইয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে কেমন-একটা বিকট শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি সমস্ত স্থির—চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না। বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া গেছে। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম। হঠাৎ আমার মনে হইল, সেই প্রেতটা এইবার মানুষের দেহ ছাড়িয়া পালাইয়াছে—শূন্য-দেহ পড়িয়া আছে। আমি তার গায়ে হাত দিলাম—সমস্ত ঠাণ্ডা। আমার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে মনে হইতে লাগিল প্রেতটা আমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া মজা দেখিয়া হাসিতেছে। হাসির একটা :চাপা শব্দ যেন কানে আসিয়া লাগিল। বাহিরে বৃষ্টি নামিয়াছে, নারিকেল গাছের মাথাগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে—সেখান হইতে কাহারা যেন ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি ও অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকাইতে-ছিল; দেয়ালের গায়ে সেই প্রতিদিনকার পরিচিত কালো ছায়াটা হঠাৎ একবার জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। আমি একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সেই

চীৎকারে পাশের ঘর হইতে সবাই ছুটিয়া আসিল। তারপর তাকে ধরা-ধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইল। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল—আহা লোকটা মরিল গা! কিন্তু ডাক্তার আসিয়া বলিল,—না জীবিত আছে, হঠাৎ মানসিক উত্তেজনায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

আমিই তার সেবার ভার লইলাম। দুই দিন, দুই রাত্রি সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল। তিন-দিনের দিন জ্ঞান হইল। প্রথম চোখ চাহিয়াই আমাকে দেখিয়া তার সেই মরা চাহনিটা একবার একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি অফিস কামাই করিয়া তার শুশ্রূষা করিতেছিলাম। দিনরাত তার কাছাকাছি থাকিতাম। যখন যা দরকার হইত উঠিয়া আনিয়া দিতাম। তার অবাক দৃষ্টি আমার সেই চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকিত। মুখের কাছে ঔষধের গ্লাস ধরিলে সে বিস্ময়ের সহিত আমার মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিত—অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত আমার হাত হইতে ঔষধ লইত। দ্বিতীয় দিনে সে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করচেন কেন? আপনি যান।" আমি সে কথা কানে তুলিলাম না। পরের দিন সে একটু বিরক্তির ভাব দেখাইল—আমার প্রত্যেক কাজে খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল; হঠাৎ একবার ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"যান; আমি আরাম হয়েছি—আপনাকে আর দরকার নেই।" আমি দেখিলাম, সেইটুকু পরিশ্রমেই সে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে শোয়াইয়া দিলাম। সে অনেকক্ষণ চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল। তারপর চোখ খুলিয়া আমার দিকে চাহিল—সে দৃষ্টি লজ্জায় ভরা।

দুই দিন বেশ চলিল, তৃতীয় দিনে আবার তার বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল—সে কিছুতেই আমাকে তার কাজ করিতে দিবে না, কাছে গেলেই অত্যন্ত বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইয়া লয়, যা করিতে বলি কিছুতেই করে না। আমার কাছ হইতে এতটুকু সাহায্য লইবে না—সে এমনি ভাব দেখাইতে লাগিল। কেবলই বলে,—"সরে যান্, সরে যান।" একবার সে আমায় ধমক দিয়া উঠিল—"কেন আপনি আমাকে এমন করে বিরক্ত করচেন?" সন্ধ্যার সময় হাতে ওষুধের গ্লাস দিলাম, ঔষধ খাইল না, সেই গ্লাস লইয়া আমাকে ছুঁড়িয়া মারিল। আমি অবাক হইয়া তার দিকে চাহিলাম, সে তাড়াতাড়ি হাত-দিয়া চোখ ঢাকিয়া ফেলিল। আমি ভাবিলাম, আমার একটু সরিয়া যাওয়া ভালো—নয়ত বেশি উত্তেজিত হইলে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারে। আমি ধীরে ধীরে ঘর হইতে চলিয়া গেলাম, কাছাকাছি থাকিয়া নজর রাখিতে লাগিলাম। তার পর অনেক রাত্রে আসিয়া তার পাশটিতে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। সে তখন ঘুমাইতেছিল।

গভীর রাত্রে হঠাৎ কাহার স্পর্শে চমকাইয়া উঠিলাম। অন্ধকারে ভালো দেখিতে পাইতেছিলাম না, মনে হইল

একটা ছায়া যেন আমার পায়ের কাছে ঘুরিতেছে। আমি উঠিতে যাইতেছি এমন সময় কে আমার পা চাপিয়া ধরিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"ক্ষমা করুন।" এক ফোঁটা জল আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল! আমি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"করেন কি! করেন কি! —পা ছাড়ুন।" সে বলিল—"ক্ষমা করুন।"

এখন হইতে তার সহিত আমার সম্বন্ধ অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। এই কয়েকদিনে তার হৃদয় যে দোলা খাইয়াছে তাহাতে যেন তার অন্তরের সেই গুমটের প্রথম-পর্দ্দাটা উড়িয়া গেছে। আমারও মনের ভ্রম ধীরে ধীরে ঘুচিতেছিল—এখন তাহাকে অনেকটা মানুষ বলিয়াই মনে হয়। সে একটু-একটু করিয়া আমার কাছে তার মন খুলিতেছিল;—কিন্তু এখনও তার সব কথা ভালো করিয়া ধরিতে পারি না। সে কতকটা বলে, কতকটা হাওয়ায় ছড়াইয়া দেয়—সেই জন্য স্পষ্ট করিয়া সব বোঝা যায় না। যাহা হউক, একটা ছায়ার মানুষের কাছে যে হৃদয়ের একটুখানি সাড়া পাওয়া গেল তাহাতে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

ক্রমেই আমাদের আলাপ একটু-একটু করিয়া জমিতে লাগিল। যতই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম ততই আমার সেই পূর্ব্বেকার সন্দেহ অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা তার কাছে আমার সেই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। সে মুখটা সাদা করিয়া বলিল—"আপনার সন্দেহ ত মিছে নয়। সত্যিই আমার প্রাণ অনেক দিন হল এক ঝড়ে উড়ে গেছে—কেবল দেহটা পড়ে আছে!" সত্যি? আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল ঘরের সেই সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারের উপর একটার-পর-একটা করিয়া অন্ধকারের পর্দ্দা আসিয়া পড়িতেছে—বাহিরে একটা অন্ধকারের ঘূর্ণা উড়িয়া চলিয়াছে—তাহার মধ্যে কত যে অদ্ভুত জিনিষ ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতেছে বলিতে পারি না।* * * হঠাৎ সে দেশলাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইল। তাহারই শব্দে ও আলোয় আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।

তার ভিতরকার খবর সে কিছুতেই দিতে চাহিত না।—মনে হইত যেন সেখানকার কোনো খবরই নাই। আমার সহিত সে যে একটা মনের সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিয়াছে, আত্মীয়তার সেই আস্বাদ তার জীবনে যেন এই প্রথম। সে যেন এই সবেমাত্র তার জীবনের একটা বন্ধন লাভ করিল;—এতদিন পৃথিবীতে তার জীবনের কোনো মূল-শিকড় গাড়া ছিল না। সে উৎসাহের সঙ্গে আমার কত খবর লইত, কিন্তু তার নিজের খবরের বেলায় সব শূন্য! এমন মানুষ কোথাও দেখি নাই যে পৃথিবী হইতে একেবারে আল্‌গা!

হয় ত আমার বুঝিবার ভুল। হয় ত তার অতীত তার মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেছে কিম্বা তাহা এমন শোকদুঃখের কঠিন শিলায় চাপা পড়িয়া আছে যে তার ভিতরকার খবর বাহিরে আসে না।

কিন্তু কথায় বলে পাথরেরও ক্ষয় আছে,—পাথরও গলে। এক-একদিন মনে হইত যেন তার জীবনের একটা সূত্র ধরিতে

পারিয়াছি। একটা কথার ইঙ্গিতে, মুখের একটু বিষণ্ণতায়, চোখের সজলতায় সে তার জীবনের এক-একটি টুকরো অন্যমনস্কে ছড়াইয়া ফেলিত। অন্য কারো কাছে হয় ত তার কোনো অর্থ ছিল না, মূল্য ছিল না,—কেহ হয় ত সে দিকে লক্ষ্যই করিত না, কিন্তু এই দুর্জ্ঞেয় মানুষটিকে জানিবার জন্য আমার একটা কৌতূহল—শুধু কৌতূহল নয়, একটা আবেগ ছিল বলিয়া সেই টুকরোগুলি আমাকে এড়াইতে পারিত না; তার জীবন-ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার অস্পষ্ট অসম্বদ্ধ লাইনগুলি আমার মনের মধ্যে গাঁথিয়া যাইত। কিন্তু কখনো তার জীবনের একটা ধারাবাহিকতা পাই নাই; পাইলে আমার এই কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিতাম।

মহা মুস্কিল! কোথা হইতে আরম্ভ করি? সে তো তার জীবনের গল্প বলে নাই যে গল্পের মতো সাজাইয়া তার কথাগুলি প্রকাশ করিব। কাজেই আমাকে একটু ছোড়ভঙ্গ হইয়া চলিতে হইবে।

ছেলেবেলায় লোকে বলিত সে মা-বাপ-খেকো ছেলে।······

যিনি তাকে মানুষ করিতেন তাঁকে সে মাসি বলিয়া ডাকিত। মাসি প্রায়ই রাগিয়া বলিতেন—"ছেলেটা মা-বাপকে খেয়েছে, এইবার আমায়ও খাবে!"······

পাড়ার ছেলেরা কেমন দাদা, দিদি বলিয়া ডাকিত; তার ভারি ইচ্ছা হইত সেও কাউকে অমনি করিয়া ডাকে, কিন্তু ডাকিবার মতো লোক খুঁজিয়া পাইত না।······

সুকুমার ছেলেবেলায় ভারি দুষ্টু ছিল। সে একটি মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, তাকে মারিয়া-ধরিয়া একাকার করিত। কিন্তু মেয়েটি কখনো তার সঙ্গে আড়ি করে নাই। সে সুকুমারকে দাদা বলিত।······

একবার পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সুকুমারের মারামারি হয়। কাহারো সঙ্গে তার বনিত না। সকলে একজোট হইয়া তাকে বেদম মারিয়াছিল। সুকুমারের কপাল কাটিয়া রক্তপাত হয়—সে দাগ এখনও আছে। রক্ত দেখিয়া সবাই পালায়;—সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে। তালদিঘির পারে কেয়াবনের ধারে সে যে কতক্ষণ পড়িয়াছিল জানে না। সন্ধ্যা হইয়া গেছে। কেয়াবনে সাপ থাকে। কেন যে তাকে সাপে কামড়ায় নাই—আশ্চর্য্য! কেহ তার খবর লয় নাই;—সে উঠিয়া দেখে, মেয়েটি একা তাকে দিঘির ধারে খুঁজিতেছে।

মাসি কপাল কাটা দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি! তিনি বলিলেন—"হতভাগা ছেলেটা এমনি করে একদিন মরবে!"······

আর-একদিন দেশলাই লইয়া খেলিতে খেলিতে সে চণ্ডীমণ্ডপে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। অনেক কষ্টে সে আগুন নেভে। আগুন যখন খুব জ্বলিতেছে তখন মাসি বলিয়াছিলেন—"যা হতভাগা, তুই ঐ আগুনে পুড়ে মর! আমার হাড় জুড়ুক।"

মাসি ছিলেন গরীব। ঐ আগুনে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব যায়। তাতে তাঁদের খাওয়া পরার ভারি কষ্ট। একদিন তিনি সুকুমারের কাছে এক-গাদা ছাই লইয়া আসিয়া

বলিলেন—"যেমন পুড়িয়ে সব ছাই করেছিস —তেমনি এই ছাই খা!" সুকুমার রাগিয়া এক-থাবা ছাই মুখে পুরিয়াছিল।……

একদিন মাসির উপর রাগ করিয়া সুকুমার সমস্ত দিন তালদিঘির পাড়ে এক পেয়ারা গাছের মাথায় চড়িয়া বসিয়াছিল। মেয়েটি তাকে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য কত সাধাসাধি করিল কিন্তু সে কিছুতেই নামিল না। মেয়েটি তখন গাছে উঠিয়া তার হাতে-পায়ে ধরিতে যায়—সে এক লাথি মারিয়া তাকে ফেলিয়া দিয়াছিল। তার পর মেয়েটি যখন আর নড়ে না, তখন সে তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া মেয়েটিকে ধরিয়া তুলিল। সুকুমার বলিল—"বল্ কোথায় লেগেছে!" সে বলিল—"না লাগেনি।" সুকুমার বলিল—"বল শিগ্‌গির, নইলে মার খাবি!" সে তখন হাঁটু দেখাইল। সেখানটা কাটিয়া একাকার হইয়াছে। সুকুমার তাড়াতাড়ি দিঘি হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল আনিল, কাপড় ছিঁড়িয়া একটা পটি বাঁধিয়া দিল। মেয়েটি বলিল —"সুকুমার দা, বাড়ি চল।" সুকুমার তখন আর দ্বিরুক্তি করিল না; তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

মাসি বলিলেন—খোঁড়াচ্চিস কেন? কি হয়েছে রে!" মেয়েটি বলিল—"পড়ে গেছি খুড়ি!" খুড়ি বলিয়া উঠিলেন—"তুই ঐ দজ্জালটার সঙ্গে মিশে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছিস; —খবরদার ওর সঙ্গে বেড়াস্‌নি!"

ঐ কথায় সুকুমারের ভারি রাগ হইয়াছিল। সে দুই দিন তার সঙ্গে খেলা করে নাই। মেয়েটি তাতে কাঁদিয়াছিল!……

সুকুমার পাঠশালায় দুষ্টুমি করিত, ভালো করিয়া পড়াশুনা করিত না, তাইতে গুরুমশায় একদিন আচ্ছা করিয়া বেত দিয়াছিলেন। সেদিন বেতের মাত্রা একটু বেশি হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মাসি বলিলেন—"বেশ হয়েছে! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!" মেয়েটি সেই ফুলোগুলোর উপর ধীরে ধীরে হাত দিয়া-দিয়া বলিল —"উঃ বাবারে এত ফুলে উঠেছে! তুমি দুষ্টুমি কর কেন ভাই!"……

সুকুমার নদীতে সাঁতার দিত। মেয়েটিকে ডাকিত—"দেখবি আয়!" সুকুমার সোঁ-সোঁ করিয়া চলিয়া যাইত, মেয়েটি তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিত—"সুকুমার দা, আর যেওনা, আর যেওনা!" সুকুমার শুনিত না, সে আরো গভীর জলে চলিয়া যাইত। শেষে উঠিয়া আসিয়া ধমক দিয়া বলিত—"তুই অমন করিস কেন?" সে বলিত—"না তুমি যেওনা, আমার বড় ভয় করে!"……

মেয়েটির মা বিধবা। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"আমার রাণীর সঙ্গে সুকুর বিয়ে দেব।" মাসি এ-কথায় তেমন কান পাতিতেন না। বলিতেন—"তাহলে ও রাণীর হাড়-মাস জ্বালিয়ে খাবে।"……

একবার বিজয়ার দিন রাণী আসিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিল। সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"প্রণাম করলি কেন রে!" রাণী মুখ-চোখ লাল করিয়া বলিল—"মা যে বল্লেন!" সুকুমার সেদিন জলে পড়িয়া প্রতিমার অনেক রাংতা জোগাড় করিয়াছিল;—তার সঙ্গে কেহ পারিত না, সে কাড়াকাড়ি করিয়া প্রতিমার মুকুটটা ছিনাইয়া

লইয়াছিল। দুর্গার মুকুট রাণীর বড় ভালো লাগিত। রাণী সেদিন প্রণাম করিবার পর সুকুমার তার মাথায় সেই মুকুট পরাইয়া দিয়া বলিল—"এই নে এটা তোকে দিলুম।"

রাণী সেই মুকুট-মাথায় বাড়িতে দৌড়িয়া গেল। তার মা, খুড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে কি অলুক্ষণে কাণ্ড! করেছিস কি! খোল্, খোল্, মা-দুর্গার মুকুট কি মাথায় পরতে আছে!" রাণী ভয়ে মুকুট খুলিয়া ফেলিল। সুকুমার বলিত—"পর না!" সে কিন্তু আর পরে নাই—ঘরের কুলুঙ্গিতে সেটা তুলিয়া রাখিয়াছিল।

রাণীর মা সেদিন সুকুমারকে বলিয়াছিলেন —"তুমি যদি বাছা সত্যিকার মুকুট রাণীকে পরাতে পার তবে ত বুঝি!"......

এমনি করিয়া সুকুমারের টুকরা-টুকরা কাহিনী আমার সংগ্রহ হইতে লাগিল। প্রথম-প্রথম কিছুই ধরিতে পারিতাম না, এক-একটা কথা শুধু কানে আসিয়া লাগিত; আবার দুই দিন পরে এমন-একটা আভাস পাইতাম যাহাতে সেই কথাটি একটা সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিত। আমি এই কথাগুলি যে পদ্ধতিতে লাভ করিয়াছিলাম তার একটু বিশেষত্ব ছিল, তার রসাস্বাদনের আনন্দ আলাদা রকমের। আমি ঠিক সে জিনিষ দিতে পারিব না। শুধু সাদা কথাগুলা পর-পর সাজাইয়া দেওয়াতে উহার উপর যে রহস্যের একটি আবরণ ছিল যাহাতে চিত্তকে ঔৎসুক্যে টানিয়া লইয়া যায় তাহা নষ্ট হইয়াছে। সুকুমারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমার মনে হইত আমি যেন একটা অসীম রহস্যপূর্ণ অন্ধকার গুহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি, এক-একবার একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে তার সমস্তটা নয়, খানিকটা অতি তাড়াতাড়ি আমার চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে; আবার সমস্ত অন্ধকার।

সুকুমার যে সেদিন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল তার কারণ সে বলে, আকাশে সেদিনকার ঝড়ের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া সে কেমনতর হইয়া গেল।

সুকুমারের জীবনে একটা ঝড়ের কাহিনী আছে। এ কাহিনীটি সে একদিনমাত্র বলিয়াছিল—আর কখনো শুনি নাই। কিন্তু সেই একদিনের শোনাতেই আমার মনে তাহা ছবির মতো আঁকিয়া গেছে।

কোন্-এক কুটুম্ববাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল—বোধ হয় বিবাহের নিমন্ত্রণ। বৈশাখ মাস। দুপুর-বেলা। নৌকা ঠিক। সকলে গিয়া নৌকায় উঠিল। সন্ধ্যা-নাগাদ্ নৌকা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে। নৌকায় ছিলেন মাসি, রাণী আর রাণীর মা। পুরুষের মধ্যে সুকুমার। মাসি ও রাণীর মা দুইজনেই বিধবা—তাঁদের সাজসজ্জার কোনো পারিপাট্য ছিল না। সাজিয়াছিল রাণী। একখানি নীলাম্বরী সাড়ি, কপালে একটি রাঙা টিপ, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি আর পায়ে মল,—ইহাতেই রাণীকে একেবারে রাণীর মতো দেখাইতেছিল। তার নীলাম্বরী সাড়িখানি বৈশাখের খর রৌদ্রের উপর একটা স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিতেছিল। গ্রাম্যপথের দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার উপরে মলের ঝুম্‌ঝুম শব্দ বাতাসের গায়ে ঢেউ তুলিয়া আম-বনের ওপারে গিয়া ক্ষীণ সুরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

কপালের সেই রাঙা টিপটির উপর প্রজাপতির মতো ডানা ছড়াইয়া সূর্য্যের রশ্মিরেখা আসিয়া পড়িতেছিল। এমন সুন্দর রাণীকে আর কোনো দিন দেখায় নাই।

স্থির জলে নৌকা চলিতেছে। সুকুমার মাঝিদের হাত হইতে একখানা দাঁড় লইয়া নৌকা বাহিতেছিল। রাণী ছইয়ের কিনারাটিতে বসিয়া একদৃষ্টে সুকুমারের দাঁড়-টানা দেখিতেছিল। মাসি, রাণীর মা ছইয়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন।

চতুর্দ্দিকে বৈশাখ-মধ্যাহ্নের অলসতা;—নৌকা ধীর-মন্থর গতিতে চলিয়াছে। সব নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে জলচর পাখীদের কাকলি আর নৌকার ছিপ্ ছিপ্ শব্দ যেন বিশ্বের তন্দ্রা আকর্ষণ করিয়া আনিতেছিল। রাণী হাতের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ একখণ্ড পশ্চিমে মেঘ উঠিয়া নদীর জল আঁধার করিয়া তুলিল। একবার একটা ফুরফুরে হাওয়া গায়ে আসিয়া লাগিল, তারপরেই একটা দম্‌কা। তারপর দমকার উপর দম্‌কা! মাঝিরা ভীত হইয়া উঠিল। তীরের দিকে নৌকা ভিড়াইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু নৌকার মুখ ফেরায় কার সাধ্য!

বৃষ্টি নামিল। নদী ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে! মনে হইতে লাগিল সমস্ত নদীটাকে কে যেন উনুনে চড়াইয়া ফুটাইতেছে। বৃষ্টির জল নদীতে পড়িবার অবসর পাইতেছে না—ঝড়ের ঝাপটে জলের ফোঁটা ধুনিয়া গিয়া উড়িয়া চলিয়াছে,—সব যেন জলের ধূলায় ধূলাময়! গাছের মাথা হইতে পাখীগুলোকে কে যেন টান মারিয়া আনিয়া নদীর উপর আছড়াইতেছে;—তাদের মৃতদেহ জলের খরস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। নৌকার মধ্যে কারো মুখে কোনো কথা নাই! প্রকৃতির সেই প্রলয়-নৃত্যের দৃশ্যে সবাই হতভম্ব।

হঠাৎ কি হইল—কেমন-একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় নৌকা ডুবিয়া গেল।

ঝড়ের মধ্যে মানুষের গলার শব্দ উঠিল—"সুকুমার দা!"

সুকুমার তখন জলে পড়িয়াছে। কার হাত আসিয়া তার গলা জড়াইল। হাতের চুড়িতে সে বুঝিল রাণী!

সুকুমার এতক্ষণ সাঁতার দিতেছিল, রাণীর ভারে সে ডুবিতে লাগিল। সজ্ঞানে মৃত্যুকে এমন মুখোমুখি দেখা, সে বড় ভয়ানক! সে উপরে ঠেলিয়া উঠিবার জন্য ছট্‌ফট করিতে লাগিল—কিন্তু জলের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক! প্রাণ যায়-যায়! রাণী কিছুতেই ছাড়ে না। তার বাহুর বন্ধন ক্রমেই চাপিয়া বসে। সুকুমারের মনে হইল, এ কি আপদ আসিয়া জুটিল; সে এক-ঝটকায় রাণীকে ঠেলিয়া দিয়া নিজে ভাসিয়া উঠিল। জলের স্রোত তাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যখন কূলে গিয়া ঠেকিল তখন একেবারে মরার মত। তারপর কতক্ষণ পরে যখন চোখ মেলিয়া চতুর্দ্দিকে আকুলভাবে চাহিল তখন মনে হইল, যে চোখের জানলা দিয়া সে এতদিন পৃথিবীকে দেখিতেছিল এ যেন সে জানলা নয়—এ যেন কোন্ অপরিচিত ঘরের অপরিচিত জানলা।—কোথায় রাণী, কোথায় কে!

সুকুমার বলে, সে বড় স্বার্থপর। নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সে রাণীকে হত্যা করিয়াছে। একসঙ্গে ডুবিয়া মরিলে ক্ষতি কি ছিল? সে যে তার বুকের কাছে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। সেইখান থেকে ঠেলিয়া তাকে সে একেবারে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিল। সে কী নিষ্ঠুর! এই ত জীবনের সুখ, এই সুখের জন্য রাণীর গলা টিপিয়া মারিতে তার এতটুকু হাত কাঁপে নাই।

প্রাণের মায়া—প্রাণের মায়া তার বড় বেশী! নইলে সে এমন করিবে কেন! কিন্তু সেই-প্রাণই ত জল থেকে রক্ষা পাইয়া যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে-ব্যামোয় ত তার বাঁচিবার কোনো আশা ছিল না—তার কামড়ের দাগ সে এখনো বহন করিতেছে। সে বলে, ভগবান চোখে-আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, যে-প্রাণের প্রতি তার এত মমতা সে প্রাণ এক-ফুঁয়ে নিভাইয়া দেওয়া যায়! কিন্তু তাহা ত তিনি নিভিতে দিলেন না! বড়-যে বাঁচিবার সাধ ছিল তাই তিনি বাঁচিয়া-থাকার মজা দেখাইলেন!......

কথার মুখেই সে হঠাৎ আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইত। আমরা তখন সন্ধ্যাবেলাটা বারান্দায় বসিতাম। সে ধীরে ধীরে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া তার সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়া চুপ করিয়া বসিত। আমি ঘরে গিয়া দেখিতাম তার দেহের সেই দীর্ঘ কালো ছায়াটা দেয়াল জুড়িয়া বসিয়া আছে। তখন তার চোখের দিকে চাহিয়া মনে হইত তার সেই চোখের গহ্বর দিয়া কে যেন উঁকি মারিতেছে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পর্য্যায়

নারীসুলভ অপচয়ের অপ্রবৃত্তি আমাকে এই পাতা কয়খানি ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত করলে। তা না হলে নূতন বৎসরে হাল-খাতা খোলাই সনাতন প্রথা। কিন্তু তাও ঠিক নয়,—নূতন আর পুরাতনের মধ্যে একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না ত, তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থার আবশ্যক হয় না! পুরাতন যে পদ লিখে আস্‌ছিল তাতে "সেমিকোলন" দিয়েছে, "ফুল-ষ্টপ" নয়; তাই জের টেনেই চলেছি। নূতন কখনো আসে কি? কালের চিরন্তন গ্রন্থে, ঋতু-পর্য্যায়ের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, সেই পুরাতনেরি পুনরাবৃত্তি চলে। যে ছন্দ, যে গাথা, যে গীত ও গীতিকা আমরা পড়ে আসি, তার কত কথা এক-পাতায় সমাপ্ত না হয়ে অন্য খানিতে এসে পড়ে, আমরা একটানা পড়েই চলি;—শেষ কোথায়? কালের এই ঋক-সাম-যজু-অথর্ব্ব, এই দর্শন আর গান, নিবেদন আর উৎসর্গ আমরা গ্রীষ্মের তীব্র আলোকে, বসন্তের গানে, বর্ষার বৃষ্টি-ধারায় ও মেঘধূমে, বিদ্যুতের হোমশিখায়, আর শরতের স্বর্ণ ধান্যসম্ভারে দেখতে পাই।

গ্রীষ্ম পঞ্চতপার উগ্র আলোকে আমাদের মনে ঋক-মন্ত্রের উদ্বোধন করে, আমরা তখন কেবলি দ্রষ্টা হই। আকাশের নীলিমা অজস্র আলোয় উদ্ভাসিত, অপার দৃষ্টিতে পূর্ণ, দীর্ঘদিনের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে শ্যামা বসুন্ধরার নিষ্পলকনেত্রে অন্তবিহীন দর্শনের সাধনা চলে, আর জলধির আলোক-উদ্দীপ্ত অক্ষৌহিণী উর্ম্মিমালা অশেষ ছন্দে অবিরত ঋক-মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। বসন্তে তরু-লতার আন্দোলন, নিরন্তর ছন্দোগতি, আমাদের মনে সুরের আনন্দ সঞ্চার করে, দ্বিজ-সম্প্রদায় সাম-গাথায় ঋতুরাজের আহ্বান গায়, সঙ্গীতের সঙ্গ-সুখে চরাচরের মন পরিপূর্ণ করে। বর্ষায় দেখি, নিখিল বিশ্ব যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করলে; জলধি তার ধূপ-বাষ্প আকাশে প্রেরণ করে, দৈবী আলোক তাতে বিদ্যুতের উদ্দীপনা সঞ্চার করে, প্রচুর ধারা-বর্ষণের সূচনা হয়,—সে আমাদের যজ্ঞফল, দেবতার প্রসাদ। আর শরতে কর্ম্মফলের নিবেদন,—দেবোদ্দেশে বর্ষের অন্তিমে নবান্নের ব্যবস্থা, অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ!

এই চারি বেদের আচার-বিধি আমাদের জীবনের কাল-ভেদেও দেখতে পাই। শৈশবে আমরা সামবেদী, তখন গানের উপরেই থাকি, ছন্দের উদ্বেলিত গতিতে আমরা চলি, উদাত্ত-অনুদাত্তের উদার-পাদক্ষেপে তরঙ্গ-গতিতে অগ্রসর হই, উত্থান-পতনের উপদ্রবে বারম্বার প্রবুদ্ধ হতে থাকি। যৌবনে আমরা ঋকদ্রষ্টা ঋষি, তাই বলে মুনি নই। কতই দেখি আর কতই দেখার আশায় উৎফুল্ল! নবীন চেতনার জাগরণে আমাদের নয়ন-মনে নূতন দৃষ্টি খুলে যায়, দেখি আর দেখাই! এ ঋক রচনায় নরনারী উভয়েরি সমান অধিকার! কি আনন্দেরি সেই জাগরণ! আকাশ, ধরণী, আলোক আর ছায়া, পত্র পুষ্প তৃণবল্লরী সবাই আপনাদের বুক অবারিত করে দিয়ে ভাল করে দেখে নেবার জন্যে, আমাদের কেবলি ডাকে! তখন আমাদের চোখে যে অঞ্জন আনন্দ-রেখা টেনে দেয়, তার উপকরণ পোড়ান ঘৃতের কালো কালি নয়,—সোণা-গলান তরল আলো! সে দৃষ্টিতে অদৃষ্টদেবী এসে পরশমণি বুলিয়ে দিয়ে যান, তাই যেখানেই তাকে ছোঁয়াই সেইখানেই সোনার স্বপন জেগে ওঠে। তারপর প্রৌঢ়ে আসে যজুর পালা,—নিবেদন আর আবেদন, মন্ত্রপাঠ আর তন্ত্র উদ্ভাবন! যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখনি আমরা "দাও" আর "দাও-এর বুলি আরম্ভ করি। যৌবন তার ভরা ভাণ্ডার হতে কেবলই দান করে, সে পূর্ণ;—তেজে দীপ্তিতে, কামনা আর বাসনার আবেগে পরিপূর্ণ; অবারিত তার দানপ্রবৃত্তি, তখন আর সঞ্চয় করবার কথা মনেই আসে না। প্রবীণ হয়ে হিসাবের খাতা খুলি, ব্যয়ের বিধানে মনোনিবেশ হয়, আয়ের কথা মনে আসে। তখনি দেবতার কাছে প্রার্থনার পর্য্যায় আরম্ভ হয়। আমি তোমায় বলি দিয়েছি, তুমি আমায় ধন দাও। "ভার্য্যাং মনোরমাং" হতে কিই-বা আমরা না চেয়ে থাকি? তারপরে শেষকালে জরার জড়তায় যখন আমরা স্থবির হতে চলেছি তখনই অথর্ব্বের সাধনা করি! এইত গেল অভ্রান্ত চতুর্ব্বেদবিধি চতুর্ব্বর্গ ফলের মূল!

নীতির দিক দিয়ে দেখলেও আমাদের এই

জীবনের চারকাল চারটি নীতির বিধানেই চলে! শৈশবে আমরা সামপন্থার পথিক। তখন সবই সমান, ছোটবড় উঁচুনীচু ভদ্র ইতর কিছুই মানিনে। উদারনৈতিক আমরা অবাধ পথে, সমতলের রাজ্যে বিচরণ করি। যৌবন দান দিতে জানে; প্রৌঢ় জানেন ভেদের কথা ভাল করে। শৈশবে যে অভেদ-বুদ্ধি ছিল, তা যৌবনের অভিজ্ঞতায়, "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—এই বিজ্ঞ বাক্যের ব্যর্থতায় ভেদজ্ঞানে পরিণত হয়। যা অভিন্ন ছিল, কালমাহাত্ম্যে দেখি তা সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে; বৈরাগ্য এসে কাণে কাণে বলে, কা তব কান্তা ইত্যাদি ইত্যাদি; বীতরাগ বানপ্রস্থের বন্দোবস্ত করতে বসে, সংসার অসার বোধ হয়, আর বেচারা বৃদ্ধ সাম দান, ভেদ সবেরই দণ্ড ভোগ করে। সাম্য যখন বৈষম্যে পরিণত হয়, দান যখন ঋণের বিভীষিকায় বিব্রত; ভেদ যখন ছেদন করতে বসে, তখন কালের দণ্ড, অঙ্কুশ আর কুঠার বার্দ্ধক্যের ক্ষীণ পরিসরের মধ্যেই দণ্ডে দণ্ডে শক্ত ও প্রবল হয়ে এসে পড়ে! ধূলিসাৎ হতে তার আর বিলম্ব হয় না। তার কুব্জ দেহ আর ন্যুব্জ পৃষ্ঠ দণ্ডের অবলম্বনে বিচরণ করে; সে দরিদ্র তখন দণ্ডী।

১লা বৈশাখ ১৩২৩।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা

এক-ফোঁটা জলে অসংখ্য জীবাণু ইতস্তত বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—অবশ্য আহারের সন্ধানেই তাহাদের এই সঞ্চরণ। কিন্তু কথাটা এই যে, জীবাণুদের এই নড়া-চড়ার মধ্যে তাহাদের নিজেদের কোন স্বাধীন ইচ্ছা আছে, না সম্পূর্ণ দৈব-ঘটনার বশেই ইহা সম্পাদিত হইতেছে? যদি প্রথমটা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এই জীবাণুদের মন বলিয়া একটা-কিছু আছে সে-কথাও মানিয়া লইতে হয়। যে সঞ্চরণের কোনো উদ্দেশ্য নাই, তাহাতে কোন্ দিকে যাই, না-যাই সে জ্ঞান থাকার কোন আবশ্যক করে না। কিন্তু মনের প্রধান ধর্ম্ম না কি এই যে, মন যাহার, সে যেদিকে গিয়া প্রচুর খাদ্য পাইয়াছে, কিম্বা যেদিকে গিয়া পায় নাই, তাহা ভুলিতে দেয় না,—তাহা পূর্ব্বাভিজ্ঞাত বিষয় সঞ্চিত করিয়া রাখে—যে পথ অনুসরণ করিলে বেশী ফল পাওয়ার সম্ভাবনা সেই পথটি চিনাইয়া দেয়। এই যে আণুবীক্ষণিক জীবাণুগুলি, ইহাদের নড়াচড়ার মধ্যে যে কোনো উদ্দেশ্য নাই, অনেক সময় এমন বোধ হয় না। যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গেল—যেদিকে যাইতেছিল, সেদিক হইতে সহসা ফিরিয়া আসিল; কথা নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ গতির বেগ বৃদ্ধি করিল—এ সকলের কি কোনই অর্থ নাই? এ সকল দেখিয়া এই মনে হয় যে ইহারা জ্ঞাতসারেই (consciously) খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেদিকে তাহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই,

জ্ঞাতসারেই সেদিক পরিত্যাগ করিয়া, যেদিকে তাহার সন্ধান পাইয়াছে, সেদিকে প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে।

জীব-রাজ্যে আরও-একটু ঊর্দ্ধে উঠিলে আমরা মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতিকে খাদ্যের সন্ধানে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই চারিদিকে বিচরণ করিতে দেখি।—এখানে হইল না, অন্যত্র ছুটিল, সেখানে হইল না, অন্যত্র যাইল। সত্য কথা বলিতে কি, সমস্ত জীবজগৎটা সুধু "try, try, try again" নীতি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে টিঁকিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু এই সব নিম্ন-শ্রেণীর জীবদের গতিবিধি দেখিয়া তাহাদের বুদ্ধি যে বেশি আছে এমন ত মনে হয় না। পিপীলিকা খুবই পরিশ্রমী জীব, কিন্তু বুদ্ধির অল্পতা বশত বেচারাকে অনেক-সময় বৃথা খাটিয়া মরিতে হয়। চলিতে চলিতে সম্মুখে একটা তৃণদণ্ড পথরোধ করিলে সে সেটাকে উল্লঙ্ঘন করিবে তবু পাশ-কাটাইয়া যাইবে না। ঐরূপ করিলে যে বাধাটা অতি সহজেই অতিক্রম করিতে পারা যায়, সে কথা তাহার মনেই আসে না। চিনির গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বোল্‌তা খোলা জানালা দিয়া অনায়াসেই ঘরে প্রবেশ করে কিন্তু বাহির হইবার সময় আর পথ খুঁজিয়া পায় না। কুকুরকে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে যেমন-তেমন একটা গেরো দিলেই চলে। কারণ যদিও ইচ্ছা করিলে সে অনায়াসেই সে গেরো দাঁত দিয়া খুলিতে পারে কিন্তু তাহা করে না;—বিধাতা তাহার ঘটে অতটুকু বুদ্ধি দেন নাই। ঘোড়া এমন কি বানরকে পর্য্যন্ত ঐরূপে সহজে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু বনমানুষকে পারা যায় না। কি করিয়া গেরো খুলিতে হয়, সে কৌশল তাহার দিব্য জানা আছে।

নিম্নশ্রেণীর জীবদের যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তি তাহা কেবল আসন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থের অনুসন্ধানেই নিযুক্ত হয় এবং সেইটি পাই-লেই তাহারা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকে। প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের বিচার ও পরীক্ষা করিয়া, প্রয়োজনীয় পদার্থের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে কাজটা যে অনেক সহজসাধ্য হয় একথা তাহাদের মনেই হয় না। মানুষের মধ্যে অনেকেরই বেলায় ঐ একই অবস্থা লক্ষিত হয়। অধিকাংশ মানুষকেই সুধু খাদ্যের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এখানে হইল না অন্যত্র গেল, সেখানে হইল না আর একস্থানে গেল। যে পথে গিয়া সে সফলতা লাভ করে সেটি যেমন সে ভুলে না, তেমনি যে পথে গিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই সেটিও সে মনে করিয়া রাখে।

এমনি করিয়া সাধারণ মানুষ পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে তার গন্তব্য স্থির করে। কিন্তু এপথে কেন ফল হইল, ওপথে কেন হইল না—এসকল সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতে তাহার কোন প্রবৃত্তি হয় না। ঘটনাসমূহকে শ্রেণীবিন্যাস (generalise) করিবার ইচ্ছা তাহার মনে একবারও উদিত হয় না। বিবিধ সমস্যার যে একই সমাধান থাকিতে পারে, সে-কথা তাহার কল্পনাতেও আসে না। যিনি এ-সকল করিতে

পারেন তিনি আর তখন সাধারণ মানুষ থাকেন না; তিনি তখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইয়া দাঁড়ান। খুব প্রাচীন-কালে, যখন বিজ্ঞানের জন্ম হয় নাই, সে সময় বিবিধ-আকারের প্রস্তরখণ্ড লোকে না দেখিয়াছিল এমন নয়, হয়ত উহাদের মধ্যে বিশেষ-কোন-এক আকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া লোকে তাহার দ্বারা নিজেদের বাসগৃহও নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। তাহার পর তাহাদের মধ্যে এমন-একটি মহা-পুরুষের আবির্ভাব হইল যাঁহার মনে আকার-বিষয়ে সাধারণভাবে পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা জন্মাইল—ইহারই ফলে জ্যামিতি-বিজ্ঞানের জন্ম হইল। আগুনের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় ছিল, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা দাহন-ক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণভাবে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম ততদিন রসায়ন-বিজ্ঞানের জন্ম হইতে পারে নাই।

কুকুর যে গেরোটা খুলিয়া আপনাকে বন্ধন-মুক্ত করে না, তাহার কারণ, সে-কথাটা তার মনেই হয় না। এ ভাবটা যদি তাহার মনে উঠিত, তাহা হইলে সে অবলীলাক্রমে দাঁতের সাহায্যে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিত। তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আকারের পাথর সকলেই দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন আকারকে শ্রেণীবিন্যাস (generalisation) করার ভাব ও ইচ্ছা কাহারো মনে উদিত না হওয়ায় তাহাদের দ্বারা জ্যামিতি আবিষ্কার সম্ভব হয় নাই। নইলে এই আবিষ্কারের পথে যে তাহাদের ক্ষমতার অভাব ছিল তাহা নহে। অনেক অসাধারণ ক্রিয়া অনেকের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত যদি তাহারা সে-বিষয়ে ভাবিতে পারিত। কত কোটি কোটি নরনারী এবং হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি আকাশে গ্রহ-তারকাদির উদয় ও অস্ত দেখিয়াছেন কিন্তু ইহাদের কাহারো মনে এ-কথাটা উদিত হয় নাই যে এই-যে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ, ইহা চাক্ষুষ পরিভ্রমণ হইলেও যথার্থ পরিভ্রমণ নয়;—এই দৃঢ় পৃথিবী যাহার উপর আমরা দাঁড়াইয়া আছি—যাহাকে সম্পূর্ণ গতিহীন বলিয়া মনে হইতেছে—এই পৃথিবীই ইহাদের বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে আর আমাদের মনে হইতেছে পৃথিবী স্থিরই আছে, গ্রহ তারকাদিই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। কোপারনিকসের (Copernicus) মনে যেদিন এই ভাবটির প্রথম উদয় হইল, সেদিন না-জানি কি অসাধারণ প্রতিভার বিদ্যুৎই না স্ফূরিত হইয়াছিল! কোপার-নিকসে পর কত-শত জ্যোতির্ব্বিদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক নিউটন ছাড়া আর কাহারও মনে স্বপ্নেও এ কথা উদিত হয় নাই যে, যে শক্তিবলে ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে, সেই একই শক্তি আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদিকে পরস্পর আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু ভাবের উদ্ভব হইলেই যে সব হইল তাহা নয়। ভাবটির উপকারিতা সম্বন্ধে মনের মধ্যে দৃঢ় জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মান আবশ্যক। এরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; যাহাদের মনের এতটা উদারতা আছে যে, তাহারা সকল জিনিষকেই

ন্যায্য ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারে কেবল তাহাদেরই পক্ষে সম্ভব। সাধারণ ব্যক্তির মনে ভাবটির উদয় হইলেও সে তাহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারে না—চেষ্টা করিলেও পারে না। শ্রেণী-বিন্যাস ব্যাপারে তাহার কোন স্বার্থ নাই,—কেননা ইহাতে অর্থাগম, ক্ষমতালাভ কি তাহার মনের মত যশোপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম নিজের কিংবা পরিবারের কিম্বা বড়-জোর দেশের কল্যাণ-সাধনেই নিয়োজিত হয়। যদি ভাগ্যক্রমে তাহার খুব উচ্চ-দরের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষমতা ঐ সকল উদ্দেশ্য-সাধনেই সে ব্যয় করিতে থাকে। ইহার ফলে সে হয় ত ধনপতি, সেনাপতি বা রাজনৈতিক হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সাধারণ ভাবে মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না বরঞ্চ অনেক সময়েই ফল উল্টা হইতে দেখা গিয়াছে।

তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে—প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরব কোথায় আছে? প্রকৃত মহৎ কোন্ জিনিষটা—সেইটা জানাই মহত্ত্বের প্রথম লক্ষণ। সংসারে কাজের লোক কাজ করিয়া যায়, কিন্তু কোনটা সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ, সেটা ঠিক করা তাহাদের অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। মানুষ নিজের মানসিক শক্তি অনুসারে জীবনের কার্য্য ঠিক করিয়া লয়। যে ব্যক্তির মানসিক শক্তি খুবই নিম্ন অঙ্গের, সে ব্যক্তি জীবনের আমোদ-প্রমোদকেই জীবনের সার ভাবে। ইহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের শক্তি যাহাদের, তাহারা ধন বা যশ, কিম্বা ধন যশ এই দুই লাভ করা সেই জীবনের কর্ত্তব্য মনে করিয়া বসে। ইহার অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের মন যাহাদের তাহারা দেশ-সেবাকেই কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকে। ইহার অপেক্ষাও যাহাদের শক্তি বেশী তাহারা বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনকেই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া থাকে। স্বার্থ-চিন্তা তাহাদের মনে স্থান লাভ করিতে পারে না। অনেক সময় প্রশ্ন উঠে—কবি বড়, না বৈজ্ঞানিক বড়, না যথার্থ বীর বড়। সেক্স্পীয়ের বড়, না নিউটন বড়, না বোনাপার্ট বড়? ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার ঠিক উত্তর দেওয়া একরূপ অসম্ভব। কিন্তু বিশ্ব-হিতের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে প্রশ্নটার উত্তর অন্যরূপ দাঁড়ায়। সত্য বলিতে কি, বোনাপার্টের যা-কিছু কাজ, সবই তাঁহার নিজের জন্য আর কতকটা তাঁহার প্রিয় ফরাসী দেশের জন্য। তাঁহার অমানুষিক সাহস ও বীরত্ব সমস্ত জগতকে সন্ত্রস্ত ও ও চমৎকৃত করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান যুগে সমর-বিষয়ে এত বড় কর্ম্মী যে আর দ্বিতীয়টি জন্মান নাই—এ সকলই সত্য। তিনি যে একজন অসীম প্রতিভাশালী পুরুষ তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু নেপোলিয়ানের যা-কিছু সে সবই ত তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হইয়াছে। এখন আছে সুধু একটা নাম আর একটা গল্প। অমন নাম আর গল্প সেক্সপীয়র তাঁহার কল্পনার সাহায্যে অনেক সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে হ্যাম্লেট্, ওথেলো প্রভৃতি নামে আমাদের

মনের উপর যেমন ভাবের উদয় হয়, বোনাপার্টের নামে তাহার বেশী আর বড় একটা কিছু হয় না। কিন্তু সেক্‌সপীয়ার কি করিয়াছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা যাক্। তিনি আমাদের সম্মুখে একখানি মুকুর ধরিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিশ্বমানবের প্রকৃতি নিয়ত প্রতিফলিত হইতে দেখিতেছি। তিনি আমাদের যাহা দিয়াছেন, তাহা নেপোলিয়ান প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে উচ্চ অঙ্গের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একজন বড় কবি, আর-একজন বড় বৈজ্ঞানিকের কাজের ধারা অনেকটা একই রকমের। বিজ্ঞান-প্রতিভা ও কবিপ্রতিভা যমজ-ভগিনী বলিলেই হয়। সেক্‌সপীয়র যেমন মানবচরিত্রের সর্ব্বপ্রকার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া চির অমর হইয়া আছেন, নিউটনও তেমনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অজ্ঞাত রহস্য প্রকাশ করিয়া চির-অমরতা লাভ করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি বিশ্বমানবের হিতের জন্য কার্য্য করেন তাঁহারা সকলেই সেক্‌স্‌পীয়ার নিউটনের মত আমাদের ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল মহাপুরুষদের হৃদয়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত সহসা একটা নূতন ভাবের উদয় হয়। কিন্তু হৃদয়ে একটা original ideaর উদয় হইলেই যে বড় লোক হয় তাহা নয়; ইহা যে বিশ্বমানবের পক্ষে হিতকর সে সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান থাকারও আবশ্যক। তাহার পর ideaটাকে আকার দিবার, তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতার আবশ্যক। কোন একটা নূতন বিষয়ের যখন আবিষ্কার হয়, তখন সেটা খুবই সহজ ও সাধারণ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু যতক্ষণ তাহা ভাবে মাত্র আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ তাহা শৈলচূড়ার মত দুর্গম।

তাহা হইলে দেখা গেল—বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে চাই ভাবের প্রেরণা, তাহার পর ভাবটার উপকারিতা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ও উপলব্ধি এবং তার পর ভাবটাকে কার্য্যে পরিণত করিবার মত একাগ্রতা ও সামর্থ্য। এ সকলের উপর আর একটা জিনিস চাই সেটি হইতেছে শুভক্ষণের উদয়। শুভক্ষণ ব্যক্তিগত সাধনার জিনিস নয়—ইহা অনেকটা দৈবাধীন ঘটনা। নিউটন্, সেক্‌সপীয়র ও নেপোলিয়ানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হয়ত কত শত নিউটন্, সেক্‌সপীয়র ও নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল শুভক্ষণের অভাবে তাঁহারা আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। খুব বড় রকমের একটা আবিষ্কার যখন হয়, তখন অনেকেই অবজ্ঞা ভরে বলিয়া থাকেন—"ও অবস্থায় সে না হইলে আর একজন ইহা করিত।" এ কথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মীদের পক্ষে খাটে বটে—মহৎ কর্ম্মীদের পক্ষে নহে। রাষ্ট্রবিপ্লব পৃথিবীতে অনেকবারই ত হইয়াছে, নেপোলিয়ান ত একবারের বেশী জন্মাইলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, সুযোগটাকে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষমতার একান্ত আবশ্যক।

যে সকল অবস্থা ও ঘটনার সমাবেশে প্রতিভার স্ফুরণ হয়, তাহা নিতান্তই বিরল; বিরল বলিয়াই ত মানব জাতি অতি ধীরে

ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রতিভাবান পুরুষের উদয়ের বিশেষ বিশেষ যুগ আছে। হয়ত কোন জাতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া কোন একটা বিজ্ঞান, কি কোন নূতন শিল্পকলার উদ্ভব হয় নাই কিন্তু সহসা এমন একটা যুগ দেখা দিল, যে-সময় সেই জাতির মধ্যে বিস্তার বিবিধ শাখা-প্রশাখায় নানাপ্রকার প্রতিভাশালীর আবির্ভাব হইল। জাতীয় বৃক্ষে প্রতিভাবান পুরুষদের অভ্যুদয় বৃক্ষের পুষ্পোদ্গমের মত। সাধারণ মানুষ সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। পত্রের দ্বারা বৃক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধিত হয় বটে কিন্তু বৃক্ষে ফুল ধরে তাহার গৌরবের জন্য, তাহাকে ফলবান করিবার জন্য। উর্ব্বরদেশ, প্রচুর খনিজ সম্পদ, ব্যবসায়ের সুবিধা ও বিস্তার জাতীয় সম্পদের পরিচায়ক বটে কিন্তু ইহার অপেক্ষা বড় মূলধন হইতেছে সেই জাতির প্রতিভাবান পুরুষোৎপাদন ক্ষমতা। জাতীয় ইতিহাস ত সেই জাতির ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রকম প্রতিভাবানের ইতিহাস বলিলেই হয়। পৃথিবীতে এমন দুর্ভাগ্য জাতিও আছে যাহাদের মধ্যে কস্মিন্‌কালেও একজন প্রতিভাবানের অভ্যুদয় হয় নাই। এরূপ জাতির পৃথিবীর ইতিহাসে কোনই স্থান থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও আবিষ্কারের জন্য কেবলই যে প্রতিভার আবশ্যক তাহা নহে। ইহার জন্য আরও এক শ্রেণীর লোকের আবশ্যক। ইহাঁদের কাজ শুধু ঘটনাসমূহ ও পরীক্ষাফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। এ কাজের জন্য অবশ্য খুব অসাধারণ ক্ষমতার আবশ্যক করে না, কিন্তু ইহার জন্য যে পরিমাণ উৎসাহ, ধীরতা ও স্বার্থ-হীনতার প্রয়োজন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। যে ব্যক্তি নিজের লাভালাভ বিষয় চিন্তা করে, তাহার দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে না। এই সকল ধীর, নিঃস্বার্থ কর্ম্মী পুরুষদের কাজের উপরই ভবিষ্যতের বড় বড় আবিষ্কার নির্ভর করিয়া থাকে। জাতীয় উন্নতি সম্পাদনের জন্য এইরূপ শ্রমশীল সহিষ্ণু কর্ম্মী পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে জাতির মধ্যে এইরূপ পুরুষের সংখ্যা যত অধিক, তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা তত বেশী।

তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক হইতেছে—ঘটনার পর্য্যবেক্ষক (observer of facts ; দ্বিতীয় হইতেছে—সমস্যার মীমাংসক (solver of problems)। বলা বাহুল্য অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই শেষোক্ত শ্রেণীর দ্বারাই জগতে সর্ব্ব প্রকার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ভাব ও পর্য্যবেক্ষণ দুইয়েরই আবশ্যক বটে, ইহার কোনটাই বাদ দিবার জো নাই; তবে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে, পর্য্যবেক্ষণ অপেক্ষা ভাবেরই যে প্রাধান্য বেশী তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

লম্ব্রসো সংখ্যা-তালিকার সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রতিভা ও বাতুলতায় বড় নিকট সম্বন্ধ। কিন্তু তিনি

যদি এমন বলিতেন যে, প্রতিভা হইতে বাতুলতা জন্মাইতে পারে, বাতুলতা হইতে প্রতিভা জন্মাইতে পারে না, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার কথাটা আরও সঙ্গত হইত। প্রতিভা বড় সর্ব্বনেশে জিনিস। ইহার অত্যাচার বড় ভীষণ অত্যাচার। ইহা অল্পে তুষ্ট হইতে জানে না। প্রতিভাশালীর কাজের যেন শেষ নাই। প্রতিভাশালীর ভাগ্যে কদাচিৎ শান্তি ঘটিতে দেখা যায়। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানটিতে উপস্থিত হইতে পারিলেও, দুর্ভাগ্যক্রমে, সে-স্থানটিও তাঁহার পক্ষে সুখকর ও প্রাণারাম হইতে পারে না। বন্ধুবর্গ তাঁহার সফলতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন, সমালোচকবৃন্দ ওটা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন; মূর্খের দল তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করে, প্রতিদ্বন্দীরা ঈর্ষা করে, আর সাধারণ জনমানব ত বিষয়টা চিন্তার মধ্যেই আনা আবশ্যক বিবেচনা করে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক মিলে। সক্রেটসের প্রতি বিষের ব্যবস্থা, ব্রুনোর প্রতি অগ্নির ব্যবস্থা; গ্যালিলিয়ো ও কলম্বসের প্রতি কারাবাসের ব্যবস্থা; জেনারের প্রতি সমস্ত জগতের বিরুদ্ধাচরণ—এ সকল ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে সকল মহানুভব প্রতিভাশালী পুরুষ তাঁহাদের আবিষ্কারের দ্বারা জগতের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, জগৎ চিরকালই তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে। অন্নাভাবে আশ্রয়াভাবে ইহাদের কতজনকেই না, অকালে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। দেবী বাগ্‌দেবী যাহাদের কৃপা করেন, লক্ষ্মী তাঁহাদের চিরকালই অকৃপা করিয়া আসিতেছেন, কথাটা বৈজ্ঞানিকদের প্রতি যেমন খাটে এমন আর কাহারও পক্ষে নহে। কেননা, বিজ্ঞান তাহার একনিষ্ঠ ভক্তকে সুধু সিদ্ধিলাভের আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই দেয় না। তাহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সাধারণের জিনিষ হইয়া পড়ে। লোকে তাহা নানা কাজে লাগাইয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করে, মূল আবিষ্কারকের কথাটি কহিবার জো থাকে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

স্বেচ্ছাচারী

৮

সকাল হইয়াছে। শশিভূষণের শ্বশ্রূঠাকুরাণী চিন্ময়ী দাসী শয্যায় শায়িতা। তিনি একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই বিন্দু দাসী তাড়াতাড়ি তাঁহার পিঠের দিকে আর একটা বালিস আগাইয়া দিল। তিনি পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া দিতে বলিলেন। দাসী জানালা খুলিলে হঠাৎ চিন্ময়ীর দৃষ্টি একটা ইজি-চেয়ারে-শায়িত শশিভূষণের উপর পতিত হইল। শশিভূষণ সারারাত্রি

জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নিদ্রিত মুখের উপর প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িবামাত্র সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল। প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, আপনি কাপড় ছেড়ে জপটা সেরে নিন, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।"

চিন্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, "রোগীর আবার জপ-তপ! নিজের শরীরের বিষয় ছাড়া এ সময়ে কি আর অন্য চিন্তা আসে, বাবা? বিন্দু, গঙ্গাজল আর কাপড়খানা আন্ ত মা।"

বিন্দু প্রার্থিত বস্তু অগ্রসর করিয়া দিলে শশিভূষণ মুখ ধুইবার জন্য বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "সরোজ!" সরোজ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "এ কি শশিদা, তুমি কৈ তিনটের সময় আমায় ডাকনি?" শশিভূষণ কলতলায় মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা পয়ষট্টি! তিনটে পর্য্যন্তই যদি জাগলুম, তাহলে পাঁচটাই বা কি দোষ করলে?"

সরোজ কহিল, "না শশি দা, এ তোমার ভারী অন্যায়!"

শশিভূষণ কহিল, "কিছু অন্যায় হয়নি ভাই। সমস্ত দিনটা পড়ে আছে, যত ইচ্ছা জেগে থেকো। আর কথাতেই বলে, অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন! ও তোমার পক্ষে দুই সমান। তুমি মার কাছে যাও। আমাকে বাসায় ফিরতে হবে, তারপর কলেজ আছে।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী-সম্বন্ধে বিন্দি দাসী ও সরোজকে সমস্ত উপদেশ দিয়া শশিভূষণ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সরোজ বলিল, "দাঁড়াও, তোমার চা'টা করে দি।" শশী বলিল, "চা খেতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।" সরোজ ছাড়িল না, তাড়াতাড়ি তাহার জন্য চা চড়াইয়া দিয়া বলিল, "কার্ত্তিকবাবু বলছিলেন, তিনিও তোমার সঙ্গে এসে রাত জাগতে ইচ্ছুক।"

শশিভূষণ কহিল, "অর্থাৎ যেটুকু সময় তোমার কাছে কাটে! তোমার গন্ধটুকু শব্দটুকুও ওর কাছে এখন লোভনীয় কি না!"

সরোজের মুখখানি শশীর এই বিদ্রূপে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জারুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা অতি করুণ বিষণ্ণতার ছায়াপাতে মনোহর শোভা ধারণ করিল। শশিভূষণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সরোজ, সাবধান ভাই, আমার ভয় হচ্চে—"

সরোজ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "কোন ভয় নেই শশিদা, অন্ধের রাতও নেই, দিনও নেই। দিন এলেও তার জন্য আসে না, রাত এলেও তার জন্য আসে না।"

শশিভূষণ হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া সরোজের মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিল, "সরোজ, সূর্য্য উঠলেই সরোজ প্রস্ফুটিত হয়, তা জানি, তবু যে আমার সরোজকে কেউ কৃপা করে দয়া দেখাবার জন্য ভালবাসবে, তোমার এ রকম অপমান আমি কিছুতেই সইব না! তুমি দয়ার পাত্রী নও, দয়ার ঢের ওপরে যা, সেই পূজাই তোমার প্রাপ্য! তাই তোমায় সাবধান করছি।"

সরোজ চায়ের বাটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার হাত কাঁপিয়া চা একটু পড়িয়া গেল। শশিভূষণ তাহার

হাত হইতে চায়ের বাটিটা গ্রহণ করিয়া বলিল, "সরোজ, আমার কথায় রাগ করলে ?"

সরোজ কহিল, "আমি অন্ধ! আমার আবার রাগ-দ্বেষ লজ্জা-ভয় কি শশিদা ?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলুম না।"

সরোজ কহিল, "কেমন করে হবে ? মিছিমিছি কাউকে কষ্ট দিলে কি কারও সুখ হয় ?"

শশিভূষণ কহিল, "আমায় ক্ষমা কর বোন, আমি তোমার ভালর জন্যই বলছিলুম। কার্ত্তিককে আর অগ্রসর হতে দিয়ো না। সে বিবাহ-পণে বদ্ধ। সর্ব্বানন্দর কাছে যা শুনেছি, তাতে বুঝেছি যে কালিকা কাকার মেয়েটা তারই আশা-পথ চেয়ে বসে আছে। কালিকা কাকাও বহুদিন থেকে কার্ত্তিকের উপর আশা-ভরসা—"

সরোজ কহিল, "থাম তুমি, এবার সত্যিই আমি রাগ করব। কেন তুমি এ সব কথা বলছ ? ভগবান আমায় দৃষ্টি-হারা করে পথের এক পাশ দিয়ে চলবার মাত্র অধিকার দিয়েছেন; আমি কি পথের সেই একধার ছাড়া আর বেশী-কিছু চেয়েছি ? তুমি আমায় দয়া করে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছ, তাই আমার চলা হচ্চে, নইলে কোথায় এক পাশে পড়ে থাকতুম, কেউ আমার খোঁজও রাখত না। তোমার উপদেশ ছাড়া, তোমার হাতের নির্দ্দেশ ছাড়া, অবলম্বন ছাড়া যদি এক পা চলি, সেই দিন তুমি আমায় ঠেলে ফেলে চলে যেয়ো।"

শশিভূষণ সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেল। কিন্তু সরোজের মনে সে যে ব্যথা দিয়া গেল তাহার অনুভব সেই দিনকার প্রভাতের সমস্ত আনন্দটুকুকে তীব্র তিক্ত রসে পরিণত করিয়া তুলিল। সরোজ ধীরে ধীরে একটা গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া তাহার অন্ধ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া দিল। তাহার সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটা ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল —আলো—আলো! হে লোক-চক্ষু, হে সর্ব্ব-প্রকাশ, হে স্বপ্রকাশ, তুমি তাহার কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হও। তাহার এই সমস্ত দেহ একটী চক্ষুতে পরিণত হইয়া সর্ব্বরূপের কারণ-স্বরূপ তোমার রূপকে এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরে গ্রহণ করিয়া তারপর পদ্মের মত মুদিত হইয়া যাক্। একবার—একটী বার মাত্র তোমার কিরণের আঘাতে তাহার এই চিরান্ধকারময়ী রাত্রি এক মুহূর্ত্তের জন্য অস্তগমন করুক! তারপর আসুক রাত্রি, আসুক অন্ধকার, তাহার আর কোন ক্ষোভ থাকিবে না!

হে প্রভাত, জীবন-প্রভাতে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া মধ্যাহ্ন আসিবার পূর্ব্বে চিররাত্রে পরিণত হইলে! ক্ষণেকের জন্য আমার চক্ষে ফুটিয়াছিলে, তারপর—আদিহীন অন্তহীন অপার অন্ধকার সাগরের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে! যে পথে সহস্র যাত্রী চলিয়াছে, সেই পথেই চলিতে হইবে; অথচ তাহাদের পথের আলো পথকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু আমার নিকটে সেই পথই, তাহার দূরত্ব, তাহার বিস্তৃতি, তাহার অসংখ্য যাত্রীর

সমাবেশ সমস্ত সঙ্গে লইয়া চির-অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে! যাক্, অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন—দুই সমান! অন্ধের চলাও যা, না চলাও তাই। কেবল এইটুকু চাই, যেন পথের একধারে আমার একটু স্থান থাকে! হে অনন্তের যাত্রীর দল, অন্ধ বলিয়া আমায় ঠেলিয়া পদ-দলিত করিয়া যাইয়ো না। তোমরা যখন দেখিতে পাও, তখন এই অন্ধ যাত্রীকে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়ো। আমায় পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাও, কোন দুঃখ নাই, কিন্তু দয়া করিয়া আমায় ধূলায় লুটাইয়া দিয়া যাইয়ো না। আমি ধীরেই চলি আর দাঁড়াইয়াই থাকি. আমি যেন দুই পায়ের উপর সোজা হইয়া থাকিতে পাই! হে আমার অন্ধকারের অন্ধ দেবতা, তোমার এই ক্ষুদ্র সেবিকাকে তোমার মৌন নীরবতার মধ্যে স্থির, নিশ্চল, উন্নত রাখিয়ো, ইহার অধিক আর কিছু চাহি না।

* * *

দ্বিপ্রহরে চিন্ময়ীকে ঔষধ পান করাইয়া সরোজ সুকুমারীকে ডাকিয়া লইয়া পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমারী কিন্তু কিছুতেই পাঠে মন দিল না, কারণ সর্ব্বদাদা বলিয়াছিল, যতদিন না মার অসুখ সারে, ততদিন তাহাদের ছুটী। সরোজ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা হবে না সুকু, মা এখন চিররোগীর মত হয়ে পড়লেন। তিনিই আমায় বকছিলেন। আর বিশেষ একদিন অবহেলা করলে তারপর দিন আরও মুস্কিলে পড়বে। যাদের চোখ নেই, তাদের যখন আঙল দিয়ে পড়তে হয়, তখন স্পর্শটাকে প্রতিদিন সজাগ রাখতে হবে, নইলে কিছুতেই এগুতে পারা যাবে না।"

সুকুমারী কহিল, "তার কি দরকার! আমি ত একবার ছুঁয়েই বুঝতে পারি যে এটা আমার কোন্ পুতুল, এটা আমার কি জিনিষ! তবে অক্ষরের বেলায় রোজ রোজ হাত বুলুতে হবে কেন?"

সরোজ কহিল, "পুতুলটার ওপর তুমি যতখানি মন দিতে পার, ততখানি মন পড়ার ওপর দিতে পার না, তাই রোজ রোজ পড়ার দরকার।"

সুকুমারী অগত্যা একখানা মোটা কার্ড বোর্ড লইয়া তাহার তোলা অক্ষরে লিখিত বর্ণমালার উপর অঙ্গুলি বুলাইতে আরম্ভ করিল। সরোজ সুকুমারীর হাতের উপর আঙুল রাখিয়া তাহার হাতের গতি-অনুসরণ এবং ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হইয়া সুকুমারী বলিল, "আচ্ছা সরোজ দিদি, যাদের চোখ আছে, তারা পড়ে কি করে?"

সরোজ কহিল, "চোখ দিয়ে।"

সুকুমারী কহিল, "আচ্ছা, তারা আঙুল দিয়ে কি করে? আমাদের মত পড়ে?"

সরোজ কহিল, "না, তারা আঙুল দিয়ে লেখে, তবে শুনেছি, পড়তেও পারে। তারা হাতের অনুভব দিয়ে চোখের অনুভবকে পড়ে।"

সুকুমারী বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "হাতের অনুভব দিয়ে চোখের অনুভব কি করে পড়ে? চোখের অনুভব আবার কি রকম?"

সরোজ মহাবিপদে পড়িল, এ কথা কি করিয়া সে তাহাকে বুঝাইবে? সে বলিল, "তুমি বড় হও, তারপর বুঝিয়ে দেব, এখন তুমি বুঝতে পারবে না।" কিন্তু সে যে বলিয়াছে, 'চক্ষুষ্মানে হাতের অনুভব দিয়া হাতের অনুভব পড়ে না, হাতের অনুভব দিয়া চোখের অনুভব পড়ে' এই কথা কয়টা সে কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিয়াছিল, বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া নয়। সে আজ সমস্ত দিন ধরিয়া ঐ কথাই ভাবিয়াছে। তাহার ক্রমাগতই মনে হইয়াছে যে চক্ষুষ্মানে কখনই স্পর্শের যথার্থ অনুভব পায় না, তাহাদের সমস্ত অনুভবই দৃষ্টির ভাষায় ঘটিয়া থাকে। অন্ধের কি যে ভাষা, কি যে অনুভব, তাহা তাহারা কিরূপে জানিবে? তাহারা আপনার অনুসারেই পরকে দেখে, পরের কার্য্যের বিচার করে। হায়, অন্ধের অনুভব যে অন্ধ নয়, কিরূপে সে তাহা অনুভব করিবে? এমন কি কেহ নাই যে অন্ধকে অন্ধেরই মত অনুভব করিবে? চক্ষুর প্রকাশকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া কেবল অন্তরের প্রকাশকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবে? এমন কে আছে যে, সমস্ত বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া তাহাদের অন্তরের মধ্যে অনুভবানন্দ-স্বরূপ আপনাকে প্রকাশিত করিবে? যদি এমন কেহ থাক, এস, সরোজ তাহারই অপেক্ষায় তাহার বহিঃপ্রকাশহীন অন্তঃসরোজ পাতিয়া বসিয়া আছে!

সরোজ সুকুমারীকে সাহায্য করিতে করিতে অনুভব করিল, কে যেন সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে আসিল এবং ক্রমশ পাঠ-কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারী পাঠ ত্যাগ করিয়া বলিল, "কে?" সরোজের মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই সে গম্ভীর মুখে বলিল, "কার্ত্তিক বাবু, ওখানে দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন? ভিতরে আসুন।"

কার্ত্তিক প্রবেশ করিয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া বলিল, "আমি কার্ত্তিক কেবল নামে, আমার যদি ময়ূর থাকত, তাহলে বোধ হয় আপনি আমার আগমন মোটেই টের পেতেন না। তা না হয়ে জুতোর ওপরই আমার আগমন-ঘোষণার দামামা বাঁধা রয়েছে। আজ আপনাকে আশ্চর্য্য করে দেবার জন্য এই দুপুরেই চলে এলুম।"

সুকুমারী কহিল, "কার্ত্তিকদা, আমার পড়তে ভাল লাগছে না, তবু সরোদি ছাড়বে না।"

কার্ত্তিক কহিল, "যারা মাষ্টার হয়, তাদের ঐটে বড় দোষ। পড়তে ভাল লাগছে না তবু তারা পড়াবেই, বসে থাকতে ভাল লাগছে না তবু তারা বসিয়ে রাখবে, কাজ করতে ভাল লাগছে না তবু তারা বলবে, কাজ কর, কর্ত্তব্য কর, নইলে ক্ষতি হবে। সুকু, আমারও পড়তে ভাল লাগছিল না, তাই আমি পালিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। কিন্তু তুমি ছোট্ট কি না, তাই তোমার পালাবার জো নেই, এ অত্যাচার সইতে হচ্চে। কি করবে, বল, পরাধীন হওয়ার ঐটেই মস্ত দোষ।"

সরোজ কহিল, "নিজেকে বড় হয়েছি মনে করা, কর্ত্তব্যের চাইতে ওপরে উঠেছি

মনে করা, স্বাধীন হয়েছি মনে করা একটা মস্ত অহঙ্কার। আর অহঙ্কারই পতনের পূর্ব্ব লক্ষণ!”

কার্ত্তিক কহিল, “তা হবে! যে চারি দিক দিয়ে বদ্ধ,—ঘরের কোণে বদ্ধ, পরের সাহায্যের দ্বারা বদ্ধ, নিজের দৃষ্টিহীনতার দরুণ বদ্ধ, সে কেমন করে বুঝবে যে মাঝে মাঝে ছাড়া পেতে, সকল বাধা থেকে, দৃষ্টির বাধা, জ্ঞানের বাধা, কর্ত্তব্যের বাধা, সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছে হয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, যা বুঝিনে, যা জানবার কোন উপায় নেই, যা একেবারে দৃষ্টির পূর্ব্বের অন্ধকারের মত সম্পূর্ণ অবোধ্য, অপ্রজ্ঞাত, সেই নিতান্তই অজানার মধ্যে আপনাকে হারাতে ইচ্ছে করে। যার বহির্দৃষ্টি নেই—”

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, “তার অন্তর্দৃষ্টি থাকতে পারে না, সে বাইরে-ভেতরে উভয় দিকেই অন্ধ, কেমন? কার্ত্তিকবাবু, হেঁয়ালিতে কথা বলতে কবে থেকে শিখলেন? আর দীন দুঃখী অন্ধদের অন্ধতা নিয়ে নিষ্ঠুরের মত বিদ্রূপ করতেই বা কে আপনাকে অধিকার দিলে? দুপুর বেলায়, সমস্ত কর্ত্তব্য ফেলে রেখে অন্ধদের নিয়ে খেলা করতেই বা কে আপনাকে বলেছিল? আপনি মনে করছেন যে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না? কিন্তু নিজের বিষয় অতখানি অহঙ্কার রাখবেন না, কার্ত্তিকবাবু। আমরা অন্ধ বলে এতখানি অন্ধ নই! আমি অন্ধ বলে যে একেবারে দেখতে পাইনে, তাও নয়! আমার বাইরে চোখ নেই বটে, কিন্তু যিনি সবারই পক্ষে চক্ষু-স্বরূপ, তিনি সর্ব্বদাই আমার অন্তরের মধ্যে চক্ষু হয়ে বসে আছেন। আপনি যা মনে করে এখানে একজন অসহায় অন্ধ নারীর কাছে আসেন, সে ভাবটা আমার অন্তরের চক্ষু স্পষ্ট দেখতে পায়। বাহিরের চোখে যা ধরা পড়ে না, ভেতরের চোখের কাছে তা খুব স্পষ্ট।”

কার্ত্তিক স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অভিমান, সমস্ত দর্প এক নিমেষে মন্ত্রমুগ্ধ বিষদন্তভগ্ন সর্পের মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কার্ত্তিক আর কোন কথা বলিতে পারিল না। এমন কি সেই বিস্ফারিত অন্ধ নয়নের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও পারিল না;—তাহার বোধ হইল, যেন ঐ অন্ধ নয়ন হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু কি তাহার অপরাধ? কি অপরাধে সে এই অন্ধ নারীর অন্তরস্থ তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে এমনভাবে দগ্ধ হইতে লাগিল?

সুকুমারী তাহাদের কথাবার্ত্তার অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিল, “কি হল সরোদি, তুমি কাঁপছ কেন?”

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কিছু না সুকু, চল, আমরা মার কাছে যাই, মাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।”

কার্ত্তিকও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কি পাপে আমায় এত বড় দণ্ড দিলে?”

সরোজ কহিল, “কি পাপে? আপনি এত বড় অন্ধ যে, নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না, অথচ ঐ দুটো চোখের এতখানি গর্ব্ব করেন! নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে আপনি এতখানি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন যে, আপনার সমস্তই যে

অন্যে টের পেতে পারে, এটুকু পর্য্যন্ত আপনি বুঝতে পারেন না! আমি কি একটা খেলার পুতুল যে দুদণ্ড খেলা করবার জন্য আমার কাছে আপনি ছুটে আসবেন, আর আমি তাই সহ্য করব?"

কার্ত্তিক কহিল, "খেলা! আমি তোমায় নিয়ে খেলা করতে আসি! তোমার কাছে আসি বলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই যেতে বসেছে! আমার দেবতার মত পিতা—তিনি আমায় ত্যাগ করতে উদ্যত, আমার পরম-হিতৈষী পিতৃতুল্য কালিকাবাবু আমার জন্য কাঁদছেন, আর হয়তো শৈলজাও আমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। তোমার ঐ অবাধ্য অন্ধ নয়ন দিয়ে তুমি আমায়—"

সরোজ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "এতেও বুঝতে পারছেন না, আপনি কতখানি অন্ধ! আপনার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা যে আমার চাইতেও আপনাকে অন্ধ করেছে। যে নিজের জন্য সকল হিতৈষী বন্ধু আত্মীয়ের ভালবাসাকে তুচ্ছ করতে পারে, সে মানুষ নয়। আপনার নিজের অন্তরের দিকে ভাল করে না চেয়ে এই মন নিয়ে কি করে রোজ আমার কাছে আসতেন—আর আমিই বা কি করে সব বুঝে সব জেনেও আপনাকে সহ্য করেছি, এইটেই আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে! কিন্তু আর না, আর আমি আপনাকে কাছে আসতে দেব না। যে নিজের বাপ-মার নয়, বন্ধুর নয়, আত্মীয়ের নয়, এমন কি প্রাণ-দিয়ে-ভালবাসারও নয়, সে কোন্ সাহসে অসহায় পরনির্ভরশীল অন্ধের কাছে আসে?"

কার্ত্তিক অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সরোজ, ক্ষমা কর। আর আমি এখানে আসব না। কিন্তু ঠিক জেনো যে তুমি আমার পক্ষে যত দুর্ল্লভ হয়ে উঠছ, ততই আমায় নির্দ্দয় ভাবে আকর্ষণ করছ। তুমি না চাইতে আমি আপনাকে দিয়েছি, এই আমার অপরাধ! তুমি লভ্য নও, তুমি নিজেই অন্ধকারের মত অবোধ্য, তাই তোমার এতখানি শক্তি! তোমায় বুঝতে পারি না তাই আসি। বুঝতে পারলে হয়তো আসতুম না। তুমি আমায় চাও না, তাই তুমি আমায় টানছ। যাক্, আবার কি বলতে কি বলব! আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য কর। কর্ত্তব্যই তোমাদের কাছে যখন বড়, তখন আমার মত কর্ত্তব্যহীন বন্ধনহীন সংসার-থেকে-সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন জীব তোমার নিয়মে-বাঁধা জগতের মধ্যে বিপ্লব বাধাতে আর আসবে না।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। সুকুমারী সরোজের হাত ধরিয়া টানিল। কিন্তু সরোজ বেঞ্চখানার উপর অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। সুকুমারী বলিল, "এস সরোদি, মার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে যে।"

সরোজ ভাবিল, ঠিক্, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে! ওষুধ তেতোই হয়! প্রকাশ্যে বলিল, "বিন্দুকে ডেকে দাও, ওষুধ খাওয়াক্। আমি একটু পরে ওঁর খাবার তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও সুকু, খেলা করগে।"

সুকুমারী চলিয়া গেল, কিন্তু সরোজ উঠিল না। তাহার অন্তরের অন্ধকার

ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। যে আলো আসিতে চাহিতেছিল, সবলে সেই আলোর প্রবেশ-দ্বার সে আজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সে চির-অন্ধকারের জীব, কাজ কি তার ক্ষণিকের আলোয়? কিন্তু মন যে কিছুতেই থামিতে চায় না! ঐ যে পদ-শব্দ ক্রমেই দূরে মিলাইয়া গেল, তাহার অশ্রুত ধ্বনির পিছনে অ-বদ্ধ মনটা কেবলই যে ছুটিতে চাহিতেছে! আর একবার মাত্র—একটীবার ঐ অতি-পরিচিত পদধ্বনি শুনিবার জন্য যে তাহার অন্তরের নির্ব্বাক অন্ধকার গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! কেহ ত অন্ধের পানে আর অমন করিয়া চাহিয়া হৃদয়ের আলো লইয়া অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না! জগতে তাহাকে অমন প্রাণ দিয়া চাহিবে, এত বড় হতভাগা ত আর একটাও এ সংসারে পাওয়া যাইবে না! তবে সে ঐ একটী মাত্র হতভাগাকে কেন এমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল?

আলো আসিতে আসিতে অর্দ্ধ পথে তাহারই ফুৎকারে নিবিয়া গেল! হায় আলো,—হায় অন্ধকারের চির-প্রার্থিত বস্তু, হায় আঁধার ঘরের কুড়াইয়া-পাওয়া মাণিক, তোমায় চাহি না,—এইটাই তুমি বুঝিয়া গেলে? হায় অন্ধতা, তুমি কি এমনি অন্ধকার যে তোমার কিছুই কেহ কখনও বুঝিতে পারিবে না? তুমি কি চির-দিনই মৌন নির্ব্বাক থাকিয়া যাইবে?

৯

শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন পুত্রের পত্রের উত্তর পাঠাইয়া মনোরমা দেবীকে বলিয়া দিলেন, সে দিন হইতে কার্ত্তিকের নাম যেন তাঁহার গৃহে আর না লওয়া হয়। মনোরমা দেবীর মনে হইল সংসারের যত-কিছু কাজ-কর্ম্ম ছিল, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন একটা মস্ত ছুটির দিন আসিয়াছে। আর কাহারও জন্য কিছু করিতে হইবে না, কাহারও আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে না, আশা-আশঙ্কা-উদ্বেগাদির দায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি গৃহ-দেবতার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। বাড়ীর সর্ব্বকর্ম্মের দাসী—লক্ষীর মা বারম্বার ঠাকুর-ঘরের দ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর বাড়ীর ব্রাহ্মণ দরোয়ান মা ঠাকুরাণীর রন্ধনের জন্য জল তুলিয়া দিয়া গিয়াছে, এমন কি দেওয়ান-গৃহিণী নিস্তারিণী দেবীর দাসী ক্ষেমীও নানা অছিলায় আসিয়া বারম্বার শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে, এ সমস্তই শঙ্করানন্দের অভিশাপের ফল,—তবুও মনোরমা দেবী উঠিলেন না। সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া একটা বিরাট জড়তা, গুরুভার আলস্য চাপিয়া বসিয়াছে। পত্নীর অবস্থা দেখিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এমন করলে ত চলবে না মনোরমা। আমরা আহারাদি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ছাত্রেরা কি দোষ করেছে? তাদের দুবেলা দু মুঠো যদি না দিতে পার তা হলে তাদের বিদায় দিতে হয়। তুমি কি আমায় পৈতৃক বৃত্তি লোপ করাতে চাও?"

মনোরমা দেবী না উঠিয়া বলিলেন, "আর কার জন্য ও-সব? সব উঠিয়ে দাও।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কি! পুত্রের অপরাধে পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করব? তার পূর্ব্বে বরং তোমাকেও ত্যাগ করতে পারি!"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "যে স্ত্রী এত বড় পিতৃদ্রোহী সন্তানের জননী, তাকে যে স্ত্রী বলে এতদিন স্বীকার করেছ, এই তার পক্ষে যথেষ্ট, এখন তাকে বিদায় দাও, কিম্বা সংসারের পেট-ভাতায় দাসী করে রাখ, দুই সমান।"

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কত বড় আত্মধিক্কারে যে মনোরমা দেবী ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তিনি তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য করে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না, মনোরমা। যে সন্তান তার পিতার এত বড় অপমান করলে, যে সন্তান তার বাপের এত বড় ধর্ম্মচ্যুতির কারণ-স্বরূপ হল, তার জন্য দুঃখ করাই দুঃখের অপমান! তুমি ওঠো, তুমি এমনভাবে অন্নজল ত্যাগ করে থাকলে গৃহদেবতা ক্রুদ্ধ হবেন। সংসারে থাকতে হলে অনেক রকম দুঃখ সইতে হয়, তা বলে ধর্ম্ম-ত্যাগ কর্ত্তব্য-ত্যাগ করবার অধিকার কারও নেই। ওঠো মনোরমা।"

স্বামীর কাতর অনুনয়ে মনোরমা দেবী আজ তিন দিনের পর কাঁদিয়া ফেলিলেন। আজ তিন দিন হইতে যে অশ্রু অবরুদ্ধ হইয়া অন্তর্লীন অগ্নির মত তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, সেই অশ্রু প্রবাহিত হইয়া বুক ভাসাইয়া দিল। অপমানিত মাতৃ-হৃদয় যে অশ্রুকে ঘৃণায় চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ আর তাহা বাঁধন মানিল না। মনোরমা দেবী দেবতার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমায় নাও, দেবতা।"

ন্যায়রত্নের গৃহের সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া কালিকামোহন তাঁহার কন্যাকে মনোরমা দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শৈলজা আসিয়া মনোরমার পদতলে প্রণাম করিবামাত্র তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শৈলজাও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার মত একটী কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল মনোরমা দেবীর অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া বসিয়া রহিল। এইরূপে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পরে অশ্রু মুছিয়া সে বলিল, "মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, বাবা বলেছেন, সমস্তই আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

মনোরমা দেবী তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যে অন্ধ তার হাতের কাছে এত বড় মাণিক থাকতে আলেয়ার পেছনে ছোটে, তার জন্য আশা করাও আশার অপমান! যাও মা, আমাদের আশা আর করো না। তোমার বাবাকে বলো, সেই মহাপাপিষ্ঠের আশা তিনি আর না করেন। অযোগ্য পাত্রের জন্য এমন কন্যাকে অবিবাহিত রাখা অন্যায়। আমাদের পাপে তোমরা কেন কষ্ট ভোগ কর?"

শৈলজা অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "তা হয় না মা, বাবা বলেন, বামুনের মেয়ের বাগ্‌দত্তা হওয়া যা, বিয়ে হওয়াও তাই।"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "শাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু তাই বলে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে বলতে পারিনে ত। এর

পরও যদি তোমার বাবা সেই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন, তাহলে যে তোমায় জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। যার এমন বাপ কেউ নয়, সর্ব্বানন্দর মত বন্ধু কেউ নয়, তোমার বাবার মত এত বড় হিতৈষীও কেউ নয়, সে কি জীবনে কখনও কারও হবে? তাকে আপন করা কারও সাধ্য নয়।"

শৈলজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তবু তিনি আপনাদেরই সন্তান, সেটা ত মিথ্যা নয়। একবার যদি ক্ষণিকের মোহে তাঁর একটা ভুল হয়ে থাকে, তাই বলে কি তাঁকে আপনারা একেবারেই ত্যাগ করবেন? আপনারা ত্যাগ করলে তাঁর যে আর কোন উপায় থাকবে না।"

মনোরমা শৈলজার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ পরম স্নেহে চাহিয়া রহিলেন, পরে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কতকটা আত্মগতভাবে বলিলেন, "আশা আছে—আশা আছে—এই তুমিই আমার একমাত্র আশা!" শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "এখন তাহলে আসি, মা একা আছেন।"

শৈলজা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * *

এদিকে নিস্তারিণী দেবী দেওয়ান দুর্গাশঙ্করকে ধরিয়া বসিলেন, এই সময়ে মণিশঙ্করের সহিত শৈলজার বিবাহের চেষ্টা কর। দুর্গাশঙ্কর বলিলেন, "কেন, শৈলজার অপরাধ? কার্ত্তিকের উপর তার বাপ রাগ করেছে বলে কি শৈলজার আর সৎপাত্র জুটবে না?"

এই উত্তরের ফলে দুর্গাশঙ্করবাবুকে সে দিনটি যেরূপ অশান্তিতে কাটাইতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন; এবং পরে যে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া নিস্তারিণী দেবীর কথানুযায়ী কার্য্য করিতে হইয়াছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

সন্ধ্যার পর তিনি টোলে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অতি লজ্জিতভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনি অমন করে এসে বসলেন যে! আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছেন?" দেওয়ান লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, তা নয়, আমিই কোন প্রার্থনা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "প্রার্থনা! আমার কাছে? কি প্রার্থনা, বলুন।"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তু বলতে ভয় হচ্চে, পাছে আপনি রাগ করেন!"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "রাগ করব! এমন কি প্রার্থনা? বলুন, সাধ্যাতীত না হলে নিশ্চয় তা পূরণ করবার চেষ্টা করব।"

দেওয়ানজী কহিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার এইটুকু কথাই যথেষ্ট। আমি প্রার্থনা করছি যে আমার মণির সঙ্গে শৈলজার বিবাহের সম্বন্ধ করে দিন।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আপনার মণির সঙ্গে? কি ভয়ঙ্কর! শৈলজার কোষ্ঠীতে কি সৎপাত্র জোটবার মোটেই আশা নেই! আপনিই বলুন, মণির মত পাত্রের সঙ্গে—আপনার যদি কোন কন্যা থাকত—তার বিয়ে দিতে পারতেন?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তু আমি পিতা।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "তেমনি শৈলজাও কোন পিতার সন্তান। আমি বললেও তিনি জেনে-শুনে কেমন করে এমন অসৎপাত্রে মেয়ে দেবেন?"

দেওয়ানজী কহিলেন, "সৎপাত্রও যেমন পিতৃদ্রোহী কুসন্তান হতে পারে, অসৎপাত্রও তেমনি সঙ্গ সময় ও অবসরের গুণে সৎপাত্র হতে পারে।"

শিবচন্দ্র আহত হইয়া বলিলেন, "দেওয়ানজী, এ আঘাত আমার প্রাপ্য বটে; আপনি ঠিকই করেছেন। আমার যেমন অহঙ্কার তেমনি তার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছেন। আচ্ছা, বেশ আমি চেষ্টা করব, যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে মণির সঙ্গে শৈলজার বিয়ে হয়। কিন্তু—"

দেওয়ানজী কহিলেন, "কিন্তুর বিষয় আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, ন্যায়রত্ন মশায়, কিন্তুর বিষয় আমার সমস্তই জানা আছে। আমি পিতা বলে এত বড় অন্ধ নই যে আমার ঐ বর্ব্বর সন্তানের কোন্ জায়গায় 'কিন্তু' আছে, তা দেখতে পাইনে। কিন্তু তবু আমি ওর জন্মদাতা, ওর পাপের ভাগ আমাকেও কতক বইতে হচ্চে এবং হবেও। তবু ওকে ত্যাগ করতে পারিনে। আপনার মত ন্যায়ের তুলা-দণ্ড ধরে কোন পিতাই বসে থাকতে পারে না। বাপ যখন পুত্রের জন্ম দিয়েছে, তখন পুত্রকে ধূলোমাটী-শুদ্ধ প্রাণপণে কোলের মধ্যে ধরে' পরের আঘাত থেকে তাকে বাঁচাতে সে বাধ্য! ভগবান যেমন ন্যায়-অন্যায়, বস্তু-অবস্তুর বিচার করবার ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন, তেমনি একটা অন্ধ প্রবৃত্তিও তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, সেটার নাম স্নেহ। ভগবান যেমন ধূলো দিয়ে রাস্তার কঠোরতা বন্ধুরতা ঢেকেছেন, তেমনি স্নেহ দিয়ে সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বন্ধুরতাও কতকটা দূর করেছেন। ধূলোয় চোখ অন্ধ করে দেবে, পথ দেখতে দেবে না, তবু তাকে ছাড়বার জো নেই, ঝাড়বার উপায়ও নেই। ঝাড়লে সে ধূলো আরও নাকে-মুখে ঢুকবে।"

দেওয়ানজী ন্যায়রত্নকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেলেন। শিবচন্দ্র প্রতিনমস্কার বিস্মৃত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠিক! ধূলা ঝাড়িতে গেলে আরও নাক-মুখ দিয়া সে প্রবেশ করে! তা করে বটে! শিবচন্দ্র প্রাণে-প্রাণে তাহা অনুভব করিতেছেন! হায় ধূলা, হায় পথ-ভুলানো, সব-ভুলানো অন্ধ-করা ধূলা, তোর হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

ভারতীয় মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার

যে দ্বিতীয় ধর্ম্ম ভারতে সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা "ইস্‌লাম"। শেষবারের আদম স্থমারি-অনুসারে, ঐ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ৬২ লক্ষ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, কাশ্মীরে প্রত্যেক দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে,--৭০৫১ জন; সিন্ধুদেশে ৭৭১৩ জন; পঞ্জাবে ৪১৭০ জন; কোটায় ৩২৮৫ জন, বাঙ্গলায় ৩২৮৫ জন মুসলমান, (প্রাচ্যখণ্ডের বুনো জাতের মধ্যেও ইসলাম-ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে); এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কেবলমাত্র ৬৩১ জন ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৮০৫ জন মুসলমান গণনায় ধৃত হইয়াছে।

ইস্‌লামের ৬২ সম্প্রদায়ের মধ্যে সব সম্প্রদায়ের লোকই ভারতে আছে; তবে, শুধু চারি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যার বিশেষরূপ আধিক্য ও প্রাধান্য লক্ষিত হয়; একদিকে শিয়াসম্প্রদায়ের লোক; অপর দিকে সুন্নিসম্প্রদায়ের লোক; আবার এই সুন্নিসম্প্রদায় তিনটি বিশেষ আকারে পরিচিতঃ—প্রাচীনতন্ত্রী, ওহাবী, ও ফেরাজি। কিন্তু বস্তুত, অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান প্রাচীনতন্ত্রী সুন্নি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

কোরাণের অদৃষ্টবাদ, সুফীদিগের নিষ্ক্রিয় ধ্যান-বাদ, ভারতীয় মুসলমানদিগের উপর একটা শোচনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; শিক্ষালাভের দিকে তাহাদের চেষ্টা নাই; শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যে তাহাদের তেমন-বেশী উদ্যম নাই; তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে কদাচিৎ যোগ দেয়।

সাধারণভাবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিসত্ত্বেও, ইস্‌লাম অবনতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইস্‌লামের অনুবর্ত্তিগণ বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিমুখ (যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে আরবেরাই প্রথম পথপ্রদর্শক ছিল) এবং সাহিত্য-বিভাগেও উহাদের রচিত কোন চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের আইনসংক্রান্ত ও ধর্ম্মতত্ত্বসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি—প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অলস ভাষ্য মাত্র। সাম্প্রদায়িক বাদানুবাদের মধ্যে, কোন উদারভাবের বিকাশ নাই, কোন নূতন কথা নাই।

সমস্ত সাধারণ মুসলমানের মধ্যে, চাষা ও নগরবাসীর পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। নগরবাসী মুসলমানেরা, উপবাস ও দৈনিক ভজনাসংক্রান্ত সমস্ত আদেশ পালন করে; পৌত্তলিকতা হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া চলে; ইহার বিপরীতে, উহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততা খুব বেশী; উহাদের সংখ্যা অধিক্য হওয়ায়, উহারা হিন্দুদিগকে নিশ্চয়ই আক্রমণ করিত; কেবল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে আক্রমণ করিতে পারে না।

লাহোরে, গ্রীষ্মকালের রাত্রে উহাদের যেরূপ প্রার্থনা হয়, M. Rudyard Kipling তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

মিনারেটের উপর হইতে, চন্দ্রালোকে, "ভীষণ নৈশ নগরটি" দেখা যাইতেছে।

"চন্দ্রের ছায়া ও আলোকের মধ্যে হাজার হাজার লোক নিদ্রা যাইতেছে—এই দৃশ্যটি চিত্র করিতে গেলে একজন Doré-র দরকার; বর্ণনা করিতে গেলে, একজন Zola-র দরকার। গৃহের ছাদগুলা, পুরুষ, রমণী ও বালকবৃন্দে ভারাক্রান্ত; আকাশ অস্পষ্ট কোলাহলে পরিপূর্ণ। ভীষণ নৈশ নগরটি সমস্তই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিব?—এখনো যে উহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে—ইহাই আশ্চর্য্য…আলোকের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত নগর, সমস্ত ময়দান—(কোথাও কোথাও প্রাচীরের বাহিরে, রাভী-নদীর এক প্রান্তে) মনে হইতেছে যেন—চন্দ্রকে নির্দ্দয়রূপে নিঃশেষে ভোগ করিতেছে। চন্দ্রের উপর উহাদের একটুও যেন মায়া-দয়া নাই; একটা হাল্‌কা মেঘে চাঁদ ঢাকিয়া গেল। রাত্রে যে-সহরকে, যে সকল অধিবাসী লোককে সাদা কালো রেখায় স্পষ্ট দেখা যায়—সেই সহর ও সহরের অধিবাসী লোক ক্রম-ঘনায়মান অন্ধকারে একেবারে যেন মুছিয়া গিয়াছে… প্রাঙ্গণে কাহার যেন পদশব্দ শুনা যায়। মুয়েজ্জিন্। মুয়েজ্জিন্ অন্তর্হিত হইল। তার পর ষাঁড়ের গর্জ্জনের মত একটা গর্জ্জন; মুয়েজ্জিন্ মিনারেটের চূড়ায় এই মাত্র উঠিয়াছে। শব্দটা যাহাতে রাভীর তীর পর্য্যন্ত পৌছায় (রাভীর জল কমিয়া গিয়াছে) এইরূপ ভাবে সে চীৎকার করিতেছে। মেঘটা চলিয়া গেল। ঐ দেখ স্বচ্ছ আকাশের গায়ে মুয়েজ্জিনের ছায়া-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে: —দুই হাত কাণে লগ্ন; ফুসফুসের প্রয়াসে, বিশাল বক্ষদেশ ফুলিয়া উঠিতেছে। "আল্লা-হো-আক্‌বর"। একবার চীৎকারটা থামিল;—তখনই আবার "স্বর্ণ-মন্দিরে"র দিকে, আর এক মুয়েজ্জিন উহারই আবৃত্তি করিল:—"আল্লা-হো-আক্‌বর"। আরও এক-বার, আরও একবার—সুব শুদ্ধ চারি বার। এরই মধ্যে ১০।১২ জন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে: —"আমি সাক্ষ্য দিতেছি; এক ঈশ্বর বই দুই ঈশ্বর নাই—তিনিই ঈশ্বর"। এই চীৎকারের কি মাহাত্ম্য! এই গভীর রাত্রে কত শত লোককে তাহাদের শয্যা হইতে ছিনিয়া আনিয়াছে!…নগরের সকল মুয়ে-জ্জিনেরাই এইরূপ আহ্বান পাঠাইতেছে, আহ্বানের হাঁক দিতেছে; ছাদের উপর লোকেরা নতজানু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একটা দীর্ঘ বিরাম,—একটা শেষ হাঁক্; "লা-ইলাহা-ইল্লালা", তার পর চারিদিক নিস্তব্ধ…"

সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে ধর্ম্মটা আরও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মান্ধ ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানেরা, পশ্চিম সীমাপ্রান্তের যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা, কুক্কুর-স্পর্শবৎ হিন্দুর স্পর্শ হইতে দূরে পলায়ন করে। উহারা মুল্লাকে যাদুকর বলিয়া জানে। উহাদের নিকট ইসলাম ধর্ম্মের এইরূপ পরিণতি হইয়াছে।

"বাল্লুচি"দিগের সম্বন্ধে Sir Herbert Edwards এই কথা লিখিয়াছেন:—

তাহাদের নিকট গোলাগুলির সোঁ সোঁ শব্দ, নগ্ন তলোয়ারের বিজ্‌লি-চমক্ ভয়ের বিষয় নহে; শোণিত তাহাদের নিকট শুধু একটা লাল তরল পদার্থমাত্র; একটা

শসা কাটাও যা, একটা মাথা কাটাও তা ;—গুরুত্বে কোনটাই কম বেশী নহে। কিন্তু আরবী ধরণের কোন অভিশম্পাৎ···কোন ক্রোধান্ধ সাধুর থুৎকার বড়ই ভীষণ; "হাজি",—যিনি উষ্ট্র ও মেষের গাত্রে চর্ম্মরোগ আনয়ন করেন সেই হাজির যাদুমন্ত্রের নিকট, • তলোয়ার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, জানুদ্বয় কাঁপিতে থাকে। (১)

এমন কি, ভারতের মধ্যেও—বিশেষত যেখানে মুসলমানের সংখ্যা কম,—ইস্‌লাম ধর্ম্ম এরূপ কলুষিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাকে আর চেনা যায় না। তাহাদের মধ্যে না-আছে উপবাস, না-আছে প্রার্থনা-মন্ত্রপাঠ। আছে শুধু বলিদান, শোভাযাত্রা, মৃত পীরপয়গম্বরের দেহাবশেষের পূজা-অর্চ্চনা; মুসলমান পীরদিগের আস্তানায় কখন-বা তীর্থযাত্রা (যাঁহাদের দেহ হইতে অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়); কখন বা হিন্দুদের মন্দিরেও তীর্থযাত্রা। যে সকল গ্রামে হিন্দুর বসতি নাই সেখানেও ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি আছে; এই সকল বিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনা, ও গার্হস্থ্য ক্রিয়া-কলাপের জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়া থাকে।

হিন্দুদের দৃষ্টান্তে, মুসলমানেরাও আপনাদের মধ্যে জাত গড়িয়া তুলিয়াছে, কিন্তু উহাদের নিয়মগুলা ততটা কড়াকড় নহে এবং বিভিন্ন জাতের লোকদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। যে সকল প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা সমধিক সেই সকল প্রদেশ ছাড়া অন্য সর্ব্বত্র মুসলমানদের ধর্ম্মে মত্ততা লোপ পাইয়াছে। অনেক সময়ে, হিন্দু-মুসলমান একই গ্রামে বাস করে এবং সদ্ভাবে বাস করে। ঐ সকল মুসলমানের মধ্যে তেমন ধর্ম্মোৎসাহ নাই; নীচ জাতির লোক ছাড়া, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বন্য জাতির লোক ছাড়া তাহারা আর কাহাকেও বড় একটা মুসলমান করিতে চেষ্টা করে না। (২)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১) পঞ্জাবের Census Report.

(২) পঞ্জাবের Census Report-এ, Ibbetson লিখিয়াছেন :—

"এই পরিচ্ছেদের আরম্ভে অবশ্য কতকটা অত্যুক্তির সহিত বলিয়াছিলাম যে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত জাতের বন্ধনটা খুবই শিথিল এবং হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, উহাতে জাতের কোন হানি হয় না। আমার এই কথাটা এখন কি পরিমাণে বদলান উচিত তাহারই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বপূর্ব্ব প্যারাগ্রাফে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি,—উচ্চশ্রেণীদিগের মধ্যে আভিজাত্যের অহঙ্কার, নীচ শ্রেণীদিগের মধ্যে কতকগুলি ব্যবসায়ের প্রতি অবজ্ঞা—এই দুইটি মুখ্য উপাদান সকল সমাজেই সামাজিক পদমর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকে। বর্ণভেদপ্রণালীকে পরিপুষ্ট করিতে গিয়া, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর কিছুই করে নাই, কেবল কতকগুলা বিধি ও নিষেধের দ্বারা, বিবিধ ব্যবসায়ের কুলক্রমিকতা ও পদমর্য্যাদা দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে মাত্র...আমার মতে, এই একমাত্র বন্ধন-সূত্রেই বর্ণভেদ-প্রণালী, হিন্দুধর্ম্মের সহিত আবদ্ধ; এবং ইহা স্বতই প্রতীতি হইবে, কোন সামাজিক প্রণালীর মধ্যে, কতকগুলা বিধিনিষেধ ও কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে, কেবল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সেই সমস্তের প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াফলে বলপূর্ব্বক কোন পরিবর্ত্তন

যশোহর

বড় ইচ্ছা ছিল, এই সম্মেলন উপলক্ষে একবার যশোহর দর্শন করিয়া আসি। অল্পদিন হইল যশোহর খুলনা তুইটি স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। পূর্ব্বে খুলনা যশোহরের অন্তর্গত ছিল। খুলনাতেই আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিবাস। খুলনার অন্তর্গত পয়গ্রামে লক্ষ্মণসেনের সুহৃদ্‌কবি ধোয়ীর পৌত্র হিঙ্গু আসিয়া বাস করেন। হিঙ্গু আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। পিতৃপুরুষের নিবাসভূমি এই উপলক্ষে দেখিয়া আসিব সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু তুঃখের বিষয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য পারিলাম না।

সম্প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরিতেছে, আমি তাহাদের সমাধান করিতে পারি নাই।

বঙ্গের বৈদ্যকায়স্থগণের কুলীনদের আদি নিবাস যশোহর। ব্রাহ্মণ কুলীনগণেরও অনেকেরই আদি-স্থান যশোহর। কুলীন সমাজকে এখানে কে আহ্বান করিয়া আনিলেন? কোন্ রাজশক্তির প্রভাবে তাঁহারা যশোহর খুলনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন? তাঁহারা কি আকর্ষণে গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া ভৈরব-তীর আশ্রয় করিলেন?

যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমি সতীশবাবুকে এই প্রশ্ন করিয়া-ছিলাম। তিনি চিন্তা করিবার প্রতীক্ষা না করিয়া বলিয়াছিলেন, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দ্বারা কুলীনসমাজ এই প্রদেশে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে বলিলাম, আমার পূর্ব্বপুরুষ হিঙ্গু যখন পয়গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই সময় হইতে প্রায় ৭০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছে, এবং আমাদের বৈদ্যগণের অনেকের পূর্ব্বপুরুষই প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে রাঢ় দেশ ত্যাগ করিয়া খুলনায় বাস স্থাপন করিয়াছেন, তখন সতীশবাবু নীরব হইয়া ভাবিতে বসিলেন।

প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কবি রাম-কৃষ্ণের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে লিখিত আছে সেনহাটী গ্রাম লক্ষ্মণ সেন পত্তন করেন। এই কথা মহাকোষ বিশ্বকোষে লিপিবদ্ধ আছে।

এই কথা যদি সত্য হয়, তবে সেনহাটী ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রামগুলিতে সমস্ত বঙ্গীয় কুলীন বৈদ্যগণের সংশ্রবের একটি সূত্র

আনিতে পারে না। বস্তুত, পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশে, ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের দরুণ ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তির জাতের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। রাজপুত মুসলমান, গুজর মুসলমান, জাট মুসলমান,—সামাজিক পদমর্য্যাদার হিসাবে, শাখাজাতির হিসাবে, রাষ্ট্রনীতির হিসাবে, রাষ্ট্র হিসাবে, তাহারা রাজপুতই রহিয়া গিয়াছে, গুজরই রহিয়া গিয়াছে, জাটই রহিয়া গিয়াছে; তাহাদের হিন্দু ভাইদিগের মত সর্ব্বাংশেই সমান। উহাদের সামাজিক প্রথাদি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, শাখাজাতি-সংক্রান্ত নিষেধ-বিধির কঠোরতা কিছুমাত্র কমে নাই, বিবাহ ও কুলক্রমিকতার নিয়মের কিছুমাত্র বদল হয় নাই।"

খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক কাশী ও কুশলী এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কুশলী সেনহাটীতে আগমন করেন। সমস্ত বঙ্গজ বৈশ্যসমাজের শীর্ষস্থানীয় কুলীনগণ সেনহাটীতে লক্ষ্মণসেনের সময় বসতি স্থাপন করেন; ইহাঁদিগকে লইয়া লক্ষ্মণসেন সেনহাটী পত্তন করেন। সেনহাটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী "সেনের বাজার" সম্বন্ধে প্রাচীন কিংবদন্তী এই যে এই বাজারটিও লক্ষ্মণ সেনের প্রতিষ্ঠিত। সেনহাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির নাম সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় এতদ্দেশে একদা কোন রাজচক্রবর্ত্তী বাস করিয়াছিলেন। কোন সামরিক গৌরব সেনহাটীর নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিকে বিজয়-চিহ্নিত করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু 'দেবভাগ,' 'ঘাটভোগ,' 'পিঠাভোগ' প্রভৃতি নাম দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে এই দেশে বড় বড় দেবমন্দিরের দেবতাদিগের ভোগের জন্য বহুবিধ গ্রাম এককালে কোন রাজা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এক সময়ে আমি এ বিষয়টির চর্চ্চা করিয়া বহু গ্রামের নাম পাইয়াছিলাম যাহা দ্বারা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে কোন ভোগ-সুখ-বিমুখ শান্তি-প্রিয় রাজচক্রবর্ত্তী কুলীন ও পণ্ডিতগোষ্ঠী পরিবৃত হইয়া সেনহাটীর নিকটে বাস করিয়াছিলেন। সেই গ্রামের তালিকাটি আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি, আজ আমার এই প্রবন্ধটি দ্বারা শুধু সকলকে পুনরায় এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি মাত্র।

স্থানীয় প্রাচীন লোকদিগের মুখে আমি শুনিয়াছি সেনহাটীর পার্শ্ববর্ত্তী বহু ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে ভূমিদান পাইয়াছিলেন। সেই সকল ভূমিদান-পত্রের কিছু কিছু চেষ্টা করিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত হইয়া "সাখ্‌নাট" নামক স্থানে প্রস্থান করেন। এই সাখনাট শব্দের সঙ্গে সেনহাট বা তন্নিকটবর্ত্তী সেখহাট গ্রামের নাম-সংশ্রব কিছু আছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, লক্ষ্মণসেন জীবনের চরম-দশায় হৃতরাজ্য ও বিতাড়িত হইয়া স্বজনবর্গের সহিত খুলনায় অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, "বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ। বল্লাল-মর্য্যাদা না লইল তিনজন॥" বল্লাল ইহাঁদিগকে মর্য্যাদা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। উত্তরকালে যখন রাজধানী শ্রীহীনা হইল, তখন লক্ষ্মণসেন সমস্ত জাতির কুলীনদিগকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাঁহাদের কুল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই নিয়ম করিয়া তাঁহাদের প্রীতি-আকর্ষণ করিলেন। বল্লালের সময় যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, লক্ষ্মণসেন এই ভাবে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে উৎস হইতে বঙ্গীয় প্রধান সামাজিকগণের কুলগঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সেনবংশীয়কে আশ্রয় করিয়াই তাহা বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল। যখন বিপৎকালে লক্ষ্মণসেন কুলীন-সম্প্রদায়কে এই মহাবর প্রদান করিয়া আহ্বান করিলেন, তখন তাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তীর ছত্রের নীচে একত্র

হইয়া যশোহরে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই যশোহর আদি বঙ্গ। সে সভা জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, শরণ, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি কবি-কাকলীতে মুখরিত ছিল, সেই সভা নবগুণসম্পন্ন পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ উজ্জ্বল করিলেন। লক্ষ্মণসেন মহাবীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা বীর বলিয়া চিনি নাই। তাঁহার সভা "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমল" রাধাকৃষ্ণ-লীলার কুঞ্জসদৃশ ছিল, তাহা হইতে পবনদূত প্রেরিত হইয়া প্রেমকথা দিগঙ্গনাদিগকে শুনাইয়া আসিত, তাহা বঙ্গের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পবিত্র তীর্থ ছিল, কারণ আমাদিগের আদিপুরুষ নবগুণসম্পন্ন কুলীনগণের পদরজঃপাতে তাহা পবিত্র হইয়াছিল।

এই জন্যই যশোহর কুলীনগণের আদিস্থান, বিক্রমপুর নহে। বঙ্গসমাজের গৌরব যশোহর, বিক্রমপুর নহে।

সেনহাটী গ্রামের বিজয়তলায় অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে যে চণ্ডী পড়িয়া আছেন, উহাই কি লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী? কথিত আছে, উহাঁর জন্য মন্দির গড়িলে তাহা তখনই ফাটিয়া যায়; এই ভয়ে কেহ উঁহার মন্দির গড়ে না। কিন্তু এখন আর ফাটিয়া যাইবে না,—মন্দির-প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইলেই এই প্রসিদ্ধা দেবীকে ধ্বংস করিবার জন্য মুসলমানেরা চেষ্টা পাইতেন, এই জন্যই এই প্রবাদের সৃষ্টি!*

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ছন্নছাড়া

(১২)

একদিন বিকেলে, আমি দেখে অবাক হলুম যে, যিনি সান্ধ্য-উপাসনা করলেন তিনি আমাদের সেই বুড়ো পাদ্রী নন। ইনি একজন লম্বা, সুশ্রী লোক। গান গাইলেন —চড়া গলায়, কিন্তু হেঁচকা দিয়ে-দিয়ে। সে দিন সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা কেবল তাঁরই কথা হতে লাগল। মাদ্‌লিন বল্লে, লোকটি সুপুরুষ বটে! মারি এসে বল্লেন, মনে হয় ওঁর গলার স্বর অল্প-বয়সী লোকের মত কিন্তু দেখেছ, কথা উচ্চারণ করেন ঠিক বুড়ো মানুষের মতন। কিন্তু চেহারায় একটা মহত্ত্ব আছে।

দু-তিন দিন পরে তিনি আমাদের দেখতে এলেন। আমি দেখলুম, তাঁর ঘাড়ের চার-পাশে সাদা সাদা চুল,—একটু-একটু কোঁকড়ানো। চোখ আর ভুরু কালো কুচকুচে। তিনি সকলকার নাম জানতে চাইলেন। মারি এসে আমার হয়ে কথা কইলেন। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন—"এই আমাদের মারি ক্লেয়ার!" ইস্‌মেরির পালা আসতে তার দিকে চেয়ে

* যশোহর সম্মিলনে পঠিত।

তিনি আশ্চর্য্য হলেন। তাকে তিনি ঘুরে দাঁড়াতে বল্লেন এবং কি-রকম করে সে চলে তাই দেখলেন। তিনি বল্লেন, তাকে দেখায় তিন-বছরের মেয়ের মতন! মারি এমেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মেয়েটির বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে?" ইস্‌মেরি অমনি ধাঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"ঐ মেয়েগুলোর মতো আমি বোকা নই।" তাই শুনে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি দেখলুম তাঁর দাঁতগুলি সাদা ধবধবে। যখন তিনি কথা কইছিলেন সামনের দিকে একটা ঝোঁক দিচ্ছিলেন—যেন তাঁর কথাগুলোকে পাকড়াও করতে চান;—সেগুলো যেন তাঁর অজ্ঞাতসারে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। মারি এমে তাঁকে উঠোনের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন; সাধারণত তিনি ঘরের দরজার বেশী কোনো অতিথিকে এগিয়ে দেন না। তিনি ঘরে ফিরে এসে নিজের ডেস্কটিতে বসলেন এবং খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, কারুর দিকে না চেয়ে বলে উঠলেন—"বাস্তবিক শ্রদ্ধা করবার মত মানুষ বটে!"

আমাদের নূতন পাদ্রীটি উপাসনা-ঘরের পাশে ছোট্ট বাড়িটিতে থাকতেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা তিনি গাছ-দিয়ে-ঘিরেন-করা পথটিতে বেড়াতেন। কখনো-কখনো আমাদের খেলবার মাঠে এসে উপস্থিত হতেন—আমরা যখন খেল্‌তুম। তিনি অনেকখানি নীচু হয়ে মারি এমেকে নমস্কার করে যেতেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি আমাদের দেখতে আসতেন। চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে এবং পায়ের উপর পা ঝুলিয়ে বসতেন। আমাদের কত গল্প শোনাতেন। তাঁকে আমাদের ভারি ভালো লাগত। তাঁর হাসি দেখে মারি এমে বলতেন যে, তিনি একেবারে মন-খুলে হাসেন।

কখনো-কখনো মারি এমের অসুখ হত। তখন তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করতেন। আমরা দেখতুম, মাদ্‌লিন চা-দানি আর দুটো চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে চলে গেল। তার মুখ তখন লাল আর সে যেন ভারি ব্যস্ত।

তারপর গ্রীষ্মকাল চলে যেতে তিনি রাত্রে খাবার পর আমাদের কাছে আসতেন—অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। নটা বাজলে তিনি উঠতেন; মারি এমে সঙ্গে করে তাঁকে বড় ফটকটা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

(১৩)

তিনি এক-বছর আমাদের কাছে ছিলেন। আমরা যে-সব দোষ করতুম তা খুলে বল্‌বার যে নিয়ম ছিল সেটা আমি তাঁর সামনে কিছুতেই সড়গড় করে নিতে পারিনি। তিনি কেমন-একরকম করে আমার দিকে চাইতেন আর মিটি-মিটি হাসতেন তাতে আমার মনে হত যেন আমার সব দোষ তিনি জানতে পেরেছেন। আমাদের এই দোষ কবুল করবার একটা নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল। সে দিন আমরা সবাই এক-এক করে গিয়ে তাঁর কাছে নিজেদের দোষের কথা বলে আসতুম। আমার পালা যখন এল-এল—আর একজন, কি দুজনমাত্র বাকি, তখন আমি কাঁপতে

থাকতুম। আমার বুক্ ধ্বক্ ধ্বক্ করত —পেটটা সেঁটে ধরত—আমি ভালো করে নিশ্বাস ফেল্‌তে পারতুম না। তারপর যখন আমার পালা এসে পড়ত, আমি দাঁড়িয়ে উঠতুম, কিন্তু আমার পা থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকত। আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করত—গাল দুটো ঠাণ্ডা হিম হয়ে আসত। দোষ কবুল করবার সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গাটায় আমি থপ্ করে হাঁটু-গেড়ে বসে পড়তুম। তাঁর গলার স্বর—মনে হত যদিও সে স্বর অনেক দূর থেকে আসছে, তাইতেই কিন্তু আমি সাহস পেতুম। তবুও আমি কেমন ভেব্‌ড়ে থাকতুম—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় কবুল করিয়ে নিতেন। তা না করলে আমার অর্দ্ধেক কথা মনেই পড়ত না। তার পর সব চুকে গেলে তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত একটা যা তা নাম বলে দি, কিন্তু কোন্ সাহসে বলি তাই ভাবতে ভাবতে আমার আসল নামটাই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ত।

আমাদের ব্রত নেবার সময় ঘনিয়ে আসছিল। মে মাসে তার দিন, কিন্তু এখন-থেকেই তার আয়োজন চলছে। মারি এমে কয়েকটা নূতন গান রচনা করেছিলেন—তার মধ্যে একটা ছিল, সেটা অনেকটা পাদ্রীমহাশয়েরই স্তুতি।

উৎসবের প্রায় দিন-পনেরো আগে অন্য মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের তফাৎ করে দেওয়া হল। আমরা সমস্ত দিন কেবল প্রার্থনা করতুম। মাদ্‌লিনের উপর ভার ছিল দেখতে আমাদের প্রার্থনায় যেন কোনো ব্যাঘাত না হয়। কিন্তু সে নিজেই গোল করত—আমাদের কারুর না কারুর সঙ্গে তার ঝগড়া লেগেই থাকত। আমার যে ব্রতসঙ্গী ছিল তার নাম সোফি। সে একটি ছোট্ট মেয়ে। আমরা দুজনে ঝগড়া-ঝাঁটির ভিতর থাকতুম না;—আমরা কেবল গভীর বিষয়ের আলোচনা করতুম। আমি তাকে প্রায়ই বলতুম যে, আমি ঐ দোষ-কবুল করাটা দুচক্ষে দেখতে পারি না, আর এই ব্রতের ভাবনায় আমার এত ভয় হচ্ছে যে আমি হয়ত কি-করতে কি করে ফেলব! সে ছিল ভালো মেয়ে, সে অবাক হত,—আমার এত ভয় কিসের! তার বিশ্বাস ছিল, আমার মনে ভক্তি নেই; সে লক্ষ্য করত, আমি প্রার্থনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। মরণকে তার বড় ভয় ছিল। মরণের কথা সে আমার কাছে চুপি-চুপি ফিস্-ফিস্ করে বল্‌ত—এবং বল্‌তে বল্‌তে ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তার চোখ দুটি ছিল সবুজ—এবং তার চুলগুলি এমন সুন্দর ছিল যে মারি এমে সেগুলো অন্য মেয়েদের মতো ছোটো-করে ছাঁটতে দিতেন না।

শেষকালে সেই ব্রতের দিন এসে পড়ল। আমার দোষ-কবুল-করা বেশ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। মনে হল যেন স্নান করে উঠলুম্—মনের মধ্যে ভারি একটু শুচিতা অনুভব করতে লাগলুম। কিন্তু আমায় যখন সেই প্রসাদী বাতাসাখানা দিলে তখন আমি এমন কাঁপছিলুম, যে তার খানিকটা আমার দাঁতে লেগে গেল। আমার গা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—মনে হল চোখের

সামনে একখানা কালো পর্দা পড়ে গেল। আমার বোধ হতে লাগল, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি মারি এমে বলছেন—"তুমি অমন করছ কেন?" তার পর, এটাও বুঝতে পারছিলুম তিনি আমাকে সঙ্গে করে বেদীর কাছ পর্য্যন্ত নিয়ে গেলেন, আমার হাতে ছোট একটি বাতি দিয়ে বল্লেন—"দেখো, শক্ত করে ধোরো!"

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, আমি ঢোক গিলতে পারছিলুম না; বোধ হল একটা তরল জিনিষ আমার মুখ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা করে গলায় ভিতর চুঁয়ে পড়ছে। আমি ভয়ে একেবারে সিঁটকে গেলুম। কারণ মাদ্‌লিন বলে দিয়েছিল যে আমরা যদি বাতাসাটাকে দাঁত দিয়ে কাটি তাহলে ক্রাইষ্টের রক্ত আমাদের মুখ দিয়ে বেয়ে পড়বে—কেউ তা থামাতে পারবে না। মারি এমে আমার মুখটা হাত দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বল্লেন—"লক্ষ্মী আমার, ঠাণ্ডা হয়ে থাক।" অম্‌নি আমার সেই কাঠ গলা নরম হয়ে এল—আমি বাতাসাটা গিলে ফেল্লুম। তার পর এতক্ষণে আমার সাহস হল কাপড়ের দিকে দেখতে—রক্তে সেটা কি রকম ভেসে গেছে। কিন্তু রক্তের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলুম না—কেবল দেখলুম, ছোট্ট একটি ছাই-রঙের দাগ—জলের একটি ফোঁটার মত। আমি রুমালখানা বার করে ঠোঁট মুছলুম, মুখ মুছলুম কিন্তু রক্তের দাগ দেখলুম না। তবুও আমার ভয় সম্পূর্ণ গেল না। তারপর আমাদের সবাই যখন গাইবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠল আমিও তাদের সঙ্গে গাইবার চেষ্টা করলুম।

বৈকালে যখন পাদ্রীমহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন মারি এমে তাঁকে বল্লেন যে, আজকের উৎসবের সময় আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। তিনি হাত দিয়ে আমার দাড়িটি ধরলেন, তাঁর দিকে আমার মুখটি তুলে ধরে আমার চোখের উপর চোখ রেখে হাসতে লাগলেন, আর বল্লেন, আমি বড় ভীতু মেয়ে!

(১৪)

এর পর থেকে আমরা পড়ার ক্লাসে আর যেতুম না। বন্‌ জিস্তিন আমাদের শেলাই শেখাত। আমরা চাষা মেয়েদের জন্য টুপি তৈরী করতুম। কাজ তেমন শক্ত নয়; জিনিষটা নতুন বলে আমার খুব উৎসাহ হতে লাগল—আমি সেলাই নিয়ে মেতে থাকতুম। জিস্তিন বলত, আমি একজন ভালো দর্জ্জি হতে পারব। মারি এমে আমার গালে চুমু খেয়ে বলতেন—তা ঠিক, যদি কুড়েমিটা যায়!

কিন্তু গোটাকত টুপি করেই আমার সব উৎসাহ একেবারে জল হয়ে এল। একই রকম কাজ বার বার করে আমার তাতে অরুচি জন্মে গেল। সে আমার আর ভালো লাগত না—আমি কিছুতেই তাতে মন দিতে পারতুম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যেত আমি চুপ-হয়ে বসে থাকতুম;—কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতুম আর-সবাই কি করছে। মারি রেনো সেলাইয়ের সময় একটি কথাও কইত না। তার ফোঁড়-গুলি এত সূক্ষ্ম ও এত কাছাকাছি হত যে খুব ভালো চোখ না হলে নজরে আসত না। ইস্‌মেরি সেলাই করতে করতে

গান গাইত—তাকে কেউ বকত না। এক-একটা মেয়ে ঘাড় নীচু করে কপাল কুঁচকে একমনে সেলাই করে যেত—তাদের আঙুলের ডগাগুলি ভিজে-ভিজে দেখাত আর ছুঁচের মুখ থেকে পুট্ পুট্ শব্দ উঠত। কেউ কেউ খুব ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে সেলাই করেই চলত—তাতে তাদের শ্রান্তি ছিল না, বিরক্তিও ছিল না। প্রত্যেক ফোঁড়টি তারা সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে-মনে গুণে যেত। এইরকম করে সেলাই করাটা আমার সব-চেয়ে ভালো বোধ হত। কেন যে আমিও ঐরকম করি না তার জন্যে নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করতুম। কয়েক-মিনিটের জন্যে আমি তাদের অনুকরণ করতে লেগে যেতুম। কিন্তু কোথাও থেকে একটু শব্দ হলেই ব্যস, আমার হাত থেমে যেত—আমি উস্‌খুস্ করতুম—চারদিকে কোথায় কি হচ্ছে তাই দেখতুম। মাদ্‌লিন বলত, আমি কেবলই সোঁক্-সোঁক্ করে বেড়াই—আর এমন ছুঁচের কথা ভাবি যা আপনা-থেকেই সেলাই করে! বাস্তবিক অনেক দিন ধরে আমার মনে হত ঘরের ঐ কোণ থেকে ফস্ করে একটা বুড়ি বেরিয়ে আমার হাতের সেলাই চুপিচুপি সেরে দিয়ে চলে যাবে—কেউ দেখতে পাবে না। আমি তারই আশা-পথ চেয়ে বসে থাকতুম। মারি এমে প্রত্যহ তিরস্কার করতেন—শেষকালে তিনি এলে-গেলেন, তাঁর তিরস্কার আমার গায়ে লাগত না। তিনি ভেবে পেতেন না কেমন করে আমায় কাজে মন দেওয়াবেন। একদিন তিনি ঠিক করলেন যে আমাকে দিনে দুবার চীৎকার করে পড়তে হবে। তাতে আমার এত আনন্দ হল যে বলতে পারি না। কখন্ পড়ার সময় আসে তার জন্যে আমি হাঁ করে বসে থাকতুম—আর বই মুড়ে ফেলবার সময় আমার আর দুঃখের অন্ত থাকত না।

(১৫)

আমার পড়া সাঙ্গ হলে মারি এমে কোলেৎকে গান গাইতে বলতেন। সে ছিল খোঁড়া। একই গান সে বারবার গাইত কিন্তু তার গলাটি ছিল এমনি মিষ্টি যে একগান একশবার শুনতে বিরক্তি হত না। কাজ করতে-করতেই সে গান গাইত আর তাল দিত ছুঁচের সঙ্গে। জিস্তিন্ আমাদের সবাইকার নাড়িনক্ষত্র জানত। সে বলত, কোলেৎ যখন আসে তখন সে এতটুকু মেয়ে—তার দুপা ভাঙা!

কোলেৎ দুহাতে দুটো ছড়ি নিয়ে—অনেক কষ্টে হাঁটত—খোঁড়ারা যে লকৃড়ি ব্যবহার করে সে তা নিত না;—তার লজ্জা হত, তাহলে তাকে বুড়ির মত দেখাবে! আমি আবৃত্তি করবার সময় দেখতুম সে একলাটি বেঞ্চে বসে আছে—পিছন দিকে হেলান দিয়ে—লম্বা হয়ে পড়ে। তার চোখের তারা দুটো এত বড় ছিল যে, তার চোখের সাদাটা দেখাই যেত না। তার সঙ্গে মেশবার আমার ভারি ইচ্ছে হত—মনে হত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। কিন্তু তাকে ভারি গুমরে বলে বোধ হত। আমি যদি কখনো তার একটু-আধটু কাজ করে দিয়েছি সে অমনি বলে উঠেছে—"খুকী, তোমায় ধন্য-বাদ।" খুকী! আমি যে মোটে বারো

বছরের সেইটে জানিয়ে দেওয়া হল। তার ভারি অহঙ্কার।

মাদ্‌লিন আমাকে হেঁয়ালির মতো কেমন অস্পষ্টভাবে বলত যে, কোলেতের সঙ্গে আড়ালে কথা কইবার আমাদের কারো হুকুম নেই। আমি যদি বলতুম, কেন? অমনি সে একটা এমন গোলমেলে জটপাকানো কাহিনী খুলতে আরম্ভ করত যার মাথামুণ্ড কিচ্ছু বুঝতে পারতুম না। আমি প্রশ্ন করতুম। সে এমন সব কথা ব্যবহার করত যার মানে আমি জানিনা। সে বলত যে আমার মত ছোট মেয়ের কোলেতের সঙ্গে একা থাকা উচিত নয়। আমি কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারতুম না,—কেন নয়? আমি দেখতুম, যখনই কোনো মেয়ে তার হাত ধরে তাকে একটু নিয়ে যাচ্ছে অমনি চারদিক থেকে অন্য মেয়েরা এসে হাসি গল্প জুড়ে দিলে। আমার মনে হত, কেউ তার বন্ধু নেই। তারজন্যে আমার কেমন মায়া করত—তার প্রতি আমার ভারি একটা টান হত। একদিন দেখলুম, সে একলাটি রয়েছে। আমি তাকে বল্লুম, এস আমার হাত ধরে একটু বেড়াবে। আমি তার সামনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম; জানতুম সে আমার কথা ঠেলতে পারবে না। সে আমার মুখের দিকে একবার চাইলে, তারপর বল্লে—"জান, হুকুম নেই!" আমি বল্লুম—"হাঁ, জানি।" সে আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"তোমার শাস্তির ভয় নেই!" আমি ঘাড় নেড়ে বল্লুম—"না!" আমার কেমন কান্না আসতে লাগল,—গলার ভিতরটা আঁট হয়ে এল। আমি তাকে ধরে-ধরে তুল্লুম। সে এক হাতে লাঠির উপর ঝুঁকে পড়ে আমার ঘাড়ে সমস্ত ভরটা দিলে। আমি বুঝতে পারলুম তার চলাটা কি কষ্টের। আমরা যতক্ষণ বেড়ালুম সে একটি কথাও কইলে না। তারপর তাকে যখন তার সেই বেঞ্চিতে ফিরিয়ে এনে বসিয়ে দিলুম তখন সে শুধু বল্লে—"মারি ক্লেয়ার, ধন্যবাদ!" কোলেতের সঙ্গে আমায় বেড়াতে দেখে জিস্তিন্ আকাশের দিকে হাত-তুলে একবার ক্রুশের চিহ্ন করলে আর সেই-অনেকদূর থেকে মাদ্‌লিন আমার দিকে কিল উঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল!

(১৬)

সন্ধ্যার সময় বুঝতে পারলুম, মারি এসে জানতে পেরেছেন যে, আমি কি করেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কোনো কথাই তুল্লেন না। পরদিন ছুটির সময় আমাকে তিনি তাঁর কাছে টেনে নিলেন; দুই হাত দিয়ে আমার মাথাটা ধরে আমার উপর ঝুঁকে পড়লেন। তিনি একটি কথাও বল্লেন না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যেন আমার অন্তরের ভিতরে ডুবে গেল। আমার মনে হতে লাগল তাঁর দৃষ্টি আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে ধরেছে। আমার বোধ হল একটি স্নিগ্ধ উত্তাপ চতুর্দ্দিক থেকে আমায় আচ্ছন্ন করছে—তার কী আরাম! আমার কপালের উপর তিনি একটি চুমু খেলেন—অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে আমার দিকে হেসে চেয়ে বলে উঠলেন—"এই আমার পদ্ম-রাণী!" সে সময় তাঁকে এমন চমৎকার সুন্দর দেখাচ্ছিল আর তাঁর চোখের ভিতর

এত-রকম রং খেলছিল যে আমি আর থাকতে পারলুম না, আমিও বলে উঠলুম —"তুমিও তো মা, ফুলের রাণী!" তিনি একটা অগ্রাহ্যের সঙ্গে বল্লেন —"তা বলে আর পদ্মের দলে নেই!" খাণিকক্ষণ পরে তিনি একটু রূঢ়স্বরে হঠাৎ বলে উঠলেন—"ইস্‌মেরির সঙ্গে বুঝি আর তোমার ভাব নেই?" আমি বল্লুম—"হাঁ, আছে!" তিনি বল্লেন—"সত্যি নাকি? তবে কোলেৎ?" আমি বল্লুম—"তাকে আমার বড় ভালো লাগে।" তিনি বলে উঠলেন—"তোমার সবাইকেই ভালো লাগে।"

(১৭)

আমি রোজই প্রায় কোলেতকে ধরে-নিয়ে বেড়াতুম। সে আমার সঙ্গে বেশি কথা কইত না—অল্পস্বল্প যা বলত তা অন্য মেয়েদের কথা। আমি যখন তার পাশে বসতুম সে কেমন-একরকম করে আমার দিকে চাইত। সে বলত, তার মনে হয় আমি একটা অদ্ভুত-রকমের মেয়ে। একদিন সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে যে তাকে দেখতে সুন্দর বলে মনে হয় কি না। এই প্রশ্ন তুলতেই আমার মনে হল মারি এমে একদিন বলে-ছিলেন যে, গায়ের তিলের মতো সে কালো। আমি কিন্তু দেখতুম তার কপালটি চওড়া, বড় বড় দুটি চোখ, মুখখানি ছোট; —কিন্তু বেশ চাঁচা-ছোলা। কি জানি কেন, যখনই তার দিকে চাইতুম আমার মনে হত যেন একটা খুব গভীর, অন্ধকার, গরম জলভরা কুয়ো দেখচি!

সত্যি বলতে কি, তাকে আমার সুন্দরী বলে মনে হত না। কিন্তু সে কথা তার মুখের উপর ত বলা যায় না—সে যে খোঁড়া। আমি বলতুম, তার গায়ের রংটা যদি আর-একটু ফর্সা হত তাহলে তাকে ঢের ভালো দেখতে হত।

একটু একটু করে তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে আসছিল। সে বলত, আর-কিছুদিন বাদে সে এখান থেকে চলে গিয়ে নিনার মতো বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার কর্‌বে। নিনা তার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি রবিবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত। কোলেৎ আমার হাত ধরে বলে উঠত— "আমারও বিয়ে হবে—নিশ্চয় হবে, বুঝলে!" বলেই সে সমস্ত শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ত। এক-এক সময়ে সে এমনি কাঁদতে থাকত যে আমি কি বল্‌ব খুঁজে পেতুম না। তার সেই বাঁকা-চোরা দোমড়ানো পা দুখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে সে কাতরস্বরে গেঙিয়ে উঠত—"একটা অলৌকিক কিছু না ঘটলে আমার আর উপায় নেই!"

হঠাৎ একটা কথা আমার মাথায় খেলে গেল—দেবী মেরি ত এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়ে তুলতে পারেন! কোলেৎ বল্লে, ঠিক কথা! সে আশ্চর্য্য হল যে, এতদিন এ কথাটি তার মনে আসেনি কেন! আর এ ত খুব ন্যায্য কথা যে আর-সবাইয়ের পা যেমন তারও পা তেমনি হবে! কোলেৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, এখনি উপায় করা চাই। সে বল্লে, এর জন্যে যে নয় দিন প্রার্থনা দরকার তাতে কয়েক-জন মেয়ে চাই, সবাইকে সংযম করে শুদ্ধ

হতে হবে—স্বর্গের দেবীর কাছ থেকে দয়া ভিক্ষার জন্য এই নয় দিন অনবরত প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু সব চুপিচুপি হওয়া চাই;—কেউ যেন না জানতে পারে। ঠিক হল সোফি আমাদের দলে থাকবে—কারণ সে বড় ভক্তিমতী, আর তাছাড়া দুচার জন বড় মেয়েদেরও সে দলে আনতে পারবে। দুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। কোলেৎ এই নয়দিন উপবাস করবে। দশদিনের দিন—সেদিন রবিবার পড়েছিল—সে যেমন পুজো দিতে যায় তেমনি যাবে। পুজোর সময় এই সংকল্প গ্রহণ করবে—"মাগো, আমার সন্তানদের তোমার দাস করে দেব।"

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে স্তোত্র গাইবে—আমরা সকলে তাতে যোগ দেব।

নয় দিন ধরে আমি একমনে প্রার্থনা করলুম—এমনতর প্রার্থনা এর আগে কখনো করিনি। রোজ যে প্রার্থনা করতুম তা আমার কাছে অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হতে লাগল। আমি ভার্জ্জিন দেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করতে লাগলুম—ভালো ভালো স্তোত্র সব খুঁজে বার করে তাই এক-শ বার পাঠ করতে লাগলুম—তাতে আমার ক্লান্তি ছিল না, বিরক্তি ছিল না। "কোলেৎকে পূর্ণাঙ্গী করে দাও!"—এই ছিল আমার আকুল প্রার্থনা। প্রথম-দিন প্রার্থনার সময় আমি এতক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসেছিলুম যে শেষে মারি এসে আমায় বকতে লাগলেন। পরস্পর ইসারা করে আমরা সব কথা চালাচালি করতে লাগলুম; কেউ তা বুঝতে পারত না। এই রকম করে নয় দিন কেটে গেল। কেউ কিছু জানতে পারলে না।

(১৮)

পূজোর সময় যখন কোলেৎ এল তখন তাকে ভারি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। গাল তার চড়িয়ে গেছে—সে চোখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হতে লাগল, এইবার তার সমস্ত দুঃখ শেষ হয়ে এসেছে। আমার ভারি আনন্দ হল। আমার সামনেই ছিল ভার্জ্জিনের ছবি—তাঁর সাদা ধবধবে কাপড় লুটিয়ে পড়েছে—আমার দিকে চেয়ে যেন তিনি হাসছিলেন। আমার সমস্ত অন্তরের বিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আমার হৃদয় বলে উঠল—"কোলেৎ নিশ্চয় পূর্ণাঙ্গী হয়ে উঠবে।" আমার কপাল যেন ফেটে পড়ছিল। আর মন যাতে একাগ্র হয়ে থাকে তার জন্যে প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখছিলুম। আর কেবলি বলছিলুম—"ওগো দয়াময়ী, কোলেৎকে পূর্ণাঙ্গী করে দাও—কোলেৎকে ভালো করে দাও!"

কোলেৎ ধীরে ধীরে বেদীর কাছে গেল। তার লাঠিটা মেজের টালির উপর ঠক্-ঠক্ করতে লাগল। কোলেৎ যখন হাঁটু পেতে বসল, যে মেয়েটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সে তার লাঠিটা হাতে করে ফিরে এল—তার বিশ্বাস এ লাঠিআর দরকার হবে না।

কোলেৎ দাঁড়িয়ে উঠতে গেল—পারলে না, হাঁটু পেতে বসে পড়ল। সে একবার লাঠিটার জন্যে হাৎড়ালে; যখন পেলেনা, আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। পারলে না। টেবিলটার গায়ে

ঝুলে পড়ে—সে পাশের একজনকে আঁকড়ে ধরলে। তার কাঁধ দুটো এদিক-ওদিক করে দুলতে লাগল—শেষে যাকে ধরেছিল তাকে সুদ্ধ নিয়ে মাটির উপর পড়ল। আমরা দুজনে ছুটে গেলুম। কোলেৎকে টেনে-হিঁচড়ে তার বেঞ্চিতে নিয়ে বসিয়ে দিলুম। কিন্তু তখনও আশা ছেড়েও আমার কেমন আশা হচ্ছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা চলছিল একটা আশা ভিতরে ভিতরে জাগছিল।

যত শীঘ্র পারলুম কোলেতের কাছে ছুটে গেলুম। দেখলুম বড় মেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। কেউ বলছে, 'তোমার জীবন ভগবানকেই উৎসর্গ কর। কোলেৎ কাঁদছিল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নয়—ধীরে ধীরে। সে চুপ করে বসেছিল—চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছিল। সে মাথাটা নীচু করে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিল—চোখের জল সেই হাতের উপর এসে পড়ছিল। আমি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রইলুম। সে যখন আমার দিকে চোখ তুললে, আমি বল্লুম —"খোঁড়া হলেই বা! খোঁড়ার কি আর বিয়ে হয় না?"

কোলেতের এই দুঃখের কাহিনী সবাই শুন্‌লে। সবাই এত অভিভূত হল যে কয়েকদিনের জন্য হুটোপটি খেলা বন্ধ হয়ে গেল। ইস্‌মেরি যখন আমাকে ঐ কথা বলতে এল তখন সে ভেবেছিল না-জানি কতবড় একটা গূঢ় সংবাদ আমায় দিচ্ছে। সোফি বল্লে—"দেবীর বিধান আমাদের মাথায় করে নেওয়া উচিত। তিনি যা করবেন তা ভালোর জন্যেই—কোলেতের কিসে ভালো-মন্দ তা আমাদের চেয়ে তিনি বেশী জানেন!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আঁচোল

তনু তোমার দেহ-ঘেরা বসনের এক প্রান্ত—
তোমার ছোট আঁচোল সে-যে এমন কে তা জান্‌ত!
ভেবেছিলাম দানে আমার ভর্‌ব তাহা ভর্‌ব.
ভয় জাগে আজ টুটেই-বা যায় আমার সকল গর্ব্ব।
তরুণ ছিল প্রভাত তবে অরুণ ছিল আলো,
মধুর মুখে করুণ আঁখি লাগ্‌ল সে কি ভালো!
নয়ন মেলে দেখি তুমি আমার গৃহদ্বারে,
আঁচোলখানি পেতে আছ দাঁড়িয়ে একটি ধারে।

সলাজ তব সরল মুখে একটি নাহি বাণী,—
সকল কথা জানাল অই আকুল আঁচোলখানি।
ফুল যে তখন ঢালছিল প্রাণ বিমল ঊষার বায়,
অমন আঁচোল না ভরে' কি অমনি ফেরা যায়?
ছোট্ট সে-যে আঁচোলখানি কতই-বা তায় ধরবে?
—আমার হেলফেলার দানে নিমেষে তা ভরবে।
হায়গো মিছে আশা! আমি যতই আনি ঢালি,
তোমার ছোট আঁচোলখানি রয়গো তবু খালি।
ফিরিয়ে দিতে চায়না যে প্রাণ; বুঝছি আমি বেশ—
তোমার ছোট আঁচোল কিছু রাখবে না মোর শেষ!
যা-হয় হবে মিছে কেন দাঁড়িয়ে আছ দ্বারে?
ঘরে এসো ভরা-ভাঁড়ার ঢালবো একেবারে!
তুমি এসে দাঁড়ালে যেই হেরি অবাক্ মানি,—
এমন ভরা ভাঁড়ার যে মোর স্বপ্নে নাহি জানি!
তোমার মেলা আঁচোল সে-যে কি গুণ হেন ধরে,—
নেবার ছলে চুপে-চুপে ভাঁড়ার যে মোর ভরে।
আঁচোল বলে ভিখারিণী,—চক্ষে জাগে রাণী;
আঁচোল যা পায় চোখ্ বুঝি দেয় হাজার-গুণে আনি।
অপরূপ যে সব অপরূপ ভিখারিণী রাণী!—
তোমায় হেরি অবাক্ মানি, ওগো অবাক্ মানি!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

বিচরণ

আমাদের সেখানে আর এ-পাহাড়ের ঋতু-পর্য্যায়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বসন্ত এখানে এসে-যায়—শীতের আগেই, দিক্-বিদিকে ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়ে। আমাদের সেখানে যখন ফুলেদের বাসর-জাগবার পালা এখানে তখন তুষারের বিছানায় ঘুমিয়ে গেছে সব ফুলগুলি। সেখানে বসন্ত দেখা দেয় শীতের আসরে শিউলি-ফুল ছড়িয়ে; এখানে শীত আসে বসন্তের সভায় সাদা চাদর টান্তে-টান্তে ফুল মাড়িয়ে।

শীত গলে-পড়ছে বর্ষায়, বর্ষা ফুটে-

উঠছে বসন্তে, বসন্ত ক্ষীণ হতে-হতে শরতের জ্যোৎস্নার মধ্যে-দিয়ে ঝিক্‌মিক্ করতে-করতে তুষারের শুভ্রতায় গিয়ে শেষ হচ্ছে; —এখানের ছন্দটা এইরূপ।

এখানে এসে অবধি হিমালয়কে একবার দেখে নেবার জন্যে উঁকি দিচ্ছি—এখানে ওখানে, সকালে সন্ধ্যায়। কিন্তু অচল সে, কুয়াশার ভিতরে কোথায় যে চলে গেছে, সপ্তাহ ধরে তার সন্ধানই পাচ্ছি না।

এ যেন একটা নিহারিকার গর্ভে বাস করছি! দিন এখানে আস্‌ছে—উত্তাপহীন অনুজ্জ্বল; রাত আস্‌ছে—অঞ্জনশিলার মত হিম অন্ধকার।

আমার চারিদিকে সবেমাত্র দশবিশ হাত পৃথিবী—গুটিকতক ফুল-পাতা নিয়ে,—যেন অগোচরের কোলে একটুকরো জগৎ; আর আমরা যেন এক-ঝাঁক দিশেহারা পাখি এইখানটায় আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের কাছে চারিদিক এখনো অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনো যেন তাঁর রং-তুলির কাজ সুরু করেননি,—সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার গায়ে পার্ব্বত্য দৃশ্যের আমেজ একটু-একটু দেগে রেখেছেন—অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।

এই-যে পরিচয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কুয়াশার যবনিকাটি দুল্‌ছে—এপারে-ওপারে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম ব্যবধান—একে সরিয়ে যেদিন শুভদৃষ্টি হবে সেদিন অন্তর গিয়ে মিলবে বাহিরে, বাহির এসে লাগবে অন্তরে! এই কথাটাই একগোছা সবুজ-পাতা আমার জানলার কাচের বাহিরে কেবলি ঘা-দিয়ে-দিয়ে জানাচ্ছে কাচের এপারে ঘরের বন্দী প্রকাণ্ড একটা পতঙ্গকে। অজানার দিক থেকে একটির-পর-একটি দূত,—চঞ্চল একটি নীল পাখি, ছোট একটি মৌমাছি—তরুলতার কানে-কানে, অপরাজিতার ঘোমটা একটু খুলে এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে—দিনের মধ্যে শতবার।

আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো—অন্ধকারের দিকে মুখ করে। কলঙ্ক-ধরা একখানা কাঁসরের মতো গভীর রাত্রিটাকে কালো ডানার ঝাপটায় বাজিয়ে তুলে মস্ত-একটা ঝড় আজ মাথার উপরে ক্রমান্বয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে—যেন দিশেহারা পাগল পাখি।

রাত্রিশেষে বর্ষা দিকবধূর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজল-রেখার কোণে একটু-খানি অরুণ আভা দেখা যাচ্ছে; আর যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখছি ধূসরের অচল ঢেউ দিকের শেষ-সীমা পর্য্যন্ত;—আর রংও নেই, রূপও নাই! এই অবিচিত্রতার মধ্যে একটি মাত্র পাহাড়ি-ফুলের কুঁড়ি, বসন্তের নববধূ সে, আলোর প্রতীক্ষা করছে! প্রজাপতির পাখার চেয়ে সুকুমার এর পাব্‌ড়িগুলি; এত ছোট, এত কচি—একেই ঘিরে আজ প্রভাতের সমস্ত সুর। সুদূর গিরি-শিখরে, মেঘলহরীর তীরে, বনের পাখির কণ্ঠে, নিহারের যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে এসেছে পর্ব্বতের কলভাষী দুরন্ত শিশু—এই-যে জলধারা এর ঝরে-পড়ার মধ্যে!

কাঁচা-সোনার একটিমাত্র আভা, বসন্ত-বাউরীর বুকের পালকের অফুট বাসন্তী আভা, সকালের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে গেল। এই আলোর উপরে সব-প্রথম তুষার,

আজ সে-সোনার পটে যেন কাজলের লেখার মতো কালো হয়ে ফুটে উঠল।

এই কালো বরফের নিষ্কলঙ্ক ললাট! এইখানে বসন্ত-দিনের—তরুণ দিনের—প্রথম আশীর্ব্বাদ পড়েছে; সে একটিমাত্র আলোর কনকা! আর তারি আভা তুষারের সহস্র-ধারায় হিমালয়ের অন্ধকার আলো করে গড়িয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে ফুল-ফোটার ছন্দটি ধরে।

আমার এ-বাগানখানি পাহাড়কে আঁকড়ে-ধরে শূন্যের উপরে ঝুলে রয়েছে। এখানে একঝাড় পাহাড়ি-মল্লিকা, এক-ঝাঁক পাখি আর আমি! এইখানটিতে তুষারের বাতাস নিয়ত গাছের ফুল, পাখির গান ফুটিয়ে তুলছে। আমার গান নেই। সকাল-সন্ধ্যায় একখানা পাথরের মত নিশ্চল নির্ব্বাক আমাকে, বাতাস আর আলো শুধুই স্পর্শ করে যাচ্ছে।

আমাদের যারা অনেকবার পাহাড়ে এসেছে এবং যারা নূতন আগন্তুক তাদের দেখি ওঠা-নামা, চলা-ফেরার অন্ত নেই। যেখানে ইংরাজি বাদ্য, গোরার নাচ সেই-সকল মেলাতেই এরা ত্রিসন্ধ্যা যোগ দিয়ে ঘুরছে, কেবলি ঘুরছে,—হয় ঘোড়ার পিঠে, নয়তো নিজের পায়ে দুইজোড়া চাকা বেঁধে! মাড়োয়ারী রাজার ফরাসী-ধরণের বৈঠকখানার চূড়োয় বাতাসের ধনুকে চড়ানো ঐ লোহার তীরটার মতো, এরা দেখি, শূন্যকে বিঁধে-বিঁধেই কেবলি ঘুরছে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে,—ছুটেও চলছে না, উড়েও যাচ্ছে না!

আমার চলার গণ্ডীটাও যে খুব বড় তা নয়। একটি পাহাড়ের যে-পিঠে সূর্য্য উদয় হন, আর যে-পিঠে তিনি অস্তে যান এইটুকুমাত্র প্রদক্ষিণ করে উঁচু-নীচু একটা পথ। এই পথ-দিয়ে কাঁটা-দেওয়া একটা মস্ত লাঠি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি—পাথর কুড়িয়ে, গাছ সংগ্রহ করে—মাসের মধ্যে ত্রিশ না হোক, উনত্রিশ দিন তো বটেই; এই পথটিতেই— সকালের আলোয়, সন্ধ্যায় ছায়ায়, দিবা দ্বিপ্রহরে, রাতের অন্ধকারে। এইখানে পাথরের গায়ে কচি স্যাওলার নূতন সবুজ, কেলুবনের ফাঁকে নীল-আকাশের চাঁদ, একটি নির্ঝরের শীর্ণ ধারা আর পর্ব্বত ছেয়ে দুর্গম বনের নিবিড় রহস্য, প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমরের গুঞ্জন, সায়ং-সন্ধ্যায় পাখিদের গানের শেষে অন্ধকারের সেই ঝিম্‌ঝিম্—যা শুন্‌ছি, কি বোধ কচ্ছি বলা কঠিন।

এই পথের একটা জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড সাইন্‌বোর্ড, তাতে লেখা আছে—"সাধারণ সড়ক্ নয়, অনধিকার প্রবেশ দণ্ডিত হইবে!" পর্ব্বতের কোলে এই 'সাইন্'টা আমাকে প্রথমদিন বড়ই ভয় দিয়েছিল, কিন্তু সন্ধানে জানলেম যারা এই মেয়াদের ভয় দিয়ে সারা পাহাড় ঘিরে নিতে চেয়েছিল তাদের মেয়াদ অনেকদিনই ফুরিয়েছে। পথটা এখন আর অনন্যসাধারণ নেই এবং সাধারণেও এই পথটার আশা অনেকদিন ছেড়ে দিয়ে, একধাপ নীচে স্কুলবাড়ি, কুয়োখানা প্রভৃতির গা-ঘেঁসে আর-একটা ঘুরুনে রাস্তা -সারকুলার রোড—ক্লবঘর ব্যাণ্ডষ্টাণ্ড ও বাজার পর্য্যন্ত জিলাপির পাকের ধরণে রচনা করে নিয়েছে—সুতরাং এ রাস্তাটার ভবিষ্যতে পথ-হয়ে-ওঠবারও

কোনো আশা নেই। এ বিপথ হয়েই রয়ে গেল,—মানুষের কাজে লেগে পথ-হয়ে-ওঠা এর ভাগ্যে আর ঘটলো না।

অনেকদিনের আনাগোনায় এই বিপথটার একটা মানচিত্র আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিম-গা বেয়ে প্রথমটা সে ঠিক পশ্চিম-মুখে সুন্দর বাঁক নিতে-নিতে সহস্রধারার উপত্যকার দিকে কাৎ হয়ে চলেছে। ঠিক যেখানটি-থেকে সূর্য্যাস্তের নীচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রূপোর তারের মত দেখা যায় সেখানটিতে পৌছে পথ স্তূপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়ে অকস্মাৎ আবার পূবে মোড় নিয়ে পর্ব্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে; একটু-দূর গিয়েই হঠাৎ পর্ব্বতের পূবের দেয়াল ঘেঁসে আবার পশ্চিমে দৌড়; সেখানে একদল মহিষ চোখ-রাঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেই পাহাড়ের একটা গড়ানে ভাঙন দিয়ে সে দ্রুত নেমে গিয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠেই সহসা মোড়-নিয়ে পর্ব্বতের পূর্ব্ব গায়ে দিগন্ত-জোড়া হিমালয়ের সম্মুখে দেবদারু-বনের ছায়ায় এসে লুকিয়ে পড়েছে; এই দিকটাতে সে শৈবাল-কোমল নির্ঝর-শীতল পর্ব্বতের বাঁকে-বাঁকে একলাটি খেলা করতে করতে পর্ব্বতের পূব-পিঠে আর-একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে; এখানে টিন্-মোড়া দোকান-ঘরে দর্জ্জি কোট সেলাই কচ্ছেন, রাস্তার একপাশে কাদের একগাড়ি জ্বালানী কাঠ খরিদ্দারের অপেক্ষায় পড়ে আছে, হতভাগা চেহারার দুখানা ভাঙা ডাণ্ডি আড্ডার দাওয়ার বাহিরে চড়ায় বাঁধা পান্‌সির মতো কাৎ-হয়ে পড়েছে। এই পর্য্যন্তই বিপথের দৌড়; বাকি যেটুকু অতিক্রম করে আমাদের বাসায় উঠে যেতে হয় সেটা বিপথ না হলেও বিপদ যে তার আর সন্দেহ নেই! মানুষ সেটাকে পর্ব্বত-শিখর পর্য্যন্ত এমন তিন-চারটে বিশ্রী মোচড় দিয়ে টেনে তুলেছে যে সেখানে কোনো যানও যান্‌না, পাও চান্‌না যে চলি।

বিপথের শেষে পথের এই মোড়টা যেন ইস্কুল-মাষ্টার, নয়তো ধর্ম্মপ্রচারক! তার বুলিই হচ্ছে—'এইবার পথে এসো!' নয়তো সে বলছে—'বিপথ হইতে পথে আইস।' এই যে রোড—সেণ্টভিন্‌সেণ্ট বা তপস্বী ভিন্‌সেণ্ট মহোদয়ের রাস্তা—এখানে নিরালা একটুও নেই;—মানুষের সকৌতুক তীক্ষ্ণদৃষ্টির চোর-কাঁটা এখানে আমার মতো বিপথের পথিকদের জন্য শরশয্যা রচনা করে রেখেছে। পেন্‌সন্-ভোগী এক কাবুলী আমিরের নূতন বয়ঃপ্রাপ্ত দুইচারি বংশধর—যাদের মাথায় শিখ-পাগড়ি, গায়ে সাহেবি কোট ও পায়ে যোধপুরী পাজামা ও ডসনের বুট্, তারা আজ কদিন ধরে আমার লম্বা চোগা ও গোর্খা টুপিটার উপরে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং দুইবেলা আমার গা-ঘেঁসেই বলাবলি করে চলেছে—"আজব টৌপি, আজব চোগা!" আজবের মধ্যে আমার দুটিমাত্র পদার্থ—দুটিই তিব্বতীয় এবং শীতের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু আজবের সংগ্রহ এ গরীবের চেয়ে আমীর-পুত্র-কয়টির অনেক বেশি ছিল সুতরাং যুদ্ধে আমারই হার লেখা গেল। এক মেমসাহেব শিলাতলে বসে মসুরী-ভ্রমণের নোট নিচ্ছেন। তিনিও

দেখলাম আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই চট্ করে খাতায় কি-এক লাইন টুকে নিলেন। তাঁর সে নোট ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুই-একজন নিকট বন্ধুছাড়া আর কারু হাতে পড়ছেনা। যাই হোক, এইরকম সব ছোট-খাট উৎপাত এড়াতে মানুষের পথে আমি চোগা ছেড়ে একটা প্রকাণ্ড সোলাটুপি ও তদুপযুক্ত চাঁদনীর কোট-প্যাণ্ট পরিধান করে বিচরণ করে বেড়াই। তাতে মানুষেরা আমায় আর তাড়া দিচ্ছেনা বটে কিন্তু মানুষের উল্টোপিঠের জীব যারা তারা আমাকে তরুশাখার উপর থেকে একটা আয়না দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে ছাড়েনা। সুতরাং বলার জ্বালায় আমার চলা দুর্ঘট হয়েছে— কি পথে, কি বিপথে। অথচ ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন চলবারই।

পথে যাই, কি বিপথে; চলি, কি না চলি!—এই দোটানার মধ্যে যখন আমি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কোনো-রকমে পথ-বিপথ দুইয়েরই মান রেখে দিনযাপন করছি,—সেই-সময় দেখি পর্ব্বত একেবারে আপাদমস্তক ফুলের সাজ পোরে সহসা বসন্তের বাসর জমিয়ে বসেছেন। “ফুলন ফুলত ভার ভার!” যত পাতা তত ফুল! যেখানে যত ধরা ছিল—পাথরের বুকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়—সূর্য্যের উদয়-অস্তের যত রং, আজ তারা ফুল হয়ে বাহিরে এসেছে! ঋতুরাজের বাঁশীর ডাকে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ রংটা দেখছি বিপুল হিল্লোলে মেঘ অতিক্রম করে গিরিশিখর পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! মেঘের বুক থেকে ইন্দ্রধনুর ফোয়ারা সাতরঙের পিচকারি আকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে; আর সন্ধ্যার কুঙ্কুম, সকালের হলুদে হিমালয়ের সাদা আর গেরুয়া বসনের দুই পিঠই দুইবেলা রঙের প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে উত্তর তীরের বসন্ত বাতাস।

বসন্তের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়ের আনন্দটা আমার পথ-বিপথ দুটোরই ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমি আজকাল যখন যে সাজটা হাতের কাছে পাই সেই বেশেই ঋতুরাজের দরবারে ত্রিসন্ধ্যা হাজির দিচ্ছি— একেবারে নির্ভয়ে।

ইনি এই পর্ব্বতের এক নামজাদা মহিলা আর্টিষ্ট! আজ কদিন ধরে আমার যাবার-আসবার পথ-আগ্‌লে হিমালয়ের একটা দৃশ্য-পট লিখতে বসেছেন। সমস্ত উত্তরদিক জুড়ে তুষারের উপরে সন্ধ্যা মুঠো-মুঠো ইন্দ্রধনুচূর্ণ ছড়িয়ে আল্‌পনা টেনে যাচ্ছেন,—মনেই ধরা যায় না সে এমন বিচিত্র—একটুক্‌রো সাদা কাগজে এরি নকল নিচ্ছেন আমাদের এই মহিলা আর্টিষ্ট!

উপহাসকে সেদিন আর পুরু পাহাড়ি-চোগার মধ্যে ঢেকে রাখা গেলনা। সে একটা অকাল বাদলের আকার ধরে বাতাসে, কুয়াসায় ও জলের ঝাপ্‌টায় চিত্র-কারিণীর রং তুলি কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে অবশেষে তাঁর অতি-আবশ্যকীয় রং-মেশাবার জল-পাত্রটি পর্য্যন্ত উল্টে দিয়ে, দুরন্ত একটা পাহাড়ি ছাগলের পিছনে-পিছনে পলায়ন করলে একেবারে গিরিশৃঙ্গে।

এই দলের এক আর্টিষ্টের কতকগুলো

ছবি নিয়ে একটা লোক কোন্-একটা পাহাড়ে শিল্প-প্রদর্শনী খুলেছে! যিনি কবি যিনি কর্ম্মী তিনি ঐ নীল আকাশ-পটে আলো-অন্ধকারের টান্ দিয়ে ছবি সৃষ্টি করছেন, আর আমরা যারা কবিও নই, শিল্পীও নই, ঐ আসল ছবিগুলো দেখে একটা একটা জাল দলিল প্রস্তুত করে নিজেদের নামের মোহরটা খুব বড় করেই তাতে লাগিয়ে দিচ্ছি—নির্লজ্জভাবে।

মানুষ সে মানুষই, বিধাতা তো নয় যে, তার সৃষ্টিটা বিধাতারই সমান করে তুলতে হবে? মানুষের শিল্প মানুষকে আগাগোড়া স্বীকার করে বিশহাত দশমুণ্ডু অথবা বিধাতার গড়া নরনারীমূর্ত্তির চেয়ে সুন্দর হয়ে যদি দেখা দেয় দিক্, তার মধ্যে প্রবঞ্চনার পাপ তো ফুটে ওঠে না! কিন্তু তুষারপর্ব্বত না হয়েও যেটা তুষারের ভ্রম জন্মে দিয়ে চলে যেতে চায় সেটাকে আমরা কি বলব? সে যে বিধাতা এবং মানুষ দুয়েরই সৃষ্টির বাহিরে থেকে দুজনকেই অপমান করতে থাকে!

আমার এ বাগানে ফুল আর ধরছেনা। প্রতিবেশী সাহেব-সুবার ছেলেমেয়েরা—তাদের আঁচল নেই—খড়ের টুপি ভরে ফুল লুট করে নিয়ে চলেছে। আমাদের গয়লা-মালী, তার অনেক যত্নের এ-ফুল। ওই শিশু-পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সে আমার কাছে নালিশ জানায় বটে কিন্তু ফুলের মোকদ্দমা তার দিনের পর দিন মুলতুবিই থাকে।

সেদিন এই গয়লার একটা কালো বাছুর খাদ্যাখাদ্য বিচার না করেই নিতান্ত ছেলেমান্ষি-বশত সাহেবদের বাগানের একটা ফুলগাছ সমূলে নিঃশেষ করে ধরা গেছে। সাহেবের চৌকিদার বাছুরকে থানায় দিতে চলেছে। পথে বেচারা অবোধ জীব মানুষের এই আইনের বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি জানাচ্ছে এবং দেখছি তার বড় বড় দুটো চোখ চারিদিককে কেবলি প্রশ্ন করছে সকাতরে—কি তার অপরাধ জান্‌তে। গোরু বাছুরের উপরে চৌকিদারের একটা শ্রদ্ধা অনুমান করেই যেন সাহেব পুলিশের উপর একখানি জবাবি চিঠি দিয়েছিলেন। সুতরাং উৎকোচ দিয়ে যে নিরপরাধ জন্তুটিকে খালাস করে দিই এমন উপায়ও ছিল না। তখন গয়লাকে তার বাছুরের হয়ে ত্রুটি স্বীকার করে মার্জ্জনা-ভিক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়ে ফুলের দুটা মোকদ্দমা একই দিনে নিষ্পত্তি করলেম। এমনি করেই নির্ব্বিবাদে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফুল-ফোটার দিন অবসান হল।

যে পর্ব্বতটাকে ঘিরে চঞ্চল হরিণ-শিশুর মতো আমার চলার পথটি নৃত্য করে খেলা করে চলেছে তারি মেরুদণ্ডের ঠিক উপরে সজারুর কাঁটার মত ঘন দুই সারি দেবদারু। শরতের বাতাস এখান থেকে শব্দের একটা জাল নীল-আকাশে দিবারাত্রি নিক্ষেপ করছে। একদিকে হিমালয়, আর-একদিকে সহস্রধারার উপত্যকা—যেখানে সূর্য্য-উদয় এবং যেখানে সূর্য্যের অস্তগমন—এ দুই দিকই আমি দেখি এইখানটিতে বসে।

ফুলের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আকাশের চোখে রঙের নেশা আর তেমন করে লাগে না; সূর্য্যের আলোতে ঝরা-পাতার কস্ ধরেছে, তুষারের সাদা দিনে-দিনে

নীল-আকাশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—চাঁদের আলোর সঙ্গে সঙ্গে।

হিমালয়ের দিনগুলিতে বিজয়ার সুর লেগেছে। এই সুর লোহার কসের মত পাথরের গায়ে, ঘাসের সবুজে, সন্ধ্যার সিঁদুরে মিশিয়ে গিয়ে দিনান্তেরও পরপারে রাত্রির অনেকদূর পর্য্যন্ত আকাশের গায়ে গেরুয়ার টান্-দিয়ে-দিয়ে বাজছে। দিন যেন আর যায় না! শরতের চাঁদনী-রাতের তীরেও নীলাকাশের বিরহী নীলকণ্ঠ আপনার একটিমাত্র সুরে বেদনার নিশ্বাস টান্ছে শুনি—উঃ উঃ!

আজ আমাদের সে-দেশে নবমীর নিশি প্রভাত হল। এখানে শরতের সাদা মেঘের দুখানা ডানা নীল-আকাশে ছড়িয়ে আজকের দিনটি যেন কৈলাসের তুষারে-গড়া একটি শ্বেত-ময়ূরের মতো কার ফিরে আসার পথ চেয়ে পর্ব্বতের চারিদিকে কেবলি উড়ে বেড়াচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় দেখছি ঠিক সহস্রধারার উপত্যকার মুখে—পর্ব্বতের পশ্চিম গায়ে তৃণে-গুল্মে, লতায়-পাতায়, পাথরের গায়ে, পথের ধূলায়, ফুলের মতো, আবীরের মতো, মাণিকের আভার মতো একটা আলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে; মনে হচ্ছে যেন তুষারের হৃদয়-রক্ত গলে এসে হিমালয়ের এই পশ্চিম-দুয়ারের সোপানে আল্‌পনার মত ছড়িয়ে পড়েছে। এরি উপর দিয়ে দেখছি, সন্ধ্যাতারার মত একটি বন-বিহঙ্গী, আলোয়-গড়া মোনাল পাখি সে, চলে গেল পায়ে-পায়ে গিরি-শিখর অতিক্রম করে—চাঁদনী-রাতের প্রাণের ভিতরে। আজ দেখলেম তুষারের শিখরে চাঁদ উঠছে আলোর একটা সুকোমলচ্ছটা আকাশে বিকীর্ণ করে। হিমালয়ের আর-সমস্তটা আজ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ঘরে এসে দেখছি এ-পাহাড়ের এক ভিখারী আমার জন্যে তার শরতকালের উপহারটি রেখে গেছে—একগোছা সোনালি কুশ আর কাশ! সুদূর পাহাড়ের কোন্ নিরালা পথের ধারে এরা নত হয়ে পড়েছিল, চলে যেতে কার সোনার আঁচল উড়ে উড়ে এদের স্পর্শ করে কনক-চূর্ণের বিভূতি দিয়ে এদের সাজিয়ে গেছে!

ভেঙে-পড়া দেবদারুর নির্য্যাস-গন্ধ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আজকাল বরফের হাওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছে। পথ-দিয়ে ক্রমাগত কম্বল-পরা পাহাড়ির দল কাঠের বোঝা, ভালুকের আর বনবেড়ালের ছাল নিয়ে, গহন বন থেকে 'মোনালপাখির' সোনার পাখা, মৌচাকের সোনালি মধু চুরি করে ঘরে ঘরে ফেরি দিচ্ছে। কোনো দিকে কুয়াসার লেশমাত্র নেই, দিনরাত্রি সমান পরিষ্কার। কেলুগাছের ফলন্ত শাখায় প্রশাখায় গিরি-মাটির একটা রং লেগেছে।

পার্ব্বতী রুক্ষ রক্ত-বাস আপনার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালিনী বেশে দেখা দিয়েছেন। অনেক দূরের একটা পাহাড়; তার গায়ে একটি-একটি গাছ দ্বিপ্রহরে চাকা-চাকা কালো দাগ ফেলেছে;—যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো; এরি উপরে চির-তুষারের ধবল মূর্ত্তি সারাদিন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটির-পর-একটি গিরিচূড়া হিমে সাদা করে দিয়ে শীত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি। পর্ব্বতে পর্ব্বতে মানুষের জ্বালানো

দীপমালা থেকে ছ-দশটা করে আলোর ফুল্‌কি প্রতিদিনই দেখছি খসে পড়ছে, আর নীল-আকাশে দীপালী উৎসব ক্রমেই দেখছি জমে উঠ্‌ছে। এখানকার হাট ভাঙবার পালা সুরু হয়েছে, পুজোর ছুটির যাত্রীরা দলে দলে ঘোড়াতে ডাণ্ডিতে ক্রমে পর্ব্বত খালি করে দিয়ে নেমে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্তটা দৈন্য এবং অশোভনতা—দেশি-বিদেশি নির্ব্বিশেষে—তার মুরগীর ঝুড়ি, আধপোড়া হাঁড়ি, ছিট্‌মোড়া ময়লা বিছানা, দড়ি-বাঁধা বাক্স, কড়ি-বাঁধা হুঁকা, হলুদের ছোপধরা চিনের বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে আজ রাস্তায় বেরিয়েছে এবং ময়লা জলের একটা নালার মতো পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে চলেছে।

এই যে কটা ঋতুর মধ্যে দিয়ে শীতের আগে পর্য্যন্ত এই পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ পাখি এল—বাসা বাঁধ্‌লে, সংসার পাতলে, বাস করলে—আবার চলে গেল দূরদূরান্তরে, আকাশ-পথে দলে দলে; কি সুন্দর, কি স্বাধীন এদের গতিবিধি! আর মানুষ যে জলে-স্থলে-আকাশে আপনার রাজত্ব বিস্তার কল্লে তার যাওয়ায় কি অশোভনতা! সিন্ধ-বাদের বিকটাকার বুড়োটার মত সে আপনার সঞ্চিত কাজের বাজের মূল্যবান অথচ মূল্যহীন আসবাবের আবর্জ্জনাকে বয়ে চলেছে দেখছি—বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। পাখি চলে গেল, সে তার বাসার একটি কুটোও নিয়ে গেল না; আর মানুষ যেতে চাচ্ছে আস্তাবলের খড়-কুটোটা এবং আস্তা-কুঁড়ের ভাঙা ঝুড়িটা, এমন-কি রাস্তার কাঁকর-গুলো পর্য্যন্ত সংগ্রহ করে মোট বেঁধে নিয়ে।

প্রথমে এসে পর্ব্বতেপর্ব্বতে পথ-হারিয়ে আমি প্রায়ই অন্যের বাগানে অনধিকার প্রবেশ করে লজ্জিত হয়েছি, এখন সে-ভয় গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়িরই ফাটক বন্ধ এবং পর্ব্বতের গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশের পথ একেবারে খোলা হয়ে গেছে। আমি সেখানে অবাধে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছি। চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তের মধ্যে দিয়ে ছবির পর ছবি, কিন্নরীর ঝাঁকের মতো চিত্র-বিচিত্র আলোর পাখনা মেলে, এ কয় দিন আমার অন্তরের বাহিরে সকালে-সন্ধ্যায় দিনে-রাতে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এদের ধরতে গিয়ে দেখি, এদের সমস্ত শ্রী লজ্জাবতী লতার মতো আমার আঙুলের পরশে ম্লান হয়ে গেল। শীত এসেছে। হিমের অভি-যানের পূর্ব্ব থেকেই গাছগুলো তাদের পাতার অনাবশ্যক বাহুল্য ঝেড়ে-ঝুড়ে আপনাদের সমস্ত শক্তি ভিতরে-ভিতরে সঞ্চয় করে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্তে ফুলের ভারে এরা নুয়ে পড়েছিল দেখেছি, আর আজ দুদিন পরে বরফের পীড়ন সুদীর্ঘ শীতের দিন-রাত্রিতে বহন করবে এরাই অনায়াসে,—ফুলেরই মতো পাতারই মত! পর্ব্বতের সক্ষম সহিষ্ণু সন্তান এরা, পাথরের বুকের ভিতরকার স্নেহ এদের বড় করে তুলেছে,—অটুট এদের প্রাণ!

আর মানুষ যাদের যত্নে বাড়িয়েছে সেই-সব ক্ষীণপ্রাণ গাছদের মালিরা দেখছি আজকাল তুষারের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কাচ-মোড়া গরম ঘরে নিয়ে তুলছে—শুকনো ঘাসের রক্ষাকবচ তাদের সর্ব্বাঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে।

এখানকার পাহাড়িগুলো মোটেই পাহাড়ি নয়, তারা আসলে চাষী ;—যখন ক্ষেতের কাজ নেই, ডাণ্ডিতে এসে কাঁধ দেয়। এরা পাহাড়ের পথগুলো চেনে কিন্তু পাহাড়কে চেনে না, বরফকে এরা ভয় করে। পর্ব্বত যেখানে ক্ষেতের উপরে নদীর জলে আপনার ছায়া ফেলেছে সেখান থেকে উঠে এসেছে এরা ; আবার সেইখানেই ফিরে যেতে চায়। আজ কদিন ক্রমাগত এরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে বরফ পড়ল-বোলে! কাল আমাদের যেতে হবে ; কালো মেঘের ভ্রূ-কুটি বিস্তার করে একটা ঝড় দূর পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে আজ আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে। দিনের আলো নিষ্প্রভ, ধূসর আকাশ দুর্ব্বহ হিমের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে। আমি পর্ব্বতের চূড়ায় একটা বন্ধ-বাড়ির বাগানে একলা উঠে এসেছি ;—ঠাণ্ডা দিনটির ভিতর দিয়ে একটানা বরফের হাওয়া মুখে এসে লাগ্‌ছে। একেবারে ছায়ার মতো ঝাপ্‌সা কালো-কালো পাহাড়গুলোর উপরেই আজ তুষারের সাদা ঢেউ যেন এগিয়ে এসে লেগেছে—চোখের সাম্‌নেই দাঁড়িয়েছে যেন! এ বাগানটা যাদের তারা চলে গেছে ; টিনের ঘরে তালা দিয়ে বাগানের যত ফুলগাছ সব রেখে গেছে। এদের বুড়ো মালী একটা কেলুগাছের তলায় কতকগুলো চারাগাছের উপরে খড়ের ঝাঁপ আড়াল দিচ্ছিল। সে আমাকে তার কাজ ফেলে বাগান দেখাতে লাগলো। কাচের ঘরে সাহেবের যত মূল্যবান সৌখিন ফুলের গাছ, জাল-দিয়ে-ঘেরা ; টেনিস্‌ খেলার একটা চাতাল, এর উপরে একহাত বরফ সেবারে পড়েছিল ; এইটে মেম-সাহেবের চা-পানের মণ্ডপ ; এই রাস্তা দিয়ে সাহেবের ঘোড়া পর্ব্বতের উপর আস্‌তে পারে, ওখানে সাহেবের কাছারির তাম্বু পড়ে, বাড়ির এই-দিকটা পুরানো আর ঐ-দিকটা সাহেব অনেক ব্যয়ে নূতন করে বানিয়েছে ইত্যাদি! অনেক দেখিয়ে মালী আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বল্লে, ঐযে ভাঙা বাংলাটা ঐটেই যে এ-বাগান প্রথম বানিয়েছিল তার ; ওদিকে আরো অনেকটা বাগান ছিল বরফে ধ্বসিয়ে দিয়েছে ; আমি ছোটবেলায় সেই বাগান দেখেছি। মালী যেদিকে দেখালে সেদিকে তুষার-পর্ব্বত পর্য্যন্ত নির্ম্মল একটী শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরি ধারটিতে সেই ভাঙা বাংলা ; ভাঙনের গা-বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষার-পর্ব্বতের দিকে ঢলে পড়েছে—ফুলের একটা উৎস! এর কাঁটায় কাঁটায় ফুল, গাঁটে গাঁটে ফুল,—পর্ব্বতের শিখরে এ যেন একটা ফুলের স্বপ্ন! বসন্তের বুল্‌বুল্‌ নয়, তুষারের সাদা পাখি একে ডেকেছে—শূন্যতার ঐ ওপার থেকে!

* * * *

অবরোহণ

চলা বলা সব বন্ধ করে যা-কিছু কুড়োবার কুড়িয়ে, যা-কিছু গুড়োবার গুড়িয়ে বসেছি। পাহাড়ের নীচে থেকে কুলীর সর্দ্দার চিৎকার করে ডাকৃছে—'ফাল্‌তো ফাল্‌তো, হারেরে বেগার কুলী!'

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চল্‌তি ভাষা

বাংলা সাহিত্য চলে এতে অনেকের আপত্তি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা বলচেন, সাহিত্যের বাহন ভাষা যেন চল্‌তি না হয়।

শুধু ভাষা কেন, অনেক বিষয়েই এই চলা-জিনিষটায় বাধা-দেওয়া আমাদের স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে। সমাজে যারা অচল তাদের চলতে দিয়োনা; দেশ-ছেড়ে সমুদ্র-পারে কাউকে যেতে দিয়োনা—এমনিতর কত যে চলার উপর নিষেধ আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই জন্য মনে হয়, ভাষা চল্‌তি হবে—এতে আমাদের দেশের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু যে জিনিষটা চলে তার একটা বেগ থাকে—সে ধাক্কা দেয়—অর্থাৎ তার আশপাশে যা চলে না তাকে আঘাত করে তবে সে চলে এবং সেই আঘাতে অচলতা শিথিল হতে থাকে।

বিলাত-যাত্রাটা ঐ-রকম করে আমাদের সমাজে চলে যাচ্ছে। প্রথম-প্রথম এর বিরুদ্ধে আপত্তির গলার জোর যতটা ছিল এখন তা ক্ষীণ হয়ে আসছে। বরং কোনো কোনো সমাজ-সভা আপত্তির কারণ আর খুঁজে পাচ্চেন না। তার মানে এই যে, যেটা চলচে সে ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে অচলতাটাকে চলার স্রোতের মুখে এনে ফেল্‌চে।

প্রথম যখন বিলাত যাবার কথা ওঠে তখন অচলতা বলে উঠেছিল, যাচ্ছ যাও, কিন্তু আমাদের এই গণ্ডীর মধ্যে তোমার প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অচলতা নিজের পাথরের দেয়ালে নিজে সিঁধ-কেটে তাদের গলিয়ে নিচ্ছে।

তার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তার একটা তাগিদ আছে। যতক্ষণ মানুষের ভিতর এতটুকু প্রাণ থাকে ততক্ষণ সেই প্রয়োজন তাকে স্থির থাকতে দেয় না—তার দাবি মেটানো চাই। প্রয়োজন জিনিষটা ভালো নয় বলে তাকে গাল-মন্দ পাড়তে পারি কিন্তু সে তাতে মরে না।

সেই জন্য দেখতে পাই, শাস্ত্রে খুব কঠোর বিধান থাকলেও এবং তাই নিয়ে আমরা মহা আস্ফালন করলেও ছত্রিশজাতের সঙ্গে একত্রে রেলগাড়িতে না গেলে এবং জল না খেলে এখন আমাদের উপায় নেই। এবং মহা-হিন্দুকুলোদ্ভবের সন্তানকে বিদ্যালয়ে এমন ছেলের সঙ্গে একাসনে বসতে হয় যার ছায়া মাড়ালে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা না করেও এখন ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় রাখা চলে;—দাস্যবৃত্তি প্রভৃতি ইতর কর্ম্মে তা পতিত হয় না।

* *
*

ভাষার ভিতরেও একটা প্রয়োজনের তাগিদ আছে। সে তার স্ফূর্ত্তির জন্যে চারদিকে হাত বাড়াচ্ছে। তাকে যদি তুমি ঘরে বন্ধ রাখতে চাও, সে শুনবে কেন? সে বলবে, তা হলে তো আমি মলুম! আমি বেঁচে আছি—আমার

এই চাই! তা সে তোমার ব্যাকরণ না দেয় জোর করে নেব।

এই জোর তার যার প্রাণের বেগ আছে। আমাদের ভাষা এখন প্রাণবন্ত। সেই জন্য সে চুপ করে থাকতে পারে না;—সে চলবেই, তাকে চল্‌তি হতেই হবে। তাকে যদি বল—চোলোনা। সে বলবে, রোসো আগে মরি! তার পর যা হয় হবে।

আমাদের সমাজের মধ্যে যেমন, ভাষার মধ্যেও তেমনি একটা অচলতা আছে। সে বলছে চল্‌তিটাকে আমাদের পংক্তিতে বসতে দেব না। কিন্তু এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঐ সমাজটার মতো সেও নিজের ঘরে সিঁধ-কেটে চল্‌তিটাকে একটু-একটু করে টেনে নিচ্ছে। তার মুখে নিজেদের মুখোস পরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে বটে কিন্তু সে মুখোস ক্ষণে ক্ষণে খসে পড়ছে। এই ছিদ্র যখন একবার পেয়েছে তখন চল্‌তি ভাষা তারই মধ্য দিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে নেবে। দেয়ালের সিঁধটা তখন এত-বড় হয়ে উঠবে যে দেয়ালের চিহ্নমাত্র থাকবে না।

এখন যাঁরা চল্‌তি ভাষার বিরুদ্ধে আপত্তি করে প্রবন্ধ লিখছেন তাঁদের ভাষার ভিতর থেকেও ঐ অর্ব্বাচিনগুলো একটা বিদ্রূপের হাসি হাস্‌তে-হাসতে ছুটে চলেছে দেখতে পাই—তাদের আনন্দের নৃত্য দেখে কে! তাদের কচি-গলার কলরোল বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্যটাকে কোথায় তলিয়ে দিচ্ছে তার ঠিক নেই।

* *
*

সাহিত্য কার ইঙ্গিতে চলে? এক-একজন প্রতিভাবান এসে সারথি হন তাঁরাই সাহিত্যকে গতি দান করেন। এঁদের দ্বারাই সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি হয়;—বাকি লোক তাঁর অনুকরণ বা অনুসরণ করে।

যিনি সাহিত্যের মহারথী তিনি রথ হাঁকিয়ে চল্লে সেই রথের চাপে সাহিত্যের রাস্তা আপনি তৈরি হয়ে ওঠে। সে রথ কল্‌কাতার মধ্যেই চলুক, কি ঢাকায় চলুক তাতে কিছু আসে-যায় না। আজকের দিনে কল্‌কাতার রাজপথে সাহিত্যের মহারথী আকাশে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন—সমস্ত বাংলা দেশ সেই দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। এমন যদি কোনো দিন আসে যখন ঢাকার পথে এমনিতর করে রথের চাকা ঘর্ঘর শব্দে চলতে থাকবে তখন সমস্ত বাংলা দেশ ঢাকার দিকেই অবাক দৃষ্টি ফেরাবে;—সেই রথের আগে তার হৃদয়ের শ্রদ্ধার নমস্কার আপনি অবনত হয়ে পড়বে। তুমি বাঁধা-পথ তৈরি করতে চাচ্চ—সেই বাঁধা-পথে যে সাহিত্যের মহারথী রথ চালাবেন এমন সুবোধ বালক তিনি নন। তাঁর কাজই যে ওই যে তাঁকে নতুন পথ দেখাতে হবে।

বর্ত্তমান সাহিত্য-রথী যে-পথ তৈরি করে দিচ্ছেন, সে-পথে তোমার-আমার মতো সামান্য কারবারিকে চলতেই হবে। পূর্ব্ব-অঞ্চল পশ্চিমের প্রতি অভিমান করে বসে থাকলে চলবে না। এখন ঐ এক রাস্তা! কারণ আর-সব পথ অন্ধকারে ঢেকে আসছে—অব্যবহারে মরে আসছে; সে

পথ অচেনা অজানা হয়ে পড়েছে। তার গতি থেমে গেছে—তাকে ছাড়িয়ে চলবার ডাক আমরা শুনতে পেয়েছি। কাজেই যে-পথ তৈরি-হতে-হতে চলেছে সে-পথের যাত্রী আমাদের হতেই হবে। তার বিরুদ্ধে চীৎকার করে গলা ভাঙতে পারি, আর-কিছু পারব না। সারথির রথের চাকার চাপে-চাপে সাহিত্যের পথ তৈরি হতে হতেই চলবে।

* *
*

সাহিত্যের ভাষা চল্‌তি না হয়ে যে উপায় নেই। যে জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য, সেই জীবন যে স্রোতের মতো বহে চলেছে। চলবার মুখে সে নূতনকে লাভ করছে। সে ত গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যস্তোত্র আবৃত্তি করচে না যে, তার মুখস্থ বুলি আউড়ে গেলেই চলবে। সে যে-নূতনকে পাচ্ছে তার আনন্দ ব্যক্ত করবার জন্যে তাকে চেষ্টা করতে হচ্ছে। সেই চেষ্টার মুখে নূতন শব্দ, নূতন ঝঙ্কার, নূতন সুর ধ্বনিত হয়ে উঠে তার মনের নূতন সজীবতাকে প্রকাশ করছে। এমনি করে সে সৃষ্টি করছে। এই সৃষ্টিই ত সাহিত্য।

পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের জীবন যেখানে ছিল সেখানে আর নেই—সেই কালকে অতিক্রম করে সে চলে এসেছে। ক্রমাগতই নূতনের পথে আমরা চলেছি—সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আমাদের চলেছে। এই চলার পথে আমাদের জীবন থেকে যেমন অনেক জিনিষ ঝরে পড়েছে—তেমনি ভাষা থেকেও ঝরেছে। এখনও অবশ্য ঢের পুরাতন জিনিষ আছে বটে। কিন্তু তাদের প্রাণ আছে বলেই তারা আমাদের সঙ্গে দৌড়ে চলতে পারছে। যেদিন পথের মধ্যে মুখ-থুবড়ি খেয়ে মরবে সেদিন সেখানেই সে পড়ে থাকবে—জীবন্ত যারা তারা এগিয়ে চলে যাবে। এমনি করে ভাষার অনেক শব্দ, অনেক আচার অতীতের কবরে চাপা পড়ে আছে—তারা আর আমাদের জীবনের সঙ্গী নয়, সেইজন্য সাহিত্যেরও সঙ্গী নয়।

যারা অবশ্য অচল তাদের সঙ্গে পুরাতনের বন্ধুত্ব অটল হয়ে থাকে। কারণ তারা কেউই চলচে না—দুজনেই এক-জায়গায় মুখোমুখি করে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন তাদের কাছে ভয়ানক!

* *
*

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে পুরাতন সাহিত্য কি একেবারে ব্যর্থ? পুরাতনকে ছাড়তে-ছাড়তে এমন জায়গায় আমরা এসে পৌঁছব যেখানে পুরাতন আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত হয়ে পড়বে? একে-বারে ব্যর্থ না হোক, অপরিচিত যে হয়ে পড়ে তার প্রমাণ ত হাতে-হাতে। বাংলার প্রাচীন পদাবলী হেঁয়ালির মতো হয়ে আসছে। তবে কি আমরা প্রাচীন সাহিত্য থেকে রস পাই না? পাই। কিন্তু সে কেমন করে? না, সেই প্রাচীন সাহিত্যকে আমাদের আয়ত্ত করতে হয়। তার শব্দকোষ, তার ব্যাকরণ আমাদের জানতে হয়, তবে তার কাছে আমরা ঘেঁসতে পারি। এই ব্যাকরণ, এই শব্দ-কোষ সেই-পথ তৈরি করে দেয় যার

ভিতর দিয়ে আমরা প্রাচীন সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ.করে তার শিল্প-সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করি। ব্যাকরণের স্বার্থকতা ঐ-খানেই। নইলে চল্‌তি ভাষা ব্যাকরণের কোনো ধার ধারে না। ব্যাকরণ না পড়েও তুমি চল্‌তি ভাষা শিখতে পার। কিন্তু যে ভাষা চলচে না তার জন্যে তোমার ব্যাকরণ চাই। সেই ব্যাকরণের বাতি হাতে করে অপরিচিত রাজ্যে আমরা প্রবেশ করি—তার শোভাসম্পদ দেখি। একথা সব দেশের সব সাহিত্য সম্বন্ধেই খাটে। অত কথায় কাজ কি, আধুনিক বাংলা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেচে যেখান থেকে প্রাচীন বাংলার দিকে ফিরতে গেলে ঐ বাতির আলো দরকার হয়ে পড়বে।

* *
*

প্রাচীন সাহিত্য যতই সম্পদশালী হোক আমাদের কাছে সে কতকটা মরা। কারণ সে পিছনে পড়ে আছে—আমাদের সঙ্গে চলচে না। তার ভিতরে যে জীবন আছে, যে মানুষ আছে, যে শব্দ আছে সুর আছে, যে চিত্র আছে তার কোনো পরিচয় আমাদের আধুনিক জীবনে নেই। সেই জন্যে বলতে হয়, প্রাচীন সাহিত্যের রস আমরা যতই উপভোগ করি না কেন সেকালের রসিকদের মতো যে নয় তা ঠিক। কোথায় এখন সেই শান্তশ্রী তপোবন? সেই আশ্রম? সেই মুনিঋষি? সেই ঋষিকন্যা? সেই রাজা, রাজসভা, বিদূষক? তারা ত এখন কল্পনায়। যে আবহাওয়ার মধ্যে এই সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সে হাওয়া এখন নেই। তার ছায়া এখন আমাদের ভাষায় তর্জ্জমা করে তবে তার আনন্দ পাই। তার প্রত্যেক শব্দটি অনুবাদ করে নিতে হয়; তার টীকা, তার ভাষ্য চাই। এতে করে আসল জিনিষটি নিশ্চয় পাই না। এ অনেকটা তেমনি, যেমন-করে ইংরাজি সাহিত্য থেকে আমরা রস পাই। তাদের নাইটিংগেলের গান কখনো শুনিনি, তাদের জেস্‌মিনের গন্ধ কখনো নাকে পাইনি, তবু তাদের কবিতা থেকে যে আনন্দ পাই সে আনন্দ কতকটা কোকিলের গান, কতকটা জুঁইয়ের গন্ধ থেকে চয়ন করি। সে আনন্দ যে ঠিক ইংরাজ-পাঠকের আনন্দ নয় তা বলতেই হবে। অবশ্য আমাদের নিজের দেশের জিনিষকে, তা পুরাতন হলেও, আমরা বিদেশী জিনিষের চেয়ে বেশী করে উপভোগ করতে পারি—কারণ তার সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ আছে।

তা ছাড়া সাহিত্যে এমন কতকগুলি মূল জিনিষ থাকে যা চিরন্তন। তারই জন্যে সব দেশের, সব কালের সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আমাদের বাধে না। মানুষ চিরকাল প্রেমের মোহিনী শক্তিতে বাঁধা পড়েছে। যেখানে সে প্রেমের রূপ দেখে, আত্মহারা হয়, আনন্দ পায়। মানুষের জীবনের ভিতর, তার সমাজের ভিতর এমনিতর কয়েকটি চিরন্তন সম্পদ আছে যা কোনো দেশ-কালের দ্বারা আবদ্ধ নয়, —যার রূপ কালে কালে কিম্বা দেশবিভেদে পরিবর্ত্তিত হলেও সে ভিতরে একই থাকে। তার ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বের মানুষ উঠছে

পড়ছে,—তার দ্বন্দ্বে ছন্দে আনন্দে, তার ভয়ে বিস্ময়ে, তার আশায় নেশায় মানুষ চলচে-ছুটছে, ভাঙচে-গড়ছে, দিচ্চে-নিচ্চে। তারই রূপ মানুষ সাহিত্যে প্রতিফলিত করে,—কারণ সাহিত্যে মানুষ নিজের কথাই বলে। সেই রূপের রসে মানুষ মুগ্ধ হয়। সেইজন্য একদিকে সাহিত্য প্রাচীন হলেও তার একটা নবীনতা চিরদিন থাকে। কিন্তু সে নবীনতা ভাবের,—ভাষার নয়। ভাষা চিরদিন চলতে থাকে। যখন তার কথা ফুরিয়ে যায় তখনই সে থেমে পড়ে। যার কিছু বলবার নেই সেই ভাষাকে থামতে বলে,—চল্‌তি হতে মানা করে।

প্রাণশক্তির বিকাশ

প্রাণ-শব্দের মূলার্থদ্বারাই বায়ু যে ইহার প্রকৃত আশ্রয় তাহা বুঝিতে পারা যায়—কারণ বায়ুবাচক 'অনিল' শব্দ ও 'প্রাণ' শব্দের একই অন্ ধাতু মূল দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু সমস্ত জীবনের প্রাণতত্ত্ব বলিয়াই ইহার এক নাম 'জগৎ-প্রাণ' হইয়াছে, যথা—"সমীরমারুতমরুজ্জগৎপ্রাণসমীরণাঃ ॥" বায়ু এইরূপে জীবনের অবলম্বন হওয়ায় একদিকে "প্রাণধারণ" দ্বারা যেমন আমরা জীবিত থাকা বুঝি—তেমনই "প্রাণবিয়োগের" দ্বারা মরিয়া যাওয়া বুঝিয়া থাকি।

শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারাই আমাদের প্রাণবায়ুর কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গেই যে প্রাণের সম্বন্ধ তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ হইতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থার মধ্যেই যে প্রাণশক্তি-বিকাশের আভাষ দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা অনুমান করিতে পারি। বস্তুতঃ প্রাণিতত্ত্বের আলোচনা করিলে ভিন্ন ভিন্ন জীব-বিকাশে শ্বাসপ্রশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়। মনুষ্যাদি উচ্চশ্রেণীর জীবে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসের যে ব্যবস্থা দেখিতে পাই—সে ব্যবস্থা প্রথম হইতেই হয় নাই; ক্রমবিকাশের নিয়মেই ঘটিয়াছে।

কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে মনুষ্যদিগের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বতন্ত্র যন্ত্র বিদ্যমান দেখা যায় না। ইহাদিগের দেহের বহিরাবরণের দ্বারা বা দেহস্থিত রন্ধ্র-বিশেষের সহিত সংযুক্ত শাখাপ্রশাখাযুক্ত শিরাদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। (১) ইহার পরই মৎস্যজাতির কান্‌কোর ন্যায়

(১) "Zoophytes, it is true, have no special respiratory organs, but then the air is admitted freely to all parts of the body. The same is the case with insects, and they possess, in addition, an express provision for introducing the air into the system. In them cavities, or stigmata, are found which communicate

শ্বাসযন্ত্রের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাকেই শ্বাস-যন্ত্রের প্রথম বিকাশ বলা যায়। তাহা হইলেও ইহা শ্বাসযন্ত্রের বহির্ব্বিকাশমাত্র। শ্বাসযন্ত্রের অন্তর্ব্বিকাশ প্রথম সরীসৃপ জাতীয় জীবেই লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহারা নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ না করিয়া মুখের দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের শ্বাস-যন্ত্র যেমন অসম্পূর্ণ, হৃদ্‌যন্ত্রও সেইরূপ। তাহাতেই ইহাদের প্রাণশক্তির বিকাশ অসম্যক্ দেখা যায়। (২)

সরীসৃপের পর পক্ষিজাতির শ্বাসযন্ত্র। সরীসৃপের ন্যায় যেমন ইহাদিগের ফুস্‌ফুসের দ্বারা বায়ুগ্রহণের ব্যবস্থা আছে—পতঙ্গ দিগের ন্যায়ও তেমনই ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা বায়ুগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। (৩)

স্তন্যপায়ী-প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রকেই শ্বাস-যন্ত্রের শেষ বিকাশ মনে করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যেও মনুষ্যের শ্বাস-যন্ত্রই সর্ব্বশেষ বিকাশ। কারণ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্র বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া চলিতে না পারায় ইহাদের বক্ষঃস্থলের কুঞ্চন হেতু শ্বাসযন্ত্রের কুঞ্চন হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। কিন্তু মনুষ্যজাতি দণ্ডায়মান হইয়া চলিতে পারায়—ইহাদের বক্ষঃস্থলের প্রশস্ততা হইতে শ্বাসযন্ত্রও প্রসারিত হইবার অবসর পায়। এই প্রকারে মনুষ্য জাতিতে শ্বাসযন্ত্রের পূর্ণতা হইতে প্রাণশক্তিরও যে পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। পরমায়ু প্রাণশক্তির অন্যতর পরিমাপক। পরমায়ু দ্বারা বিচার করিলেও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে সমস্ত জীবের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের বিকাশ হয় নাই তাহাদিগের আয়ুষ্কাল বিশেষরূপে পরিমিত দেখা যায়। মশকাদির জীবন এক দিনও নহে। কোন কোন পতঙ্গ ঊর্দ্ধপক্ষে সাত

freely with the atmosphere. These stigmata open into canals which lead into the two tracheae (or wind-pipes) that traverse the sides of the body and which are connected with each other by several tubes running across the body. From these tracheae branch off others, which with their subdivisions reach all parts of the system.". The National Encyclopœdia—Respiration.

(২) Reptiles are furnished with lungs that communicate with the mouth. They do not inhale the air, like animals, but swallow it. As they have but one heart, only part of the blood which circulates through the body becomes arterialized, hence their cold blood and the imperfect development of their vitality.

The National Encyclopœdia.

(৩) The air which enters by the trachea, not only passes into the lungs, but by means of the bronchial tubes passes into the air-cells disposed over various parts of the body, which communicate with the interior of the bones. * * * In principle they resemble the air-cells of insects, and undoubtedly serve the same purposes." The National Encyclopœdia.

বৎসর মাত্র আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পতঙ্গের পর মৎস্যসরীসৃপাদিকে অপেক্ষাকৃত বহুগুণ দীর্ঘায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মৎস্য ২০০।২৫০ বৎসরেরও অধিককাল পর্য্যন্ত বাঁচে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাদের তুলনায় স্তন্যপায়ীদিগের জীবন আরও সুদীর্ঘ দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তী ৩০০ বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচিয়াছে বলিয়া জানা যায়। মনুষ্যের জীবন এতদপেক্ষাও দীর্ঘতর ছিল বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বিবরণ দেখা যায়। নোয়া (Noah) সাড়ে নয় শত বৎসর জীবিত ছিলেন বাইবেলে এইরূপ উল্লেখ আছে। আমাদের পুরাণেও দ্বাপর যুগে মনুষ্যের সহস্র বৎসর পরমায়ুর উল্লেখ দেখা যায়। আধুনিক কালেও কাশীধামস্থিত আমাদের মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বয়স ৩০০ বৎসরের ঊর্দ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের পূর্ব্বের দীর্ঘ পরমায়ু বর্ত্তমানে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার ইহাই আমাদের নিকট স্বাভাবিক কারণ বলিয়া মনে হয় যে উচ্চ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য আয়ুঃক্ষয়কর নূতন নূতন বহু কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রাণিসাধারণ আহার-বিহার প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য মনুষ্যকে করিতে হইত এক্ষণে তাহাকে তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক কার্য্য করিতে হয়। অপর প্রাণীদিগের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক প্রাণ-শক্তি অর্জ্জনের দ্বারাই মনুষ্য পশু-সাধারণ ভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রকারেই শারীরিক, মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই মনুষ্য অপর প্রাণী সকল হইতে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানের এই বিশিষ্ট সভ্যভাব সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের জন্য মনুষ্যের যে শক্তি ব্যয়িত হওয়ার প্রয়োজন হয়—তাহাতে আয়ুঃক্ষয় অবশ্যম্ভাবীই হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে কার্য্যের মাত্রা বাড়িয়া আয়ুর মাত্রা কমিয়া গিয়াছে। তাহাতেই এক্ষণে সময়ের দ্বারা জীবনের বিচার না হইয়া কার্য্যের দ্বারা জীবনের বিচার হয়। ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য কবি বলিতেছেন :—

"In small proportions we just beauties see,
And in short measures life may perfect be."

B. Johnson.

যে সমস্ত পশু মনুষ্যের সভ্যজীবনের সহচর হইয়াছে—তাহাদিগের আয়ুও পূর্ব্বোক্ত সভ্যতার প্রভাবেই খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে।

কেবল কার্য্যের ভারই যে আয়ুঃক্ষয়ের কারণ তাহা নহে, কৃত্রিম জীবনও আয়ুঃ-ক্ষয়ের কারণ। মনুষ্যদিগকে যেমন বর্ত্তমানে বহু প্রকারে কৃত্রিম জীবন যাপন করিতে হয়—তাহাদিগের পালিত জন্তুদিগকেও তদ্রূপ কৃত্রিম জীবন যাপন করিতে হয়। এই কারণেই মনুষ্য জাতির আয়ুঃ-পরিমাণ যেমন হ্রাস পাইয়াছে—মনুষ্যজাতি-পালিত পশুজাতির আয়ুঃ-পরিমাণও তদনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও মনুষ্যের আয়ুঃপরিমাণই যে অধিক, নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদে তাহার প্রমাণ পাই।

"নরাগজা বিশেশয়। তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা। তার অর্দ্ধ বরা পাগলা॥"

"মানুষ ও হাতী একশত বিশ বৎসর বাঁচে। ঘোড়া তার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ষাট্ বৎসর বাঁচে। বলদ বাইশ বৎসর, ছাগল তের বৎসর ও শূকর তার অর্দ্ধেক বাঁচে।"

আমাদের শ্বাসযন্ত্রেই যে কেবল প্রাণবায়ু প্রবহমান হয় তাহা নহে, আমাদের নাড়ী নামক স্নায়ুজালের মধ্যেও প্রাণবায়ু প্রবহমান হইয়া থাকে। এই স্নায়ুজাল সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত থাকায় ইহাদের মধ্য দিয়া সর্ব্বদেহেই বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়। স্নায়ুসকল বায়ু হইতে যে পুষ্টি প্রাপ্ত হয় তাহাই আমাদিগের প্রাণশক্তিরূপে পরিণত হয়। তাহাতেই স্নায়ুশক্তি আমাদের প্রকৃত প্রাণশক্তি হইয়াছে। এই জন্যই স্নায়ুর শক্তি পরাহত হইলে আমাদের আর কোন কার্য্যই সম্ভবপর হয় না। বায়ু হইতে স্নায়ুশক্তি উদ্ভূত হয় বলিয়াই আমাদের ঋষিগণ বায়ুকে অন্তর্নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য যোগরূপ উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই যোগরূপ উপায়ে ঋষিগণ যে অলৌকিক শক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তাহাই "যোগবল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যোগবল এরূপ দিব্যপ্রাণশক্তি যে ইহার দ্বারা ঋষিগণ মৃত্যুজয়ী পর্য্যন্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

পূরক, কুম্ভক, রেচক প্রভৃতি শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া যোগেরই অঙ্গবিশেষ। যোগশাস্ত্রে ইহাদিগকে "প্রাণায়াম" নামে অভিহিত করা হয়। প্রাণের (জীবনের) আয়াম (দৈর্ঘ্য) সাধক বলিয়াই 'প্রাণায়াম' নাম হইয়াছে। জীবনের উপর ইহার প্রভাব শাস্ত্রে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে :—

সর্ব্বপাপহরং প্রোক্তং প্রাণায়ামং দ্বিজন্মনাম্।
ততস্ত্বভ্যধিকং নাস্তি তপঃ পরমপাবনম্ ॥
নিরোধাজ্জায়তে বায়ুস্তস্মাদগ্নিস্ততোজ্জলম্।
ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥
আকেশাদানখাগ্রাচ্চ তপস্তপ্যেৎ সুদারুণম্।
আত্মানং শোধয়েদ্‌যস্তু প্রাণায়ামৈঃ পুনঃপুনঃ ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত অগ্নিপুরাণম্ ॥

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে সম্প্রতি এই প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার উপকারিতা কেবল যে স্বীকৃত হইতেছে তাহা নহে, ইহার অনুশীলনও হইতেছে।

এই প্রকারে কেবল শ্বাসযন্ত্র নহে, স্নায়ু-মণ্ডলীও প্রাণশক্তির আধার হইয়াছে। মনুষ্যেই স্নায়ুর পরিণামের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাণশক্তির চরম বিকাশ যে মনুষ্যে হইয়াছে এতদ্দ্বারা আমরা তাহারই প্রমাণ পাইতেছি।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনাসকল হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মনুষ্য যোগাভ্যাসের দ্বারা অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া যেমন ঈশ্বরত্বের অধিকারী হইতে পারে—প্রাণায়াম-অনুশীলনের দ্বারা শ্বাসবায়ুকে আয়ত্ত করিয়া তেমনই আবার অমরত্বের অধিকারীও হইতে পারে। অতএব মনুষ্যে জীবনী-শক্তি যেমন শেষ-সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে—জীবিতকালও তেমনই শেষ-সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। এইরূপেই প্রাণ শক্তির বিকাশ মনুষ্য জাতিতে আসিয়াই বিশ্রান্ত হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অপরিমেয়

কত বেদনায়
প্রদোষ প্রবাল রূপ ম্লান হয়ে যায়
গৈরিকের করুণ আভায়,
কত অশ্রু শিশিরের অজস্র পতনে
গোধূলির স্বর্ণরাগ নিবে অযতনে,
অন্ধ-করা অন্ধকার চৌদিকে ঘনায়,
কত ধীরে কত বেদনায়!

কত করুণায়,
আঁধার ভেদিয়া ধীরে আকাশের গায়
গ্রহ-তারা ঘেরিয়া দাঁড়ায়,
ওঠে ছায়াপথ দূরে ছায়ার মাঝারে;
চন্দ্রালোকে চলে দৃষ্টি আঁধারের পারে,
কাতর কম্পিত প্রাণ ঊর্দ্ধপানে চায়
কার লাগি, কোন্ কামনায়?

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রোঁদার শিল্প-চাতুর্য্য

Paul Gsell নামে এক ভক্তকে রোঁদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাতির আলোয় তুমি কি কখন কোন প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিয়াছ?"

"না।"

"তবে, আমি তোমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিব। দিনের আলোতে ভাস্কর্য্য-কলার সম্পূর্ণতাটুকু বেশ ফুটিয়া ওঠে বটে, কিন্তু বাতির আলোয় তাতে এক নূতনতর শ্রী দেখা যায়।"

রোঁদার শিল্পশালায় বিখ্যাত Venus di Mediciর একটি নকল প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সেই মূর্ত্তির খুব কাছে একটা আলো ধরিয়া তিনি বলিলেন, "কি দেখিতেছ?"

সেই আলোকোজ্জ্বল মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া পল প্রথম দৃষ্টিতেই এক আকস্মিক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন।

আলোকপাতে মার্ব্বেলের উপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসংখ্য টোল ফুটিয়া উঠিল!—এমন যে হইতে পারে, পল তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

"মনোযোগের সহিত দেখ"—বলিয়া, রোঁদা আস্তে-আস্তে ভেনাসের মূর্ত্তিটি ঘুরাইয়া দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে এমন-যে বন্ধুরতা আছে, দিনের বেলাতেও তাহা নজরে পড়ে না। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা সহজ-সরল বলিয়া মনে হইতেছিল, এখন-যেন তাহারই মধ্যে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি হইল।

রোঁদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য নয়? ঐ দেখ উরুর সঙ্গে যেখানে দেহের যোগ হইয়াছে, ঐ নত জায়গাটি কি-রকম ঢেউ-খেলানো!......

নিতম্বের বঙ্কিম রেখাগুলি মানুষের মনে কত-না বাসনা জাগায়······আবার— এদিকে, কোমরের উপরের টোলগুলি— আহা, কি চমৎকার!”

ভক্তের উৎসাহে রোঁদা মৃদুস্বরে কথাগুলি বলিলেন,— মূর্ত্তির উপরে তিনি ঝুকিয়া ছিলেন—যেন তিনি তাহাকে প্রাণে-প্রাণে ভালবাসেন।

“এযে সত্যিকার রক্ত-মাংস! এ ত পাথর-দিয়া-গড়া নয়, চুম্বনে আদর-সোহাগে গড়া!—” প্রতিমার উপরে হঠাৎ হাত রাখিয়া রোঁদা বলিলেন, “এর গায়ে হাত দিতে গেলে মনে হয়—এ দেহেও যেন জীবনের উত্তাপ আছে!”

মেডিসি ভেনাস

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন;—

“শিল্প-বিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের মত-সম্বন্ধে এখন তোমার কি মনে হয়? তাঁরা বলেন, গ্রীক আর্টে রক্ত-মাংসকে পার্থিব বলিয়া ঘৃণা করা হইত—কারণ, প্রাচীন শিল্পীরা যখন আদর্শকে ফুটাইতে যাইতেন, তখন তাহার বাস্তবতার হাজার খুঁটিনাটি মানিতে চাহিতেন না!

প্রাচীন শিল্পীরা নাকি সরল, নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিকে শিক্ষা দিতেন—ইহাই এখন প্রমাণ করিতে চাওয়া হয়!—গ্রীকদের চিত্ত ছিল যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং, তাঁহারা যে প্রত্যেক পদার্থের সারাংশটুকু বাছিয়া লইতে পারিতেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহারা মানব-আদর্শের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণগুলিই গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু কখনও বাস্তবতার খুঁটিনাটিগুলি অবহেলা করিতেন না। —তাঁহারা কখনও মিথ্যা পদ্ধতির ধার ধারিতেন না। প্রকৃতিকে তাঁহারা সম্মান করিতেন—তাঁহাকে যেমন দেখিতেন, তেমনি দেখাইতেন। তাঁহাদের সকল কাজেই বাস্তবতার পূজা আছে। বাস্তবকে তাঁহারা দেখিতে পারিতেন না; এ-কথা মনে-করাও পাগলামি। এত স্নেহে, এত আদরে, এত আবেগে আর কোন দেশের লোক মানবের

দেহ-রূপ ফুটাইতে পারে নাই। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাই মিথ্যা—প্রাচীন গ্রীক আর্ট নয়।

লোকে মনে করে, ভাস্করের সঙ্গে বর্ণের কোন সংশ্রব নাই—বর্ণ হচ্ছে চিত্র-কলার নিজস্ব। এ ধারণা ভুল।"

একটি প্রাচীন মূর্ত্তির উপরে আলো তুলিয়া ধরিয়া রোঁদা বলিলেন, "মূর্ত্তির বুকের উপর কেমন উজ্জ্বল আলো ও দেহের ভাঁজে ভাঁজে কেমন গভীর ছায়া পড়িয়াছে দেখ! এখানে কি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মিলন-সাধন হয় নাই? শক্তিধর ভাস্কর হইতে গেলে চিত্রকরের মতই বর্ণজ্ঞান থাকা চাই। কারণ, প্রতিমার উপরে তাঁহাকে আলো-ছায়ার বর্ণলীলা ফুটাইতে হয়! বর্ণজ্ঞান না থাকিলে ভাল সজীব মূর্ত্তি গড়িতে পারা যায় না।"

লৌহযুগ

"লৌহযুগ" ও Saint-Jean-Baptiste নামে রোঁদার গঠিত দুটি মূর্ত্তি আছে।—মূর্ত্তিদুটি একেবারে জীবন্ত—দেখিলেই মনে হয়, তারা যেন নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতেছে!

Paul Gsell-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে রোঁদা বলিলেন, "হ্যাঁ, এই মূর্ত্তি-দুটিতে আর্টের অনুকরণ-শক্তির বিকাশ যে কতটা হইতে পারে, আমি তাহাই বিশেষরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি; অবশ্য, আমার এমন মূর্ত্তি আরও অনেক আছে, যাদের মধ্যে সজীবতার অভাব দেখা যায় না। যেমন "ক্যালের নাগরিকগণ," "ব্যালয্যাক্" ও "চলন্ত মানুষ" প্রভৃতি।

এমন-কি, আমার গড়া যে-সব মূর্ত্তিতে ক্রিয়ার আভাস অল্প, তাহাদের ভিতরেও আমি কিছু-কিছু গতির সূচনা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। একেবারে-অচল মূর্ত্তি আমি বড়-একটা গড়ি নাই।

জীবনের অভাবে আর্ট কি বাঁচিতে পারে? ভাস্কর যদি আমাদের কাছে সুখ ও দুঃখ বা অন্য-কোন বৃত্তির বিকাশ দেখাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবন্ত মূর্ত্তি গড়িতেই হইবে—তবেই আমাদের প্রাণে ভাবের প্রেরণা আসিবে। নহিলে, একখণ্ড জড় প্রস্তরের সুখ-দুঃখে কিসের জন্য আমরা বিচলিত হইব? ভাল গঠন-ক্ষমতা ও গতির লীলাই হচ্ছে ভাস্কর্য্যের প্রাণ।"

Paul Gsell বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার 'লৌহ-যুগের' মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, সে-যেন জাগিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে হাত তুলিতেছে; আপনার "সেণ্টজনে"র মূর্ত্তি যেন বিশ্বে সত্যপ্রচারের জন্য পাদপীঠ

তখন আমিও যত-দূর পারি বুঝাইয়া, মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিব!

সর্ব্বপ্রথমে একটা কথা বুঝিতে হইবে। গতি হচ্ছে, এক ভঙ্গী হইতে অন্য ভঙ্গীতে পরিবর্ত্তন।

এই সাদাসিধা কথাটি সমস্ত গুপ্তরহস্যের মূল।

শিল্পী এই ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন দেখান। তাঁহার কার্য্যে এর-আগে প্রথম কি ভঙ্গী ছিল, সেটির কতক-কতক দেখি এবং এর-পরে কি হইবে তারও কতকটা দেখিতে পাই। একটা দৃষ্টান্ত দি।

'মার্শাল নে'র মূর্ত্তির কাছ-দিয়া এবার তুমি যখন যাইবে, বিশেষরূপে মূর্ত্তিটিকে লক্ষ্য

চলন্ত মানুষ

হইতে নামিতে উদ্যত! জড়ের মধ্যে এমন গতির সূচনা দেখিলে বোধ হয় শিল্প-বিজ্ঞানে বুঝি কোন যাদু আছে! আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ওস্তাদ-শিল্পীদের কার্য্যও আমি দেখিয়াছি। যেমন Rudeএর গঠিত Maréchal Ney ও Marseillaise। আচ্ছা, কি-করিয়া এমন আশ্চর্য্য সম্ভব হয়—অচলকে কোন্ মন্ত্রে সচলের মত দেখানো যায়?"

রোঁদা উত্তর দিলেন, "অচলকে সচল করার চেয়ে এ-সব কথা বুঝাইয়া দেওয়া ঢের-বেশী শক্ত। তবে তুমি যখন আমাকে একেবারেই যাদুকর ঠাওরাইয়া বসিলে,

করিও। দেখিবে, মূর্ত্তির যে হাত তরোয়ালের খাপ্ ধরিয়া আছে, সেই হাতখানি ও পা-দুটি ঠিক তখনকার ভঙ্গীতে আছে—যখন তিনি অসি কোষমুক্ত করিয়াছিলেন। তারপর দেহ। তরবারি খুলিবার সময়ে মূর্ত্তির দেহ নিশ্চয়ই বামদিকে একটু হেলিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে ভঙ্গী বদ্লাইয়া দেহ এখন সরল,—বক্ষ উন্নত, এবং মস্তক সৈন্যদলের দিকে ফিরিতেছে—আক্রমণের আদেশ দিবার জন্য; উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত দক্ষিণ হস্ত তরবারি ঘুরাইতেছে।

এখন, ভাবিয়া দেখ। এই মূর্ত্তিতে যে গতি আছে, তাহা এর-আগে যে ভঙ্গী

সেনাপতি নে

উঠিতেছে, মুখ আকাশের দিকে ফিরানো, হাতদুটি নিদ্রার আলস্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রসারিত। এই মূর্ত্তিতে সুপ্তি হইতে জাগরণের ভাবটি বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায়।

"লৌহযুগে" জাগরণের মাধুর্য্যটুকু তখনই স্পষ্ট হইয়া উঠে, যখন ইহার ভিতরের গুপ্ত অর্থটি বুঝিতে পারা যায়। এই পিত্তল-মূর্ত্তির আসল ভাব কি? প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবের বিবেক যখন সবে পরিস্ফুট হইতেছে, তখন পাশবতা ও জড়তার পরাজয় এবং বিচার-শক্তি ও জ্ঞানের জয়-ঘোষণাই "লৌহযুগে" নিপুণভাবে দেখান হইয়াছে।

রোঁদা বলিতেছেন, "যদি চলন্ত

ছিল, সেই প্রথম ভঙ্গীরই পরিবর্ত্তনমাত্র! প্রথম ভঙ্গী কি? না, সেনাপতি যখন অসি কোষমুক্ত করিয়াছিলেন; আর, দ্বিতীয় ভঙ্গী তখনকার—যখন তিনি উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হস্তে বিপক্ষের দিকে বেগে ধাবমান।"

রোঁদার "লৌহযুগ" নামক মূর্ত্তিতেও পাথরে গতি ফুটাইবার এই কৌশল দেখা যায়। যুবকের পদদ্বয় যেন এখনও অর্দ্ধসুপ্ত শিথিল ও কম্পমান; কিন্তু মূর্ত্তিটির দেহের উপরদিকে যতই চাওয়া যাইবে, মনে হইবে, তাহার ভঙ্গী যেন ক্রমেই দৃঢ় ও স্থির হইয়া আসিতেছে! তাহার পার্শ্বাস্থিগুলি চামড়া ঠেলিয়া উঠিতেছে, বুক ফুলিয়া

সেণ্ট জন

মানুষের ফটো তোলা যায়, তবে মনে হইবে, তাহা যেন অচল। আমার "সেণ্টজনে"র মূর্ত্তি দুই পা-ই মাটির উপরে রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক এম্‌নি ভঙ্গীতে কোন লোকের ফটো তুলিলে দেখা যাইত, "সেণ্টজনে"র মত তাহার উভয় চরণই এমন সম্পূর্ণভাবে ভূমিসংলগ্ন নাই। হয় সেই মূর্ত্তির পিছনের পা-টি, মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া সামনের পায়ের দিকে আসিতে থাকিত, নয় তাহার পিছনের পা মাটিতে ও সামনের পা উঠানো থাকিত।

এই কারণেই ফটোগ্রাফে কোন চলন্ত লোককে দেখিলে মনে হয়, সে-যেন হঠাৎ পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির ঠিক্‌ঠাক্ নকল করিয়াও ফটোগ্রাফে এখানে সত্য নাই এবং জীবন ফুটাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শিল্পী এখানে বিজ্ঞানকে হারাইয়া দিয়াছেন।"

* * * *

Paul Gsell রেঁাদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, প্রাচীন ভাস্কর্য্যে রমণী-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনার কি মনে হয় না যে, একালের মেয়েরা সেকালের তুলনায় রূপহীন হইয়া পড়িয়াছেন?"

"না।"

"কিন্তু গ্রীক ভাস্করের গড়া "ভেনাসে"র মূর্ত্তিগুলি কি-রকম নিখুঁত—"

"হ্যাঁ, সেকালের শিল্পীদের আসল চোখ ছিল, আর একালের শিল্পীরা অন্ধ। গ্রীক রমণীরা রূপবতী বটে কিন্তু সে রূপের যথার্থ প্রকাশ ছিল ভাস্করদের প্রাণে—যাঁহারা তাহাদের মূর্ত্তি গড়িতেন।

ঠিক গ্রীক ভাস্করের প্রতিমার মত রূপবতী রমণীর অভাব একালেও নাই।

অঙ্গহীন রমণী-মূর্ত্তি

সত্য বলিতে-কি—পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই এক-একরূপ নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। প্যারিতে একবার কাম্বোডিয়া হইতে একদল নর্ত্তকী আসিয়াছিল,—অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমি তাহাদের মূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম—তাহাদের ছোট ছোট দেহের বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গীতে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ছিল। জাপানী অভিনেত্রী হানাকোর মূর্ত্তিকেও আদর্শ রাখিয়া আমি কাজ করিয়াছি। এই প্রাচ্য রূপসীর সঙ্গে প্রতীচ্য রূপসীর কিছুই মেলে না বটে,—কিন্তু আপনার অসাধারণ সবল সৌন্দর্য্যে এই জাপানী অভিনেত্রী কি সুন্দরী!

কথা কি জান,—সৌন্দর্য্য আছে সর্ব্বত্র। রূপের অভাব বলিয়াই যে আমাদের চোখে রূপসীর চেহারা পড়ে না—তাহা নয়; আমাদের চোখই আসল রূপ দেখিতে জানে

না। সৌন্দর্য্যই হচ্ছে স্বভাব। প্রকৃতিতে, মানব-দেহে যতটা স্বভাব আছে, এমন আর কিছুতে নয়। শক্তি-সৌন্দর্য্যে রমণী-তনু

অঙ্গহীন রমণী-মূর্ত্তি

কত সময় কত রকমের ছবির আভাস দেয়। কখনও তাহা ফুলের মত;—আনত দেহ যেন বৃন্ত, পীবর বক্ষ, মস্তক ও সমুজ্জ্বল কেশমালা যেন বিকসিত দল। কখনও তাহা নমনীয় লতার মত এবং কখনও-বা সরল-সতেজ চারাগাছের মত। রমণীর দেহ যখন পিছনের দিকে নুইয়া পড়ে, তখন তাহা ধনুকের মত,—যে ধনুকে মদন তাঁহার অদৃশ্য শর যোজনা করেন।

মানবের দেহ হচ্ছে, আত্মার দর্পণ এবং আসল সৌন্দর্য্যের বিকাশ সেই আত্মা হইতেই। নর-দেহের ভিতরে যে রূপের প্রদীপ জ্বলে, বাহিরের আকৃতিগত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আমরা তাহারই বেশী আদর করি,—কারণ সেই অন্তর্গূঢ় প্রদীপের শিখাতেই মানুষের সমস্ত দেহ সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভালো-মন্দ

বৈশাখের ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ "এখন ও তখন" প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই উপদেশটি অমূল্য—সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়ো না, কাহারো হিংসা করিয়ো না, কাহাকেও গালি দিয়ো না প্রভৃতি নিষেধসূচক বিধানগুলি কেহ যদি সমর্থন করেন ত তাঁর মুখের-উপর কিছু বলা চলে না। কারণ সেগুলিকে মানিয়া [illegible] মানব-সভ্যতার অঙ্গ হইয়া গেছে। তাহা পালন করিতে পারি আর না-পারি, তার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে আমাদের আত্মমর্য্যাদায় বাধে। কিন্তু এমনিতর কথাতেই আমাদের কেহ-কেহ দেখিতেছি মুখ বাঁকাইতেছেন।

* *
*

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—বাংলা সাহিত্যকে পাকা-বয়সের সাহিত্য বলা যায় না, এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে; ইহার জন্য চাই স্নেহ।

রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি ঠিক যেন শিশুর উপর মা-বাপের দরদের কথা। তাঁর অন্তরে বাংলা সাহিত্য-শিশুর প্রতি মঙ্গল-কামনার ব্যথা আছে বলিয়াই তাঁর মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইয়াছে।— তাঁর যে নাড়ির টান আছে! বাংলা সাহিত্যের সেবায় তিনি যে অকাতরে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা ত জাজ্বল্যমান। উহার প্রতি তাঁর স্নেহ স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া এই স্নেহকে তিনি ছোটো করিয়া দেখেন নাই—তিনি যে স্নেহের কথা বলিয়াছেন তাহা আস্কারা-দিয়া মাথায় তোলা নহে। তিনি বলেন—"স্নেহের লক্ষণ এই যে, তাহা বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণতাকে বড় করে না, তাহা ভবিষ্যতের আশার প্রতিই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে।"

এই স্নেহ না থাকিলে কোনো জিনিষকে ছোটো হইতে বড় করিয়া তোলা যায় না।

* *
*

এখন কথা উঠিয়াছে বাংলা সাহিত্যকে কি সত্য-সত্য শিশু বলা যায়? লোকে সন্দেহ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের কথা ঠিক নহে—তিনি বুড়ো-ধাড়ি ছেলেকে আদর দিয়া তার মাথা খাইতে চান।

যাঁরা এরূপ বলিতেছেন তাঁদের যুক্তির প্রধান কথা এই যে, বাংলা সাহিত্যের জন্ম অনেক দিন হইয়াছে। কিন্তু দিন গণিয়া কি সাহিত্যের পরিণতি সাব্যস্ত করা যায়? মানুষেরই যায় না তা সাহিত্য তো দূরের কথা। চল্‌তি-কথায় শোনা যায় কোনো কোনো বংশের লোক আশি-বছরে সাবালক হয়। সেটা একেবারে মিছা কথা নয়। অনেক মানুষের বয়স আশি হইয়াছে দেখা যায়; -তার চুল পাকিয়াছে, হাড় পাকিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নাই;—আট বছরে যেমন ছিল—আশি বছরেও তেমন আছে। তেমন লোককে বলিতে হয় বয়স হয় নাই। সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে;—শুধু বছর গণিয়া তার পরিণতি নির্ণয় করা চলে না; পরিণতির যে রূপ আছে তাহা সে লাভ করিয়াছে কি না বিচার করিতে হয়।

* *
*

বাংলা সাহিত্যের পরিণতির রূপ কোথায় সে বৈচিত্র্য কোথায়? নানা শাখা[illegible] হইয়া দেশের আকাশকে তো [illegible] সে আচ্ছন্ন করে নাই। ইহার [illegible] তো পরি[illegible]ষ্ট ও পরিস্ফুট হয় নাই—অধিকাংশ ডালপালা এই সবেমাত্র বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ঘনপল্লবচ্ছায়ে দেশের সকল বিহঙ্গরাজ তো এখনও নীড় বাঁধিতে আসেন নাই। মহা মহীরুহে পরিণত হইবার এখনও এর অনেক বিলম্ব।

দুই-একজন মহাপুরুষের শক্তিতে ইহার এক-এক-জায়গাকার ঝাড় যেন যাদুমন্ত্রে হঠাৎ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেছে, তাহাতে দেশবিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু অনেক অংশ যে এখনও কচি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে চোখের সামনে ধরিলে ইহার যে রূপ বাহির হইয়া পড়ে তাহা যে পরিণতির রূপ নয় বেশ বোঝা যায়।

মাসে মাসে যে রাশি-রাশি প্রবন্ধ, ঝুড়ি-ঝুড়ি বই বাহির হইতেছে তার অধিকাংশ কি? যাঁরা পাকা সাহিত্যের রস গ্রহণ করিয়া সে রসে রসিয়াছেন তাঁদের হাতে এ-সমস্ত রচনা ধরিয়া দিলে তাঁরা বলেন, এ ছেলেখেলা! সাহিত্যে কোনো কথা বলিতে তো আমাদের আটকায় না, কেমন করিয়া বলিতেছি তার দিকেও লক্ষ্য নাই;—কথা ফুটিয়াছে সেই আনন্দে কথা কহিয়া চলি। ইহাই তো ছেলেমানুষীর লক্ষণ। এই প্রগল্‌ভতা বয়স হইলে তবে কাটে।

* *
*

সব-দেশেই সাহিত্যের নানা স্তর থাকে,—সব রচনাই যে প্রথম-শ্রেণীর হয় তাহা নহে। কিন্তু সাহিত্য যেখানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেখানে এক-জায়গায় এমন-একটা বাঁধ থাকে যার নীচে সে আর গড়াইয়া পড়ে না—অর্থাৎ তার একটা standard থাকে। কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যে কি অমনিতর একটা বাঁধের চেহারা কোথাও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে? আমাদের সাহিত্য, খুব চিন্তাশীল প্রবন্ধ হইতে স্কুলের ভাষা-শিক্ষানবীশের রচনা পর্য্যন্ত গোগ্রাসে গিলিতেছে।

মাসিক-সাহিত্য যদি খুলিয়া দেখা যায় তবে কি চোখে পড়ে? নিজের মনের মূল হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে, নিজের স্বার্থকতার তাগিদে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এমনতর রচনা কয়টা দেখিতে পাই? অধিকাংশই ত ধার-করা মাল। তাও আবার ছেঁড়া বস্তা, ভাঙা ঝাঁকাতে বোঝাই করিয়া বাজারে পাঠাই। কোনো-খান থেকে একটা নূতন কথা শুনিলে সেইটা মহা উৎসাহের সহিত অনবরত আবৃত্তি করিতে থাকি।

এ সবই অপরিণতির লক্ষণ;—ছেলে-মানুষের চঞ্চলতা। কিন্তু এরও একটা দরকার আছে। এই রকম স্বাভাবিকতার পথ দিয়াই পরিণতি আসে।

শিশু অস্ফুট ভাষায় কথা বলে, সে আবোল-তাবোল বকে; সে-সব কথা প্রবীণের কাছে নিরর্থক বলিয়া তাকে যদি দাব্‌ড়ি দিয়া ক্রমাগতই থামাইয়া দেওয়া যায় এবং সে যদি তা শোনে, তাহা হইলে চাই-কি সে-শিশু খুব গম্ভীর হইয়া উঠিতে পারে;—দেখিলে মনে হইবে ঠিক যেন প্রবীণ, কিন্তু তেমন প্রবীণকে লইয়া কি মানুষের সমাজ টিঁকিবে?

আমাদের সাহিত্যে ঐরূপ শিশু-প্রবীণ তৈরি হইয়াছে; তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যকে আমরা হয় ত বাহবা দিতেছি কিন্তু বিশ্বের প্রবীণ সভায় তাঁহাদের অবস্থাটা কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়।

শিশুকে আচ্ছা-করিয়া কাণ-মলা দিয়া তার সব বক্‌বকানি থামাইয়া দেওয়া যায়—সে জোর প্রবীণের হাতে আছে। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার কি শিশুর কান-মলিয়া বেড়ানো? কোনো প্রবীণ যদি ছেলের প্রগল্‌ভতার জন্য তার কান মলিয়া-মলিয়া তাকে বোবা করিয়া তোলেন তাহা হইলে সে প্রবীণের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ছোট ছেলের

কান মলিতে পারি বলিয়াই তার কান মলা যে মস্ত একটা বাহাদুরি এই বর্ব্বরতা আমাদের মনে যেন না থাকে।"

* *
*

শিশুকেও শ্রদ্ধা করিতে হয়—শ্রদ্ধার রসে মানুষ হইলে তবে সে শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিতে পারে। গোড়া-থেকেই তাকে যদি অবহেলা কর—তার কোনো মূল্য দেখিতে না পাও তবে তার জীবনের যে কোনো মূল্য আছে তা প্রমাণ করিবার সে অবসরই পাইবে না। মহৎকে মানুষ শ্রদ্ধা করে; কিন্তু সেই মহৎ সৃষ্টি হয় মহত্ত্বের সম্ভাবনাকে শ্রদ্ধা করিয়া।

রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদের সাহিত্য-শিশুটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিবার উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"যে শক্তি আমাদের মাতৃ-ভূমির কোলের শিশু, যাহা তাঁহাকে একদিন বিশ্বসভায় রাজমুকুট পরাইবে, তাহাকে অনেক যত্নে, অনেক স্নেহে সমস্ত আঘাত বাঁচাইয়া মানুষ করিতে হইবে,—সমস্ত অপরিণতি সত্ত্বেও তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই।"

*
* *

এখন কথা উঠিতে পারে, তবে কি এমনি করিয়া বাংলা সাহিত্যটা কেবলই শিশুর কলরোলে ভরিতে থাকিবে?

শিশুর অসম্বদ্ধ কথা চিরস্থায়ী হয় না। সে-কলরোল ভাষার স্রোতকে ডাকিয়া আনে। সেটা একটা পথ মাত্র—তাহা চরম নহে। সমস্ত বিশ্ব-জুড়িয়া কত-কোটী শিশু যে কলরোল করিতেছে তার ঠিক নাই, তাই বলিয়া বিশ্বের ভাষা যে অসম্বদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে তাহা ত নহে।

আর তাছাড়া আমাদের সাহিত্যে কোন্‌গুলা আসল জিনিস, কোন্‌গুলা ঝুটা তাহা বুঝিবার মতো বেশি সমঝদারের অভাব দেখা যাইতেছে। সমঝদারদের মধ্যেও শিশু-প্রকৃতির অসদ্ভাব নাই—তাঁহাদের যে সমালোচনা তার মধ্যেও ছেলেমানুষী চূড়ান্ত আছে। এ-সব সমালোচনায় কাজ কিছু হয় না—হট্টগোল বাড়ে মাত্র। সমালোচক-নাম গ্রহণ করিলেই যে বিজ্ঞতা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া যায় এমন নহে। সমালোচনার শক্তিও সাহিত্যের মতো পুষ্ট হইবার অপেক্ষা রাখে।

* *
*

বঙ্গসাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষীরা চীৎকার করিয়া উঠিবেন "যেটা মন্দ সেটাকে মন্দ বলিব না!"

মন্দকে গাল-পাড়িয়া হয়ত তার মুখ-বন্ধ করিতে পার কিন্তু তাতেই যে ভালো আবির্ভূত হইবেন এমন কোনো কথা নাই। মন্দটা না থাকিলেই যে ভালো থাকে এমন নয়;—ভালোকে উপার্জ্জন করিতে হয়। মন্দকে যদি দেখাইবার দরকার থাকে তবে তার সত্য-রূপ প্রকাশ করিয়া দাও। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ভালোর গুণগান-দ্বারাই আমরা মন্দকে সত্যরূপে দেখিতে পাই।"

মানুষের মধ্যে ভালোকে জাগাইয়া তোলাই আসল কাজ, কারণ সেটা একটা

পাওয়া—একটা positive জিনিষ; মন্দটা ছাড়ার দিক—সেটা negative। সাহিত্যের কারবার এই positiveকে লইয়া। তারই সাধনা দরকার। আমাদের সত্যকার সাহিত্য-হিতৈষীর কাজ সেই সাধনার পথে বাতি ধরা—চোখের সামনে ভালোর আদর্শ মূর্ত্তিকে দেখাইয়া দেওয়া। কাঁচা সাহিত্যে ভালোর প্রতিষ্ঠা করার এই উপায়।

পদ্মের পাপড়ি

উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে

যখন বিবেচনা করি যে, এ প্রদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা আসিয়া কি বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, যখন বিবেচনা করি যে ইউঁরোপীয়দিগের গুণসকল আমাদিগের দ্বারা অনুকৃত না হইয়া দোষসকল অনুকৃত হইতেছে এবং যে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহ-প্রণালী ইংলণ্ডের উপযুক্ত, এদেশে তাহা আরোপিত হইয়া কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে, যৎকালে নিদাঘ-তাপের আতিশয্যে সমস্ত প্রকৃতি অবসন্ন, সমস্ত প্রাণী আকুল, মনুষ্যেরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন কোন ইঙ্গ-বঙ্গ ইংরাজী-পরিচ্ছদ আঁটিয়া কষ্টেসৃষ্টে সঞ্চরণ করিতেছেন, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখন মনে হয় যে উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্যই এরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে আমাদের দেশের ইংরাজী-নবিশেরা আমাদিগের জাতির যেন কোন সুখাদ্য নাই এই জন্য ইংরাজী অৰ্দ্ধপক্ক আমপ্রায় মাংস ও "সজীব" পণির ভক্ষণে রত হইতেছে, যখন দেখি যে লোকে খানা খাইয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টায় কপট ব্যবহার করিতেছে, যখন দেখি বাঙ্গালী, হোটেলে আহার করিয়া হোটেলস্থ ইংরাজ অভ্যাগতদিগের হাস্যাস্পদ হইতেছে, যখন দেখি যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজী প্রণালী-অনুসারে আহারে বসিয়া ইংরাজী শিষ্টাচারের কতই নিয়মভঙ্গ করিয়া থাকে, যখন দেখি যে, যাহাদিগের পেটে ইংরাজী A অক্ষর নাই, তাহারা তাহাদিগের অজ্ঞাত ইংরাজী আহার-দ্রব্য অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া "এটা দেও ওটা দেও" বলে, যখন দেখি যে, তাহারা ইংরাজী শব্দ good health অজ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত good hell বলিয়া মদ্যপান করে, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে, লোকে স্বদেশীয় ভাষা অপেক্ষা বিদেশীয় ভাষা অনুশীলনের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করিতেছে, ঐ

ভাষা আয়ত্ত করিবার মানসে অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিতেছে, তথাপি প্রকৃতরূপে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না; যখন দেখি যে, বাঙ্গালী ইংরাজের মত ইংরাজী লিখিতে ও কহিতে পারগ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় কি কষ্ট না পাইতেছে; যখন দেখি যে, বিদেশীয় ভাষার কোন শব্দ-উচ্চারণে অশুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত হইলে যেন কত অপকর্ম্ম করিয়াছে মনে করিয়া লোকে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়; অথচ বাঙ্গালায় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা শ্লাঘার বিষয় মনে করে; যখন দেখি যে, লোকে ইংরাজী ভাষায় অসংখ্য ভুল করিয়াও তাহাতে সামান্য পত্র লিখিবে তথাচ দেশীয় ভাষায় উহা লিখিবে না; যখন দেখি যে, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সঙ্গে দশটা ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা কহেন, যখন শুনি যে, তাঁহারা আপনাদিগের ছাত্রকে বাঙ্গালায় দরজা দিতে না বলিয়া ইংরাজীতে 'give the door' বলেন; যখন বিবেচনা করি যে, এ-বিড়ম্বনার কারণ কি; তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি, সন্তানদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিখাইবার জন্য লোকে অতিশয় আগ্রহ-বিশিষ্ট, ও তাহাদিগকে তৎপাঠে প্রবৃত্ত করাইয়া এত পরিশ্রম করাইতেছে যে, তাহাদিগের আর আহারের অবকাশ নাই, শারীরিক স্বাস্থ্য ও উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ নাই; যখন দেখি, বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য কলেজের ছাত্রেরা এত পরিশ্রম কবিতেছে যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের দৃষ্টি ক্ষীণ হইতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, তথাপি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না ও নিবৃত্ত হইলেও চলে না; যখন বিবেচনা করি এ বিপদের কারণ কি, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন স্মরণ করি যে, সেকালের লোক অল্প অর্থে কিরূপ প্রফুল্লচিত্তে কাল কাটাইতেন, যখন বিবেচনা করি যে, এক্ষণে আমাদিগের অবাস্তব অভাব ও প্রয়োজন কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যখন বিবেচনা করি যে, জিনিষ-পত্র ক্রমে কিরূপ মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে, যখন দেখি যে, উপজীবিকার উদ্বেগে লোকের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, ও ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবনায় আকুল হইতেছে, যখন বিবেচনা করি যে, আমরা ত একরূপে কাটাইলাম, ছেলে-পুলের দশা ইহার পর কি হইবে, যখন বিবেচনা করি যে, এ মহান বিপদের কারণ কি, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা হতভাগ্য বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এরূপ হইতেছে।

উদো যদি চেষ্টা করে বুদোর বোঝা কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিতে পারে কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নাই। বরং তাহাকে সেই বোঝা আহ্লাদপূর্ব্বক বহন করাইতে ইচ্ছুক দেখা যায়। বুদো চেষ্টা করিলে অনুকরণের স্রোত অনেক পরিমাণে রোধ করিয়া সমাজের সারবত্তা ও নিজের কুশল রক্ষা করিতে পারে কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নাই। উদোর ন্যায় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও

সাহস-সম্পন্ন হইলে এবং তাহাদিগের ন্যায় দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিলে উদোর যে বোঝা বুদোর ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহা অনেক লাঘব হইতে পারে, কিন্তু সেদিকে বুদোর মনোযোগ নাই। এইজন্যই দেশ ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে।

বঃ—

কাব্য ও দুর্নীতি

একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা দুর্নীতির উত্তেজক বলিয়া কাব্যের প্রতি দোষ আরোপণ করেন। তাঁহারা বলেন কাব্যের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, উহার দ্বারা যে ফল হয় তাহা নীতি-বিরুদ্ধ। এ মতটি ইয়ুরোপে সময় সময় মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। St Augustine বলেন, কাব্যে অনেক কল্পনা-প্রসূত মিথ্যা কথা আছে, সুতরাং উহা মিথ্যার আদিপুরুষ সয়তানের মদিরাস্বরূপ। এ যুক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, তবে এ কথাটা অরিজেনের মুখ-নিঃসৃত হইলে আরো ভাল হইত। কাব্য-জাত মিথ্যা মনের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে কিন্তু তাহাতে মনের উর্ব্বরতার অনেক বৃদ্ধি হয়।

অপর একশ্রেণীর নীতিবেত্তারা অন্য কারণে কাব্যের নীতি-বিরোধ প্রমাণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, কাব্যের দ্বারা মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া কার্য্য-কারিতার দিকে উন্মুখ হইয়া উঠে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন কার্য্যেই তাহার পরিসমাপ্তি হয় না। এইরূপে উত্তেজিত মনোবৃত্তি উপযুক্ত উদ্‌ঘাপনে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে নিজের কার্য্যকারিতা হারায়। তখন তাহার ফল হয় এই যে বাস্তব কোন ব্যবহার কিম্বা ঘটনাতেও মনোবৃত্তি আর তাহার নিয়োজিত কার্য্য করিতে চাহে না। একটা অন্যায় আচরণ দেখিলে আর আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয় না এবং ক্রোধ তাহার নিয়োজিত কার্য্য করে না, অর্থাৎ অন্যায়াচারীকে শাস্তি দেয় না। কাব্যে কোন একটা অন্যায় আচরণ দেখিলে আমাদের ক্রোধ হয় বটে কিন্তু তাহাতে অন্যায়াচারীর শাস্তি হয় না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে এমন হইয়া পড়ে যে বাস্তব জীবনে অন্যায়াচরণ দেখিলে আমাদের ক্রোধ আর উত্তেজিত হয় না; আমরা অবিবাদে একজনের উপর অত্যাচার দেখিয়া অত্যাচারীর অপ্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করি। এরূপ ফল উৎপন্ন করিলে কাব্য যে নীতি-বিরোধী সে বিষয়ে আর বিসম্বাদ থাকে না।

সম্প্রতি একটি বাঙ্গালা পুস্তকে দেখিলাম পেলির এই মতটি বিয়োগান্ত কাব্যের সম্বন্ধে খাটান হইয়াছে। বলা বাহুল্য উক্ত মত কেবলমাত্র যে বিয়োগান্ত কাব্য সম্বন্ধেই খাটে এমন নহে, মিলনান্ত কাব্যেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। মনে কর, আমরা

কাব্যে পড়িলাম যে, এক ব্যক্তি আপনার প্রাণ-সঙ্কটেও আমাদের মমতাভাজন এক পাত্রের উপকার করিল, তাহাতে তাহার প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয়, তাহা আমাদের প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এইরূপ অনেকবার হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে, বাস্তব জীবনের উপকার পাইলেও আমাদের কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে না। এককথায় সাধারণতঃ সকল কাব্যের প্রতিই এই দোষ অর্পিত হইতে পারে। একজন সমালোচক এই পুস্তকের সমালোচনায় উক্ত মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, পাকা ভিত্তির উপর মিথ্যা দাঁড়াইয়া এবং কাঁচা ভিত্তির উপর সত্য দাঁড়াইয়া,—উপস্থিত মত ও তাহার সমালোচনাই তাহার এক প্রমাণ। সুতরাং এ বিষয়ে দুইএকটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

কাব্যে বর্ণিত ঘটনা গল্পমাত্র এই জ্ঞানের উপরেই আমাদের কাব্য-রসাস্বাদিনী শক্তি নির্ভর করে; যে ঘটনা আমরা বাস্তব জীবনে দেখিলে শোকে অভিভূত হই, কাব্যে তাহাই পড়িয়া আমরা সুখ উপভোগ করি। দুঃস্বপ্ন দেখিবার সময় যদি আমাদের মনে হয় যে ইহা কেবল স্বপ্নমাত্র তাহা হইলে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না বরঞ্চ অনেক সময় ভাল লাগে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাস্তব জীবনে যে পরিমাণে আমাদের মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয় কাব্যে ততদূর হয় না; সুতরাং কাব্যপাঠে আমাদের মনোবৃত্তি উত্তেজনামান যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে না। যদি উঠিত তবে দুঃখময় কাব্য পাঠ কখনই সুখকর হইত না; বরং তাহা যন্ত্রণার নিদান হইয়া উঠিত। এরূপ অবস্থায় কাব্যালোচনায় মনোবৃত্তির কার্য্যকালে অকর্ম্মণ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি কাব্যালোচনায় কতক পরিমাণে উত্তেজিত মনোবৃত্তিকে বশীকরণ শিক্ষা পাই তাহা হইলে কাব্য আমাদের উপকারী ব্যতীত অপকারী নহে। সকল সময় মনোবৃত্তি কার্য্যে পরিণত হওয়া, অসভ্য অবস্থায় যাহাহউক, বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থায় অপ্রার্থিত। যদি মনোবৃত্তি বশীকরণ পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদের মতে দুর্নীতি হয় তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষ পড়ে বর্ত্তমান সভ্যতার ঘাড়ে। যদি কাব্য পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদিগের মতানুসারে মনোবৃত্তির উপর কার্য্য করে, তাহা হইলে কাব্য যে শুধু নীতি-গর্হিত ফল উৎপন্ন করে এরূপ নহে। তাহা হইলে অনায়াসেই কাব্যকে নীতি-সংরক্ষণ কার্য্যেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। একটি সুন্দরী কুলরমণীকে দেখিবামাত্র মনে কুচিন্তাকে স্থান দেওয়া একটা নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নীতিবেত্তাদের মতানুসারে ঐরূপ কুচিন্তা উদ্রেকোপযোগী কাব্য পাঠ করিলে ক্রমশ ওরূপ অবস্থায় আর কুচিন্তা উদিত হইবে না। সুতরাং কাব্যের দ্বারা যদি ভাল মনোবৃত্তি ক্রমে ভোঁতা হইয়া যায় তবে কাব্যের দ্বারা মন্দ মনোবৃত্তিরও ক্রমে ক্রমে বিষদাঁত ভাঙ্গা যাইতে পারে।

আসল কথাটা এই, অন্যান্য চারুশিল্পের

ন্যায় কাব্য একটী চিত্তোতোষিণী বিদ্যা। ইহা মূলতঃ নীতিরক্ষকও নহে নীতিভক্ষকও নহে। তবে পৃথিবীর অপর সকল বিষয়ের ন্যায় ইহা দুর্নীতও হইতে পারে সুনীতও হইতে পারে। কিন্তু এটা বিশেষরূপ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কাব্যের উদ্দেশ্য সুরুচি ও সুপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের আমোদ দেওয়া; যে কাব্য আমোদ না দিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করে তাহা অপর বিষয়ে খুব উৎকৃষ্ট হইলেও কাব্যাংশে নিকৃষ্ট।

একখানি কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ দুর্নীতি। একখানি কাব্যের যত অধিক সংখ্যক লোকের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হওয়া সম্ভব ও তাহার যেরূপ দীর্ঘজীবন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহাতে দুর্নীত কাব্য হইতে ভয়ানক অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। দুর্নীতি দুই কারণে দূষনীয়। প্রথমতঃ দুর্নীতির কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ পক্ষে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয় আর দ্বিতীয়তঃ, দুর্নীত কার্য্যে অন্য লোককে আকৃষ্ট করিয়া সমাজের অনিষ্টকারী একটা ভয়ঙ্কর রক্তবীজ সৃষ্টি করে। দুর্নীত কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ পক্ষে যত অনিষ্ট হয় পরোক্ষে তদপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। প্রথমোক্তরূপ অনিষ্ট সাধিত হইবার পর তবে জানিতে পারা যায় সুতরাং তাহা দুর্নিবার্য্য, দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট কাল-সাপেক্ষ সুতরাং তাহার প্রতিবিধান সম্ভব ও সকলেই তাহার নিরাকরণে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। স্পৃহনীয় বস্তুর সংস্রববশতঃ দুর্নীত কার্য্য বিশেষরূপ সংক্রামক হইয়া পড়ে, সেই জন্য দুর্নীত কাব্য বিশেষরূপ অনিষ্টকর ও দণ্ডার্হ। দুর্নীতি অপেক্ষা কাব্যের আর গুরুতর দোষ হইতে পারে না; কাজেই এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কোন কাব্য বিচারালয়ে আনীত হইলে অনেক বুঝিয়া-সুঝিয়া আমাদের মত দেওয়া উচিত। চুরির আসামীকে বিচারের সময় জজ-সাহেব যত বিবেচনা করিয়া কাজ করেন খুনের মকদ্দমা নিষ্পত্তির সময় তাহার সহস্রগুণ অধিক সতর্ক হইয়া কার্য্য করা তাঁহার উচিত। ইহার অন্যথা হইলে অনেক কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া গ্রন্থরচনা করিলে হতভাগ্য গ্রন্থকারকে কেহ বা নাস্তিক কেহ বা দুর্নীত বলিয়া অবজ্ঞা করিবার ভান করেন। সামান্য বিষয়ে মতভেদ হইলেও যেরূপ গালাগালি হইয়া থাকে, বোধ করি কাহারো অবিদিত নাই। কাজেই একজন গ্রন্থকারের নামে এই দোষ আরোপিত হইলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে না করিয়া তাহার যথার্থ দোষগুণ বিচার করিয়া আমাদের মতস্থির করা উচিত।

বস্তুতঃ পক্ষে সচরাচর ভাষায় ব্যবহৃত "দুর্নীত" শব্দের বিশেষ কোন আকৃতি নাই। উহা অনেকটা গ্রীক দেবতা প্রোটিয়ুসের ন্যায়। তুমি একটা কিছু মনে করিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সে অমনি আর একটা আকার ধরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তবে এই একটা বুঝিতে পারা যায় যে কাহারো কোন একটা বদ্ধমূল কুসংস্কারের বিরোধী হইলেই তাহার নিকট তাহা দুর্নীত।

ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেও এইরূপ, গ্রন্থমাত্রের পক্ষেও এইরূপ।

যে গ্রন্থ লোককে নীতি-পথ হইতে বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায় রচিত তাহা দুর্নীত। এখানে "অভিপ্রায়ে" কথার ব্যবহারের কারণ বলিতে হইবে।

সৌন্দর্য্য-লিপ্সা উত্তেজিত করা এক, এবং ইন্দ্রিয়-লিপ্সা উত্তেজিত করা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জড়িত হইয়া থাকে। একজন কবি আমাদের সৌন্দর্য্য-লিপ্সা উত্তেজিত না করিয়াও ইন্দ্রিয়-লালসা উদ্রেক করিতে পারেন, এবং আর একজন কবি যখন আমাদের সৌন্দর্য্য-লালসা চরিতার্থ করিতে যত্নশীল হন, তখন আমাদের কল্পনার দোষে আমাদের মনে আনুসঙ্গিকরূপে ইন্দ্রিয়-লিপ্সা জাগ্রত হইতেও পারে। এক্ষণে নীতি-পরায়ণ পাঠকদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উপরোক্ত উভয় কবিই কি তাঁহাদের চক্ষে দণ্ডার্হ? প্রথমোক্ত কবির কাব্য হইতে কুফল ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না, তিনি সুমিষ্ট খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া অপচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করান্, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত কবির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। মনে কর, মনুষ্য-শরীরের পরিমাণ-সামঞ্জস্য ও তাহার সুঠাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবয়ব-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যদি গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়স্ তাঁহার সজীবপ্রভ প্রস্তরমূর্ত্তি-সমূহকে উলঙ্গ করিয়া গঠিত করিয়া থাকেন, ও তাহাতে করিয়া যদি কোন মাংসপিণ্ডের কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-লালসাই উদ্দৃপ্ত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে দণ্ডার্হ কে?—শিল্পী না দর্শক? ভাস্কর-বিদ্যায় অতুলনীয় গ্রীক ফিডিয়স্ কিম্বা পলিক্লীনিস্ রচিত উলঙ্গ প্রস্তর-মূর্ত্তির একটি ভগ্নাংশমাত্র পাইলেও তাহা সৌন্দর্য্য-উপাসক ইয়ুরোপের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী হইয়া পড়ে। এবং ঐ সকল উলঙ্গ প্রস্তরমূর্ত্তির অনুকরণ সমূহই দর্শকদের বিশুদ্ধ আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই য়ুরোপের প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হয়; এমন কি লণ্ডনের য়ুনিবর্‌সিটি কলেজে—যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষে একত্র হইয়া বিদ্যানুশীলন করেন, যে স্থানে বৃদ্ধ অধ্যাপক ও অল্পবয়স শিষ্যগণ একত্রে শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন—সেখানেও সর্ব্বত্রেই ওইরূপ উলঙ্গ প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শকদের সৌন্দর্য্য-প্রীতি চরিতার্থ করে। কিন্তু প্যারিসের জঘন্য স্থানসমূহে যে সকল চিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য কদর্য্য বলিয়াই তাহা নিন্দনীয়। যে গ্রন্থ হইতে কুফল উৎপন্ন হয় তাহাই যে দুর্নীত, এমন নয়। গোলাপ ফুল হইতে মাকড়সা গরল সংগ্রহ করে কিন্তু সেইজন্য গরলাধার বলিয়া কেহ গোলাপকে ত্যজ্য মনে করিবেন না। বলিংব্রুক দুইটি Puritan ধর্ম্মোপদেশ পড়িয়া নাস্তিকতায় দীক্ষিত হন কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ উক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেওয়ার দোষে দোষী করিবেন না। একজন যদি যথার্থ মনের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বেশ্যাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার সাপক্ষে এমন গ্রন্থরচনা করেন যে তাহা পরিবার-মণ্ডলীতে পাঠ করিলে সকলে কানে হাত দিবেন, তথাপি তাহা দুর্নীত নয়, কেন না তাহার অভিপ্রায় মানুষকে কুপথে লইয়া

যাওয়া নহে। শারীর-তত্ত্ব-বিদ্যায় এমন অনেক কথা আছে যে তাহা লোকের সামনে উচ্চারণ করা অসম্ভব, কিন্তু তাহা বলিয়া কি শরীর-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ দুর্নীত? পৃথিবীর প্রাচীন কবিরা কিছু খোলা-খুলি কথা কহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সেজন্য দুর্নীত আখ্যা পাইতে পারেন না। লরেন্স ষ্টার্ণ নিজের গ্রন্থের দুর্নীতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন প্রাচীন কবিদের বিষয়ে তাহা খুব খাটে। একদিন ষ্টার্ণ একজন ভদ্র মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি আমার Tristram Shandy পড়িয়াছেন?" ভদ্রমহিলা উত্তর করিলেন, "না, মহাশয়, আমি পড়ি নাই; আর সত্য কথা বলিতে কি, আমি শুনিয়াছি যে উহা স্ত্রীলোকের অপাঠ্য।" ইহাতে ষ্টার্ণ বলিলেন, "Madam, he is like your little heir playing on the carpet. At times he shows a good deal of his person which is generally hidden—but in perfect innocence."

আসল কথাটা এই যে—গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের উপর তাহার নীতি নির্ভর করে না, রচনা-প্রণালীর উপর করে। পাঠকের মনে দুর্নীত ভাব উৎপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থ দুর্নীত।

আর যদি গ্রন্থকারের অপর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তবে সে গ্রন্থ দুর্নীত নহে। গ্রন্থকারের মনের ভিতরকার উদ্দেশ্য অন্তর্যামীই জানিতে পারেন, তবে গ্রন্থে যে উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত থাকে আমরা তাহারই কথা কহিতেছি। আলোচ্য গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন সূত্র হইতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাহা লইয়া কোলাহল করা অনাবশ্যক।

রেজ্‌কি

পুরুষের পক্ষে যেমন বিদ্যাবুদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমনি রূপগুণ, দুই একত্রে থাকলে ত কথাই নেই, সোনায় সোহাগা; কিন্তু একটিমাত্র বেছে নিতে হইলে শেষটাই নইলে নয়।

*
* *

নদী যেমন তটশালিনী বলেই সুন্দর, কবিতা যেমন ছন্দোবদ্ধ বলেই মধুর,—মনুষ্য-জীবনও তেমনি কাজে-কর্ত্তব্যে, নিয়মে-আইনে, বাধা-বিঘ্নে সহস্ররূপে প্রতিহত ও সংযত বলে'ই তার যা'-কিছু দর ও আদর।

*
* *

সবল ও দুর্ব্বল প্রকৃতির প্রধান প্রভেদ এই যে, সবল প্রকৃতি বাইরের ঘটনাস্রোতকে স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিত করবার চেষ্টা করে, এবং দুর্ব্বল প্রকৃতি সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।

*
* *

কি হতে পারত তার সঙ্গে নিজের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা না করে', সচরাচর কি হয়ে থাকে তার সঙ্গে তুলনা করলে পৃথিবীতে বিলাপ-পরিতাপের অংশ অনেক পরিমাণে কমে যায়।

*
* *

সত্য এক, মিথ্যা অনেক ; এবং এ-স্থলেও অনেক সময়ে অধিকাংশেরই জয় হয়।

*
* *

দার্জ্জিলিঙের বর্ষা রেমিটেণ্ট জ্বরের মত ; —কমে বাড়ে, কিন্তু ছাড়ে না !

*
* *

বড়লোক সমাজ-রূপ জমির বুটি বা ফুলস্বরূপ। ফুল যেমন জমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে বটে, আবার সেই জমিই ফুলের ভিত্তি বা আশ্রয়,—তেমনি এই পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

*
* *

খাদ্যসামগ্রী যেমন পাক করলে তবে শরীরের পরিপাক করবার উপযোগী হয়, জীবনের সহজ সত্যগুলিও অনেক সময়ে তেমনি ক্ষমতাবান মানুষের মস্তিষ্করূপ পাকশালা হতে উপদেশ বা গ্রন্থাকারে নির্গত হলে পর তবে আমাদের সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

*
* *

চিঠি একপ্রকার ছাঁকনির কাজ করে। অর্দ্ধঘণ্টা এবং অর্দ্ধতোলার সীমার মধ্যে মনোভাব ব্যক্ত করতে বাধ্য হলে অনেক বাজে ও বাহুল্য কথা আপনিই বাদ পড়ে' যায়।

*
* *

উপনয়নকে যদি দ্বিতীয় জন্ম বলা যায় ত সন্ন্যাসকে প্রথম মৃত্যু বলা যেতে পারে।

*
* *

যে সুস্পষ্টরূপে ভাবে সে-ই লেখক, এবং যে সুস্পষ্টরূপে বোঝে সে-ই যথার্থ সমালোচক।

*
* *

যা'-কিছু আছে তা'ত সত্য। কিন্তু যা'-কিছু নেই, অথচ হতে পারত,—কত অগঠিত ভুবন, কত অকল্পিত নিয়ম, কত অচিন্ত্য জীব,—সে সব কি এবং কই ? যা'-কিছু আছে তা' ছাড়া আর কিছু কোথায়ও নেই, এ কল্পনাটি আমার কাছে মাঝে মাঝে যেরূপ অদ্ভুত-আশ্চর্য্য মনে হয়, এমন আর কারো কখনো মনে হয় কি না কে জানে। ক্ষুদ্র মানবের কল্পনা জিনিষটা কি এতই সৃষ্টিছাড়া যে বিশ্বও তার সীমা দিতে পারে না ?

*
* *

অধীন ব্যক্তির পরসেবা দাসত্ব, এবং স্বাধীন ব্যক্তির পরসেবা দেবত্ব বলে' গণ্য হয় ;—ইহাপেক্ষা স্বাধীনতার মহত্তর সুযশ কি হতে পারে ?

*
* *

মানুষ বিপদে পড়লে প্রথমে পরের দোষ দেয়, পরে বিধাতার দোষ দেয়,

তারপরে অদৃষ্টের দোষ দেয়,—সবশেষে নিজের বুদ্ধি বা চরিত্রের দোষ দেয়, যদি নিতান্ত উদারচেতা হয়। কিন্তু দোষের এত ভাগীদার জুটিয়েও যে দুঃখের বোঝা সবটাই নিজের বইতে হয়,—এই বড় আক্ষেপের বিষয়।

*
* *

প্রবৃত্তি ভগবদ্দত্ত, নিবৃত্তি মানুষের ইচ্ছাকৃত, কাজেই প্রথমোক্তের প্রভাব বেশি হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

*
* *

পরের দ্রব্য না বলে' নেওয়াকে সাধারণতঃ বলে চুরি। কিন্তু যা-কিছু অপরকে দিতে পারতাম অথচ দিই নাই,—সে-প্রকার চুরির জন্য স্বতন্ত্র ধারা ও কারা আবশ্যক নয় কি?

*
* *

জীবনের সুযাত্রার পক্ষে হয় ধনসম্পদ নয় মনঃসম্পদ,—দুইয়ের মধ্যে একটি থাকা অতীব আবশ্যক।

*
* *

প্রকৃত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কি সুলভ, কেমন বিনি-পয়সায় পাওয়া যায়! প্রকৃত প্রেম স্নেহ সকলি তাই। ভগবানের দান অনায়াসলব্ধ এবং অমূল্য। কেবল মানুষের কারুকার্য্যই মানুষের পক্ষে কষ্টকল্পিত, কষ্টসাধ্য ও কষ্টোপার্জ্জিত।

*
* *

প্রশ্নঃ—তোমার শরীর এত কাহিল কেন?

উত্তরঃ—অনুরোধে এত ঢেঁকি গিলি যে, হজম করে' উঠতে পারিনে!

*
* *

অনুরোধ এড়াবার সব-চেয়ে সহজ উপায় সেটি রক্ষা করা।

*
* *

বড় বড় স্বার্থত্যাগের মহত্ত্বগুণেই সে কষ্টকে কষ্ট বলে' মনে হয় না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ক্ষুদ্র ত্যাগস্বীকার প্রসন্নভাবে লঘুচিত্তে করতে পারাই শক্ত ব্যাপার; কারণ জিত্‌লে মান নেই, অথচ হারলে অপমান,—অন্ততঃ নিজের কাছে।

*
* *

আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা আইন দ্বারা রহিত করলে অনেকেরই দায়ে পড়ে' মুখ বন্ধ হয়!

*
* *

যে মন্দ, সে অপরকে বেশি বা সমান মন্দ প্রমাণ করতে, এবং যে ভাল সে অপরকে নিজের তুলনায় কত মন্দ ব্যাখ্যা করতে সর্ব্বদাই এত ব্যস্ত যে, পরনিন্দার মৌরশী-পাট্টা অনিবার্য্য!

*
* *

পাড়াপ্রতিবেশীর কথা থেকে অর্দ্ধাংশ বিয়োগপূর্ব্বক বাকিটুকু দুই দিয়ে ভাগ করলে তবে তার যোগ ও গুণের পরিমাণ মরে' গিয়ে সত্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়।

*
* *

ছেলেপিলে যদি হাতের পাঁচ আঙুলের মত হয় ত সেই পাঞ্জা দিয়ে মানুষ যেমন বাস্তবকে ধারণা করতে পারে এমন আর কিছুতে পারে না।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

রাজা

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি,
রাখব দেনা বাকি।

যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারি আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেছি, আমি তাহার নইক অজানা।
তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইক আমার ঠিকানা।
তাই ভেবেছি জীবনমরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে।
তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরি স্বত্বে
মিলবে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্মৃতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে আমার আমিত্ব (egotism) পূর্ব্বপ্রকাশিত "স্মৃতি"র বহু স্থানে রূপসীর সুন্দর মুখমণ্ডলে দুষ্ট ব্রণের মত কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কি করি? ভারতী-স্মৃতির সহিত আমার স্মৃতিটুকু ভেলভেট কোটের ভিতরে দরজির সূতার মত জড়িত। গোলাপের চাষ করিতে গেলে গোলাপের কাঁটাকে বাদ দিলে চলে না। হোতা যখন "অগ্নিমীলে যজ্ঞস্য হোতারং" প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উজ্জ্বল অগ্নিদেবকে আহ্বান করিয়া বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন সেই জবাপুষ্পবর্ণ হুতাশনের চারিদিকে আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের মত রাশি রাশি ধূম-দৈত্য ক্রীড়া করে—এরূপ দৌরাত্ম্য অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য।

আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত "স্মৃতি"র রচনা-ভঙ্গী আমার নিজের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু শুনিতেছি ইহা কাহারো কাহারো ভাল লাগিয়াছে। ইহার কারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি;—অশেষগুণসম্পন্না শ্রীমতী স্বর্ণ-কুমারী দেবীর গুণ-কীর্ত্তনে আমার ন-গণ্য রচনাও মহিমান্বিত হইয়াছে। অতি-তুচ্ছ শঙ্খও ভক্ত পূজারির অধর-স্পর্শে মন্ত্র-পূত হয়।

আঁস্তাকুড়েও শিউলি ফুল ফুটিলে প্রকৃতি দেবী আনন্দে হাসিয়া উঠেন। অতি-তুচ্ছ ধবল কাচও যদি পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীলের সন্নিধিতে থাকে, প্রতিফলিত বর্ণের শোভায় অপূর্ব্ব-শ্রী-সম্পদ ধারণ করে।

কথায় বলে "সৎসঙ্গে কাশীবাস—অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ"। এ কথা অযথার্থ নহে।

সঙ্গাসঙ্গগুণের তত্ত্বদর্শী কোনো একটি highly original খান্‌সামার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কলাপের কথা এ-স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খানাসামা-পুঙ্গবের নিকটে দুইটি অতি-যত্নে রক্ষিত শিশি ছিল—একটি সুরভি গোলাপী আতরে পূর্ণ ও আর একটি পূতিগন্ধময় আরকে পরিপূর্ণ। সাহেব জেলার উচ্চপদাধিষ্ঠিত হাকিম—এ জন্য দলে দলে "সেলাম বন্দগী" করিবার জন্য অসংখ্য লোক সাহেবের বাংলায় হাজির হইত। যাহারা খানসামা-মহোদয়কে বক্‌সিস্ দিত, তাহাদের বসিবার চেয়ারগুলি সাহেবের অজ্ঞাতে গোলাপী আতরে ভুর্ ভুর্ করিত। বলা বাহুল্য, সাহেব তাহাদিগকে সুপ্রসন্নচিত্তে অভিবাদন করিতেন। আর যাহারা খানসামার দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণাস্বরূপ রজতমুদ্রা প্রদান করিত না, চতুর খান্‌সামা তাহাদিগের জন্য অন্যপ্রকার ব্যবস্থা করিত। সাহেব তাহাদিগের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। তাহাদিগের সাক্ষাতেই বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দে নিজ নাসিকা-রন্ধ্র রুমাল দিয়া ঢাকিতেন। তাহারা চলিয়া গেলে, মহা খাপ্পা হইয়া সাহেব বিকট স্বরে চীৎকার করিতেন—"বড়া বদ্‌বু! বড়া বদ্‌বু।" প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন মৌলিক খান্‌সামা সাহেবকে বুঝাইয়া দিত, "উহারা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত।" বলা বাহুল্য, তাহারা আর সাহেবের দরবারে হাজরি দিতে পাইত না। অতএব সঙ্গের গুণ অনির্ব্বচনীয়।

* * *

পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর শরীরে অহঙ্কারের নামগন্ধ নাই। তিনি রাজকন্যা; দেবতুল্য নানাগুণালঙ্কৃত জানকীনাথের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, বাংলাদেশের প্রসিদ্ধা লেখিকা, ইংরাজিভাষায় পারদর্শিনী, তথাপি তাঁহার ব্যবহারে আমি কোন দিন বিন্দুমাত্র অ-বিনয় দেখি নাই। অন্য কেহ হইলে, হয় তো মদদর্পে মাটিতে তাহার পা পড়িত না। এই বরেণ্যা নারীর সহিত আমার বহু-বহু পত্র-বিনিময় হইয়াছে। আশ্চর্য্য! কোনো পত্রের কোনো স্থলেই বড়াইর ছায়া নাই। ইহা কি কম শ্লাঘার কথা। আমাদের দেশে কথায় বলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে জ্যাঠা হয়। কিন্তু সরল শিশুপ্রকৃতি স্বর্ণ-কুমারীর চরিত্রে জ্যাঠামির লেশমাত্র দেখি নাই।

কোনো অসহিষ্ণু সমালোচক বলিয়াছেন —"পুরুষ জ্যাঠা সহ্য হয়—মেয়ে জ্যাঠা সহ্য হয় না।" এই নারী-অবমাননা দেখিয়া ভক্ত মিরাবাইর কথা মনে পড়ে। যখন মীরাবাই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, সে-সময়ে বৃন্দাবন-বাসীদিগের মধ্যে বৈষ্ণবকুলতিলক প্রভুপাদ জীব গোস্বামীর খুব নাম। ভক্তদর্শন অভিলাষে মীরাবাই প্রভু জীব গোস্বামীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া গান ধরেন—

"মেরে গির্‌ধর্ গোপাল—
দুস্‌রা ন কোই!

সন্তন্ দিঠ্ বৈঠ্ বৈঠ্ লোকলাজ খোই !
অশ্রুয়নজল সিঁচ্ সিঁচ্ প্রেম-বেল বোই,
অব্ তো বেল্ ফয়ল্ গই জানে সব্ কোই !
যাঁকে শির্ মোর্ মুকুট্ মেরো পতি সোই—
শঙ্খ চক্র গদা পদম্ কণ্ঠমাল্ সোই ।”

সেই সুমধুর অদ্ভুত গীত শুনিয়া সকলেই মোহিত হইল, কিন্তু প্রভু জীব গোস্বামী অচল, অটল!—তাঁহার কুঞ্জে স্ত্রী-মূর্ত্তির প্রবেশ নিষেধ! প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, মধুর গর্জ্জনে মীরাবাই বলিলেন—“এই বৃন্দাবনে বৃন্দাবনের রাজা গোবিন্দজীউ ছাড়া আর পুরুষ কোথায়? তুমিও তো নারী!”

পুরুষত্ব-অভিমানী পূর্ব্বোক্ত মনুষ্য-পুঙ্গবের longitude and latitude on the map of Bengal আমি জানি না। দেখা হইলে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অবশ্যই বলিতাম, “হে পুরুষ-মুখস্-ধারিণী নারি! তুমি পুরুষ-জ্যাঠার কথা কি বলিতেছ? এই বাংলামুল্লুকে নারী ছাড়া পুরুষ কোথায়?”

* * *

যখন আমাদের দুইজনের মধ্যে পত্র-লেখালেখি আরম্ভ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম-পত্রে লিখিয়াছিলেন, “আমার স্বামী-মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপনাকে পত্র লিখিতেছি! আজি হইতে আপনি আমার ভ্রাতা।”

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই সাধ্বী স্বামিদেবতার অনুজ্ঞা-ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই করিতেন না।

ইহা হইতে ইহাও সুন্দররূপে উপলব্ধি হয় যে, যাঁহারা বলেন এই পরিবারের মধ্যে “পর্দ্দা” নাই, তাঁহারা মহাভ্রান্ত। ইঁহাদের মধ্যে যে পর্দ্দা আছে তাহাই আর্য্যভূমির আসল খাঁটি পর্দ্দা। এ পর্দ্দা এখনও দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে আছে। এ পর্দ্দার অভ্যন্তরে মুক্তবায়ু আছে—এখানে নিশ্বাস রোধকারী বদ্ধবায়ু নাই। এই পর্দ্দার অভ্যন্তরে সুনীল অনন্তবিস্তার আকাশ, উত্তাল তরঙ্গরঙ্গময় মহাসমুদ্র, শাল-তাল-তমাল পরিপূর্ণ শ্যামল বনভূমি, তুঙ্গ শৃঙ্গময় তুষারধবল হিমাদ্রি, ঝির্ ঝির্ শব্দ-ময়ী লীলাময়ী গিরিনির্ঝরিণী আছে—ম্যালেরিয়ার বীজপূর্ণ পানাপুকুর নাই! সচরাচর হিন্দুঘরে যে পর্দ্দা আছে তাহা বিজাতীয়, বিদেশী আম্‌দানি—দেশীয় নহে। সে পর্দ্দা গান্ধারীর মুখস্—চীননারীর চরণযুগলের লৌহশৃঙ্খল—হিন্দুস্থানী সুন্দরী-বৃন্দের পদকোকনদে কাঁসার “পঞ্জরী”। শুনিতে পাই যে আফ্রিকার মরুখণ্ডে উষ্ট্রপক্ষী শিকারীর ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অবশেষে তপ্ত বালুকারাশির ভিতরে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। আধুনিক পর্দ্দা এই মূঢ় উষ্ট্রপক্ষীর নিরাপদ নির্জ্জনবাস।

স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুমোদিত স্ত্রী-স্বাধীনতায় উচ্ছৃঙ্খলতার নাম-গন্ধ নাই। এই দেবী কর্ম্মযোগিনী। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ—যাহাতে কামনার লেশমাত্রও নাই—তাঁহার আদর্শ। তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মজীবনের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কতিপয় ছত্র সম্পূর্ণ প্রযুজ্য—

“ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দ্দিকে! জান না বন্ধন,
মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ! যেন মেঘমাঝে

শ্রাবণের সৌদামিনী! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে! তটিনী যেন রঙ্গিণী!
উধাও, অধীর, তব নারী-মূর্ত্তি রাজে!
হে নারি! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা-ভিতরে।
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ অয়ি সুমঙ্গলা!
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হয়ে তোমার ও নারী-মূর্ত্তি রাজে।"

* * *

বঙ্গ-সাহিত্য-কণ্ঠ-কৌস্তুভ শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত স্বর্ণকুমারী দেবীর "মিলন" পাতাইয়াছিলেন। এ "মিলন"-ইতিহাসেরও ছবি পূজনীয়া দিদি মধুর উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। সে চিত্র র‍্যাফেলের ম্যাডোনা অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। কবি-শ্রেষ্ঠা গিরীন্দ্রমোহিনীকে আমি "মা" বলি। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বহু বহু কথা বলিবার আছে। "স্বর্ণায়ণ" শেষ হইলেই "রবীন্দ্রায়ণ" ও "গিরীন্দ্রায়ণ" আরম্ভ করিব।

স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে লিখিয়াছিলেন, "যেমন আপনাকে আমি নিয়মিত পত্র লিখি, আরও দুইজনকে নিয়মিত পত্র দিই। তাঁহাদের নাম—গিরীন্দ্রমোহিনী ও সরোজকুমারী।"

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী M. D-র নাম কে না শুনিয়াছেন? ইনি বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী M. D-র সহিত আমার সুমধুর সুবাদ আছে। ইনি নিজের সম্বন্ধে যাহা যাহা না জানেন তাহা পর্য্যন্ত আমি জানি। ইনি যখন দেড় বৎসরের শিশু তখন কুকুরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাশীর কালভৈরবের অনুকরণ করিতেন ও কবিজনসুলভ দিব্য-দৃষ্টিপ্রভাবে সেই সামান্য সারমেয়ের কদাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেবেন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার লীলাভিরাম আস্ফালন দেখিয়া হর্ষবিহ্বল-চিত্তে অট্ট অট্ট হাস্য করিতেন, তখন আমিও আনন্দে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিতাম।

সহৃদয় পাঠক-মহাশয়! কবি-ভগ্নী সরোজকুমারীর নামের শেষের M. D. অক্ষর-দুটি মার্কিন দেশের bogus title "Doctor of Medicine"-বোধক নহে। আমি সরল চিত্তে বলিতে পারি, অক্ষরযুগল Maha (মহা) ও dusta (দুষ্ট) শব্দযুগল-বাচক নহে। একদা আমি এই মহিয়সী নারীর সম্বলপুরের ভবনে হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হই। ইনি ও ইঁহার সহধর্ম্মী স্বামিমহাশয় (সম্বলপুরের সুবিখ্যাত গভর্ণমেণ্ট-প্লীডর্ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল্ মহাশয়) আমাকে গুরুপুত্র নির্ব্বিশেষে যত্ন করেন। কিন্তু একটা অদ্ভুত আজগুবি ব্যাপার দেখিয়া আমি যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়াছিলাম। "সরোজ, পাকা পেঁপে খেতে ইচ্ছা করচে।" মহাশয়, বলিব কি? মুখের কথা না খসিতে খসিতে একথাল সুরসাল পেঁপে আসিয়া উপস্থিত! "সরোজ, একপেয়ালা গরম চা খেতে ইচ্ছা করচে।" আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! চক্ষের নিমিষে একটা প্লেটে মাখম্-মিছরি প্রভৃতি পরিবেষ্টিত মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের মত উষ্ণ এক পেয়ালা চা আসিয়া হাজির! আমি

মনে মনে ভাবিলাম, "মহাভারত-বর্ণিতা দ্রৌপদীর সহিত আমি ইঁহার অন্য-কিছু সাদৃশ্য তো খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে ইনি দ্রৌপদীর "হাতা" কোথায় পাইলেন? মহাশয়, সেই দিন হইতেই ইনি আমার কল্পনা-চক্ষে M. D.—মহিমময়ী দ্রৌপদী।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অশ্রু

ক

আমাদের বাড়ী পাশাপাশি। উপমাদের সঙ্গে আমাদের বেশ-একটু ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তার যোগ ছিল। উপমার সঙ্গে ছেলেবেলায় কত খেলাই খেলেছি—যদিও সে আমার চেয়ে বছর-পাঁচেক বয়সে ছোট। সুতরাং, বাল্যের ভালবাসা যে যৌবনের প্রেমে পরিণত হবে, এ-আর আশ্চর্য্য কি?

উপমার বাবা সুরেনবাবু নব্যতন্ত্রের হিন্দু। মেয়ের বিয়ের জন্য তাঁর স্ত্রী যথেষ্ট মুখরা হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর 'মাথার টনক্' নড়াতে পারেন-নি। মেয়ে বড় হবে, লেখাপড়া শিখ্‌বে, তবেই বিয়ের কথা—এই ছিল তাঁর পণ।

প্রথম যেদিন তার কাছে আত্মপ্রকাশ করি, সেদিন সে কিছুই বলে-নি; কিন্তু তার প্রসন্ন নতদৃষ্টি ও রক্ত কপোলে হৃদয়ের মৌন সম্মতি পেয়েছিলাম। বাগানের গোলাপগাছ থেকে একটি আধ্‌-ফোটা ফুল তুলে তার এলো খোঁপায় গুঁজে দিলাম—আমার প্রাণের পুলকই ফুলের পাপ্‌ড়িগুলিকে যেন রঙ্গিন করে তুলেছিল। ......উপমা আমার একখানি হাত দুহাতে নিজের মুঠোর ভিতর নিয়ে কোলে করে বসে রইল। আমরা কেউ কিছু বল্‌লাম না—বকুলশাখার কানে-কানে বাতাস মৃদু গুঞ্জনে যে কথা বল্‌ছিল, সারাসন্ধ্যা সেইখানে বসে বসে আমরা তাই সুধু শুন্‌তে লাগ্‌লুম।

খ

এ-কথা কত লুকানো!

জান্‌তাম, আমার আইন-পড়া সাঙ্গ না-হলে বাবা কখনই এ-বিবাহে মত দেবেন না। বিশেষ সে-সময়ে আমার বাবা ফিটের ব্যামোয় বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। সুতরাং তখনকার মত আমার প্রাণের কথা আমার প্রাণেই চাপা রইল।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় আমি উপমাদের বাড়ীতে চা খেতে যাই—এটি আমার অনেক দিনের অভ্যাস।

সেদিনও নিয়মমত গেলাম।

টেবিলের একধারে বসে সুরেনবাবু খবরের কাগজ পড়্‌ছিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বস্‌লুম। উপমা চকিত চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। উপমার চোখের এই দৃষ্টিতে এখন আমি এক নূতন ভাষা দেখি—চারিদিকে লোক জন থাক্‌লেও সে ভাষা আমি ছাড়া আর

কেউ পড়্‌তে পারত না—সে ভাষা যে কেবল আমারই জন্য!

বাইরে পায়ের শব্দ হোল। সুরেনবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্লেন, "উপা, বোধহয় নরেন আস্‌ছে।"

নরেন উপমার দাদা।

নরেন ঘরের ভিতরে এল—তার পিছনে সাহেবী পোষাক-পরা আর-একজন লোক। হঠাৎ এক অচেনা লোক দেখে উপমা একটু জড়সড় হয়ে আমার কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল।

নরেন বল্লে, "উপা, লজ্জা করিস্‌নে, এ আমার বন্ধু অজিত। বাবা, আমার মুখে অজিতের কথা শুনেছেন ত?"

সুরেনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "এস বাবা, এস! নরেনের বন্ধু বলে তোমাকে আর আপনি বল্লুম না। বোসো—ঐ চেয়ারে বোসো। উপা, আর দু-পেয়ালা চা তৈরি কর্‌ত মা!

অজিত হেসে বল্‌লে, "কোর্টের ফের্‌তা আস্‌ছি, নরেন আর আমাকে বাড়ী গিয়ে খোলস্ ছাড়্‌বার অবকাশ দেয়-নি। আশা করি দাঁড়কাকের এ ময়ুরপুচ্ছকে আপনারা সকলে ক্ষমা কর্‌বেন।"—টুপী হাতে করে অজিত আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়্‌ল।

এই অজিতের কথা আজ ক-দিন ধরেই শুন্‌ছি। অজিত, খুব বড়লোকের এক মাত্র সন্তান। কল্‌কাতায় বি-এ পাশ করে বিলাতে গিয়ে সে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে। দেখ্‌তেও সে বেশ সুপুরুষ। নরেন কাল বল্‌ছিল, অজিতের সঙ্গে উপমার বিয়ে হলে বেশ হয়। কথাটা তীরের ফলার মত আমার বুকে গিয়ে বিঁধেছিল বটে,—কিন্তু ভেবেছিলুম সে সুধু কথার কথা।

আজ আমার চায়ের পেয়ালায় কে-যেন নিম-পাতার রস ঢেলে দিয়েছে! কোন রকমে চা-পান কর্‌তে কর্‌তে ভাবতে লাগলুম, নরেন যখন অজিতকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, ব্যাপারটা তখন আর হাল্‌কা ভেবে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। উপমা যে এখন আমার দেহের সঙ্গে রক্তের মত মিশে আছে,—সে পরের হবে, এ-যে ভাবতেও পারি-না। উপমাকে এখন যেদিন ভুল্‌ব—সেদিন আমি নিজেকেও হয়ত ভুলে যাব!

ভাবছি, হঠাৎ আমার বেয়ারা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে খবর দিলে, বাবার আবার ফিট হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়্‌লুম।

গ

বাবার এবারকার পীড়া কিছু গুরুতর। ডাক্তার বল্লেন, কলকাতার গরম বাবার সহ্য হচ্ছে না, এঁকে দু-একদিনের মধ্যেই দার্জ্জিলিঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত, নইলে অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মা ধরে বসলেন, কাল্‌কেই দার্জ্জিলিঙ্গ যাব। স্থির হোল, দার্জ্জিলিঙ্গে আমার এক মামা আছেন, আপাতত সেইখানে গিয়েই উঠ্‌ব।

বলতে-কি, এ-সময়ে আমার মন কলকাতা থেকে কিছুতেই নড়্‌তে চাইছিল-না, কিন্তু উপায় নেই—এ যে কর্ত্তব্য!

সকালে উঠে তাড়াতাড়ি উপমাদের বাড়ী ছুটলাম।

ম ঢুকতেই দেখি, উপমা বাগানে দাঁড়িয়ে ফুল তুল্‌ছে।

আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌লাম, "উপা, বাবার ব্যামোর বড় বাড়াবাড়ি—তাঁকে নিয়ে আমরা দার্জ্জিলিঙ্গ যাচ্ছি।"

"কবে, প্রভাত-দা?"

"আজই।"

"—আজই! সেকি, যাবার আগে মা-বাবা দেখতে পাবেন-না?"

"কেন উপা, তোমার বাবা আর মা কোথায়?"

"তাঁরা শ্রীরামপুরে কাকার বাড়ী গেছেন। কোল আসবেন।"

আমি হতাশভাবে বল্‌লাম, "তোমার বাবার সঙ্গে আজ আমার দেখা হওয়ার যে বড় দরকার ছিল উপা!"

"কেন প্রভাত-দা?"

"—আমার হাতে তোমাকে দিতে তাঁর কোন আপত্তি আছে কিনা, যাবার আগে সে-কথা জেনে যেতাম।"

উপমার গালদুটি রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। ঘাড় হেঁট করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে বল্লে, "তোমরা চলে যাচ্ছ, এইবেলা আমি সকলকার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

নরম কাঁধের উপর এলানো চুল দুলিয়ে উপমা চলে যেতে উদ্যত হোল,—আমি আবেগভরে তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে গাঢ়স্বরে বল্‌লাম, "দাঁড়াও উপমা, অনেক দিন তোমায় দেখ্‌ব-না, একবার ভাল করে দেখে-নি!"

উপমা একবার চকিতের জন্য পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল,—পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে লজ্জায় নুয়ে ফুলের ডালার দিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল।

গাছের ফাঁক্ দিয়ে সোনার মত এক ঝলক রোদ্ এসে উপমার মুখের এক-দিকটি আলোয়-আলো করে তুল্‌ল—সে মূর্ত্তি যেন গ্রীক ভাস্করের উপাস্য প্রতিমা!

ঘ

দার্জ্জিলিঙ্গে এসে বাবার রোগ কম্‌ল না—কিন্তু নানান্ উপসর্গ বাড়তে লাগ্‌ল।

আমাদের মনের আনন্দই প্রকৃতিতে প্রাণসঞ্চার করে।—সে আনন্দ আমার ছিল না। তাই উপত্যকায় মেঘের মেলা, তুষার-পটে আলোর খেলা, শৈল-কোলে ঝরণার লীলা—এ-সব চোখ-দিয়ে দেখ্‌তাম মাত্র, মন-দিয়ে গ্রহণ কর্‌তে পারতাম না;—সবই যেন অর্থহীন চিত্রের মত!

সুধু বাবার অসুখই এত অশান্তির কারণ নয়;—নিয়তি সকল দিক থেকেই আমাকে কাবু কর্‌বার ফিকিরে আছে।

জীবনের এই ভাগটা শিশুর পক্ষে দ্বিতীয় ভাগের মত আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে,—একে বাদ দেওয়াও চলে না, মনে রাখাও কষ্টকর। এ দুর্দ্দিনের কথা ভুলে যেতে কত না চেষ্টা করেছি,—কিন্তু পারি-নি, কিছুতেই পারি-নি! এ-যেন আগুনের আখরের মত আমার বুকের ভিতরটা দাগী করে রেখেছে!

.........তাকে দেবী বলেই জানতাম। না,—জানতাম কেন, এখনো তাই বলেই জানি, তাই বলেই পূজা করি। ভ্রম-প্রমাদের জীবনে হয়ত সে ক্ষণিকের ভুল করে ফেলেছিল। কিন্তু কার অভিশাপে

ক্ষণিকের সে ভুল আমার অদৃষ্টে চিরস্থায়ী হয়ে রইল ?

দার্জ্জিলিঙ্গে আসবার পরে, কল্‌কাতা থেকে প্রথম চিঠি পাই উপমার। আমরা কে কেমন আছি জিজ্ঞাসা করে সব-শেষ লাইনে সে লিখেছিল :—"প্রভাত-দাদা, তোমার জন্যে আমার মন-কেমন করে।"

সর্ব্বশেষের সামান্য এই একটি লাইনকে তোমরা কেউ অসামান্য বলে ভাববে-না হয়ত। আমি কিন্তু সেই লাইনটিকে ইষ্ট-মন্ত্রের মত মনে-মনে কতবার—কতদিন যে জপ করেছি, তা-আর বলা যায় না। প্রেম যে সামান্যকে অসামান্য করে তোলে !

আজও সে লাইন—সেই একটিমাত্র লাইন আমার জীবনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। "প্রভাত-দাদা, তোমার জন্যে আমার মন-কেমন করে।"—উপমার শেষ-পত্রের এই শেষ-পংক্তিটি স্মরণীয়। কারণ, তারপর উপমার জীবনে যেদিন এসেছে, সে-দিনের কথা আর আমার অধিকারে নেই—সে তখন অন্যের ধর্ম্মপত্নী !

চিঠি লেখবার সময় সত্যই কি তার মন-কেমন করেছিল ? এখনো মাঝে মাঝে কথাটা ভাবি। একটা ইতর প্রাণীর সঙ্গে থাক্‌লেও যে তার উপরে মায়া পড়ে,—আর আমি হচ্ছি তার বাল্যসাথী,—কত কাল থেকে একসঙ্গে আছি, আমার উপরে কি তার মায়া পড়ে-নি ? এ-আর বিচিত্র কি ? কিন্তু আমার এ প্রাণ ত তার মায়ার কাঙ্গাল ছিল না—সে যে চেয়েছিল, প্রেম ! উপমাও ত তা জান্‌ত !

আবার, আর-এক হতেও পারে। হয়ত, আমার জীবন তার নির্দ্দয়তায় নিষ্ফল হয়ে যাবে বলে, আমার হতভাগ্যের কথা ভেবে তার মনে অনুতাপের ক্ষণিক দয়া হয়েছিল। তাই কি ? উপমার এ মন-কেমন-করা কি প্রথম শিকারীর করুণার মত ? না, না,—আর ভাব্‌তে পারি-না। এযে নিজের দেহেই ছুরি চালিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ শিক্ষা হচ্ছে। এ ব্যাপার যতই বিশ্লেষণ কর্‌ব, আমার আত্মা ততই রক্তাক্ত হয়ে উঠ্‌বে !

ধনীর সন্তান অজিতের অর্থের মোহেই হোক্, আর তার বাপ-মার ইচ্ছা বা আদেশেই হোক্,—উপমা যখন আমাকে ত্যাগ করেছে, তখন আর কারণ-চিন্তা করে লাভ কি ? অকালে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও চাতক যখন বাদলের ধারা পাবে না, তখন তার পক্ষে কান্না-থামানোই হচ্ছে, উচিতকার্য্য।

* *
*

উপমার চিঠি সামনে রেখে সেদিনও মেঘের প্রাসাদ তৈরি কর্‌ছিলাম, এমন-সময়ে সুরেনবাবুর এক পত্র এসে আমার সুখের মেঘে আগুণ ধরিয়ে দিলে। সেই পত্রেই প্রথম জানলুম, অজিতের সঙ্গে উপমার বিবাহ।

আমার তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা নিষ্ফল ; কারণ, সে ত আমি পার্‌ব-না ! কল্পনায় পরের মানস-ভাব হয়ত ফুটানো যায়, কিন্তু নিজে যা প্রাণে-প্রাণে অনুভব করছি, সে কঠিন বাস্তবকে ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যায় কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। অন্তত আমার সে শক্তি নেই।

জীবনে ধিক্কার এল,—নারীর প্রতি ঘৃণা হোল। সারা সন্ধ্যা কেমন-যেন আচ্ছন্নের মত চুপ করে বসে রইলুম,—যখন সাড় হোল তখন রাত্রি হয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি,—আমার বুক ছাপিয়ে অনন্ত কালিমা যেন বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। চন্দ্রশূন্য আকাশ, মাথার উপরে যেন-এক কালিমাখা বিরাট কটাহের মত উল্টে রয়েছে। আমার মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে শত শত অভাগার প্রাণে প্রাণে অহরহ যে দুঃখের চিতা জ্বল্‌ছে, তারই শিখার ধূমে আকাশ অত অন্ধকার!………

উপমার চিঠিখানা হাতেই ছিল,—সেখানা বাতির আলোয় ধর্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু ছাই হয়েও চিঠিখানা একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল-না,—বেঁকে-চুরে দুম্‌ড়ে গেল মাত্র। মাথা হেঁট করে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। ছোট-ছোট চেনা হাতের লেখায় তখনো পড়া যাচ্ছে, 'প্রভাত-দাদা, তোমার জন্যে আমার মন-কেমন করে!' —করে নাকি? করুক্! বিদ্রূপের স্বরে আপনমনে হেসে উঠে, পত্র-ভস্ম সবলে মুঠোয় চেপে ধরলুম, মুড়্-মুড়্ করে একটা শব্দ হোল—সে-যেন কার অতি-মৃদু আর্ত্তনাদ! যখন মুঠো খুল্‌লুম, হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া এসে ছাইগুলোকে এক-ঝাপ্‌টায় নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

* * *

মনের যখন এমনি অবস্থা, বাবার অসুখ তখন চরমে উঠ্‌ল।

সুরেন-বাবুর আর-এক পত্র পেলুম,—উপমার বিয়ের নিমন্ত্রণ! তার দু-চারদিন পরেই বাবাকে নিয়ে কল্‌কাতায় রওনা হলুম।

মনে আছে, উপমাদের বাড়ীতে যেদিন সানায়ে সাহানা বাজচে, আমাদের বাড়ীতে সেদিন কান্নার রোল উঠেছে!

৬

কল্‌কাতা আমার বিষ হয়ে উঠেছিল। ওকালতী পাশ করেই তাই পশ্চিমে চলে এসেছি। ছোট ভায়ের সঙ্গে মা কল্‌কাতাতেই আছেন।

বছর-দুই কেটে গেছে। এর মধ্যে মনের উন্নতি যত-না হোক্,—আর্থিক উন্নতি কিছু-কিছু হয়েছে।

মা প্রতি পত্রেই কান্না ধরেছেন, এইবার আমাকে বিয়ে কর্‌তে হবে। কিন্তু সে-কথা আমি কানে তুলিনি।

ইতিমধ্যে মার চিঠিতে উপমার খবরও পেয়েছি। তার জীবন সুখের নয়। অজিত মাতাল আর লম্পট। উপমার গায়ে হাত তুল্‌তেও সে পিছপাও নয়।

নিয়তি!

আমার কথা কি আর তার মনে আছে? বোধহয়, না। নইলে, বিয়ের পর থেকে সে আমার কোন খোঁজখবর নেয়-নি কেন? ভাল স্বামী না পেলেও সে টাকা ত পেয়েছে বটে! উপমা এখন বিলাসিনী ধনীর ঘরণী। সেখানে আমি কে?

থাক্ ও কথা। অতীতের চিতাভস্ম কুড়িয়ে, কি আর হবে?

এদিকে মা হতাশ হয়ে উঠ্‌ছেন।

শেষপত্রে তিনি লিখেছেন, যাদের নিয়ে এ-বয়সে তাঁর সংসারধর্ম্ম, তারা যদি সংসারী না-হয়, তবে তিনিও আর সংসারের ভার বইবেন না—কাশী চলে যাবেন।—চিঠির ঝাপসা কালি দেখে বুঝলাম, লিখ্‌তে লিখ্‌তে মা কেঁদেছেন। মনে কেমন একটা ঘা লাগ্‌ল।—অভাগিনী বিধবা জননী আমার! না ভেবে-চিন্তেই উত্তর দিলাম—আমি বিয়ে কর্‌ব।

চ

দেশে ফির্‌ছি।

একেলে বিয়ের বাজারে রোজগারী উকীল-বর ভারি আক্রা—একরাশ পুঁটিমাছের ভিতরে দশ-সেরী একটি কাত্‌লার মত। সুতরাং, আমাকে কেন্‌বার খরিদ্দারের অভাব হয়-নি।

মত দিয়েছি বলে এখন অনুতাপ হচ্ছে। পরিচিতকে যে আপন করতে পারলে-না, অপরিচিতকে সে কি আর আপন কর্‌তে পারবে?

ট্রেণ একটা বড় জংশনে এসে দাঁড়াল। কল্‌কাতা থেকেও একখানা যাত্রী-গাড়ী এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিল।

এখন বড়দিনের ছুটি। পশ্চিমে, কল্‌কাতার গাড়ীতে এ-সময় অনেক চেনা মুখ নজরে পড়ে। ও-গাড়ীতে কোন আত্মীয়-বন্ধু আছেন কিনা দেখবার জন্যে কামরা থেকে নেমে পড়্‌লুম।

চেনা মুখ আছে বৈকি! দু-চার পা যেতে-না-যেতেই যাকে দেখলুম,—তাকে দেখবার আশা মোটেই করি-নি। একখানি সেকেণ্ডক্লাশ রিজার্ভ গাড়ীতে, জানালায় মুখ বাড়িয়ে, ঠিক আমার সামনেই বসে আছে—উপমা!

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌লুম,—উপমাও আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে!

আমাকে দেখেই সে কেঁপে উঠ্‌ল। তারপর ঘাড় হেঁট করে পাথরের মত বসে রইল। যেন-সে ফাঁশীর হুকুম পেয়েছে!

আমার মনের ভিতর সমস্ত অতীত একচমকে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। সেই উপমা!

উঃ, কি বিবর্ণ তার মুখ, কি বিশীর্ণ তার দেহ, কি বিষণ্ণ তার ভাব! সেই রূপে-নিরুপমা উপমা, কেমন করে এমন বিষাদ-প্রতিমা হোল?—এযে জীবন্ত শব!

কতক্ষণ যে অবাক-আড়ষ্ট হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তা আমার মনে নেই। উপমা আমার প্রাণে যে দাগা দিয়েছিল, আমার সমস্তকেই যে ব্যর্থ করে দিয়েছিল, আজ তার এই দীনমূর্ত্তি দেখে সে-সব কথা একেবারে ভুলে গেলাম—ষ্টেশনের সেই ব্যস্ত জনতা, সেই কর্কশ কোলাহল ডুবিয়ে আমার স্মৃতির পটে সেই-একদিনের সোনার ছবি জেগে উঠল, যেদিন তার পাশে বসে, তার হাতে হাত রেখে বকুল-শাখায় বসন্ত-বাতাসের অশ্রান্ত গানে এক নূতন রাগিনীর আভাস পেয়েছিলাম!

কলকাতার গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠল, সে তীক্ষ্ণ ধ্বনি যেন ধারালো অস্ত্রের মত আমার প্রাণটা খান্‌-খান্‌ করে দিলে। আমি চম্‌কে উঠলুম—উপমাও চম্‌কে উঠল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

উপমা যেন প্রাণপণে চোখ তুলে আমার

দিকে চেয়ে রইল,—সে চোখে কোন্ ভাব ছিল, মন তা বুঝেছে, আমার মুখ তা বলতে পারবে-না!

আকাশের রোদ উপমার মুখে এসে পড়্‌ল—তার পাণ্ডুর কপোলে কি ও চক্‌চক্ করছে? অশ্রু!

উপমা কাঁদছে!

* * *

কল্‌কাতার টিকিট ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বিবাহ? এ-জীবনে নয়।

তার চোখের জলে মনের সকল মলিনতা ধুয়ে গেছে। জীবনে তাকে আর-কথনো দেখি-নি; কিন্তু আমার হৃদয়-মরু সজল করে, আজীবন জেগে থাক্‌বে, সেই এক ফোঁটা অশ্রুজল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাসকাবারী

আর্টের আধ্যাত্মিকতা

জ্যৈষ্ঠের "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের "আর্টের আধ্যাত্মিকতা" নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ:—পিউরিটানগণ কাব্য সঙ্গীত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আধুনিক জগতেও কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্য্যে আমরা চাহিতেছি Idealism, অর্থাৎ যাহা উচ্চভাবের উদ্বোধক—যাহা অধ্যাত্মবোধের সহায়, ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দীপক। প্রথমেই আমরা বলিতে চাই চারুকলা বা আর্টের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। ভগবৎ-উপলব্ধিতে এক রস, রমণী-সম্ভোগে আর এক রস। শিল্পী এই দুই বিষয়ের যে কোনটি লইয়া এক রসপূর্ণ সৃষ্টি করিতে পারেন। রমণী-সম্ভোগের চিত্র ধর্ম্মজীবনের পক্ষে হানিকর হইতে পারে, কিন্তু শুধু রসসৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে তাহার মূল্য যে কম হইবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে কি? ভগবানের বহুমূর্ত্তি—কে যে কতভাবে দেখিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষের মহত্ত্ব, উদারতা, অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে ভগবান আছেন, আবার মানুষের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও সেই একই ভগবান। সাধু চাহেন প্রথমটি। শিল্পী কিন্তু দুইটিকেই সমানভাবে সত্য রসপূর্ণ করিয়া দেখাইতে পারেন। সাধু ও শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নহে। সাধু ও সংস্কারক জগৎকে মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। সতীধর্ম্ম, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি এইরূপ এক-একটি আদর্শ। শিল্পী কিন্তু বলেন পাপ না চাহিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া উহার প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইব কেন? পুণ্যবান হইয়াও পাপের মধ্যে কি খেলা কি উদ্দেশ্য কি তত্ত্ব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিরত থাকিব কেন? জগতে আদর্শ-প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পী তাঁহার শিল্পকে নিয়োজিত

করেন না। কোন্ আদর্শ কোন্ যুগে ফুটিয়া উঠিয়া জগতের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে সেই অনুসারে শিল্পী তাঁহার প্রতিভা পরিচালিত করেন না। আর্ট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরন্তন সত্য, উদাসীনভাবে ধ্যান করেন পাপ-পুণ্যে, ক্ষুদ্রে-বৃহতে, অন্তের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের বিচিত্র সত্তা। প্রকৃত অধ্যাত্মের সঙ্গে আর্টের কোন বিরোধ নাই। যোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার যোগে। ভোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার ভোগে। যোগীর যোগীত্ব, ভোগীর ভোগীত্ব, দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব প্রকটিত করিতে পারিলেই, শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠা। এই হিসাবে শিল্পীই প্রকৃত আধ্যাত্মবাদী। অসুন্দর কাহাকে বলি? অসুন্দর তাহাই যাহা বস্তুর বাহিরের চেহারাটা শুধু দেখায়, বস্তুর অন্তরের রহস্যটি যাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। ফটোগ্রাফ কুৎসিত, তাহা নগ্ননারীরই হউক আর সাধু পুরুষেরই হউক। কারণ ফটোগ্রাফে নগ্ননারীই দেখি, নগ্ননারীত্ব দেখি না, সাধুপুরুষের জটাবল্কল দেখি কিন্তু সাধুত্বের ব্যাখ্যা পাই না। কবি যিনি, দ্রষ্টা যিনি, তিনি সৃষ্টি করেন সিদ্ধ অবস্থার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া। এ ভাব ভাল-মন্দ শুদ্ধ-অশুদ্ধ মঙ্গল-অমঙ্গলের অতীত। আচরণ, উদাহরণ, শিক্ষা, ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধু ধর্ম্মের সহিত, অধ্যাত্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে চাহেন, শিল্পী কিন্তু চাহেন শুধু ভাবের মধ্য দিয়া। ম্যাডোনার ছবিই তুমি অঙ্কিত কর, আর বারনারীরই ছবি অঙ্কিত কর, তোমার বিষয়টির কোন প্রকৃতিগত দোষ নাই। প্রশ্ন শুধু, সত্য ভাবটিকে পাইয়াছ কি? আর্টের প্রভাব-প্রসার সূক্ষ্ম। আমরা চাই স্থূলপ্রভাব—লাঠ্যৌষধি না হইলে আমাদের চৈতন্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি-শাস্ত্রের তাই সৃষ্টি হইয়াছে। আর্টের মধ্যেও তাই নীতিবাদ প্রভৃতি মতবাদ প্রবেশ করাইতে চাহিতেছ। কিন্তু মানুষের সূক্ষ্ম যে অন্তরের প্রকৃতি, তাহার আধ্যাত্মসত্তা কোনদিনই নীতি দ্বারা প্রবুদ্ধ হইবে না। আর্ট হইতেছে দৃষ্টি—revelation। এই দৃষ্টি বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবেই আমাদের এক সহজ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য, আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য।"

*
* *

নিধু গুপ্ত

"নারায়ণে" "নিধু গুপ্ত" নামক প্রবন্ধের লেখক লিখিতেছেন—"এ যুগের শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা * * রবীন্দ্রনাথও তাঁহার (নিধু গুপ্তের) ও অন্যান্য কবি-ওয়ালার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।"

লেখক বলিতে চান, নিধু গুপ্তের—

১। "আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল,
ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।"

২। "আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থেকো, এ দেহে সকলি সবে।"

৩। "মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন"

প্রভৃতি লাইনের নকল করিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

১। "হলোনা হলোনা সই
মরমে মরম লুকানো রহিল বলা হ'ল না ;
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হলোনা হলোনা সই।"
২। তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল।"
৩। হৃদয় আমার হারিয়েছে"—প্রভৃতি।

এ অত্যন্ত ভুয়ো কথা—যতই জোর গলায় বল, ইহা টি'কিবে না। রবীন্দ্রনাথ নিধুগুপ্তের প্রভাব "অতিক্রম" করিতে পারেন নাই—একথা মানিতে হইলে রবীন্দ্রের রবীন্দ্রত্বকেই অস্বীকার করিতে হয়। প্রতিভাকে অস্বীকার করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা করিতে পার কিন্তু প্রতিভার আলো কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। জগতে এর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডভাবে দেখিলে তো চলিবে না, তাঁহাকে সমগ্রভাবে দেখা চাই। তিনি যদি কেবলমাত্র গোটা-কয়েক বিরহ বা মিলনের টপ্পা লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে চাই-কি এমন কথা তোলা চলিত। কিন্তু তাঁহার শক্তি যে বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তো কোনো গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই—তাহা নব-নব বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া অসীমতার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই অপরের কথা দূরে থাক, তিনি নিজেকেই নিজে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। লেখক যে লাইনগুলি উদ্ধৃত কবিয়াছেন তাহা ত রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বস্ব নহে—এবং সেগুলিও যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তাহাও নয়। কাজেই সেগুলি লইয়া রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা চলে না।

আর তা ছাড়া, সকল মানুষের মধ্যে কতকগুলা সাধারণ ভাব আছে—সেগুলোর মূল-কথা লইয়া সাহিত্যের বিচার হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া কোন্ আকারে তাহা ফুটিয়াছে তাহাই দেখিতে হয়। নইলে মূলভাব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় সাহিত্যের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত গোটা-কয়েক সূত্র ছাড়া বেশি-কিছু সৃষ্টি হয় নাই। কয়েকটা-মাত্র সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা বিশ্বের সমস্ত প্রতিভাকে বাঁধিয়া ফেলা যায়।

*
* *

ভাষা বিভ্রাট

বৈশাখের "উপাসনা"য় "ভাষা বিভ্রাট" নামে একটি লেখা বাহির হইয়াছে। লেখক এই রচনাটিতে শুধু ভাষা নহে, ভাবেরও বিভ্রাট ঘটাইয়া প্রবন্ধটির নাম সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'উপাসনা'র লেখক একস্থানে বলিতেছেন, "নবীনগণ নিজ নিজ নবীনতার জন্য এবং নব নব ভাবের আমদানির দরুণ ভাষাকে সরলতা ও ভাবহীনতার দিকেই টানিয়া লইয়াছেন।" —এই নব-আবিষ্কৃত তথ্যের অর্থ খুজিয়া পাওয়া শক্ত। "নব নব ভাবের আমদানি" যখন হইতেছেই, তখন ভাষায় আবার "ভাব-হীনতা" থাকিবে কি-করিয়া? এ উক্তির টীকা করিতে পারেন, কে এমন মল্লিনাথ আছেন?

"পদ্য আপন ছন্দ আপন গতির তালকে বাঁচাইতে গিয়া ভাষার আসরের ফরাসের বাহিরে পা ফেলিলে কেহ তেমন দোষ

ধরিবে না। কিন্তু গদ্যের সে ক্ষমতা নাই। তাহার আসরের বাহিরে যাইবার জো নাই, সাজ পরিবর্ত্তনের জো নাই এবং বিষয়, সময়, তাল, মান সর্ব্ব বিষয়েই তাহাকে বাঁধা নিয়মে চলিতে হইবে।”—এ কি পিনাল-কোডের ধারা বাঁধিয়া সাহিত্য চালাইবার ব্যবস্থা? গদ্য “সর্ব্ববিষয়েই” বাঁধা নিয়মে চলে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার তো কোথাও দেখি নাই। গদ্য যদি চিরকাল বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিয়া থাকে ত তার রূপ পরিবর্ত্তন হয় কেমন করিয়া?

অবশ্য বন্ধন যে একেবারে নাই তাহা নহে। সাহিত্য বলুন, শিল্প বলুন রূপের দিক দিয়া সকলেরই একটা বন্ধন আছে বটে কিন্তু ভাবের দিক দিয়া যে স্বাধীনতা তাহা ঐ রূপের খোলস হইতে উহাদিগকে মুক্তি দিয়া নূতন রূপ দান করে। সেইজন্য এক রূপের বন্ধনটাই যে চিরস্থায়ী তাহা নহে। তা যদি না হইত তাহা হইলে জগতের সমস্ত চিন্তা মাত্র-কয়েকটা বাঁধা রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইত;—থাকিত কেবল কয়েকটা বুকনির ছাঁচ;—সাহিত্যে শিল্পে এত বৈচিত্র্য আসিত না। আর, নিয়মকে বড় করিলে ত চলিবে না, কারণ সৃষ্টি আগে, পরে নিয়ম—এ ত জানা কথা। নিয়ম শুধু সৃষ্টির রহস্যকে প্রকাশ করে মাত্র—সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে না। সাহিত্য ত সৃষ্টিরই কাজ। কলে ফেলিয়া যদি এক-মার্কা মারা সাহিত্য তৈরি করিতে চাও তবে একেবারে ঠিকঠাক বাঁধা-নিয়মে কল চালাইতে পার।

লেখক নিজে যে নিয়মের কথা তুলিয়াছেন প্রবন্ধের মধ্যে তিনি সে নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে বাঁধা-নিয়মে বাংলা ভাষা আগে চলিত ঠিক সে নিয়মে তাঁর ভাষা চলে নাই। তাঁর ভাষা শুধু ফরাসের বাহিরে নয়, ফরাস ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে ছুটাছুটি করিয়া হাঁপাইয়াছে। তিনি এমন সব অদ্ভুত বাক্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা বাংলার বাঁধা-নিয়মের মধ্যে কিছুতেই আসে না। এমনটা কেন হইল? ইহার মধ্যে অক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু অক্ষমতাটাই সব নয়।

আর একটা কথা লেখক বলিয়াছেন, “গুরুচণ্ডালি দোষ গদ্যে যতটা কাণে ঠেকিবে পদ্যে ততটা নয়।”—কথ্য বা লেখ্য ভাষায় এবং গদ্যে বা পদ্যে—গুরুচণ্ডালি দোষ সর্ব্বত্রই নিন্দার বিষয়। এ দোষ গদ্যে যাঁর কাণে ঠেকে না, তাঁর কাণে কোনো দোষ আছে নিশ্চয়।

লেখক ভাষার স্বাধীনতার পক্ষপাতী নহেন অথচ তিনি শব্দ সম্বন্ধে এতটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন যে বলিবার নয়। কথায় কথায় ইংরাজি বুকনি যথা—“Direct descendant, upstart, provincialism, conscious, conclusion draw, cultured, ইত্যাদি!

*

* *

ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গ

জ্যৈষ্ঠের ‘প্রবাসী’তে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর “আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি” নামে সুলিখিত প্রবন্ধের একস্থলে আছে—“এখনকার সামাজিক জীবনের পাঁক ইবসেনের সামাজিক নাট্যগুলিতে প্রচুর উঠিয়া

আসিয়াছে বটে; কিন্তু সেইসঙ্গে সেই নাট্যগুলির মধ্যে পূর্ণতর সমাজ শতদলের ভাবী বিকাশের একটা অস্ফুট আভাসও যেন আছে। ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গ প্রভৃতির মধ্যে সেই আভাসটুকু বাদ পড়ায় এবং পাঁকের পরিমাণ বেশী জমিয়া উঠায় তাঁহারা পাঠকদিগকে রাশীকৃত অর্থহীন তথ্যের তলায় চাপা দিয়া শ্বাসরোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এইজন্য এই সকল লেখককে অবনতিশীল শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইয়া থাকে।”

এত সহজে ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গের প্রতিভাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় কিনা, ভাবিবার কথা। “অস্ফুট আভাসও যেন আছে”—এই সংশয়পূর্ণ উক্তিটির জন্য ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গকে খাটো করা যায় কি? আমাদের বিশ্বাস, “সমাজ শতদলের ভাবী বিকাশের একটা আভাস”—ষ্ট্রাইন্‌ণ্ডবার্গের রচনায় “অস্ফুট”ত নয়ই, বরং প্রস্ফুটই বলিতে হইবে। ইব্‌সেনের মত ষ্ট্রাইন্‌ড্‌বার্গের লেখাতেও “সামাজিক জীবনের পাঁক” আছে বটে, কিন্তু সে পাঁক হইতে শতদলও উঠিয়াছে। Father ও There are Crimes and Crimes প্রভৃতি নাটকে ষ্ট্রাইন্‌ড্‌বার্গ যে খালি পাঁক্ ঘাঁটিয়াছেন, এ-কথা কেহই বলিতে পারেন না। পরন্তু, শেষোক্ত নাটকখানিতে বাস্তব আর্টের সহিত আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব মিলন দেখা যায়। বিখ্যাত সমালোচক অষ্টিন হ্যারিসনের মতে “In Father and The Dance of Death he reached Ibsen at his highest”। Father সম্বন্ধে তিনি বলেন, “In its essentials, it is a moral Play”। প্রবন্ধের গোড়াতেই অজিতবাবু যে “অতীন্দ্রিয় প্রাণে”র কথা বলিয়াছেন, ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গে তাহারও অভাব নাই। “The Mystical in Art” বলিতে যাহা বুঝায়, ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গের লেখায় তাহার বিকাশও যথেষ্ট। Symbolistic Play বা রূপক নাট্য ষ্ট্রাইন্‌ডবার্গ যত-বেশী লিখিয়াছেন তত বেশী আর-কিছু নয়। সেগুলি গুণ্‌তিতে উনিশখানি; এবং ইহার অনেকগুলিতেই বাস্তবতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার ও অতীন্দ্রিয়তার বিচিত্র ইন্দ্রজাল আছে।

*

* *

সাহিত্যের ভাষা ও চলতি কথা

জ্যৈষ্ঠের “ভারতবর্ষে” শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম, আর, এ-এস রচিত “সাহিত্যিক ভাষা ও চলিত কথা” নামে একটি লেখা বাহির হইয়াছে। লেখকের মূল বক্তব্য এই যে, তিনি সাহিত্যিক ভাষায় চল্‌তি কথার পক্ষপাতী নন। প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি বলিতেছেন, —“একজন মূর্খ কৃষকের ক্ষেত্রের বিবরণ ও বাগ্মীবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বক্তৃতা যে এক নহে, তাহা কে-না জানে।” —লেখক গোড়াতেই গলদ করিয়া বসিয়াছেন। কারণ, যাঁহারা চল্‌তি ভাষা চালাইতে চান, তাঁহারা “মূর্খ কৃষকে”র ভাষা অবলম্বন করেন না। তবে চাষার ভাষাতেও তাঁহারা লিখিতেন বটে,—যদি তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইত,— যদি তাহাতে আর্ট থাকিত, সঙ্গতি থাকিত, সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশের বাধা না ঘটিত। চাষার

ভাষা অশিক্ষিতের শৃঙ্খলাহীন ভাষা,—সেই জন্যই তাহা অচল। কিন্তু প্রতিভা থাকিলে চাষার ভাষা হইতেও শ্রেষ্ঠ কবিত্ব সৃষ্টি হইতে পারে,—এর প্রমাণ কৃষক-কবি বার্নস্। তাঁহার ভাষা চাষার ভাষা হইলেও তাঁহাকে চাষাড়ে বলিয়া কেহ নাক বাঁকান না। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গলার অসংখ্য গ্রাম্য কবির লেখা পড়িলেও এ সত্যটি বেশ বোঝা যায়। লেখক বলিতেছেন, "আস্‌তে আজ্ঞা হউক স্থলে আস্‌তে হুকুম হোক বলিলে চমৎকার ভদ্রতা প্রকাশ পাইবে কি? 'কুশল', 'মঙ্গল', 'প্রণাম' কথার ঠিক চলিত কথায় অনুবাদই হয় না।"—সকলের আগে লেখকের এটুকু মনে-রাখা দরকার যে, অনেক সংস্কৃত কথা চল্‌তি হইয়া গেছে এবং চল্‌তি ভাষা মানে সংস্কৃতের অনুবাদ নয়। চলিত কথায় সংস্কৃতের বাংলা অনুবাদ যেমন অদ্ভুত শোনায়, চল্‌তি কথাকেও সংস্কৃতের ছাঁচে ফেলিলে তেমনি অদ্ভুত শোনায়। "মাথা খাও সেখানে যেয়ো না" না-বলিয়া যদি "মস্তক ভক্ষণ কর তথায় গমন করিও না" বলা হয়, কিম্বা "সে এখন আমার হাতে" না বলিয়া "সে অধুনা আমার হস্তে" "তার কপাল ভাঙিয়াছে"র পরিবর্তে "তাহার ললাট-দেশ ভঙ্গ হইয়াছে" বলিলে কেমন শোনায়? চল্‌তি কথাকে সংস্কৃতে তর্জ্জমা করিয়া অনেক স্থলে শুদ্ধ ভাষা তৈরি করা হয়। বাজারে তাহাই খাঁটি মাল বলিয়া চলিতেছে। যাঁহারা চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী তাঁদের ঐখানেই বিশেষ আপত্তি। তাঁরা চান বাংলা ভাষার অকৃত্রিম, স্বভাব-সুন্দর সহজ-সরল রূপ। বাংলার ঐ সহজ রূপ মুখে যে ভাষা চলে তার মধ্যেই আছে।

"যখন লোকের ভাষায় শিল্প সৃষ্টি করিতে হয়, তখন চলিত কথায় তাহার চলে না, তখন নানাভাবে চলিত-কথাকে বাড়াইয়া কমাইয়া, নূতন করিয়া কুটিল আড়ম্বরপূর্ণ, কৃত্রিম ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।"—কিন্তু এ দোষ কাহাদের? যাঁরা চলতি ভাষায় পক্ষপাতী তাঁরা এ দোষ ততটা করেন না যতটা করেন আমাদের সাধুভাষীরা। কারণ তাঁরাই ত সরল চল্‌তিটাকে সভ্য করিবার জন্য তার ঘাড়ে আড়ম্বরের বোঝা চাপাইয়া তাকে কৃত্রিম রূপ দান করিতেছেন। আর একথা কি বলিবার দরকার আছে যে, কুটিলতায়, কৃত্রিমতায় ও আড়ম্বরে আসল শিল্পসৃষ্টি হওয়া অসম্ভব?

লেখক তারপর বলিতেছেন চল্‌তি ভাষা শিশুর ভাষা -"শিশুর কথা মিষ্ট হইলেও বিজ্ঞের কথার সঙ্গে উচ্চাসন পাইবে না।" এ এমন ছেলে-মানুষী কথা যে এর জবাব দিতে লজ্জা হয়। শিশুর ভাষা অস্ফুট ভাষা। মন যাঁর পরিণত তাঁর ভাষাও পরিণত। যে বয়সে শিশু নয় এমন লোকের মুখেও শিশুর ভাষা শোনা যায়। ভাষা কার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে তা লইয়া বিচার করিলে চলে না, কোন্ মন হইতে উঠিতেছে তাহাই দেখিতে হয়। মানুষ শিশু-অবস্থা হইতে যখন পরিণত অবস্থায় পৌঁছায় তখন যে সে শৈশবের ভাষা ছাড়িয়া দেয় তাহা ত নহে—সেই ভাষাই তার নিজের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তখন পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে।

তখনও সে চল্‌তি ভাষাতেই কথা কয়; বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া অভিধান খুঁজিয়া শব্দ চয়ন করিতে বসে না—গম্ভীর ভাবে সাধু ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করে না। তা যদি কেহ করে ত লোকের কাছে সে হাস্যাস্পদ হয়।

"চলিত কথায় উৎকৃষ্ট ধ্বনি হইতে পারে না।"—এ যুক্তির প্রমাণ কি? রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" ও "খেয়া" প্রভৃতি কাব্য-পুস্তকে এবং "ঘরে-বাইরে" নামে উপন্যাসে কি ধ্বনির অভাব আছে? Irish Ballads and Songs-এ এবং বাংলার অধিকাংশ সঙ্গীত-সাহিত্যে চল্‌তি কথারই বেশী চলন দেখি,—কিন্তু এগুলির ভিতরেও "শ্রুতির ছন্দ বা rhyme নষ্ট হইয়া যায়" নাই। বারন্‌সের কবিতাও তথাকথিত "সাধু ভাষায় রচিত" নয়, অথচ সমালোচকে বলেন, "The words are almost always so apt and full of life at once so natural expressive, and so graceful and musical in their animated simplicity that, were the matter ever so trivial, they would of themselves trun it into poetry."

* *
*

সমালোচনা

হেঁয়ালি। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য, ২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। সুকবি বিজয়চন্দ্রের বাছাই-করা প্রায় শতাধিক খণ্ড কবিতা ও গান এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে; কয়েকটি পুরাতন কবিতাও স্থান পাইয়াছে। নূতন কবিতাগুলি কবির "দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইবার পরে এবং একেবারে অন্ধত্বলাভের পরে রচিত।" কবিতাগুলির স্নিগ্ধ ভাব ও সরল মধুর ঝঙ্কার সহজেই মনকে মুগ্ধ করে। কবিতাগুলি ছন্দে-ভাবে বিচিত্র,—নানা রসে রসালো। গ্রন্থের নাম 'হেঁয়ালি' হইলেও কোথাও অস্পষ্টতা-দোষ নাই—মুক্ত স্বচ্ছ প্রবাহে ভাবের স্রোত অবাধে বহিয়া গিয়াছে। কবিত্ব ও কৌতুকের অপূর্ব্ব সমাবেশে গ্রন্থখানি শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। গ্রন্থে কবির রচিত কয়েকটি সংস্কৃত কবিতাও স্থান লাভ করিয়াছে। ছাপা-কাগজ ভাল।

গ্রহ-নক্ষত্র। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। গ্রন্থখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক—ছেলেদের জন্য লিখিত। এমন সরল সহজ ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে যে বৈজ্ঞানিক দুরূহ তত্ত্বগুলি অল্প-বয়স্ক ছাত্রেরাও কাহারও সাহায্য-ব্যতিরেকে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। পাঠ্যগ্রন্থের বিভীষিকার ছায়া, বিষয়টিকে কোথাও এতটুকু ম্লান বা দুর্ব্বোধ করে নাই। গ্রন্থখানি উপকথার গল্পের ন্যায়ই অপূর্ব্ব কৌতুহলোদ্দীপক, এবং তাহারই মত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বিজ্ঞানের এই দুরূহ বিষয়গুলি এমন সহজে বুঝাইবার ক্ষমতা থাকা সামান্য গুণ নহে

গ্রন্থকার সে ক্ষমতার অধিকারী। গ্রন্থে অসংখ্য চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে; বিষয়গুলি বুঝাইবার পক্ষে সেগুলির সার্থকতা যথেষ্ট। ছেলেদের জন্য লিখিত হইলেও এ গ্রন্থ-পাঠে বয়স্ক পাঠকও উপকৃত হইবেন, প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট।

গয়া-কাহিনী। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। 'গয়ার ইতিহাস' ও রহস্য-বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত—প্রথমভাগে 'পৌরাণিকী কথা', দ্বিতীয়ভাগে 'ইতিহাসে গয়া ও গয়ালী', এবং পরিশিষ্টে 'গঙ্গাধরের স্তব', ও 'গয়াকৃত্যের' বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়াছেন। 'ভূমিকা'য় হিন্দুর শ্রাদ্ধতত্ত্বের আলোচনাটুকু সুনিপুণ; সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। ঐতিহাসিক আলোচনায় গ্রন্থকার এ-দেশের ও বিদেশের সুধীবৃন্দের মতাদি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের হাতেই সে সকলের আলোচনার ভার অর্পণ করিয়াছেন, নিজে কোন মত নির্দ্দেশ করেন নাই। গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশটুকু কৌতূহলোদ্দীপক—নানা তথ্যের সমাবেশে তাহা পূর্ণ। গয়ার মানচিত্র, বিষ্ণুপাদ মন্দির, অক্ষয়বট, ব্রহ্মযোনি, রামশিলা, বুদ্ধগয়ার মন্দির প্রভৃতির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থে দুইটি ত্রুটি লক্ষ্য করিলাম,—এক—ভাষা সর্ব্বত্র সরল হয় নাই, আর—এত বড় গ্রন্থে লেখকের স্বাধীন চিন্তাশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। সুতরাং সাহিত্য-হিসাবে এ গ্রন্থের যে বিশেষ মূল্য আছে, এমন কথা বলিতে পারি না।

রিক্তা। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসতীশচন্দ্র নাগ, টাউন ক্লব, খুলনা। কলিকাতা, মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থের ললাটপটে শ্রীযুক্ত জলধর সেনের এক 'পরিচয়-পত্র' আঁটা আছে। পরিচয়-পত্রের শেষাংশ এইরূপ- "ইনি (কবি) কলেজে পড়েন, অবকাশ-সময়ে কবিতা লেখেন, হয়ত বা আরও কিছু লেখেন। বাঙ্গালী পাঠকবর্গ তাঁহার এই কবিতা পুস্তকখানি ক্রয় করিলে তাঁহার খরচার টাকাগুলি ঘরে উঠিবার পথ হয়; আর কবিযশঃ—সেটা ভাগ্য-সাপেক্ষ!" ইহার উপর আবার 'সংগ্রাহকের' এক 'নিবেদন' আছে। এত ছাপ আঁটা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই কবিতাগুলির ভাবে, ভাষায় বা ছন্দে কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না। পঙ্গু ছন্দ, আড়ষ্ট ভাব ও নির্জ্জীব ভাষাই চোখে পড়িল। সেই মামুলি ভালবাসা' আর 'প্রভু আমি অধম'—ইহারই ধূয়া চলিয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি উপাদেয়। ভূমিকাটি পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়, ঐতিহাসিক উপাদান-সংগ্রহে মুদ্রাতত্ত্ব কতখানি সহায়তা করে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "মুদ্রার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইলেও তদ্বারা যে রাজার নামে উহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহার অস্তিত্বজ্ঞাপন ব্যতীত অপর কিছু প্রমাণ করিতেছে বলা যায় না। কিন্তু যে সকল দেশে প্রাচীনকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই, যে সকল দেশে জনপ্রবাদ, বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসন এবং সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিয়া লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হয়, সে সকল দেশে প্রাচীন মুদ্রা ইতিহাস-রচনার একটি প্রধান উপকরণ।" এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভকাল হইতে উত্তরপথে ও দক্ষিণপথে মুসলমান বিজয়কাল অবধি প্রাচীনমুদ্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে বিবরণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যেক যুগের ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের মুদ্রার বিবরণ এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রমাণ-প্রয়োগে সংগ্রহকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃঃ পূঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুদ্রার প্রচলন ছিল;

বিদেশীয় মুদ্রার প্রচলনও সে সময় দেখা যায়। ছাঁচে ও ঢালাই করিয়া, দুই ভাবেই মুদ্রাঙ্কন হইত। যতদূর জানা গিয়াছে, ভারতে সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রার আকার ছিল চতুষ্কোণ—পরে তাহা গোলাকারে দাঁড়াইয়াছিল। রৌপ্য, তাম্র ও সুবর্ণ ধাতুই মুদ্রা-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। গ্রন্থখানি আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসের এই অভিনব বিভাগের আলোচনা দ্বারা সংগ্রহকার ভারতীয় ভাষার একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষা, অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা সবিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থে প্রাচীন মুদ্রাদির বহু প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে —তবে চিত্র-সূচীর সহিত একটি নির্ঘণ্ট (Index) দিলে আরও ভাল হইত। সূচী-বর্ণিত মুদ্রাগুলি কোন্ সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র নির্ঘণ্টে বা চিত্র-সূচীর সঙ্গে দেওয়া থাকিলে পাঠকদের সুবিধা হইত। যাহা হৌক, বিদেশীয় ভাষায় ভারতীয় মুদ্রার বিবরণী সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি বর্ত্তমান থাকিলেও ভারতীয় কোন ভাষাতেই এরূপ কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং ভারতীয় ভাষায় রচিত —বিশেষ বাঙ্‌লা ভাষায়—মুদ্রাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় এই প্রথম গ্রন্থখানি যে সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রহকার আশা দিয়াছেন, 'প্রাচীনমুদ্রা'—দ্বিতীয় ভাগে, মুসলমান-আমলের মুদ্রার বিবরণ তিনি প্রদান করিবেন। আমরা সাগ্রহে দ্বিতীয় ভাগের প্রতীক্ষায় রহিলাম। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি ভালই হইয়াছে এবং বিষয় প্রভৃতির তুলনায় মূল্যও অধিক নহে।

বেসুর বীণ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসত্যচরণ নাথ, নৈহাটি-শ্রীরামপুর খুলনা। কলিকাতা মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ; কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলির ভাব স্পষ্ট, সহজ; —ভাষা সরল। কবিত্বেরও পরিচয় পাইলাম।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র—মূল্য ।৹ শ্রীহেমলতা সরকার প্রণীত। এই ৫০০ পৃষ্ঠার জীবন-চরিতখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। গ্রন্থে যাঁহার জীবন-চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে তিনি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; গ্রন্থ-কর্ত্রী অতি সাবধানে স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্রের জীবনী-কথা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অতি সরল ও সুমার্জ্জিত ভাষায় এই জীবন-কাহিনী সকলের সুখপাঠ্য করিয়াছেন। এ যুগের সাহিত্য-সেবকদের নিকট এ গ্রন্থখানি বড়ই উপাদেয় হইবে; কারণ মিত্র মহাশয়ের বংশ-কথা-প্রসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সময়ের ঐতিহাসিক কথা অনেক পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ বংশের উৎপত্তি ও প্রসার দেখাইতে গিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের সমগ্র কায়স্থ সমাজের ইতিহাসের একটা অংশ যে-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয়ই এই গ্রন্থ খানিকে আদর করিবেন। মিত্র মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র পূর্ব্বাঞ্চলেই ছিল বলিয়া তাঁহার সাধুতা ও বদান্যতার কথা তেমন সুপ্রচারিত নহে। কিন্তু গ্রন্থে ঐ গুণগুলির পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে যে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সামাজিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ও লোকসেবার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মূলে সর্ব্বত্রই স্বর্গীয় ব্রজসুন্দরের পরিশ্রম, উদ্যোগ, দান ও ধর্ম্মপ্রাণতা রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্বাঞ্চলের যত সাধু অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠাতা এই ব্রজসুন্দর এবং যত লোক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের সহায় ও বন্ধু এই ব্রজসুন্দর। পূর্ব্ববঙ্গের সকল নামজাদা কৃতী পুরুষই যাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন, সেই মহাপুরুষের কীর্ত্তি-কাহিনী সকলের কাছে উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী আমাদের সাহিত্য ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

দীপ-শিখা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

৪০শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৩ [৪র্থ সংখ্যা

চিত্রাবলী

১

মায়াবতী

কুমায়ুন প্রদেশে হিমালয়ের শীর্ষে বিবেকানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থল। এখানে প্রাচ্য সন্ন্যাসীরা পশ্চিমে বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রস্তুত হন এবং পাশ্চাত্য জিজ্ঞাসুরা প্রাচ্য সাধু বনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ইহা একটি ইংরেজ দম্পতীর অর্থে পরিচালিত হইতেছে। সাহেবের দেহাবসান হইয়াছে। তাঁহার সন্তানহীনা বৃদ্ধা পত্নী এই আশ্রমবাসী সকলের জননী-স্বরূপিনী হইয়া দয়ামায়া নিয়ম ও শৃঙ্খলায় ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজমানা রহিয়াছেন।

এ আশ্রমটি রেলপথ হইতে শত ক্রোশ ব্যবধানে, ভীষণ অরণ্যে পরিবেষ্টিত। তিন মাইল দূরে একটি গ্রাম্য পোষ্টাফিস আছে। তিন মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নাই। সামনের পাহাড়ে একটুখানি ছপ্পরে দূরাগত গোয়ালারা গরু-মহিষ লইয়া থাকে। সকালে বিকালে মাঝে মাঝে সেখান হইতে ধোঁয়া উঠিতে দেখা যায়। সেই ধোঁয়াটুকু বড় মিষ্ট। তাহা হইতে শুধুই "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" নহে—"পর্ব্বতো লোকবান্ ধূমাৎ" ইহাও অনুমিত হয়। ধোঁয়াটুকু মনুষ্য আবাসের ইঙ্গিতকারী, নিতান্ত দীন-দুঃখী পাহাড়ীদের একমাত্র সুখ ও আরামের নিশানা।

এখানকার পাহাড়ী আকাশ সারাদিন একটা শব্দে ছাইয়া থাকে। এ অঞ্চলে মহিষের গলায় যে একটা প্রকাণ্ড তামার ঘণ্টা বাঁধা রহে, অনেক দূর-দূরান্তর হইতে সেই ঘণ্টারব শিখরে শিখরে অনুরণিত হয়। গোয়ালারা ঘণ্টারব অনুসরণ করিয়া

দূরগত বিপথগামী পশুকে বাঘ-ভাল্লুকের গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোষ্ঠে ফিরাইয়া আনে। পথে আসিতে অচেনা অজানা নির্জ্জন গিরি-প্রান্তরে এই ঘণ্টা-রব মনে ভারি বিষণ্ণতা আনিয়াছিল। কিন্তু এই পরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন ইহা একটা স্নিগ্ধতা একটা সজনতার ভাব লইয়া আসে।

এখানে বসিয়া বসিয়া মেঘের জন্ম দেখা যায়। প্রথমে একটা ছোট স্রোতস্বতীর উপরে একটুখানি শিশু-মেঘ চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে। ক্রমে সে বড় ও হৃষ্টপুষ্ট হইতে থাকে। পাহাড়ের এ ধারে সবুজ গাছ-পাতার গায়ে গায়ে ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। ক্রমে কটা রঙ হইয়া আকাশের গায়ে মিলাইয়া পাহাড়ের ওধারে গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

আপাততঃ এখানে দুজন পাশ্চাত্য পুরুষ আছেন—অমৃতানন্দ ও ম্যাকনেল,. দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন রকমে পাশ্চাত্য গুণের আদর্শ ধরিয়া দেখাইতেছেন। জ্ঞানী অমৃতানন্দ তত্ত্ব-জ্ঞানামৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন, তারই লিপ্সু, তাতেই নিমগ্ন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা সহকারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা, বেদান্ত উপনিষদাদি অধ্যয়ন ও মিতাহারে নিয়মিত সময়ে ধ্যান-ধারণাদি সাধনায় তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত নিয়ত রহিয়াছে।

এদিকে কর্ম্মী ম্যাকনেল রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, খালাসীদের মত নীল কাপড়ে, মোটা পুরাণ শততালি-দেওয়া বুট পায়ে, ছাতা মাথায় সারা বাগান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও মালীদের দ্বারা বীজ বোয়াইতেছে, কোথাও গাছের গোড়া খোদাইতেছে, কোথাও আগাছা উপড়াইতেছে, কোথাও সম্বৎসরের ফল পাড়িয়া ঘরে উঠাইতেছে,কোথাও ছাদ মেরামৎ করিতেছে, কোথাও ছুতোরের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফাটক তৈরি করিতেছে, বেড়া লাগাইতেছে,বর্ষাধৌত সাঁকো ফের গাঁথাইতেছে। কাজের শেষ নাই, অক্লান্ত অধ্যবসায়েরও সীমা নাই। এ দেশী ভাষা জানে না, ভাষা শিখিবার জন্য অমৃতানন্দের মত কোন প্রযত্নও করে না। নিজের মতে নিজের প্রথায় নিজের কাজ করিয়া যায়। ৬টা বাজিতেই আশ্রম হইতে নীচের পাহাড়ে আসিয়া চাকর-মহলে গিয়া টিনের ছাদের উপর বাড়ি মারিয়া শব্দ করে—"Get up, get up—you! Himtoa! You—Udia! you—get up—here—get up"—এই করিয়া করিয়া ঘুমন্ত চাকরদের উঠাইয়া দেয়। তারপর তাদের লইয়া সারাটা দিন তুর্কি নাচন নাচায়, তাদের তমোরসাশ্রিত প্রকৃতি হইতে নিজের রজো-প্রভাবে যতটা কাজ আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা লয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজে খাটে, হাসে, রঙ্গ-তামাসা করে। কখন থেকে থেকে বসিয়া পড়িয়া তাদের মত করিয়া বলে—"শিব শিব শিব," আর কপালের ঘাম পোঁছে। কখন তাহারা সাহেবের ভাষায় সাহেবকে বলে—"This not good!" আর মহা হাস্য-কৌতুকের আদান-প্রদান চলে।

অমৃতানন্দ এখানকার সন্ন্যাসীদের নিকটে রাজযোগ শিক্ষা করিতেছেন, আর ম্যাকনেল এই আশ্রমের সর্ব্বসাধারণকে কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিতেছে।

এই আশ্রমবাসী সকলেরই জন্য স্বাধ্যায় —বিশেষভাবে বেদান্তাধ্যায়—ও সাধন নিত্য-কর্ম্মরূপে অবধারিত।

সমস্ত সৃষ্টিকে যে একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দতে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলা, গুটাইয়া ফেলা—আর কোন বিভাজ্য উপাদান বাকী থাকিতে না দেওয়া, তাও শুধুই গায়ের জোরে নয়, কিন্তু এমন নিক্তির ওজনে চুলচেরা সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরীক্ষায় ফেলিয়া দিয়া যে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—এর চেয়ে বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর কি হইতে পারে? স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত লইয়া এই বিজ্ঞান, শুধু এক-একটা স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া নয়, সমগ্রের উপর এই বিজ্ঞান, অংশের উপর নয়। মায়াবতীতে সেই মহাবিজ্ঞানের অনুশীলনের পথ খোলা রহিয়াছে।

সেকালের সব উপাখ্যানেই দেখিতে পাই তপস্যার পন্থা হইতেছে ধারণা ও সমাধি, এবং তাহার ফল হইতেছে ব্রহ্ম জ্ঞান। ধ্রুব বিমাতার নিষ্ঠুর বাক্যে পীড়িত হইয়া ভগবান্‌কে খুঁজিতে গেলেন। নারদ তাঁকে ভগবান্‌কে পাওয়ার পন্থা বলিয়া দিলেন ঐ আসন, ধারণা ও ধ্যান। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে যোগ চাই, যোগের ফলে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, পরস্পর পরস্পরের অঙ্গীভূত, এক অন্যতে অনস্যূত হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও আছে—প্রকৃতি-প্রভাবে যতটুকু বা যতখানি কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে সঙ্গে সঙ্গে তাও কর্ম্মযোগরূপে অনাসক্তভাবে করিতে থাকিবে, নয়ত

যাঁহা যাঁহা কর্ম্ম কিও লালচ লগ্‌
তাঁহা তাঁহা আপ বাঁধাও ॥

সমস্ত হিন্দুধর্ম্মই এই, সমস্ত বেদ-বেদান্ত উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস সর্ব্বত্রই এই একই শিক্ষা, একই কথা। জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, সামলিয়া সামলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—তবেই কাম্যস্থান মুক্তিতে পৌছান যাইবে। মায়াবতী-আশ্রমে এই চৌঘুড়ি চালান হইতেছে। যে বিজ্ঞান পরম বিজ্ঞান, সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের রিসার্চ এখানে চলিতেছে।

কেল্লাগুলা প্রায়ই পাহাড়ের উপরে স্থাপিত হয়। শত্রুর সেখানে ওঠা শক্ত, নীচে হইতে উপরের সব কার্য্যকলাপ দেখাও শক্ত। কিন্তু যারা উপরে থাকে, তারা নীচের সব ব্যাপার অনায়াসে দেখিতে পায়, উপর হইতে কামান দাগিয়া নীচের যেখানে সেখানে গোলা-চালানও সহজ হয়। তেমনি-উচু ভাবের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলে, সমতলস্থ লোকদের ভাবের সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া না ফেলিলে বেশী ফলোপধায়ী কাজ করা যায়। উপর হইতে যে কামান দাগিবে সে দূরদর্শী হইবে, আর তার কাজের ফলও দূরগামী হইবে। তাই নিরাপদ হইতে হইলে ভাবের উচ্চতার উপর দুর্গ বানাইয়া বাস করা চাই, সেখান হইতে কাজ-চালান চাই। এই আশ্রমের নিবৃত্তিধর্ম্মী জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরা সংসারী লোকদের প্রবৃত্তিমূলক কাজে লাগাম ধারণের কৌশল শিখাইতেছেন—যোগঃ কর্ম্মেষু কৌশলং।

সম্মুখে ভারতবর্ষের সীমান্ত, তুষার

পর্ব্বতমালা। এই কঠিন, স্থির, অতি অসহ-শীতল তুষারাদ্রি হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিতে পারিলে তবে ভারতভূমির বাহিরে পদ-ক্ষেপণ হইবে। এই তুষার-প্রাচীরের পরপারে নব নব জাতি, নবসভ্যতা, তাহাদের পিতৃপিতামহাগত নবভাবের সমুচ্চয়। ইহার এপারে ব্রহ্মঘোষ, অতীতের শতসহস্র ব্রহ্মবাদীর উচ্চারিত নাদের প্রতিধ্বনি। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যখন জনকরাজার সভায় গিয়াছিলেন, কতশত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমস্ত উপনিষদে কত অসংখ্যেয় ব্রহ্মবিদ্যার্থীর নাম পাওয়া যায়। সেই বিদ্যার আকাঙ্ক্ষা এই পুণ্য আশ্রমে আজও বলবতী, তাহাই এখানকার জীবনের জীবন।

* * *

২

কামনাদেবীর পীঠ

ভাইসরয় গিয়াছিলেন শীকারে। আজ চারদিন পরে শিমলায় ফিরিলেন। অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় তোপের পর তোপ-সেলামীতে আজ সিমলানগরবাসী সে সম্বাদ অবগত হইল। তোপ গুণিতে লাগিলাম—এক, দুই, তিন, চার……এগার পর্য্যন্ত। তারপর আর মনোযোগ রহিল না—কি জানি, সংখ্যা আরও কতদূর অগ্রগর হইল, বুঝি সতেরোই হইবে।

মগ্ন ছিলাম প্রাচীন ভারতের ধ্যানে। প্রাচীন সভ্যতা, আমাদের পিতৃপুরুষ, তাঁহাদের লক্ষ্য ও চরম আদর্শ, ভাগবতপুরাণের লিখন, এই সকলের অনুশীলনে। খাতায় টোকা দশবৎসর পূর্ব্বের নিজের ভারতবর্ষস্তুতি পাঠ করিতেছিলাম—"মানচিত্রে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ যেরূপভাবে অসমরেখান্বিত দেখা যায় সম্মুখে প্রত্যক্ষে সেই রেখা তরঙ্গান্বিত ভূমি বিরাজিত। হে মম নয়নাগ্রে উদ্ভাসিত পুণ্যভূমি মাতৃভূমি—নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোস্ততে সর্ব্বত এব। তোমার অগ্রে নমস্কার, তোমার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, তোমার সকল দিকেই নমস্কার।"

এমন সময় তোপসেলামী আরম্ভ হইল। আমি নমস্কার করিতেছি হিমালয়কিরীটী ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষ সেই কিরীট নত করিয়া নমস্কার করিতেছে কাহাকে? নব সভ্যতা ও তাহার আধার ও সংরক্ষক এক নূতন অভ্যুদয়প্রাপ্ত নবজাতিকে।

হিমালয়ের শীর্ষে শিমলানগরী বামবাহু ছোট শিমলা পর্য্যন্ত প্রলম্বিত করিয়া প্রজাগণের ঘনসন্নিবিষ্ট আবাসগৃহ সকল বক্ষে পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে স্তরে স্তরে ধারণ করিয়া আছে। আর প্রসারিত দক্ষিণবাহু উর্দ্ধে উঠাইয়া হাতের তেলোখানির উপর রাজপ্রতিনিধির সুরম্য প্রাসাদ নভস্তলে ধরিয়া রহিয়াছে। প্রাসাদ-চূড়ায় লালপতাকা যখন বাতাসে দোদুল্যমান রহে তখন জানা যায় রাজপ্রতিনিধি শিমলায় বিরাজমান, আর ধ্বজাহীন প্রাসাদ প্রতিনিধির শিমলা সহরে অনুপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করে। এই প্রাসাদই শিমলার মর্ম্মস্থল। এই প্রাসাদের গুণেই শিমলা শিমলা। শিমলার স্পন্দন, প্রাণন ও মনন, সঞ্চরণ ও বিচরণ সবই এই

প্রাসাদের তালে। ভাইস্‌রিগ্যাল কৌন্সিলের ইংরেজ মেম্বর, নন্‌-অফিশ্যাল দেশী মেম্বরেরা, ফরেন-অফিস, হোম-ডিপার্টমেণ্ট, রেলওয়েবোর্ড —সবই এক-একটি স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক হইলেও, তাহাদের স্ব স্ব অক্ষগতি থাকিলেও, সকলেই এই ভাইস্‌রিগ্যাল সূর্য্য প্রদক্ষিণে বাধ্য। কোথায় বা প্রাচীন ভারতবর্ষ আর তাহার বেদনির্ঘোষ আর কোথায় এই শিমলায় অত্যুজ্জ্বল বর্ণে অতি সুস্পষ্টরূপে বিভাসিত, পাশ্চাত্যসভ্যতা।

এ কামনাদেবীর পীঠস্থান। ভাইস্‌রিগ্যাল লজেরও উচ্চে যে পাহাড় 'প্রস্পেক্ট হিল' নামে অভিহিত হয়, যাহাকে পাহাড়ীরা 'করেড়ু' বলে, তাহার শিখরে যে মন্দির অধিষ্ঠিত আছে তাহা কামনাদেবীর মন্দির। এই শৈলাবাসে দেবী সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে সকলের হৃদয়ে মায়াজাল বিস্তার করিতেছেন। শিমলায় যে-ই আসে সে-ই প্রায় কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আসে। কিম্বা শুধু কার্য্য-গতিকে বা কেবলমাত্র হাওয়াবদলের জন্য আসিয়া পড়িলেও লোককে কামনা পাইয়া বসে। এখানে নবীন ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের অধিষ্ঠান। তাঁহাদেরই কাহারো না কাহারো নিকট কোন না কোন কামনাপূর্ত্তির অভিপ্রায়ে মর্ত্ত্যজনের সমাগম হইয়া থাকে। যে দেশ বলিয়াছে—

অন্ধ-তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততোভূয় ইবতে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ

—দেবতাগণের পূজা যে করে সে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়,—সেই দেশে দেবতা-পূজার ও তজ্জনিত অন্ধতম ক্লেশপ্রাপ্তির চরমস্থান এই শিমলাশৈল। সবচেয়ে খারাপ কামনা এখানকার সাহেবিয়ানার। "এবার মরে সাহেব হব"—এর জন্যও তর সয়না। এ জন্মেই সাহেব-মেম হবার ষোলআনা কামনা কামড়িয়া ধরে।

বদ্রি কেদারনাথে ভ্রমিয়া শঙ্করাচার্য্য হইবার সখ চাপিয়া উঠিতে পারে, নেপালে গিয়া সম্রাট অশোক বনিবার দুরাশা হৃদয়ে জাগিতে পারে, কাশ্মীরের কন্দরে ফিরিয়া রাজা কনিষ্কের পদাঙ্কানুসরণের প্রবৃত্তি জাগিতে পারে, কিন্তু শিমলায় কালা কৌন্সিলির* চূড়ান্ত লক্ষ্য—একটি আস্ত এস-পি-সিংহ বা আলি ইমাম। বড় বড় সাহেবেরা সদা-সর্ব্বদা আমার বাড়ীতে খানা খাইবে, বাবা-লোকেরা মেম-গভর্ণেস পরি-রক্ষিত হইয়া বেড়াইবে, বড় বড় দেশীয় লোকেরা বড় সাহেবের তুল্য আমাকে সম্মান করিবে। আর তা যদি না হইতে পারে অন্ততঃ ননঅফিশ্যাল ডিনারে ইভনিং স্যুট পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইব, পঞ্জাব-লাটের পার্টিতে ফ্রক কোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জাহির করিয়া আসিব, রায়সাহেব, রায় বাহাদুর, সি-আই-ই, হাইকোর্টের জজশিপ—কিছু-না-কিছু একটা জুটিয়া যাইবে, নিদেন ছেলেটার জন্য একটা বড় চাকুরী। কোথায় দেশময় স্বাবলম্বন প্রচারের সংকল্প, কোথায় স্বাধীন জীবিকার স্বপ্ন—আর কোথায় কামনা হইতে কামনান্তরে পড়িয়া ফাঁদে-পড়া পাখীর মত ধড়ফড়ানি।

* ভাইস্‌রিগ্যাল কৌন্সিলের দেশী মেম্বরকে পাহাড়ীরা এই নামে অভিহিত করে।

ধন্যা দেবি তুমি শিমলাশিখর-বাসিনি!

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতীহিসা

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রচচ্ছতি।

জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মহামায়া তুমি মোহে নিক্ষেপ করিতেছ।

আমার বাড়ীটা করেড়ু-চক্রের পথে, ঠিক কামনাদেবীর পাদতলে। চিরাগের নীচে যেমন অন্ধকার, কামনার পদতলে তেমনি নিষ্কামতা থাকিতে পারে কি? তা যদি হয় তবে দাও দেবি এ মোহজাল ভাঙ্গিয়া—ঐ ভাইসরিগ্যাল লজের মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়া দাও।

হে ভারতবর্ষ, নবপ্রভাবের প্রতি তোমার তোপসেলামী সত্ত্বেও তোমাকে আমার নমস্কার। তোমার অগ্রেও নমস্কার, তোমার পশ্চাতেও নমস্কার। তুমি কাল যা ছিলে তাহাকেও নমস্কার, ভবিষ্যদ্গর্ভা তুমি আজ যা আছ তাহাকেও নমস্কার! তোমার বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই আমার মুক্তি!

শ্রীসরলা দেবী।

একা

নিরন্তর একা আমি শ্রান্ত উদাসীন,
দিনের সহস্র আলো অবসাদে ক্ষীণ
আজি মোর নয়ন-সম্মুখে,
পুষ্পসম পরিপূর্ণ সুখে
আরতো জাগে না দৃষ্টি প্রভাত-সময়,
কীটে কাটা কোরকের বন্ধ আঁখি অন্ধকারময়!

নভ হতে কাকলির যে ঝরণা ঝরে,
তাহার বারতা নাই আমার অন্তরে,
সে পরশে জাগে নাক আর
বক্ষোলীন গানের ঝঙ্কার
উষার প্রত্যক্ষদান, জাগরণ সুখ,
আজি এ জীবন হতে অকস্মাৎ একান্ত বিমুখ!

নাই গতি, নাই গীতি, বর্ণ গন্ধ শেষ—
অন্ধ নয়নের পরে নিষ্ফল নিমেষ,
স্পন্দমান বক্ষের উপরে,
মৃত্যু শুধু নিঃশব্দে সঞ্চরে,
দিগন্ত ভরিয়া গেছে যুগান্তের মেঘে,
প্রলয়ে নিলীন পৃথ্বী আজি আর কিছু নাই জেগে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।
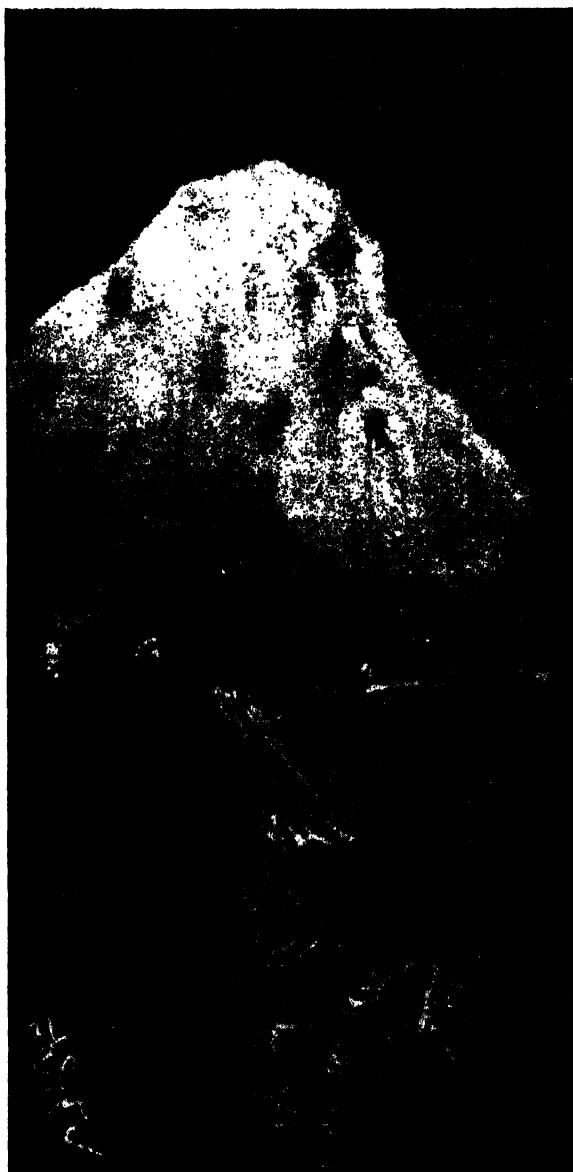
শীত (ফাল্গুনী)

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

স্বেচ্ছাচারী

১০

বন্ধন! চারিদিকেই বন্ধন! কর্ত্তব্যের বন্ধন, উচ্চ আশার বন্ধন, ধর্ম্মের বন্ধন, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বন্ধন, এমন কি স্নেহেরও বন্ধন! স্বাধীনতার নাম-গন্ধ এ জগতে নাই! এক পা এদিক-ওদিক ফেলিবার জো নাই, ফেলিলেই চারিদিক হইতে চীৎকার, ক্রুদ্ধ অভিশাপ, অথবা কাতর ক্রন্দন! যিনি গুরু, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর, আর কিছু করিতে পারিবে না; যিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর্ত্তব্য, অন্য কিছু করিলে পাপ হইবে; যিনি ভালবাসেন, তিনি বলিতেছেন, ইহাই কর; আর কিছু করিলে আমার কষ্ট হইবে, আমি কাঁদিব। অথচ কেহই একবার ভাবিয়া দেখিবেন না, আমার কি প্রয়োজন, আমি কি চাই! আমার ক্ষুধিত হৃদয় যাহার জন্য কাঁদিতেছে, তাহার দিকে চাহিবারও আমার অধিকার নাই, চাহিলেই হয় রক্ত চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ, নয় কর্ত্তব্যের সিংহনাদ,—অথবা স্নেহের করুণ আর্ত্তস্বর! কার্ত্তিক অতিষ্ঠ হইয়া ভাবিল, এই বন্ধনের মূলোচ্ছেদ করিতেই হইবে!

বাহির হইতে টানাটানি করিলে সমস্ত বন্ধনগুলি একজোটে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। কিন্তু একে একে প্রত্যেক বন্ধনের মূলদেশ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ করিতে পারিলে হয়তো সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব এখন হইতে তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইল, সেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা প্রয়োগ করা।

কার্ত্তিক তাহার পিতার পত্রের অতি বিনীত উত্তর লিখিয়া সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শশিভূষণ তাহা পাঠ করিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করিল—

"সঙ্গাৎ সংযাতে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি॥"

কার্ত্তিক বলিল, "অর্থাৎ আমি নাশের দিকে যাচ্ছি। তোমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়েছে, তবু কেন নাশের দিকে যাব?"

শশিভূষণ কহিল, "অর্থাৎ এত বড় মিথ্যা চিঠি যখন তুমি লিখতে পেরেছ, তখন তোমার বুদ্ধিনাশ না হোক সম্মোহ পর্য্যন্ত হয়েছে। সম্মোহের পর যে যে অবস্থা শাস্ত্রে লেখা আছে, তাই দেখবার জন্য আমরা প্রস্তুত রইলুম। এখন যাও যেদিকে খুসি, আমরা আমাদের কাজ করি। আর তুমি বিরক্ত করতে এস না।"

কার্ত্তিক কহিল, "অর্থাৎ তোমরা আমায় ত্যাগ করলে।"

শশিভূষণ কহিল, "কিরে সর্ব্বা? তোর সে শ্লোকটা কি, সেই 'বোরগন্ধতা'—?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার অপরাধটা কি যে তোমরা এত বড় শাস্তি দিচ্ছ? সংসারে

যে যা চায় সে তা পায় না, তাই বলে কি মানুষ কিছু চাইবেও না? এতবড় পরাধীনতা কি নিষ্ঠুরতা নয়? তোমাদের এতবড় নির্দ্দয়তার কি কোন শাস্তি কেউ দেবে না? এমন কি কেউ নেই—”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “কৈ আর আছে! থাকলে আর তোমার মত স্বার্থসেবী আত্ম-পরায়ণ জীবের কোন শাস্তি হয় না?”

কার্ত্তিক কহিল, “আরও শাস্তি চাই! আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করছি, জগতে সব-চাইতে বড় যা শাস্তি আমি তাই নেব। আমি বুঝেছি, সবাই যা চায়, আমি তা চাই না, এই আমার অপরাধ, সবাই যা করে আমি তা করি-নে, এই আমার অপরাধ। আর সব চেয়ে অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে আমি কারও পাকা ধানে মৈ দিই নি, আপনার সামান্য একটু কামনা নিয়ে জগতের একপাশে সরে থাকতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তা হতে পেল না, কারণ আমি পরাধীন!”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “না, সব-চাইতে যা বড় অপরাধ, সেইটেই তুমি বললে না, তোমার সর্ব্বাধম অপরাধ এই যে তুমি স্বেচ্ছাচারী। নিয়মের সংসারে থেকে যে নিজেকে অনিয়মের অধীন করে তোলে, তাকে সংসার কখনই মার্জ্জনা করবে না।”

শশিভূষণ কহিল, “সংসারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি যে, জগতে যে বস্তু সব-চেয়ে ভাল, তাই যদি আবার কোন কারণে খারাপ হয় তাহলে তার মত খারাপ আর কিছু হতে পারে না; ভাল বস্তু নষ্ট হলে তার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হতে হয়। কার্ত্তিক, তোমার বাবাকে যখন তুমি ঠকাবার চেষ্টা করেছ, তখনই বুঝেছি যে তোমার আর আশা নেই। বাপকে যদি ঠকাও তাহলে আর কোন্ পাপের ভয় তোমায় ঠেকিয়ে রাখবে?”

কার্ত্তিক কহিল, “এই চিঠিতে বাবার চোখে যে ধূলো দেবার চেষ্টা করেছি, তাই বা তুমি কেমন করে জানলে? আর যদিই-বা কারও চোখে ধূলো দি, তিনি ত ইচ্ছা করলে চোখ ঢাকতেও পারেন! তোমরা ত রয়েছ, তাঁদের সাবধান করে দাও না কেন! লিখে পাঠাও যে কার্ত্তিক আর আপনাদের স্নেহের উপযুক্ত নেই। এখন তার চরিত্র, তার সুবুদ্ধি সমস্তই এমনি পচে উঠেছে যে তার দুর্গন্ধে তোমরাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছ?”

শশিভূষণ কহিল, “স্নেহ জিনিষটা চির দিনই নিম্নগামী। যে যত নীচ, যার চরিত্র যত অধঃপতিত, স্নেহপরায়ণ মানুষের, সাধু লোকের স্নেহ ততই তার দিকে ছুটে চলতে থাকে। তুমি যত নেমে যাবে, তোমার বাপ মা আর কালিকাবাবুর স্নেহ ততই তোমার দিকে ছুটে চলবে। প্রমাণ চাও, এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দু’দিন অপেক্ষা কর, দেখবে, তাঁরা তোমার সব দোষ ক্ষমা করে আবার তোমায় তেমনি ভালবাসছেন। কিন্তু যদি তুমি মানুষ হও তাহলে তোমার সব কথা খুলে লেখা উচিত! তুমি কি হয়েছ সব কথা প্রকাশ করে বল, তারপরও যদি তাঁরা তোমায় গ্রহণ করেন তাহলে আত্ম-সমর্পণ করবে।”

কার্ত্তিক কহিল, “আমি কি হয়েছি,—

কি দোষ তোমরা দেখতে পেয়েছ, স্পষ্ট করে বল, তারপর আমি সেই কথা সত্য হোক আর মিথ্যা হোক কালিকাবাবুকে লিখে দেব।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "লিখে দাও যে তুমি মনে মনে ভয়ঙ্কর এক মতলব এঁটে বসে আছ। অকারণে কতকগুলি নির্দ্দোষের উপর প্রতিশোধ নেবার মতলব করেছ।"

কার্ত্তিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "প্রতিশোধ আমি নেবই, তবে তাতে কার যে বেশী অপকার হবে, আমার, কি অন্যের, তা বলতে পারি নে। যাক্, তোমাদের কথাই রাখলুম। এই আমি এখনি চিঠি লিখে দিচ্ছি—ঐ সব কথাই লিখব।"

কার্ত্তিক আর একখানা পত্রে সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণ যে সব কথা বলিল, সমস্তই লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। শশিভূষণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ রকম সয়তান আর একটীও দেখিনি। আগেকার কালে শুনেছি ডাকাতের দল খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত, এখনকার কালেও যে তা হতে পারে তা জানতুম না। কালিকাবাবুর হয়েছে এগুলেও নির্ব্বংশ, পেছুলেও নির্ব্বংশ! এমন চিঠি পেয়ে তিনি ত এখনি তেড়ে এসে বলবেন, বাবা কার্ত্তিক, তুমি যাই হও তোমায় আমি ছাড়তে পারব না।"

কার্ত্তিক সত্যই এইবার হাসিয়া ফেলিল; হাসিয়া বলিল, "তাহলে আমিই বা কি করি! আমারও যে আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে ভূতে পায়! তোমরা যা বলছ, তাই করছি, তবু মন পাচ্ছিনে!"

শশিভূষণ কহিল, "আমাদের বিরুদ্ধেও কোন মতলব-টৎলব আছে না কি?"

কার্ত্তিক কহিল, "তা আমি যখন মতলব নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন তোমাদের বিরুদ্ধেও কিছু আছে বৈ কি! আর যদিই বা না থাকে, তবু ত আর তোমরা আমায় বিশ্বাস করবে না। যাই হোক, তুমি আমার একটা উপকার কর—আমার বিষয় যা-যা ধারণা তোমাদের হয়েছে, সমস্ত খোলসা করে কালিকাবাবুকে লিখে দাও। তারপর যা থাকে আমার ভাগ্যে, তাই হবে।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেলে শশিভূষণ সর্ব্বানন্দকে বলিল, "সর্ব্ব, কার্ত্তিক যা বলছে, তাই করব?"

সর্ব্বানন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "না ঠাকুরদা, আমি কোন্ প্রাণে তা করতে বলব? কার্ত্তিক যাই হোক আমার ভাই। মার পেটের ভাইয়ের চেয়েও ঢের বেশী। ও যে আমায় কত ভালবাসে, তা তুমি কি করে জানবে, ঠাকুরদা? কত দিন কত মাস কত বৎসর এক সঙ্গে শোয়া বসা—এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান! রোগে ও আমার সেবক, ভালবাসায় ও আমার সব-চেয়ে প্রিয়তম বন্ধু, হিতেচ্ছায় ও আমার মার পেটের ভাইয়ের চেয়েও বড়। ওকে কি আমি ত্যাগ করতে পারি? মরি যদি ত এক সঙ্গে মরব, পড়ি যদি ত এক সঙ্গে পড়ব; তবু ওকে ছাড়তে পারব না। আমার জীবনে সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ওকে ভালবাসা। ছেলেবেলা থেকে ও আমার যা, তা আমিই জানি, আর ভগবান জানেন!"

শশিভূষণ কহিল, "কিন্তু তবু কালিকা কাকার মেয়ে যদি ওকে বিবাহ করে শেষ অসুখী হয়? কার্ত্তিকের ভাব দেখে বোধ হচ্ছে যে মনে মনে ও কি একটা ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছে। ওর চরিত্র যতদূর বুঝেছি তাতে এই বলতে পারি যে, ও যদি একবার মন্দর দিকে বেঁকে, তাহলে অধঃপাতের চরম সীমায় না পৌঁছে থামবে না। সেইজন্য মনে হচ্ছে, আমাদের কর্ত্তব্য এ বিবাহে বাধা দেওয়া।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তাই যদি কর্ত্তব্য বলে তোমার বোধ হয়ে থাকে, তাহ'লে ও যখন সরোজকে এমন করে প্রাণ দিয়ে চাচ্ছে, তখন সরোজের কাছে যাবার পথই বা ওর পক্ষে বন্ধ করে দাও কেন?"

শশিভূষণ কহিল, "কি জান ভাই, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমি কিছুতেই ভাল বাসা বলে স্বীকার করতে চাইনে। কার্ত্তিকের মত অতখানি শক্তি অতখানি তেজ কি সামান্য একটা অন্ধ নারীর ভালবাসায় আবদ্ধ থাকতে পারে? যদি কার্ত্তিক সরোজকে পেত, তাহলে ফলে এই হত যে সরোজের জীবনও বিফল হয়ে যেত, আর কার্ত্তিকও শীঘ্র অবসন্ন হয়ে নূতনতর উত্তেজনার জন্য ছুটে বেরিয়ে পড়ত।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারলুম না। তুমি হয়তো মিছি-মিছি দুটো জীবনকে বিফল করে দিলে! তারপর যদি কার্ত্তিকের সঙ্গে শৈলজার বিবাহ ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা কর, তাহলে হয়তো আরও একটা জীবন বিফল করে দেবে। আমার মতে তুমি আর এ বিষয়ে কিছু করো না। ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হোক।"

শশিভূষণ এ কথার আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

১১

পুত্রের কাতর প্রার্থনাপূর্ণ পত্র পাইয়া শিবচন্দ্রের অন্তর-বাহির সুগভীর বেদনায় কম্পিত হইয়া উঠিল। কার্ত্তিক তাহার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহার অন্তরের সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করিয়া পরে লিখিয়াছে, "আমার মনের এইরূপ অবস্থা জানিয়া-শুনিয়াও যদি বাবু আমার হাতে তাঁহার কন্যাদান করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে অগত্যা বিবাহ করিতে আমি বাধ্য। ইহা ছাড়া আপনার সঙ্গে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে যে কথা হয়, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, শৈলজার সঙ্গে আমার বিবাহ আপনার তত অভিপ্রেত নয়। তখন যদি বুঝিতাম যে, আপনিও বাবুর মতেই মত দিয়াছেন, এমন-কি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া বাবুর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি এতদূর নীচ প্রকৃতির নই যে আপনি বাক্যদান করিয়াছেন জানিয়াও শৈলজাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইব। যাহাই হউক, এখন আপনিই আমার বিচারক। আমি আপনার অধম পুত্র; এ-রকম অবস্থাতেও যদি আপনি শৈলজাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, লিখিবেন, আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। আমারও একটা সঙ্কল্প ছিল, যে সর্ব্বদাদার সঙ্গে

শৈলজার বিবাহ দিব, কারণ সে শৈলজাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখে; এমন-কি আমি এইরূপ হওয়ার দরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেও আমায় ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। চারিদিক হইতে এমনভাবে পরিত্যক্ত হইয়া আমি বাঁচিব কিরূপে? আপনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, মার কোলেও আমার স্থান নাই, সর্ব্বদাদাও আমার সঙ্গ ত্যাগ করিল। আমি ভগবানের নিকট নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধী;—কিন্তু কি যে আমার অপরাধ, তাহা জানিতে পারিতেছি না, ইহাই আমার ক্ষোভ। তথাপি আমার অপরাধ থাকুক আর নাই থাকুক, আমি আপনারই। পুত্র যত দোষী হোক, পিতা তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আপনি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

শিবচন্দ্র পত্র পড়িয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন, এবং অজ্ঞাতে তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল। পুত্র দোষী হোক আর নির্দ্দোষ হোক, এমনভাবে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে কোলে না তুলিয়া লইয়া কি থাকা যায়? শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পত্র-হস্তে কালিকাবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

কালিকাবাবুর কয়দিন হইতে ক্রমাগত জ্বর হইতেছিল। নানা চিন্তায় ইদানীং তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। তথাপি অক্লান্তকর্ম্মী কালিকাবাবু তাঁহার বিপুল জমিদারী ও বৈষয়িক কার্য্য সমস্তই প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করিতেছিলেন।

জমিদারী কাছারির কাজ দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিকের পত্র পাইয়া তিনি হাতে লইয়া অন্যমনস্কভাবে ভাবিতেছিলেন, এখন খুলিবেন কি না। কি জানি, কেন, এ পত্র খুলিতে আজ কিছুতেই তাঁহার সাহস হইতেছিল না। দুই চারিবার নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি উহা ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া অন্য কার্য্যে মন দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় পত্র-হস্তে ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি কাছারি ছাড়িয়া পাশের ঘরে গিয়া একটা চেয়ারে বসিলেন। শিবচন্দ্রও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

শিবচন্দ্র তাঁহার পত্রখানা কালিকাবাবুর হস্তে দিলেন। কালিকাবাবু আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "এমন ছেলেকেও আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে মর্ম্ম-পীড়িত করেছিলেন? ছিঃ! দাঁড়ান, আমাকেও সে আজ পত্র দিয়েছে, দেখি, তাতেই বা সে কি লিখেছে।" তিনি তখন স্বয়ং তাঁহার সেই পত্রখানা আনিয়া পাঠ করিলেন, সেখানি পূর্ব্ব পত্রেরই অনুরূপ। উপরন্তু কার্ত্তিকের সম্বন্ধে সর্ব্বানন্দ ও শশিভূষণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট লেখা আছে। কার্ত্তিক কোন কথা গোপন করে নাই।

কালিকাবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এখন আপনার মত কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "এমন অবস্থায় কি করে বলতে পারি যে, আপনি এই কার্ত্তিককে আপনার কন্যাদান করুন। সে ত স্পষ্টই বলেছে যে, সে অন্য-গত-চিত্ত; এ-অবস্থায় আমি ত কোন রকমেই

বলতে পারছি না যে, এই অনুপযুক্ত পাত্রে আপনি আপনার কন্যা সমর্পণ করুন।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “অনুপযুক্ত! কি বলছেন আপনি? এতখানি সরলতার কি কোন মাহাত্ম্য নেই? কার্ত্তিক ত কোন কথা গোপন করেনি, এমন-কি এই দেখুন, আমায় যে পত্র দিয়েছে, তাতে সে লিখেছে, সর্ব্বানন্দ আর শশিভূষণের মতে কার্ত্তিক বদমতলবি, স্বেচ্ছাচারী, আত্ম-সুখপরায়ণ! এমন-কি এই পত্রে সে যে সরলতা দেখিয়েছে তাও তাদের মতে ভাণ মাত্র! ওর সমস্তই মিথ্যা, এই কথা তারা বলতে চায়। যে সাহস করে এ-সবও লিখতে পারে, তাকে সন্দেহ করবার কারণ আমি ত খুঁজে পাই না।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “ওর যখন প্রয়োজন যে আপনি ওকে ত্যাগ করুন, তখন ও কেন, মিথ্যে হোক সত্যি হোক, নিজেকে দোষী করে পত্র লিখবে না? ওর ত এই প্রয়োজন যে আপনি ওকে এই বিবাহের দায় থেকে মুক্তি দেন।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “কৈ ও ত মুক্তি চায় নি! ও ত স্পষ্ট বলেছে যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ পুত্রকন্যা জগতে পাওয়া যায় না, তাই বলে বাপ-মা তাকে ত্যাগ করলে সে ত নষ্টের দিকে যাবেই। সবাই ত্যাগ করেছে বলে বাপ-মার তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়, এমন-কি যাতে আবার সে ঠিক পথে চলতে পারে, তাই তাঁদের করা উচিত।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “তবে কেন সে লিখলে যে তার কি দোষ, সে তা জানে না? তার মতে সে কোন দোষই করেনি। আমি তাকে যেমন চিনি, এমন বোধ হয় কেউ চেনে না। আমি জানি, যদি সে ঠিক বুঝে থাকে যে তার অন্যায় হয়েছে, তাহলে সে এখনি ছুটে এসে আমাদের কাছে মাপ চাইবে। এমন করে দূরে থেকে পত্রের দ্বারা কাজ সারবার চেষ্টা করত না। এ পত্র যে ভাণ মাত্র যদিও সে কথা বিশ্বাস করতে আমার মন চাইছে না, তবুও পুত্র-স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি কেমন করে বলি যে, আপনি সমস্ত বিষয় বিচার না করেই এই পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করুন?”

কালিকাবাবু কহিলেন, “ন্যায়রত্ন মশায়, আপনার মত ন্যায়পরায়ণ লোকের কি এত বড় খল-স্বভাব পুত্র হতে পারে? না, আমি বলছি, এ পত্র ভাণ নয়। সে আমার কবল থেকে মুক্তি চাইতে পারে, কিন্তু এ পত্র ভাণ নয়। সে স্পষ্টই তার নিজের বিষয়ে পরের যা ধারণা তাও লিখেছে। এখনো সে বালক মাত্র, তবে মনের এখন যে গতি, দু'দিন পরে তা থাকবে না, এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। তাহলেও ব্যাপার যখন এই রকম দাঁড়িয়েছে, তখন শৈলজার গর্ভধারিণীর কি মত হবে, সেটা এখন জানা প্রয়োজন। আর শৈলজার মনের কথাও যখন জানি, তখন তার মত নেওয়াও প্রয়োজন। তাকে যখন এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রেখেছি, এবং সেও যখন ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছে, তখন তার মতটাও ফেলবার নয়।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “এই অবকাশে আমিও আমার একটা কর্ত্তব্য সেরে নি। আমি

দেওয়ানজীর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি যে, তাঁর পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করব। সেই জন্য বলছি যে, যদিও আপনার কন্যা বাক্‌দত্তা হয়ে রয়েছেন, তথাপি ঐ অন্য-পূর্ব্বা কন্যাকেও তিনি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে রাজী আছেন। আর যদি বলেন যে মণিশঙ্করের মত পাত্রে কি করে কন্যাদান করবেন, তাতে আমি এই বলতে চাই যে, যদি ভাল পাত্র মন্দ হয়ে যেতে পারে, তাহলে মন্দই বা ভাল না হতে পারবে কেন? আজ মণিশঙ্কর অপাত্র, হয়তো বিবাহের পর তাঁর মতি-গতি বদলাতে পারে।"

কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কর্ত্তব্য আপনি করেছেন। এখন তাঁকে বলবেন যে তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য চিরবাধিত হলুম। কিন্তু তাঁর পুত্রকে আমি কন্যা দিতে পারব না। হয়তো ন্যায়ের তর্কে তাঁর পুত্র পাত্র হতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্মের কাজ করছে, তাকে কন্যাদান চিরদিনই অধর্ম্ম। অবশ্য এ কথাও তাঁকে বলবেন যে তাঁর এই অনুপযুক্ত প্রস্তাবের জন্য আমি তাঁর উপর কিছুমাত্র শ্রদ্ধাহীন হইনি। কারণ পিতা মাত্রেই পুত্রের মঙ্গল কামনা করে থাকে। বিশেষত দেওয়ানজী আমার চির-হিতৈষী। তাঁর উপর চিরদিনই আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবে মণিকে কন্যাদান করতে পারব না।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "আমরা হয়তো মণিশঙ্করকে চিরদিনই ভুল বুঝে আসছি। কে জানে, ওর মধ্যেও হয়তো অনেক ভাল জিনিষ আছে, সময় আর অবসরের গুণে সেগুলি প্রকাশ পেলেও পেতে পারে। যাই হোক, আপনি এ বিষয় চিন্তা করে দেখবেন। কার্ত্তিকের প্রতি স্নেহাধিক্যে অন্যের প্রতি অযথা অন্যায় করবেন না। আর আপনি আমার কাছে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তা থেকে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিলুম!"

কালিকাবাবু কহিলেন, "কিন্তু আমি দিলুম না, এটা স্মরণ রাখবেন। আমি দেব-দ্বিজের সাক্ষাতে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা থেকে সহজে চ্যুত হব না। তবে সবই যখন ভগবানের ইচ্ছায় ঘটে, তখন আমার আর অহঙ্কার করে বলবার কিছু নেই।"

শিবচন্দ্র চলিয়া গেলে কালিকাবাবু সেই দিনের জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন; এবং মধ্যাহ্নকৃত্য-সমাপনান্তে শয়ন-কক্ষে পত্নী ইন্দিরা দেবীকে ডাকিয়া আনিয়া কার্ত্তিকের পত্রদ্বয় পাঠ করিতে দিলেন। ইন্দিরা দেবী পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এখন উপায়?"

কালিকাবাবু বলিলেন, "এখন তোমার মত কি? শৈলজা আমার একার নয়, তোমারও। শৈলজার ভাল-মন্দ কেবল আমার উপর নয়, তোমার উপরও সমান-ভাবে নির্ভর করছে। তুমি বুঝে বল যে, বাক্‌দত্তা কন্যাকে অন্য কোন পাত্রে এ অবস্থায় আমার দেওয়া উচিত কি না। একদিকে আমার দেব-সাক্ষাতে শপথ, আর একদিকে মেয়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গল। কার্ত্তিকের মনের অবস্থা জেনেও যদি তাকে

অসৎপাত্র জ্ঞান না কর, অনুপযুক্ত না মনে কর, তা হলে কোন কথাই নেই, কার্ত্তিকের সঙ্গেই বিবাহ হবে। কিন্তু যদি তাকে অসৎপাত্র বলে সাব্যস্ত কর, তা হলে আমার ধর্ম্মচ্যুতিকে গণনার মধ্যেও এনো না।"

ইন্দিরা কহিলেন, "এ চিঠি পড়ে কেমন করে কার্ত্তিককে অসৎপাত্র বলব? সে তো কিছুই গোপন করে নি। তবে মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ! সে যদি সতীর কন্যা হয়, যদি কায়মনোবাক্যে আমি তোমায় ভক্তি করে থাকি, তা হলে শৈলজা কখনই অসুখী হবে না। যে সুখী হব মনে করে, তাকে জগতের কোন দুঃখই বিচলিত করতে পারে না। সব রকম ক্ষতিই সে হাসি-মুখে সইতে পারে।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বাঁচলুম ইন্দু, তোমার আশ্বাস পেয়ে আমি বাঁচলুম! না, আর আমার কোন দ্বিধা নেই। তবে একবার শৈলর মতটা জানা দরকার! কারণ সে এখন বড় হয়েছে, তাকে এই পত্র দেখিয়ে তার মত জেনে এসে আমায় বল।"

ইন্দিরা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ক্ষেপেছ! সে আবার কি বলবে? সে জানে যে তার বিয়ে হয়েছে, এখন একটা লোকাচার-রক্ষার জন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন শুধু বাকী। তবু তার মত জানছি।"

ইন্দিরা দেবী পত্র দুইখানি লইয়া চলিয়া গেলেন।

কালিকাবাবু বিমূঢ়ভাবে প্রতীক্ষার পর স্ত্রীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি বল্‌লে সে?"

"বল্‌বে আবার কি! যা তোমায় বলে গেলুম, তাই। মেয়ে অভিমানে কেঁদে ফুঁপিয়ে অস্থির যে তোমরাও কি না আমার নিজের একটা আলাদা মতের প্রতীক্ষা কর! আমি কি তোমাদের মেয়ে নই? আমি কি পরের পেটের মেয়ে?"

কালিকাবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, "এ যে আরও ভাবনার কথা! যোগ্য সন্তানও যদি এমন করে বাপ-মার উপর নির্ভর রাখে, তাহলে মা-বাপের দায়িত্ব যে ঢের বেড়ে যায়! তাই বল্‌ছি, একটু স্পষ্ট ভাবে যদি—"

"ওগো না গো, না, কেন মিছে ও-সব ভাব্‌ছ? নিজের মেয়েকে কি জন্ম থেকে জানি না! আমাদের ইচ্ছাই যে চিরদিন ওর মনে ঢুকে ওর ইচ্ছার আকারে বেরিয়ে এসেছে। এর চেয়ে আর স্পষ্ট করে সে কি বল্‌বে? আমি যখন বলছি, তখন স্বচ্ছন্দে তুমি এ কথায় নির্ভর করতে পার। আমি যে নিজের মনেই বুঝছি, কার্ত্তিক ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করার কথা মনে ভাবতেই পারবে না।"

কালিকাবাবু একটা নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

১২

প্রভাতে উঠিয়া সরোজ তাহার অতি-প্রিয় ফুলগাছগুলির ফুলের উপর হাত বুলাইতেছিল। শীতের প্রভাতে বেলী যুঁই ইত্যাদি অন্তর্হিত হইয়াছিল বটে, তবু গাঁদা একাই সমস্ত ফুলের অভাব পূর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় সমস্ত বারান্দা আলো করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে নানাজাতীয় গোলাপ শোভায়-গন্ধে বর্ষাভব সমস্ত পুষ্পের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। সমস্তই গন্ধময়, সমস্তই কোমল স্পর্শময়, সর্ব্বোপরি সমস্তই শোভাময়! কিন্তু অন্ধের পক্ষে এই পুষ্পরাশির যাহা পরিপূর্ণ প্রকাশ —সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, তাহাই অস্তিত্বহীন! সরোজ স্পর্শ করিতে করিতে পুষ্পের সেই বহুপূর্ব্বদৃষ্ট শোভাময় প্রকাশকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার অন্তর এখন স্পর্শময়, স্পর্শই এখন তাহার কাছে একমাত্র প্রকাশ! মৌন ফুলগুলি কেবল স্পর্শের ভাষায় কথা কহিতেছে। দর্শনের অভাব-জনিত দুঃখ স্পর্শের সুখে মিলাইয়া যাইতেছে। সরোজ একবার এ টব হইতে একটি, ও টব হইতে একটি এমনি করিয়া অনেকগুলি ফুলে আপনার অঞ্চল ভরিয়া ফেলিয়া উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বাহিরের দরজায় পরিচিত শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শশিভূষণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার-সংলগ্ন চিঠির বাক্সের তালা খুলিয়া কয়েক খানা পত্র বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সরোজ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কার চিঠি পেলে?"

শশী অন্যমনস্কভাবে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল।"

সরোজ কহিল, "কার চিঠি পেয়ে ও কথা বলছ?"

শশিভূষণ কহিল, "তোমার শনির। শনিরাজকে রোহিণী ভেদ করে যেতে দিই নি, চিরকালের জন্য ওঁর গতি সরিয়ে দিয়েছি, এর জন্য এই দশরথকে ধন্যবাদ দাও। এঃ, আজ যে অনেক ফুল তুলে ফেলেছ! যাক্, ভালই হয়েছে, শনির পূজো পাঠিয়ে দাও,—গ্রহরাজ কাঁচা-খেকো দেবতা!"

সরোজ হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কার কথা বলছ, খুলে না বললে আমি কি করে বুঝব?"

শশী কহিল, "ঠিকই বুঝেছ, সরোজ। প্রকাশ করে বলা বাহুল্যমাত্র।"

সরোজ আর একটা গাঁদা তুলিয়া বলিল, "কি লিখেছেন তিনি?"

শশিভূষণ আর একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে বিরক্তভাবে বলিল, "লিখবে আর কি! লিখেছে, 'কাল আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন এই দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করে যেয়ো। ১৮ই বৌভাতে তোমায় সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করলুম।' সবান্ধবটার মানে বুঝেছ? এত বড় নিষ্ঠুর! আমার ইচ্ছে করছে, এই চিঠিখানা ছিঁড়ে ওর মুখের ওপর ফেলে দিতে পারতুম, তাহলে রাগ কতক যেত। তার ওপর ভঙ্গী দেখেছ? আমার বাসার ঠিকানায় চিঠি দেয়নি, এই বাড়ীর ঠিকানায় দিয়েছে, অর্থাৎ যাতে এ চিঠির মর্ম্ম তোমার কানেও পৌঁছোয়! কি কাপুরুষের মত নিষ্ঠুরতা!"

শশিভূষণ পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া একটা টবের উপর ফেলিয়া দিয়া উপরে চলিয়া গেল। আর সরোজ! অন্ধ, আলোক-বর্জ্জিতা, প্রকাশ-শক্তি-হীনা সরোজ

একটা দেওয়াল ধরিয়া সেই চির-পরিচিত পথ দিয়া উপরে যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। যে পথে সে দৃষ্টিবান লোকেরই মত অতি দ্রুত সর্ব্বদা চলা-ফেরা করিতেছে, সেই পথেই আজ সে পথ-হারা! সমস্ত স্পর্শশক্তি স্পর্শের স্মৃতি নিমেষ-মধ্যে তাহার অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া গেল।

এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে স্পর্শের সুখে স্পর্শের আতিশয্যে দৃষ্টির প্রকাশকেও অবজ্ঞা করিতেছিল; কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার অন্তর সেই স্পর্শের জন্যই হাহাকার করিয়া উঠিল। একবার ঐ পত্রাংশগুলি সে স্পর্শ করিবে না? জীবনে একটীবার মাত্র সেই হস্ত-লিখিত পত্রের এতটুকু অংশকে স্পর্শ করিয়া তাঁহারই স্পর্শ সে অনুভব করিবে না? সরোজ ত কিছুই চায় না। দর্শন তাহার পক্ষে নাই, শ্রবণ তাহার পক্ষে এখন দুরাশা, যে স্পর্শ তাহার একমাত্র সম্বল, সেই স্পর্শের যোগেও সেই বাঞ্ছিত স্পর্শকে সে কখনও অনুভব করিতে পায় নাই। কিন্তু ঐ যে অনাদরে অপমানিতভাবে পতিত পত্রাংশগুলি সেই বাঞ্ছিত স্পর্শ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে শশিভূষণ না হয় ঘৃণায় ফেলিয়া দিল, কিন্তু চির-বুভুক্ষিত তাহার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশগুলি কি বলিয়া উহাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? সরোজ আর অগ্রসর হইতে পারিল না—ফিরিয়া দাঁড়াইল। অমনি কোথা হইতে সমস্ত স্পর্শশক্তি ফিরিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল। পুনর্লব্ধ শক্তিতে যেখানে সেই পত্রখণ্ডগুলি পড়িয়াছিল, অনুমান করিয়া লইয়া সে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর স্থিরভাবে কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, কেহ কাছাকাছি নড়িতেছে-চড়িতেছে কি না। শেষে যখন মনে হইল, নিকটে কেহ নাই, তখন অতি সন্তর্পণে সে হাতড়াইতে আরম্ভ করিল! হায়, হায়, এক টুকরা কাগজও তাহার হস্ত স্পর্শ করিতেছে না। একখণ্ড, যত ক্ষুদ্রই হোক, কিছু তাহাতে লেখা থাকুক আর নাই থাকুক, সেই পত্রের এককণা পাইলেই সরোজ বর্ত্তাইয়া যায়! দাও ঠাকুর, দাও দেবতা, সেই পত্রের এক টুকরা তাহাকেও দাও!

পাইয়াছি! পাইয়াছি! ওরে মৌন মূক, তোরা চীৎকার করিস্‌নে কেন, এতক্ষণ? কেন চেঁচাইয়া বলিসনে, এই যে আমরা, তোমার হারানো ধন, এই যে আমরা! পাইয়াছি, ওরে পাইয়াছি। হোক ছোট, হোক তুচ্ছ, তবু পাইয়াছি। সেই স্পর্শের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমার এই ঊষার জগতকে স্পর্শের রসে ভরাইয়া ফেলিয়াছে। পাইয়াছি! ওরে অন্ধকার হৃদয়, শান্ত হ, একেবারে হারায় নাই। আলো আসিয়াছে, যায় নাই, একেবারে চির-অতীতের মধ্যে অস্ত যায় নাই—পাইয়াছি!

সরোজ সেই কাগজখণ্ডকে তাহার সমস্ত শরীর দিয়া স্পর্শ করিল; শেষে মাথায় ঠেকাইল; তার পর ধীরে ধীরে কানের কাছে লইয়া গেল।

কথা কও! আমার চক্ষু নাই। তুমি কি বলিয়াছ, কি বলিতেছ, আমি চক্ষু দিয়া বুঝিতে পারিতেছি না! আমার স্পর্শ আছে, কিন্তু তার কাছে তুমি আজ মূক; স্পর্শ দিয়া কিছুই শুনিতে পাই না যে! কথা

কও! বল, কি বলিতেছ? আমি তোমায় দূরে সরাইয়া দিয়াছি? সেই অভিমানে কি আজ তুমি মূক হইয়া অন্ধের নিকট আসিয়াছ? অন্ধের উপর প্রতিশোধ লইতে তুমি আজ মূকের মূর্ত্তিতে আসিয়াছ! আমি ত শুনিতে পাই, তাই কি তুমি কথাও পরিত্যাগ করিলে? এত বড় প্রতিশোধ! আমি অন্ধ! তুমি মৌন! আমি যে শুনিতে চাহিতেছি, কিন্তু তুমি কিছু বলিবে না? কথা কও, কথা কও, অন্ধের সমস্ত অন্ধকার জগৎ ভরিয়া উঠুক,—তুমি একটীবার মাত্র কথা কও!

সহসা কাহার পদ-শব্দ শুনিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই কাগজের টুকরাটুকুকে আবরণে ঢাকিয়া আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে এতই উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছিল যে তাহার পশ্চাতে আর একজনও যে সন্তর্পণে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সে শব্দ সে অনুভবও করিতে পারিল না। তাহার অন্তরে এই কয় মুহূর্ত্তের জন্য যেন জগতের সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। একটীমাত্র পরিচিত শব্দের আশায় সে তাহার সমস্ত অন্তর্জগতকে সেই কয় মুহূর্ত্তের জন্য শব্দহীন করিয়া ফেলিয়াছিল।

সরোজ অতি সন্তর্পণে সেই কাগজখানি তাহার মাথার শিয়রের একটী কুলুঙ্গীতে রাখিল, তার পর জোড়-করে তাহাকে প্রণাম করিয়া অঞ্চলস্থ সমস্ত ফুলগুলি তাহার উপর ঢালিয়া দিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

শশিভূষণ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে তীর-বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শশিদা, দয়া কর, আর এক মিনিট আমায় সময় দাও।"

শশী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বোন, এক মিনিট কেন, চির-জীবনের জন্যই ত ওকে দিতে পারতুম! হায়, হায়, এ আমি কি করলুম! আমি ত তোমায় বুঝতে পারি নি, সরোজ! সেই হতভাগা তোমায় এ কি করে গিয়েছে! সে যে আমার সরোজের সমস্ত দলগুলি ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে, তা ত' আমি জানতে পারিনি। হতভাগিনী, তাহলে তাকে অমন করে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিলে কেন? যে অন্ধ, সে কি নিজের প্রতিও অন্ধ!"

শশিভূষণ অতি যত্নে অতি ভক্তি-ভরে সেই ফুলগুলি সরাইয়া সেই কাগজের টুকরা-টুকু বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল; পরে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হায়, অন্ধের পূজাও ঠিক জায়গায় পৌঁছায় না! সরোজ, এ কি কাগজ তুমি এনেছ? এ ত কার্ত্তিকের সে চিঠি নয়, এ যে একখানা বাজে কাগজের টুকরো!"

সরোজ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। পূজা পৌঁছিল না! পূজা বৃথা হইল! অন্ধ আমি, তাই কি দেবতাও অন্ধ হইলেন! হতভাগিনীর হাতখানি ধরিয়া কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার পায়ের কাছে লইয়া যাইতে পারিলে না? হায় অন্ধতা! হায় অন্ধকারের অন্ধ দেবতা!

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

কীট-পতঙ্গের জীবনের কার্য্য

প্রত্যেক শাস্ত্রেরই ইতিহাসে এমন দুই-একটা কালের চিহ্ন আছে, যখন বড় বড় পণ্ডিতকেও কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। তখন তাঁহাদের ভালো-মন্দ বিচার-শক্তি অন্তর্দ্ধান করে; কোনো গতিকে গোঁজামিল দিয়া নিজেদের সিদ্ধান্তকে দাঁড় করাইয়া রাখাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য হয়।

অল্পদিন হইল প্রাণিতত্ত্বের ইতিহাসে ঐ প্রকার একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে। মানুষ যে বুদ্ধির বলে ভালো-মন্দ বিচার করে, ভবিষ্যতের চিন্তা করে, আত্মোন্নতির দিকে মনোযোগী হয়; সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়া চলে,—প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ তখন মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতর প্রাণিগণ এমন-কি মশা-মাছি পর্য্যন্ত, সেই উচ্চবুদ্ধি অল্পাধিক লাভ করিয়াছে। তখন কোন্ সার্কাসের কোন্ ঘোড়াটা চালকের ইঙ্গিত বুঝিয়া সাদা ও কালো রঙের তফাৎ বুঝিতেছে, পশুশালার কোন্ বন-মানুষটা কি প্রকার সঙ্কেত করিয়া প্রাতে এক পেয়ালা চা চাহিতেছে,—এই রকম তথ্য-সংগ্রহই প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের কাজ ছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল, প্রত্যেক প্রাণীই মানুষের ন্যায় কতক সংস্কারজ, কতক অভ্যাসানুযায়ী ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান লইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করে; অনুসন্ধান করিলেই সেই সকল জ্ঞানের লক্ষণ পাওয়া যায়। তাই তাঁহারা এই সকল তথ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিতেন। শেষাশেষি তাঁহারা মশা-মাছি এবং গো-মহিষের মনস্তত্ত্ব পর্য্যন্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ক্রিয়ার পিছনে পিছনেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীতে মনুষ্যসুলভ গুণের অনুসন্ধানের প্রবল চেষ্টার পর, আজকাল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। এখন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ, প্রাচীনদিগের গবেষণার কথাবার্ত্তা চাপা দিয়া, ইতর প্রাণীদিগকে স্বাধীন-বুদ্ধিবর্জ্জিত এক-একটা যন্ত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের কারখানার নির্জীব কলে বাষ্প ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির শক্তি আশ্রয় করিয়া সেগুলিকে যেমন সজীব প্রাণীর ন্যায় চালনা করে, ইঁহাদের মতে ইতর প্রাণীর দেহ-যন্ত্রেও সেই প্রকার বাহিরের তাপ ও আলোক প্রভৃতির শক্তি কার্য্য করিয়া তাহাতে জীবনের লক্ষণ দেখায়। অর্থাৎ প্রাণীর প্রাণিত্ব এবং কারখানা ঘরের কলের চঞ্চলতা, গোড়ায় একই ব্যাপার;—ইহাই ইঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গরু ঘোড়া ছাগল ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর ইতর প্রাণীকে তাঁহারা কলের কোঠায় আজও ফেলিতে পারেন নাই,—কীটপতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী যে, প্রকৃতই যন্ত্রবৎ চলা-ফেরা করে, তাহার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রাণীদিগকে আমরা আজকাল যে মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই, হঠাৎ একদিন বিধাতার

ইচ্ছায় তাহারা সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জন্মে নাই। জীবসৃষ্টির প্রথমে কি-রকম জানি না, এক-কোষময় জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রাথমিক প্রাণীদের স্ত্রীপুং-ভেদ ছিল না, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল না, মস্তিষ্ক ও পাকাশয় প্রভৃতি দেহযন্ত্রও ছিল না। জড়বৎ তাহারা জলে ভাসিয়া বেড়াইত; গায়ে কোনো খাদ্যদ্রব্য ঠেকিলে তাহার রস শোষণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিত। এই এক-কোষময় প্রাণীই আধুনিক বহুকোষময় বিচিত্র প্রাণীদের জনক। মানুষ গরু ছাগল কুকুর প্রভৃতি সকল প্রাণীই তাহারি উন্নত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগাইতেছে।

আদিম প্রাণীর সন্ততিবর্গ এত উন্নত হইলেও, আজও তাহাদিগকে এক-কোষ অবস্থায় জলে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ আধুনিক নিকৃষ্ট প্রাণীদের জীবনের কার্য্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া এই প্রাথমিক প্রাণীদিগকে লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দেখিয়াছিলেন, বাহিরের তাপ ও আলোক প্রভৃতির উত্তেজনায় দেহগুলিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করা ইহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য। ইহাদের বুদ্ধি বা বিচারশক্তি নাই,—বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া না দিয়া ইহারা একবারে থাকিতেই পারে না। পণ্ডিতগণ প্রাণীর এই শ্রেণীর কার্য্যগুলিকে Reflex Action অর্থাৎ অনিচ্ছা-সঞ্চলন নাম দিয়াছেন। ইহা কেবল আদিম প্রাণি-দেহেরই ধর্ম্ম নয়। জটিল দেহ-যন্ত্রবিশিষ্ট মানুষেও ইহা দেখা যায়। গলায় ভাত বাধিলে যখন আমরা কাশিতে আরম্ভ করি, বা চোখের কাছ দিয়া ঢিল চলিয়া গেলে যখন আমরা তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করি, তখন বিপদের সম্ভাবনা মনে করিয়া এই কার্য্য ভাবিয়া-চিন্তিয়া করি না। শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ বন্ধ হইলে কাশি আপনা হইতেই আসে; চোখে ঢিলের আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা হইলে চোখ্ আপনিই বুজিয়া আসে। এই সকল কার্য্যের উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব নাই। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এগুলিকেও অনিচ্ছা-সঞ্চলনের কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। তবে আদিম প্রাণী যেমন সহজ-ভাবে বাহিরের উত্তেজনায় সঞ্চলন দেখায়, মানুষের দেহের ন্যায় জটিল যন্ত্র সে প্রকারে সাড়া দেয় না। মানুষের মস্তিষ্ক আছে; বহুপ্রকারের স্নায়ুমণ্ডলী আছে, তার উপরে আবার মংসপেশী। একটা বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, এই সকলগুলিই নাড়া পায় এবং তাহারি সমবেত ফলে চোখ্ বুজিয়া আসে বা হাঁচি ও কাশির সূত্রপাত হয়।

কেবল প্রাণিজগতে নয়, উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যেও ঐ প্রকার সঞ্চরণ দেখা যায়। উদ্ভিদের মস্তিষ্ক নাই, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাই, কিন্তু তবুও ইহারা কি প্রকারে আলোকের দিকে পাতাগুলিকে উঁচু করিয়া ধরে এবং লতা-গাছগুলি যে দিকে আলো সেই দিকে কেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, ইহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল ব্যাপারকেও অনিচ্ছা-সঞ্চলনের কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। এই ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক নাম Tropism; কিন্তু গোড়ায় খবর লইতে গেলে প্রাণী ও

উদ্ভিদের অনিচ্ছা-সঞ্চলনের একই কারণ দেখা যায়। বাহিরের তাপ আলোক এবং নানা প্রকার আঘাত ও উত্তেজনা উভয়েরই দেহে কাজ করিয়া সঞ্চলন দেখায়।

আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের পূর্ব্বোক্ত অনিচ্ছাসঞ্চলনের মূল কথাটি ধরিয়া কীট-পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট প্রাণীর জীবনের অনেক কার্য্যের ব্যাখ্যা দিতেছেন।

ঘরের জানালায় টবে যে লতা-গাছটিকে রাখা গিয়াছে, সেটি কেন আলোর দিকে হেলিয়া পড়ে, এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক পণ্ডিতই একবাক্যে বলেন,—লতার ডালগুলির যে অর্দ্ধেক ঘরের দিকে থাকে, তাহা অপর অর্দ্ধেকের তুলনায় কিছু কম আলো পায়। আলোর উত্তেজনা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। কাজেই লতার ডালের যে-অংশে জানালার তীব্র আলো পড়ে, তাহার বৃদ্ধি মৃদু হইয়া আসে;—বৃদ্ধি অধিক হয় কেবল ঘরের দিকের ছায়াময় অংশেরই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, আলোকপাতের তারতম্যে একই ডালের এক পিঠ অপর পিঠের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থায় ডালের আকৃতি কিপ্রকার হইবে, পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন। একটি অখণ্ড জিনিসের এক পিঠ বৃদ্ধি পাইয়া প্রসারিত হইতেছে এবং আর এক পিঠের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে বলিয়া তাহা তুলনায় সঙ্কুচিত হইতেছে। এই অবস্থায় ধনুকের মত বাঁকিয়া আলোর দিকে ঘাড় উঁচু করা ব্যতীত লতার আর অন্য উপায় থাকে না। বাহিরের উত্তেজনায় বুদ্ধিমান প্রাণীর মত চলাফেরার ইহাই একমাত্র উদাহরণ নয়,—গাছ-পালার পাতা ও শিকড়কে অনিষ্টকর জিনিস হইতে দূরে থাকিতে দেখা যায়, সন্ধ্যার সময়ে অনেক গাছের পাতা ও ফুলকে বুজিয়া আসিতে দেখা যায়। হঠাৎ এই সকল কাজ দেখিলে মনে হয়, যেন উদ্ভিদের বুদ্ধি আছে, তাই তাহারা নিজেদের ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া চলে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাহিরের উত্তেজনা তাহাদের দেহের জড়বৎ কোষের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া ঐ সকল কাজ দেখায়।

বর্ষার রাত্রিতে প্রদীপের কাছে দলে দলে পোকা আসিয়া কিপ্রকারে বিরক্ত করে এবং শেষে নিজেরা পুড়িয়া মরে, তাহার পরিচয় পাঠককে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেন, পোকারা আলোতে খেলা করিতে ভালবাসে; কোন্‌টি ভালো এবং কোন্‌টি মন্দ এই জ্ঞান তাহাদের আছে; তাই তাহারা আলোর দিকে ছুটে, কিন্তু শেষে নিজেদের মূর্খতার জন্যই পুড়িয়া মরে। আধুনিক পণ্ডিতেরা একথা মানিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, যে প্রকারে অন্ধকার ঘরের লতা আলোর দিকে ছুটিয়া যায়, কতকটা সেই প্রকারেই পোকা দীপশিখার দিকে ছুটিয়া ভাগ্যদোষে পুড়িয়া মরে। লতা যেমন বাহিরের আলো দ্বারাই চালিত হয়, পোকাও সেইপ্রকারে আলোর প্রভাবে প্রদীপের দিকে ছুটাছুটি করিয়া পুড়িয়া মরে। ইঁহারা বলেন, প্রত্যেক পোকারই জোড়া জোড়া চোখ থাকে; প্রদীপের আলো সাধারণতঃ উহাদের একটা চোখের উপরে কার্য্য করিয়া তাহাতে কোন প্রকারে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সুরু

করিয়া দেয় এবং ইহার ফলে পোকার অর্দ্ধাঙ্গের স্নায়ুজাল ও পেশীসমূহ এমন উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন আলোর দিকে না ছুটিয়া থাকিতে পারে না। দেহের একটা দিক্ উত্তেজিত এবং আর-একটা দিক্ শান্ত, এইপ্রকার বিসদৃশ অবস্থা তাহাদের পক্ষে পীড়াজনক। এইজন্যই দুই পিঠকে সমান উত্তেজিত করিবার জন্য উহারা আলোর দিকে ছুটিয়া যায়; ইহাতে পীড়ার শান্তি হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আগুনের তাপে দগ্ধীভূত হইয়া তাহারা শান্তি ভোগ করিবার সুযোগ পায় না।

কীটপতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী যে কেবল আলোর দিকেই ছুটিয়া চলে তাহা নয়। আলো দেখিলে অন্ধকার খোঁজে বা গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লয়, এপ্রকার প্রাণীও অনেক আছে। কেঁচো এবং অনেক শুঁয়ো পোকা জাতীয় প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা আলো দেখিলেই পলায়। কেঁচো কখনই দিনে গর্ত্তের বাহির হয় না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া গর্ত্তের চারিদিকে বেড়ায়। ইতর প্রাণীদের এই আলোক-আতঙ্ককে পণ্ডিতেরা Negative Heliotropism নাম দিয়াছেন। নামটি যত বড় হউক না কেন, ব্যাপারটি কিন্তু ক্ষুদ্র। আলোকপাতে এই সকল প্রাণীরও দেহের একার্দ্ধ, অপরার্দ্ধের তুলনায় বিসদৃশ হইয়া দাঁড়ায়;—দুই অর্দ্ধের অবস্থা সমান করিবার জন্য উহারা অন্ধকার খোঁজে।

সমুদ্র হইতে একটু দূরবর্ত্তী স্থানে ডিম্ব হইতে যে সকল কচ্ছপ সদ্য বহির্গত হয়, তাহাদের ব্যবহারে একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পক্ষিমাতা তাহার শাবকগুলিকে যে প্রকার যত্নে আহার করায় ও উড়িতে শেখায়, কচ্ছপ-মাতা তাহার শিশুসন্তানদিগের জন্য সে প্রকার যত্ন লয় না। ডিম্ব-প্রসব করিয়া নিরাপদ স্থানে বালুর মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়া দিলেই জননীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। শিশুরা ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া নিজেদের চেষ্টা নিজেরাই করে। পক্ষিরাজ গরুড় ডিম হইতে বাহির হইয়াই আহারের চেষ্টায় যেমম ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছিল, ইহারা জন্মিয়াই সেপ্রকারে আহারের চেষ্টা করে না। জন্মগ্রহণের পরমুহূর্ত্তেই ঘাড় উঁচু করিয়া চারিদিক্‌টা দেখিয়া লয় এবং তখন যদি সমুদ্রের নীল জল চোখে পড়ে, তবে সমুদ্রের দিকেই ছুটিয়া চলে। জন্মের পর-ক্ষণেই ইহারা কিপ্রকারে সমুদ্র চিনিয়া লইয়া জলে লম্ফ প্রদান করে, প্রাণিবিদ্‌গণ তাহার গবেষণা করিয়াছেন। ইহাতেও দেখা গিয়াছে, কচ্ছপ-শিশু নিজের প্রবৃত্তির বশে সমুদ্রের দিকে চলে না। বাহিরের উত্তেজনা তাহাদের দেহে এমন কতকগুলি কার্য্য করিতে থাকে, যাহাতে তাহারা সমুদ্রের দিকে না চলিয়া থাকিতে পারে না।

লাল নীল প্রভৃতি নানাপ্রকার রঙ্ প্রাণীর চক্ষে পড়িয়া যে বিচিত্র কার্য্যের সূচনা করে, তাহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। লাল ফুলটিকে শিশু হাত বাড়াইয়া ধরিতে যায়; লাল রঙের কাপড় দেখিলে গরু-বাছুর ভয় পাইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করে। সবুজ বা বেগুনী রঙের

কাপড় গরুর সম্মুখে ধরিলে সে গ্রাহ্যই করে না। বেগুনী বা নীল রঙের ফুল শিশুর প্রিয় নয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ সদ্যজাত কচ্ছপ লইয়া পরীক্ষায় দেখিয়াছেন,—ইহাদের সম্মুখে লাল সবুজ পীত বা বেগুনী রঙের জিনিস রাখিলে সেগুলি ইহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু নীল রঙের জিনিস দূরে রাখিলেও তাহার দিকে ছুটিয়া চলে। এইপ্রকার পরীক্ষায় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, জন্মগ্রহণ করিয়াই যখন কচ্ছপ-শিশু সমুদ্রের দিকে ছুট্ দেয়, তখন সমুদ্রের জলের দিকে সে স্বেচ্ছায় যায় না; সমুদ্রই নীল জল সম্মুখে বিস্তৃত রাখিয়া কচ্ছপকে জলে টানিয়া আনে। আকাশে ঢিল ছুড়িলে তাহা যেমন পৃথিবীর টানে মাটিতে পড়ে;—এই টানও যেন সেইপ্রকার; ইহাতে প্রবৃত্তি ইচ্ছা বা অনিচ্ছার গন্ধ নাই।

প্রাণি-বিজ্ঞানে Differential Sensetiveness বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। নামটা যত লম্বা বিষয়টা কিন্তু তত নয়। ইহার স্থূল অর্থ "ছায়া ও আলোক-বোধ"। কয়েকজাতীয় দিবাচর কীটপতঙ্গের মধ্যেই ইহা লক্ষ্য করা যায়। আলোয় চলিতে চলিতে যখন ছায়ায় আসিয়া পড়ে, তখন তাহাদের গতিরোধ হয়। ছায়া অতিক্রম করিয়া যাওয়া সাধ্যে কুলায় না,—তখন তাহারা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আলোর মধ্যেই বিচরণ আরম্ভ করে। প্রাণীদিগের এই কার্য্যেরও কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাণিবিদ্‌গণ বলেন, এই শ্রেণীর প্রাণিগণ যখন আলোর মধ্যে চলাফেরা করে তখন আলোক দ্বারা তাহাদের দেহের কোষগুলিতে পূর্ণমাত্রায় রাসায়নিক কার্য্য চলিতে থাকে, কিন্তু ছায়ায় আসিলেই তাহা কমিয়া আসে। তার পরে রাসায়নিক কার্য্যের এই বাড়া-কমা দেহে এমন এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে যে, তাহাতে পেশীসকল সঙ্কুচিত হইয়া দেহটিকে ছায়া হইতে দূরে আনিয়া ফেলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ছায়া-ভীতির মূলেও তাহাদের প্রবৃত্তির বা বিবেচনা শক্তির সম্বন্ধ নাই। গলায় দড়া বঁধিয়া টানিলে গরু-বাছুর যেমন টানের দিকে ছুটিয়া চলে,—এই ব্যাপারটাও যেন সেই প্রকার।

পতঙ্গদিগের জীবনের ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত। আজ যে প্রজাপতিটিকে ফুলে ফুলে বসিয়া মধু খাইতে দেখিতেছি, তাহা প্রথমেই প্রজাপতির আকারে জন্মে নাই। মাতৃগর্ভ হইতে ডিম্বাকারে উহা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তার পরে ডিম হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন শুঁয়ো পোকার আকারে গাছের কচি পাতা খাইয়া বেড়াইয়াছিল, এবং শেষে কয়েক সপ্তাহ গুঁটির মধ্যে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া পরে গুঁটি কাটিয়া প্রজাপতি হইয়াছিল। কয়েক জাতীয় প্রজাপতির দেহে বিভিন্ন অবস্থায় একই উত্তেজনার বিভিন্ন প্রকার কাজ দেখা গিয়াছে। শুঁয়ো পোকার অবস্থায় ইহারা আলোকে বাহির হয় না, কিন্তু প্রজাপতির আকার পাইলেই যে-দিকে আলো সে-দিকে ছুটিয়া চলে। আবার এমনও কতকগুলি প্রজাপতি দেখা গিয়াছে, যাহারা কেবল ডিম্বপ্রসবের সময়েই আলোক-প্রীতি দেখায়।

প্রাণিবিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলিরও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বয়সের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ঐ সকল প্রজাপতির দৈহিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটে। কাজেই শিশু-প্রজাপতি আলোকের উত্তেজনায় যে প্রকারে সাড়া দিত, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা আর সে প্রকারে সাড়া দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে প্রজাপতিদিগের রঙিন্ ফুলে ফুলে ভ্রমণেরও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গায়ে রঙ মাখিয়া ফুলগুলি গাছে গাছে দাঁড়াইয়া থাকে, পথিক প্রজাপতির একটা চক্ষুতে সেই রঙ্ এমন কতকগুলি রাসায়নিক কাজের সূচনা করে যে, তখন সে ফুলের উপরে আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই চক্ষুকে শান্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফুলের বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া প্রজাপতি ফুলের নিকটে স্বেচ্ছায় যায় না, ফুলের বর্ণই প্রজাপতিকে টানিয়া ফুলের উপরে বসায়—এবং এই নিরাশ্রয় স্বল্পায়ু অতিথিটিকে উদরপূর্ণ করিয়া মধু খাওয়ায়।

কাঁকড়া-জাতীয় কয়েকটি প্রাণীর চাল-চলন বড়ই বিচিত্র। ইহাদের মধ্যে এক জাতি (Gemmarns) কখনই আলোকে বাহির হয় না। নদীর তীরবর্ত্তী যে-সকল স্থানে সূর্য্যালোক পড়ে না, সেই সকল স্থানের জলেই উহারা বাস করে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, জলে যদি অতি অল্প মাত্রায় অম্ল-পদার্থ মিশানো হয়, তবে মুহূর্ত্তমধ্যে ইহাদের আলোকভীতি দূর হইয়া যায়। তখন ইহারা যে দিকে আলো কেবল সেই দিকেই ছুটিয়া চলে। আর এক জাতীয় কাঁকড়ায় ইহারি ঠিক্ বিপরীত কার্য্য প্রকাশ। সাধারণতঃ ইহারা আলোক ও অন্ধকার উভয়ই ভালবাসে; কিন্তু যদি জলে কিছু অঙ্গারক বাষ্প মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা আলোক ছাড়িয়া কখনই অন্ধকারে যাইতে চাহে না। প্রাণিবিদ্‌গণ এই সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলেন, আলোক-পাতে ইহাদের চক্ষুস্থিত যে সকল পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, অম্ল বা অঙ্গারক-বাষ্পের যোগে তাহার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়; তাই কখনো ইহারা আলোকভীতি এবং কখনো আলোক-প্রীতি দেখায়। কিন্তু এই ভীতি বা প্রীতির গোড়ায় তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার লেশ মাত্র নাই। তাহারা যন্ত্রবৎ কার্য্য করে। রাত্রিতে নদীর কিনারায় মশালের তীব্র আলো জ্বালিয়া মাছ শিকার করিবার এক উপায় আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, মাছগুলি ভয়ানক মূর্খ, তাই আলো দেখিয়াই তাহারা নদীর কিনারায় আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়, আলোক-পাতে কয়েকজাতীয় মাছের চক্ষুতে এমন রাসায়নিক কার্য্যের সূচনা হয় যে, তাহারা কলের পুতুলের মতো আলোর কাছে আসিয়া জটলা করিতে থাকে।

প্রাণিদেহে বাহিরের শক্তির প্রভাব-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কয়েকটি স্থূল উদাহরণ দেওয়া হইল। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ সুকৌশলে এবং বহু গবেষণায় এ-সম্বন্ধে আরো অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের সকল কার্য্যই যে যন্ত্রবৎ

চলে, তাহা ইঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। একই প্রকার উত্তেজনায় প্রাণিদেহের স্নায়ু ও পেশী একই প্রকারে সাড়া দিতে দিতে যে শেষে অভ্যাসের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া যায়, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। তা'র পরে "সংস্কার" (Instinct) বলিয়া যে একটা ব্যাপার আজন্ম প্রাণীর উপরে কার্য্য করে, তাহাকেও অস্বীকার করিলে চলিতেছে না। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সংস্কারের আধিকারটি বড়ই বিস্তৃত রাখিয়াছিলেন। প্রাণি-জীবনের যে-সকল কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ কঠিন হইত, সেগুলিকে তাঁহারা সংস্কারের গণ্ডীর ভিতরে টানিয়া গোঁজামিল দিতেন। পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলি সংস্কারের গণ্ডী ছোটো করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ডাক্তারির ঝকমারি

এল্, এম্, এস্ পাশ করিয়া বাড়ীতে গিয়া বসিতেই গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গ্রামের মধ্যে আমার এত হিতৈষী ও অনুরাগী বন্ধু ছিল আগে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমাদের গ্রামেও চিরন্তন দলাদলির অভাব ছিল না। আজ এক দলের প্রধানের পুত্র হইয়াও বিপক্ষদলের প্রধান চাটুয্যে-মশায়ের সঘন আশীর্ব্বাদ শুনিয়া মনে হইল, আমি অসাধ্য সাধন করিয়াছি।

কাছাকাছি দশবার-খানা গ্রামে পাশ-করা ডাক্তার ছিল না। সপ্ততিবর্ষবয়স্ক রামতারণ কবিরাজের বটিকা, কষায়ের উপর দিয়াই রোগীর যাহোক-একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইত। কবিরাজ-মহাশয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যাবলে চিকিৎসা করিতেন। এ-জন্মে তাঁহাকে কেহ কবিরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে দেখে নাই। তাঁহার পিতা কবিরাজ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কতকগুলি বটিকা ও চূর্ণ প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হইয়াই তাঁহার জন্মান্তরলব্ধ কবিরাজী জ্ঞান স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সেই দিন হইতেই তিনি কবিরাজ। পঞ্জিকার ঔষধের বিজ্ঞাপনগুলি তাঁহার Materia Medicaর কাজ করিত।

তাহা হইলে কি হয়, কবিরাজ-মহাশয়ের হাতযশের কথা দশখানা গ্রামে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন লোক ছিল না যে, একবার-না-একবার তুলসীপাতার রস, মধু প্রভৃতি দিয়া কবিরাজ-মহাশয়ের বাড়ী না খাইয়াছে। আমাদের গ্রামে তিনি ধন্বন্তরি ছিলেন।

এ-হেন কবিরাজ-মহাশয়ের অল্পদিন হইল এক প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছিল। গ্রামের অখিলচন্দ্র হাজরা কলিকাতায় এক সওদাগরের আফিসে চাকরী করিতেন। তাঁহার পুত্র নিবারণচন্দ্র হাজরা পিতার আফিসে এপ্রেন্টিশরূপে মাস-ছয়েক কাজ করিয়াছিল। পরে কি কারণে প্রকাশ নাই,

আফিস হইতে তাড়িত হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গ্রামে পলাইয়া আসে। আসিবার সময় বার আনা মূল্যে একখানা "হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা" ও একটা গৃহচিকিৎসার ঔষধের বাক্স কিনিয়া আনিয়াছিল। কে জানিত তাহার মধ্যে এত প্রতিভা গুপ্ত ছিল? সর্দ্দি, কাশী, পেট-কামড়ানি আরাম করিয়া সে অল্পদিনেই খুব নাম-ডাক করিয়া ফেলিল। তাহার ঔষধ সস্তা ও সেবনে কোন ক্লেশ নাই দেখিয়া কবিরাজ-মহাশয়ের অনেক রোগী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই আপ্‌শোষে কবিরাজ-মহাশয় আজকাল তাঁহার রোগীগণের নিকট মন্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, "একি আর আরোক মিশান' কলের জল পেয়েছ নাকি! যে চারপয়সায় পাবে?"

এ-হেন দুইজন চিকিৎসক থাকিতেও আমার গ্রামে আসিয়া চিকিৎসা করিবার বিশেষ আগ্রহ হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু পাশ হইতেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতের এত অনুরোধ-প্রার্থনা পাইতে লাগিলাম যে, তাহার এক আনা রোগী পাইলেই আমি জুড়ী-গাড়ী হাঁকাইতে পারিতাম। মনে ভাবিলাম, দেখা যাক্, ব্যাপারখানাই কি?

বাড়ীর সামনে মস্ত বৈঠকখানা ছিল। সে ঘরখানি ডিস্‌পেন্‌সারিতে পরিণত হইল। অনেক টাকার ঔষধ কিনিলাম। চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি আসবাব হইতে কম্পাউণ্ডারের পর্দ্দাঢাকা ঘরটি পর্য্যন্ত কিছুই বাকি রহিল না। তখন এত-বড় ডাক্তার হইয়া পড়িয়াছি ভাবিতাম যে খুড়ামহাশয় যখন তাঁহার প্রিয় ভাগিনেয়টিকে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ঘুচাইয়া যাত্রার দল হইতে ছাড়াইয়া কেবল আমার হিতার্থ কম্পাউণ্ডার করিয়া দিতে চাহিলেন, তখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান ত করিলামই, অধিকন্তু তাঁহার সুযোগ্য ভাগিনেয়টির গুণ-সম্বন্ধে এমন দু'-একটি 'হিতং মনোহারি চ' বাক্য প্রয়োগ করিলাম, যাহা খুড়ামহাশয়ের কর্ণে এর আগে কখনও প্রবেশ করে নাই।

আমাদের পরিবারটি অতি বৃহৎ ছিল। জ্ঞাতি-কুটুম্ব আত্মীয়-স্বজন অসংখ্য। গ্রামের মধ্যে বিশ-ত্রিশঘরের কম নহে। আমি ডাক্তারি আরম্ভ করিবামাত্র ইঁহারা তাঁহাদেরই প্রশংসিত ধন্বন্তরি-কল্প কবিরাজ ও সুলভ-চিকিৎসক নিবারণ বাবাজীকে বরখাস্ত করিয়া আমার রোগীরূপে দেখা দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বকার 'যমের হাত হতে ছিনিয়ে আন্‌তে পারে' কবিরাজ এখন 'হাতুড়ে' ও নিবারণ-বাবাজী "Vaga-bond" উপাধি লাভ করিল। মনে ভাবিলাম, আর ভাবনা কি? এত পসার আমার!

সকালে উঠিয়া ডাক্তারখানায় বসিতে গিয়া দেখি একঘর লোক। ঘরে ঢুকিতেই পিসামহাশয় বলিলেন, "এই যে গিরিশ! এখনি বাবা একবার যেতে হবে। খোকার বড় অসুখ। মাথার যন্ত্রণায় গেল।"

আমি বলিলাম, "কি হয়েছে?"

পি। কি জানি বাবা! চল একবার। বলে মাথার যন্ত্রণা। ছট্‌ফট্ কচ্ছে। আমরা তার কি বুঝ্‌ব? আমরা ডাকিনি,

কব্‌রেজ-ম’শাই বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি নিজেই খবর নিতে উঠেছিলেন। তাঁর সামনেই পড়ে গেল। তা তিনি বলেন কি? না, ও কিছু নয়। একটু ঘুমুলেই সেরে যাবে। ছেলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে, আর কব্‌রেজ বল্লে কি না, ও কিছু নয়! দেখ দিকি বাবা কাণ্ডটা! এই সব গোবদ্দির হাতে এতদিন গ্রামের লোকের প্রাণটা নির্ভর কর্‌ত।”

বৃদ্ধ ঘোষাল-মহাশয় এতক্ষণ এক-পার্শ্বে চুপচাপ বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ কাশিতে কাশিতে বলিয়া উঠিলেন, “যা বলেছ দাদা! গোবদ্দি বলে গোবদ্দি! আমার এই একটু হাঁপানি, এ আজ দশবছরে সারাতে পাল্লে না। চিকিৎসা করাতে করাতে আমার জমীজমা বন্ধক পড়্‌ল। আর বাবাজীর আমার ওষুধের কেমন জোর! কালকের দিনটে খেয়েই এমনি ঘুমিয়েছি যে কোথা দিয়ে গোটা রাতটা কেটে গেল তা টেরই পাইনি। তা বাবাজি, আজকে আমার ব্যবস্থা তা’হলে কি হবে?”

আমি বলিলাম, “আজকে ঐ ওষুধটাই চলুক।”

পিসামহাশয় ভাবিলেন, আবার কেহ ধরিলেই বিপদ্‌। তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, “চল বাবা তাহলে।”

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পথে বাহির হইলাম। পথে ঘোষাল-মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া পিসামহাশয় বলিলেন, “কেন শোন ও বুড়োর কথা। ওর মান্ধাতার আমলের হাঁপানি। শিবের অসাধ্য ব্যারাম। ও কি কখন ভাল হয়? আর জমীজমা বেচে চিকিৎসা করার কথা যা বল্লে ও সব তাহা মিথ্যে। কেবল চালের লাউ-কুমড়ো আর সজ্‌নের ডাঁটা খাইয়ে কব্‌রেজের ঠেঙে ওষুধ আদায় করেছে। তুমি বাবা ছেলেমানুষ, ও-সব ভাঁওতায় ভুল না।”

এইরূপ ‘জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা’ দ্বারা আমার চক্ষুরুন্মীলনের প্রয়াস পাইতে পাইতে পিসামহাশয় তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। রোগী নামে ‘খোকা’ হইলেও বাস্তবিক ‘খোকা’ নহে। প্রায় বিশবৎসর বয়স্ক বলিষ্ঠ যুবা। গ্রামের আখ্‌ড়ায় কুস্তী লড়ে। বিছানার উপর চুপ্‌ করিয়া শুইয়াছিল। মাথায় একটা কাপড় বাঁধা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হয়েছে?”

সে বলিল, “বড্ড মাথাটা ধরেছে।”

পরীক্ষায় বুঝিলাম, রোগ কিছুই নহে, সামান্য মাথা-ধরা মাত্র। কিন্তু ধন্বন্তরির উপর টেক্কা মারিবার দুর্ব্বলতা দূর করিতে পারিলাম না। বলিলাম, “আচ্ছা, আমি ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

কিন্তু পিসামহাশয় শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “সে কি বাবা! এখনি যাবে কি? এখন তোমায় ছাড়ছি না।”

পিসীমা পাশের ঘর হইতে আসিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন, তাঁহার এই একটি সন্তান, ভগবানের কি সে দিকে দৃষ্টি নাই!

এ-সব অকাট্য যুক্তির আর উত্তর নাই। মনটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। আজ সকালে পাণিগ্রামে একটা ডাক ছিল। গেলেই চারটাকা পাওয়া যাইত। এদিকে একঘর রোগীও ডাক্তারখানায় বসিয়া আছে।

তাহাদের প্রেস্‌কিপ্‌সন্‌ দিলে কিছু-টাকার ঔষধ বিক্রয়ও হইবে। এখানে থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। রোগ কিছুই নহে—অর্থের আশাও ছাড়িয়া দিলাম। আত্মীয়স্থলে ত ভিজিট পাওয়াই যাইবে না।

পিসামহাশয় বলিলেন, "তা'হলে বাবা, ওষুধটা লিখে দাও। চট্‌ করে আনিয়ে নিই।"

ঔষধ লিখিয়া দিলে চাকর ডিস্‌পেন্‌সারির দিকে ছুটিল। আমি নিরুপায়। চুপ্‌চাপ রোগীর শিয়রে বসিয়া। রোগী একবার "উঃ, আঃ" করে, আর পিসীমা অমনি অস্থির হইয়া উঠেন। বলেন, "মাথাটা একটু টিপে দাওনা বাবা।" তখন এক হাতে পাখা লইয়া রোগীকে বাতাস করিতে ও অপরহাতে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিলাম।

পিসীমার এইবার ফুরসৎ হইল। এতক্ষণ তাঁহাকেই মাথা টিপিতে ও বাতাস করিতে হইতেছিল। এইবার মেঝেয় বসিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর কথা পাড়িলেন। তাঁহার সইয়ের সন্তান হওয়ার পর চুল উঠিয়া যাইতেছে, কি তেল মাখিলে তাহা বন্ধ হয়, তাঁহার ভাসুরের কন্যাটির মাঝে মাঝে পেট কামড়ায়, তাহা কিরূপে সারান' যাইতে পারে, তাঁহার খুড়শ্বাশুড়ির একটি পুত্র বড় রোগা, একটু সালসা-টালসা খাওয়াইলে কোনও উপকার হয় কি না, এইরূপ বহু রোগীর রোগের Symptom শুদ্ধ এরূপ বর্ণনা করিয়া গেলেন যে, আমি অন্যমনস্কে 'হুঁ', হাঁ' করিয়া কোনরকমে যাহা মনে আসিল তাহাই ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। মনে করিলাম, গোল মিটিল! কোথায় কে রোগী, এখান হইতে তাহার কি চিকিৎসা হইবে?

কিন্তু পিসীমা বলিলেন, "তা'হলে বাবা ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধগুলি পাঠিয়ে দিও। আহা, তাদের বড় কষ্ট রে বড় কষ্ট। কেই বা দেখে? তোকে কত আশীর্ব্বাদ করবে।" আমি ত একেবারে থ! একবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, রোগী না দেখিয়া চিকিৎসা করি কিরূপে? কিন্তু সে-সব আপত্তি টিকিল না। পিসীমা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুই একটু জল দিলেও সেরে যাবে বাবা। আমার কথা ঠেলিস্‌নি।"

এইরূপ তিনচার ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া খোকার মাথাধরা সারিলে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলাম। ডাক্তারখানায় আসিয়া দেখি, অর্দ্ধেক রোগী চলিয়া গিয়াছে। দুইটা জরুরি ডাক আসিয়াছিল, আমায় না পাইয়া কবিরাজ-মহাশয় ও নিবারণচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর দিন-তিনেক পিসীমার রোগীদিগের জন্য ঔষধ পাঠাইবার অনবরত তাগাদা আসিতে লাগিল, শেষে বিরক্ত হইয়া কয়েকটা ঔষধ পাঠাইলাম। ঔষধের দাম ত' পাইলামই না,—তার উপর ডাক-মাশুল ও প্যাকিং খরচাটাও ঘর হইতে দিতে হইল। পিসামহাশয় চালাক লোক, আগে হইতেই বলিয়া দিয়াছিলেন, "বাবা, ওষুধপত্র প্যাক করা ত আমরা জানি না। শেষটা ভেঙ্গে-টেঙ্গে যাবে। পাঠাবার বন্দোবস্তটা তুমিই ক'রো। খরচ যা লাগে আমি দেব।"

কিন্তু খরচ ত তিনি দিলেনই না, অধিকন্তু কিছুদিন বাদে "তোমার ওষুধে বড্ড উপকার হয়েছে বাবা, আর এক-এক শিশি পাঠাও" বলিয়া অনুরোধ হইল। শেষে এই অজ্ঞাত রোগীদের ঔষধ সরবরাহ করা এত ভয়ানক হইয়া উঠিল যে, একদিন মরিয়া হইয়া সংকল্প করিয়াছিলাম, "দিই খানিকটা ষ্ট্রিক্‌নিন পাঠিয়ে—একেবারে আরাম হয়ে যাক্।"

পিসামহাশয়ের পর খুড়া, কাকা, জেঠা, ঠাকুরদাদা প্রভৃতি কতরকম সম্পর্কের কতরকম আত্মীয়ের তলব পড়িতে লাগিল। আমার পসারও খুব জমিয়া উঠিল। ভিন্ন গ্রামের রোগী ডাকিতে আসিলে দেখাই ত পায় না। গ্রামের লোককেও অনেক চেষ্টা করিয়া তবে আমায় লইয়া যাইতে হয়। আমি দিনরাতই আত্মীয়দের কাহারও না কাহারও বাড়ীতে আটকা পড়িয়া আছি। কাহারও পেট কামড়াইল ডাক গিরিশকে, কাহারও অম্বলের ঢেঁকুর উঠিয়াছে ডাক গিরিশকে, কাহারও ছেলে বড় কাঁদুনে বোধহয় ক্রিমি হইয়াছে—ডাক গিরিশকে! আমারও তখন বড়-বেশী চক্ষুলজ্জা ছিল। ভিজিট্ ত মুখ ফুটিয়া চাহিতেই পারিতাম না। ঘরের পয়সা দিয়া যে-সকল ঔষধ কিনিয়াছিলাম ও আত্মীয়দের যাহা ব্যবস্থা করিতাম, তাহার মূল্যও চাহিতে পারিতাম না।

সুতরাং পসারের ফলে একদিকে যেমন বাহিরের ডাকগুলি হারাইয়া উপার্জ্জনহীন হইতে লাগিলাম, অপরদিকে তেমনি আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণে ঔষধের আলমারিগুলি ক্রমেই শূন্যগর্ভ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন সাদা কাগজের বড় দরকার হইয়া পড়িল। খালি শিশিগুলির গায়ে জড়াইয়া গালার মোহর লাগাইয়া আলমারীতে সাজাইয়া রাখিতে হইত।

যাহারা পয়সা দেয় এমন রোগী হাত-ছাড়া না হওয়াতে কবিরাজ-মহাশয় ও নিবারণ-বাবাজী আমার উপর বিশেষ অপ্রসন্ন হইলেন না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বাড়ীতে সদরে বড়দাদা ও অন্দরে পরিবারের তিরস্কারে দিনের মধ্যে দশবার মনে পড়িত—

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"।

দাদার তিরস্কারটা তত গায়ে লাগিত না, কারণ দিনের বেলায় খাওয়ার সময় ছাড়া আমাকে আর বাড়ীতে দেখাই যাইত না, আমার রোগীদের এতই আকর্ষণ ছিল। কিন্তু খাওয়ার সময়টি ঠিক্ ছিল। রোগীরা আমার স্বাস্থ্যের দিকে খুব দৃষ্টি রাখিত। এত আত্মীয় রোগী থাকিতেও কখনও কাহারও বাড়ীতে খাওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। রোগীরা খাওয়ার সময় হইলেই শশব্যস্তে আমাকে বলিত, "এইবার যাও বাবা! আহা বেলা হ'লো, নিজের শরীরের ওপর একটু দৃষ্টি রেখ' বাবা! আর দেরী ক'রো না,—যাও।" কিন্তু আমার শরীরের প্রতি রোগীদের এই মমতা দাদা অন্যরকমে বুঝিতেন। বলিতেন, "একটু চোখের চামড়াও কি নেই! এত আত্মীয়তা সবই মুখে! একমুঠো ভাত কোনদিন খাওয়াতে পাল্লে না। ঠিক খাওয়ার সময়টি হলেই তাড়িয়ে দেয় আবার আঁচান হ'তে না হ'তেই ফের ডাকৃতে আসে।"

আমি বলিতাম, "বাড়ীতে রোগী, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা কর্‌বে কি করে?"

দাদা বলিতেন, "আরে রেখে দে তোর রুগী! তোকে নেহাৎ ভালমানুষ পেয়েছে, তাই দিনরাত বাজে কাজে বসিয়ে রেখেছে। অত চক্ষুলজ্জা কল্লে কি ব্যবসা চলে? ভাল ভাল ঘরগুলো সব হাতছাড়া হ'তে চলেছে। শিবুলার জমীদারবাড়ী থেকে দু'-তিনদিন ডাক্‌তে এসে ফিরে গেছে। সে খবর রাখিস?"

ব্যবসার যে ক্ষতি হইতেছে তাহা আমারও বুঝিতে বাকি ছিল না। কিন্তু করি কি? দাদার তিরস্কারটা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু পরিবারের বাক্যবাণ অত সহজে উড়াইয়া দিতে পারা গেল না। কারণ, দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত দিনের মধ্যে হয়ত একবার। বেশীমাত্রায় তিরস্কার আরম্ভ হইলে, বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেই সব গোল চুকিয়া যাইত! কিন্তু শয়নমন্দিরে গৃহিণীর গর্জ্জনে নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। একে সমস্ত দিনের বেগার খাটুনি, তার উপর নিশীথে বক্তৃতা শ্রবণে মেজাজটা শীঘ্রই খিট্‌খিটে হইয়া উঠিল। শেষে একদিন চোখা চোখা দুইচারিটি বোলচাল দিতেই পত্নীর কান্নার জলে বালিস ভিজিয়া গেল। ভয় হইল, ভিজা বালিসে শুইয়া পাছে সর্দ্দি হয়। দিন-দুই পরে জ্যেষ্ঠ শ্যালক আসিয়া হাজির, শাশুড়ীঠাকুরাণীর বড় ব্যারাম, আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইবে। বোলচালের জের যে এতদূর গড়াইবে কে তাহা জানিত? যাহাই হউক, স্ত্রী চলিয়া গেলেন। আমিও দিনকতক নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমার আত্মীয়েরা ক্রমে সে সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিলেন। হয়ত খুড়ামহাশয়ের জামাই আসিয়াছে। চাকর দৌড়িয়া আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে আসিল, "বাবু একটু পিপারমেণ্ট চাচ্ছেন, জামাই-বাবুর পানে দিতে হ'বে।" পিসামহাশয়ের চাকর আসিয়া বলিল, "খোকাবাবুর কাঁচের দোয়াত ভেঙ্গে গেছে, একটু প্ল্যাষ্টার অফ্ প্যারিস্ চাই।"

আমার সেদিন আর সহ্য হইল না। জনকতক রোগী বসিয়াছিল। তাহাদের সামনেই বলিলাম, "আর এই টেবিলটা আর চেয়ার-কখানা চাই না? বেশ বৈঠকখানা সাজান হবে। আর আলমারী গুলোও নিয়ে যেতে ব'ল। খোকার বৌ হ'লে পুতুল সাজিয়ে রাখবে।" সমবেত রোগীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। চাকর-দুইজন পলাইয়া গেল।

একটু পরে ঠাকুরদাদা (কি সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ভিন্ন মানুষের বলা অসম্ভব) আসিলেন। বলিলেন, "ওহে নাতি, সাবু ত ভাই কেউ রাঁধ্‌তে পাচ্ছে না। একবার দেখিয়ে না দিলে ত হয় না।"

আমি বলিলাম "বটে? রোগীর বিছানা-টিছানা ঝাড়তে পারে ত? রোগীর বিছানা ঝাড়া সোজা কাজ নয়, একজন বহুদর্শী ডাক্তারের দরকার। আর ডাক্তারখানার ঝাঁটা না হ'লে সুবিধা হবে না। তা

আমিই ঝাঁটা নিয়ে যাচ্ছি। রোগীর বিষ আচ্ছা করে ঝাড়িয়ে দিয়ে আস্‌ব এখন।”

একঘর লোক সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুরদাদা একেবারে হতভম্ব। এমন কথা যে আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে, এটা বোধহয় সকলেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল।

যাক্‌, কয়েকটা কথা বলিয়া ফেলিয়া আমার মনটা হাল্‌কা হইয়া গেল। ভাবিলাম, আর কি, চক্ষুলজ্জা ত কাটাইয়াছি। এইবার একবার দেখি।

সেদিন আর কোথাও বাহির হইলাম না। সমস্ত দিন বসিয়া কতটাকার ঔষধ আত্মীয়েরা হজম করিয়াছে তাহার হিসাব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, প্রায় আড়াই হাজার টাকা পাওনা। কম্পাউণ্ডারের দ্বারা প্রত্যেকের নামে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিল্‌ করিয়া পাঠাইলাম ও সেই সঙ্গে জানাইয়া দিলাম যে, ভিজিটের টাকার জোগাড় না করিয়া কেহ যেন আর আমায় ডাকিতে না আসে।

এই ব্যবস্থার আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল। পরদিন হইতেই আর জ্যেঠা, খুড়া, কাকা, ঠাকুরদাদার কাহারও টিকি দেখা গেল না। অনেকগুলি রোগী চট্‌পট্‌ সারিয়া উঠিল। পূর্ব্বদিনে যাহাদের শয্যাশায়ী দেখিয়াছিলাম, পরদিনে তাহাদের জন-কতককে নদীর ধারে সিগারেট ফুঁকিয়া খোষমেজাজে বেড়াইতে দেখিলাম। ভাবিলাম, বেশ হইয়াছে, এবার কিছু রোজগার করা যাক্‌।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পরদিন হইতে আর-একটাও ডাক আসিল না। মনে করিলাম, দিন-কতক যাক্‌, নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। কোনও ডাক আসিল না।

একদিন দাদা ডাকিয়া বলিলেন, “হ্যাঁরে, এ-সব কি শুন্‌ছি? তোর নাকি মাথা খারাপ হয়েছে? খুড়া কাল জমীদার-বাবুর নায়েবকে বল্‌ছিল, ‘গিরিশকে নিয়ে যাওয়া মিছে। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রোগী দেখ্‌লে মার্‌তে যায়। ডাক্‌তে গেলে গালাগাল দেয়। আর দিন-রাত ব’সে ব’সে কেবল মিথ্যে কতকগুলো বিল লিখ্‌ছে। মনে কেমন ধারণা হয়ে গেছে, বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা তার পাওনা।”

শুনিয়া ত আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া ফিরিতেছি, দেখি কবিরাজ-মহাশয়ের ঘরে বিরাট মজ্‌লিস্‌। আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই ও গ্রামের মাতব্বর-মণ্ডলী সকলেই সেখানে হাজির। আমারই নাম হইতেছে শুনিলাম। একটু আড়ি পাতিতে হইল। ষড়যন্ত্রটা কি শুনি!

ঠাকুরদাদা বলিতেছেন, “আর বলেন কেন কব্‌রেজ ম’শাই! একেবারে উন্মাদ পাগল হয়েছে। আমায় বলে কি না ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে। কি করি বল, আপনার লোক, সম্পর্কে নাতি বোলে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। নইলে অন্য কেউ হ’লে দেখে নিতুম একবার। আমার কথায় বিশ্বাস না-হয় এই চাটুয্যে-ম’শাই, ঘোষাল-ম’শাই আর গাঙ্গুলীদাদাকেই না হয় জিজ্ঞাসা করুন। ওঁরাও ত সেখানে বসেছিলেন।”

গাঙ্গুলিম'শায় বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কথাটা সত্যি বটে। আমরা ত শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম। আপনার লোক, বয়সে বড়, তায় সম্পর্কে ঠাকুরদাদা। তাকে কিনা মুখের ওপর এ কথাটা বল্লে! হ'লই বা পাগল!"

চাটুয্যে-মশাই বলিলেন, "ও-সব ইংরেজী পড়ার ফল,—বুঝেছেন কি না! এই জন্যেই—বুঝেছেন কি না—আমার ছেলেটিকে ইংরেজী স্কুলে দিই নি। শুভঙ্করী শিখে গোমস্তাগিরি করে খায় সেও ভাল,—বুঝেছেন কি না—তবু আমার ইংরেজী-পড়া ছেলে চাই নি। কোন্‌দিন বাপকেই—বুঝেছেন কি না—জুতোর ঠোক্কর দিয়ে বস্‌বে।"

খুড়ামহাশয় বলিলেন, "তা এখন করা যায় কি? চিকিৎসার না-হয় কোনও ভাবনা নেই। আমাদের বহুদর্শী কবরেজ ম'শাই থাক্‌তে ও-সব অর্ব্বাচীন ছোঁড়াদের দ্বারা কি আর ভাল চিকিৎসা হত! তবে আপনার লোক, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে গিরিশকে না দেখিয়ে আর কব্‌রেজ ম'শাইকে ডাক্‌তে পারি নি। বিশেষ গিরিশ যে রকম করে ধরেছিল—বল্‌ত 'খুড়োমশাই, আপনাদের ভরসাতেই এ গ্রামে আছি।' তা আমি আমার যতদূর সাধ্য, গিরিশের রোগী যোগাড় করে দিয়েছি। আমাদের গোষ্ঠীর কেউ গিরিশকে ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকে নি। কিন্তু পাগলের হাতে ত আর চিকিৎসা করান যায় না। সেদিন ওষুধ আন্‌তে পাঠিয়েছিলুম, চাকরকে বলে দিয়েছে 'আরও জনকতক লোক নিয়ে আস্‌গে যা। তুই একলা চেয়ার, টেবিল, আলমারী নিয়ে যাবি কি করে?' একেবারে বদ্ধ পাগল কব্‌রেজ ম'শাই, বদ্ধ পাগল।"

কবিরাজ-মশাই এতক্ষণ অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তামাক টানিতেছিলেন। এইবার মুখ হইতে অনেকখানি ধূম বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, "একটু হিমসাগর তৈল মাসখানেক মাথায় মালিস কর্‌লেই সব সেরে যাবে। আমার কাছে যা মস্‌লা আছে তা আজ-কালকার দিনে আর কোথাও পাওয়া যায় না। যদি বলেন ত মাসখানেকের উপযোগী তেল তৈরী করে দিই।"

পিসাম'শায় বলিলেন, "আপনি কাল সকালে গিরিশের দাদার সঙ্গে দেখা করে একটা ব্যবস্থা করুন। আহা, ছোক্‌রা লেখাপড়া শিখে শেষটা এমন হ'ল!"

আমি আর দাঁড়াইলাম না। দাঁড়াইলে বোধ হয় আর আত্মসংবরণ করিতে পারিতাম না। রাগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হন শুনিয়াছিলাম, ইহারা যথার্থই আমায় পাগল বানাইল।

দাদাকে সকল কথা বলিলাম। দাদা বলিলেন, "তুই হুগ্‌লীতে গিয়ে ডিস্‌পেন্‌সারি খোল্। এখানে আর সুবিধে হবে না।"

একবার মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই নীচ লোকগুলোর ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইব? কিন্তু উপায়ও দেখিতে পাইলাম না। উপার্জ্জনের পথ ত করিতে হইবে।

হুগ্‌লীতে যাইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেল। যেদিন গ্রাম ছাড়িব, সেইদিন সকালবেলা গ্রামের জনকতক মাতব্বর, কবিরাজ-মহাশয় ও নিবারণ বাবাজী আসিয়া হাজির। আত্মীয়রা কেহ দেখা দেন নাই,

বোধহয়, পাছে টাকার তাগাদা করি এই ভয়ে।

কবিরাজ-মহাশয় বলিলেন, “বাবাজী নাকি হুগ্‌লীতে যাচ্ছ?”

আমি বলিলাম, “আজ্ঞে হ্যাঁ। মাথাটা খারাপ হয়েছে কিনা, দিনকতক চিকিৎসা করাতে হ’বে। হুগ্‌লীতে বিরজা কব্‌রেজের হিমসাগর তেলের মত ওষুধ আজকাল আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

কবিরাজ-ম’শাই একটু যেন দমিয়া গিয়া বলিলেন, “বায়ুর প্রকোপটা একটু কম যাতে থাকে তাই ক’রো বাবাজী। সুশ্রুত বলেন—

‘কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।’

অর্থাৎ, বায়ুর প্রকোপে মাথা খারাপ হ’লে উদরে হরীতকী দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।”

আমি না হাসিয়া খুব গম্ভীর ভাবে বলিলাম, “আজ্ঞে, যা বলেছেন!—

চরকসংহিতাতেও পড়েছিলুম—

“ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥”

কবিরাজ-মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, “ঠিক্, ঠিক্! বাবাজীর আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রও পড়া আছে দেখ্‌ছি।”

আমি সবিনয়ে বলিলাম, “আজ্ঞে, অল্প-স্বল্প,—আপনাদের মত কি আর পড়েছি?”

দাদা আসিয়া বলিলেন, “ওঠ গিরিশ, বেলা হয়ে যাচ্ছে।”

আমি উঠিলাম। যাইবার সময় কবিরাজ মহাশয়কে বলিলাম, “দেখুন কব্‌রেজ-ম’শায়, সূচিকাভরণে আজকাল বড্ড উপকার হচ্ছে, বড় বড় ডাক্তাররা পর্য্যন্ত কবিরাজী সূচিকাভরণ চালাচ্ছেন। আপনিও ব্যবহার করে দেখ্‌বেন। জ্বরবিকারে গোটা-চারেক বড়ি দিলেই একেবারে আরাম। কিন্তু বেশ টাট্‌কা বিষ যোগাড় করা চাই নৈলে ফল হবে না। কেবল চুপিচুপি আপনাকে বলে গেলুম। গ্রামের সবাই প্রায় আমার আত্মীয়। তাই ওদের ভালটা আগে দেখ্‌তে হয়। আর দেখ বাবাজী, (নিবারণের দিকে ফিরিয়া) হোমিওপ্যাথি ‘Cobra’-(কব্‌রা)-ও সূচিকাভরণের কাজ করে। কিছু বেশী পয়সা দিয়েও ‘কব্‌রা’ টা আনিও। আমায় লিখ্‌লে আমি হুগ্‌লী থেকে টাট্‌কা ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দেব।”

বলিয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দেখিলাম আমাদের বুড়ো চাকর বেণী ডিস্পেন্সরী-ঘরে চাবি লাগাইতেছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

মোদ্দা কথা

যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে গল্প লিখে থাকেন তাঁদের দিকে নাক-সিঁটকে কেউ কেউ বলচেন যে ও-সব মাথা-মুণ্ড লিখে হচ্ছে কি? ওতে দুনিয়ার কি কোনো উপকার হবে? সাহিত্য-সংসারে একদল লোভী লোক আছেন যাঁরা সব-জিনিষ থেকেই উপকার আদায় করবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারেন না। যা পাচ্ছেন তাই নিয়ে তাঁদের মন খুসী হয় না, তাঁদের আরো-কিছু চাই।

মানুষ সংসারে চলাচল করে বেড়ায় দুরকম করে। এক হচ্ছে হিসেবের খাতা বুকে নিয়ে, আর-এক হচ্ছে ঠিক তার উল্টো—বেহিসেবী চালে। মানুষের ভিতর এই যে দুটো ভূত—একটা হিসেবী আর একটা বেহিসেবী, এরা কেউ কাউকে রেয়াৎ করে চলেনা। তা যদি চলত—কিম্বা মাত্র-একটা ভূত যদি থাকত তাহলে দুনিয়ায় এত গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠত না;—ঘড়ির কাঁটার মতো সব ঠিক-ঠিক চলে যেত। একখানা পাকা হিসেবের খাতা বেঁধে নিতে পারলে তারই সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে জীবনটা বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে দেওয়া যেত—হিসেব-মতো সব পেতুম, হিসেব-মতো দিতুম, কোনো গোল থাকত না। কিন্তু তা তো হবার জো নেই; বেহিসেবীটা ঝড়ের মতো এসে হিসেবের খাতা ছিঁড়ে-খুঁড়ে তার পাতা উড়িয়ে কি যে করে দেয় তাইতে সব গোলমাল হয়ে যায়—অত যে হিসেবপত্র সে-সব কিছুই ঠিক থাকে না।

হিসেবীটা আমাদের কানে-কানে ফোসলায় এতখানি জমা কর, এতটুকু খরচ কর; ওদিকে যেয়োনা ভারি লোক্সান, এই পথটা লাভের পথ; এই শস্য যদি বপন কর, এত ফল পাবে, ঐ লোকটার সঙ্গে যদি কারবার কর, ও তোমায় ঠকাবে; এই-খানে তোমার ভয়, এইখানে সংশয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বেহিসেবীটা অত-কথা বলে না, সে এসে হিড়্‌হিড়্ করে টানে, বলে এস, এস;—চলে-চল। কোথায় যাবরে বাপু? কেনরে বাপু?—এ সব কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসরই দেয় না। কোথায় থাকে তখন হিসেবের খাতা—লাভ-লোক-সানের কথা!

এই হিসেবীটা যে মন্দ তা বলচি না, এর দ্বারা জগতে উপকার হয়েছে—মানুষ কি কোরে বেশ নিশ্চিন্তে থাকে এর সেই চেষ্টা। এ মানুষকে অঙ্ক কসতে শিখিয়ে বলচে, বিজ্ঞান শিখিয়ে বলচে—দেখ, এই রকম যদি কর এর ফল এই হবেই, এর নড়চড় কিছুতেই হবে না। এমন করে কানে-ধরে সব শিখিয়ে দিচ্ছে যে কেউ যে ধাপ্পা দিয়ে ভুল বুঝিয়ে যাবে তার জো নেই—হিসেবের সঙ্গে তখনি গর-মিল হয়ে তা ধরা পড়ে যাবে।

কিন্তু বেহিসেবী এ-সবের কিছু ধার ধারে না—তার কোনো মতলবই নেই ;—সে হিসেব করে না, সে কেবল একটা করে ফেলে। নিজের গায়ের কাপড়খানা, কি নিজের পাতের ভাত সে আর-একজনকে দিয়ে ফেল্লে, কারুর জন্যে হয়ত প্রাণটাই বিসর্জ্জন দিলে, নিজের কোনো লাভ নেই এমন-একটা কাজে বিস্তর টাকা খরচ করে ফতুর হয়ে পথে-পথে বেড়াতে লাগল, যাকে ভালোবেসে কোনো ফল নেই তাকেই ভালোবেসে ফেল্লে, যা পাওয়া যাবে না—তারই পিছন-পিছন চিরজীবন ছুটে শেষটা পথের মধ্যেই মরে পড়ল। এমনিতর কত যে অনাসৃষ্টি ব্যাপার সে সৃষ্টি করে তার ঠিক নেই। হিসেবের খাতার মধ্যে তাকে আনা যায় না—তার জমাখরচও চলে না।

হিসেবীটার কাজই হচ্ছে কিনা সব-কিছুকে হিসাবের মধ্যে আনা ; সেইজন্যে সে বেহিসেবীকে একেবারে বাতিল করে তার হাল ছেড়ে দিতে পারচে না। সে বড় পাকা লোক, সে অনবরত খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করচে ঐটের ভিতর থেকেও কিছু লাভ আদায় করা যায় কিনা। কিন্তু বেহিসেবীটাকে হিসাবের মধ্যে ফেল্লে সে যেন কেমনতর হয়ে যায়—তার আর সে-রূপ থাকে না, তেজ থাকে না, মানুষের মন-কাড়বার শক্তি কমে আসে। সে তখন কাঁদলে লোকে বলে মায়া-কান্না কাঁদচে, কাউকে ভালোবাসলে বলে ও ডাইনির ভালোবাসা, প্রাণ দিলে বলে নাম-কেনবার জন্যে অমনটা করলে। হিসেবীর কাজের ভিতর যে উদ্দেশ্য বলে একটা জিনিষ থাকে সেইটে ঐ বেহিসেবীর সমস্ত রস একেবারে জল করে দেয়।

জগতসংসারে এই হিসেবী আর বেহিসেবী দুটোরই নাম-যশ খুব। দুজনেরই উপাসক আছে, স্তাবক আছে। দুজনেরই মহিমা কীর্ত্তন খুব চলচে। এ ছাড়া আর একটি দল আছেন তাঁরা থাকেন মাঝামাঝি,—হিসেবীকে রাখেন, বেহিসেবীকেও চান, আবার বেহিসেবীর কাছ থেকেও কিছু লাভ আদায় করবার মতলব রাখেন। এঁরাই হচ্ছেন একটু অতিরিক্ত লোভী। এঁরাই সব-কিছুর কাছ থেকে হিসাব মতো লাভ পাবার দাবী নিয়ে চীৎকার করেন।

*
* *

মানুষের মধ্যে এই যে সব ঝঞ্ঝট, এর ধাক্কা সাহিত্যে, শিল্পে—মানুষের সব রচনার উপর এসে পড়েছে। কোনো জায়গায় হিসেব-খতিয়ে লাভ-লোকসান দেখে কাজ চলছে, কোনোখানে বেহিসেবীর হুটোপাটি চলচে, আবার কোথাও বা অতি-বুদ্ধিমানেরা হিসেবী, বেহিসবী ও হিসেবী-বেহিসেবীকে নিয়ে জগতে লাভের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে মহৎ উপকার করবার চেষ্টায় আছেন। এই সব-কটা শ্রেণীরই এক-একটা নাম দিয়ে বাজারে মহা হৈ-চৈ চলছে। যাঁরা বেহিসেবী রকমে সাহিত লিখচেন, শিল্প সৃষ্টি করচেন—হিসেবী তাঁদের উপর চোখ রাঙাচ্চেন, বলচেন, তোমর আমাদের হিসেব সব গোল করে দিচ্চ আমরা এতটা লাভ জমিয়ে এনেছিলুম তোমরা তা মাটি করে দিলে। তার

চীৎকার করে জগৎসংসারের লোককে বলচে —সাবধান, সাবধান! তারা অঙ্ক কসে— যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে বলচে এই দেখ আমরা যা বলচি তা একেবারে নির্ভুল। বেহিসেবী কিন্তু সে কথায় কান দিচ্চে না।

কিন্তু ঐ কটা দল কি সমস্ত বিশ্ব জুড়ে আছে? তা ত নয়। ওদের বাইরে একটু জায়গা আছে যেখান-থেকে আর-একটা বিচার চলছে। সেটা এই যে, যে যা তাকে তাই বলে মেনে নিয়েই বিচার করা। আমগাছ আমই দেয়, কাঁটাল দেয় না, তাতে হয় ত মানুষের লোকসান হচ্চে, তাই নিয়ে ঝগড়া না করে আমের রস-বিচার করাটাই ঠিক বলে একদল রসিক মেনে নিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, এঁরাই পাকা রসিক—কারণ এঁরা রস উপভোগ করে সেই রসের মাধুর্য্য বণ্টন করচেন—রস নিয়ে শুক্‌নো তর্ক করচেন না।

কেউ হয়ত চোখ রাঙিয়ে বলে উঠবেন, তোমরা মূর্খ তাই তর্ক করতে ভয় পাচ্ছ। আমরা তাদের এই জবাব দেব—আচ্ছা বেশ, তোমরা ততক্ষণ তর্ক কর—আমরা যে রসের ভাঁড় হাতে পেয়েছি তাতেই মন ডুবিয়ে রাখি।

*
* *

আচ্ছা, মানুষে গল্প শুন্‌তেই বা চায় কেন আর গল্প বলতেই বা এত ব্যস্ত কেন? কেউ কেউ বলেন, গল্প শোনবার মানুষের একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা আছে—যেমন তার অন্নের ক্ষুধা, জলের পিপাসা। তাহলে এর পরের কথা হবে এই যে, মানুষ গল্প শুন্‌তে চায় বলেই মানুষ গল্প তৈরি করে। কিন্তু এতে করে কি প্রশ্নের ঠিক মীমাংসাটা হল?

খুব আদিম কালের মানুষের সৃষ্টি-করা গল্পগুলো যদি তলিয়ে দেখা যায় তাহ'লে এই মনে হয় যে, মানুষ মনের দু-রকম তাগাদায় গল্প বলেছে। এক হচ্ছে এই যে, তার প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার লড়ালড়ির ব্যাপারে তাকে যে-সব অসম-সাহসিক কাজ করতে হয়েছে—যে বিপদে পড়তে হয়েছে, বিপদ কাটাতে হয়েছে কিম্বা তাইতে মরতে হয়েচে অথবা এমন-একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেচে যাতে তার মনকে খুব নাড়া দিয়েছে অর্থাৎ সে নিজে যা করেছে বা দেখেছে সেই-সব তাকে এমন একটা প্রেরণা দিয়েছে যে সে তা বলে তবে যেন নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। ঐ-সব কথা বলবার আগ্রহটা তাদের এত বেশি ছিল যে, যখন ভালো করে ভাষা ফোটেনি তখন থেকেই নানা-রকম ইসারায় তাদের অন্ধকার গুহার মধ্যে যেখানে একটু জায়গা পেয়েছে সেইখানেই ঐ-সব কথা এঁকে এঁকে রেখেছে। তাদের সেই প্রথম জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা—নূতন সংশয়, নূতন আনন্দ যা পেয়েছে যেমন-করে পেরেছে প্রকাশ করে তবে ছেড়েছে। কারণ প্রকাশ করাটাই হচ্ছে সত্যকার পাওয়া।

ঐ তো গেল একটা কথা। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, শুধু বাস্তব জীবনে নয়, কল্পনায় যা দেখেছে তার কথা'ও তারা বলেছে। নতুন চোখ মেলে, মন খুলে এই বিশ্বের প্রতি যখন তারা চেয়ে দেখেছিল তখন এই বিশ্বের বিচিত্র আশ্চর্য্যরূপ, এর

গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এর পীড়ন, এর অত্যাচার, এর স্নেহ চারদিক থেকে তাদের ছেঁকে ধরেছিল। তারই উত্তেজনায় আর নতুন প্রাণের আবেগে তারা পৃথিবীকে লুঠ-করে নেবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পদে পদে তাদের ঠেকতে হয়েছে—বিশ্বের শক্তি এই চঞ্চল শিশুগুলিকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়েছে। ছুটে যাবার পথে প্রকাণ্ড পাহাড় এসে পথ-আগলে দাঁড়িয়েছে, নদী সমুদ্র এসে পথকে খণ্ডিত করে দিয়েছে। যাবো আর নেবো এমনটা হয় নি। এই সব ধাক্কায় তাদের অন্তরে নব নব ভাবের উদয় হয়েছে—কখনো ভাবনা এসে, কখনো ভয় এসে, কখনো সংশয় এসে তাদের চুলের মুঠি ধরে নাড়া দিয়ে গেছে। বিশ্বের একটা অসীম দুর্জ্ঞেয়তা তাদের চারদিক থেকে আচ্ছন্ন করেছে। প্রকৃতির কারণ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু কার্য্য এসে তাদের সঙ্গে লড়াই দিচ্ছে। তখন তাদের ভয় একটা পাহাড়ের মূর্ত্তি ধরে কিম্বা হিংস্র জন্তুর আকার ধরে মনের মধ্যে বিরাজ করেচে। পাহাড়কে তারা ভয় বলে দেখছে—ভয়ের ছবি আঁকতে হলে তারা পাহাড়কেই এঁকেচে। তার পর, তারা প্রতি পদে ঠেকে শিখেছে যে বিশ্বের যা দেখচি এই সব নয়,—আরো আছে, আরো আছে, আরো আছে! কারণ যখনই তারা একটা জিনিষকে বাগে এনে মনে করেছে এর শেষ করে ফেল্লুম তখনই তার ভিতর থেকে নূতন বেরিয়ে এসে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে—তার সঙ্গে আবার তাকে লড়তে হয়েছে। এমনি করে দুর্জ্ঞেয়তার অন্ত না পেয়ে তার বিশ্বাস হয়েছে—আরো আছে। বাস্তবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই আরো-আছের বিশ্বাস মিলে তার কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছে। এই কল্পনাকে লাভ করে সে যেন আর একটা নূতন জগতের পরিচয় লাভ করলে—তাকে সে পেলে। এই পাওয়ার গল্প তখন সে বলতে আরম্ভ করলে। তখন যে বাস্তব জীবনের গল্প একেবারে থেমে গেল তা নয়। ক্রমে কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিশল, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশল, এবং ক্রমে হয় ত কল্পনাও বাস্তব হয়ে দাঁড়াতে লাগল।

*
* *

মানুষ তখন যে জন্যে গল্প বলেছে আমার মনে হয় এখনকার মানুষ ঠিক সেই জন্যেই গল্প বলে। এখনও মানুষের কাছে পৃথিবী পুরাতন হয়ে আসে নি—এখনও সেই দুর্জ্ঞেয়তার মায়া তাকে প্রতি দিন আচ্ছন্ন করচে—সে এখনো বিস্মিত হচ্ছে, এখনো ভয় পাচ্ছে, এখনও বাধা দেখচে। তবে অবশ্য বলবার কথা, বলবার ধরণ এখন আলাদা হয়ে গেছে—কারণ সে জীবন এখন নেই। এখন অনেক মোটা জিনিষ ঝরে গিয়ে সূক্ষ্মের দিকেই মানুষের মন যাচ্ছে।

মানুষের মন-থেকে এখনও কল্পনার জগত সরে যায় নি—একেবারে আজগুবি কল্পনাকে সে আমোল দিতে পারচে না বটে কিন্তু সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করচে না। সেই জন্যে গল্পের স্রোত বেড়েই চলেছে। ঠিক যে-মানুষটি চোখের সামনে দেখা যায় তার কথা না বলেও

যে-মানুষটি হতে-পারে এমন মানুষকে সৃষ্টি করে তার কাহিনীও বলা হচ্ছে। তার জন্যে তাকে নিন্দা করলে চলবে না; কারণ সে সৃষ্টি করচে—যা সম্ভাবনায় আছে তাকে সম্ভব করে তুলছে—এই সম্ভাবনার মানুষটি রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে নিশ্চয় একদিন দেখা দেবেন। ছুনিয়ায় এমন-তর যে ঘটেনি তা নয়।

এই সম্ভাবনাকে মানুষ অস্বীকার করছে না বলেই তার চলার পথ খোলা আছে। তার জ্ঞানের কাজ, বিজ্ঞানের কাজ, তার সাহিত্য, শিল্প থেমে যায়নি। কোনো সমালোচক যদি এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে বলেন তাহলে জানব সে মানুষের মহা শত্রু।

*
* *

মানুষ এমনি করে সাহিত্য শিল্প জ্ঞান বিজ্ঞান সৃষ্টি করে চলেছে। তার সৃষ্টির ফল নিয়ে খাতাঞ্জির দল বড়-বড় হিসেবের খাতা খুলে মনুষ্য-জাতির লাভ-লোকসানের হিসেব কস্‌চেন। সেটাকে আমি মন্দ বলি না। সেটার হয়ত দরকার আছে। কিন্তু সৃষ্টির তাৎপর্য্যই যে তাই এ কথা আমি মানি না। মানুষ এই পৃথিবী থেকে যে রস পেয়েছে সেই রস সে অন্য-আকারে ফিরিয়ে দিয়েছে—তাইতে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন গাছ মাটি-থেকে রস নিয়ে ফলের মধ্যে দিয়ে সেই রস পৃথিবীতে বিতরণ করে। সেই ফল বেচে হয় ত মালির লাভ হতে পারে কিন্তু গাছ যে সে-জন্যে ফল দেয়নি এটা ঠিক। তেমনি সাহিত্য-বাগানের মালিরা যদি পারেন সাহিত্যের ফল থেকে ছুপয়সা লাভ করুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যদি বলা হয় ঐ লাভের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তাহলে বলতেই হবে তা নয়। সাহিত্য জন্মগ্রহণ করেছে রস আত্মসাৎ করে এবং তার কাজই হচ্ছে রস বিতরণ করা। তাহলে বলতে হয়, সাহিত্যের বিচার হিসাবের খাতা দেখিয়ে নয়—জগতে কি উপকার হল, না হল, তা খতিয়ে নয়, —তার রস বিচার করে।

খোলা জানালায়

জানালা খুলে বসে আছি, তার নীচের ঝিলমিলগুলিও তোলা আছে। দেখতে পাচ্ছি সম্মুখের সবুজ মাঠ, তাও বারন্দার সিঁড়ির ব্যবধানে মাঝে মাঝে খণ্ডিত, ছোট ছোট গাছপালার হেলাদোলা, পাশের বাড়ীর ছাদের মাথা, দোতলার খোলা জানালার ছুধারের ছুই রং, একদিকে ধূসর অন্যদিকে সবুজ—ছাদের কার্ণিশ হতে তারি উপর আমাদের বাঙ্গালী বাড়ীর বিশেষ নিদর্শন, একখানি রাঙা-পেড়ে গঙ্গাজলী ডুরে শাড়ী কেবলি উড়ে এসে পড়ছে, নেতিয়ে পড়ে, উঠে আবার উড়ছে, কখনো তার ভঙ্গী উদ্যত-ফণা ফণিনীর মত ইঙ্গিতে গৃহিণীর অপ্রতিহত প্রভাব ব্যক্ত করছে।—

আবার কখনো-বা বাতাসের তাড়নায় ঘূর্ণীপাকের মত কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে, সাদা আর রাঙার পাকে জড়িয়ে দড়ার মত হয়ে যাচ্ছে, তিনি যে এই সংসারে মায়ার কি নাগপাশে জড়িয়ে আছেন, তাই যেন জানাচ্ছে। আরো দূরে দেখতে পাচ্ছি বড় বড় উঁচু গাছের মাথা, কোনটি ছত্রাকার, কোনটি ফোয়ারার উচ্ছ্বাসের মত উপরে উঠে, নীচের দিকে গোল হয়ে ঘিরে ঝরে পড়ছে। একটি আমগাছের মাথার আত-পত্রে নূতন সবুজ আর কচি রাঙা পাতার বাহার! তারি পাশে অশ্বত্থগাছে অসংখ্য পাতা, সবে গজিয়েছে, কচি দুর্ব্বার মত একটুখানি পীতাভ হরিত; তারা কেবলি নাচছে! ছোটছেলে পা-জড়' করে যেমন লাফিয়ে ওঠে, কিম্বা কলের পুতুলের কল টিপলে সে যেমন চট করে চোখ খোলে, তেম্নি হঠাৎ গতি, এ পাতা যখন উল্টে পড়ে তখন সেই পুতুলের খোলা চোখের মত চকিত সাদা দেখা যায়! তারপর মস্ত একটা গাছের মাথা, তার পাতার চুলের উড়ে-পড়া, দোলা, ছড়িয়ে যাওয়া, কিছুই ভিন্ন করে দেখতে পাচ্ছিনে, সব নেপ্‌টে আছে, আমাদের হাল-ফেশানের "পাতা-কাটা" কেশ-সজ্জার মত;—একটি বড় ডাল এধারে ওধারে ধীরে ধীরে দুলছে, কে-যেন বড় লজ্জা করে ঘাড় নাড়াচ্ছে, বলছে "না, না, দোহাই তোমার"!

এর পরই পৃথিবীর সম্পর্ক ঘুচল, শুধু আকাশ দেখতে পাচ্ছি, মেঘে মেঘে ছয়লাপ; নীল যে কোথায় ছিল তার আর কোন নাগালই পাওয়া যাচ্ছে-না। কিন্তু এই ধূসর মেঘগুলির রং গাদা-করা ছাইএর ঢিপির মত নয়, এর মধ্যে বেশ একটু তেজ আছ, ইস্‌পাতের মত, তীক্ষ্ণ আলোর সম্ভাবনা সঙ্গোপনে পোষণ করে রেখেছে! দিগন্তের নুয়ে-পড়া অংশ বেয়ে মেঘ কেবলি উঠে আস্‌ছে, রাশি রাশি, সারি সারি, ধূসর আর ধবল। কখনো আবার বাতাসের প্রবল আবেগে একেবারে সব পরদা উড়ে উঠছে, তখনই আকাশের সুনীল চোখের স্বচ্ছ চাহনি আর তারি উপর আলোর হাসি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই আলোর লীলা, খোলা চোখের চাহনি চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে, ধূসরের পরদা সরসরিয়ে নেমে আসছে; আলোর আশা গেলেও তার স্মৃতিটুকু ত ফুরোচ্ছে-না। একটি চিল আবর্ত্তের মত ঘুরতে-ঘুরতে শূন্যপথের অবর্ত্তমান আশ্রয়ের প্রত্যাশায় উঠছে, কেবলি উঠছে। ডানাদুটি তার যতদূর-সম্ভব সটান করে ছড়িয়ে দিয়েছে, আগ্রহের আর অন্ত নাই, কিন্তু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষ যখন আর দেখতে পাবে না, তখন তার নেমে-আসা, নিঃশেষিত-আলো উল্কা-পিণ্ডের খসে-পড়ার মতই হবে। কাক কখনো একা, কখনো সঙ্গীর সঙ্গে উড়ে চলেছে, উপরের দিকে নয়, কখনো পূর্ব্ব হতে পশ্চিমে, কখনো-বা উত্তর হতে দক্ষিণে, বাতাসের সমুদ্রের বুকে সাঁতার দিয়ে চলেছে, তাদের পাখার আন্দোলন হাতছানি দিয়ে আহ্বান-সঙ্কেতের মত! তারা পৃথিবীর গাছপালার মাথার উপরে খুব যে বেশীদূর ছাড়িয়ে [illegible]ছে তা নয়, উড়ছে আবার গাছের আগায় এসে বসে

পড়ছে! এদের কাক-চক্ষু আকাশের নীলে ভরা, কিন্তু সে দৃষ্টি পৃথিবীর মুখের দিকেই সন্নত; আর ঐ চিলের চক্ষুদুটি আগুনের পিঙ্গল স্ফুলিঙ্গের মত,—উড়ে ওঠা আর খসে পড়াই যার ব্যবসায়। ভূঁয়ে-চরা পাখীদের আজ খবর নাই, তারা আকাশের ভাবগতিক, গম্ভীর দৃষ্টি, বাতাসের পালাই-পালাই ভঙ্গী, এলোমেলো চলাফেরা, আর পৃথিবীর অন্ধকার মুখ দেখে, ঘর ছেড়ে বেরোনটা উচিত মনে করেনি। চটুল চড়াই ছাদের কার্ণিশের নীচে হতে, বারান্দার কোণার বাসা হতে চট করে এক-একবার নেমে, কিছু খুঁটে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তবু কিন্তু কোকিলের ডাকের বিরাম নাই, সেই রাঙা-আঁখি বিরহী পাখীটির পক্ষে কি আলো-করা, কি মেঘলা দিন দুইই সমান। তার মনের চিরক্রন্দন তো কিছুতেই শান্তি মানতে চায়-না। বাতাস গাছপালার পাতায় পাতায় যে মর্ম্মরধ্বনি সঞ্চার করে যাচ্ছে, তাও অফুরাণ। পৃথিবীর বুকে শিকড়ের শিকল দিয়ে বাঁধা এই যে স্থাবর, এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অঙ্গুলির সব ভঙ্গিমাই, হাওয়ায় উড়ে-চলা পতঙ্গ, পাখী আর মেঘের মত! পরাধীন শৃঙ্খলায়ত্তের মনের মধ্যে ছাড়া পাবার, স্বৈর বিচরণের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—অভিশপ্তের অকাল মুক্তি-প্রয়াসের মত, কেবলি ব্যর্থ হাহাকারে আর নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাকে ব্যক্ত করছে!

এতক্ষণ যে মেঘমালা কেবলি উড়ে উঠছিল, এখন তারা স্থির হয়ে আপনাদের স্তূপে আর স্তম্ভে পরিণত করেছে, বাতাস তাদের আর টলাতে পারছে না। তাদের দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণী মনে করতে বাধা নাই, বিদ্যুৎ হঠাৎ চমকে উঠে তীক্ষ্ণ অঙ্গুলি দিয়ে চিরে চিরে ফাটল ফুটিয়ে দিয়ে গেল, সেখানে ফাঁকে ফাঁকে ধূসরের নিবিড়তা লঘু হয়ে এল, মনে হচ্ছে বহুদূর হতে পাহাড়ের গা বেয়ে ক্ষীণ জলধারা বয়ে আসছে; গিরিরাজের স্বর্ণ উপবীতের মত!

মেঘ উড়ে চলে বটে কিন্তু একা থাকৃতে চায়-না, যেখানেই একজনের দেখা পাওয়া গেল, অম্নি সঙ্গে-সঙ্গে আরো দশজন এসে জমে যায়, এরা গলাগলি করে চলে, এদের মধ্যে বড়-একটি উদার হৃদ্যতার ভাব আছে, কোন ব্যবধানই রাখে না, মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। পাখীরাও ঝাঁক বেঁধে একত্রে উড়ে চলে বটে, কিন্তু তাদের ডানার ব্যবধান এক হতে দেয় না। এদের বাষ্পের ডানা স্পর্শমাত্রে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, কোন বাধাই রাখে না, এমন-কি আকারেরও নয়, যার সঙ্গে মিল্‌তে চায় তার সঙ্গে শুধু অর্দ্ধাঙ্গ নয়, একেবারে সর্ব্বাঙ্গে অভিন্ন হয়। জানি, মেঘ আকাশের পথেই, বাতাসে ভর করে উড়ে আসে, তবু যখন দূর দিগ্বলয়ের সীমা হতে তাদের আস্‌তে দেখি, তখন বোধ হয় কোন অতল ফুঁড়েই উঠে আস্‌ছে—এরা যে সমুদ্রের বাষ্প হ'তে জন্মগ্রহণ করেছে সেইটি আভাষে প্রকাশ করে বোধ হয়। আকাশ-লোকের এই কামচারীদের কখনোই নিঃসঙ্গ দেখা যায় না, তাই শরতের বারিহীন, শুভ্র, লঘু, একক, এক-একখানি মেঘকে অপার আলো আর অন্তহীন

নীলিমার বুকে ভেসে যেতে দেখেও কেমন দুঃখ হয়। অমন আনন্দের মধ্যেও সে যেন উদাস হয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে চলে।

স্তম্ভ এবং স্তূপ দাঁড়ায় না, বাতাসের বার বার ঠেলা পেয়ে টলতে আরম্ভ করেছে —ভেঙে পড়ে আর-কি! এরা যদি ইষ্টক প্রস্তরের নির্ম্মাণ হত, তাহলে চারিদিক ছেয়ে চূণ-বালির ধূসর রাবিশ ঝরতে আরম্ভ করত, কিন্তু এরা যে বাতাসের আবেগে উড়ে-আসা বাষ্পের প্রয়াস, উত্তাপের অভিমান, যখন ভাঙন ধরল তখন চারিধারে বৃষ্টিধারার বর্ষণ আরম্ভ হল, সব যে ঝাপসা হয়ে এল, এ অশ্রুজলের অভিযান আমার খোলা জানালা দিয়ে, ছোট্ট ঘর-খানির ভিতর প্লাবন বহিয়ে দিলে। আর তো স্থির হয়ে বসে ছবি-আঁকা সম্ভব নয়, বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা কওয়াও বন্ধ হল সেই সঙ্গে সব দুয়ার-জানালা রুদ্ধ করে অন্ধকারের অধিকার প্রচার হয়ে গেল; অতএব দেখাও শেষ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গ্রেফ্‌তার

(গল্প)

আষাঢ় মাস। সারারাত্রি বর্ষণের পর ভোরের দিকে আকাশ বেশ ধরিয়া গিয়াছে। পথে এক-হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া লোক চলিতে সুরু করিয়াছে।

বেনেটোলায় এক মেসের কক্ষে তক্তা-পোষে বিছানার উপর কুমুদ চৌধুরী বসিয়া-ছিল। ঘরের কোণে ছোট একটা টেবিল, টেবিলের পাশে চেয়ার। চেয়ারের গায়ে একটা আধ-ভিজা পাঞ্জাবি শুকাইতেছে। টেবিলের উপর কালি-কলম, কেতাব-কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া—টুথ পাউডারের কৌটা, সাবানের বাক্স, আর্শি-চিরুণি এবং 'হাওয়াগাড়ী' সিগারেটের খোলা প্যাকেট অবধি—সবই বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো। টেবিলের কিছুদূরে আর-একখানা তক্তাপোষে বিছানা পাতা —সে বিছানায় শুইয়া সতীশ। তাহার তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই।

কুমুদের চোখ দুইটা লাল—দেখিলে মনে হয়, কাল রাত্রি-জাগরণ গিয়াছে। কুমুদ উদাসভাবে খোলা জানালার পানে চাহিয়া-ছিল। জানালা দিয়া রাস্তা দেখা যাইতেছিল।

কুমুদের বাড়ী রাজসাহীতে। আইনের প্রথম পরীক্ষা দিবার জন্য সে কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতায় তাহার জানা অপর কোন আস্তানা না থাকায় সে আসিয়া সতীশের মেসে উঠিয়াছিল। সতীশের সহিত তাহার পাঁচ বৎসরের আলাপ। রাজসাহী কলেজে দুইজনে একসঙ্গে আই, এস্, সি পড়িত—এখন সতীশ মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

কাল কুমুদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। রাত্রে সতীশের সহিত সে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল—রাত্রি সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত থিয়েটারে থাকিয়া অবশেষে অসহ্য বোধ হইলে, দুই বন্ধুতে অতিকষ্টে একটাকায় একখানা থার্ড ক্লাস গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসায় ফিরিয়াছে। আজই কুমুদের বাড়ী ফিরিবার কথা। সেখান হইতে শ্বশুরবাড়ী গিয়া আবার স্ত্রীকে আনিতে হইবে। সম্মুখে অম্বুবাচী—অম্বুবাচী কাটিলে তার পর সাতদিন আর কোথাও যাত্রা করিতে নাই। গত ফাল্গুন মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছে—স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর আর দেখা হয় নাই—তবে কয়মাসে চিঠির মারফত দুইজনের মধ্যে প্রণয়টুকু খুবই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পত্রে স্ত্রী নীহার লিখিয়াছে, "তোমার এগ্‌জামিন হয়ে গেলেই যদি এখানে না আস, তাহলে আড়ি—আড়ি—আড়ি!"

বসিয়া বসিয়া কুমুদ সেই কথাই ভাবিতেছিল। তাহার ভারী হাসি পাইল। নীহার নেহাৎ ছেলেমানুষ! মনটা তাহার অত্যন্ত সরল! সে ভাবে, সে-ই শুধু কুমুদকে দেখিবার জন্য অস্থির! কুমুদের যেন সেদিকে মোটে আগ্রহই নাই! পাগল! সে ত জানে না, কতকাল আশায় আশায় কাটাইয়া কত দীর্ঘ দিনের বিরহ-তপের শেষে কুমুদ নীহারকে পাইয়াছে! কত সাধের ধন সে! কুমুদ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপর হইতে গতরাত্রের থিয়েটারের প্রোগ্রামখানা টানিয়া সেটার উপর চোখ বুলাইতে লাগিল।

এমন সময় সতীশ ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল, গাঢ়স্বরে কহিল, "কতক্ষণ উঠেছ হে?"

কুমুদ কহিল, "এই উঠছি।"

সতীশ জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, রাস্তার পানে চাহিয়া কহিল, "যাক্, বৃষ্টি ধরেছে তাহলে। কিন্তু পথে—ওঃ, এখনো যে বেশ জল জমে রয়েছে!"

কুমুদ কহিল, "তাইত ভাবছি, বাজার-টাজার কতকগুলো আবার করতে আছে! আজই দার্জ্জিলিং মেলে আমায় বেরুতে হবে—কি করে যে কি হয়!"

সতীশ তাচ্ছল্যের ভাবে কহিল, "কোন ভাবনা নেই। চল না, এই চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া যাক্। এখান থেকে গাড়ী করে প্রথমেই মিউনিসিপাল মার্কেটে গিয়ে কাজ সারা! ততক্ষণে চাঁদনির দোকানগুলোও খুলে যাবে; ব্যস্—কত জিনিষ কিনবে, কেনো না! কলকেতার সহরে আবার জিনিস কেনবার ভাবনা!"

কুমুদ একটু চিন্তিত স্বরে কহিল, "আবার না বৃষ্টি নামে!"

সতীশ কহিল, "না হে না, রোদ উঠেছে—আকাশ পরিষ্কার হয়েছে! হাঁ, তোমার ফর্দ্দটা তাহলে ঠিক করে রাখো।"

কুমুদ কহিল, "সে ঠিকই আছে। তারপর ফিরে এসে সব গুছিয়ে ফেললেই হবে।"

সতীশ তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার কোন ভাবনা নেই হে। সব হয়ে যাবে।"

মাথা একটু নীচু করিয়া কুমুদ কহিল, "ক'খানা বাঙলা বই আবার কেনবার ইচ্ছে আছে।"

সতীশ কহিল, "বেশ ত—ফেরবার মুখে ট্রাম থেকে নয় সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়েই একদম নামা যাবে!" তার পর একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "এগুলো অন্ হার ম্যাজেষ্টিস্ সার্ভিস, বুঝি! ভালো কথা, আজ তোমার চিঠিগুলি দেখতে হচ্ছে।"

ঈষৎ লজ্জামিশ্রিত স্বরে কুমুদ কহিল, "তার আর কি!"

"তাহলে নাও, মুখ-হাত ধোও—আমি চায়ের জোগাড় দেখি" বলিয়া সতীশ ষ্টোভ্ জ্বালিতে বসিল।

২

সতীশের ঘরেই প্রত্যহ চায়ের আসর বসে। একে একে ক্রমে আরও পাঁচ-সাতটি যুবক আসিয়া সতীশের ঘরের তক্তাপোষ দুইখানি অধিকার করিয়া বসিল।

চা খাইতে খাইতে জিতেন দাস কুমুদকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আজই তাহলে আপনি বাড়ী চলেছেন?"

কুমুদ তাহার পল্লী-সুলভ সরল স্বরে কহিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"দার্জ্জিলিং মেলে?"

কুমুদ কহিল, "হ্যাঁ। ঐটেতেই সুবিধে কি না!"

তিনকড়ি কহিল, "কিন্তু দুদিন আরো থেকে গেলে হত না, মশায়?"

সতীশ কহিল, "তোমার মত নাম-কাটা সেপাই নয় ত! নতুন বিয়ে হয়েছে এই সে দিন, এগ্‌জামিনের পাঁচিল ভাঙ্‌ল—আর উনি বলেন, দুদিন থেকে গেলে হত না, মশায়!"

তিনকড়ি হাসিয়া কহিল, "তাহলে ক্ষমা চাইছি।"

জিতেন দাস কহিল, "আপনাদের রাজসাহীর বার্ কেমন? আমরা গেলে কিছু হয়-টয়?"

জিতেন সদ্য ল পাশ করিয়া পুলিশ কোর্টে বাহির হইতেছে। পসার যত হোক আর না হোক, তাহার টিপ্পনীর জ্বালায় মেসের সকলে অস্থির। হুল ফুটাইবার এমন সুযোগ পাইয়া নিয়োগী কহিল, "তোমার এখানে এমন চলছে, বল, তুমি আবার রাজসাহী ছুটবে কি দুঃখে?"

জিতেন অপ্রতিভভাবে কহিল, "না, এই কথার কথা বলছি!"

নিয়োগী কহিল, "তার চেয়ে কুমুদবাবু, আপনি বরং পাশ-টাশ করে এখানে এসে পুলিশ কোর্টে বেরুবেন। জিতেনের জুনিয়রী করে যা পাবেন, তা অন্নের পর্ব্বত!"

ব্যঙ্গের মর্ম্ম বুঝিয়া জিতেন কথার স্রোত ফিরাইল, কহিল, "কাল থিয়েটার দেখলেন কেমন, বলুন।"

কুমুদ সলজ্জ হাসির সহিত কহিল, "মন্দ নয়।"

এমন সময়ে যোগেশ একখানা খবরের কাগজ হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল, ও জিতেন দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওহে জিতেন, তোমার একটা কেশ্ 'থাণ্ডারে' রিপোর্ট হয়েছে যে—"

জিতেন কাগজখানা দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিয়াছিল। দালালের বিস্তর মন জোগাইয়া কাল কোর্টে সে একটা কেশ্ পাইয়াছিল এবং মেশে 'থাণ্ডার' লওয়া হয় বলিয়া রিপোর্টারকে

নিজের ব্যয়ে টিফিন খাওয়াইয়া খাওয়ারের জন্য তাহার রিপোর্টটাও সে লিখাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু মুখে সে এমন ভাব দেখাইল, যেন ইহাতে তাহার মোটেই হাত নাই; আর খুবই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সে কহিল, "কোন্ কেশ্‌টা রিপোর্ট করলে?"

নিয়োগী কহিল, "কাল ক'টা কেশ্ করেছ?"

জিতেন অম্লান বদনে কহিল, "কাল একটু heavy file ছিল।"

তিনকড়ি কহিল, "পড়ই না চেঁচিয়ে—"

যোগেশ পড়িতে লাগিল,

A LENIENT JUDGMENT!

One week for a lota!

One Abdul was placed before the Chief Presidency Magistrate for trial on a charge of having committed theft in respect of a brass *lota* belonging to one Ganga Kahar. He was caught red-handed. Babu Jitendrakumar Das, Pleader appeared for the accused. The learned pleader admitted the charge and prayed for mercy. The Magistrate convicted the accused to undergo one week's rigorous imprisonment."

ঘরশুদ্ধ সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিয়োগী কহিল "এই! আমি ভেবেছিলুম, জিতেন দাস আমাদের মস্ত কি ল' পয়েণ্ট argue করেছে, তারই রিপোর্ট বেরিয়েছে!"

জিতেন লোকটার সহগুণ অদ্ভুত। কিন্তু সব বিষয়েরই একটা সীমা আছে! আজিকার বিদ্রূপ সে সীমা পার হইয়াছিল। তাহার প্রসার-প্রতিপত্তি লইয়া মেসে ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রায়ই সকলেই করিয়া থাকে এবং সে-ও ঔদাসীন্যের অটল বর্ম্মে চির দিনই আপনাকে দুর্ভেদ্য রাখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ এ বিদ্রূপে সে বিচলিত হইল। একজন অপরিচিত যুবার সম্মুখে—বিশেষ যে আইন-পরীক্ষার্থীরূপে দুইদিনের জন্য মেসে আসিয়াছে—তাহার সম্মুখে আইন-ব্যবসায়-ঘটিত এ বিদ্রূপ নিতান্তই অপমানসূচক বলিয়া তাহার মনে হইল। সে রাগিয়া বলিল, "খবরের কাগজের কেশের রিপোর্টে কবে আর ল' পয়েণ্ট বেরিয়েছে, শুনি! ও ত আর ল' রিপোর্ট্‌স্ নয়।"

চায়ের পেয়ালা রাখিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে জিতেন সিগারেট্ ধরাইল।

৩

হাসির রোল তখনও থামে নাই—কুমুদও সে কৌতুক মৃদু হাস্যে উপভোগ করিতেছে, এমন সময় এক বিঘ্ন ঘটিল। গম্ভীর মুখে এক আগন্তুক সেই কক্ষের দ্বারে আবির্ভূত হইলেন। আগন্তুক সকলেরই অপরিচিত; তাঁহার পিছনে আবার মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা এক পুলিশের জমাদার।

দিন-কালের কথা মনে করিয়া যুবকের দল ঈষৎ বিচলিত হইল। জিতেনই সাহস করিয়া প্রথমে কথা কহিল। সে কহিল, "কি চান মশায়?"

আগন্তুক চারিধারটা একবার চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "এটা ত মেশ?"

তিনকড়ি কহিল, "হাঁ।"

আগন্তুক কহিলেন, "এ মেশে কুমুদনাথ চৌধুরী বলে সম্প্রতি কেউ এসেছেন?" কুমুদের বুকটা মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সকলেই বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিল। কুমুদ কহিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী।"

"আপনার বাড়ী রাজসাহীতে?"

"হাঁ।"

"আপনি প্রিলিমিনারী ল' এগ্‌জামিন দিতে এখানে এসেছেন?"

"হাঁ।"

"আপনার পিতার নাম অচিন্ত্যনাথ চৌধুরী?"

"হাঁ।"

"আপনি বিবাহ করেচেন াইস্কিংড়ের ভুবন সান্যালের মেয়েকে?"

কুমুদের মুখ ক্রমেই শুকাইয়া আসিতেছিল। তাহার সম্বন্ধে এত সংবাদ এ পুলিশের লোক রাখিতে গেল কেন? বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল। শেষ প্রশ্নের উত্তরে কোনমতে "হাঁ" বলিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। সতীশ পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। বিস্ময়ে ভয়ে আর-সকলের চৈতন্য-লোপের উপক্রম হইয়াছিল। জিতেন শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুমুদকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। এই শান্ত ভালমানুষ ছোকরাটির মধ্যে এতখানি রহস্য লুকানো ছিল! আশ্চর্য্য!

আগন্তুক কহিলেন, "আপনাকে তবে সব কথা খুলেই বলি। আমি পুলিশের লোক, অর্থাৎ সি, আই, ডির ইনস্পেক্টর। গবেশগঞ্জের ডাকাতি মামলার সঙ্গে আপনার নামটা পাওয়া গেছে। আমরা তাই আপনাকে খুঁজছি—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কুমুদের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল—জড়িত স্বরে সে কহিল, "কিন্তু গবেশগঞ্জ কোথায়, তা আমি জানিনে মশায়।"

আগন্তুক হাসিয়া কহিলেন, "আগে শুনুন সব, তারপর বুঝে জবাব দেবেন। বিস্তর খোঁজের পর শেষ খবর পাওয়া গেল, আপনি এখানে আছেন। তাই বড় সাহেবের হুকুমে এখানে এসেছি—আপনাকে এখন আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"আপাতত বড় সাহেবের কাছে।"

"তার পর?"

"তার পর কি, সে বড় সাহেবই জানেন। তিনি যা হুকুম করবেন, তাই হবে।"

মেস-শুদ্ধ সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। সকাল বেলায় এ কি বিভ্রাট! জিতেন দাস আইন-কানুন জানে, ব্যবসায়ে উকিল—সে রাগিয়া গেল সতীশের উপর। দেখ দেখি, কোথা হইতে এক বন্ধুকে আনিয়া বাসায় তুলিল, এক পোলিটিকাল কেশের আসামী! এখন তাহার সঙ্গে এই পোলিটিকাল কেশে পড়িয়া সকলকেই সাত ঘাটের জল খাইয়া ফিরিতে হইবে। ফিরিতে পাইবে, তাহারই বা ঠিক কি! কে জানে, কোথা হইতে কোন্ আসামী কি এক মিথ্যা জালে জড়াইয়া দিবে! সে সন্তর্পণে ঘর হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। আগন্তুক তাহা বুঝিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিলেন,

"আপনারা কেউ সরে যাবেন না। তাহলে হয়ত আমায় অভদ্রতার অপরাধে অপরাধী হতে হবে।"

জিতেন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আজ্ঞে না, আমি যাইনি কোথাও—একটা সিগারেট খুঁজছিলুম।"

"সিগারেট! তা এই নিন্ না, আমিই দিচ্ছি।" আগন্তুক রৌপ্য-নির্ম্মিত সুদৃশ্য কেশ হইতে সিগারেট বাহির করিয়া জিতেনের হাতে দিয়া কহিলেন, "দেশলাই চাই?"

"না, দেশলাই আছে।" বিজয়-গর্ব্বে জিতেনের মুখ সস্মিত হইয়া উঠিল। এত লোক থাকিতে পুলিশ তাহাকেই সিগারেট দিয়া খাতির করিয়াছে! সে উকিল কি না!

কিন্তু এ গর্ব্ব অধিকক্ষণ টিঁকিল না। ইনস্পেক্টর বাবুটি সকলের সম্মুখেই কেশ ধরিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "আপনারা কেউ ইচ্ছে করেন?" কুমুদকেও এ প্রশ্ন করা হইল।

সতীশ নিষ্ফল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ইনস্পেক্টরের পানে চাহিল। ভাবিল, লোকটা পাকা পুলিশ! মুখে কি চমৎকার ভদ্রতাই দেখাইতে পারে! আসিয়াছে ত এক নিরপরাধ যুবাকে গ্রেফ্‌তার করিতে, তাহাকে আবার সিগারেট দেওয়াটুকু আছে! ইহাকেই না বলে, মিছরির ছুরি!

সকলেই ধন্যবাদের সহিত সিগারেট উপহার প্রত্যাখ্যান করিলে ইনস্পেক্টর বাবু কহিলেন, "এখন আমি কুমুদবাবুর বাক্স তোরঙ্গ সার্চ্চ করতে চাই। আপনাদের মধ্যে দুজনকে সে সার্চ্চে সাক্ষী থাকতে হবে। আপনি রাজী আছেন?" বলিয়া তিনি সতীশের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সতীশ বলিলেন, "মাপ করবেন।"

"আপনারা?"

কেহই সম্মত হইল না। ইনস্পেক্টর বাবু হাসিয়া কহিলেন, "দেখুন, এতে কোন গোল নেই! আর আপনারা রাজী না হলে আমায় অগত্যা বাইরে থেকে লোক আনতে হবে। আপনারা এই সব সার্চ্চে সাক্ষী হতে চান্ না, কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদের বাইরে থেকে লোক আনতে হয়—আর আসামীর উকিল এই নিয়ে মহা-আস্ফালনে এই point-এ আমাদের জেরা করেন! অথচ দেখুন, সাধ করে কি আমাদের বাইরের লোক ধরতে যেতে হয়!"

জিতেন খুব মুরুব্বির ভঙ্গীতে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সকলে অবাক হইয়া গেল। এই বিপদেও উহার মুখে হাসি আসে! আশ্চর্য্য! জিতেন কহিল, "এতে আর দোষ কি! আচ্ছা, আমি রাজী আছি। নিন্ মশায়, করুন সার্চ্চ। তোমরা আর-একজন কেউ এসো না হে! সতীশ, তুমিই এসো—আমি বলছি, এতে কোন ভয় নেই। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো।"

ইনস্পেক্টর বাবুর উপর যত-কিছু আক্রোশ ছিল, সে সমস্ত জিতেনেব উপর বর্ষণ করিয়া তীব্র স্বরে সতীশ কহিল, "সাক্ষী দিয়ে পয়সা-রোজগারের মতলব যার থাকে, স্বচ্ছন্দে সে গিয়ে সার্চ্চ লিষ্টে সই করুক্। আমার অত পয়সার খাঁকতি হয় নি!"

ইনস্পেক্টর বাবু কহিলেন, "নিন, তাহলে আপনিই একজন সাক্ষী হোন, আর

একজনকে আমার জমাদার বাইরে থেকে ডেকে আনুক, না হয়!"

জমাদার লোক ডাকিতে গেলে ইনস্পেক্টর বাবু একখানা ছোট পকেট বুক বাহির করিয়া মেশে কে-কে আছে, কিজ্ঞাসা করিয়া সকলের নাম তাহাতে লিখিয়া লইলেন। লোক আসিলে কুমুদের ট্রাঙ্ক খোলা হইল। ভিতরে ছিল, কয়েকখানা কাপড়, জামা, উড়ানি, এসেন্সের শিশি, ফুলেল তেলের বোতল, আর্শি, চিরুণি, Ancient Law, Jurisprudence, Roman Law প্রভৃতি কয়খানা আইনের কেতাব, রবিবাবুর গানের বহি একখানা ও একতাড়া চিঠি। ইনস্পেক্টর বাবু চিঠির তাড়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কুমুদ সজল নেত্রে কহিল, "ওগুলো মশায়, প্রাইভেট্—আমার স্ত্রীর চিঠি!"

ইনস্পেক্টর কহিলেন, "সবগুলোই?"

"আজ্ঞে হাঁা।"

"কখানা আছে?"

"খান পঞ্চাশেক হবে।"

"পঞ্চাশখানাই স্ত্রীর চিঠি!" ইনস্পেক্টর বাবুর ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি ফুটিল। হাসিয়া তিনি কহিলেন, "আপনার বিবাহ হয়েছে কদ্দিন?"

এ প্রশ্নে কুমুদের মনখানা ঝড়ের ধাক্কায় জীর্ণ গৃহের মতই একেবারে ভূমে লুটাইয়া পড়িল। এ প্রশ্নে চকিতে তাহার নীহারের মুখ মনে পড়িল। আহা, অভাগিনী বালিকা! বড় আশা করিয়া সে বসিয়া আছে—কবে কুমুদকে দেখিবে! এ দেখা কবে হইবে? সারা জীবনে আর হইবে কি! কে জানে, কোথা হইতে কি প্রমাণ আসিয়া নয়কে হয় করিয়া দিবে! দুইজনের মধ্যে দারুণ ব্যবধান ঘটাইয়া তুলিবে! হয় ত, এ জীবনে মোটেই আর দেখা হইবে না! তাই যদি কথাটা শুনিলে ইঁহার মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগে, ইহাই ভাবিয়া কুমুদ কহিল, "পাঁচ মাস।"

"পাঁচ মাসে পঞ্চাশখানা চিঠি! বলেন কি! আপনি ত তাহলে ভারী ভাগ্যবান দেখচি!" ইনস্পেক্টরের বিদ্রূপে সকলে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে জ্বালা বাহিরে ফুটাইবার উপায় নাই—দায়ে পড়িয়া গায়েই মারিতে হইল। বইগুলা তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়া ইনস্পেক্টর বাবু 'গান' বহিখানি ও চিঠির তাড়াটি সঙ্গে লইলেন, কহিলেন, "এই দুটো শুধু বড় সাহেবের কাছে দাখিল করব। বাকী এ সব ট্রাঙ্কেই থাকুক।" বলিয়া সমস্ত দ্রব্য যথাস্থানে রাখিয়া ট্রাঙ্কে চাবি দিয়া চাবিটা তিনি কুমুদকে ফিরাইয়া দিলেন, ও সার্চ্চ-লিষ্টে সাক্ষীর সহি লইয়া কুমুদকে বলিলেন, "এখন কুমুদবাবু, আপনাকে সাফ কথা বলছি। আপনাকে নিয়ে যেতে হবে, বড় সাহেবের হুকুম, সুতরাং আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করলুম। আপনি ভদ্রলোক, আপনার মর্য্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ হয়, তেমন কিছু করবার আমার ইচ্ছা নেই। আমি পুলিশ হলেও মানুষ। আপনি নিজে থেকে আসতে রাজী হন ত আসুন,—বাইরে সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী হাজির, কেউ আপনার গায়ে হাতও দেবে না, আপনি গাড়ীতে এসে বসুন। আর যদি না আসেন ত আমায় পাকাপাকি রকমেই গ্রেফ্‌তার করতে হবে। প্রয়োজন

হলে হাতে হাতকড়ি লাগাবারও হুকুম আছে।”

কুমুদ কহিল, “চলুন, আমি যাচ্ছি।”

ইনস্পেক্টর বাবু সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আপনাদের বোধ হয় এতে কোন আপত্তি নেই?”

উকিল জিতেন কহিল, “আপত্তি করে ৩৫৩ ধারায় পড়ব শেষে!”

ইনস্পেক্টর কহিলেন, “আপনি ভুল করছেন—৩৫৩ ধারা হবে আমায় প্রহার দিলে। আর কাজে বাধা দিলে হয়, ১৮৬ ধারা। তাহলে আসি মশায়, নমস্কার! হয়ত আবার দেখা হতে পারে—আপনাদের নাম-গুলো নিয়েছি ত? হাঁ, ঠিক আছে! আপনিই সতীশবাবু না? মেডিকেল কলেজে পড়েন —কুমুদবাবুর বাল্যবন্ধু?”

সতীশ কহিল, “হাঁ, যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?”

“মাপ করবেন—এখন সঙ্গে নিতে পারছি না। তবে হুকুম হলে আপনি পরে এঁর জন্য জামিন দাঁড়িয়ে এঁকে খালাস করে আনতে পারেন।”

যাইবার সময় কুমুদ ম্লান মুখে সকলের পানে চাহিল—সকলের মুখেই বিষাদের করুণ ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহা দেখিয়া কুমুদের বুকটা হু-হু করিয়া উঠিল। মেশ ছাড়িয়া কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী হইতে চলিয়াছে সে! কোনমতে সকলকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, “আপনারা আমার খবরটা নেবেন, মশায়। আমি কিছুই জানি না। সতীশ, আমায় বাঁচাবার ভার তোমার উপর। ভগবান জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নই। গবেশগঞ্জ কোথায়, তাই আমি জানি না।”

বলির ছাগশিশুর ন্যায়ই কাঁপিতে কাঁপিতে কুমুদ ইনস্পেক্টরের সহিত বাহির হইয়া গেল।

৪

তখন মেসের ঘরে যুক্তি-তর্কের প্রবল একটা আন্দোলন ছুটিল। যোগেশ কহিল, “এ কি ভোজবাজী! ভদ্রলোক কোথায় এগ্‌জামিন দিয়ে দেশে ফিরবেন, না, কি এ!”

সতীশ কহিল, “আমি কিন্তু বুক ঠুকে বলতে পারি, কুমুদের কোন দোষ নেই। ও-রকম নিরীহ ভালমানুষ আমি আর দুটি দেখি নি। ও করবে ডাকাতি!”

তিনকড়ি কহিল, “নিশ্চয়ই এ কোন শত্রুর কাজ।”

মোহিত কহিল, “জিতেনবাবু, আচ্ছা, এ যে ধরে নিয়ে গেল, এ কোন্ আইনের কোন্ ধারায়?”

জিতেন বাহিরের পানে চাহিয়াছিল; আইন-ঘটিত প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া অন্যমনস্ক-ভাবে কহিল, “মানে গিয়ে একটা ধারা আছে বটে! ঐ যে যেটাতে বলছে, পোলিটিক্যাল কেশ্-মাত্রেই অর্থাৎ পোলিটি-ক্যাল ব্যাপার আর কি!”

যোগেশ কহিল, “কিছুই বুঝতে পারলুম না। যাক্, মোদ্দা ওকে যে নিয়ে গেল, কৈ ওয়ারেণ্ট দেখালে না ত! ওয়ারেণ্ট না হলে একজনকে এভাবে কখনো গ্রেফ্‌তার করতে পারে?”

কথাটা সকলেরই মনে বিদ্যুতের মত চকিতে খেলিয়া গেল। তিনকড়ি কহিল,

"তাই ত, কি বল হে জিতেন, ওয়ারেণ্ট না থাকলে ধরতে পারে না,—সত্যিই ত! ও লোকটা ওয়ারেণ্ট দেখালে না, কিছু না, থামকা নিয়ে গেল! এ ত তাহলে illegal arrest."

জিতেনের তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল! তাইত, ইহারা ঠিকই ধরিয়াছে ত! এটুকু তাহার মাথাতেই আসে নাই! আসিলে, আহা,—

যোগেশ কহিল, "ওয়ারেণ্টটা কেউ দেখতেও চাইলে না! কি হে জিতেন, তুমি না একজন উকিল এখানে ছিলে! তোমার এ ভুল হল কি করে?"

জিতেন দেখিল, এটুকুকে ভুল বলিয়া মানিলে তাহার আইন-জ্ঞান সম্বন্ধে ইহাদের মনে একটা বিশ্রী ধারণা জন্মিবে! অথচ ইনস্পেক্টর যখন ওয়ায়েণ্ট দেখায় নাই, তখন বিনা-ওয়ারেণ্টে ধরিবার নিশ্চয়ই তাহার ক্ষমতা আছে! সে ত আর বে-আইনী কাজ করিয়া চাকরি খোয়াইতে পারে না! তাছাড়া ঠিক—এ যে পোলিটিক্যাল, ব্যাপার! সে কহিল, "আহা, বুঝছ না—এ হল পোলিটিক্যাল কেশ—এতে ওয়ারেণ্ট দরকার করে না!"

নিয়োগী কহিল, "নাঃ, ওয়ারেণ্ট দরকার করে না! This is common sense, sir. পোলিটিক্যাল কেশেও ওয়ারেণ্ট চাই! না হলে যে-সে এসে অমনি একজনকে ধরে নিয়ে চলে যাবে! ইংরেজের আইনের মুল্লুকে এ কখনো হতেই পারে না!"

সতীশ কহিল, "আমরা বেকুব বনে দিব্যি বসে রইলুম ত! ওয়ারেণ্টখানা দেখতেও চাইলুম না!"

নিয়োগী কহিল, "এ বিপদে বেকুব বনা কিছু ত আর আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু জিতেনটা ছিল কি করতে! ও না পুলিশকোর্টের উকিল!"

উকিলের মুখ তখন এতটুকু হইয়া গিয়াছিল—ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের পানে একবার তাকাইয়া সে মাথা নামাইল। মুখে তাহার কোন কথা ফুটিল না।

তিনকড়ি কহিল, "তারপর গবেশগঞ্জ! এমন নামও ত কখনো শুনিনি। তুমি শুনেছ, যোগেশ? তুমি ত খবরের কাগজের পোকা, এ ডাকাতির কথা নিশ্চয়ই কখনও পড়ে থাকবে!"

মোহিত কহিল, "যাক, যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই। বাজে কথা রাখো এখন। ভদ্রলোক যখন আমাদের আশ্রয়ে এসেছিলেন, তখন আমাদের প্রাণ পণ চেষ্টা করা উচিত, যাতে উনি খালাস পান।"

যোগেশ কহিল, "তাহলে লালবাজারে যাওয়া যাক, চল। জিতেন, তুমি এক কাজ কর, তুমি তাহলে কুমুদবাবুর উকিল হয়ে দাঁড়াও।"

জিতেন কহিল, "দুশো বার আমার দাঁড়ানো উচিত, বিশেষ উনি যখন কিছুকাল-বাদে member of the same profession হতে চলেছেন। কিন্তু আমার এক মস্ত বিপদ হয়েছে। আজ শেয়ালদা কোর্টে আমার একটা খুব সিরিয়স্ কেশ আছে clear case—দালাল-টালাল নেই—আ টাকা ফীও দিয়ে গেছে। তারা আমার জন্যে ও দিকে হাঁ করে বসে থাকবে,— এ না হয়েছে মুস্কিল!"

নিয়োগী কহিল, "কুছ্‌ পরোয়া নেই! তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু পুলিশ কোর্টের কোন বড় উকিলের কাছে আমাদের নিয়ে চল। আমরা চাঁদা করে তাঁর ফী দেব—যত টাকা লাগে। তিনিই এ কেশে দাঁড়াবেন।"

জিতেন কহিল, "চল, এখনই যাচ্ছি। কি আর করা যাবে—আমিও নয় ধাঁ করে একবার শেয়ালদায় গিয়ে তাদের টাকা কটা ফিরিয়ে দিয়ে দোসরা উকিলের জোগাড় করতে বলে আসব'খন।"

নিয়োগী কহিল, "না, না, কোথাকার কে! তার জন্যে শুধু-শুধু তোমায় আট টাকা লোকসান করতে হবে না।"

সকলে চট্‌-পট্‌ উঠিয়া পড়িয়া উকিলের উদ্দেশ্যে বাহির হইল।

৫

কুমুদের গাড়ী বেনেটোলা ছাড়িয়া হ্যারিসন রোড পার হইয়া সার্কুলার রোড ধরিয়া বরাবর দক্ষিণ মুখে চলিল। গাড়ীতে বসিয়া সে বাহিরের পানে চাহিয়াছিল; সজল নেত্রে চারিধার ঝাপ্‌সা দেখিতেছিল। বুকের উপর কারা-কক্ষের ভীষণ অন্ধকার ভারী পাথরের মতই আঁটিয়া বসিয়াছিল। সে অন্ধকারের ভারে নিশ্বাস তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার সাগর ভীম গর্জ্জনে নাচিতেছিল। পথের এক ধারে ফুটপাথ। ফুটপাথের উপর রেলওয়ে লাইন—লাইনে মালগাড়ীতে ময়লা বোঝাই হইতেছে! কুমুদ ভাবিল, ঐ ময়লা-গাড়ীর গাড়োয়ানগুলাও কত সুখী! তাহাদের লঘু স্বচ্ছ মনের উপর কোনরূপ দুশ্চিন্তার পাথর ত কেহ চাপিয়া ধরে নাই! সে যদি কুমুদ না হইয়া ঐ ময়লা গাড়ীরই গাড়োয়ান হইত—আহা, তাহা হইলে কি স্বাধীন স্বচ্ছন্দ অব্যাহত গতিতে এখন সে চলিতে ফিরিতে পারিত। কিন্তু সে গাড়োয়ান নয়, সে কুমুদ—তাই সে বন্দী, পুলিশের হাতে বন্দী! সম্পূর্ণ এক অজানা অপরাধের কলঙ্কে তাহার সমস্ত জীবন কালিমাখা কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে! হায় নীহার, পুণ্যবতী সাধ্বী সতী, তোমার অমল পুণ্য-বিভায় কি এ কলঙ্কের কালি মুছিবে না—এ বিপদ হইতে মুক্তি-লাভ ঘটিবে না!

কুমুদের মনে ভাবনার আর অন্ত ছিল না! কিন্তু ভাবিয়া কি ফল! কঠোর সত্য নির্ম্মমভাবে তাহাকে পীড়ন করিতেছিল। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই, ওরে কিছুতেই মুক্তি নাই!

গাড়ী আসিয়া ক্রমে এক সুসজ্জিত গৃহের গাড়ী-বারান্দায় ঢুকিল। ফটক হইতে লাল কাঁকর-ফেলা পথ গাড়ী-বারান্দার মধ্য দিয়া বাঁকিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। দুইধারে বিচিত্র ক্রোটন ও ভার্বীনার ঝাড়। মাঝে মাঝে সূর্য্যমুখী, ক্যানা প্রভৃতি বিবিধ ফুলের গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। গাড়ী থামিলে ইনস্পেক্টর বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন, কুমুদকেও নামিতে বলিলেন; কুমুদ নামিলে তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া প্রশস্ত এক কক্ষে বসিতে বলিলেন। ঘরের মধ্যে পা দিতেই কুমুদের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—বুকের মধ্যে কে যেন অসংখ্য কামান দাগিল! ম্যাটিং-করা ঘর সোফা-কৌচে সজ্জিত—মাঝখানে শ্বেত পাথরের টেবিল।

দ্বারের মাথায় একটা বন্দুক। সজ্জার কেতা দস্তুরমত বিলাতী ধরণের।

ইনস্পেক্টর বাবু বলিলেন, "আপনি এই চেয়ারে বসুন। বড় সাহেব এখনই আসবেন।"

কুমুদ এবার কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিয়াই কহিল, "কিন্তু যথার্থ বলছি আমি, গবেশগঞ্জ কোথায়, তা আমি জানিও না—সেখানে কবে ডাকাতি হয়েছে, তাও বলতে পারি না। এগ্‌জামিনের জন্য আজ দু'মাস খবরের কাগজ অবধি উল্টে দেখিনি। আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি যথার্থ কোন দোষে দোষী নই।"

ইনস্পেক্টর বাবু নরম সুরেই বলিলেন, "সে কথা আমায় বলে কোন ফল নেই। আমি হুকুমের চাকর মাত্র। হুকুম তামিল করাই আমার কাজ। বড় সাহেবের হুকুমে আপনাকে এখানে এনেছি। আপনার সম্বন্ধে তাঁর ব্যবস্থাই আমায় মাথা পেতে নিতে হবে। আপনি তাঁকেই সব খুলে বলবেন। তিনি ছেড়ে দিতে বলেন, এখনই আপনাকে ছেড়ে দেব। কেন মিথ্যে ধরে রাখব? আমার কি লাভ এতে, বলুন না! ঐ যে বাঁ-ধারের দোরে সবুজ পর্দা দেখচেন, ঐটে হলগে বড় সাহেবের ঘর—তিনি এখনই আসবেন,তাঁকেই সব বলবেন। এখন একটু বসুন। এই ডান দিকে আমার অফিস—আমি এখন অফিসে চললুম, বিস্তর কাগজ-পত্র দেখে-শুনে ঠিক করবার আছে।"

ইনস্পেক্টর চলিয়া গেলে কুমুদ ভাবিল, পাষাণ, পাষাণ ইহারা! মিথ্যা ইহাদের কাছে হৃদয়-ব্যথা জানানো! পরের জন্য ইহারা ভাবিতেও জানে না—প্রাণে পাষাণ গাঁথিয়া কাগজ দেখিয়াই শুধু কাজ করিয়া যায়—মানুষ দেখিয়া কাজ করে না! তবে কি ফল, ইহাদের কাছে আবেদন-নিবেদনে!

তাহার শুধু বার বার মনে পড়িতেছিল, নীহারের কথা! এ নির্ম্মম আঘাত নীহারের প্রাণে ভয়ঙ্কর বাজিবে! আহা, বালিকার আধ-ফোটা হৃদয়-ফুলটি এ আঘাতে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে! কত আশায় সে লিখিয়াছিল, "এগজামিনের পরই আসা চাই।" হায়রে সরলা বালিকা,—তোমার সব আশা আজ নিয়তির এক নির্ম্মম ফুৎকারে ছিঁড়িয়া গেল! কুমুদের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর ভাবিতে পারিল না। চোখে বাণ ডাকিয়াছিল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। ভাবনার যে এদিকে কূল নাই, কিনারা নাই! আর কত সে ভাবিবে!

এমন সময় স্বপ্নে যেন এক বীণার সুর বাজিয়া উঠিল, "কুমুদ—" কুমুদের মনে হইল, না, সে মাথা তুলিবে না—চোখ খুলিবে না! এ সত্যের নির্ম্মমতার মাঝে বাজুক, স্বপ্নের বীণা আবার বাজুক! এ বড় আরামের সুর—বড় মধুর!

আবার সুর বাজিল, "কুমুদ—"

কুমুদ ভাবিল, আবার! তবে ত এ স্বপ্ন নয়! সে স্পষ্ট শুনিয়াছে! সে মাথা তুলিল। মাথা তুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর ঝিম-ঝিম করিয়া উঠিল! সে কি পাগল, না, কোন নেশা করিয়াছে?

কুমুদ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, তাহার সম্মুখে অদূরে দাঁড়াইয়া এক কিশোরী! রূপে

বিদ্যুৎ খেলিতেছে—মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি, চোখে রাজ্যের করুণা যেন মাখানো! সে অবাক হইয়া গেল। সে যে বড় সাহেবের রুদ্র মূর্ত্তি রক্ত আঁখিরই কল্পনা করিতেছিল—তাহার পরিবর্ত্তে এ কি! বাঙালীর ঘরের সুন্দরী কিশোরী! কাল রাত্রে থিয়েটারে সে এক রোমাঞ্চকারী নাটকের অভিনয়ে দেখিয়াছিল—শেষ দৃশ্যে নায়ককে বধ্যভূমিতে আনা হইয়াছে; ঘাতকের খড়্গ নায়কের মাথার উপর উদ্যত—রাজা স্বয়ং প্রশ্ন করিলেন, "বন্দী, এখনো বলিতে চাও, তুমি রাজকন্যাকে ভালবাস?" নায়ক অচপল স্বরে উত্তর দিল, "বাসি মহারাজ! এই মরণের তীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, রাজকন্যাকে প্রাণ দিয়াও ভালবাসি।" অমনি নেপথ্যে বংশী-ধ্বনি হইল এবং চকিতে ঘড়-ঘড় করিয়া বধ্যভূমির 'সিন্' সরিয়া গিয়া তাহার স্থলে রাজ-কন্যার প্রমোদ-কুঞ্জ দেখা দিল। সেখানে বেদীর উপর অলস শয়ানে শায়িতা রূপসী রাজকন্যা—আর চারিধারে ফুল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অসংখ্য সজ্জিতা সখী! ঘাতকের হাতের অস্ত্র হাতেই থামিয়া রহিল এবং সখীর দল সমস্বরে মিলনের গান ধরিয়া দিল। এ ব্যাপারে তাহার কাল রাত্রের থিয়েটারের সেই পট-পরিবর্ত্তনের দৃশ্যই মনে পড়িতেছিল। কোথায় গারদ-ঘরের ভীষণ অন্ধকার—না, সজ্জিত কক্ষে বঙ্গসুন্দরীর ব্রীড়াময় মুখচ্ছবি!

সে ভাবিল, এ আর কিছুই নয়—পুলিশের চাল! রূপের ফাঁদ পাতিয়া নির্দ্দোষ নিরপরাধ বন্দীকে ভাল করিয়া জড়াইয়া ফেলিবার মতলব এ! ইংরাজী উপন্যাসে নারী-গোয়েন্দার কথা সে বিস্তর পড়িয়াছে, এখানেও যে বাঙালীর মেয়ে সি-আই-ডিতে ঢুকিবে, সে আর এমন-কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিশোরী নিশ্চয় এই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে! নহিলে অপরিচিত যুবার সম্মুখে বাঙালীর মেয়ে- বিশেষ এমন সুন্দরী কিশোরী—কোথায় আর এমন অসঙ্কোচে বাহির হইয়া থাকে!

কিশোরী কহিল, "আমায় তুমি চেনো না, তার মানে তোমার বিয়েয় আমি যেতে পারিনি। খোকা তখন সবে দেড় মাসের। আমি হচ্ছি নীহারের দিদি, বুঝলে—আমার নাম সুবালা।"

সুবালা! শ্যালিকা সুবালা! নাঃ—ইহাদের অসাধ্য কাজ নাই! কিন্তু নীহারের নামটা না হয় চিঠি হইতে জানিতে পারে,—সুবালা—শ্যালিকা সুবালার নাম কেমন করিয়া পুলিশে জানিল! চিঠিতে কৈ এ নামের এতটুকু উল্লেখও ত কোথাও নাই! তা ছাড়া সুবালাকে কুমুদ নিজে কখনও চক্ষে দেখে নাই, নীহারের কাছে নামটাই শুধু শুনিয়াছিল। তাহার বিবাহের সময় সুবালা আসিতে পারে নাই সত্য এবং সে শুনিয়াছে, ছেলে হইয়াছে বলিয়াই সে আসিতে পারে নাই। সে সংবাদও পুলিশ রাখিয়াছে? আশ্চর্য্য! সি-আই-ডি পুলিশ যাদু জানে!

কুমুদ কোন উত্তর না দিয়া নত শিরেই বসিয়া রহিল। সে ভাবিল, না, এ ফাঁদে পড়া হইবে না! ভারী হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে! কিশোরী কহিল, "তোমার এগজামিন কেমন হল?"

কুমুদের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক

মারিল। সে একবার কিশোরীর পানে চাহিল। কিশোরীর সহাস প্রফুল্ল মুখে দিব্য সরলতা—কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ নাই। সে ভাবিল, হায়, এমন রূপেও কপটতার কালি মাখাইতে পারে! আত্মীয়তার কি চমৎকার ভাণ এ! সে কহিল, "আমায় আপনারা মাপ করবেন —যথার্থ বলছি, আমি কিছু জানি না। গবেশগঞ্জর নামও কখনও আমি কানে শুনিনি।"

"গবেশগঞ্জ!" কিশোরী কহিল, "গবেশ গঞ্জ আবার কি!"

"সেই যে, আপনারা বলছেন, যেখানে ডাকাতি হয়েছে।"

"ডাকাতি!" কিশোরী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিল, "ডাকাতি আবার কি! আমায় তুমি চিনতে পারছ না—আমায় না হয় না দেখতে পার,—কিন্তু আমার নামও কি কখনও শোন নি? আমি যে তোমার শালী!"

কুমুদ কহিল, "কিন্তু আপনি থানায় এলেন কি করে?"

"থানা কোথায়! এটা ত থানা নয়। ওঁকে আর থানায় থাকতে হয় না। উনি যে এখন সি-আই-ডিতে বদলি হয়েছেন—এটা ওঁর বাসা।"

অকূলের মাঝে কুমুদ যেন একটু কূলের সন্ধান পাইতেছিল। তাহার ভায়রা-ভাইয়ের সম্বন্ধে সে শুনিয়াছিল, পুলিশে তিনি কাজ করেন। কিন্তু বেঙ্গল পুলিশ কি কলিকাতা পুলিশ তাহার কোন তত্ত্ব লয় নাই! তাই ত—এ কথাটা একবারও তাহার মনে পড়ে নাই যে! তবে কি ব্যাপারখানা আগাগোড়াই—

এমন সময় ইনস্পেক্টর বাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "বড় সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল আপনার? ইনিই আমার বড় সাহেব। আশ্চর্য্য হবেন না। এঁরই হুকুমে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। হুজুর, আসামীর ট্রাঙ্কে এই মাল পাওয়া গেছে—এই থেকেই এঁকে সনাক্ত করতে পারবেন যে ইনিই আসল কুমুদনাথ চৌধুরী, জাল নন্। আপনার ভগ্নী নীহার এঁরই হাতে প্রাণ-মন সমর্পণ করেছেন; চিঠিতেও আগাগোড়া তা কবুল করেছেন—এবং সে একখানা চিঠিতে নয়, অমন পঞ্চাশ-খানায়!" বলিয়া তিনি রবিবাবুর গানের বহিখানি ও নীহারের লেখা চিঠির তাড়া সুবালার হাতে তুলিয়া দিলেন।

সুবালা কহিল, "ডাকাতি-টাকাতি এ-সব কি?"

"ওঃ—এর মধ্যে একটু রহস্য আছে—" বলিয়া ইনস্পেক্টর সন্তোষকুমার সংক্ষেপে ব্যাপার বুঝাইয়া দিলে সুবালা কহিল, "পরশু খোকার ভাত। তোমার বাড়ীতে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তা সেখান থেকে কাল রাত্রে জবাব এসেছে, তুমি এগজামিন দিতে এখানে এসেছ—বেনেটোলায় তোমার কে বন্ধু আছেন, সতীশবাবু, তাঁরই মেশে উঠেছ! তাই এঁকে পাঠিয়েছিলুম, তোমায় আনবার জন্য। উনি যে এ-রকম ফন্দী খাটিয়ে নিয়ে আসবেন, তা কি করে জানব বল ভাই! ওঁর রসিকতাই অমনি মারাত্মক রকমের, আমি ত হাড়ে-নাড়ে জ্বল্‌ছি! তা যাক,

এখন কিছুদিন এখানে তোমায় থাকতে হবে —এগজামিন ত হয়ে গেছে! অসুবিধেও কিছু হবে না,—নীহারও কাল এখানে এসেছে। মা আর বাবা কাল আসবেন।"

কুমুদের একবার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? নীহার আসিয়াছে! কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার সে চারিধারে চাহিয়া দেখিল। সুবালা সরিয়া গিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে চুড়ি-বালা-পরা সুন্দর সুগোল একখানি ছোট হাত টানিয়া বাহির করিল, হাসিয়া কহিল, "এ হাত কার, চেনো?" বলিয়া তখনই আপাদ-মস্তক লজ্জায় জড়িতা এক বালিকাকে কুমুদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল। সন্তোষ কহিল, "শুধু হাত কেন, গোটা মানুষটাকে দেখেই না হয় সন্দেহ-ভঞ্জন কর। কি জানি, থানা-পুলিশ বলে মনে যখন একবার সন্দেহ হয়েছে, তখন রীতিমত সব দেখে-শুনে নেওয়া ভাল।"

কুমুদ অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাই ত এ যে ইন্দ্রজাল! সলজ্জে সে মুখ নামাইল। সন্তোষ বলিল, "আমি তাহলে তোমার বন্ধুদের চিঠি পাঠাচ্ছি হে— তাঁদের নামগুলি পকেট-জাত করেছি। তাঁরা ওদিকে ভাবনায় লালবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়—আর জমাদারকেও পাঠাই তোমার জিনিষপত্র আনতে! ওবেলায় নিজেও একবার যাব'খন—এবেলায় তাড়া আছে, ঘটে উঠবে না। যে-রকম ভয় দেখিয়ে এসেছি, তাতে নিজের গিয়েই মাপ চাওয়া উচিত!"

* * *

দশটা বাজে। মেশে সকলে স্নান সারিয়া উকিলবাবুকে লইয়া লালবাজারে যাইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় জমাদার আসিয়া সতীশের হাতে একটা প্যাকেট দিল। সতীশ জমাদারকে দেখিয়া ভয় পাইয়া ছিল,—আবার কি ব্যাপার! কম্পিত হস্তে সে প্যাকেট ছিঁড়িয়া ফেলিল—একখানা সাদা কাগজে কয় ছত্র লেখা—তাহাতে সন্তোষ পরিচয় দিয়া ব্যাপার বুঝাইয়া ক্ষমা চাহিয়াছে এবং মেশের বন্ধুদের প্রত্যেককে শনিবার রাত্রে আপনার বালিগঞ্জের গৃহে পুত্রের অন্ন-প্রাশনের ভোজে উপস্থিত থাকিয়া শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। সতীশ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "নেউগী, ওহে, এদিকে এসো, ধড়াচূড়ো খুলে ফেলো, এধারে দেখে যাও,—a pleasant comedy, after all."

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারতের সভ্যতা

খৃষ্টধর্ম্ম

ভারতের ধর্ম্মগুলির সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। য়ুরোপ, ভারতের মর্ম্ম-ভাবটিকে নবীকৃত করিতেও পারে নাই, ভারতের ধর্ম্মভক্তদিগকেও ছিনাইয়া আনিয়া স্বধর্ম্মভুক্ত করিতে পারে নাই। পঞ্চম শতাব্দী হইতে, নেস্টোরীয় খৃষ্টসম্প্রদায় ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছে। ভারতে উহাদের গির্জা

এখনো বর্ত্তমান আছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে পোর্টুগীরা কতকটা প্ররোচনা ও কতকটা বাহুবলের দ্বারা "ক্যাথলিক" ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে। ফরাসী ধর্ম্মপ্রচারকেরা খুব পুরাতন ও বহুসংখ্যক; পরিশেষে, সকল সম্প্রদায়েরই প্রটেষ্টাণ্টরা, গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছে। তথাপি ত্রিশকোটি ভারত-বাসীর মধ্যে, শুধু ২০ লক্ষ দেশীয় খৃষ্টান। তন্মধ্যে ১২ লক্ষ ক্যাথলিক, প্রায় ৬ লক্ষ প্রটেষ্টাণ্ট ও ২ লক্ষ "জ্যাকোবাইট্"।

এই নিষ্ফলতার অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথমতঃ ভারতের বর্ণভেদ। যে ব্যক্তি একাকী খৃষ্টান হয়, সে জাত হইতে বহিষ্কৃত হয়; যে পরিবার হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে পরিবার স্বকীয় বংশমর্য্যাদা ও সামাজিক বিশেষাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। যে-সকল নীচবর্ণের লোক হিন্দুসমাজে অবজ্ঞার পাত্র, বিজেতাদিগের ধর্ম্মগ্রহণ করা তাহারাই স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করে; দুর্ভিক্ষের সময়, দুর্দ্দশায় পড়িয়া অনেকে খৃষ্টান হয়। করমণ্ডল-উপকূলে, কতকগুলা ঘৃণিত জাতি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং আপনাদের মধ্যে কতকগুলা জাত গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সাধারণত, খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকেরা বর্ণভেদ-প্রথার প্রতি বড়-একটা অনুকূল নহে।

দ্বিতীয় কারণ যাহা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের কতকটা প্রতিবন্ধক হইয়াছে—তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাহিতা। যে জাতি তেত্রিশ-কোটি দেবতার পূজা করে, তাহারা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক নিজ দেবালয়ে খৃষ্টকেও স্থান দিবে, কুমারী-মেরীকেও স্থান দিবে, "সেণ্ট"দিগকেও স্থান দিবে; এমন কি উহারা উহাদিগকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করিবে। উহারা এই কথাটা বুঝিতে পারে না যে, কোন নূতন দেবতার পূজা আরম্ভ করিলেই পুরাতন দেবতাদিগের পূজা বাদ দিতে হইবে।

শিক্ষিত হিন্দুরা এই একই মনোভাব প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে ভাণ্ডরকার এইরূপ বলেনঃ—"খৃষ্টান পাদ্রিদিগকে আমি এইরূপ উত্তর দিব। তাঁহারা এমন-একটা ধর্ম্ম আমাদিগকে দিতে চান যাহা তাঁহাদের মতে সর্ব্বাংশে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের একমাত্র প্রত্যাদেশ······কিন্তু না, খৃষ্টধর্ম্মই মানবজাতির একমাত্র ধর্ম্ম নহে; এই পৃথিবীতে, হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্লাম-ধর্ম্ম প্রভৃতি কত ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে! আমরা-কি বলিব, এই সমস্ত মায়া-বিভ্রম? এ শুধু সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিপক্ষগণের জল্পনা। কারণ, একমাত্র ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম,—একথা কোন্ ধর্ম্ম-বিশেষের বলিবার অধিকার আছে? প্রত্যেক ধর্ম্মেই সত্যের অংশ আছে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই ভ্রমের অংশ আছে; অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতেই আমরা এই ভ্রম আবিষ্কার করিতে পারি ও নিরাকৃত করিতে সমর্থ হই। সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত; কিন্তু সকল ধর্ম্মেই, দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ জগৎপিতার অনুপ্রাণিত সত্যের সহিত মিথ্যা মিশাইয়া দিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর তাঁহার

প্রেম মানুষের উপর অজস্র বর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু আমরা বলিয়া থাকি,—"প্রকৃত সত্য কি তাহা মানুষকে জানাইবার জন্য ঈশ্বর শতশত বৎসর হইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণে শুধু একটিমাত্র জাতি সেই সত্য জানিতে পারিয়াছে।" তাহা কখনই নহে, যদি ধর্ম্ম সত্য-সত্যই মানুষের একটা প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, তাহা হইলে গোড়া হইতেই তিনি মানুষের নিকট সেই ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন; মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বর এমন-করিয়া তাহা রোপণ করিয়া দিবেন যে সে নিজের ছায়ার মত সর্ব্বত্রই তাহা সঙ্গে-সঙ্গে লইয়া যাইবে। মানুষ যেখানেই যায়, ধর্ম্মও ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করে। মানবজাতির ন্যায় ধর্ম্মও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। মানুষ, ইতিহাসের কোন এক বিশেষ যুগে ভগবৎ-প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। এই প্রত্যাদেশ, মানব-বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছে, এই প্রত্যাদেশ কালক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং চিরকালই পরিপুষ্ট হইবে। ঈশ্বর সকল সময়েই আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আছেন। যতই আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে, ততই তিনি সত্যকে পূর্ণভাবে আমাদের নিকট প্রকাশ করিবেন।"

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বামী এই ভাবেই শিকাগোর কংগ্রেসে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

"ধর্ম্মের ঐক্য-সম্বন্ধে কত কথাই না বলা হইয়াছে! আমার নিজের মতটা এইখানে আমি ব্যাখ্যা করিব। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ, কোন ধর্ম্মের প্রচারের সফলতা হইতে, এবং অন্যান্য ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইতে, এই ঐক্যলাভের আশা করেন, তবে আমি তাঁহাকে বলিব;—"ভাই, তোমার এই আশা একটি অসম্ভব আশা।" একজন খৃষ্টান হিন্দু হইয়া যাক্, ইহাই কি আমার মনের বাসনা? ভগবান আমাকে এই দুর্বাসনা হইতে রক্ষা করুন। একটি বীজ মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়াছে; উহা বায়ু পৃথ্বী ও জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহা কি বায়ু পৃথ্বী বা জলে পরিণত হয়? না,—উহা একটি বৃক্ষে পরিণত হয়; এবং ঐ বৃক্ষ, বায়ু পৃথ্বী ও জলকে আত্মসাৎ করে, এবং শেষে উহাই ঐ বৃক্ষের উপাদান-বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও এইরূপ। খৃষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধ হইবে না; হিন্দু, বৌদ্ধও, খৃষ্টান হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিবে, অথচ নিজের বিশেষত্ব বজায় রাখিবে, উন্নতির নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইবে।"

আর একটি কারণ, পাদ্রিদিগের চেষ্টাকে আটকাইয়া রাখে। গভর্ণমেণ্ট উদাসীন; কোন স্কুলে, কোন কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না; যে-সকল দার্শনিক ও য়ুরোপীয় লেখককর্ত্তৃক শিক্ষিত হিন্দুরা অনুপ্রাণিত হয়, তাহারা সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করে। অতএব ভারতকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা একটা অসম্ভব কার্য্য। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রভাব, অবশ্য দেশপ্রচলিত ধর্ম্মগুলির মধ্যে সুনীতি প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবে; ইহারই মধ্যে ত ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব,

শিক্ষিত লোকদিগের বিশ্বাসকে পরিশোধিত করিয়াছে।

যুরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকেরা জাপানীদিগের ন্যায় প্রামাণিক-বাস্তব-বাদের (Positivism) দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, বরং উহারা এমন-এক দর্শন-তন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়াছে যাহা কখন-বা শেলিংএর বিশ্ব-ব্রহ্মবাদকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কখন-বা শপেন্‌হোয়েরের নৈরাশ্য-রঞ্জিত ভাব-বাদকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যদি কখন ভারত ও জাপান চিন্তাশীল লেখক উৎপাদন করিতে এবং বিশ্বমানবের নৈতিক উন্নতির উপর একটা বিশেষ ক্রিয়া প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই বলিতে পারা যায়, ঐ উভয় দেশের প্রবণতা বিপরীত-গামী হইবে; সুতরাং উহারা এক সঙ্গে সমান আধিপত্য সম্ভোগ করিবে না। কিন্তু নব্যভারতের এইরূপ ক্রিয়া প্রকটিত করিবার সামর্থ্য লাভ করা দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। নব্যভারতের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ধারণা, এক্ষণে সংশয়, বিস্ময় ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পদ্মের পাপড়ি

কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন

য়ুরোপের সাহিত্যে মহাকাব্য লিখিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। কোন কবি মহাকাব্য লিখেন না, অনেক পাঠক মহাকাব্য পড়েন না, অনেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া পড়েন, অনেকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পড়েন। অনেক সমালোচক দুঃখ করিতেছেন, এখন আর মহাকাব্য লিখা হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভ্যতার পাড়ে যতই চর পড়িবে, কবিত্বের পাড়ে ততই ভাঙ্গন ধরিবে! প্রমাণ কি? না, সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মহাকাব্য লেখা হইয়াছে, এখন আর মহাকাব্য লেখা হয় না। তাঁহাদের মতে, বোধ করি এমন সময় আসিবে, যখন কোন কাব্যই লেখা হইবে না।

এত তাড়াতাড়ি কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে হইবে না। তাহার নাড়ী বেশ চলিতেছে। কেন কি বৃত্তান্ত, সমস্ত ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করা উচিত।

সভ্যতার সমস্ত অঙ্গে যেরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, কবিতার অঙ্গেও যে সেই রূপ পরিবর্ত্তন হইবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কবিতা সভ্যতা-ছাড়া একটা আকাশ-কুসুম নহে। কবিতা নিতান্তই আসমানদার নহে। তাহার সমস্ত ঘর-বাড়িই আস্‌মানে নহে। তাহার জমিদারীও যথেষ্ট আছে।

সভ্যতার একটা লক্ষণ এই যে, দেশের সভ্য অবস্থায় একজন ব্যক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়

না। দেশ বলিলেই একজন বা দুইজন বোঝায় না, শাসনতন্ত্র বলিলে একজন বা দুইজন বোঝায় না। ব্যক্তি নামিয়া আসিতেছে ও মণ্ডলী বিস্তৃত হইতেছে। এখন লক্ষলোকের সমষ্টি একজন ব্যক্তি নহে। এখন শাসনতন্ত্র আলোচনা করিতে হইলে একটি রাজার খেয়াল, শিক্ষা ও মনোভাব আলোচনা করিলে চলিবে না; এখন অনেকটা দেখিতে হইবে, অনেককে দেখিতে হইবে। এখন যদি তুমি একটা যন্ত্রের একটা অংশমাত্র দেখিয়া বল যে, এ ত খুব অল্প কাজই করিতেছে, তাহা হইলে তুমি ভ্রমে পড়িবে। সে যন্ত্রের সকল অঙ্গই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

এখনকার সভ্যসমাজে যদি তুমি কিছু জানিতে চাও, একজনের দিকে চাহিও না। একটা দেখিলে চলিবে না; দশটাকে মনে মনে তেরিজ কষিয়া একটাতে পরিণত কর। কবিতাও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। সভ্য দেশের কবিতা এখন যদি তুমি আলোচনা করিতে চাও, তবে একটা কাব্য, একটি কবির দিকে চাহিও না। তাহা হইলে বলিবে "এ কি হইল? এ ত যথেষ্ট হইল না! এদেশে কি তবে এই কবিতা?" বিরক্ত হইয়া হয়ত প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ করিতে যাইবে। যদি মহাভারত, কি রামায়ণ, কি গ্রিসীয় একটা কোন মহাকাব্য নজরে পড়ে, তবে বলিবে "পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, প্রচুর হইয়াছে!" এক মহাভারত বা এক রামায়ণ পড়িলেই তুমি প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত ভাবটি পাইলে। কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে। এখন একখানা কবিতার বইকে আলাদা করিয়া পড়িলে পাঠের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। মনে কর ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে যত কবি আছে সকলকেই এক বলিয়া ধরিতে হইবে। একজন কবির কাব্যে এক প্রকারের মনোভাব অথবা এক রঙের বিভিন্ন মনোভাব সকল দেখিতে পাইলে, কিন্তু তাহা একটা সর্গ মাত্র; দ্বিতীয় কবির কাব্যে যখন আর এক শ্রেণীর মনোভাব বা আর এক রঙের বিভিন্ন মনোভাব সকল দেখিতে পাইলে, তখন তাহাকে দ্বিতীয় সর্গ মনে করিয়া লইতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কবিতা-পাঠকশ্রেণী আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে এক একটা মহাকাব্য রচিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন কবির বিভিন্ন সর্গগুলি মনের মধ্যে একত্রে বাঁধাইয়া রাখিতেছেন। ইংলণ্ডের সাহিত্যে একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত হইতেছে, অনেক দিন হইতে অনেক কবি তাহার একটু একটু করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। পাঠকেরাই এই মহাকাব্যের বেদব্যাস। তাঁহারা মনের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশ করিয়া তাহাকে একত্বে পরিণত করিতেছেন। যে কেহ ইহার একটি মাত্র অংশ দেখেন অথবা সকল অংশগুলিকে আলাদা করিয়া দেখেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পড়েন। তাঁহারা বলেন, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য অগ্রসর হইতেছে না। তাঁহারা কি করেন? না, একটি সাধারণ তন্ত্রের শাসন-প্রণালীর প্রতিনিধিগণের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখেন। দেখেন রাজার মত প্রভূত ক্ষমতা কাহারো হস্তে নাই, রাজার মত একাধিপত্য কেহ করিতে পায় না ও

তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, "দেশের রাজ্য-প্রণালী ক্রমশই অবনত হইয়া আসিতেছে। সভ্যতা বাড়িতেছে বটে কিন্তু রাজ্যতন্ত্রের উন্নতি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বরঞ্চ উল্টা!" কিন্তু সভ্যতা বাড়িতেছে বলিলেই বুঝা যায় যে, জ্ঞানও বাড়িতেছে কবিতাও বাড়িতেছে।

রাজ্যতন্ত্র যখন খুব জটিল ও বিস্তৃত হয়, তখন সাধারণ তন্ত্রের বিশেষ আবশ্যকতা বাড়ে। যত দিন ছোটখাট সোজাসুজি রকম থাকে, ততদিন সাধারণ তন্ত্রের ন্যায় অতবড় বিস্তৃত রাজ্য-প্রণালীর তেমন আবশ্যকতা থাকে না। এক রাজায় আর যখন চলে না, তখন সে রাজার দিন ফুরায়। য়ুরোপে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। কবিতার রাজ্যও অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভাব, জটিলতম অনুভাব হইতে অতি বিশদতম অনুভাব সকল কবিতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার কবিতায় এমন সকল ছায়া-শরীরী মৃদুস্পর্শ কল্পনা খেলায়, যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না ও সাধারণ লোকেরা ধরিতে ছুঁইতে পারে না; এমন সকল গূঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে যাহা সাধারণত সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে। প্রাচীন কালে কবিতায় কেবল নলিনী মালতী মল্লিকা যুঁথি জাতি প্রভৃতি কতকগুলি বাগানের ফুল ফুটিত, আর কোন ফুলকে যেন কেহ কবিতার উপযুক্ত বলিয়াই মনে করিত না, আজকাল কবিতায় অতি ক্ষুদ্র-কায়া, সাধারণতঃ চক্ষুর অগোচর, তৃণের মধ্যে প্রস্ফুটিত সামান্য বনফুলটি পর্য্যন্ত ফুটে। এক কথায়—যাহাকে লোকে, অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়াই হউক বা চক্ষুর দোষেই হউক, অতি সামান্য বলিয়া দেখে, বা একেবারে দেখেই না, এখনকার কবিতা তাহার অতি বৃহৎ গূঢ়ভাব খুলিয়া দেখায়। আবার যাহাকে অতি বৃহৎ, অতি অনায়ত্ত বলিয়া লোকে ছুঁইতে ভয় করে, এখনকার কবিতায় তাহাকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দেয়। অতএব এখনকার উপযোগী মহাকাব্য একজনে লিখিতে পারে না, একজনে লিখেও না।

এখন শ্রম-বিভাগের কাল। সভ্যতার প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রমবিভাগ। কবিতাতেও শ্রমবিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রমবিভাগের আবশ্যক হইয়াছে।

গীতিকাব্য এবং খণ্ডকাব্যের সহিত মহাকাব্যের প্রধান প্রভেদ কি? না, মহাকাব্যে নানা ঘটনায়, নানা চরিত্রের নানা বিভিন্ন অনুভাব সকল বর্ণিত হইয়াছে। গীতিকাব্য ও খণ্ডকাব্যে একটি কি দুইটি চরিত্র, একটি কি দুইটি ঘটনা, একটি কি দুইটি অনুভাব মাত্র ঘনীভূত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি আবার কবির নিজের ভাব নিজের কথা মাত্র। ইহা প্রায় দেখা যায়, যে সময় মহাকাব্যের সময়, সে সময় খণ্ডকাব্যের সময় নহে। বাল্মীকি ব্যাসের সময় কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন নাই। মহাকাব্যে যে সকল অনুভাব একত্রে বর্ণিত হয়, তাহাদের তত গাঢ়তা থাকিতেই পারে না। তাহা হইলে মহাকাব্য রচনার শিল্প-নৈপুণ্যের ব্যাঘাত করে। তাহাতে

সমস্ত অনুভাবের একটা সামঞ্জস্য রাখা আবশ্যক, নহিলে সহসা পরিমাণ-বহির্ভূত হইয়া পড়ে। এক প্রকার বিশেষ প্রণালীর স্থাপত্য আছে, যাহাতে থামগুলা মোটামোটা প্রকাণ্ড হয়, অলঙ্কার নাই, ছোট-ছোট কিছুই নাই, সাদাসিধে অথচ প্রকাণ্ড। মহাকাব্যে সেইরূপ। তাহাতে অনুভাবের সকল রকম খেলা থাকিতে পারে না। তাহাতে সহজে যে সকল সরল মোটা-মোটা অনুভাবগুলি আসিতে পারে, সেইগুলিই থাকে। আর সেই সহজ বড় বড় অনুভাব গুলিই প্রাচীন লোকদের ও প্রাচীন কবিদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহাদের অনুভাবগুলি সরল, পরিষ্কার, উপরে ভাসমান, তাহাদের দ্বিত্ব নাই, জটিলতা নাই। যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তি সকল সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত, ঘটনাবৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাও একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়। গীতিকাব্য মহাকাব্যের পূর্ব্বেও ছিল কি না সে কথা পরে আলোচিত হইবে। এক মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষেপে, অপরিস্ফুটভাবে অনেক গীতিকাব্য থাকে, অনেক কবি সেইগুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শকুন্তলা, উত্তর-রাম-চরিত প্রভৃতি তাহার উদাহরণ-স্থল। গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য যখন এতদূর বিস্তৃত হইয়া উঠে, যে, মহাকাব্যের অল্পায়তন স্থানে তাহারা ভাল স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন তাহারা পৃথক হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে কবিতার অশুভ আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই।

প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা হইতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ-উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল। এখনকার মতন তখন বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতিকাব্য সমূহের বীজ মাত্র সেই সৌর মহাকাব্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের মত বসন্ত বর্ষা ছিল না; কানন, পর্ব্বত, ছিল না; পশু পক্ষী পতঙ্গ ছিল না; সকলেরই মূল কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সৌরজগৎ পরিপূর্ণতর হইয়াছে। ইহার কোন অংশ সেই মহা সৌরচক্রের সমান নহে বলিয়া কেহ যেন না বলেন যে, জগৎ ক্রমশই অসম্পূর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। এখন সৌর জগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন, অথচ আকর্ষণ-সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্যতন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে; তাহা হইলে আর কাহারো সন্দেহ থাকিবে না যে, এখনকার সৌরজগৎ পরিস্ফুটতর উন্নততর। জগতেরও উন্নতি-পর্য্যায়ের মধ্যে শ্রম-বিভাগ আছে। সৌর-জগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পৃথক পৃথক হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোন মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দ্দূর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র-সম্মিলিত বাষ্পরাশিগত অবস্থার পূর্ব্বেও আর কোন অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতন্ত্র আদি ভূত সমূহের অস্ফুটভাবে পৃথক ভাবে বিশৃঙ্খল

সঞ্চরণ, পরস্পর সংঘর্ষ। যাহাকে ইংরাজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃঙ্খল পার্থক্য, পরে একত্র সম্মিলন, ও তাহার পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলা বিশৃঙ্খল পৃথক সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণীবদ্ধ করা, ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল পৃথক পৃথক ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পরে প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা। কবিতাতেও এ নিয়ম খাটে। প্রথমে ছাড়াছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীতসমূহ। সৌর জগতকে যে ভাবে দেখা আবশ্যক, উন্নততর সাহিত্যের কবিতাকেও সেইভাবে দেখা কর্ত্তব্য। নহিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।

সভ্যতার জোয়ারের মুখে সমস্ত সমাজ তীরের মত অগ্রসর হইতেছে; কেবল কবিতাই যে উজান বাহিয়া হঠিতেছে এমন কেহ না মনে করেন। এখন ব্যক্তির (individual) গুরুত্ব লোপ পাইতেছে বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে সংসার খাট হইয়া আসিতেছে। কারণ Tennyson বলিতেছেন—"The individual withers and the world is more and more."

একদল পণ্ডিত বলেন যে যতদিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। মনে কর কবিতা নিশাচর পক্ষী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কি করেন কেবল "makes the darkness visible". বিজ্ঞান প্রত্যহ অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছেন। অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস্ সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্য-প্রিয় কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল? এখন একটা রহস্যের আবরণ খুলিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিধাতা রহস্য দিয়া রহস্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা রহস্যের রক্তবীজকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার প্রত্যেক লক্ষ লক্ষ রক্তবিন্দুতে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ জন্মিতেছে। মহাদেব রহস্য-রাক্ষসকে এইরূপ বর দিয়া রাখিয়াছেন, সে তাঁহার বরে অমর।

যেমন, এমন ঘোরতর অজ্ঞ কেহ কেহ আছে, যে, নিজের অজ্ঞতার বিষয়েও অজ্ঞ, তেমনি প্রাচীন অজ্ঞানের সময় আমরা রহস্যকে রহস্য বলিয়াই জানিতাম না। অজ্ঞানতার একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সে রহস্যের একটা কল্পিত আকার, আয়তন, ইতিহাস, ঠিকুজি, কুষ্ঠি পর্য্যন্ত তৈরি করিয়া ফেলে, এবং তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ প্রাচীন কবিরা রহস্যের

পৌত্তলিকতাকে সেবা করিতেন। এখনকার কবিরা জ্ঞানের অস্ত্রে তাহার আকার আয়তন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে আরো রহস্য করিয়া তুলিতেছেন। এই নিমিত্ত প্রাচীন কালের অজ্ঞান অবস্থা কবিতার পক্ষে তেমন উপযোগী ছিল না। পৌরাণিক সৃষ্টিসমূহ দেখিলে আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। বহুকাল চলিয়া আসিয়া এখন তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহা কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ এখন তাহাতে আমাদের মনে নানা ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন, যে, এখনকার কোন কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া, যেরূপ তাঁহার খেয়ালে যায় সেইরূপ করিয়া, উষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে! কত লোকে সন্ধ্যা ও উষাকে কল্পনায় কত ভাবে, কত আকারে দেখে; আর এক সময় একরকম দেখে, আর এক সময়ে আর একরকমে দেখে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ করিলে তাহাদের সকলেরই কল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ তৈরি করিয়া রাখা হয়, উষা ও সন্ধ্যা যখনি তাহার মধ্যে গিয়া পড়ে তখনি একটা বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়।

যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতায় ততই শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে। .

রেলগাড়ি

সাহিত্যের রেলগাড়িতে ভাবগণ বা ভাবুকগণ আরোহী। যশের এঞ্জিনে কালের রাস্তায় চলিতেছে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে তত উচ্চ-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, কেহ ফার্ষ্ট ক্লাশে, কেহ সেকেণ্ড, কেহ থার্ড ক্লাসে। যে যত মূল্য দিয়াছে সে সেই পরিমাণে দূরে যাইতে পারিবে। কোন্ কালে বাল্মীকি ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট লইয়া গাড়ীতে চড়িয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার ষ্টেষণ ফুরায় নাই। আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর চালনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে অলঙ্কার দিয়া এইরূপ বলিতে পারি, যে, যেখানে কালের Terminus— যাহার উর্দ্ধে আর ষ্টেষন নাই, যে ষ্টেষনে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আসিয়া থামিবে, সেই ষ্টেষণে যাইবার টিকিট তিনি ক্রয় করিয়াছেন। গাড়ির গার্ড পাঠক-সম্প্রদায়, সমালোচক। ইঁহারা যে নিজেদের কাজ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া করেন না, তাই সকলেই জানেন। আরোহীদের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কত শত ভাব তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া গোলেমালে

প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়ে; সকলেই তাহাকে খাতির করে, সেলাম করে, অভ্যর্থনা করে। এমন দু-এক ষ্টেষণ গিয়া কেহ কেহ ধরা পড়ে, গার্ড্ তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করে, তাহার যথোপযুক্ত গাড়িতে উঠাইয়া দেয়; কেহ কেহ এমন কত ষ্টেষণ পার হইয়া যায় কেহ খোঁজ লয় না। ইহাতে কেবল মাত্র অমনোযোগিতা, কিন্তু গার্ডেরা ইহা অপেক্ষাও অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন; আলাপ থাকিলে, বন্ধুতা থাকিলে অনেক থার্ড্ ক্লাশকে ফার্ষ্ট ক্লাশে চড়াইয়া দেন। এমন ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, নালিশ করি কাহার কাছে? যিনি দোষী, তিনিই বিচারক। কত শত মুখচোরা, ভীরুস্বভাব, সঙ্কোচ-পরায়ণ বেচারী ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কিনিয়া, ভিড়ে, গোলেমালে, ঠেলাঠেলিতে শশব্যস্ত হইয়া থার্ডক্লাশে উঠিয়া পড়েন, কতশত ষ্টেষণ পার হইয়া সহসা গার্ডের নজরে পড়েন ও তাঁহারা উপযুক্ত শ্রেণীতে স্থান পান। এই সকল বেবন্দোবস্ত কোন কালে যে দূর হইবে, এমন ভরসা হয় না। সকল বিষয়েই দেখ, জগতে মূল্য দিয়া তাহার উপযুক্ত সামগ্রী খুব কম লোকেই পাইয়াছে; হয় দোকানদার তাহাকে ঠকাইয়াছে, নয়, সে দোকানদারকে ঠকাইয়াছে। এ সকল কেবল অসাবধানতার ফল। যত দিন রেলগাড়ি থাকিবে ততদিন শত শত ফার্ষ্টক্লাশের আরোহী থার্ডক্লাশে চড়িবে, ইহা নিবারণের উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটা আমার দুঃখ আছে। রেলোয়ের কর্ম্মচারীগণ বিনা টিকিটে সেকেণ্ডক্লাসে ভ্রমণ করিতে পারেন। তাঁহারা চিরদিন পরের টিকিট সমালোচনা করিয়াই কালযাপন করিয়াছেন, নিজে একখানি টিকিটও ক্রয় করেন নাই। ইহা কি সত্য নয়, যে, তিনি নিজে আপনাকে যত বড় ব্যক্তিই মনে করুন না, যতক্ষণে না তিনি ট্যাঁকের পয়সায় টিকিট কিনিবেন, ততক্ষণে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী অপেক্ষাও অল্প সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচকবর্গ যে, বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-ক্রেতাদিগের সমতুল্য সম্মান পাইয়া থাকেন, ও অহঙ্কারে এতখানি ফুঁপিয়া উঠেন যে, পাঁচটা আরোহীর জায়গা একা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়-বিরুদ্ধ। অনেকে বিনা টিকিটে অসঙ্কোচে গাড়ীতে চড়িয়া বসেন; ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করে, অবশ্য ইহার কাছে টিকিট আছে, কেহ সন্দেহও করে না, জিজ্ঞাসাও করে না। গার্ড দেখিল, তাঁহার পাকাদাড়ি, পাকাচুল; অনেক দিন হইতে ফার্ষ্টক্লাশে চড়িয়া আসিতেছেন; তাঁহাকে টিকিটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তিও হইল না, সাহসও হইল না কাহারো বা হীরার আংটি, ঘড়ির চেন, জরির তাজ দেখিল,—আর টিকিট দেখিল না। সাহিত্য-রেলোয়ে কোম্পানিতে এইরূপ বহুবিধ অনিয়ম ঘটিতেছে; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যতবড় লোকই হউন্ না কেন টিকিট নিতান্ত মনোযোগ সহকারে আলোচনা না করিয়া কাহাকেও ছাড়া উচিত নহে। কিন্তু অত পরিশ্রম করে কে? আবার, অধিক কড়াকড় করিলেও নিন্দা হয়।

যাঁহারা টিকিট কিনিয়া ট্রেণ মিস্ করেন, তাঁহাদের জন্য বড় মায়া করে। তাঁহারা ঠিক সময়ে অসেন নাই। সময়-মাফিক আসিয়াছিল বলিয়া কত থার্ড ক্লাসের লোক গাড়িতে উঠিল, এমন কি, কত লোক টিকিট না কিনিয়াও গাড়িতে উঠিল; অসময়ে আসিয়াছেন বলিয়া কত ফার্ষ্ট ক্লাসের লোক পড়িয়া রহিলেন। যাহা হউক্ তাঁহাদের জন্য ভবিষ্যৎ আছে, দ্বিতীয় ট্রেণ আসিলে তাঁহারা চড়িতে পাইবেন। কিন্তু ইঁহাদের অনেকে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যান, ষ্টেসনে অপেক্ষা করেন না। এইরূপে কত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের টিকিট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, পকেটে পয়সা আনিয়া টিকিট ক্রয় করেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যা গণনা কে করিবে? জেফ্রি যে ট্রেণে গার্ড ছিলেন, বাইরণ যে ট্রেণে আরোহী ছিলেন, সেই ট্রেণ ধরিবার জন্য ওয়ার্ডস্বার্থ ও যেলী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছে; তাঁহারা ট্রেণ মিস্ করিলেন; দ্বিতীয় ট্রেণ আসিলে পর তাঁহারা স্থান পাইলেন। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্প্রতি যে ট্রেণ চলিতেছে, অনেক বড় বড় ব্যক্তি সে ট্রেণটা মিস্ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেন নিরাশ হইতেছেন? দশ মিনিট সবুর করুন্, আর একখানা ট্রেণ এল ব'লে!

বঙ্গীয় সাহিত্য-ট্রেণে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাশে আরোহী নিতান্তই কম, অন্যান্য ক্লাশে অত্যন্ত ভিড়। এই নিমিত্ত গার্ডেরা বাছিয়া বাছিয়া দুই এক জনকে ফার্ষ্ট ক্লাশে বসিতে দেয়। তাহারা যদিও ফার্ষ্ট ক্লাশে বসিয়াছে, তথাপি গার্ড্ জানে যে তাহারা থার্ড ক্লাশের আরোহী। তাহাদের বলে, বাঙ্গলার মিল্‌টন, বাঙ্গলার বাইরণ্, বাঙ্গলার ফসেট্ ইত্যাদি, অথচ মনে মনে সকলেই জানে যে, তাহারা মিল্টন, বাইরণ, ফসেটের সমতুল্য নহে; অনুগ্রহ করিয়া এক ক্লাশে বসিতে দিয়াছে মাত্র। কিন্তু এমন করিবার আবশ্যক কি? ইহাতে বুদ্ধিমান লোকের নিতান্ত সঙ্কোচ জন্মিবার কথা। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই ত ভাল হয়!

বঙ্গীয় সাহিত্য-কোম্পানীতে খুচরা, টুকরা মাল-বোঝাই গোটাকতক মাল গাড়ি অর্থাৎ খবরের কাগজ, একরকম বেশ চলিতেছে। কিন্তু ভাব-আরোহীদিগের জন্য আরোহী-শকট অর্থাৎ মাসিক প্রবন্ধ-পত্র ভাল চলিতেছে না। গাড়ি চলিবার জন্য এঞ্জিনে শ্বেতবর্ণ খনিজ কয়লার আবশ্যক। কোথায় পাইবে বল! সাহিত্য-এঞ্জিন কেন, দেশে সহস্র এঞ্জিন বেকার পড়িয়া আছে, ভারতবর্ষের রাজা-গঞ্জে রাণী-গঞ্জে কয়লা যে নাই, এমন নহে, কিন্তু এত গভীর অকালে নিহিত যে, সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর এক, উদ্যমের কয়লা আছে, তাহাও বাঙ্গলা দেশে এমন বিরল ও বাঙ্গলার কয়লায় এত অধিক ধোঁয়া হয় ও এত কম আগুন জ্বলে যে, দুই পা গিয়াই গাড়ি চলে না। আমারও কলমের কয়লা ফুরাইয়া গিয়াছে, এইখানেই চলা বন্ধ করিয়াছে; ষ্টেশন যদিও দূরে আছে, কথা যদিও বাকী আছে, কিন্তু আর লিখিতে পারিতেছি না, কয়লা নিভিয়া গিয়াছে।

(১৯)

কোলেতের কথা মারি এমে জানতে পেরেছেন কিনা তাই শোনবার জন্যে মনটা ভারি ব্যস্ত হয়ে রইল। কিন্তু বিকেলের আগে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হল না। বিকেলে আমরা বেড়াতে বেরুলুম। তাঁকে মোটেই বিমর্ষ দেখলুম না, বরং ভাবটা খুসি-খুসি। সে-সময় তাঁকে এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল যে তেমন কখনো দেখিনি। তাঁর সমস্ত মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল ভিতর-থেকে কি-যেন তাঁকে ঠেলে-ঠেলে তুলচে। এমন-করে চলতে তাঁকে কখনো দেখিনি। তাঁর মাথার কাপড়টা ঘাড়ের কাছে একটু এলিয়ে পড়েছিল এবং গলার খানিকটা খুলে গিয়েছিল। আমাদের দিকে তাঁর নজর ছিল না। কোনো-কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি ছিল না—কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল তিনি কি যেন দেখচেন। থেকে-থেকে একটা হাসির রেখা তাঁর মুখে ফুটে উঠছিল—বোধ হচ্ছিল কে যেন তাঁর অন্তরের ভিতর থেকে তাঁর সঙ্গে কথা কহচে।

সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি গাছতলায় সেই পুরোনো বেঞ্চিটার উপরে গিয়ে বসলেন। পাদ্রিমশায়ও গাছের দিকে পিঠ করে তাঁর পাশে বসেছিলেন। দু জনেই গম্ভীর। আমি ভাবলুম, তাঁরা নিশ্চয় কোলেৎ সম্বন্ধে কথা কইচেন তাই একটু দূরে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। যেন কি-একটা কথার জবাব দিয়ে মারি এমে বল্লেন—"হাঁ, আমার তখন পনেরো বছর বয়স।" পাদ্রীমশায় বলে উঠলেন—"পনেরো বছর বয়সে তোমার জীবনের কোনো লক্ষ্যই ছিল না।" মারি এমে কি উত্তর করলেন শুনতে পেলুম না, পাদ্রীমশায় বলে যেতে লাগলেন—"কিম্বা সে-বয়সে সম্ভবযোগ্য সব-কিছুই জীবনের লক্ষ্য হতে পারত। একটি মিষ্টি কথা কিম্বা এতটুকু তাচ্ছিল্য সমস্ত জীবনটাকে ওলটপালট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।" খানিকক্ষণ তিনি আর কিছু বল্লেন না, তার পর নীচু গলায় বল্লেন—"দোষ তোমার বাপ-মায়ের।" মারি এমে বল্লেন—"আমার কোনো ক্ষোভ নেই!" তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা কেউ একটি কথাও বল্লেন না। সব চুপ-চাপ। মারি এমে একটা আঙুল তুলে যেন তাঁর মনে কথাগুলো দেগে দিতে চান এইভাবে পাদ্রীমশায়কে বলে উঠলেন—"সর্ব্বত্র—সকল সময়ে, সকল বাধা সত্ত্বেও।" পাদ্রীমহাশয় তাঁর হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠে পুনরাবৃত্তি কল্লেন—"সর্ব্বত্র—সকল সময়, সকল বাধা সত্ত্বেও!"

হঠাৎ বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল;—পাদ্রীমশায় গাছে ঢাকা সেই সরু পথ দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আমি অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের মুখে শোনা ঐ কথা নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করতে লাগলুম—কিন্তু

কোলেতের কাহিনীর সঙ্গে মোটেই তার খাপ খাওয়াতে পারলুম না।

(২০)

অলৌকিক ঘটনার দ্বারা মুক্তি পাবার কোনো আশা কোলেতের ছিল না, কিন্তু তবুও সে এখানে মন-টেঁকাতে পারছিল না। যখন দেখলে তার বয়সী সব মেয়েরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন সে যেন মরিয়া হয়ে উঠল। সে কোনো নিয়ম, কোনো শাসন মানতে চাইত না,—পূজা-অর্চ্চনার সময় সে উপস্থিত থাকত না, কেবল উপাসনার সময় হাজির হত—কারণ তখন তার গান গাইবার পালা। গানের দিকে তার ভারি ঝোঁক ছিল। আমি তার কাছে-কাছে থেকে তাকে সান্ত্বনা দিতুম। সে একদিন আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল যে বিয়ে মানেই ভালোবাসা।

(২১)

মারি এমের শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিল না, শেষে তিনি অসুখে পড়লেন। মাদ্‌লিন খুব যত্নের সঙ্গে তাঁর শুশ্রূষা করতে লাগল—কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের প্রতি তার ব্যবহার ভয়ানক কড়া হয়ে উঠল। বিশেষ করে আমাকেই সে বিষ-নজরে দেখত। আমার যখন সেলাই ভালো লাগত না, চুপ করে বসে থাকতুম, সে আমার কাছে এসে নাক-সিঁটকে বলত—"বিবি-সাহেবের সেলাই করতে যদি আপত্তি থাকে ত একটা ঝাঁটা নিয়ে ঘর-ঝাঁট দিতে পারেন।" একদিন রবিবার উপাসনার সময় হঠাৎ তার খেয়াল হল আমাকে দিয়ে সিঁড়ি সাফ করাবে। তখন শীতকাল। একটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস অলিগলির ভিতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমার গায়ে এসে লাগতে লাগল। শরীরটাকে গরম করবার জন্যে আমি খুব জোরে-জোরে ঝাঁটা ঘষতে লাগলুম। উপাসনার ঘর থেকে হার্ম্মোনিয়মের শব্দ আসছিল। থেকে থেকে মাদ্‌লিনের থরথরে গলার চীৎকার ও পাদ্রীসাহেবের ঘড়বড়ে আওয়াজ পাচ্ছিলুম। উপাসনার কোথায় কখন কি হচ্ছে গান শুনে-শুনে আমি সব ধরতে পারছিলুম। হঠাৎ কোলেতের গলা সবাইকে ছাড়িয়ে উঠল। সে গলার যেমন জোর তেমনি তা নিখুঁত। সে সুর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—হার্ম্মোনিয়মের শব্দ কোথায় তলিয়ে গেল—সমস্ত শব্দকেই ছাপিয়ে উঠল। তার পর মনে হল যেন সেই সুর বাড়ির উপর দিয়ে, সারি সারি গাছের মাথা দিয়ে, গির্জ্জের চূড়ো ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। আমার সমস্ত শরীর ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। তার পর সেই সুর যখন আবার পৃথিবীর উপর নেমে এল, কাঁপতে কাঁপতে গির্জ্জের মধ্যে প্রবেশ করলে এবং আবার হার্ম্মোনিয়মের সুরের মধ্যে গিয়ে মিশিয়ে গেল, আমি কেঁদে ফেললুম—ছেলেমানুষে যেমন করে কাঁদে সে তেমনি কান্না! তার পর মাদ্‌লিনের সেই সরু থন্‌থনে গলার সুর আর-সবাইয়ের সুরকে ফুঁড়ে আসতে লাগল। আমি খুব জোরে-জোরে ঘস্‌ঘস্‌ শব্দে ঝাঁটা ঘসতে লাগলুম—যেন আমার সেই ঝাঁটা দিয়ে ঐ কর্কশ সুরটাকে আঁচড়ে আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করে দেব।

(২২)

সে দিন মারি এমে আমাকে তাঁর

কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দুমাস তিনি বিছানায় পড়ে; সেই সবেমাত্র একটু ভালো হয়েছেন। দেখলুম, তাঁর চোখের আভা একেবারেই নেই। তাই দেখে আমার মনে হল ঠিক যেন একটা রামধনু আকাশের গায়ে মিলিয়ে এসেচে। কোথায় কি হচ্ছে তারই গল্প আমার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি শুনতে লাগলেন—এবং আমার কথার মধ্যে মধ্যে হাসবার চেষ্টা করলেন। আমি দেখলুম সে হাসিতে মুখের একটামাত্র দিক হাসচে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অসুখের সময় তাঁকে আমি চীৎকার করতে শুনেছি কি না। আমি বল্লুম—"ওঃ! শুনেছি বই কি।" তিনি মাঝরাত্রে এমন চেঁচিয়েছিলেন যে আমাদের ঘরসুদ্ধ সকলে জেগে উঠল। মাদ্‌লিন ছুটোছুটি করতে লাগল এবং তার জল-ছিটকানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। অমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, মারি এমের হয়েছে কি? সে ছুটোছুটি করে আমাদের পাশ দিয়ে যাবার মুখে বলে গেল—"বাত হয়েছে।" আমার মনে পড়ল বন্ জিস্তিনকে একবার বাতে ধরেছিল। সে কিন্তু এমন বিদ্‌কুটে চীৎকার করেনি। আমি ভাবতে লাগলুম মারি এমের পা বন্ জিস্তিনের মতো ফুলে তিন- ডবল হয়ে উঠল কি না। ক্রমেই তাঁর সেই চীৎকার ভয়ানক হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ একবার এমন হল যে মনে হল বুঝি সে চেঁচানি বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। তারপর দেখি তিনি গোঁ-গোঁ করে কাতরাতে লাগলেন—ব্যস্ আর কিছু নয়। খানিকক্ষণ পরে মাদ্‌লিন এসে রেনোর কানে-কানে কি বল্লে—রেনো কাপড় পরে নীচে নেমে গেল। তারপর পাদ্রীকে সঙ্গে করে ফিরে এল। পাদ্রীমহাশয় ঝড়ের মতো মারি এমের ঘরে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে মাদ্‌লিন দরজা বন্ধ করে দিলে। তিনি বেশীক্ষণ থাকলেন না। কিন্তু দেখলুম যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিলেন তেমনি আস্তে আস্তে ফিরে গেলেন। কাঁধ দুটোর মধ্যে মাথাটাকে খুব-করে ঝুঁকিয়ে দিয়ে, ডান-হাতে গায়ের জোব্বাটা বাঁ-হাতের উপর দিয়ে ধরে' তিনি যেতে লাগলেন—যেন কি-একটা বহুমূল্য জিনিষ বহে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি মনে-মনে ভাবলুম বোধ হয় দৈবী তেল তিনি নিয়ে গেলেন, আমার মনে কেমন ভয় হতে লাগল।—সাহস হলনা কাউকে জিজ্ঞাসা করি মারি এমে মারা গেলেন না কি। সেদিন মাদ্‌লিনের কাপড় আঁকড়ে ধরতে সে আমাকে যে ধাক্কাটা মেরেছিল আমি তা কখনো ভুলব না। ধাক্কা মেরে সে আমায় সটান ফেলে দিলে এবং ছুটে যেতে-যেতে চুপি-চুপি বলে গেল—"ভালো আছেন।" তার পর মারি এমে যখন একেবারে ভালো হয়ে উঠলেন তখন মাদ্‌লিনের ব্যবহারও ভালো হয়ে এ'ল—আগের মতোই সব চলতে লাগল।

(২৩)

সেলাইয়ের উপর আমার একেবারে বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল, মারি এমে তাইতে ভারি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। সে-কথা আমার সামনে তিনি পাদ্রীর বোনের কাছে বলতেন। পাদ্রীমহাশয়ের বোন বুড়ী—বিয়ে হয়নি; লম্বা মুখ,

বড় বড় ঘোলাটে চোখ। আমরা তাঁকে মাক্সিমিলিয়েন্ বলে ডাক্‌তুম। মারি এমে তাঁর কাছে বলতেন যে আমার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁর বড় ভাবনা হয়। তিনি বলতেন, আমি খুব সহজে শিখ্‌তে পারি বটে কিন্তু কোনো-রকম সেলাইয়ের কাজেই আমার এতটুকু রুচি নেই ;—পড়াশুনায় আমার ঝোঁক আছে বলে তাঁর মনে হয়। তিনি অনেক খোঁজ করছেন আমার এমন-কেউ আত্মীয় আছে কি না যে আমার ভার নিতে পারে, কিন্তু এক বুড়ী ছাড়া আর-কোনো আত্মীয়ের সন্ধান পাননি; সে আমার দিদির ভার নিয়েছে, কিন্তু আমায় নিতে চায়নি। মাক্সিমিলিয়েন্ বল্লেন, তাঁর দর্জ্জীর দোকানে আমায় নিতে তিনি রাজী আছেন। এ প্রস্তাব পাদ্রীমশায়ের খুব ভালো লাগল। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন যে তাহলে সপ্তাহে দুবার করে তিনি নিজে সেখানে গিয়ে আমায় পড়িয়ে আসবেন। তাতে মারি এমের এত আনন্দ হল যে কি করে তাঁদের কাছে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবেন খুঁজে পেলেন না। পাদ্রীমহাশয়কে একটা কাজে রোমে যেতে হচ্ছে, সেখান থেকে তিনি ফিরে এলেই আমি ম্যাক্সমিলিয়েনের সঙ্গে চলে যাবো এই স্থির হল। ইতিমধ্যে মারি এমে আমার সব জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখবেন আর মাক্সিমিলিয়েন্ গুরু-মায়ের কাছ থেকে আমার বিদায়ের অনুমতি নিয়ে আসবেন। গুরুমায়ের নাম উঠতে আমার কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। আমি যখন মারি এমে ও পাদ্রীমহাশয়ের পাশে বেঞ্চিতে বসে থাক্‌তুম তিনি সামনে দিয়ে যাবার সময় আমার উপর যে রূঢ় কটাক্ষ করে যেতেন সে আমি ভুলতে পারব না। মাক্সিমিলিয়েন্‌কে তিনি কি জবাব দেন তাই শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রইলুম। সপ্তাহখানেক হল পাদ্রীমহাশয় চলে গেছেন, মারি এমে সে সময় রোজই আমার যে নতুন কাজ হল তার কথা পাড়তেন। বলতেন, রবিবারে রবিবারে আমাদের দেখা হবে। কত যে উপদেশ দিতেন ঠিক নেই, ক্রমাগত বলতেন, ভালো হয়ে থেকো, শরীরের যত্ন নিয়ো।

(২৪)

গুরু-মা একদিন সকালে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলুম একখানা প্রকাণ্ড লাল চৌকির উপর তিনি বসে আছেন। তাঁর সম্বন্ধে মেয়েরা যে সব ভুতুড়ে গল্প বলে আমার তাই মনে পড়তে লাগল। চারিদিকে লাল, তার মধ্যে কালো পোষাকমোড়া তাঁর চেহারা দেখে আমার মনে হল যেন অন্ধকার কুটুরির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আফিম-ফুল ফুটে উঠেছে। তিনি খানিকক্ষণ ধরে চোখ-পিট্‌-পিট্‌ করতে লাগলেন। মুখের উপর একটা হাসি ছিল কিন্তু সে যেন অবজ্ঞার হাসি। আমার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল; কিন্তু আমি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। নাক-সিঁটকে ভুরু-কুঁচকে তিনি বল্লেন—"তোমায় ডেকেছি কেন জান ?" আমি বল্লুম, বোধ হয় মাক্সিমিলিয়েন্ সম্বন্ধে কিছু বলবেন তাই। তিনি আবার নাক-সিঁটকে বল্লেন—"হুঁ, সেই কথাই বটে।" তিনি বল্লেন—"দেখ বাপু তোমার চোখ-ফোটা দরকার

হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি তোমাকে সোলোঞর এক চাষার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।” চোখের পাতা অর্দ্ধেক বুজে কথার ঠোকর-মেরে-মেরে তিনি বল্লেন—“তোমায় রাখালের কাজ করতে হবে, বুঝলে?” তারপর ঠেস্ দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—“অর্থাৎ ভেড়া চরাতে হবে!” আমি বল্লুম—“তা বেশত!” তিনি নিজের শরীরটাকে গুটিয়ে নিয়ে খাড়া হয়ে বসে বল্লেন—“ভেড়া-চরানো কাকে বলে জানো?” আমি বল্লুম—“হাঁ, ভেড়া-চরানো দেখেছি।” তাঁর হল্‌দে মুখখানা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে এনে তিনি বল্লেন—“তোমায় নিজের হাতে গোয়াল মুক্ত করতে হবে! তার ভারি দুর্গন্ধ! চাষার বাড়ির কাজ-কর্ম্ম দেখা, গোরুর দুধ-দোওয়া, শূয়োর ঘাঁটা—এ সবই তোমার করতে হবে!” তিনি প্রত্যেক কথাটির উপর জোর দিয়ে দিয়ে বলছিলেন,—তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল পাছে আমি তাঁর কথার তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে থাকি। আমি আবার উত্তর করলুম—“আচ্ছা, তাই করব!” তিনি চৌকির হাতা ধরে খাড়া হয়ে উঠলেন, আমার উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা গেঁথে রেখে বলতে লাগলেন—“তোমার মনে অভিমান নেই!” আমি একটু হেসে বল্লুম—“না।” তিনি ভারি আশ্চর্য্য হলেন দেখলুম; আমাকে তখনও মিটি-মিটি হাসতে দেখে তাঁর গলার স্বর নরম হয়ে এল, তিনি বল্লেন—“তাই না কি বাছা! আমার বিশ্বাস ছিল তুমি ভারী অভিমানী।” তিনি চৌকির গায়ে আবার হেলে পড়লেন, চোখের পাতা দিয়ে দৃষ্টি ঢেকে তিনি এক-ঘেয়ে সুরে—যেমন করে প্রার্থনা বলে যান তেমনি করে গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন যে আমার মনিবের হুকুম যেন আমি অমান্য না করি, ধর্ম্মকর্ম্মের কর্ত্তব্য যেন না ভুলি; সেণ্টজন ভোজ যে দিন হবে তার আগের দিন এক চাষার স্ত্রী এসে আমায় নিয়ে যাবে ইত্যাদি।

আমি তাঁর ঘর থেকে মনের যে কি-রকম ভাব নিয়ে বেরিয়ে এলুম তা প্রকাশ করে বলতে পারি না। কিন্তু মারি এমের মনে কষ্ট দিতে আমার ভারি সঙ্কোচ হতে লাগল। কেমন করে তাঁকে বলব? তিনি আমার অপেক্ষায় পথেই দাঁড়িয়েছিলেন। ছুটে এসে আমার কাঁধ দুটো ধরে, আমার মুখের কাছে হেঁট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“কি হল?” তাঁকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। আমি বল্লুম—“তাঁর ইচ্ছা আমায় রাখালের কাজে দেওয়া হয়!” তিনি কথাটা বুঝতে পাল্লেন না, কপাল কুঁচকে বল্লেন—“রাখালের কাজ? সে কি?” আমি বলে গেলুম—“হাঁ, এক চাষার বাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে—আমায় সেখানে দুধ দুইতে হবে -শূয়োর ঘাঁটতে হবে।” মারি এমে এমন জোরে ঠেলে সরিয়ে দিলেন যে দেয়ালে আমার মাথা ঠুকে গেল। তিনি দরজার দিকে ছুটে গেলেন। মনে হল তিনি গুরুমায়ের ঘরে যাচ্ছেন; কিন্তু তিনি সটান বেরিয়ে গেলেন; আবার ফিরে এসে পথ-ঘরটায় ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগলেন। হাতের মুঠো তাঁর শক্ত হয়ে উঠল এবং থেকে-থেকে মাটির উপর পায়ের চাপড় পড়তে লাগল। তিনি টেনে টেনে

নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। অবশেষে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, হাত তাঁর ঝুলে পড়ল—যেন একেবারে অবসন্ন। এমন স্বরে কথা বলতে লাগলেন যে মনে হল সে স্বর অনেক দূর থেকে আসছে;—তিনি বলে উঠলেন—"এ তার প্রতিহিংসা। এমনি করে সে শোধ তুলচে!"

তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন, আদর করে আমার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি একবার বল্লেও না যে আমি যাবো না? মাক্সিমিলিয়েনের কাছে যাবার জন্যে একটা প্রার্থনাও জানালে না?" আমি ঘাড় নাড়লুম; গুরু-মা আমায় যে-সব কথা বলেছেন আমি অবিকল তাই বলে যেতে লাগলুম। তিনি চুপ করে শুনতে লাগলেন। তার পর বল্লেন, যেন এ সব কথা আমি মেয়েদের কাছে না বলি! তিনি বল্লেন, কোন ভাবনা নেই, পাদ্রীমশায় ফিরে এলেই এ-সব গোল চুকে যাবে।

(২৫)

পরের রবিবার আমরা উপাসনায় যাবার জন্যে সার-বন্দি হচ্ছি এমন সময় মাদ্‌লিন পাগলের মতো হয়ে ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে এল। হাত-দুটো উপর দিকে উঁচু করে তুলে চীৎকার করে উঠল—"ওগো পাদ্রীমশায় মারা গেছেন গো!"—বলে তার সাম্‌নের টেবিলটার উপরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমাদের সকলকার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল, আমরা তার কাছে ছুটে গেলুম,—সে পড়ে-পড়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। খুঁটিয়ে সব জানবার জন্যে আমরা ছটফট করতে লাগলুম কিন্তু সে কেবল টেবিলটার উপর আছড়ে আছড়ে পড়ে বলতে লাগল—"তিনি আর নেই—আর নেই!" আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। আমার কোনো দুঃখ হচ্ছে কি না বুঝতে পারলুম না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা চলছিল মাদ্‌লিনের সেই গলার স্বর আমার কানে ঘণ্টার শব্দের মতো বেজে বেজে উঠছিল। সেদিন আমাদের বেড়ানো বন্ধ রইল। ছোটো ছোটো মেয়েরা পর্য্যন্ত কেউ টুঁ শব্দ করলে না। আমি মারি এমেকে দেখতে গেলুম—তিনি সেদিন উপাসনায় আসেন নি; মারি রেনো আমায় বল্লে তাঁর শরীর কিন্তু ভালো আছে। জল-খাবার ঘরে তাঁর খোজ পেলুম। দেখলুম তাঁর নিজের সেই উঁচু জায়গাটিতে তিনি বসে আছেন,—টেবিলের উপর তাঁর মাথাটি ঝুঁকে রয়েছে, হাতদুখানি চেয়ারের গায়ে ঝুলে পড়েছে। আমি একটু দূরে চুপটি করে বসে রইলুম। কিন্তু যেমন দেখলুম তিনি কেঁদে উঠলেন অমনি আমার বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে বেরিয়ে এল। আমি দু হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলুম। কিন্তু বেশীক্ষণ কাঁদতে পারলুম না;—মনে হতে লাগল যতটা দুঃখ হওয়া উচিত আমার ততটা দুঃখ হচ্ছে না। আমার কাঁদবার ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু আমি চোখ দিয়ে এক-ফোঁটা জল বার করতে পারছিলুম না। আমার ভারি লজ্জা হতে লাগল; কারণ আমি জানতুম কেউ মরে গেলে তার জন্যে কান্নাকাটি করা উচিত। আমি লজ্জায় মুখ-থেকে হাত সরাতে পারছিলুমনা; ভয় হচ্ছিল, মারি এমে যদি দেখেন আমার চোখে জল নেই তা'হলে তিনি ভাববেন আমি কী নিষ্ঠুর!

আমি বসে বসে তাঁর কান্না শুনছিলুম। সেই কান্নার শব্দ শীতকালের বাতাসের ঝাপটার মতো কানে এসে লাগছিল। সে শব্দ কেবলই উঁচু থেকে নীচু এবং নীচু থেকে উঁচু হয়ে-হয়ে উঠছিল—মনে হচ্ছিল তিনি যেন গানের একটা সুর বসাচ্ছেন। হঠাৎ সে-শব্দ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে ছিঁড়ে গেল এবং তার গভীর রেশ কাঁপতে কাঁপতে আকাশে মিলিয়ে গেল। খাবার আসবার কিছু আগে মার্দালন সেই ঘরে এল—সে এসে মারি এমেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল, হাত দিয়ে তাঁকে ভালো করে ঘিরে ধরলে—খুব সাবধানে নিয়ে যেতে লাগল। রাত্রে সে আমাদের বল্লে যে পাদ্রী-মহাশয় রোমে মারা গেছেন—তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর আত্মীয়দের কাছে গোর দেবার জন্যে।

(২৬)

পরদিন মারি এমে আগের মতোই আমাদের সব খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন, আর কান্নাকাটি করলেন না; কিন্তু আমাদের-কাউকে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে দিলেন না। তিনি মাটির দিকে চোখ নীচু করে বেড়াতে লাগলেন—আমার মনে হতে লাগল, আমাকে যেন আর তাঁর মনে নেই। আমার আর একদিন মাত্র বাকি। গুরুমা বলেছিলেন কাল আমায় নিতে আসবে;—পরশু সেণ্টজন ভোজ। সন্ধ্যা বেলা প্রার্থনার শেষে মারি এমে যখন বল্লেন—"হে ভগবান, যারা নির্ব্বাসিত এবং যারা কারারুদ্ধ তাদের প্রতি তোমার করুণা বর্ষিত হোক!" সেই সময় তিনি উচ্চ কণ্ঠে এই কথাগুলিও বল্লেন—"তোমাদের যে সঙ্গীটি এখান থেকে বিদায় নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়তে চল্‌ল, এস তার জন্যেও প্রার্থনা জানাই।" আমি তখনই বুঝলুম এ আমার কথাই হচ্ছে, এবং আমার মনে হতে লাগল নির্ব্বাসিত এবং কারারুদ্ধের মতোই আমি কৃপার পাত্রী! সে-রাত্রে আমি কিছুতেই ঘুমুতে পারলুম না। কাল যাচ্ছি একথা জানতুম কিন্তু কেমন জায়গায় যাচ্ছি তা জানতুম না। সোলোঞ জায়গাটা কি-রকম আমার কিছু জানা ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, যেন সে জায়গাটা অনেক—অনেক দূরে; সেখানে সব বড় বড় মাঠ, তাতে কেবল রাশি রাশি ফুল! কল্পনার চোখে দেখছিলুম আমি ভেড়া চরাচ্ছি—একপাল সাদা ধবধবে ভেড়া ঘুরে বেড়াচ্চে—আমার দুপাশে দুই কুকুর, ভেড়া-গুলো ছটকে না যায় তার জন্য আমার ইসারার অপেক্ষায় আমার মুখ চেয়ে আছে। এ-কথা মারি এমেকে বলবার আমার সাহস হয় নি বটে, কিন্তু দর্জ্জির দোকানে বন্ধ থাকার চেয়ে ঐ খোলা মাঠে ভেড়া-চরানো আমার তখন বেশ লাগছিল। ইস্‌মেরি আমার পাশে নাক ডাকাচ্ছিল, সেই শব্দে চমক ভেঙে আমার মন আমার সঙ্গীদের কাছে আবার ফিরে এল।

রাত্রিটি এমন উজ্জ্বল যে আমি ঘরের প্রত্যেক বিছানাটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। আমি এক এক করে সব বিছানার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেতে লাগলুম;—যাদের আমি ভালোবাসি তাদের কাছে খানিক্-খানিক করে থামতে লাগলুম।

ঠিক আমার ওধারে আমার বন্ধু সোফি—তার সেই চমৎকার চুলের গোছা বালিসের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানটা যেন আলো হয়ে উঠেছে। খানিকটা ওধারে আমাদের অভিমানিনী সেমিনো আর তার যমজ বোন—যাকে আমরা "বোকা" বলে ডাকি। অভিমানিনী সেমিনোর কপাল ছিল চওড়া, মোলায়েম সাদা ধবধবে আর তার চাহনিটি ভারি মিষ্টি। তার ঘাড়ে কোনো দোষ পড়লে সে কখনো বলত না যে সেটা মিছে, সে শুধু কাঁধটা দোলাতে থাকত এবং একটা ঘৃণার সঙ্গে নিজের চারিদিকে চাইত। মারি এমে বলতেন, তার কপালটি যেমন শুভ্র, তার অন্তরটিও তেমনি শুভ্র! তার বোন "বোকা" তার চেয়ে প্রায় দেড়া লম্বা। তার চুল ছিল মোটা মোটা, সেগুলো তার ভুরুর উপর এসে ঠেকত। ঘরের একেবারে ও-কিনারায় কোলেতের বিছানা। সে এখনও জানে যে আমি মাক্সিমিলিয়েনের কাছেই যাচ্ছি। তার দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই আমার বিয়ে-থা হয়ে যাবে। সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে আমার বিয়ে হয়ে গেলেই তাকে এখান থেকে আমার কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমি অনেকক্ষণ-ধরে তার কথা ভাবলুম। তার পর জানলার দিকে আমার নজর পড়ল—যে গাছতলায় আমি বসতুম সেখানকার ঘন গাছের ছায়া আমার দিকে ঝুঁকে এসে পড়েছে; মনে হল তারা আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছে; আমার মুখের একটু হাসি তাদের দিলুম। গাছের ওধারে হাঁসপাতাল ঘর,—এমনি দেখাচ্চে যেন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে,—তার ছোট ছোট জানলাগুলো রুগ্ন চোখের মতো বোধ হচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে সেই হাঁসপাতালের দিকে চেয়ে চেয়ে সিষ্টর আগাতার কথা ভাবতে লাগলুম। তাঁকে দেখতে এমনি জলজ্বলে আর স্বভাবটি এমনি মিষ্টি যে তিনি যখন ছোট ছোট মেয়েদের ধমকাতেন তারা হেসে উঠত। তিনি আমাদের চিকিৎসা করতেন। আমরা-কেউ তাঁর কাছে আঙুলের ঘা নিয়ে গেলে তিনি মজার মজার গল্প বলতে আরম্ভ করতেন এবং কে পেটুক আর কার সাজসজ্জার ঝোঁক তাই বুঝে কাউকে কেক্, কাউকে ফিতে দেবেন বলতেন। তিনি ভাণ করতে থাকতেন যেন ঐ জিনিষগুলো খুঁজচেন, আমরা ব্যস্ত হয়ে যখন তাই দেখতে থাকতুম, তিনি ধাঁ করে আঙুলের উপর ছুরি ফুটিয়ে, ধোয়া-মোছা শেষ করে বেঁধে ফেলতেন। আমার মনে পড়ে আমার পায়ে একবার ঘা হয়ে কিছুতে সারেনা। একদিন সকালে সিষ্টর আগাতা গম্ভীরভাবে আমায় বল্লেন—"দেখ মারি ক্লেয়ার, আজ তোমার পায়ে একটা দৈব জিনিষ আমি লাগিয়ে দেব, যদি তিন দিনের মধ্যে আরাম না হয় তাহ'লে তোমার পা কেটে ফেলতে হবে।" তিনদিন আমি খুব সাবধানে রইলুম। পাছে দৈব জিনিষে কোনো ব্যাঘাত পড়ে সেই ভয়ে আমি তিন দিন আর চলাফেরা করলুম না। আমি ভেবেছিলুম নিশ্চয় ঐ দৈব জিনিষ সত্যিকার ক্রুশ কিম্বা ভার্জ্জিনদেবীর মাথার কাপড়ের একটু টুকরো হবে। তিন দিনের দিন আমার পা সম্পূর্ণ সেরে গেল। তার পর আমি যখন

তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম ঐ দৈব জিনিষটা কি, তিনি হেসে উঠলেন, বল্লেন, আমি ভারি বোকা এবং মলমের কৌটটা দেখিয়ে বল্লেন এই সেই দৈব জিনিষ!

(২৭)

যখন শুতে গেলুম তখন রাত্রি অনেক। সকাল হতেই মনে হতে লাগল সেই চাষার স্ত্রী এই এল বলে। ইচ্ছে হচ্ছিল সে আসুক কিন্তু সে যে আসছে তার জন্যে ভয়ও হচ্ছিল। আমাদের খাওয়া শেষ হতেই এক দাসী এসে জিজ্ঞেস করলে আমি যাবার জন্যে তৈরি কি না। মারি এমে বল্লেন—"এই এখুনি হল বলে!" বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে তার সঙ্গে যেতে বল্লেন। তিনি নিজের হাতে আমায় কাপড় পরিয়ে দিয়ে আমাকে একটা পুঁটুলি দিলেন। তার পর তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন —"তাঁকে কাল নিয়ে আসবে কিন্তু তুমি তখন থাকবে না।" তার পর আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন—"আমার কাছে শপথ কর রোজ রাত্রে তাঁর জন্যে প্রার্থনা করবে।" আমি বল্লুম—"আচ্ছা।" তিনি আমায় সজোরে তাঁর কাছে টেনে নিলেন, আমাকে ঠেসে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন, তার পর ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। শুনলুম তিনি বলতে বলতে যাচ্ছেন—"হে ভগবান, এ কী শাস্তি!" আমি একাই উঠোনটা পার হয়ে গেলুম—চাষার স্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল—সে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সংস্কৃত ভূত ও দেশী পেত্নী

১। ভূতের কাণ্ড

আমাদের বন্ধু কানাই কি উপায়ে তাহার নিজের নামটি আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার একটা ব্যাকরণ-ঘটিত ইতিহাস পাওয়া যায়। কানাই বেচারার অন্ন-প্রাশনের সময়ে তাহার বাপ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'জ্যোতি'। জ্যোতি যখন গ্রামের পাঠশালা ছাড়িয়া সহরের ইংরেজি স্কুলে ঢুকিল, তখন সেই স্কুল বা বিদ্যালয়ের কাব্যতীর্থ পণ্ডিত-মহাশয় জ্যোতিকে 'জ্যোতিস্ চন্দ্র' করিয়া তুলিলেন এবং বালকেরা তাহাকে 'জ্যোতিশ্' নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল। পণ্ডিত-মহাশয়ের ব্যাকরণের প্রতি প্রখর দৃষ্টি ছিল; তিনি যখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে বালকেরা 'জ্যোতিস্' বলিয়া ডাকিবার সময় মনে মনে 'শ' কল্পনা করে, তখন তিনি নামটার ব্যাকরণ-ঘটিত সকল পরিবর্ত্তন বুঝাইয়া দিলেন। জ্যোতি বেচারা দেখিল যে তাহার নামটা নিতান্ত নেড়া-মুড়া থাকিবার সময়েও 'স' যুক্ত 'জ্যোতিস্' হইবে, 'চন্দ্র' যোগ হইলে 'জ্যোতিশ্' হইবে এবং তাহার নামে কেবল তাহার উপাধি 'ঠাকুর'টুকু জুড়িলে 'জ্যোতিষ্ ঠাকুর' হইবে। এত শিক্ষার পর যদি তাহার

বিদ্যা হয়, তাহা হইলে 'জ্যোতিষ্' বিদ্বান্ হইয়াছে, এইরূপ নাকি বলিতে হইবে। পণ্ডিত-মহাশয় যখন তাহার কোমল নামটিকে, মূর্দ্ধা, তালু ও দন্তে পিষিতেছিলেন জ্যোতি তখন একটা অভিগন্ধি ফাঁদিয়া সকল সন্ধি লোপ করিয়া দিল; সে তাহার ঠাকুরমার দেওয়া আটপৌরে নামটিকে পোষাকী করিয়া 'কানাই' নাম চালাইল। কানাই-এর শিরে বিসর্জ্জনীয়ের ফোঁটার বৈচিত্র্য কিংবা রেফের টীকি চলে না দেখিয়া পণ্ডিত-মহাশয় ব্যাকরণ বন্ধ করিলেন।

মাগধী প্রাকৃতের মেয়ে, যে দ্রবীড় জাতির দেশের তেলে-জলে পুষ্ট হইয়া বাঙ্গলা ভাষা হইয়াছে, সে যে কেবল সখ করিয়াই পাণিনি-সেক্‌রার গড়া দুই-চারি-খানি গহনা পরে, এখন সে কথা তাহার রূপ দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে চাহেন না। পণ্ডিতেরা যদি শ্রীহর্ষের দময়ন্তীকে ভুলিয়া বঙ্কিমের কাল ভ্রমরকে আদর করেন, তবে ভ্রমর শব্দে যেন স্ত্রী-প্রত্যয় না খোঁজেন। আমাদের ঘরের সুন্দর মেয়ে সংস্কৃতের সুন্দরী কন্যা নহেন। পণ্ডিতদের দৃষ্টি পড়িলেই বাঙ্গলা ভাষা যখন অং বং করিয়া নাকী সুরে কথা কহিয়া প্রলাপ বকিতে বসে, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে ভূতে পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের দলের শেষ প্রতিনিধি হরপ্রসাদ, ভূত তাড়াইবার অনেক উদ্যোগ করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ শব্দ-তত্ত্বের মন্ত্র আওড়াইয়া অনেক সাধনা করিয়াছেন; তবুও এই ভূতের উৎপাত কমিতেছে না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, 'সবুজপাতা' না বলিয়া 'সবুজপত্র' বলেন বটে কিন্তু তিনি এই ভূতের একটি ওঝা! আমি প্রমাণ দিতেছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে এই ভূত চাপিয়াছে; ওঝারা কি করিবেন ভাবিয়া দেখুন।

কয়েক বৎসরের বাঙ্গলা পরীক্ষার প্রশ্ন-কাগজে বালকদিগকে যে সকল কথার ভুল শুধ্‌রাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় দিব। পরীক্ষকের বিচারের ভুল শব্দগুলির পাশে বন্ধনী দিয়া, তাঁহার উদ্দিষ্ট শুদ্ধ প্রয়োগগুলিও বসান গেল, যথা ঃ—মন-কষ্ট (মনঃকষ্ট), মহিমাময় (মহিমময়), দেশবাসীগণ (—বাসিগণ)। বাঙ্গলায় যে 'মনস্' শব্দ নাই, আমাদের প্রাকৃত 'মনে' যে কোন বিসর্জ্জনীয়ের দাগ পড়ে না, তাহা পরীক্ষকেরা মানেন না। বাঙ্গলায় নূতন করিয়া সন্ধির নিয়মে শব্দ না গড়িয়া অনেক আস্ত যুক্ত শব্দ সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে আনিয়াছি; সংস্কৃত হইতেই 'মনস্তাপ' পাইয়াছি, 'মনোহর'ও পাইয়াছি। পণ্ডিতেরা বলিতে চান, যে 'মনস্' প্রভৃতি বিসর্গ, বা বিসর্জ্জনীয় যুক্ত শব্দের সঙ্গে বাঙ্গলা কথা মিলিলে কোন গোল হইবে না, কিন্তু সংস্কৃত কথা জুড়িলেই সন্ধির নিয়ম পালিতে হইবে, কারণ বাঙ্গলা কথায় সন্ধি হয় না। একটা ধূয়া শুনিতে পাই বটে যে বাঙ্গলা কথায় সন্ধি হয় না, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বাঙ্গলা 'মশা' ও সংস্কৃত 'অরি'তে মিলিয়া যে মশারি হইয়াছে, সাহিত্যের দরবারেও তাহা সঙ্গে লইতে অনুরুদ্ধ হইয়া থাকি; মোকদ্দমাদি না চালাইলে আইন, আদালত বন্ধ হয়; গোলালু সকলেরই গ্রাহ্য হইয়াছে; কথায়

কথা জুড়িলে, স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণের সময় যে স্বর-সঙ্কোচ ঘটে, উহাই সন্ধি। বাঙ্গলার প্রকৃত-সিদ্ধ উচ্চারণ 'জগৎ' ও 'বন্ধু' একত্রে জগবন্ধু হয়; কিন্তু এরূপ স্থলে সন্ধিযোগ না করাই দস্তুর হইয়াছে। সংস্কৃত কথার সহিত সংস্কৃত জুড়িয়াও আমরা সকল সময়ে সন্ধি জুড়ি না; 'চোর' খাঁটি সংস্কৃত, অথচ আমাদের 'মনচোরটিকে' প্রাকৃত রূপেই পাই। প্রাচীন প্রাকৃতেও 'মনস্' ছিল না বলিয়া সহজ রকমেই 'মন্মথ' দেখা দিয়াছিল; পণ্ডিতেরা উহাকে আগ্রহ করিয়া টানিয়া লইয়াছেন এবং 'মনস' দিয়া মিলাইতে না পারিয়া, গোঁজামিল দিয়া বিশেষ সূত্র গড়িয়াছেন। বিসর্গটা কোনরকমে 'দুঃখ' প্রভৃতির মাঝখানেই বাঁচিয়া আছে; বাঙ্গলায় যে 'নিশ্বাস' টানি, তাহার মধ্যে আর উহার উগ্রতা স্থান পায় না। বাঙ্গলায় 'মহিমা-ই' শব্দ, 'বাসী-ই শব্দ; উহাদের প্রপিতামহের কুলের সংবাদ লইলে উহারা আর কুলীন হইতে পারিবে না। দেশী শব্দের উচ্চারণের নিয়মে, পাড়া-গাঁয়ের রামায়ণে যখন 'রামের মহিমে' পর্য্যন্ত চলিয়াছে তখন উহার মুক্তির জন্য দেবতার কাছে 'মহিম্নস্তব' পড়িলে কিছু লাভ হইবে না। ঘসিয়া মাজিয়া বাঙ্গলা কথার আদিম সংস্কৃত রূপ ফুটাইবার চেষ্টাকে পাগ্‌লামি বলা চলে। এ কথাও যেন আমাদের মনে থাকে, যে—'গুলি' 'রা' প্রভৃতির মত বাঙ্গলা ভাষায় 'গণ' বহুবচনের চিহ্নমাত্র।

কোন শব্দ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে বলিয়াই সে বাঙ্গলা ভাষার নিয়মের বাহিরে থাকিবে এবং তাহার জন্য প্রতি পংক্তিতে বিশেষ আসন দিতে হইবে এ আব্দার চলিবে না। অনেক প্রাকৃত শব্দ লইয়া সংস্কৃত যেরূপ লীলা-খেলা করিয়াছেন, আমাদের ভাষা যদি সংস্কৃত শব্দগুলি লইয়া তেমনই কিছু করে, তবে সেটা লীলা-খেলা না হইয়া পাপ হইবে কেন? পূর্ব্বে কয়েকবার ঠিক এই বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছি। নূতন করিয়া আবার কথা উঠিয়াছে বলিয়া কয়েকটা নূতন দৃষ্টান্ত দিব। প্রাচীন 'ক্রীড়' হইতে প্রাকৃতে 'কীল' ও 'কেল' হইয়াছিল; এবং 'কেল' হইতে আকার 'খেল' হইয়াছিল। প্রাচীন প্রাকৃতের 'জ্যুৎকীলনম্' অর্থাৎ 'দ্যূতক্রীড়া' বা জুয়াখেলা কথায়, 'কীল' ও 'কেল' ঠিক 'খেলা' অর্থেই পাওয়া যায়; কিন্তু এক সময়ে 'কেল-টি' বিলাসের খেলায় দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় অপভ্রংশের 'খেল' খেলা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল। পরে দেখা গেল, যে সংস্কৃতেও 'কেলী' চলিতেছে এবং চক্ষের কটাক্ষের খেলাকে 'খেলন' বলিয়া কবিতায় লিখিত হইতেছে। 'খেলৎখঞ্জা' প্রভৃতি প্রয়োগ অনেক রচনায় পাওয়া যায়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ আমাদের ভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে, সে গুলিকে বাঙ্গলার প্রত্যয় দিয়া সাজাইলে দোষ হইবে কেন? সংস্কৃত শব্দগুলিকে যখন 'পণ্ডিতাঃ' 'পণ্ডিতং' প্রভৃতি রূপ ছাড়িয়া, বাঙ্গলা বিভক্তি লইয়া 'পণ্ডিতেরা' 'পণ্ডিতকে' রূপে সাজিতেই হইবে, তখন কয়েকটি তদ্ধিত-প্রত্যয়ের বেলায় সংস্কৃতগিরি করিতে গেলে চলিবে কেন? যেখানে লোকে টাকা থাকিলে

'বড়মানুষী' করে, সেখানে বিদ্যা থাকিলে 'পণ্ডিতী' করে। 'পাণ্ডিত্য' চলুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু 'পণ্ডিতি' বন্ধ করিতে পারিবে না। 'বাবু' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বাব্বী' হইবে বলিয়া, দীনবন্ধুর নিমচাঁদ, অটলকে তামাসা করিয়া শিখাইয়াছিলেন। বাবুর স্ত্রীলিঙ্গে বহু পশ্চিমে, মহারাষ্ট্রে ও মধ্যদেশে 'বাবী' হয়; এবং ঐ 'বাবী' উচ্চারণে 'বাঈ' হইয়া থাকে। বেহার দেশের কোন শ্রেণীর প্রয়োগের ফলে, বাঙ্গলায় 'বাঈ' শব্দ পবিত্র নহে। পশ্চিম অঞ্চলে ও ওড়িষ্যার পশ্চিম-ভাগে অনেক স্ত্রীলোককে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া তাহাদের স্বামীর নামে স্ত্রীপ্রত্যয় করিয়া ডাকিবার প্রথা আছে; এই নিয়মে সাধুর স্ত্রী, 'সাধোবানি' নাম পায়। এস্থলে 'সাধোধানি' না বলিয়া 'সাধ্বী' বলিলে, স্ত্রীলোকের গুণবিশেষের কথাই বলা হইবে। এ প্রয়োগ বাঙ্গলায় থাকিলে প্রসন্ন-গোয়ালিনীর নাম লইয়া স্বয়ং কমলা-কান্তও লালিকা চালাইতে পারিতেন না। 'মাতঙ্গী দশমহাবিদ্যাতি' থাকিবেন, কিন্তু শতবিদ্যা হইলেও বাঙ্গলার ঘরে 'মাতঙ্গিনী' রূপই দেখিতে পাইব। আমাদের 'ইনী' সংস্কৃতের কেহ নন। নূতন শব্দ রচনার প্রয়োজন হইলে যদি সংস্কৃতের আশ্রয় লইয়া কিছু গড়িতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সংস্কৃত নিয়ম পালন না করিলে নিতান্ত দোষ হইবে, 'বাধ্যবোধ' করার অর্থে 'বাধিত' লিখিলে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ পাইবে। যদি 'পীড়ন' অর্থ সূচিত না করিয়া বাঙ্গলায় 'বাধ' প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কথা ছিল না।

পেত্নীর কাণ্ড

যাহা সত্যই প্রাচীন বা অতীত অর্থাৎ ভূত, তাহার জন্য ওঝার ব্যবস্থা চলে, কিন্তু দেশী পেত্নী তাড়াইতে হইলে দেশী-রকমের তুক্-তাক্ করিবার রীত আছে। কবি দীনবন্ধুর কুড়ারাম, দাতাকর্ণ পর্য্যন্ত পড়িয়া ও ইজ্জাতাছার লিখিতে শিখিয়াই, কানফোঁড়া খাতায় যে সাহিত্য রচনা করিয়াছিল তাহাও সনাতন বলিয়া আদর পাইবে কি? যে পুঁথি নকলের চাকরি বজায় রাখিবার জন্য কোন প্রকারে 'ও', 'ঙ', 'ঞ' প্রভৃতির গায়ে আ-কার, ই-কার বসাইয়া লেখার দায় সারিত, তাহার প্রবর্ত্তিত রীতির ত অপঘাত-মৃত্যু হইয়াছিল জানি, ঐ মৃত রীতির পেত্নী এখন জমিদারি কাছারির শেওড়া গাছ এবং আদালতের ধারের অশ্বত্থ গাছ হইতেও তাড়া খাইতেছে, অথচ আমাদের সাহিত্যের মণ্ডপে কেহ কেহ তাহাকে আবাহন করিতে চান।

স্বর ও ব্যঞ্জনে প্রভেদ ঘুচাইয়া, দু-একটা স্বরবর্ণের গায়ে আ-কার য-ফলা প্রভৃতি লাগাইয়া, জোঁকের গায়ে জোঁক বসাইবার দরকার কি? অনুস্বারকে অনুনাসিকের প্রধান রূপ বলিয়া ধরিলে, উহার পাঁচটি প্রতিনিধি পাই; যেখানে অনুস্বার হইবার কথা সেখানে সেই অনুস্বার 'ক' বর্গে যুক্ত হইলে 'ঙ' হয়, 'চ' বর্গে যুক্ত হইলে 'ঞ' হয়, 'ট' বর্গে 'ণ' হয়, 'ত' বর্গে 'ন' হয় এবং 'প' বর্গে 'ম' হয়। 'ন' এবং 'ম' স্বাধীন ব্যঞ্জন বর্ণও বটে, এবং অনুনাসিকের চিহ্নও বটে। 'ন', স্থান-

বিশেষের উচ্চারণে 'ণ' হইলে, 'ণ'টি একটি স্বতন্ত্র বর্ণ হয়; খাঁটি দেশী বাঙ্গলা শব্দে এই 'ণ' এর কোন ব্যবহার নাই। 'ঙ' এবং 'ঞ', 'ক' ও 'চ' বর্গের দুইটি অনুনাসিক মাত্র হইলেও, এই সাম্য ও স্বাধীনতার দিনে, কেহ কেহ উহাদিগকে স্বাধীন বর্ণরূপে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন। এখানে প্রয়োজনের তাড়না নাই, কেবল নূতন কিছু করার ঝোঁক আছে। আমাদের প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত অর্থাৎ পালি ভাষার উচ্চারণ বুঝাইবার গোলে পড়িয়া লঙ্কাদ্বীপে 'ঞ' অক্ষরের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'প্রজ্ঞা' শব্দটি বৈদিক যুগে 'প্রজ্‌-ঞ-আ' রূপে উচ্চারিত হইত; কালে এদেশে উহার উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছিল 'প্রগ্‌গাঁ'। ভারতবর্ষের প্রচলিত উচ্চারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া প্রাচীন উচ্চারণ বুঝিবার জন্য লঙ্কায় খুব বেশী 'ঞ' চালাইতে হইয়াছিল। কুড়ারামের রীতির আদর্শকে সমর্থন করিবার জন্য, লঙ্কার রীতি প্রদর্শিত হইবে কি? কেবল লঙ্কার জোরে 'ঞ' অক্ষরকে স্বাধীন ব্যঞ্জন করিলে উহা অসহ্য বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে।

সাহিত্যে যাহা অগ্রাহ্য, যাহা vulgar, তাহার একটা সাধারণ নাম, সাহিত্য-প্রসিদ্ধ কুড়ারামের নাম হইতে সংগ্রহ করিয়া, 'কুড়ারামি' বলা যাইতে পারে। যাহা পণ্ডিতি ধরণে উপহাসজনক যাহা pedantic, তাহাকে বিদ্যাদিগ্‌গজের নামে 'দিগ্‌গজি' বলিলে বেশ হয়। ইহাতে ভাব-প্রকাশের জন্য সকলের পরিচিত শব্দ পাওয়া যাইবে, এবং 'কুড়ারামি' ও 'দিগ্‌গজি' বলিলে, ভূত-পেত্নীরা লজ্জা পাইয়া পলাইবে। ওঝারা এই মন্ত্রদুইটিকে গ্রহণ করিবেন কি না, জানিতে চাই।

পুনশ্চ।—এই প্রবন্ধটি লিখিবার পরে স্যার রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা বানান' প্রবন্ধটি বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া, দুই একটা কথা পুনশ্চ দিয়া লিখিতেছি। আমার প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে খাঁটি দেশী শব্দের জন্য 'ণ' এর কোন ব্যবহার থাকিতে পারে না, ঐ অক্ষরটি যে 'ন' এর স্থল-বিশেষের পরিবর্ত্তিত রূপমাত্র, তাহাও বলিয়াছি। আমি অভ্যাসের ফলে সর্ব্বদাই অপভ্রংশ শব্দগুলিকে মূল সংস্কৃতের কতকটা অনুরূপ করিয়া বাণান করিয়া থাকি, এ বিষয়ে স্যার রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য গ্রহণীয় মনে করিতেছি। সোণা, বাণান প্রভৃতিতে 'ণ' ব্যবহারের বাস্তবিকই কোন প্রয়োজন নাই। যেগুলি খাঁটি দেশী শব্দ, অর্থাৎ সংস্কৃত ও প্রাচীন প্রাকৃতের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, সেগুলির জন্য আরও কয়েকটি অক্ষর সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। বাঙ্গলা ভাষায় দীর্ঘ বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ নাই, এবং টান ও ঝোঁকের খাতিরে হ্রস্বকেও দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়; কাজেই 'ঈ' ও 'ঊ' কোনও ব্যবহারে লাগিতে পারে না। 'ঋ' অক্ষরের কোন ব্যবহার নাই, এবং সম্ভবতঃ সংস্কৃতের 'ঐ' এবং 'ঔ' দেশী শব্দে ব্যবহৃত হইতে পারে না; বাংলা উচ্চারণে 'ঐ' এবং 'ঔ' অক্ষর দুইটি ঠিক সংস্কৃত ধরণে উচ্চারিত না হইয়া, 'অই' ও 'অউ' রূপে উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু উপযুক্ত অক্ষর থাকিতে অযথা সংস্কৃত অক্ষরের ভুল উচ্চারণ প্রচলিত করা উচিত নয়।

বিদেশের Student প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলায় লিখিবার সময় 'S' অক্ষরটির দন্ত্য উচ্চারণ বজায় রাখিতে পারি না; কারণ 'ট' অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হইলেই সংস্কৃতের নিয়মে 'ষ' বসাইতে হয়। ইহা ছাড়া দেশী শব্দের জন্য 'ষ' খুঁজিতে হয় না। ওড়িয়ায় যেমন সকল উচ্চারণেই 'স', বাঙ্গলায় তেমনি সকল দেশী শব্দের উচ্চারণই 'শ' হইয়া থাকে; দেশী শব্দে কেবল 'শ'ই ব্যবহৃত হইতে পারে।

বঙ্গ শব্দটি যখন প্রত্নতত্ত্বের মধ্যেই লুকাইয়া নাই; কবিতায় এবং মুখের কথাতেও যখন উহার ব্যবহার আছে, তখন বাঙ্গলাকে বঙ্গ শব্দ হইতে ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করা উচিত নয়। 'বাঙ্গলা' লিখিলে আমাদের প্রাকৃতিক উচ্চারণে যখন মাত্রা বাড়িয়া যায় না, তখন কবিতার জন্যও 'বাংলা' লিখিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালের আর্য্যেরা যে দেশকে সাধু করিয়া 'বঙ্গ' নাম দিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ অনার্য্যেরা সে দেশকে এবং আপনাদের জাতিকে 'বংলং' বলিত; সেই ঐতিহ্যেই 'বাঙ্গলা' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে; ঠিক 'বঙ্গ' হইতে 'বাঙ্গলা' হইয়াছে মনে হয় না। এই প্রত্নতত্ত্ব 'বাংলা' বাণানেরই অনুকূলে। কিন্তু 'বঙ্গ' ও বাঙ্গলা যখন চিরকাল চলিয়াছে এবং এবং উহাতে কবিতার জন্য প্রার্থনীয় উচ্চারণে বাধা পড়ে না, তখন একএকজন এক এক পন্থা অবলম্বন না করিলেই ভাল হয় না কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শিল্পের স্বরূপ

Paul বলিলেন, "সাহিত্য-শিল্পী ও নাট্য-শিল্পীর মত চিত্রকর বা ভাস্কর কি একই গতির (movement) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বৈচিত্র্য এক জায়গায় ফুটাইতে পারেন? আমার বিশ্বাস, এখানে কলমের কালোয়াত্-দের কাছে আপনারা হার মানিতে বাধ্য।"

রোঁদা জবাব দিলেন, "যতটা ভাবিতেছ, আমাদের অসুবিধা ততটা বেশী নয়। সময়ে-অসময়ে আমরা একই চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে একসঙ্গে অনেকগুলি ক্রমিক দৃশ্য অঙ্কন বা খোদন করিতে পারি।"

"—কিন্তু এ ত মান্ধাতার আমোলের ছেলে-ভুলানো প্রথা। আপনি বোধ হয় সেই-সব প্রাচীন পটের কথা বলিতেছেন, যেগুলিতে এক-এক ব্যক্তির জীবনের নানা ঘটনা, নানা দৃশ্যে পাশাপাশি আঁকিয়া দেখান হইয়াছে?"

"—বড় বড় ওস্তাদ-শিল্পী এই প্রথা অবলম্বন করিলেও, আমি এমন ধারা সেকেলে ছেলে-মানুষী পছন্দ করি না। কেবল মুহূর্ত্তের ভঙ্গী লইয়াই আর্টিষ্টের কারবার নয়,—নাটকীয় কলায় তিনি সম্পূর্ণতা দিতেও পারেন। তবে, কোন-একটি সমগ্র কার্য্যের চিত্র আঁকিতে গেলে তাঁহাকে

পাত্র-পাত্রী-সন্নিবেশের কায়দা জানিতে হইবে। প্রথমে দেখান চাই, ঐ কাজ আরম্ভ করিয়াছে কে, বা কাহারা? তার পর, কাহাদের দ্বারা কাজ-করান হইতেছে? সর্ব্বশেষে, কাহাদের সাহায্যে উক্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হইল? একটি দৃষ্টান্তে আমার বক্তব্য বুঝাইয়া দি, শোন।

Rudeএর Marseillaiseএর মূর্ত্তিগুলি দেখ।

সকলের উপরে স্বাধীনতার মূর্ত্তি; বক্ষে বর্ম্ম পরিয়া মুক্তপক্ষে বায়ু আন্দোলিত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন, 'নাগরিকগণ! অস্ত্র ধর!'—তাঁহার উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাম বাহু সাহসীগণকে আহ্বান করিতেছে এবং দক্ষিণ হস্তের নগ্ন অসি শত্রুপক্ষের দিকে প্রসারিত। ইনিই হইতেছেন কার্য্য-কারিণী শক্তি—ইঁহারই আদেশে সকল কার্য্য সাধিত হয়। ইঁহার উভয় চরণ পরস্পর-বিযুক্ত,—যেন, ইনি সবেগে ধাবমান। ইঁহার দিকে চাহিলেই মনে হয়, সকলেই যেন ইঁহার আদেশ মানিতে বাধ্য।

তারপর, দ্বিতীয় দৃশ্য।—দেখ, স্বাধীনতার আহ্বানে যোদ্ধারা ছুটিয়া আসিতেছেন। এক ব্যক্তি, কেশরী-কেশর-শোভিত শিরস্ত্রাণ শূন্যে আন্দোলন করিয়া দেবীকে যেন অভিবাদন জানাইতেছেন। পাশেই তাঁহার পুত্র কোষ-বদ্ধ তরবারি মুষ্টিমধ্যে ধরিয়া, যেন বিনতি করিয়া বলিতেছে, 'পিতা, আমি ত দুর্ব্বল নই—শিশুর মত কেন পিছনে পড়িয়া থাকিব? আমিও আপনার সঙ্গ লইতে চাই!'—সস্নেহ গর্ব্বভরে পুত্রের দিকে চাহিয়া বীর পিতা যেন বলিতেছেন,—'এস!'

তৃতীয় দৃশ্য।—এক বৃদ্ধ বীরপুরুষ,—আপন অস্ত্রভারে নুইয়া পড়িয়াছেন,—তথাপি রণোৎসাহে মত্ত হইতে লালায়িত;—কারণ, ধমনীতে যাহার একবিন্দুও রক্ত আছে, আজ কি সে অলস আমোদে ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে পারে? আর এক বৃদ্ধ বিজয়কামনা করিতে করিতে এবং সকলকে উপদেশ দিতে দিতে সৈন্যদলের অনুগমন করিতেছেন।

চতুর্থ দৃশ্য।—একজন ধনুকধারী, আপনার বলিষ্ঠ পেশীসতেজ দেহ লইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; আর-এক ব্যক্তি রণ-শিঙ্গার আবেগ-গম্ভীর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। পবনে পতাকা উড়িতেছে এবং বর্ষার সূচাগ্র ফলকগুলি উর্দ্ধে উত্থিত।—যুদ্ধের নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে—সংগ্রাম আরম্ভ হইল!"

রোঁদার Burghers of Calais বা "ক্যালের নাগরিকগণ" নামে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাস্কর্য্য-কার্য্যেও, একস্থানে এইরূপ ধারাবাহিক দৃশ্যমালা প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্যালের আত্মত্যাগী নাগরিকগণের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বোধ করি, সকলেরই জানা আছে।

ক্যালে-অবরোধে বিজয়ী ইংরাজ এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে, যদি সহরের ছয়জন নামজাদা বাসিন্দা মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেন, তাহাহইলে সমস্ত নাগরিককে হত্যা করা হইবে না। Eustache de Saint-Pierre প্রমুখ ছয়জন নাগরিক এই সর্ত্তমত আত্মদানে অগ্রসর হইলেন। রোঁদার শিল্পকার্য্যে আমরা দেখিতে পাই, "ক্যালের নাগরিকগণ" সমগ্র দেশবাসীর প্রতিনিধিরূপে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছেন।

মার্সে ইয়েজ
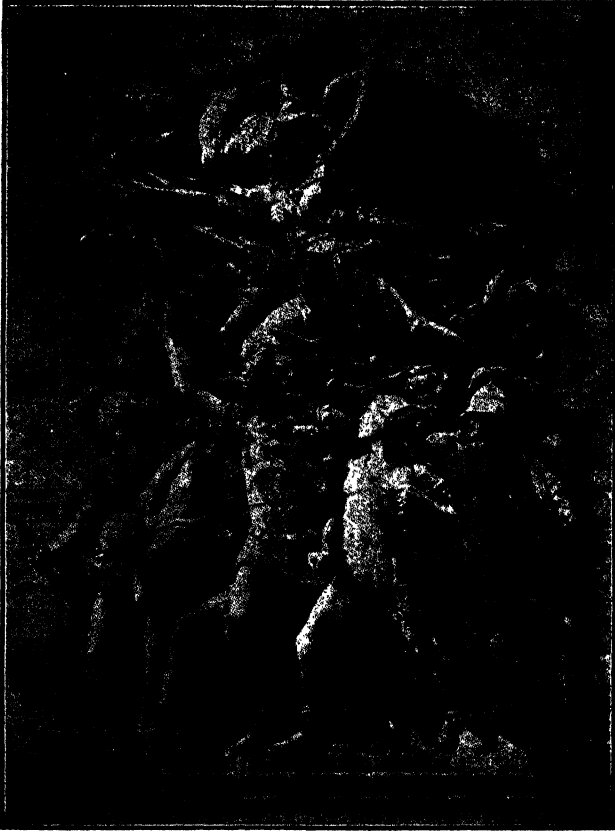
এই ছয়টি মূর্ত্তিতে মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতির ছবি ঠিকমত ফুটিয়াছে। নাগরিকদের কেহ অবরোধে অনাহার-কৃশ, কিন্তু কাপুরুষ নন; কেহ স্বদেশের হতভাগ্যের কথা ভাবিয়া দুঃখে ম্রিয়মান; কেহ কম সাহসী—তাড়াতাড়ি সব চুকাইয়া দিতে সকলের আগে-আগে চলিয়াছেন; কেহ আত্মদানে ভীত নন, কিন্তু আপনার অসহায় স্ত্রী-পুত্রের ভাবনায় অস্থির ও হতাশ; কেহ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া ভীত—স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তিনি কোনরকমে আপনাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন এবং কেহ-বা অল্প-বয়সী, দুর্ভাবনায় বিকৃতমুখ—হয়ত আপন প্রণয়িনীর প্রিয়মুখস্মরণে কাতর; কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে, অতএব যাইতেই হইবে—সব ছাড়িয়া যাইতেই হইবে!

* *
*

রোঁদা পেন্সিলে নক্সা আঁকিয়াছেন অগুন্তি। নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অনেকগুলি

সেণ্ট পিয়ের
(ক্যালের নাগরিকগণের একটি মূর্ত্তি)

আঁকা। ছবিগুলিতে নিপুণ হাতে পেন্সিলের এক-একটি টানে মানুষের এক-একটি সমগ্র দেহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাল করিয়া আঁকিতে গেলে, পাছে ততক্ষণে আদর্শের দেহভঙ্গী বদ্‌লাইয়া যায় এ-সকল চিত্রে সেজন্য শিল্পীর ব্যাকুলতার প্রমাণ আছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তমান দৈহিক নানা ভঙ্গী এই-সব নক্সাতে যোঁদা শীঘ্রহস্তে ধরিয়া রাখিয়াছেন। সেগুলিতে সুধু বর্ণ ও রেখার লীলা নাই—গতি ও প্রাণের স্ফূর্ত্তিও আছে।

সাধারণ দর্শক হয়ত এ ছবিগুলির অসম্পূর্ণতা দেখিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিবেন,—কিন্তু মাজিয়া-ঘষিয়া সযত্নে-সমাপ্ত রেখা-চিত্রের চাইতে রূপে-গুণে এগুলি যে কতটা উঁচুদরের, সমজদার ছাড়া আর কেউ তা সহজে বুঝিবেন না।

ক্যালের নাগরিকগণ

রোঁদার নক্সা

রোঁদা বলিতেছেন, "তিলোত্তমা নহিলে যে সাধারণের মন মজে না—এ-কথাটা খুবই খাঁটি। শিল্পী যদি বাজে খুঁটিনাটি ছাড়িয়া একেবারে ধ্রুব সত্যের সমগ্রতা লইয়া আপন কাজে ভাবের ছাপ্ দেন, অবোধ লোকেরা তবে অবুঝের মত হাঁ করিয়া থাকিবে। অকপট পর্য্যবেক্ষণে যে বাস্তবতার সরলতা ফুটিয়া ওঠে, লোকে ত তা বোঝে না—তারা চায় থিয়েটারী ঢং—কৃত্রিমতা!

লোকের এ ভুল ধারণা যে, নক্সার (Drawing) মধ্যে সৌন্দর্য্য আছে। তা ত নয়! নক্সা যে ভাবের বিকাশ দেখায়, যে সত্য প্রকাশ করে, আসল সৌন্দর্য্যের আধার আছে সেইখানেই। সুন্দর-কি? ভাব ও সত্য।

চিত্রে-ভাস্কর্য্যে যেমন নক্সা, সাহিত্যে তেমনি লিখন-ভঙ্গী আছে। চেষ্টাকৃত লিখন-ভঙ্গী ভাল নয়। যে বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইতেছে, যে আবেগ প্রকাশ করা হইতেছে অন্য সব দিক হইতে নিবৃত্ত করিয়া পাঠকের চিত্তকে যে লিখন-ভঙ্গী কেবল তাহাদেরই প্রতি কেন্দ্রীভূত করিতে পারে, শ্রেষ্ঠ বলা যায় সুধু সেই লিখন-ভঙ্গীকে।

যে শিল্পী আপন নক্সা লইয়াই আড়ম্বর প্রকাশ করেন, যে লেখক আপন লিখন-ভঙ্গীর দিকেই লোকের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লালায়িত, তাঁহাদের মধ্যে কোন পদার্থ নাই। এ কেমন? না, সৈনিক যেন লাল-টুকটুকে জামা পরিয়া দেমাকে-ডগমগ—কিন্তু লড়ায়ে যাইতে নারাজ; চাষা যেন আপনার লাঙ্গলখানাকে কেবল মাজিয়া-ঘষিয়া চক্চকে করিতেই ব্যস্ত,—কিন্তু তা-দিয়া মাটি চষিতে প্রস্তুত নয়!

সুন্দর রচনা-ভঙ্গী, সুন্দর নক্সা বা সুন্দর বর্ণ বলিয়া একটা-কিছু নাই। কোন নক্সা বা রচনা-ভঙ্গী, যথার্থ সুন্দর হইলেও, বিশেষ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য-বোধের অবকাশ তোমার থাকে না; কারণ, তাহার মধ্য দিয়া যে ভাব অভিব্যক্ত হয়, তোমার চিত্ত তাহাতেই মুগ্ধ ও মগ্ন হইয়া থাকে। একজন প্রতিভাধর লেখক বা শিল্পীর রচনায় যখন অপূর্ব্ব সত্য, প্রগাঢ় ভাব ও গভীর কল্পনা আত্মপ্রকাশ

করে,—তখন বুঝিতে পারা যায় যে, সেই লিখন-ভঙ্গী অথবা নক্সা ও বর্ণ নিশ্চয়ই সুন্দর;—কিন্তু এ-সব গুণ সুধু সত্যেরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র।

র‍্যাফেলের নক্সার সুখ্যাতি করে সবাই এবং সে সুখ্যাতিও নিরর্থক বলি না। কিন্তু কেবল নক্সা ও রেখা-সন্নিবেশের কৌশলের জন্য তাঁহাকে বাহবা দেওয়া ঠিক নয়। তাঁহার নক্সা যে অর্থ প্রকাশ করে সুখ্যাতি করিতে হইবে তাহাকেই। র‍্যাফেলের হৃদয়-মধ্যে যে অগাধ প্রেম ছিল—যাহা নির্ঝর-ধারার মত বিশ্বপ্রকৃতির উপরে ঝরিয়া পড়িত, র‍্যাফেলের নক্সায় তাহারই অপূর্ব্ব-মধুর বিকাশ দেখা যায়। যাঁহারা র‍্যাফেলের প্রাণ পান নাই, অথচ তাঁহার নক্সার নিখুঁত রেখা ও পাত্রপাত্রীর ভঙ্গিমার নকল করেন, তাঁহারা অবুঝ ও আনাড়ির কাজ করেন।

মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সায় সুধু তাহার রীতি, তাহার পাত্রপাত্রীর দেহে মাংসপেশীর নিপুণ সমাবেশ দেখিয়া আহা-মরি করিলে চলিবে না,—দেখিতে হইবে তন্মধ্যে প্রকাশিত ভাব ও কল্পনার দুর্ব্বার বেগ ও তেজ। এটুকু না-বুঝিয়াই যাহারা এঞ্জিলোর নক্সার নকল করিতে বসিয়া যায়, তাহারা সুধু দশের মাঝে হাস্যাস্পদ হয়।

মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সা

জগতে, ললিতকলার এমন-কোন নিদর্শন বোধহয় নাই, যাহা সুধু রেখা ও বর্ণের সমাবেশে আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ করিতে পারে। তা-বলিয়া মনে করিয়ো না যে, রেখা ও বর্ণকে আমি অবহেলা করিতে বলিতেছি। নক্সায় যে শিল্পীর হাতের কায়দা নাই, তিনি ভাব ও কল্পনার রাশ কিছুতেই সামলাইতে পারিবেন না। এরূপ শিল্পী নির্ব্বোধ ঘোড়-সওয়ারের মত, যে ঘোড়াকে চালাইতে চায় কিন্তু দানা-পানি দেয় না।

বর্ণ ও রেখার রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ, তাহাই হইতেছে ভাবের ঘরের তালা-চাবির মত। এদিকে-অপটু শিল্পী যখন লোকের মর্ম্মস্পর্শী ছবি আঁকিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদে ফুলিয়া ওঠে আসলে হয়ত তখন তাহার অক্ষমতা দেখিয়া দর্শকেরা হাসি সামলাইতে পারে না। ছবিতে মানুষের হাত যদি বেখাপ্পাগোছের ছোট-খাটো হয়, পা যদি বেজায় ট্যাড়া-বাঁকা হয়, পারিপ্রেক্ষিত যদি ঠিক্‌ঠাক্ না হয়, দর্শকের মন তবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবেই। —আদত্ কথা হচ্ছে এই, বিজ্ঞানই হচ্ছে শিল্পের প্রাণ।

সুধু রেখা লইয়া যাহাদের আড়ম্বর, রঙের উপরে রঙ লেপিয়া যাহাদের বাহাদুরি; অথবা লেখায় বড়-বড় লম্বা-চওড়া শব্দ বসান যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের আদর মুদীর দোকানে, অসভ্যের বৈঠকে। সহজ সরলতার সহিত রেখা টানিতে, রং দিতে ও লিখিতে পারাই হচ্ছে সব-চেয়ে শক্ত কাজ।

* *

রোঁদা ও পল একদিন শিল্পশালা দর্শন করিতে গিয়াছেন। সেখানে বিখ্যাত ভাস্কর Houdon-এর গঠিত নামজাদা লোকের কতগুলি আবক্ষ মূর্ত্তি সাজান ছিল।

ভল্‌টেয়ারের মূর্ত্তির সুমুখে দাঁড়াইয়া রোঁদা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি আশ্চর্য্য! এ যে মূর্ত্তিমন্ত দ্বেষ-হিংসা! দেখ! ইঁহার বক্রদৃষ্টি যেন-কোন শত্রুর ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করিতেছে। এঁর সূক্ষ্মাগ্র নাসা যেন শৃগালের মত;—কোথায় দোষ, কোথায় ত্রুটি ইনি যেন তাহারই ঘ্রাণ লইতেছেন। দেখিলেই মনে হয়, এঁর নাক যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। আর ঐ মুখ—ও যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা; মনে হয় মূর্ত্তির ওষ্ঠাধর হইতেও যেন অস্পষ্টস্বরে ব্যঙ্গবাণী বাহির হইতেছে!

ভলটেয়ারের এই রুগ্ন, অপুরুষোচিত ও জীবন্ত মূর্ত্তিটি দেখিলেই বুঝা যায়, ইহা কোন সুচতুর বৃদ্ধ জল্পকের চেহারা।"

ভলটেয়ার

খানিকক্ষণ ভাবিয়া রোঁদা বলিলেন, "মূর্ত্তির চোখদুটি কি অপূর্ব্ব, কি স্বচ্ছ! এই আশ্চর্য্য চোখের কথা যখন-তখন আমার মনে পড়ে। Houdonএর সকল মূর্ত্তির উপরেই ঠিক এই কথা বলা চলে। এমন

স্বচ্ছ, জীবন্ত চোখ গড়িতে আর কাহাকেও দেখি না। Houdon যত মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, সকলেরই চোখের ভাব কতটা আলাদা বল দেখি! Houdon চোখ দেখিয়া প্রাণ বুঝিতেন,—চোখ তাঁহার কাছে কোন কথাই ঢাকিতে পারিত না। সুতরাং আদর্শের সঙ্গে এ-সব মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, এটা জানিতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র।"

—এইখানে রোঁদাকে বাধা দিয়া পল বলিলেন, "তাহাহইলে, আদর্শের সঙ্গে প্রতিমূর্ত্তির সাদৃশ্য থাকা আপনি দরকার মনে করেন?"

—"নিশ্চয়ই। খুব দরকার।"

—"কিন্তু অনেক শিল্পী বলেন, ঠিক আদর্শের মত দেখিতে না হইলেও প্রতিমূর্ত্তি ভাল হইতে পারে। Henner একবার এক মহিলার ছবি আঁকিয়াছিলেন। কিন্তু মহিলাটি সে ছবি দেখিয়া আপত্তি করেন যে, ছবির সঙ্গে তাঁহার চেহারার মিল নাই। Henner তাঁহার গ্রাম্যভাষায় উত্তর দিলেন, "ঠাকরুণ, তুমি মরে গেলে তোমার ছেলেপুলেরা এই ভেবেই খুসি হবে যে, তারা Henner-এর আঁকা একখানি চমৎকার ছবি পেয়েছে; এ ছবিতে তোমার চেহারা ঠিক হয়েছে কিনা, এ-কথা নিয়ে তারা খুব কমই মাথা ঘামাবে!"

রোঁদা বলিলেন, "হতে পারে Henner এমন কথা বলিয়াছিলেন! কিন্তু এ সুধু কথার-কথা মাত্র—তাঁর মনের আসল ভাব নিশ্চয়ই এমনধারা ছিল না। কারণ, Hennerএর মত একজন প্রতিভাবান শিল্পী যে আর্ট-সম্বন্ধে এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করিতেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু সব-প্রথমে আমাদের বুঝিতে হইবে, প্রতিমূর্ত্তিতে কিরূপ সারূপ্য থাকা দরকার।

যদি কোন শিল্পী ফটোগ্রাফীর মত কেবল বাহিরের চেহারার হুবহু নকল করিয়া যান, অথচ ভিতরের ভাবের কোন ধার-না-ধারেন, তবে তাঁহার প্রশংসা হইবে না। যাহার মূর্ত্তি অঙ্কিত বা গঠিত হইতেছে, প্রতিমূর্ত্তিতে তাঁহার চরিত্র-সাদৃশ্য থাকা চাই;—দরকার সুধু এইটুকু; বাহিরের চেহারার আড়ালে চিত্রকর বা ভাস্করের অন্বেষ্য,—চরিত্র-সাদৃশ্য এককথায়, প্রতিমূর্ত্তির সমস্ত অবয়ব ভাবাভিরাম হওয়া উচিত।"

—"আচ্ছা, এমন-কি কখনো-কখনো দেখা যায় না যে, বাহিরের চেহারার সঙ্গে স্বভাবের বেমিল হইয়াছে?"

—"তা কখনো হয় না। আপাতদৃষ্টি মাত্র যাহাদের সম্বল, মুখ দেখিয়া তাহারাই ঠকিয়া যায়—স্বভাবের আন্দাজ করিতে পারে না। কপটতার মুখোস খুলিয়া সত্য আবিষ্কার করা—এ হচ্ছে শিল্পীরই কাজ।

প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন বা গঠন করিতে গেলে যতটা মর্ম্মবোধের আবশ্যক,—ললিতকলায় আর কোন কাজে ততটা নয়। সময়ে-সময়ে একটা কথা শুনি, শিল্পকর্ম্মে মানসিক শক্তির চেয়ে নাকি হস্ত-নৈপুণ্যের সার্থকতা বেশী। তুমি যদি কোন ভাল আবক্ষ মূর্ত্তি পরীক্ষা কর, তবে বুঝিবে এ উক্তি কতটা মিথ্যা! দৃষ্টান্তস্বরূপ Houdonএর মূর্ত্তিগুলিই

দেখ। এগুলির এক-একটি যেন লিখিত জীবনচরিতের এক-একটি পরিচ্ছেদ। কাল, বংশ, জীবিকা ও ব্যক্তিগত চরিত্র—প্রতিমূর্ত্তিগুলি হইতে এ-সমস্তই জানা যায়।

মিরাবো

মিরাবোঁর মূর্ত্তির কথাই ধর। উগ্র প্রকৃতি,—মাথার পরচুলা উস্কখুস্ক, কাপড়-চোপড় এলমেল; বিদ্রোহের ঝটিকায় এই ভীষণস্বভাবের লোকটি যেন নিশ্বসিয়া নিশ্বসিয়া উঠিতেছে—যে-কোন মুহূর্ত্তে এ সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিতে পারে!

বংশ।—ভাব-ভঙ্গি প্রভুত্বসূচক, ভ্রূদুটি সুবঙ্কিম, উদ্ধত ললাট; এ-সবই, লোকটির কুলীনবংশের প্রমাণ। কিন্তু বসন্তের ব্রণ-চিহ্নিত গণ্ড ও দুই স্কন্ধের মধ্যদেশে প্রবিষ্ট কণ্ঠ, ইঁহার প্রজাতান্ত্রিক চিত্তের পরিচয় দিতেছে।

জীবিকা ঃ—বিচারপতি; নিজের বাক্য সকলের কর্ণগোচর করিবার জন্য মুখ যেন বাহির হইয়া আছে। ইঁহার মস্তক উন্নত; কারণ, সাধারণত অধিকাংশ বক্তার মত ইনিও খর্ব্বাকৃতি। ঢেঙ্গা না হইলেও এ ধরণের লোকের কোমর আর বুক বেশ পূরন্ত হইয়া থাকে। মূর্ত্তির চক্ষুদুটি কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি স্থির হইয়া নাই,—তাহারা যেন এক বিরাট জনতার উপরে ইতস্তত ঘুরিতেছে। দৃষ্টি অনিশ্চিত, কিন্তু গর্ব্বিত।

ব্যক্তিগত চরিত্র ঃ দেখ, ঠোঁঠদুটিতে ইন্দ্রিয়াশক্তির ছাপ্ আছে; চিবুক ভাঁজ-করা, নাসারন্ধ্র যেন কম্পমান; ইঁনি লম্পট এবং জীবনকে উপভোগ করিতে অভিলাষী; স্বভাবের এ-সব দোষ মূর্ত্তিতে একেবারে স্পষ্ট।

Houdonএর সকল মূর্ত্তি হইতেই এইরূপ চরিত্র-চিত্র দেওয়া যায়।"

পল বলিলেন, "অপরের মনের ভিতরে এমন গভীরভাবে ঢুকিতে পারা ভারি শক্ত।"

—"হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে আসল মুস্কিল হইতেছে, তাঁহার মক্কেল—যাহার মূর্ত্তি তিনি গড়েন। প্রতিমূর্ত্তিতে যাহারা আপনাদের চেহারার সাদৃশ্য চায়, শিল্পীকে বিশেষ করিয়া তাহারাই বিষম ফ্যাসাদে ফেলিয়া থা.ক। নিজেকে ঠিক নিজের মতই দেখে, এমন লোক খুব কম; আবার, যে আপনার স্বরূপ বোঝে, সেও চায় না যে শিল্পী তাকে ঠিক তেমনি ভাবেই ফুটাইয়া তুলেন। মানী চায়, ছবিতে যেন তার মানের পরিচয় থাকে—চরিত্র

ফুটুক-না-ফুটুক, সেদিকে তার কোনই মাথা-ব্যথা নাই।

এইজন্যই অনেক সামান্য পটুয়াও বেজায় নাম কিনিয়াছে। তাহারা তাহাদের মক্কেলের যে ছবি আঁকিয়াছে, স্বভাবের সঙ্গে তার কিছুই সম্পর্ক নাই—তাতে আছে সুধু সোনার ঘড়ী, হীরার আংটি, জরির জুতা! এ-সব শিল্পীর আদরও খুব; কারণ, তারা কারুর স্বরূপ না দেখাইয়া জাঁকজমক, শোভা-সম্পদের দিকটাই ভাল করিয়া দেখায়। প্রতিমূর্ত্তিতে যত আড়ম্বর থাকিবে, তাহা যতই সাজানগুজানো পুতুলের মত দেখাইবে, মক্কেলেরা ততই খুসী হইয়া শিল্পীকে বেশীরকম বথ্‌শীষ দিবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মাতৃভাষা কি পেত্নী ভাষা?

ভূতকালের ভাষাকে ভূত বল্‌লে প্রভূত রসিকতা হয় কিনা জানিনি, তবে আভিধানিক অর্থে অন্তত কথাটা সার্থক হয়। কিন্তু যা' প্রকৃত মাতৃভাষা,—যা' মাতৃজাতির কাছ থেকে কোটি কোটি বঙ্গ-সন্তান পীযূষের সঙ্গে আজো প্রত্যহ গ্রহণ করচে, এক-হিসাবে 'ধিয়ো য়ো ন প্রচোদয়াৎ, যা' আমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তিকে লালন করছে সেই মাতৃস্থানীয়া মাতৃরূপিণী দেশ-ভাষাকে পেত্নীভাষা বল্‌লে এক-রকম নিজের মায়েরই অপমান করা হয়।

যিনি স্বদেশের ভাষা-বিজ্ঞান আলোচনা করতে বসেছেন, তাঁকে মাতৃজাতির পায়ের কাছে বসে ভাষা শিখতে হবে, তথাকথিত ইতর-সাধারণের কথা কানে তুলতে হবে, অর্থাৎ স্ত্রী-শূদ্রের কাছেই সাকৃরেদি করতে হবে; কারণ ত্রয়ী তাদের শ্রুতিগোচর হয়নি এবং গুঙ্কারে, অনুস্বার ও বিসর্গের তিন তিন প্যাঁচে কান একেবারে বিগড়ে যায়নি। এই-রকম করতে পারলে তবেই বাংলা ভাষার যথার্থ ভিতরকার সূত্রগুলি ধরা পড়বে। নইলে যাঁরা গোঁফ-কামিয়ে মা সেজেছেন সেই টুলো সরস্বতীদের মা-সরস্বতী মনে ক'রে, তাঁদের ভাষাকে মাতৃভাষার মন্দিরে ঘণ্টা নাড়তে দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

কারণ ষত্ব-নত্ব-ওয়ালারা খাঁটি বাংলার পুতনা-স্বরূপ। ওঁরা মা সেজে এসেছেন বটে, কিন্তু স্তন্য বলে যা' সাত-কোটি বাঙালীর মুখে দিতে উদ্যত হয়েছেন তা একেবারে বিষ। কারণ তা কথ্য ভাষা নয়, একেবারে অকথ্য, দুরুচ্চার্য্য; তা চল্‌তি নয়, একেবারে অচল; তা রীতিমত ব্যাভার করলে মিউজিয়মে জায়গা হবে,—লোকালয়ে নয়। ওঁদের খাঁটি বাংলার অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত হয়নি, অথচ ওঁরা ব্যাকরণের সম্বন্ধে অনর্গল কলমবাজী ও গলাবাজী করে চলেচেন। অথচ যে-সংস্কৃতের সঙ্গে যোগ-রাখবার জন্যে কচি ছেলেদের ঘাড়ে হ্রস্ব-দীর্ঘ

ষত্ব-নত্বের বোঝা চাপাচ্চেন, সেই সংস্কৃত যখন উচ্চারণ করচেন, তখন হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত টিট্‌কারী দিয়ে হো-হো-শব্দে হেসে উঠচে। এর কারণ, গোড়ায় গলদ থেকে যাচ্চে। সংস্কৃতের তদ্ভব ও তৎসম শব্দগুলি লেখ্‌বার বেলায় মাছি-মারা কেরানীর মত নকল করা হচ্ছে অথচ বল্‌বার বেলা বাংলার বাগ্‌দেবতা বাঙালীর ছেলের বাগ্‌যন্ত্রকে যেমনটি করেচেন ঠিক তারই বশে চলতে হচ্ছে। তব্‌লায় সেতারের গৎ বাজানো যাচ্ছে না। অথচ যদি আমরা উচ্চারণের অনুযায়ী বানান লেখবার ও পড়বার অভ্যাস করতুম তো সংস্কৃতও সহজে ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারা যেত, বাংলাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচত।

বাংলা সংস্কৃতে যে প্রভেদের অন্ত নেই, যাঁরা একটু মনোযোগ দিয়ে দুটো ভাষা আলোচনা করেছেন, তাঁরাই এ-কথা স্বীকার করবেন। প্রথম স্বর-ব্যঞ্জনের কথাটা নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক্‌। একটু ধীরভাবে বিচার করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, বাংলায় এমন স্বর নেই যা হসন্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনরূপে ব্যাভার না হয়েছে। কৃত্তিবাস থেকে, এমন কি শূন্যপুরাণ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত এমন লেখক কেউ হন নি যিনি বাংলা স্বরের বর্ণসঙ্কর মূর্ত্তি না দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ গোটাকত এইখানে বল্‌ছি—

"আপন ইচ্ছাএ্‌ যাএ্‌ ঘোড়া জেথা লএ্‌ মন।"

—উত্তরকাণ্ড (কৃত্তিবাস)।

"তাহা সঙরনে হারাইল-ধন পাএ্‌ লোকে।"

—ঐ।

"হাথে হাথ মোচড়ে ওষ্ঠ কামড়াঅ্‌ দন্তে।"

—ঐ।

"চউদিকে জঅ্‌ জঅ্‌ কোলাহল হঅ্‌"

—শূন্যপুরাণ।

"বাজাআ্‌ জঅ্‌ ঢাক মেঘের মত ডাক

—শূন্যপুরাণ।

"ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর জাহার তনএ্‌"

—ঐ।

বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দও এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির প্রথম তিন তিন চরণে চার চার মাত্রা (Syllable)। মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দে মাত্রা=স্বরযুক্ত বর্ণ +তৎপরস্থিত হসন্ত বর্ণ; যেমন—

মাতৃধনের | অংশ গেলে |
কার্ কাছে মা | যাব |
পিতৃধনে | অংশী হ'লে |
ছাই্‌ আছে তাই্‌ | পাব |

—ঈশ্বর গুপ্ত

এর মাত্রা ভাগ করলে এই রকম দাঁড়ায়—

মাৎ+ঋ+ধ+নের্। অং+শ+গে+লে।
কার্+কা+ছে+মা | যা+ব ——।
পিৎ+ঋ+ধ+নে | অং+শী+হ+লে |
ছাই্‌+আ+ছে+তাই্‌—পা+ব ——।

এতেও 'ছাই' ও 'তাই' শব্দের ই স্পষ্টই হসন্ত বা ব্যঞ্জন-ভাবাত্মক।

আরও দেখুন—

ছোট বউ্‌ লো | রান্না চড়া।
বড় বউ্‌ ব- | ড়ালের ঝি।

—প্রাচীন ছড়া।

রাই্ উঠেছেন | রাই্ উঠেছেন |
বুড়ি গঙ্গার | ঘাটে
কার হাতে রে | শাঁখা সিঁদুর |
দাও্ গে রায়ের | হাতে
—ব্রতকথা।

যে রত্ন নাই্ | রত্নাকরে
ঘরে বসে | পেই্ ছি করে
পদ্মযোনির | হৃৎপদ্মের ধন
—দাশুরায়।

হায় কি হ'ল | হেম নবীনের্ |
নাই্ক জারি | জুরি
—হেমচন্দ্র।

রুদ্র ওগো | দুঃখে সুখে |
এই্ কথাটি | বাজল বুকে |
তোমার প্রেমে — আঘাত আছে |
নাই্ক অব | -হেলা |
—রবীন্দ্রনাথ।

গীতার মতন | নাই্ক শাস্ত্র |
গীতার পুণ্যে বাঁচি |
—দ্বিজেন্দ্রলাল।

যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া গেল তার সকল গুলিরই হসন্ত-চিহ্নিত স্বরের প্রতি নজর করলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। যেমন শেষ-দৃষ্টান্তটির গীতার 'র' এবং 'নাইক'শব্দের 'ই' দুই তুল্যমূল্য, দুইএরি এক ওজন, দুই হসন্ত। আমাদের এই হসন্ত স্বর চাওয়ায় আছে, পাওয়ায় আছে; লুকো-ছাপা হয়ে কেবল যে ঝিউ্ড়ি বউ্ড়ির দলে ভিড়ে আছে তা নয়, একেবারে খাস দেউ্ড়িতে রয়েছে। এমন কি গোলাপি রেউ্ড়ীর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ফিরছে। যজ্ঞিবাড়ীতে কেও্ড়া জলের সঙ্গে মিশে হাজার হাজার ভদ্রলোকের পিপাসা দূর করছে।

যখন "আমি খাই্" বা "তুমি খাও্" বা "সে খাএ্"* তখন ঐ বর্ণমালার বর্ণসঙ্কর-গুলো আমাদের জাত মারবার জন্যে আমাদের পাত ছুঁয়ে নিতান্ত ন্যাও্টোভাবে বসে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলায় স্বর-ব্যঞ্জনে বড় একটা প্রভেদ নেই। স্বরবর্ণ অক্লেশে ব্যঞ্জনের মত ব্যাভার হ'য়ে থাকে। আর শুধু বাংলাতেই বা কেন, সিন্ধী, কাশ্মিরী, মৈথিলী ও দ্রবিড় ভাষাতেও শেষের 'ই' 'উ' 'ও' হসন্ত-রূপেই অর্দ্ধো-চ্চারিত হ'য়ে থাকে। বাংলাতে অধিকন্তু সময়ে-সময়ে মাঝের 'ই' 'ও' প্রভৃতিও হসন্ত হয়। যেমন "সেঁউ্তি"র 'উ' 'মাইতি'র 'ই' 'আও্তা'র 'ও' ইত্যাদি। সংস্কৃত-ভাঙা এতগুলো প্রাদেশিক ভাষায় যে এই বর্ণসঙ্করের পশার বেড়েছে, বিদেশী হ'লেও পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন্ তা জানেন। কিন্তু আমাদের পুনুকে-পাণিনি বা হবু-বোপদেবেরা সে খবর রাখেন বলে বোধ হয় না। এখন, বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনের যদি বিশেষ-কোনো পার্থক্য না-ই থাকে, তবে তথাকথিত স্বরবর্ণে ব্যঞ্জনের ফলা না বিঁধব কেন? পাই্কারী শব্দটা যদি কেউ পাইক্কারী লেখে বা বানান করবার সময় 'প'-এ আকার 'ই'তে কফলা আ-কার,

---

* 'খায়'-এর য় আধুনিক উৎপাত। উত্তম ও মধ্যম পুরুষে যখন হসন্ত স্বর এখনও চলচে তখন প্রথম পুরুষে আপত্তি কিসের ?

'র' এ দীর্ঘ ঈ বলে তাতে ক্ষতি কি? আর স্বরবর্ণে আকার লাগানো? সেতো আমাদের সনাতন রীতি। অকারের গায়ে আকারের মাত্রা লাগিয়ে আমরা আকারের সৃষ্টি করেছি অথচ বাংলা অ একেবারে সংস্কৃত অ নয়। তা'ছাড়া হিব্রুর মতন বাংলা যদি স্বর অস্বীকার করে তাতেই বা কি? স্বরের বদলে যদি স্বর-তন্মাত্র "কামেৎ" "শুরেক" "ফত্া" "কস্‌রা" বা "জবর" "জের"এর মত 'ি' 'ু'র নোক্তা লাগালেই চলে, ত চলুক না। এ বিষয়ে প্রকৃতই যদি বাংলা, শেমিটিক্ ভাষার অনুরূপ হয় তবে সংস্কৃতের সামগানে তা ঢাক্‌লে চল্‌বে না।

এইবার 'ঙ' 'ঞ'-র কথা। ছেলেবেলায় শুনেছিলুম="ক খ গ ঘ আনো গুরু মশায়ের টিকি ধরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। 'আনো' না হোক আমাদের 'ঙ'-টি যে জিহ্বামূলীয় ন এবং ঞটি তালব্য ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং দন্ত্য ন এবং মূর্দ্ধন্য ণ যখন স্বাধীন তখন তালব্য ন (ঞ) আর জিহ্বা-মূলীয় ন (ঙ) স্বাধীনভাবে ব্যাভার না হবে কেন? বিশেষত ছন্দে যখন গোলোযোগের সম্ভাবনা ঘটে তখন 'ঙ' এবং 'ঙ্গ'-টা উচ্চারণের অনুযায়ী আলাদা ক'রে রাখাই উচিত, গাঙে আর গঙ্গায় একাকার হ'লে পরকালে মহা মুস্কিল।

আসামে 'ঙ'র ব্যাভার আছে। 'ডাগর' না লিখে অসমীয়া ভাষায় 'ডাঙর' লেখা হয়। আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া-যেতে পারে কিন্তু স্থানাভাব। বাংলা বৈষ্ণব কবির "শাঙন" রাতির সঙ্গে কোন্ কাব্য-রসিকের পরিচয় নেই?

আর 'ঞ'র জন্যেই বা লঙ্কা ডিঙোতে হবে কেন তা তো বুঝ্‌লুম না। ক্রিয়ার শেষে প্রচীনকালের বাংলা ভাষার মতন নেপালি-ভাষায় এখনো 'য়'র জায়গায় বিকল্পে 'ঞ' লেখা হয়ে থাকে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে তো 'ঞ'র ছড়াছড়ি। যাঁরা কাশ্মীরী কবি রাজদানের "শিব-পরিণয়" পড়েছেন তাঁরা সকলেই একথা জানেন। আর ঐ কাব্য যখন কোল্‌কেতার এসিয়াটিক সোসাইটি থেকেও ছাপা হয়েছে তখন প্রত্নতাত্ত্বিক মশায়দের তো আগে জানা উচিত।

তবে, প্রত্নতত্ত্ব বেশীদিন আলোচনা করলে, বোধ হয় আর-কিছু নতুন আলোচনা করবার ফুরসুৎ থাকে না, কারণ তখন চারদিকেই প্রত্ন, চারদিকেই পেত্নী ব'লে ভ্রম হতে থাকে, এমন-কি যা সব-চেয়ে প্রাণের দ্বারা ওতঃপ্রোত, যা লক্ষ জিহ্বাকে অহরহ স্পন্দিত করছে সেই জীবন্ত মাতৃ-ভাষাকেও পেত্নী ভাষা বলে মনে হয়। আর 'হয়ে' 'ক'রে' প্রভৃতি প্রত্যেক ক্রিয়ার পিছনে 'ইয়া' 'ইয়া' লেজুড় জুড়ে নিজেদের ক্রিয়াবান পুরুষ বলে ঘোষণা করবার প্রবৃত্তি হয়। লঘু ক্রিয়ার জন্যেও বহ্বারম্ভ করতে হয়। সর্ব্বনামের বুকের পাঁজরে অকারণে সর্ব্বনাশের হাহা-কার ধ্বনিত করে তুলতে হয়, 'যার' 'তার' জায়গায় 'যাহার' 'তাহার' লিখে খামকা পুঁথি বাড়ানো অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। কারণ ঘোরালো না হলে, ঐতিহ্যের পেট না ভরলে, মোটকথা রচনা শব্দাড়ম্বরে মনুমেণ্টাল্ না হলে আমাদের পাণ্ডিত্যাভিমানী মনুসন্তানদের কিছুতেই মন ওঠে না।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

মাসকাবারী

নারী-সম্মান

আষাঢ়ের মানসীতে সুকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, Chivalry ব্যাপারটা বিদেশের আমদানি নয়, ভারতেও আগে তাহার অভাব ছিল না। কথাটা লইয়া সাহিত্যে আগেও অনেক নাড়াচাড়া হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে, ধরিতে গেলে একমাত্র রাজপুত-জাতির মধ্যেই য়ুরোপীয় Chivalryর মত উচ্চ ভাব ছিল। কিন্তু যতীন্দ্রবাবু তাহা দেখাইতে পারেন নাই। তাছাড়া, ভারতের অতীত কালে যে-শ্রেণীর নারী-সম্মান বর্ত্তমান ছিল, তাহা ঠিক Chivalryর মত নয়,—তাহার আদর্শ আরও উচ্চ। য়ুরোপের সঙ্গে সকল সময়ে ভারতের তুলনা করা, আমাদের একটা মারাত্মক বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; য়ুরোপের দোষ-গুণই কি ভারতের দোষ-গুণের মাপকাটি,—য়ুরোপই কি ভারতের আদর্শ? যে Chivalryর কথা লইয়া য়ুরোপে-ভারতে তুলনা করা হয়, সেই Chivalryর আদর্শই য়ুরোপে যতটা কাল্পনিক ছিল ততটা বাস্তবিক ছিল না। এ-কথা অনেক পাশ্চাত্য লেখকের মুখেই শুনিতে পাই। যেমন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিতেছেন :—"The practice of chivalry fell even more sadly short of its theoretic standard than practice generally falls below theory." (Subjection of women.) "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা' —বড় জোর কথা"—তাতে সন্দেহ করি না; কিন্তু 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' নারী-মর্য্যাদার চরম মন্ত্র"—এ উক্তির তলায় ত কিছুতেই ঢ্যাঁরাসই দিতে পারিলাম না। 'গীত-গোবিন্দে'র ঐ এক লাইন পড়িয়াই নারী-মর্য্যাদায় পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইবার কোন হেতু নাই; কারণ, সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—

> "স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরশি মণ্ডণং
> দেহি পদপল্লবমুদারং।
> জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো
> হরতু তদুপাহিতবিকারং॥"

এ ত রতি-পূজার চরম মন্ত্র!—"নারী-মর্য্যাদার চরম মন্ত্র" যদি ইহাই হয়, তবে এমন সম্মানে যে-কোন মহিলা লজ্জায় মুখ ঢাকিবেন। এখানে নারীর যৌবনের সম্মান থাকিলেও তাঁহার নারীত্বের কোনই মর্য্যাদা নাই; তবে যতীন্দ্রবাবু যদি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ফাঁদিয়া বসেন,—সে আলাদা কথা।

"সৌন্দর্য্য যাহার শক্তি, কোমলতা যাহার কান্তি, লজ্জা যাহার সম্পদ, মনো-হরণ যাহার মনোবৃত্তি এবং অশ্রু যাহার আয়ুধ" যতীন্দ্রবাবুর মতে, তিনিই "নারী-দেবতা"।—পাঠক দেখিবেন, যিনি নারীর সম্মান-প্রতিষ্ঠার জন্য কলম ধরিয়াছেন, তিনিও নারীকে রতি-রূপেই আঁকিয়াছেন, অন্নপূর্ণা-রূপে আঁকেন নাই। এ বাঙ্গলা দেশে নারী-সম্মানের কথা তুলিলে পত্নীপূজার কথাই বুঝি সহজে মনে আসে—মাতৃপূজা

কেউ জানে না। এখন যিনি নারী-সম্মানের ওকালতি করিতেছেন তাঁরও শ্রদ্ধাবৃত্তির দৌড় ঐ পর্য্যন্ত; কিন্তু সেকালের সবাই এ তন্ত্রের নয়! তখনকার মহানির্ব্বানতন্ত্র বলিতেছেন, "ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ ক্কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।"

যতীন্দ্রবাবু "নারী-সম্মানে"র আর-এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দিরাছেন। বৃন্দাবনে দোল-লীলার সময়ে 'লাঠ্‌মার হোলী' নামে এক উৎসব আছে। লেখক উৎসব-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "পুরুষেরা কেহ বা কোন রমণীর অঙ্গে ফাগ দিতেছে, কেহ বা কোন তন্বঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বসন্ত-লীলারসমধুর গ্রাম্য গীতাংশ গাহিয়া কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া মারিতেছে, অমনি সে কোপিনী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বিদ্রূপ রোগের সুকঠিন 'লাঠ্যৌষধে'র ব্যবস্থা করিতেছে। * * * পুরুষের প্রাণবিয়োগও ঘটিতেছে, তথাপি চিরপ্রথাগত নারীমর্য্যাদারীতির অমর্য্যাদা ঘটিতেছে না।"—এই কি নারী-মর্য্যাদার চিত্র? বৃন্দাবনে হোলীর 'গ্রাম্যগীত' আমরা শুনিয়াছি;—সে গান এত অশ্লীল যে, বলিয়া বুঝানো অসম্ভব। বৃন্দাবনের হোলীর গানে রমণীর রমণীত্বে যে বিষম কলঙ্ক মাখানো হয়, এ-যুগে যমুনার বিশীর্ণ ধারায় তাহার ছাপ্ উঠিবে না।

তারপর, "আনন্দের এই দ্বন্দযুদ্ধে, প্রতিদ্বন্দী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দুর্ব্বল পক্ষকেই জয়ের যাবতীয় সুবিধা-সুযোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে।"—অতএব, নারীর কি সম্মান!

কিন্তু, যতীন্দ্রবাবু কি এটুকু বুঝেন নাই, এরূপ সুবিধা দেওয়ায় দুর্ব্বল পক্ষের প্রতি সবলের যতটা অনুগ্রহ জাহির হইয়াছে, ততটা মর্য্যাদা দেখানো হয় নাই? খেলা-ধূলায় সবল অনেকসময়ে দুর্ব্বলকে সাধ-করিয়া জিতিতে দেয়, চলিত কথায় যাকে আমরা বলি 'বেলেখেলা'! আবার, শিশুর হাতে আমরা যে সখ-করিয়া মার খাইয়া থাকি, তাতে কি শিশুর শক্তির মর্য্যাদা বাড়িয়া যায়?

দুঃখের বিষয়, যতীন্দ্রবাবু "নারী-সম্মান" লিখিতে বসিয়া মহিলার প্রতি সম্মানের পরিচয় যত-না দিয়াছেন অপমানের পরিমাণ তার-চেয়ে ঢের বেশী করিয়া ফেলিয়াছেন।

* *
*

কবিতার প্রাণ

"ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনে"র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রাণপণে "কবিতার প্রাণ" আবিষ্কার করিতে গিয়া পাঠকের প্রাণান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাচীন ও আধুনিক অনেক কবির কাব্য লইয়া তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহা সমালোচনা নয়—অপগণ্ডের গণ্ডগোল মাত্র! লেখক একস্থানে বলিতেছেন:—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"

এই কবিতাটী শিশুপাঠ্য হইলেও এমন মনোরম সরল ও সুন্দর কবিতা এপর্য্যন্তও রচিত হয় নাই।"

ছেলেবেলায় পাঠশালে আমরা এর চেয়েও "মনোরম সরল ও সুন্দর কবিতা" 'শিশুশিক্ষা'র প্রথমভাগে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে; যোগেন্দ্রবাবু এরই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন! যথা—

"কাল কাক, ভাল নাক,
পান খায়, গান গায়,
শিকি চাই, টিকি নাই"—প্রভৃতি।

এখন ভাষার কথা। "সে শিষ্য তুইজন কে তাঁহাদের নাম আপনাদিগকে বলিবার কৌতূহল অনাবশ্যক, তাঁহারা আর কেহই নহেন আমি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর কথা বলিতেছিলাম।"—আশা করি, "সম্মিলনে"র আগামী সংখ্যায় এই বিষম ধাঁধাটির উত্তর বাহির হইবে।

তারপর, অলঙ্কৃত ভাষার বিড়ম্বনা। "তখন নিদ্রিত তুঃখমগ্ন শোকাকুল বঙ্গবাসী দেখিতে পাইল"—প্রভৃতি। 'বঙ্গবাসী' যে ঘুমাইয়াও চোখ খুলিয়া দেখিতে পায়, বাঙ্গালী হইয়াও এ অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। লেখাটির আগাগোড়া এমনি ভাব ও ভাষার বিভ্রাটে ভরা। ভেড়ার লোম কত আর বাছিব?

যাঁহাদের কাব্যজ্ঞানের দৌড় "পাখী সব করে রব" পর্য্যন্ত এবং যাঁহাদের ভাষায় এখনও 'হাতমক্স' শেষ হয় নাই, তাঁহারাও যদি সাহিত্যের উপরে এমন করিয়া দৃষ্টি দেন, তবে বাঙ্গালী পাঠকের জন্য স্বস্ত্যয়ন করা দরকার!

* * *

ছোটগল্প

আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে একটি ছোট গল্প পড়িলাম। গল্পটি একজন বিখ্যাত প্রবীণ লেখকের লেখা। তাহার আখ্যান-ভাগ এই:—

(১)

পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে রমেশ চারিদিক অন্ধকার দেখিল। সংসারে বিধবা বৌদিদি, তাহার স্ত্রী লক্ষ্মী ও পুত্র নারায়ণ। বড় ভাই রোজগারী ছিলেন, যা আনিতেন তাতেই সংসার চলিত। রমেশ লেখাপড়া ভালরকম শিখে নাই,—সে বেকার বসিয়া থাকিত। সংসারের ভার এখন তারই ঘাড়ে পড়িল। শুধু তাই নয়—বসতবাড়ী তৈয়ারি করিতে যে পাঁচহাজার টাকা ধার হইয়াছিল, তার তুই হাজার টাকা এখনো শুধিতে বাকী আছে।

লক্ষ্মী বলিল, "আমার ভাবনা হয়েছে, দিদি আমাদের ফেলে বাপের বাড়ী না যান। তিনি বড় মানুষের মেয়ে, তাঁর কি এত কষ্ট সহ্য হবে। মাসে মাসে তিনি যা হাতখরচ বাপের বাড়ী থেকে পেতেন, তার একটি পয়সাও ত তোমরা তুই বাপ-বেটায় রাখতে দেও নাই। দিদি যদি একটু শক্ত হতেন, তাহলে কি তুমি এমন হতে পারতে? আমি কতদিন এই কথা দিদিকে বলেছি; তিনি হারাধন (রমেশকে তার বৌদিদি এই নামে ডাকিতেন) বল্‌তেই অজ্ঞান। এখন যে সবই গেল।"

(২)

বৌদিদির ভাই মোহিতবাবু রমেশকে পরামর্শ দিলেন, বসতবাড়ী বিক্রী করিয়া ধার শোধ করিতে। বৌদিদি স্বামীর ভিটা-বিক্রয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "যদি না খেয়ে মরতে হয়, তাতেও রাজী আছি; আমি এই বাড়ীর মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। আমি তোমাদের বাড়ী যাব না। আমার গয়না বেচে ধার শোধ দাও।"

মোহিতবাবু বলিলেন, "ওসব কথা আর বলিসনে কমলা! তোর দাদা তুই হাজার টাকা দিয়ে ধার শোধ দিতে পারে।"—মোহিতবাবু মস্ত এটর্ণী। রমেশকে তিনি নিজের আফিসে একটি কাজও দিতে স্বীকার করিলেন।

(৩)

সেইদিন রাত্রেই রমেশের চার-বছরের ছেলে নারায়ণ হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া

উঠিল। তারপর অজ্ঞান হইয়া গেল। ডাক্তারেরা কিছুতেই তার জ্ঞানসঞ্চার করিতে না পারিয়া বুঝিল, জীবনের আশা আর নাই।

রমেশের বৌদিদি স্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন, "তুমিই আমার দেবতা। আমার প্রার্থনা শোন! আমার প্রার্থনা, নারায়ণকে নিয়ে যেতে পারবে না —নিয়ে যেতে পারবে না।"

লেখক বলিতেছেন,—

"তাহার পর যাহা হইল, তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় স্বতই অবনত হয়—আর সতীর মহিমা, বিধবার প্রার্থনার বল দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।"

বিধবার মৃত স্বামী আসিয়া একখণ্ড শিকড় দিয়া অদৃশ্য হইলেন। সেই শিকড় খাইয়া খোকা বাঁচিয়া গেল।

খোকা বাঁচিল, অতএব গল্পও ফুরাইল।

এই লেখাটি পড়িয়া ছোটগল্প-সম্বন্ধে যে দু-চার কথা মনে আসিয়াছে, এখানে তাহাই বলিতে চাই।

ছোটগল্পের লেখক আছেন প্রধানত দু-রকম। এক, যাঁরা সৃষ্টি করেন; আর এক, যাঁরা সুধু ঘটনা-বিবৃতি করেন।

সৃষ্টি করা যাঁহাদের কাজ তাঁহাদের গল্পের মানুষগুলি নিজের চরিত্র-প্রভাবে অগ্রসর হইতে থাকে; যে ঘটনা তাহাদের সামনে আসিয়া পড়ে তাহার গতি ঐ চরিত্রের অনুযায়ী হয় কিম্বা তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপযোগী ঘটনা সৃষ্টি করে। লেখকের দৃষ্টি থাকে যেন ঘটনা ও চরিত্রের সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়। এইরূপে ঘটনার বিকাশ গল্পের মধ্য হইতেই হয় বলিয়া সে ঘটনাকে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। নইলে বাহির হইতে ঘটনা চাপাইয়া দিলে পাঠকের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিবেই। সেই জন্য অলৌকিক কাণ্ড কিম্বা দৈবমহিমা সেখানে স্থান পায় না। এ-শ্রেণীর লেখকেরা জানেন, দৈব—দৈবমাত্র। কেবল দৈবের উপরে যাঁহারা চরিত্র-বিকাশের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা কখনই উঁচুদরের লেখক নন। কারণ, দৈব-সহায়তায় যে চরিত্রের বিকাশ, তাহাতে চরিত্রের মাহাত্ম্য ও লেখকের বাহাদুরী কোথায়?

ঘটনা-বর্ণনা করা যাঁহাদের কাজ তাঁহাদের কাছে ঘটনাই সর্ব্বস্ব। তেমন-করিয়া ঘটনা সৃষ্টি করিতে পারিলে অবশ্য কৃতিত্ব আছে, কিন্তু সৃষ্টি করা ত ইঁহাদের কাজ নয়, গড়গড় করিয়া বলিয়া যাওয়া ইঁহাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য তাঁহাদের বলিবার মুখে অনেক সময় সম্ভব-অসম্ভব বাধে না। কেহ যদি আপত্তি তোলেন যে, এমন ঘটনা অসম্ভব, তাঁহারা জবাব দেন যে সেই ঘটনা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ ডাকিয়া ত গল্পের রসগ্রহণ করা চলে না। গল্পের যা ঘটনা বা ইতিহাস, তার প্রমাণ গল্পের মধ্যেই থাকা চাই; তাহা এমন করিয়া সাজানো চাই যাহাতে পাঠকের মনে সংশয় না জাগিতে পারে। দৈবশক্তিতে বিশ্বাস কিম্বা ঐরূপ কোন জিনিষের উপর বরাত দেওয়া চলে না। অথবা যিনি গল্প লিখিতেছেন তিনি সাধু ব্যক্তি, তিনি কি মিথ্যা বলিবেন?—এ যুক্তিও খাটে না। গল্প পড়িবার সময় বাহিরে কি ঘটে না-ঘটে তা বিচার করিয়া দেখিবার তত দরকার নাই,—গল্পের আবহাওয়ার মধ্যে

সেরূপ ঘটনা সম্ভব কি না তাহাই বিচার্য্য। এই বিচারশক্তির অভাবে আমাদের অনেক গল্প-রচনায় কেবল পণ্ডশ্রম হয়। সেগুলা গল্প নামেরই যোগ্য হয় না—খবরের কাগজের উপযুক্ত রিপোর্ট হইতে পারে। গল্পসাহিত্যের আসরে তাহাদের কোন স্থান নাই।

এই ধরণের লেখকদের কাছে কেবলমাত্র ঘটনাই ভরসা বলিয়া অনেকসময়ে ইঁহাদের গল্পের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ও ধারা বজায় থাকে না। লেখকেরা যখন আর স্বাভাবিক ঘটনায় গল্পলিখিত পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রবিকাশ করিতে অপারগ হন, তখন তাঁহারা বাধ্য হইয়া যা-তা আজগুবি একটা-কোন ব্যাপার আনিয়া গল্প জমাইবার উদ্যোগ করেন। উপরের গল্পটি তাহার প্রমাণ। লেখক, বিধবার আদর্শ চরিত্র আঁকিতে চান। কিন্তু, গোড়া থেকেই ঘটনার পর ঘটনা আনিয়া যখন দেখিলেন, পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে অথচ কিছুই হইতেছে না, তখন ভূত-প্রেত, ছেলের হঠাৎ অসুখ ও শিকড় প্রভৃতি নানান কাণ্ডের দরকার হইল।

সতী ডাকিলেই যে মৃত পতি শিকড়-হাতে ফিরিয়া আসিবেন, এ রূপকথায় সাজে;—কিন্তু এই দৈবঘটনার উপরেই যখন এই গল্পের সমস্ত গল্পত্ব নির্ভর করিতেছে, তখন তাহা না ঘটাইলে চলে কৈ!

সাহিত্য-সমাজে চিরকালই Creation বা সৃষ্টির আদর বেশী—Narration বা ঘটনা-বিবৃতির পসার তেমন নাই। যাঁহারা পরিণত, শিক্ষিত মনের খোরাক যোগাইতে চান, তাঁহারা সৃষ্টি করিয়া আপনাদের "নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি"র পরিচয় দেন। ইঁহাদের সৃষ্ট চরিত্র-বিকাশের মুখে, স্বাভাবিক নিয়মে যে-সকল ঘটনা ঘটে, সে-সকল ঘটনা না ঘটিয়া আর উপায়ান্তর নাই, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অন্য দিকে, যাঁহারা কোন নূতন চরিত্রের বিবরণ না দিয়া, কেবল ঘটনার পর ঘটনার বিবরণ দিয়া যাইবেন এবং দৈব সহায় না হইলেই যাঁহাদের সমস্ত গল্পত্ব পণ্ড হইয়া যাইবে, তাঁহারাও পাঠক পাইবেন বটে,—কিন্তু সে পাঠশালার দশম-শ্রেণীতে, গাছতলায় এবং ধানের ক্ষেতে!

দৈব-ঔষধ, দৈব-মাদুলী যখন পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে বাহির হয়, তখন তা মানায় ভাল; কিন্তু গল্পসাহিত্যের মধ্যে তাহা জাহির করিলে লেখককে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

তারপর, আর এক কথা। উপরের গল্পটিতে লেখক দেখাইতে চান, বিধবার চরিত্র-মহিমা। এক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য, বিধবার চরিত্র-বিকাশের পক্ষে যতটুকু দরকার,—কেবল ততটুকুই দেখানো। কিন্তু গল্পের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগটি তিনি এত ছড়াইয়া লিখিয়াছেন ও বক্তব্যের অতিরিক্ত এত কথা বলিয়াছেন যে, সেই অতি-বিস্তৃতি ও অবান্তর কথাগুলির কোন সার্থকতা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই।

ছোটগল্প লেখার কায়দা আলাদা। বদ্ধ-গবাক্ষের ছিদ্রপথে ঘরের মধ্যে সূর্য্যের রশ্মি আসিলে, সে আলোক-রেখা যেমন আশপাশ সব অন্ধকার রাখিয়া—কেবল যতটুকু যায় ততটুকু উজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোটগল্প-লেখকও তেমনি মূল-চরিত্রের বিকাশপক্ষে যেটুকু দরকার, সেটুকু ছাড়া আর-কিছু দেখাইতে পারিবেন না। আলোচ্য

গল্পের লেখক, রমেশের জন্য নিজে ভাবিয়াছেন এবং মোহিতবাবুকেও ভাবাইয়াছেন; আবার, শেষে বেকার রমেশ যে চাকরি পাইল সে-কথা বলিয়াও সকলকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। অথচ বিধবা কমলার চরিত্র-বিকাশের পক্ষে এ-কথাগুলি কোনই সাহায্য করে নাই। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র;—এ-ছাড়া এমনি অকারণ প্রসঙ্গ আরও কয়েক স্থানে আছে।

দ্রোণাচার্য্যের আদেশে ধনুকধারী অর্জ্জুন যখন লক্ষ্যস্থির করিয়াছিলেন, তখন তিনি শাখাসীন পক্ষীর চক্ষু ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান নাই। ছোটগল্প-লেখকের দৃষ্টিও এমনি তীক্ষ্ণ, অমোঘ ও লক্ষ্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

* * *

সমালোচনা

পল্লী-স্বাস্থ্য। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু প্রণীত প্রকাশক, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, ২৫নং মহেন্দ্র বসু লেন, কলিকাতা। কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চার আনা মাত্র। "পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে বাস করিয়া কিরূপে স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতমাত্র এই গ্রন্থে সূচিত হইয়াছে।" পল্লীসংস্কার-সম্বন্ধে আজ-কাল চারিদিকে আন্দোলন দেখা দিলেও এ পর্য্যন্ত সে-দিকে কাজ কিছু আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। গ্রন্থকারের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিকে অবলম্বন করিয়া সে কাজ আরম্ভ হৌক, ইহাই বক্তব্য। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি যে-সকল ব্যাধি মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়া পল্লীগ্রামগুলিকে উজাড় করিয়া দিতেছে, সে সকল ব্যাধি প্রতিষেধ-সাপেক্ষ। সতর্কভাবে এসম্বন্ধে কতকগুলি সহজ নিয়ম পালন করিলে এ সকল ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়া মহামারীর মূর্ত্তি ধরিতে পারে না—এ গ্রন্থে সেই সকল মোটামুটি সহজ নিয়মগুলিরই উল্লেখ ও আলোচনা আছে; ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইবার পক্ষে কতকগুলি সহজ উপায়ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, "দেশে ড্রেনেজের সুব্যবস্থা না হইলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইবে না, ইহা মনে করিয়া যাঁহারা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। ড্রেনেজ ব্যতীত এমন অনেক সহজসাধ্য উপায় আছে, যাহা যথারীতি অবলম্বন করিলে আমরা ঐ রোগের অত্যাচার হইতে একেবারে না হৌক, অনেকাংশে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি।" সেই সকল সহজ উপায় এই গ্রন্থে সুন্দর সহজ ও সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভে পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন, "দেশের সাধারণ লোককে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে ভালবাসা। মুখে 'ভালবাসি' বলিলে হইবে না, 'কাজে' ভাল বাসিতে হইবে।" স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি দেশের নিরক্ষর জনসাধারণকে বুঝাইবার ভার দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর। তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া বিদেশে পড়িয়া থাকিলে দেশের স্বাস্থ্য কি করিয়া ভাল হইবে? কাজেই নিরক্ষর জনসাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি-বিধানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া মহামারীর অত্যাচারে প্রাণ হারাইতেছে—দেশও জনহীন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে শুধু বক্তৃতা দিয়া বেড়াইলে বা মাসিকে প্রবন্ধ ছাপাইলে—ভাবার জোরে ত আর গ্রাম বাঁচিবে

না—হাতে-কলমে লাগা চাই। তারপর গ্রন্থকার প্রথমেই পানীয় জল ও খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পচা ডোবা ও কূয়ার জলই পল্লীগ্রামের লোক পান করিয়া থাকে। সে দূষিত জল ছাড়া উপায় নাই—এবং সে জল পান করিয়া সদ্য রোগের কবলে পড়িয়া গ্রামবাসী মারা ত পড়িবেই—জল পরিষ্কার করিবার উপায় জানা থাকিলে এ বিপদ ঘটিতে পারে না। যে ডোবায় তাহারা স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, হয় তাহারই জল তাহারা পান করে, নয় কূপ হইতে জল লইয়া পান করে—অথচ এইসকল স্থানেরই ময়লা জল জমির মধ্য দিয়া কূপে প্রবেশ করিতেছে—আবার কিছুদূরে গোশালার ও পায়খানার ময়লা জল নর্দ্দামা বহিয়া আসিয়া অন্তঃপ্রবাহ দ্বারা কূপের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।' কি করিয়া পানীয় জল ভাল রাখা যায়, সে-সম্বন্ধে লেখক বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন—এবং সে উপায়ও তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাও আয়াস বা বহু-ব্যয়সাধ্যও নহে। গ্রন্থকার বিশেষজ্ঞ—তাঁহার মতে জল পরিষ্কার করিবার দুইটি অত্যন্ত-সহজ উপায়—জল ছাঁকা এবং ফুটাইয়া লওয়া। জল ছাঁকিবার পক্ষে কাপড় বা অন্য ছাঁকনি অপেক্ষা মোটাবালি ও কাঁকরই প্রশস্ত। তবে গ্রামে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে শুধু ছাঁকনির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, এ কথাও গ্রন্থকার বলিয়াছেন। সে সময়—লেখক বলিয়াছেন, "জল যতই দূষিত হৌক না কেন, উহার মধ্যে কলেরা প্রভৃতি যে কোন সংক্রামক রোগের বীজ সংমিশ্রিত থাকুক না কেন, উহাকে যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া ফুটাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহার সংক্রামকতা দোষ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ জল নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে পান করা যাইতে পারে।" কলেরা রোগ দূষিত জল বা জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়াই উৎপন্ন হয়। গ্রন্থকার বলেন, "পার্ম্যাঙ্গানেট অব্ পটাস্ (Permanganate of Potash) নামক একপ্রকার বিশোধক ঔষধ জলে মিশ্রিত করিলে জলের সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়; এইজন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় "পুষ্করিণী বা কূপের জলে এই পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিলে আশঙ্কার কারণ থাকে না। তবে এ দ্রব্যের মূল্য বেশী—এবং সকল স্থানে পাওয়া যায় না। ব্যবহার করিতে গেলে ইহার মাত্রা পরিমিত হওয়া আবশ্যক—চিকিৎসকের হস্তেই ইহার সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা! সাধারণ লোকের পক্ষে জল ফুটান অপেক্ষা জলকে নির্দ্দোষ করিবার সহজ উপায় আর নাই।" গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "পল্লীগ্রামের সকলে যদি বারমাস পানীয় জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া পরে শীতল করিয়া ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি অর্দ্ধেক রোগ গ্রাম হইতে দূরীভূত হয়।" খাদ্য-সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা, অতিভোজন ত্যাগ করিতে হইবে—কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন করিলে শরীর ভাল থাকে। বাসি ভাত ও বাসি তরকারি পল্লীগ্রামের দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে—তাহা দোষের নিশ্চয়ই—তবে উত্তমরূপে পুনরায় তাহা গরম করিয়া খাইলে তত দোষের হয় না। গ্রীষ্মকালে বাসি তরকারি বিকৃত হইয়া যায়—তাহা ভোজন করা উচিত নয়। সদ্য-প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রশস্ত। নির্ম্মল বায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার আর-একটি প্রধান সহায়। বাসগৃহে বায়ু-সঞ্চালনের রীতিমত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দরিদ্র পল্লীবাসীর উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণের কৌশলও লেখক বিবৃত করিয়াছেন—ঘর খটখটে হওয়া প্রয়োজন এবং অর্থাভাবে গৃহে যাহারা জানালা রাখিতে পারে না, তাহাদের উচিত ঘরের দেওয়ালের মধ্যভাগ মাটি দিয়া না বুজাইয়া তথায় বাঁশের জাপরি বসানো। শীতকালে এই জাপরি গুণ-চট দিয়া ঢাকিয়া দিলে ঠাণ্ডা আসিবে না অথচ বায়ু-সঞ্চালনেরও ব্যাঘাত ঘটে না। বাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ময়লা বা জঞ্জাল জড় করিয়া রাখা উচিত নহে। ইহাতে গৃহের বায়ু দূষিত হয়, পুষ্করিণীর জল নষ্ট হয় এবং মশার উপদ্রব বাড়ে। মশা হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি—ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইলে, মশার উৎপাত বন্ধ করা দরকার। জঙ্গল

কাটিয়া সাফ করিতে হইবে—এবং মশারি ব্যবহার করিতে হইবে। জলা জমিতেই মশার উৎপত্তি—পচা খানা-ডোবা বাটীর নিকটে যাহাতে থাকিতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিলে মশার উৎপাত বন্ধ হইবে। এইরূপ মোটামুটি সহজ নিয়মগুলি পালন করিলে পল্লীর যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে—তবে, দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রামবাসীর সহিত গ্রামের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আন্তরিক যোগ থাকা প্রয়োজন—তাহাদিগকে এই সকল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া, এ বিষয়ে সাহায্য করা—অর্থাৎ ভাইয়ের মত তাহাদিগের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সংস্কার-ভার হাতে লইতে হইবে—নহিলে যাহাদের জ্ঞানের বল নাই, অর্থের বল নাই, তাহারা কি করিয়া পল্লী-সংস্কার করিবে! এই গ্রন্থখানি পল্লীর ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জিকার মত রক্ষিত হোক—যাহাতে সাধারণের কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচক্ষণ গ্রন্থকার-মহাশয় ইহার মূল্য যথাসম্ভব সামান্যই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। চারআনা মাত্র ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ ঘরে রাখিলে বিস্তর শারীরিক যন্ত্রণা ও মনস্তাপের হাত হইতে পল্লীবাসী মুক্তিলাভ ত করিবেনই—এমন কি বহুমূল্য মানব-প্রাণও রক্ষা পাইবার বিলক্ষণ আশা আছে।

কোরক। শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, নিউ আর্য্যমিশন প্রেসে, শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ—কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। লেখক 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন, "কবিতা মুদ্রিত করাইয়া জনসাধারণের সমক্ষে বহিষ্করণ-রূপ অসমসাহসিকের কার্য্যে আমার এই প্রথম উদ্যম। এবংবিধ গুরুকার্য্যে দায়িত্ব এবং ফলাফলের বিষয় পূর্ব্বে সম্যক পর্য্যালোচনা না করিয়া অগ্রসর হইলে, পরে যেরূপ সকলের হাস্যাস্পদ হইতে হয়, আমাকে যে ঠিক তদ্রূপ হইতে হইবে, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রাখি না। তবে উপায়! * * * * * হেমবাবু হেমবাবুরই ন্যায় এবং বঙ্কিমবাবু বঙ্কিমবাবুরই ন্যায় পরীক্ষিত হইবেন। আমার ন্যায় তরুণ এবং ক্ষুদ্র লেখককে পরীক্ষা করিতে হইলে সম্মানার্হ পণ্ডিতগণকে কৃপাপরবশ হইয়া উচ্চ আসন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কেননা, আমি তাঁহাদিগের করুণাপ্রার্থী।" তারপর কবিতা আরম্ভ হইয়াছে—

"তব অমর বীণার মঞ্জু রাগিণী
ঝঙ্কে তাহারি প্রাণ—"

'ঝঙ্কে' শুনিয়াও অগ্রসর হইলাম—তার পরই 'প্রণয়ের অরি প্রলয়ের ভেরী' আর 'বেদনা'!

দই-খই। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ সাহা প্রণীত। কলিকাতা, মানসী প্রেসে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। দেখিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, এখানিও কবিতা-গ্রন্থ—কিন্তু লেখক নিজেই ছাপ আঁটিয়া দিয়াছেন, "গান।" 'ফেলিয়ে'—'লুকায়ে' প্রভৃতি মিল ঘটাইয়া 'গান' জমাইবার আশা দুরাশা বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

কর্ম্মক্ষেত্র। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, ডি, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল, আই, এম, এস্ (অবসর-প্রাপ্ত) প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশ্রীকালী ঘোষ, ৫৬নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অস্পৃশ্য জাতির সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আমাদের মধ্যে শতকরা ৮৭জন হিন্দুকে অর্থাৎ দুইশত লক্ষের মধ্যে ১৭০ লক্ষ হিন্দুকে ইতর অর্থাৎ পৃথক করিয়া রাখি এবং পৃথক থাকি—তাহাদের কপালে 'অস্পৃশ্য' ছাপ আঁটিয়া দিয়াছি। তাহাদের সুখ-দুঃখ, শুভাশুভের কোন সংবাদই রাখি না, তাহাদিগকে হীন পশুর চেয়েও হীনতর করিয়া রাখিয়াছি। ইহাতে নিজেদের মনুষ্যত্ব ত হারাইয়াছিই—এমন কি আমাদের জাতিও এই পাপে লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশের কাজে তাহাদের ডাকি না—তাহাদিগকে হারাইয়া বলহীন হইয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছি। এ পুস্তিকায় ইহারই আলোচনা আছে।

আশ্রমে। শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র শীল প্রণীত। চুঁচুড়া সান্‌রাইজ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থ। বিশেষত্বহীন রচনা।

স্তবক। শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী প্রণীত।

কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি ছোট গল্পের বই। 'পদচিহ্ন', 'অভিসার', 'হাসি', 'অকর্ম্মণ্য' প্রভৃতি দশটি ছোট গল্প এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। 'পদচিহ্ন', "অভিসার" ও 'হারু খুড়ার বিপদ' গল্প তিনটিতে আমরা ছোটগল্পের একটু সাড়া পাইয়াছি। কিন্তু ভাষার দোষে ও আড়ম্বরের বাহুল্যে ছোটগল্পের প্রাণটুকুই চাপা পড়িয়াছে। 'অভিসার' গল্পে এ দোষ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু 'পদচিহ্ন' গল্পে—'বলিতে পার?'—এই প্রশ্নের ছড়াছড়িতে বিরক্তি ধরে। 'অকর্ম্মণ্য', 'শাসন-প্রণালী,' 'শুভযাত্রা' প্রভৃতি অপর গল্পগুলি সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন। গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি আছে; ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভালো।

মাধবী। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। চট্টগ্রাম' ছনহরা, যতীশ লাইব্রেরী হইতে শ্রীমণীন্দ্র বিনোদ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ঘোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-পুস্তক—খণ্ডকবিতার সমষ্টি। গ্রন্থের ললাট-পটে 'শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র, বি, এল' এক পরিচয়-পত্র আঁটিয়া দিয়াছেন। সে পত্রে কটমট ভাষায় স্তুতির মাত্রা যতখানি ঠাসা যাইতে পারে, আছে। কবিতাগুলিতে পূর্ব্বতন কবিগণের ভাবের ছায়া বহু স্থলেই লক্ষিত হইল—ছন্দে বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রাণ নাই। বহুস্থলে মিলেরও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কবিতাগুলিতে কোথাও কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না।

মন্দির। কিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩নং পটল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রিয়-প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই গ্রন্থের ছোট একটু 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়াছেন। এখানি কবিতা-গ্রন্থ—খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক—তবে দুর্ব্বোধ বা অস্পষ্ট নহে। রামেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান। * * ভাষার উপর তাঁহার প্রভুত্ব আছে। তিনি ভাষাকে ইচ্ছামত খেলাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বেগে চলিয়াছে, দ্রুত চলিয়াছে, স্থানে স্থানে কূল পর্য্যন্ত উছলিয়াছে।" এ কথায় আমরাও সায় দিতে পারি। গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে; তবে কবিত্বের চেয়ে তত্ত্বকথার মাত্রাই ফুটিয়াছে বেশী।

হামির। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রিয়নাথ দাস-গুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে 'কয়েকটি কথায়' লেখক বলিয়াছেন, "উপন্যাস ইতিহাস নহে।" তাঁহারই কথায় প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরা বলি, 'ইতিহাস উপন্যাস নহে।' এই গ্রন্থে লেখক গড়্-গড়্ করিয়া ইতিহাসের যেটুকু বিবরণ সংক্ষেপে দিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিক তথ্য-হিসাবে সেটুকুর সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই—তবে যেখানে উপন্যাস দেখা দিয়াছে, সেখানেই গলদ জুটিয়াছে বিস্তর। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কোথাও নাই, তাহা ছাড়া কোন চরিত্রই উপন্যাস-হিসাবে বিকাশ লাভ করে নাই। চিতোর দেখিয়া হামিরের প্রকাণ্ড 'স্বগত-উক্তি' নিতান্তই থিয়েটারী ঢংয়ের হইয়াছে। শাস্তা ও শিবানীর রসিকতার প্রয়াস নেহাৎ মামুলি—গণেশ প্রসাদ, বিদ্যাদিগ্‌গজ-দিগ্বিজয় ও মাণিকলালের মিশ্র সংস্করণ; তবে তাহাদের প্রাণ আছে,—গণেশ বেচারা নির্জ্জীব; শুধু পটে আঁকা জীব। অবান্তর ব্যাপারের বহুল বর্ণনায় উপন্যাসখানি আচ্ছন্ন। উপন্যাসের আসল রসটুকুরই ইহাতে অভাব দেখিলাম। প্রশংসার মধ্যে বলিতে পারি, লেখকের ভাষা মন্দ নহে—সরল, আড়ম্বরহীন। এ গ্রন্থকে ঐতিহাসিক 'আখ্যান' মাত্র বলিতে পারি, উপন্যাস-হিসাবে রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত
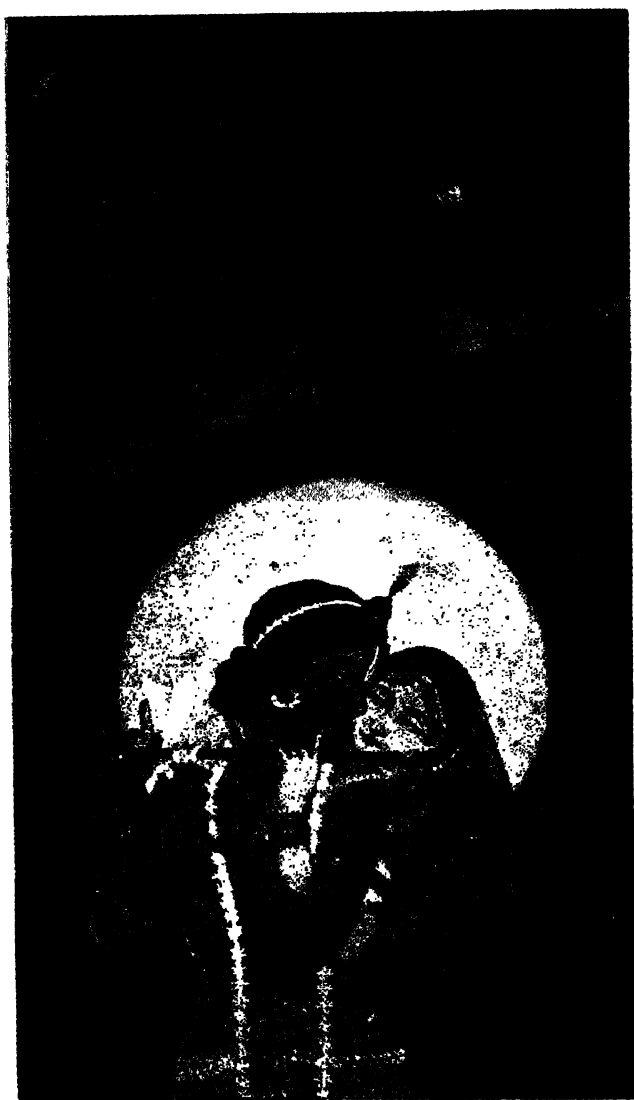
দুজনে

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দে অঙ্কিত

ভারতী

৪০শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২৩ [৫ম সংখ্যা

বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত দেশ

(১) অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরি

ছোটবড় আঠারটি দেশ লইয়া বর্ত্তমান অষ্ট্র-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। এই সাম্রাজ্যের বিস্তার অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রজাশক্তির বিকাশের ফলে হয় নাই। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরির আয়তন-বৃদ্ধি বেশীর ভাগ বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে ঘটিয়াছে। বহেমিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি রাজ্য বিবাহের যৌতুকস্বরূপ অষ্ট্রীয়ার হাতে আসিয়াছিল। তাই, এককালে অষ্ট্রীয়াকে বিদ্রূপ করিয়া বলা হইত, "আর সকলে যুদ্ধ করিয়া মরুক, কিন্তু তুমি, হে ভাগ্যবতী অষ্ট্রীয়া, শুধু বিবাহ করিতে থাক।" এই কারণে অনেকে অষ্ট্রীয়াকে ইউরোপের "শ্বাশুড়ী-মা" বলিয়াও অভিহিত করিয়াছিলেন।

বিবাহের দ্বারা অষ্ট্রীয়ার আয়তন-বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু শক্তিবৃদ্ধি হয় নাই। অষ্ট্রীয়ার আঠারোটি প্রদেশে এগারোটি বিভিন্নজাতীয় লোক বাস করে। এই এগারটি জাতির ভিতর আবার পাঁচটি জাতি গোঁড়া ন্যাশনেলিষ্ট ; দেশের আর সকল জাতির সহিত ইহাদের সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে। অষ্ট্রীয়াতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রায় সকল স্তরই দৃষ্টিগোচর হয়। ভিয়েনা-অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক এবং উচ্চশিক্ষিত জার্ম্মান, টাইরলের সরল এবং সাহসী পাহাড়ী, হাঙ্গেরির জিপ্‌সি, বজনিয়ার মুসলমান, ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়ার প্রাচীন রোমান ঔপনিবেশিকদিগের বংশধর—রোমানিয়ানগণ, বহেমিয়ার উন্নতশীল জেক্, গ্যালিসিয়ার রক্ষণশীল ইহুদি ও ভাগ্যহীন পোল এবং সর্ব্বশেষে মাগিয়ার। তুর্ক এবং রুশদেশের ফিন্ জাতি ব্যতীত ইউরোপে এই মাগিয়ারদের জাত-ভাই আর কেহ নাই। এই সব জাতি ছাড়া অষ্ট্রীয়াতে ইতালিয়ান্, সার্ভিয়ান্ প্রভৃতি বহু জাতি আছে। এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, অষ্ট্রীয়ায় এক অষ্ট্রীয়ান ব্যতীত আর সকল জাতিই বাস করে। প্রকৃতপক্ষে অষ্ট্রীয়ান নামে কোন জাতি নাই। তবে অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মান-

দিগকে মোটামুটি অষ্ট্রীয়ান বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, কারণ ইহারাই প্রাচীন টিউটনিক সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ইহাদের সংখ্যা অষ্ট্রীয়ার সমগ্র অধিবাসীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। ইহারা সকল বিষয়ে অষ্ট্রীয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উন্নত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্ব্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ স্বত্বেও এই-সব জাতি এতকাল যাবৎ একত্রে এবং এক রাজার অধীনে বাস করিয়া আসিতেছে। অনেক দিন পূর্ব্বে সার্ভিয়ার পররাষ্ট্র-সচীব বলিয়াছিলেন, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী কোন জাতির স্বদেশ নহে, ইহা অনেকগুলি জাতির কারাগার মাত্র। কথাটা খুব সত্য, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কোন জাতিই এই কারাগার হইতে পলাইবার চেষ্টা করে নাই। কোন কোন জাতি বারম্বার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা হাঙ্গেরিয়ান্‌দের ন্যায় অষ্ট্রীয়ার ভিতরে থাকিয়াই স্বাধীন হইতে চায়, অষ্ট্রীয়াকে ত্যাগ করিতে চায় না। তাহার প্রধান কারণ, বৃদ্ধসম্রাট ফ্রান্স জোসেফকে অষ্ট্রীয়ার সকল জাতিই সমানভাবে ভক্তি করিয়া থাকে। তাঁহার জীবনের দুঃখময় ইতিহাস পাঠ করিলে, তাঁহার প্রতি সকলেরই সহানুভূতি হয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতৃব্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁহার রাজ্যের সকল দেশেই ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিতেছিল। তাঁহার সিংহাসন আরোহণ করিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে—২৪শে ফেব্রুয়ারীতে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের খবর পাইয়া সমস্ত দেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভিয়েনার অধিবাসীরা চিরকালই সৌখীন ও আমোদপ্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাহারা কখনো রাজনীতির ধার ধারিত না; কিন্তু ভিয়েনাতেও, লুই ফিলিপের পতনের খবর আসিয়া পৌঁছিবার পর রাজধানীর অবস্থা ষোড়শ লুইয়ের জীবনের শেষ দিনে প্যারী নগরীর অবস্থার অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৩ই মার্চ্চ সমগ্র ভিয়েনা নগরী বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বহেমিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি প্রভৃতি দেশও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। ফ্রান্স জোসেফ এই বিপ্লবের সময় অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর এই বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাপণ করিতেই কাটিয়া যায়। হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমন করিতে অষ্ট্রীয়ান গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। হাঙ্গেরিয়ানরা চিরকালই রণকুশল। তাহারা যুদ্ধের পর যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ানদিগকে হারাইতে থাকে এবং অবশেষে ফ্রান্স জোসেফকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুবিখ্যাত দেশ-হিতৈষী কসুথকে হাঙ্গেরির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে। এই বিপদের সময় ফ্রান্স জোসেফ রুশিয়ার জার নিকোলাসের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহারই সাহায্যে হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমন করেন। কসুথ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তুরস্কের সুলতানের আশ্রয় লয়েন এবং অবশেষে আমেরিকায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। তখন অষ্ট্রীয়ানরা হাঙ্গেরিয়ানদের উপর যে-প্রকার পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল—তার তুলনা বোধ হয় বর্ত্তমান যুদ্ধেও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে। হাঙ্গেরিয়ান

বাহিনীর সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে জোর করিয়া অষ্ট্রিয়ান সেনাদলে সাধারণ সৈনিকরূপে ভর্ত্তি করান এবং একসঙ্গে এগারজন হাঙ্গেরিয়ান সেনাপতিকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলান হয়। এঁদের ভিতর একজন যুদ্ধে আহত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং স্কন্ধেও গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল; তবুও তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া ফাঁসী-কাঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

এর পর অষ্ট্রীয়ান গবর্ণমেণ্ট বিশবৎসরকাল হাঙ্গেরিয়ানদের উপর নানারূপ উপদ্রব করেন এবং তাহাদিগকে জার্ম্মান-ভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেন; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরিকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হন। ফ্রান্স জোসেফ্ ঐ বৎসরই বুধাপেস্তে আসিয়া হাঙ্গেরির রাজারূপে অভিষিক্ত হন। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরি তখন হইতে "যুক্তরাজত্ব" নামে পরিচিত।

ফ্রান্স জোসেফকে তাঁহার রাজ্যের আরও বহুবিধ দুর্দ্দশা দেখিতে হইয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করিবার কয়েক বৎসর পরেই রাজ্যের ইতালীয় প্রদেশগুলি প্রায় সমস্তই তাঁহার হাত-ছাড়া হইয়া যায়। তারপর প্রুশিয়ার হস্তে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান রাজ্যগুলির ভিতর অষ্ট্রিয়ার বহুকালের নেতৃত্ব নষ্ট হয়। এর উপরে তাঁহাকে অনেক পারিবারিক দুঃখ-কষ্টও ভোগ করিতে হইয়াছে। আততায়ীর হস্তে দুই-একবার তাঁহার নিজের প্রাণ-সংশয়ও ঘটিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র যুবরাজ রুডল্ফের শোচনীয় পরিণামের কথা সকলেরই জানা আছে। যুবরাজ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন কি আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ সুইট্জারল্যাণ্ডে বিপ্লববাদীদের হাতে প্রাণ হারান। ফ্রান্স যোসেফের ভ্রাতা মাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকো দেশের সম্রাট্ ছিলেন। ঐ দেশে বিপ্লব ঘোষণা হইবার পর প্রজাতান্ত্রিকদের আদেশে তাঁহাকে গুলি করিয়া মারা হয়। মাক্সিমিলিয়ানের স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শোকে পাগল হইয়া যান এবং এখনো সেই অবস্থায়ই আছেন। ফ্রান্স জোসেফের দুঃখের মাত্রা ইহাতেও পূর্ণ হয় নাই; দুইবৎসর হইল তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ফার্দিনান্দকে একজন সার্ভিয়ান আততায়ী গুলি করিয়া মারে এবং তাহার দরুণই ইউরোপ আজ এই কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সম্রাটের বয়স এখন ছিয়াশী বৎসর। আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপব্যাপী এক মহাবিপ্লবের সময় তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল এবং হয়ত এই আর-এক মহাবিপ্লবের ভিতরেই তাঁহার রাজত্বের অবসান হইবে। তাঁহার প্রতি তাঁহার রাজ্যের সকল জাতির সমান সহানুভূতি আছে এবং এই ব্যক্তিগত সহানুভূতিই অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন জাতিদের এতদিন একত্র রাখিতে পারিয়াছে। ইহা

ছাড়া অন্যান্য জাতির জানে যে অষ্ট্রীয়ার বাহিরে আসিয়া স্বাধীন হইলে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী হইবে। একাকী হইয়া পড়িলে পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদিগের কোন একটীর রাজ্য-লিপ্সার চাপে পড়িয়া চিরদিনের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব হারাইবে। তাই গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ করিলেও এইসকল জাতি অষ্ট্রীয়া হইতে পৃথক থাকিতে চায় না।

জার্ম্মানরাই অষ্ট্রীয়ার রাজার জাতি এবং কিছুকাল পূর্ব্বে জার্ম্মানভাষাই অষ্ট্রীয়ার রাজ-ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। রাজকীয় এবং দেশের যাবতীয় কাজকর্ম্ম জার্ম্মান ভাষাতেই সম্পাদিত হইত। আমাদের দেশে যেমন ইংরাজী না জানিলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ মিলে না, সেইরূপ অষ্ট্রীয়াতেও কিছু-কাল পূর্ব্বে জার্ম্মান না জানিলে গবর্ণমেণ্টের কাজকর্ম্ম মিলিত না। তখন সকলে মনে করিত যে, কালে অষ্ট্রীয়াতে জার্ম্মান ব্যতীত আর কোন ভাষা থাকিবে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে জেক্ এবং পোলদের ভিতর জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠে এবং ক্রমে তাহা অন্যান্য জাতির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই জাতীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ভাষা-সংস্কার। জার্ম্মান ভাষা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া মাতৃভাষার উন্নতিসাধন করিতে হইবে ইহাই অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন জাতিদের মূলমন্ত্র। তাই প্রথমে ভাষা নিয়া জার্ম্মানদের সঙ্গে ইহাদের বিবাদ আরম্ভ হয়। গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মান হইলেও এ-বিষয়ে দুই-একটি জাতি ব্যতীত সকল জাতিকেই সমানভাবে সাহায্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন, দুই-একটি ভাষা ব্যতীত অষ্ট্রীয়ার আর সকল ভাষা জার্ম্মান ভাষার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রধান প্রধান জাতিরা সকলেই নিজেদের ভাষায় সরকারী কাজকর্ম্মের ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ বাড়িয়াছে। রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে দেশের প্রধান ভাষাগুলি শিক্ষা করিতে হয়। তাহার উপর বিভিন্ন জাতিদের জন্য গবর্ণমেণ্টকে পৃথক পৃথক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মানরা ইহাতে গবর্ণমেণ্টের উপর যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়াছে; কারণ ইহাতে তাহাদের "প্যান্-জার্ম্মান" আন্দোলন বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। হাঙ্গেরিয়ানদের নিকট জার্ম্মানরা আগেই পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু ইদানিং এই ভাষা-যুদ্ধে জেক্, পোল, এমন-কি ষ্টাইরিয়া এবং কারিন্থিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরাও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া জার্ম্মানদের দুই-একবার পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জার্ম্মানদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ আরো বাড়িয়া গিয়াছে। "প্যান-জার্ম্মান" আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য শুধু জার্ম্মানি এবং অষ্ট্রীয়ার টিউটনিক জাতিদের এক সাম্রাজ্যের অধীনে আনা নহে; রুষ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা (বুয়ার), হলাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের সমস্ত টিউটনিক জাতিদের একত্র করাও এই আন্দোলনের লক্ষ্য। Pan-Germanism-এর আর এক উদ্দেশ্য, সালোনিকা পর্য্যন্ত

বলকান দেশে এবং কনষ্টান্তিনোপল ও বাগ্‌দাদের রাস্তা দিয়া পারস্য-উপসাগর পর্য্যন্ত তুরস্ক-দেশে জার্ম্মান অধিকার বিস্তার করা। কারণ, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে-সমস্ত জার্ম্মান গমন করে, তাহারা শীঘ্রই স্বদেশকে ভুলিয়া যায় এবং নিজেদের জাতীয়তা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি দেশে জার্ম্মান-উপনিবেশ স্থাপিত হইলে,—ঔপনিবেশিকরা চিরকালই জার্ম্মান থাকিবে—নিজেদের জাতীয়তা হারাইবে না। বাগ্‌দাদ-রেলওয়ে এই উদ্দেশ্যেই স্থাপন করা হইয়াছিল এবং ইহাকেই জার্ম্মানরা গর্ব্ব করিয়া বলিত, "Drang nach Osten",—অর্থাৎ পূর্ব্বের দিকে চাপ দেওয়া। যুদ্ধের পূর্ব্বে একমাত্র এসিয়া-মাইনরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার জার্ম্মান বাস করিত। ইদানিং অষ্ট্রীয়ায় জেক্, মাগীয়ার এবং ইতালিয়ানদের সহিত জার্ম্মানদের বিবাদের ফলে এই "প্যান-জার্ম্মান" আন্দোলন একটু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই বিবাদের ফলে এখন অষ্ট্রীয়ার অধিকাংশ জার্ম্মানই জার্ম্মানিকে তাহাদের স্বদেশ বলিয়া মনে করে। অষ্ট্রীয়ার অনেক জার্ম্মান, প্রুসিয়ান অপেক্ষাও হোহেন্‌জলার্ণ বংশের অধিক ভক্ত। বিস্মার্কই তাহাদের জাতীয় আদর্শ বীরপুরুষ এবং সিডানের বাৎসরিক জন্মোৎসবই তাহাদের জাতীয় উৎসব। মাঝখানে বহেমিয়া না থাকিলে বিস্মার্ক নিশ্চয়ই অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মান অংশকে প্রুশিয়ার অধিকারভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অবশ্য, অষ্ট্রীয়ার দক্ষিণে জার্ম্মানদের সহিত প্রুশিয়ানদের চরিত্রের কোন সামঞ্জস্য নাই। অষ্ট্রীয়ার দক্ষিণে জার্ম্মানরা অতিশয় ভদ্র, মধুরপ্রকৃতি এবং অতিথিবৎসল। ইহারা একটু আরামপ্রিয়, তাই প্রুশিয়ানদের ন্যায় অতটা মারামারি-হাঙ্গামা পছন্দ করে না।

অষ্ট্রীয়ায় "প্যান-জার্ম্মান" আন্দোলনের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার নিমিত্ত "প্যান-স্লাভ" আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু "প্যান-জার্ম্মান"দের ন্যায় "প্যান-স্লাভ"দের কোন বাঁধা-ধরা কার্য্যপ্রণালী নাই। রুষিয়ার "প্যান-স্লাভ-"দের ন্যায় ইহারাও সমগ্র স্লাভ জাতির ভিতর ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে চায়। ইহা ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই। অষ্ট্রীয়ার স্লাভদের সংখ্যা অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহাদের ভিতর চিরদিন দলাদলি চলিতেছে এবং ইহাই ইহাদিগের দুর্ব্বলতার কারণ। একসময় "প্যান-স্লাভ"দের লক্ষ্য ছিল, অষ্ট্রীয়াতে রুষিয়ার অধীনে এক স্লাভ সাম্রাজ্য স্থাপন করা; কিন্তু জাপানের হাতে রুষিয়ার পরাজয় হইবার পর এই আশা ত্যাগ করা হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর আবার কি হইবে, বলা যায় না।

অষ্ট্রীয়ার স্লাভনিক জাতিদের ভিতর জেক্‌রা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। বিদ্যা-বুদ্ধিতে ইহারা ইউরোপের কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। জার্ম্মানদের সহিত ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরোধ এবং ইহারা "প্যান-জার্ম্মান" আন্দোলনের প্রবল শত্রু। হাঙ্গেরির ন্যায় বহেমিয়াও স্বাধীন হয় এবং সম্রাট প্রাগ নগরে আসিয়া বহেমিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইহাই তাহাদের

ইচ্ছা। তাহাদের আন্দোলনের দরুণ গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৭ খৃঃ জেক্ ভাষা, বহেমিয়ার সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়েন। তখন হইতেই জার্ম্মানদের সহিত ইহাদের ঘোরতর বিরোধ আরম্ভ হয়। এই বিবাদের ফলে ইহাদের মধ্যে অনেকবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুধু রাস্তায় নয়, অনেকবার পার্লিয়ামেণ্ট-গৃহেও হইয়াছে এবং উভয় পক্ষের এই দলাদলির দরুণ অনেকবার পার্লিয়ামেণ্টের কাজ-কর্ম্ম বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জেকদের অত্যাচারে ভিয়েনার বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল; তখন জার্ম্মানরা লিঞ্জ নগরে কুবেলিকের প্রসিদ্ধ কন্সর্ট-হল ধ্বংস করিয়া এর প্রতিশোধ লয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জেক্রা প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তখন গবর্ণমেণ্ট বহেমিয়ার রাজধানী প্রাগ নগরে সামরিক আইন ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সব বিবাদে মোটের উপর জেক্রাই লাভ করিয়াছে বেশী এবং বর্ত্তমানে বহেমিয়ার অনেক স্থানে জার্ম্মান ভাষাকেও সম্পূর্ণ বয়কট করা হইয়াছে। প্রাগ নগরের সমুদয় রাস্তার নাম জেক্ ভাষায় লিখিত,—আগে সকল রাস্তারই জার্ম্মান নাম ছিল। এমন-কি, প্রাগে কাহারও বাড়ীর সাম্‌নে জার্ম্মান ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড লাগাইবারও হুকুম নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য আমি প্রাগে গিয়াছিলাম। আমি পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর Baron von Kranzbergএর বাড়ীতে থাকিতাম। বাড়ী থেকে বাহির হইতে গেলেই Baroness von Kranzberg রোজ আমাকে সাবধান করিয়া দিতেন, যেন রাস্তায় কাহারও সহিত জার্ম্মান ভাষায় কথা না বলি। রাস্তায় পুলিশকে জার্ম্মান ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর মিলিত না—অথচ সকল পুলিশ-কর্ম্মচারীই জার্ম্মান ভাষা জানিত। আমি একদিন প্রাগের প্রসিদ্ধ রাস্তা ফার্দিনান্দ ষ্ট্রীটের কোন বাড়ীতে একজন মজুরের দ্বারা একটা পার্শেল পাঠাইতেছিলাম। পার্শেলের উপরে রাস্তার নাম জার্ম্মান ভাষায় ফার্দিনান্দ ষ্ট্রীট লিখা ছিল বলিয়া মজুরটি তাহা লইয়া যাইতে কিছুতেই রাজী হইল না। অবশেষে জার্ম্মান নাম কাটিয়া জেক ভাষায় রাস্তার নাম লিখিয়া দিলে সে পার্শেল লইয়া গেল। জার্ম্মান ভাষার প্রতি এই বিদ্বেষ শুধু মধ্য এবং নিম্নশ্রেণীর স্লাভদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়; উচ্চ শ্রেণীর স্লাভদের মধ্যে এই ভাষা-বিদ্বেষ নাই। তাহারা প্রায় সকলেই দেশের প্রধান প্রধান ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে।

জার্ম্মানরা স্লাভদের এই ভাষা-বিদ্বেষ প্রথম প্রথম উপেক্ষার চক্ষে দেখিত। তাহারা জানিত যে, উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত জার্ম্মান ভাষা ভিন্ন ইহাদের উপায় নাই। বাস্তবিকও পোল এবং জেক্ ভাষা ব্যতীত অষ্ট্রীয়ার অন্যান্য স্লাভানিক ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী কোন পুস্তক ছিল না। অষ্ট্রীয়ার কোন কোন স্লাভানিক ভাষা কত দরিদ্র তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কার্নিওলার উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে স্লভাক্ ভাষায় শিক্ষা প্রদানের যেদিন প্রস্তাব করা হয়, সেই দিন Count Aueroperg পার্লিয়ামেণ্ট-সভায়

সমগ্র স্লভাক্ সাহিত্য সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। চেষ্টায় তাহাদের সাহিত্যের এই দারিদ্র্য অনেকটা ঘুচিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কার্নিওলার উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়েও স্লভাক্ ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করা হইয়া থাকে। প্রাগ সহরে অনেক দিন হইল, জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি জেক্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে জার্ম্মানরা আরো বিরক্ত হইয়াছে, কারণ প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং এককালে ইহা জার্ম্মান সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল।

জেক্ ব্যতীত হাঙ্গেরিয়ানদের সঙ্গেও ভাষা লইয়া জার্ম্মানদের বিবাদ চলিতেছে। হাঙ্গেরি অষ্ট্রীয়ার একটি স্বাধীন রাজ্য। রাজস্ব এবং সৈনিক বিভাগ ছাড়া আর সব বিভাগই অষ্ট্রীয়া হইতে পৃথক। হাঙ্গেরির পৃথক পার্লিয়ামেণ্ট-সভা আছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরির পার্লিয়ামেণ্ট সৈনিক-বিভাগে জার্ম্মান ভাষার পরিবর্ত্তে হাঙ্গেরিয়ান ভাষা চালাইবার প্রস্তাব করেন। অষ্ট্রীয়ান পার্লিয়ামেণ্টের অনুরোধে সম্রাট ইহাতে মত না দেওয়ায় হাঙ্গেরিয়ান পার্লিয়ামেণ্ট কর দেওয়া এবং সৈন্য-চালান করা বন্ধ করিয়া দেন। এই গোলমাল সমানে পাঁচ বৎসর কাল চলিতে থাকে এবং অবশেষে সম্রাটের চেষ্টায় মিটমাট হইয়া যায়। অষ্ট্রীয়া এবং হাঙ্গেরির মধ্যে বিবাদ হইলে তাহা আপোষে মিটাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং হাঙ্গেরিকে পৃথক মাশুলের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভাষা নিয়া বিবাদ এখনো থামে নাই।

অষ্ট্রীয়ার ইতালিয়ানরাও গবর্ণমেণ্টের উপর সন্তুষ্ট নয়। ইহাদেরও প্রধান অনুযোগ, ভাষা। জেক্ পোল প্রভৃতি জাতির নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু ইতালিয়ানদের জন্য গবর্ণমেণ্ট এ-পর্য্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। উচ্চ-শিক্ষার নিমিত্ত ইতালিয়ানদের মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে হয়। দক্ষিণ Tyrol, Treist এবং Istriaর অধিকাংশ অধিবাসী ইতালিয়ান। তাহারা ইতালির সহিত মিলিতে চায়। ইতালির "Irredentist"রা ইহাদের পৃষ্ঠপোষক। এই "Irredentist"দের প্ররোচনায় Tyrol এবং Treist-এ অনেকবার দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের পরে হয়ত ইহাদের আশা পূর্ণ হইবে।

অষ্ট্রীয়ার পোলদের অবস্থা রুষিয়া এবং জার্ম্মানির পোলদের অপেক্ষা অনেক ভাল। জার্ম্মানির পোলদের নিজের ভাষায় কথা বলিবার অধিকার নাই। রুষিয়াতে তাদের দশা এতটা খারাপ না হইলেও ওয়ার্-স বিশ্ববিদ্যালয়ে পোল ভাষার স্থান নাই। অষ্ট্রীয়াতে এ-পর্য্যন্ত পোলদের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই। অষ্ট্রীয়ার পোলদের অধিকার জার্ম্মানদের সমান এবং তাহাদের জন্য গবর্ণমেণ্ট পৃথক স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বে তাহারা ইউরোপের অনেক জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ইউরোপে ইহাদের ন্যায় মধুরস্বভাব জাতি আর দুটি নাই। কিন্তু ইহারা আজ দুইশত বৎসর পরাধীন। অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মানি এবং

রুষিয়া এই তিন দেশে মিলিয়া নিজেদের মধ্যে পোল্যাণ্ড দেশটিকে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের চরিত্রহীনতা এবং হ্যাপস্‌বার্গ ও বুরবোঁ বংশের চক্রান্ত হতভাগ্য পোলাণ্ডের পতনের কারণ হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়ান গবর্ণমেণ্টের সদ্‌ব্যবহারের দরুণ অষ্ট্রীয়ার পোলরা এত দিন তুষ্ট ছিল, কিন্তু ইদানিং অষ্ট্রীয়ার মিত্র জার্ম্মানির হাতে তাহাদের স্বজাতিদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পোলরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মান-অধিকৃত রুশ-পোল্যাণ্ডের অবস্থা বেল্‌জিয়ামের অনুরূপ, কিম্বা বেলজিয়াম অপেক্ষাও খারাপ। এই যুদ্ধের ফলে যদি পোল্যাণ্ড আজ দুইশত বৎসর পরে তাহার লুপ্ত স্বাধীনতা আবার ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে এই লোকক্ষয় অনেকটা সার্থক হইবে।

অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন জাতিদের নিজের ভিতর এবং গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চিরদিন বিবাদ থাকা সত্বেও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের জুবিলি-উৎসবে সকল জাতিই সমান উৎসাহে যোগদান করিয়াছিল। সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি এই উৎসাহের কারণ। সম্রাটের জুবিলি ব্যতীত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়াতে আর-একটী স্মরণযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বহুকাল ধরিয়া রুষিয়া এবং অষ্ট্রীয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত তুরস্কের ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল; তুরস্কের পতন হইলেই উভয়ে দেশ ভাগ করিয়া লইবে. এই ছিল তাহাদের অভিপ্রায়। উভয়েরই স্বার্থ এক; তাই উভয়েই মিলিয়া সুলতানের কাছে তাঁহার রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত, বিশেষতঃ মাসিডনিয়ার অধিবাসীদিগের উন্নতির নিমিত্ত নানারূপ সংস্কারের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের একটিও সুলতান কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হয়—ইহা প্রস্তাবকারীদেরও উদ্দেশ্য ছিল না; তুরস্ক সংস্কৃত হইয়া ইউরোপের অন্যান্য রাজের ন্যায় শক্তিশালী হইয়া উঠুক, ইহা অষ্ট্রীয়ার কিম্বা রুষিয়ার মনের কথা নহে। সুতরাং অপর কেহ তুরস্কে কার্য্যকরী সংস্কারের প্রস্তাব করিলে ইঁহারা উভয়ে তুরস্কের অখণ্ডতার দোহাই দিয়া প্রস্তাবিত সংস্কারে বাধা দিতেন। এদিকে কিন্তু উভয়েই স্বার্থসাধনের জন্য রেলওয়ে প্রভৃতির সাহায্যে তুরস্কের অখণ্ডতা নষ্ট করিবার নিমিত্ত গোপনে মন্ত্রণা করিতেন। কিন্তু ইঁহাদের এই-সব ষড়্‌যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নবীন তুর্কীদের বিদ্রোহ বাঁধিয়া উঠে। এই বিপ্লব কিরূপ নৈপুণ্য এবং ধীরতার সহিত চালিত হইয়াছিল—তাহা সকলেরই জানা আছে। সকলেই ভাবিয়াছিল এবার তুরস্কের বাস্তবিক সুদিন আসিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তুরস্কের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের কৃতকার্য্যতা স্থায়ী হইল না। তুরস্কে বিদ্রোহের খবর পাইয়া অষ্ট্রীয়া ও রুষিয়া উভয়েই হতাশ হইলেন। তুরস্ক নবপ্রাণে বলী হইয়া উঠিল—আর ত তুরস্ককে লুট করা যাইবে না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! এইভাবে হতাশ হইয়া উভয় শক্তিই আবার ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সেই ষড়্‌যন্ত্রের ভিতরকার খবর কেউ জানেনা। তবে

এইমাত্র প্রকাশ যে, অষ্ট্রীয়ার পররাষ্ট্র-সচীবের সঙ্গে রুষিয়া এবং ইতালির পররাষ্ট্র-সচীবদের অনেকবার গোপনে মন্ত্রণা হইয়াছিল। ইতালি ট্রিপোলি আক্রমণ করিলে ইঁহারা কেহ বাধা দিবেন না—বোধ হয় তখনই এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এর কিছুদিন পরে সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার করদরাজা ফার্দিনান্দ, ভিয়েনা নগরে আসেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে খুব আদর-যত্ন করেন। ফার্দিনান্দ, জাতিতে পূরা জর্ম্মাণ। ৫ই অক্টোবর অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রণায় ফার্দিনান্দ, বুলগেরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজে "জার" উপাধি গ্রহণ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-রুমেলিয়ার জন্য তুরস্ককে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। ঠিক এর পরের দিন অষ্ট্রীয়া তুরস্কের দুইটি প্রদেশ—বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়া অষ্ট্রীয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলেন। অষ্ট্রীয়ার এই সব কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল, তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব নষ্ট করা—অন্ততঃ তাহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়া এবং তুরস্কে আবার সুলতানের কলুষিত রাজ্যশাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা। যাহা হউক তুরস্কের সঙ্গে তখন যুদ্ধ বাধিল না, কারণ তুরস্ক এই অপমান নীরবে সহ্য করিল। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়া বার্লিন-সন্ধির ফলে • নামে মাত্র তুরস্কের অধীনে ছিল এবং বুলগেরিয়াতেও তুরস্কের অধিকার শুধু কাগজ-পত্রেই ছিল। ইংরাজের ভয়ে Baron von Achrenthal আর বেশী-কিছু করিতে পারিলেন না। ইংরাজ চিরদিনই তুরস্কের বন্ধু ছিলেন। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়া অষ্ট্রীয়া কাড়িয়া লইবার পর সার এডওয়ার্ড গ্রে তুরস্কের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের প্রতি ইংলণ্ডের সহানুভূতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এবং তার দরুণ অষ্ট্রীয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই ব্যাপারে অষ্ট্রীয়ার প্রতি সার্ভিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর বিদ্বেষ আরো বাড়িয়া উঠে। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়ায় বিশলক্ষ সার্ভিয়ান বাস করে। ইহাদের অনেকে ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও জাতিতে স্লাভ। অষ্ট্রীয়ার এই রাজ্য-সংযোজনে সার্ভিয়ান জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়াকে নিজস্ব শাসনপ্রণালী দিয়াছেন এবং বিরানব্বই জন মেম্বর লইয়া একটি ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, অষ্ট্রীয়াতে স্লাভ আধিপত্য বিস্তার করাই এই রাজ্য-সংযোজনের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। খুব সম্ভব, পূর্ব্বাঞ্চলে জার্ম্মান অধিকার বিস্তার করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে তাহাই মনে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশকে জার্ম্মান-ভাবাপন্ন করিবার বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দুই প্রদেশের প্রায় সমস্ত রাজকর্ম্মচারীই জার্ম্মান। দেশের জঙ্গল কাটিবার কিম্বা খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিবার অধিকার জার্ম্মান কণ্ট্রাক্টর ভিন্ন আর কাহারও নাই। অনেক স্লাভনিক বিদ্যালয় উঠাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে জার্ম্মান বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। জার্ম্মান সংবাদপত্র ভিন্ন

দেশের অন্য সব সংবাদপত্রের মতামতের স্বাধীনতার উপর কড়া নজর রাখা হইয়াছে। এই সব কারণে বস্‌নিয়া ও হার্জেগভনিয়ার অধিবাসীরা—মুসলমান এবং ক্রিশ্চান—সকলেই অসন্তুষ্ট।

এইরূপে অষ্ট্রিয়ার সকল জাতিই গবর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট। যুদ্ধের পূর্ব্বে অনেকে বলিতেন যে, বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইলেই অষ্ট্রিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমানে অনেকে বলেন, এই যুদ্ধের পর আর অষ্ট্রিয়ার অস্তিত্ব থাকিবে না এবং থাকিবারও প্রয়োজন নাই। কার কথা সত্য হইবে, বলা যায় না। তবে, ইহা মনে রাখা উচিত যে, এই প্রাচীন সাম্রাজ্য চিরদিন সকলের কাছে পরাজিত হইয়াও আজ পর্য্যন্ত সজীব আছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে ইউরোপের মধ্যে একটি প্রধান দেশ বলিয়া গণ্য হইতেছে। অষ্ট্রীয়াই এককালে "পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্য" বলিয়া পরিচিত ছিল এবং অষ্ট্রীয়ার অধিপতিরাই ইউরোপের নিকট একপক্ষে সীজারের উত্তরাধিকারী এবং অপরপক্ষে ঈশ্বরের পার্থিব শক্তির প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতেন।

শ্রীউপেন্দ্র চৌধুরী

খান-তিনেক চিঠি

(১)

ভাই দিদি! আজ কতদিন পরে তোমায় চিঠি লিখ্‌ছি। তুমি যেদিন শ্বশুরবাড়ী গেলে, সে প্রায় আজ বছরখানেক হতে চল্‌ল। এর মধ্যে মাসীমার কাছে তোমার খবর মাঝে মাঝে পেয়েছি বটে, কিন্তু আমার কোনও খবর তোমায় দিতে পারি নি। এ ক'মাসে আমার উপর দিয়ে যে কত ঝড় বয়ে গেছে, কত যে সহ্য করতে হয়েছে, সে আর কত বলব! একটু নিশ্চিন্ত হয়েই তোমাকে সাধ্যমত সে সব বিষয় শোনাতে বসেছি! কারণ আমার এ দুঃখের কাহিনী তুমি ছাড়া জগতে আর কে শোনবার লোক আছে?

তুমি ত দেখেই গিয়েছিলে এদিকে মার শরীর দিন দিন কি রকম ভেঙ্গে পড়ছিল। রোজ রাত্রে তাঁর জ্বর হতে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তিনি ত কারো কথা শোনবার লোক ছিলেন না! তারই ওপর সকালে স্নানও চল্‌ত ভাত ত খেতেনই। আমি যখন বড় পীড়াপীড়ি করতাম, তখন বলতেন 'আমার ও বাতিকের জ্বর, ওতে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করলে চলে না।' আমি কি এত জানি, তাই বুঝতাম। কিন্তু বেশী দিন এ-ভাবে গেল না। দু-তিন মাসের মধ্যেই মা শয্যাগত হয়ে পড়লেন। হাত, পা, মুখ ফুলে উঠ্‌ল।

গ্রামে আমাদের ডাক্তার-কবিরাজেরও যেমন দুর্দ্দশা, আর আমাদের অবস্থাও তেমনি; কাজেই বুঝতেই পারছ, যে মার

চিকিৎসার ব্যবস্থা কেমন হ'ল। দিন দিন তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। আমি ত চারিদিক অন্ধকার দেখলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর মার মাথার কাছে বসে আছি, এমন সময়ে তিনি বল্লেন, "আমার ত দিন ফুরিয়ে এল ; তা সেজন্যে আমার দুঃখ নেই, এখন তোমার একটা হিল্লে করে দিয়ে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

এ কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললুম, বল্লুম, "মা! তুমি এ সব কথা বল না। তুমি গেলে আমার গতি কি হবে? আমি কোথায় দাঁড়াব তাহলে?"

মা বল্লেন, "সেই ত আমার ভাবনা মা! এতদিন আমি ছিলাম, এক রকম করে চলে যাচ্ছিল, এখন তোমায় কার হাতে দিয়ে যাব, এই ভেবে-ভেবেই মরতে বসেও ত আমার স্বস্তি নেই। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে হারুর মাকে ডেকে সেদিন জামাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলুম। আজ সে ফিরে এসেছে। বিকেলে যখন তুমি ঘাটে গিয়েছিলে, তখন সে এসে আমায় বলে গেল, জামাই বলেছেন দু-এক দিনের মধ্যেই এখানে আসবেন। এতদিনের পর আমার এ অসময়ে তাঁর দয়া হয়েছে। এলে, তাঁর হাতে তোমায় সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

মার কথা শুনে আমার মনে তখন অন্য ভাবনার উদয় হ'ল। স্বামী? আমার স্বামী আসবেন? জ্ঞান হয়ে মার কাছে এইটুকু শুনেছিলাম যে সাতবছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। মা দরিদ্র, কুলীন জামাতার মর্য্যাদা রক্ষা করা তাঁর সামর্থে কুলায় না—কাজেই তিনি বিয়ের পর আর এ-মুখো হন্‌নি। সে কথা আমার বিন্দু-মাত্রও মনে নেই। এতদিন মনে করবার জন্য কোন আগ্রহও হয়নি। কিন্তু আজ মার কথা শুনে স্বামী যে কেমন—তাঁর চেহারিটি কি-রকম,—এ সব মনে করতে অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু বিশেষ কিছু মনে হল না। আর, সাতবছর বয়সে যাকে বিয়ে করে রেখে গেছেন, আজ তার আঠারবছর বয়স হল, এ-পর্য্যন্ত একদিনের জন্য যিনি বিবাহিতা স্ত্রীর একটা কোনও খোঁজ পর্য্যন্ত নেন-নি, তাঁর উপরে যে বিশেষ শ্রদ্ধা হল, তাও নয়। তবু আমি মার কথার কোন উত্তর দিলুম না।

তার পরে তিন-চার দিন কেটে গেল। একদিন আমি ঘরের সব কাজকর্ম্ম সেরে বিকেলে ঘাটে জল আনতে গিয়েছি, মা তখন একলা শুয়েছিলেন, ফিরে এসে দরজার কাছ থেকে শুনলুম, ঘরের ভিতর পুরুষের ভারী গলায় কে কথা কইচে, আমি চমকে উঠলুম। তবে কি যাঁর আসবার কথা ছিল, তিনিই এসেছেন? আমি তখনি ঘরে না ঢুকে দরজার আড়াল থেকে ঘরের ভিতর চেয়ে দেখি মার বিছানার পাশে একজন পুরুষ বসে আছেন। তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে মনে হয়, যেন আরও বেশী বয়স হয়েছে। বার্দ্ধক্যের ভারে শরীর যেন নুয়ে পড়েছে। তিনি সুশ্রী কি কুৎসিত সেটা দেখবার আর ইচ্ছা হল না। আমার বুকের ভিতরটা তখন কাঁপছিল,

কেবলি মনে হচ্ছিল ইনিই কি আমার স্বামী?

বেশীক্ষণ সন্দেহে থাকতে হল না। ঘরে ঢুকতেই মা বল্লেন, "অমিয়া! এদিকে এস! ইনি তোমার স্বামী! প্রণাম কর!"

আমি নিঃশব্দে মার আজ্ঞা পালন করলুম। মা তখন আমার হাত ধরে তাঁর জামাইয়ের হাতে দিলেন ও সজল নয়নে বল্লেন, "বাবা! দুঃখিনীর ধন তোমার হাতে সঁপে দিলুম, ওকে একটু যত্ন কর। এতদিন যে দেখ নি, খোঁজ করনি, তাতে কোন ক্ষতি হয় নি, কিন্তু আজ তুমি ছাড়া সংসারে আর ওর কেউ নেই!"

মার জামাই যে এ কথার উত্তরে বিড়বিড় করে কি বল্‌লেন আমি তা কিছু বুঝতে পারলুম না। বুঝতে ইচ্ছাও ছিল না। মা আমাকে বললেন, "যাও! মুখ হাত ধোবার জল দাও। দিয়ে ওঁর জলখাবারের যোগাড় কর!" আমি হাঁপ ছেড়ে তখনি সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

আমি নিঃশব্দে সংসারের কাজ আর মার সেবা করি আর অবসর পেলে নিজের বইগুলি পড়ে সময় কাটাই। স্বামী আমার সঙ্গে পরিচয় করবার কোন চেষ্টা করেন না। বরং তাঁর মার সঙ্গে যে সব কথা হত তা শুনে আমার সন্দেহ হত যে তিনি আমার জন্য যত আসুন আর নাই আসুন, মার কোথায় কি সম্পত্তি আছে, কি করে আমাদের দিন চলে, এই সব জানবার জন্যই তাঁর বেশী আগ্রহ! আমার উপরে যে একেবারেই তাঁর কোন লক্ষ্য ছিল না, তা বলতে পারি নি। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আমার চাল-চলন, আমার প্রত্যেক কাজকর্ম্ম তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন!

একদিন আমি আড়াল থেকে শুনি, তিনি মাকে বলছেন, "আমাদের গৃহস্থঘরের মেয়েরা রাঁধবে, বাড়বে, কাজকর্ম্ম করবে, সংসার দেখবে, এই ত আমরা জানি, আপনার মেয়ে ত দেখি সবই উল্টো? চব্বিশ ঘণ্টাই ফিটফাট! মাথার চুলটি এদিক হতে ওদিকে যায় না, সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কাপড়-সেমিজ ভিন্ন পরা হয় না! এর উপর ত রাতদিন বই হাতে করে বসে থাকে দেখতে পাই! আমাদের গরীবের ঘরে এমন নভেল-পড়া বিবি নিয়ে কি করে চল্‌বে?"

মা এ কথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "বাছা! তুমি আমার মেয়ের পরিচয় জান না তাই এ কথা বল্লে। আমার নিজের মেয়ে বলে বল্‌ছি না—কিন্তু এমন শান্ত মেয়ে তুমি আর সহজে দেখতে পাবে না। আগে তাকে নিয়ে ঘর কর তারপরে আমার কথা বুঝতে পার্ব্বে। এই ত তুমি এখানে কদিন এসেছ—ঘর-সংসার গৃহস্থালীর কাজ কে করছে, কে এ সংসার চালাচ্ছে তা ত দেখতেই পাচ্ছ? রাতদিন রান্নাবান্না, বাসন মাজা, ঝাঁটপাট, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, জল তোলা, কাপড় কাচা, এত সব কাজ করেও যদি সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে তাহলে সেটা তার গুণের পরিচয় না হয়ে দোষ হয়ে দাঁড়াল? আর পড়া-শোনার কথা যদি বল, ও ছেলেবেলা থেকে আমাদের পড়সী অনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে মানুষ

হয়েছে। তিনি নিজে শিক্ষিত লোক—মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে বড় ভাল বাসেন! তিনি তাঁর নিজের মেয়ের সঙ্গে বরাবর ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন! তাঁর যত্নে ও চেষ্টায় ও এখন বেশ ভালরকম বাঙ্গলা ও ইংরাজী শিখেছে! তাঁর স্ত্রীর কাছে নানারকম শিল্পকাজ সেলাইয়ের কাজ শিখেছে। আমার কাছে মানুষ হলে কি আর এমন হতে পারত? অন্যে যখন দয়া করে ভালবেসে তাকে শেখাতে চাইলেন, আমি তাতে বাধা দিইনি। কারণ ওগুলো যে দোষের কাজ তা আমার ধারণা ছিল না।"

মার কথা শুনে তাঁর জামাই আর কিছু বললেন না। কিন্তু আমার এ রকম লেখা-পড়ার কথা শুনে তিনি যে বিষম বিরক্ত হয়েছেন তা বেশ বুঝতে পারলুম। ভয়ে ও নিরাশায় আমার বুকের ভিতর কেঁপে উঠল। এই স্বামী! এই লোকের অধীনে আমায় চিরকাল কাটাতে হবে! আমার ভবিষ্যৎ যে কি অন্ধকার, আজ তা কতকটা বুঝতে পেরে আমি শিউরে উঠলুম।

তাঁর আসবার প্রায় হপ্তাখানেক পরে একদিন মার অবস্থা খারাপ বোধ হতে লাগল। নিশ্বাস জোরে জোরে পড়তে লাগল। অসংলগ্ন কথাও দু-একটা বলতে লাগলেন। আমি ত ভয়ে আকুল হয়ে সারা রাত তাঁকে নিয়ে জেগে বসে রইলাম। তাঁর জামাই নিজের বিছানায় বসে বসে আফিঙ্গের নেশায় ঝিমুতে লাগলেন।

সকালবেলা পাড়ার লোকে খবর পেয়ে এসে তাঁকে ধরাধরি করে তুলসীতলায় নিয়ে গেল। বেলা দশটার সময় সব শেষ হল। সংসারে আমি অনাথা!

যেদিন মার চতুর্থী হয়ে গেল সেদিন আমার স্বামী বললেন, "আমি কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি করে আর এখানে বসে থাকতে পারি না। কাল সকালে বাড়ী যেতে হবে, সব ঠিকঠাক করে নাও।"

গ্রাম ছেড়ে আসতে আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা হচ্ছিল। ছোটবেলাকার কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি, মার কত কথা মনে হয়ে আমার যে কি কষ্ট হয়েছিল, তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি মনের দুঃখ মনেই চেপে মুখটি বুঁজে তাঁর সঙ্গে তাঁর গ্রামে গেলুম।

আমাকে বাড়ী এনে স্বামী বললেন, "আমি এখানকার জমীদার-সরকারে আট টাকা মাইনের মুহুরীগিরি করি। আমার স্ত্রী যে চব্বিশ ঘণ্টা জ্যাকেট-সেমিজ পরে বই হাতে করে বসে থাকবে, সে আমি সইতে পারব না। তোমার মার কাছে যা করেছ সে সব ভুলে যাও। এই আমার ঘরকন্না দেখে নাও—কাজকর্ম্ম কর, খাও দাও থাক, আমার মত গরীব লোকের ঘরে এর চেয়ে বেশী আর কিছু হতে পারবে না।"

এ কথার কোন জবাব দেওয়া আবশ্যক-বোধ করলাম না। সেই থেকে স্বামীর ঘর করছি। তুমি এ-কথা জেনে বোধহয় খুব সুখী হবে। এতক্ষণ নিজের কথাই সাত-কাহন করলুম। এইবার একটু তোমার খবর নেওয়া যাক্। তুমি কেমন আছ? তোমার খোকা কেমন? তাকে

আমার স্নেহচুম্বন দিও। উকীলবাবু কেমন আছেন? তাঁর কাজ-কর্ম্ম কেমন চলছে, লিখো। তোমার চিঠি পেলে আর যা লেখবার আছে, লিখবো। আজ তবে আসি। ইতি—

তোমার স্নেহের অমিয়া

(২)

ভাই দিদি! তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জেনে সুখী হলুম। আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করেছ, কিন্তু আমার আর থাকাথাকি কি ভাই? দিন কাটাতে হয়, কোনমতে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। সুখ-দুঃখের কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোর না। তবে আমাদের অবস্থার কতক পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে, কিসে কি হল, তা তোমায় লিখছি।

তোমায় আগে লিখেছিলেম যে, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে স্বামীর ঘরকন্না করছি। তাঁর মনে বোধ হয় ভাবনা ছিল যে, এই লেখা-পড়া-জানা নভেল-পড়া স্ত্রী নিয়ে তাঁর ঘরকন্না কি করে চলবে! কিন্তু যখন দেখলেন আমি গাঁয়ের আর-আর মেয়েদেরই মত দিবারাত্রি সংসারের কাজেই মন ঢেলে রেখেছি, পড়াশুনার ধার দিয়েও যাই না, বিশেষ কারও সঙ্গে মিশি না, তখন তিনি আমার উপর কতকটা তুষ্ট হয়েছেন বলে বোধ হল। মিথ্যা বলব না—আমার সঙ্গে তিনি কোন কঠোর ব্যবহার করেন-নি। তবে, তিনি কেবল আমার সেবাটুকু গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন, আমিও সেই কর্ত্তব্যটুকু শেষ করেই নিশ্চিন্ত ছিলাম।

গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে প্রথম প্রথম মেশবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কেন জানি না আমার সঙ্গে কেউ ভাল করে মিশল না। আমি কাছে গেলে ভাল করে কথা কয় না, অথচ আমাকে দেখলে এ-ওর গা-টেপাটিপি করে আর চাপা হাসির ঘটা পড়ে যায়, তাও বুঝতে পারি। একদিন এই সব ব্যাপার দেখে আমি কিছু না বলে চলে আসছি, শুনলুম একজন আমাকে শুনিয়ে বলছে, "দেখেছিস্ কি রকম জাঁক! আমরা যেন ওঁর সমযুগ্যিই নই! কথা না কয়ে চলে যাওয়া হল! কিসের যে এত গরব, তাও ত জানি নে!"

আর একজন বল্লে, "রূপের! রূপের! এ আর বুঝতে পারিস নে! রূপের দেমাকে মট্ মট্ কচ্ছেন! তবু যদি আট টাকা মাইনের মুহুরীর বাঁদী না হতেন।"

এই সমালোচনা শোনবার পর থেকে আমি আর কারও কাছে যাই না। আপনার মনে কাজ-কর্ম্ম করি, আর ঘরে পড়ে থাকি। যা-হোক, একরকম নির্ব্বিবাদে দিন কাটছিল।

একদিন হঠাৎ স্বামী রক্তআমাশয় রোগে পড়লেন। একে তাঁর জরাজীর্ণ শরীর, তার উপর আফিঙ্গ খেতেন, রোগটা বেশ চেপে ধরল। প্রথম দু তিন দিন সামান্য টাটকা-টোটকা ওষুধ খেলেন, তাতে কিছুই হল না, দিন দিন বড় কাতর হয়ে পড়লেন। চার দিনের দিন সকালবেলা জমীদার-বাড়ী থেকে একজন পাইক এল। স্বামী চার দিন কাজে যান নি কেন, তাই জানবার জন্য দেওয়ানজী

তাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পাইককে ডেকে নিজের অবস্থা সব বলে তারপর বলে দিলেন, "একবার ছোটবাবুকে আমার অসুখের কথা জানিয়ে বলবি যে তিনি ত কত গরীব-দুঃখীর ঘরে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করে প্রাণ দিয়েছেন, যদি আমার ওপর দয়া করে একবার আমায় দেখে যান, তবেই যদি এ যাত্রা বাঁচি, নয়ত পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করাবার শক্তিও আমার নেই, আর আমায় বাঁচাতেও হবে না।" এই কথা বারবার বলে তাকে কিছু পয়সা জল খেতে দিয়ে বিদায় করলেন। সে ত চলে গেল। স্বামী আমাকে তখন বল্লেন, "আমাদের জমীদারের বড় ছেলে শরৎবাবু কলকাতা থেকে চারটে পাশ দিয়ে এসেছেন। গ্রামের গরীব দুঃখী প্রজারা অনেক সময় রোগ হলে বিনা চিকিৎসায় বা হাতুড়ে কবিরাজের হাতে পড়ে বিঘোরে মরে, সেইজন্য তিনি ডাক্তারী পড়েছেন। দরকার হলে রোগীর ঘরে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করেন, অসমর্থ রোগীর ওষুধ-পথ্যের খরচ সব নিজেই দেন। এছাড়া গ্রামের উন্নতির জন্য যে কত চেষ্টা করেছেন সে আর কি বলব! যাতে গ্রামে ম্যালেরিয়া না হতে পায় সে জন্য চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার ব্যবস্থা, যত সব পাঁক-পড়া মজাপুকুর কাটিয়ে পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত, ছেলেদের পড়বার জন্য গ্রামে স্কুল, এ সব করেছেন। তাঁর চেষ্টায় গ্রামে একটা লাইব্রেরী আর একটা দাতব্য ঔষধালয় হয়েছে। এইবার শুনছি মেয়েদের জন্য তিনি একটা স্কুল করবার চেষ্টা কচ্ছেন। তাঁর গুণের কথা আর কত বলব? যদি একবার আমার অসুখের কথা তাঁর কাণে ওঠে ত দেখবে তখনি নিজে এসে উপস্থিত হবেন।"

আমি নীরবে সব শুনলাম। যদিও জমীদার-পুত্রকে চিনি না, জানি না, তবু তাঁর গুণের কথা শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার বুকটি ভরে গেল।

তার পরদিন সকালে আমি যখন ঘরে ঝাঁট দিচ্ছি তখন বাইরে থেকে আমার স্বামীকে কে একজন ডাকলে। তার পরেই দেখি এক যুবাপুরুষ ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। আমি ত তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টেনে থতমত খেয়ে সরে দাঁড়ালাম। তিনিও আমায় দেখে অপ্রস্তত হয়ে বাইরে চলে গেলেন। আগের দিনের পাইক এসে আমার স্বামীকে বল্লে, ছোটবাবু এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামী ত উঠতে পারেন না,—শশব্যস্ত হয়ে তাকে বললেন, তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে এস। পাইক চলে গেল। স্বামী আমায় বললেন, শীঘ্র একখানা ভাল আসন দাও। আসনের মধ্যে ত ঘরে দুখানা পিঁড়া,—কাজেই আমি আমার নিজের হাতে বোনা একখানা আসন বের করে জলচৌকির উপর পেতে দিয়ে সরে দাঁড়ালেম। শরৎবাবু ঘরে এসে আমার স্বামীকে বললেন, "আমি জানতাম ঘরে আপনি একলাই থাকেন। তাই একেবারে এসে ঘরে ঢুকেছিলাম।" বলে আরও মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে?" স্বামী সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে আমার এখানে আসবার কথা সব বললেন। শরৎবাবু

আর একবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন।

তারপরে তিনি রোগীকে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করলেন। যা যা জানবার ছিল জিজ্ঞাসা করে দেখে শুনে শেষে বল্লেন, "আপনার রোগ সারতে কিছু সময় লাগবে, কারণ এখন অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আমি রোজ সকালে এসে আপনাকে দেখে যাব। আর ঔষধ-পথ্য যা দরকার, এই পাইক সব দিয়ে যাবে। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

শরৎবাবু চিকিৎসা করতে লাগলেন। প্রায় দুই হপ্তা পরে আমার স্বামী দুটি অন্ন পথ্য পেলেন। কিন্তু তিনি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন যে, আবার যে আগের মত খেটে খেতে পারবেন সে আশা আর করতে পারলেন না। তাঁর কোন বিষয়-সম্পত্তি ছিল না। সামান্য যা উপার্জ্জন ছিল, তাইতে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলত, সঞ্চিতও কিছু ছিল না। অন্নচিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

আমি কোনদিন তাঁর সঙ্গে যেচে কথা বলি-নি। তাঁকে কাতর দেখে একটা কথা আমার মনে আসত, কিন্তু আমি নিজ হতে মুখ ফুটে কিছু বললাম না। শরৎবাবু এখন আর রোজ আসেন না। দু-চার দিন অন্তর এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যান। ক্রমেই অভাব আমাদের সংসারে বেড়ে উঠতে লাগল।

একদিন সব কাজকর্ম্ম সেরে আমি চুপ করে বসে আছি, এমনসময়ে আমার স্বামী বললেন, "দিন চলবার ত আর কোন উপায় দেখছি না। শেষটা কি এই বুড়-বয়সে অনাহারে মরতে হবে না কি, কিছু ত বুঝতে পারছি না। শরীরও ত একবারে অশক্ত হয়ে পড়ল। আমি ত মনে মনে ভাবছি এবার যেদিন শরৎবাবু আসবেন তাঁকে একবার অবস্থাটা খুলে বলব, যাতে আমাদের একটা কিছু উপায় হয়। কি বল?"

আমি কিছু উত্তর দিলুম না; কিন্তু ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে হবে, এ কথা মনে হবা মাত্র ঘৃণায় সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

স্বামী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ বললেন, "কই তুমি যে কিছু বল্লে না?"

তখন আমি বল্লাম, "তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আমি আর তাতে কি বলব বল? তবে, যদি আমার মত জিজ্ঞাসা কর তাহলে বলি, যে নিজের পরিশ্রমে যদি একবেলা দুমুঠো শাকান্ন খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়, সেও ভাল, তবু পরের গলগ্রহ হয়ে ভিক্ষান্নে বেঁচে থাকা আমি ঘৃণা করি। আমি গরীবের মেয়ে, তবু এটুকু আত্মসম্মান আমার আছে।"

স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন, "সে কথা সত্য বটে, কিন্তু পরিশ্রম করবার শক্তি কৈ? যতদিন তা ছিল, ততদিন কি এ কথা বলেছি?"

আমি বল্লাম, "তোমার নেই, আমার ত আছে?"

তিনি এ কথায় বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "তুমি স্ত্রীলোক, তোমার দ্বারা কি কাজ হবে?"

আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বল্লাম, "স্ত্রীলোক বলে কি আমি কিছুই করতে পারি না? কিছু না পারি যদি, ত লোকের বাড়ী রেঁধেও ত নিজের পেট চালাতে পারি! যা মাইনে পাই তাতে তোমার খরচ চলতে পারে? ভিক্ষার চেয়ে সে কি ভাল নয়? কিন্তু তাও করতে হবে না। তুমি না সেদিন বলছিলে যে গ্রামে মেয়েদের স্কুল হচ্ছে? তোমার যদি মত হয়, আমি সেই স্কুলে কাজ নিয়ে মেয়েদের পড়াতে পারি, সেলাই শিখাতে পারি।"

তিনি অনেকক্ষণ কি ভাবলেন। বোধ হয় মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রতি তাঁর চিরদিনের যে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা ছিল, দারুণ অভাব ও অন্নচিন্তায় পড়ে ক্রমে সেটা অন্তর্হিত হয়ে আসছিল। বহুক্ষণ পরে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "আমি এতদিন তোমায় চিনতে পারি নি। যাক্, শরৎবাবু এলে আমি তোমার কথা তাঁকে বলব।"

দু-এক দিনের মধ্যেই শরৎবাবু এলেন। স্বামীর শারীরিক কুশলাদি জানবার পর তিনি বসলে, স্বামী তাঁকে আমাদের সাংসারিক অবস্থার কথা জানালেন। তিনি অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বললেন, "এ কথা আপনি এতদিন ত আমাকে কিছুই বলেন নি! আপনি আমাদের এতদিন পুরাণ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, আপনি যদি এখন অশক্ত হন, ত আপনার সব ভার আমাদেরই—"

স্বামী বল্লেন, "আপনার অসীম দয়া! কিন্তু এ ব্যবস্থায় আমার স্ত্রী সম্মত নয়। সে বলে আমার খাটবার ক্ষমতা থাকতে এ-ভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা বড় ঘৃণা ও লজ্জার কথা!"

আমি ঘরেই ছিলাম; দেখলাম এ কথা শুনে তাঁর চোখে বিস্ময় ও আনন্দের আভা ফুটে উঠল। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে ওঁর কি ইচ্ছা আমাকে খুলে বলুন! উনি তবে কি করতে চান? কি ভাবে আমার সাহায্য পেতে চান উনি?"

স্বামী তখন আমার কথা সব তাঁকে খুলে বল্লেন। শরৎবাবু এ কথা শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে শেষে বল্লেন, "দেখুন! আজ আপনার কথা শুনে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হয়েছি, তা আর কি বলব? আমি অনেকদিন থেকে মেয়েদের জন্যে একটি স্কুল খুলতে চেষ্টা করছি। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক গ্রামের অনেকেই মেয়ে পাঠাতে রাজি হয়েছেন। স্কুল-বাড়ীও ঠিক করে রেখেছি। কেবল উপযুক্ত একজন শিক্ষয়িত্রী এখন পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারি-নি বলে স্কুল খুলতে পাচ্ছি না। কলকাতা থেকে আনতে গেলে টাকা অনেক বেশী পড়ে। স্কুলের এই প্রথম অবস্থায় সেটা সুবিধাজনক নয়। উনি যদি এখন এ ভার নেন তাহলে যে শুধু আপনার সুবিধা তা নয়, আমারও যে কি উপকার করা হয় সে আর মুখে কি বলব? কারণ এটি আমার বহুদিনের কামনা ছিল। তা হলে আজ আমি আসি। শীঘ্রই সব ঠিক করে আপনাকে জানাব।"

তিনি উঠে দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আবার বল্লেন, "যেদিন আপনাকে

আমি প্রথমে দেখেছিলাম, সেইদিনই আমার মনে ধারণা জন্মেছিল যে, আপনার স্থান সাধারণ স্ত্রীলোকদের চেয়ে অনেক উঁচুতে! আজ আপনার পরিচয় ভাল করে পেয়ে আমার সে ধারণা আরও দৃঢ় হল! বেশী আর কি বল্‌ব, যদি আপনার আদর্শে আমাদের এই গ্রামের মেয়েরা উন্নত হতে পারে, তবেই বুঝব আমার এতদিনের সব পরিশ্রম সফল হয়েছে!”

আমি শুধু নীরবে নমস্কার করলাম। প্রতি-নমস্কার করে তিনি প্রফুল্লচিত্তে চলে গেলেন।

এখন আমরা স্কুলবাড়ীতেই থাকি। স্কুলের ঝি আমার সব কাজকর্ম্ম করে দেয়। এখনও বেশী মেয়ে জড় হয়-নি। ছোট বড় সবশুদ্ধ পনেরটি। এদের পড়িয়ে সেলাই শিখিয়ে, আমার বেশ একরকমে দিন কাটছে। আমাদের সব অভাব দূর হয়েছে। তবে, স্বামীর শরীর দিন দিন বড় অপটু হয়ে পড়্‌ছে।

তোমাদের সব খবর দিও। খোকা কেমন আছে? সে এখন কথা বলতে পারে কি? আমার ভালবাসা জানাবে ও স্নেহের চুম্বন খোকাবাবুকে দেবে! আজ এই পর্য্যন্ত—ইতি

তোমার স্নেহের বোন—অমিয়া।

(৩)

ভাই দিদি! এবার তোমার চিঠির উত্তর দিতে অনেক দেরি হয়ে গেল। হয়ত তুমি মনে মনে এজন্য রাগ করেছ, কিন্তু কেন যে আজ তিন-চার মাস তোমার খবর নিতে পারি-নি, তা জানলে আর তুমি আমার দোষ দেবে না।

প্রথমেই একটা খবর দিচ্ছি, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীর মোটেই ভাল ছিল না, বয়সও হয়েছিল, বিশেষ সেই রক্তআমাশয়ের পর থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, তার উপর জ্বর হল, সে ধাক্কা আর সামলাতে পারলেন না। মার মৃত্যুর পর এতদিন তিনিই আমার অভিভাবক ছিলেন। আজ তিনিও চলে গেলেন। সংসারে আজ আমি একবারে একলা!

আমি এখনও আগের মত স্কুলে কাজ করি, মেয়েদের নিয়ে কোনমতে দিন কাটাই। মেয়েরা সকলে আমাকে খুব ভালবাসে। যদি এই রকমেই এখানে আমার সারাজীবনটা কেটে যেত, তাহলে তার চেয়ে প্রার্থনীয় আমার আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার অদৃষ্টের লিখন অন্যরূপ—কাজেই তা হল না। আমার এখানকার বাস উঠতে বসেছে! শরৎবাবু মাঝে মাঝে স্কুল দেখতে আসতেন, আমি পড়ান ছাড়া স্কুলের আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র সবই রাখতাম, কাজেই স্কুল-সংক্রান্ত কাজে দরকার হলেই তিনি আমার কাছে আসতেন, হিসাবপত্র দেখতেন। এতে অবশ্য দূষণীয় কিছুই ছিল না, কিন্তু তা হলে কি হবে—এই উপলক্ষ্য করেই আমার কলঙ্ককাহিনী গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল।

গ্রামের লোকে—বিশেষ মেয়েরা কোন-দিনই আমার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, তবে এতদিন কেউ কোন কথা বলতে পারত

না। স্বামীর মৃত্যুর পর আমার নামের সঙ্গে শরৎবাবুর নাম যোগ করে চারিদিকে একটি বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হল। পল্লীনারীরা ঘাটে যাবার পথে দলে দলে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যে কত ঠাট্টা-টিটকারী আরম্ভ করলে, সে আর তোমায় লিখে কি জানাব?

কেউ বলে, "প্রথম থেকেই আমি জানি যে ও ছুঁড়ী কম নয়! লেখাপড়া শিখে ফাজিল হয়ে কার মাথা খাবে, ও-সব চরিত্তিরের লোকের রাতদিন সেই চেষ্টা! কেন, একথা আমি কি আগেই তোদের বলি-নি?"

অন্যে বললে, "ওই জন্যেই ত ওর সঙ্গে মিশলুম না! ওসব রীতের লোকের সঙ্গে কি আমাদের পোষায়? গেরস্তর মেয়ে ঘর-সংসারের কাজ করবে, রাঁধবে-বাড়বে—সবাইকার সেবা-যত্ন করবে—এই ত জানি;—ওমা! এ—তা—না,—দিনরাত পটের বিবির মত সেজে কেতাব নিয়ে বসে আছেন! আর, এই সব কাণ্ড! আজকাল কি গাঁয়ে আর আগের মত শাসন আছে? এখন সব নিজে-নিজেই কত্তা! কেউ কারো শাসন মানে না! আগে পাড়া ঘরে এমন হলে মাথা মুড়িয়ে গাঁয়ের বার করে দিত না!"

আর একজন বল্লে, "তা ধরেছে বেশ মাতব্বর লোককে! কবে বিয়ে হয় দেখ না!"

পিছন থেকে অন্য একজন ফোঁশ্ করে উঠল—"আরে রেখে দে তোর বিয়ে! বিয়ে হলে বাপের ত্যজপুত্তুর হতে হবে সে খবর রাখিস কিছু? তবে হ্যাঁ! নিকে হতে পারে বটে!"

এইরকম সমস্ত দিন ধরে যে কত কুৎসিত কল্পনা-জল্পনা চলতে লাগল সে আর কি বলব? আমি ত একেবারে ঘৃণায় লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেলুম,—এরা বলে কি? আমি ত কখনো স্বপ্নেও এরকম অসম্ভব আশা মনে আনি নি! আমার দোষ কি? সংসারে আমার মত একটা অসহায়া নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক—একপাশে পড়ে দুমুঠো অন্ন করে খাচ্ছে, তাতে কেন এরা এমন করে বাদ সাধে? আমি ত মনে-জ্ঞানে কখন কারুর কোন ক্ষতি করি-নি? আর, এ-সব কথা যদি তাঁর কানে উঠে থাকে? একথা মনে আসবামাত্র লজ্জায় আমার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল! ছি! ছি! আমি তাহলে কি করে তাঁর কাছে মুখ দেখাব?

ক্রমেই দেখলুম, স্কুলে মেয়ের সংখ্যা কমতে লাগল। সব-চেয়ে বড় মেয়েদুটাই প্রথমে স্কুল ছেড়ে দিলে। তাদের না দেখে আমি অন্য মেয়েদের কাছে খোঁজ করলুম—শুনলুম আর তারা স্কুলে আসবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় একটি মেয়ে বল্লে, "সে কথা আমি আপনার কাছে বলতে পার্ব্ব না।" আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম।

একে একে সব মেয়েদের আসা বন্ধ হতে লাগল। স্কুলের ঝি বাড়ী বাড়ী গিয়ে সাধ্য-সাধনা করেও কারুকে আনতে পারলে না। সকলের বাড়ী থেকে বলে পাঠালে, জমীদারবাবুর ভয়েও কেউ আমার মত মন্দ স্ত্রীলোকের কাছে নিজের মেয়ে ছেড়ে দিতে

পারে না। তিনি বড়লোক যা করেন, তাই শোভা পায়, তা-বলে সকলের ঘরে ত তা চলবে না।

স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। আমার যে তখন মনের কি অবস্থা তা তোমায় আর কি জানাব? নিজের লজ্জা ও অপমানের ত কথাই নেই, তার উপর কাজটি যদি যায়, তবে আমি কোথায় দাঁড়াব? সব-চেয়ে এই ভাবনাই প্রবল হয়ে দাঁড়াল।

সেদিন সন্ধ্যের সময় একলাটি বসে নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবছি, হঠাৎ শরৎ-বাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি এমন সময়ে কখন আসতেন না—আমি মনে করলুম, তবে বুঝি বিশেষ কোন কাজ আছে। তাঁকে বসতে বলে আমি নীরবে তাঁর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। আজ আর তাঁর মুখের দিকে আমি চাইতে পারলুম না।

তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, "এ সময়ে এসে ত আপনার কোন কাজের ক্ষতি করলুম না?"

আমি বললুম, "আজ তিন-চার দিন থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে—মেয়েরা কেউ আসে না। আমার হাতে কোন কাজ-কর্ম্মই নেই।"

তিনি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, "স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে! একথা ত আমি জানতুম না!" খানিক নিস্তব্ধ থেকে তিনি আবার বললেন—"এই সব লোকদের উন্নতির জন্যেই আমি এতদিন নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলাম! যাক্ সেকথা—আমি আপনাকে যা বলতে এসেছি, আপনি তা শুনে আমার প্রতি হয়ত অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আজ আর সে কথা প্রকাশ করা ছাড়া উপায় নেই! গ্রামে আমাদের দুজনের নামে যে নিন্দা ও অপবাদ চলছে আপনি তা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আপনাকে এ মিথ্যা কলঙ্ক থেকে মুক্ত করবার জন্য আমাদের বিবাহের প্রস্তাব করতে আমি এসেছি। এখন, এ বিষয়ে আপনার কি মত—কোনরকম লজ্জা না করে আমাকে বলুন।"

তিনি থামলেন। আমি দাঁড়িয়েছিলুম, ধীরে ধীরে সেইখানে বসে পড়লুম। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল। একটি কথা আমার মুখ থেকে বেরুল না।

তিনি বলতে লাগলেন, "শুধু যে এই কুৎসা রটেছে বলে আমি এ কথা বলছি তা মনে করবেন না। যেদিন আপনাকে প্রথম দেখেছি সেইদিনই আমার মন আপনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এতদিন আমি সে কথা প্রকাশ করি-নি। বাড়ীতে এতদিন মা ও বাবা বিয়ে করবার জন্যে আমাকে জ্বালাতন করেছেন। আমি সে সব কথা উড়িয়ে কাটিয়ে দিই। মনে ছিল যাঁকে ভালবাসি, যদি কখনো তাঁকে পাই, তবেই বিবাহ হবে, নয়ত চিরকাল এইরকমেই যাবে। আমি যা বলতে এসেছিলাম, তা বলা হল, এখন আপনার উত্তরের উপর আমার জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।"

আমি আজ যে কথা শুনলুম—সে যে আমার আশার অতীত! আমার মত নগণ্য হতভাগিনীকে তিনি ভালবেসেছেন! এ কথা যখন শুনলুম—তখনি যেন আমার

চিত্তের সকল ক্ষোভ সকল অপমানের জ্বালা এক মুহূর্ত্তে জুড়িয়ে গেল! মনে হল আমি এতদিন যে কষ্ট যে লাঞ্ছনা সহ্য করেছি, আজ এই তার চরম পুরস্কার! কেমন যেন একটা পুলকময় অবসাদে আমার সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে আসছিল! আমি তাঁর কথার উত্তর দেব কি, বাক্যে-মনে তখন একেবারে নীরব-নিস্পন্দ হয়ে গেলুম।

শরৎবাবু আবার বল্লেন, "শিশুকালে আপনার যে বিবাহ হয়েছিল, সে গণ্য নয়। আর তাও যদি ধরা যায় ত, বিধবা-বিবাহও ত অশাস্ত্রীয় নয়! সে ত আজকাল কত জায়গায় হয়েছে! আপনি শিক্ষিতা, আপনার মনে যে এ বিষয়ে কোন কুসংস্কার আছে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

আমি তখন চমকে উঠলুম! বিবাহ! না—না—এ কখনো হতে পারে না। বিস্তর আয়াসে মনের আবেগ দমন করে আমি বল্লুম, "আপনি আমার অসময়ের আশ্রয়দাতা প্রতিপালক, আমি যেখানেই থাকি আপনার দয়া কখনো ভুলতে পার্ব্ব না! কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিতান্ত অযোগ্যা, আপনি প্রভু—আমি আশ্রিতা মাত্র, আপনার সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্বন্ধ হতে পারে না, আমায় ক্ষমা করুন!"

শরৎবাবু বল্লেন, "এই কি আপনার মনের আসল কথা? না! এত সহজে আমি আপনার আশা ছাড়তে পার্‌ব না! আপনি যে সব কথা বল্লেন সে সবই নিরর্থক! আপনি আমার যোগ্য কি না সে বিচার ত আমি করেছি! এখন আমাকে আপনি যোগ্য বিবেচনা করেন কি না সেই কথা বলুন!"

তাঁর এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। তাঁর প্রতি আমার মনের যে ভাব তা আমি জীবনে কারো কাছে প্রকাশ করতে পার্ব্ব না। কিন্তু তা-বলে তাঁর প্রস্তাবেও আমি কিছুতে রাজি হতে পারি না।

আমাকে নীরব দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বল্লেন, "আমি এখনি আপনার শেষ উত্তর চাইনা। আপনি এ বিষয় ভাল করে ভেবে দেখবেন। আমি দুই-চারদিনের মধ্যে আবার আসব; কিন্তু আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ যে, শুধু আপনি আমাকে ভালবেসে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারবেন কিনা, এইটুকুই ভেবে দেখবেন। আমাদের দুজনের মধ্যে যে সামাজিক অসামঞ্জস্য আছে, কিম্বা এ বিবাহ হলে সমাজে কি-রকম বিপ্লব বাধতে পারে সে সব ভাববার কোন দরকার নেই। আজ-কার মত আমি আসি।"

তিনি চলে গেলেন। আমি বিছানায় পড়ে পড়ে অনেক ভেবে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করতে লাগলুম। সন্ধ্যার সময় স্কুলের চাকরি গেলে কোথায় দাঁড়াব, কি করে দিনপাত হবে, এই সব ভাবনায় আকুল হয়েছিলুম। এখন দেখছি মুখের একটি কথায় এক মুহূর্ত্তে আমার সব দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচে যায়! শুধু কি তাই? যে সৌভাগ্য আমি কখনো মনে মনে কল্পনায়ও আনতে সাহস করি-নি আজ তা অযাচিত ভাবে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে, দারুণ পিপাসায় যার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে তার সামনে সুবাসিত সুশীতল পানীয় ধরলে

তার যে অবস্থা হয়, আমারও তখন সেই দশা! এ লোভ কি সহজে সামলান যায়? আমি এখন কি করব? তবে কি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেব? কিন্তু, আমি বিধবা, আমাকে গ্রহণ করলে তাঁকে অনেক অপযশ অনেক গ্লানি সহ্য করতে হবে। তিনি অবশ্য সবরকম ত্যাগস্বীকারেই প্রস্তুত আছেন, তাঁকে এ-সব কিছুতে টলাতে পারবে না, কিন্তু আমি কেমন করে জেনে শুনে তাঁর এ অধঃপতনের কারণ হব? না! না! আমাদের বিবাহ হতে পারে না! বিবাহে দরকারই বা কি? আমি আমার প্রেমের পুরস্কার পেয়েছি, তাতেই এখন আমার বুক ভরে রয়েছে—আর আমি লোকের নিন্দা, অপমান, কলঙ্ক কিছুরই ভয় রাখি না! এবার তিনি এলে তাঁকে সব বুঝিয়ে বোলবো। যদি তাতেও তিনি না বোঝেন, তখন অন্য উপায় স্থির করা যাবে।

তার পরদিন স্কুলের ঝি ঘাট থেকে নেয়ে এসে বল্লে, "মা! একটা কথা শুনে এলুম। শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁর বাপের নাকি খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন 'যদি তুমি এ কাজ কর তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই,—আমার বিষয়ের উপরও তোমার কোন দাবী থাকবে না।' জমীদার-গিন্নি ত আমায় ডেকে দশ কথা শুনিয়ে দিলে। সবাই তোমাকেই যাচ্ছেতাই গালাগালি কচ্ছে। তা মা! আমি ত সব দেখছি, তুমি ত কোন কথাই বল-নি, শরৎবাবু বিদ্বান লোক, তিনি কেন এমন অন্যায় কাজ করতে গেলেন?"

আমি তার কথার উত্তর দিলুম না! দেখলুম, গ্রামের পুরুষগুলি শুদ্ধ এই আন্দোলনে প্রবল উৎসাহে যোগ দিয়েছে। স্কুলবাড়ীর কাছে গ্রামের যত-সব নিষ্কর্ম্মা কুচরিত্রের লোক, যত-সব বখাটে ছোঁড়া একটা আড্ডায় বসে সন্ধ্যেটা গান-বাজনা করে আর লোকের ঘরের নিন্দা-কুৎসা করে কাটায়। এমন সব সঙ্কীর্ণ চরিত্রের লোক এ গ্রামের! যখন আমি আশ্রয়হীন হয়ে পথে দাঁড়িয়েছিলুম, একমুঠো অন্নের সংস্থান ছিল না, তখন একটা মুখের কথা বলে খোঁজ নেবার লোক ছিল না, কিন্তু আজ আমার এই আশ্রয়টুকু ঘোচাবার জন্য এরা সকলে পড়ে মহা উৎসাহে লেগে গেছে! আমি ঘর থেকে শুনছি, সত্য মিথ্যা নানা অলঙ্কার দিয়ে এখানেও আমার চরিত্রের বর্ণনা চলেছে!

লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে জর্জ্জরিত হয়ে কোনমতে সে রাত ও তার পরদিনও কাটল। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করেছিলাম। তাই এ দিন আমার মন কতকটা স্থির হয়েছিল।

বৈকালে আমি ঘরের জানালার ধারে একলা বসেছিলাম। এ দুদিন স্কুল বসে-নি। আমার কোন কাজ ছিল না। আমি বসে বসে নিজের অদৃষ্টের বিষয় ভাবছিলাম; হঠাৎ দেখলাম, একখানা টেলিগ্রাম হাতে করে শরৎবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই চিরহাস্যময় প্রফুল্ল মুখ আজ কি গম্ভীর,—কি বিষাদময়! কিছুক্ষণ আমরা কেহই কোন কথা বললাম না।

তারপরে তিনি বল্লেন, "কলকাতা থেকে আমার এক বন্ধু বিশেষ দরকারে পড়ে

জরুরি টেলিগ্রাম করেছেন। আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি, তাই এ কথা আপনাকে বলতে এলাম। ফিরতে বোধ হয় চার-পাঁচ দিন দেরি হবে।"

আমি চুপ করেই থাকলাম। তিনিও খানিক থেমে বল্লেন, "আমি যা বলে গিয়েছিলাম আজ কি তার উত্তর পাব?"

আমি আজ সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে বেশ সহজভাবেই বল্লাম, "আমার ওপর আপনার অসীম দয়া! কিন্তু বার বার আমাকে আপনার অবাধ্য হতে হচ্ছে, আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন! আমি যেমন আছি এমনি থাকতে পেলেই সুখী হব। এর চেয়ে বেশী উচ্চ আশা আমার নেই! আমি বিধবা, সমাজে নিন্দিতা, আমাকে বিবাহ করলে আপনার যশ মান ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব ধূলিসাৎ হবে, সমাজে আপনাকে অশেষ লাঞ্ছিত ও নিন্দিত হতে হবে! আমার প্রাণ থাকতে আমি আপনার এ অধঃপতনের কারণ হতে পার্ব্ব না! আর আমার বলবার কিছু নেই! এ প্রসঙ্গ এখানে শেষ হলেই আমি সুখী হব!"

শরৎবাবু বল্লেন, "আপনি যা বল্লেন এতে আপনার হৃদয়ের মহত্বই প্রকাশ হল, কিন্তু আমি এ কথা শুন্‌তে আসি নি। আমার প্রশ্নের উত্তর কি, সেইটা জানতে শুধু এসেছি। আপনি শুধু বলুন, আমাকে ভালবেসে গ্রহণ করতে পারবেন কি?"

আমি এ দুদিন অনেক চেষ্টায় মন সংযত করেছিলাম, কিন্তু আর সহ্য করতে পারলাম না। এ কথার উত্তর যা, মুখে বলে আমি কি করে তা জানাব? তাঁর সম্মানরক্ষা করে পাশে দাঁড়াবার মত অদৃষ্ট ত আমার নয়! অশ্রু এসে আমার দৃষ্টি রোধ করল! হৃদয়ের রুদ্ধ যাতনা ও অপমান পুঞ্জীকৃত অশ্রুরাশিতে পরিণত হয়ে আমার সব চেষ্টা সব সংযম মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাসিয়ে দিল।

এ ভাবে কতক্ষণ কেটেছে মনে ছিল না, সহসা তিনি উঠে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার একখানি হাত ধরে বললেন, "আমি বুঝেছি, তোমার মন আমার প্রতি বিমুখ নয়,—তোমার ঐ নীরব রোদনেই তোমার মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। তবে বল! কেন তুমি আমায় ত্যাগ করবে?"

তাঁর সেই আবেগকম্পিত মৃদুস্বরে কি অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছিল, সে শুধু আমি নিজের অন্তরেই অনুভব করলুম, মুখে তা প্রকাশ করা যায় না! আমি মুগ্ধ হয়ে একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, আমাদের চারিচক্ষের মিলন হল! তাঁর সে দৃষ্টিতে কি প্রেম! কি করুণা! আমার হাত তখনও তাঁর হাতের মধ্যে থর্ থর্ করে কাঁপছিল! মুহূর্ত্তের জন্য আমি সব ভুললাম! আমার সব প্রতিজ্ঞা সব সংকল্প বুঝি-বা ভেসে যায়!

তিনি আবার বল্লেন, "আমি তোমার মনের ভাব বুঝেছি, তোমার আপত্তির কারণও সব বুঝেছি। এখন আমি যা স্থির করেছি তা শোন! আমারই দোষে চারিদিকে তোমার নামে যে কলঙ্ক রটেছে, সেই দেশব্যাপী অখ্যাতি ও কুৎসার স্রোতে তোমাকে ভাসিয়ে আমি যে সরে দাঁড়াব, তেমন কাপুরুষ আমি নই! বাবার সঙ্গেও

আমার এ কথা হয়েছে। আমি তাঁকে স্পষ্ট কথাই বলে দিয়েছি। তিনি আমায় বিষয় থেকে বঞ্চিত করবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। তাতেই বা ক্ষতি কি? তাঁর বিষয়ের ওপর আমার কোন আসক্তি নেই। আমার নিজের উপার্জ্জন করে সংসার প্রতিপালন করবার ক্ষমতা আছে। তার পর লোকনিন্দা? সে ত আমি গ্রাহ্যই করি না। তাহলে আমাদের মিলনে আর কি বাধা আছে? জরুরি দরকার বলেই আমাকে যেতে হচ্ছে নয়ত এ সময়ে আমি যেতাম না। তোমার কাছে আমার মিনতি —আমার জন্যে অনেক সহ্য করেছ আর দু-চার দিন সহ্য কর। আমার তার চেয়ে বেশী দেরি হবে না!”

তিনি চলে গেলেন। আমি বিবশপ্রাণে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লাম। আড্ডা-ঘরের ছোঁড়ারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল,—তারা হারমোনিয়ামে সুর দিয়ে গান ধরলে—

“দুজনে দেখা হল—মধুযামিনী রে!
কেহ কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!”

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, এখানে থাকলে আমি নিজের সংকল্প বজায় রাখতে পারব না। আমি যে কত দুর্ব্বল, আজ নিজেই তা টের পেয়েছি! কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে আমি কোনমতেই সম্মত হতেও পারি না। আমি কে? সামান্য পথের ধূলা মাত্র! বায়ুতাড়িত তৃণের মত সংসারে আজ এখানে কাল ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর, আমারই জন্য তাঁর মত মহৎ লোকের এত অধঃপতন? আজ যদি আমি তাঁর চক্ষের সামনে থেকে সরে যাই, অবশ্য প্রথম প্রথম তাঁর কিছু কষ্ট হতে পারে! কিন্তু কালে যখন তাঁর এ মোহ কেটে যাবে, তখন আবার তিনি সুখী হতে পারবেন। তাঁর যশ মান সুখ সৌভাগ্য সবই বজায় থাকবে! তবে আমি কেন তাঁর জীবন-পথে দুষ্টগ্রহের মত দাঁড়াব? না! আমি এখানে থাকব না! কাল তিনি গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাবেন, এটা আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধার কথা! আমিও কাল সময় বুঝে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাব!

তারপরে মনে হল, কিন্তু যাব যে—তা, কোথায়? অনেক ভেবে-চিন্তেও ত কোন আত্মীয়-বন্ধুকে মনে করতে পারলাম না। তখন ভাবলুম, সে সব ভেবে ফল কি? যেদিকে দু'চোখ যায় এখন ত বেরিয়ে পড়ি, তারপরে যেখানেই হোক্ আশ্রয় একটা জুটবেই! এই সংসারে এত লোকের ঠাঁই আছে, আর আমার কি হবে না?

এই কথাই ঠিক! কর্ত্তব্য স্থির হলে আমি উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আড্ডাঘর থেকে তখনো গানের সুর বায়ু-স্রোতে ভেসে আসছিল। তারা তখনো গাইছিল—

আর ত হল না দেখা—জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি—যমুনাতীরে—
মধুযামিনী রে!

আমি খানিক জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

তাদের গান শুনলাম। তারপর তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। তাঁর নামেও একখানি চিঠি রেখে কাল যখন সময় বুঝব, তখনি বেরিয়ে পড়ব। তুমি হয়ত এই চিঠি পেয়ে আমার অবস্থা ভেবে কত কষ্ট পাবে। তাই লিখছি, আমার কথা মনে করে বৃথা কষ্ট পেও না। আমি মন স্থির করেছি। আর আমার কষ্টবোধ নেই। জানি "ফুটেছি মরুর মাঝে, দুদিন পরে যাব ঝরে!" এ ছাড়া আমার জীবনের পরিণতি আর কি হতে পারে? তা যদি না হবে, তাহলে কি মা আমার সাতবছর বয়সে বিয়ে দিয়ে এম্‌নি করে আমরা সারাজীবনটা নষ্ট করে দিতেন? যাক,—গত কথা ভেবে লাভ কি?

তাহলে আজকার মত আসি। যেখানেই থাকি তোমাকে কখনো ভুলব না। কোন জায়গায় একটু স্থির হয়ে বসেই আবার চিঠি লিখব। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি

তোমার স্নেহের বোন্—অমিয়া।

সরোজকুমারী দেবী।

লজ্জার বিকাশ

লজ্জা আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি বটে কিন্তু ইহা আমাদের সহজাত নহে। কারণ জন্মের সঙ্গে লজ্জার বিকাশ দূরের কথা, শৈশব উত্তীর্ণ হইলেও লজ্জার বিকাশ হইতে সময় লাগে। এই প্রকারে লজ্জার বিকাশ গৌণকল্পে হয় বলিয়া ইহা যেমন মনুষ্যের বিশেষ বিকাশ, তেমনই ইহা উচ্চবিকাশেরও লক্ষণ। বস্তুতঃ ক্রমবিকাশবাদের আবিষ্কর্তা স্বনামখ্যাত ডারুইন্ সাহেবের অনুসন্ধানের ফলে কোন কোন অসভ্যজাতির মধ্যে লজ্জার বিকাশ এখনও হয় নাই বলিয়া যে জানিতে পারা গিয়াছে (১) তাহাতেও লজ্জা উচ্চবিকাশের লক্ষণ বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

মনোবৃত্তির পরিস্ফুরণই উচ্চবিকাশের লক্ষণ, বয়োবৃদ্ধির সমনুপাতেই এই স্ফুরণ হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লজ্জার বিকাশ হওয়ায় ইহাকেও মানসিক পরিস্ফুরণেরই ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ডারুইন্ ইহার প্রকাশ সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত মতেরই আভাস পাওয়া যায়; যথা—

"But we cannot cause a blush as Dr. Burgess remarks, by any physical means, that is by any action on the body. It is the mind which must be affected."—The Expressions of the Emotions in Man and Animals." p 327.

"আমরা বাহ্য উপায় অর্থাৎ শরীরের উপর কোন কার্য্য-দ্বারা লজ্জা উৎপাদন

(১) "The Expressions of the Emotions in Man and Animals." Popular Edition (John Murray) 1904. p. 338.

করিতে পারি না। লজ্জা উৎপাদনের জন্য মনের উপর ক্রিয়ারই আবশ্যক।”

বাইবেলে মানবের আদি পিতামাতা আদম ও ইভের বৃত্তান্তে লজ্জা-উৎপত্তির যে আখ্যান পাওয়া যায় তাহাতে উপরিউক্ত মতের আশ্চর্য্য সমর্থনই রহিয়াছে। আদি মানবজননী ইভ্ সর্পের প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল নিজে ভক্ষণ করিলে ও আদি মানব-পিতা আদমকে ভক্ষণ করাইলেই তাঁহাদের মধ্যে প্রথম লজ্জার সঞ্চার হয়। এই লজ্জার প্রভাবে তাঁহারা পত্রের দ্বারা প্রথম গাত্রাবরণ প্রস্তুত করেন। এতদবসরে ঈশ্বর তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা লজ্জায় স্বর্গোদ্যানের বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হন। (২)

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যে লজ্জার আবির্ভাব হয় উদ্ধৃত বাইবেলের উপাখ্যানের তাহাই সারমর্ম্ম। লজ্জার বিকাশের সহিত যে একটি অন্তরালে থাকিবার ভাব ও ভয়ের ভাব সংমিশ্রিত থাকে, লজ্জা-বিকাশের এই মূলনিয়মও উদ্ধৃত বাইবেলের উপাখ্যান হইতেই প্রমাণিত হয়।

লজ্জার উৎপত্তি ও বিকাশের আভাস এই। এখন ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি? “অন্যের সংস্রবে সঙ্কোচভাব” ইহাই লজ্জার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। অন্যের দ্বারা লক্ষিত হইলেই এই সঙ্কোচভাবের উৎপত্তি হয়। ভয়বাচক যে ‘বিলক্ষ’ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা এই প্রকারে লক্ষিত হওয়ার অর্থ প্রকাশ করে বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং লজ্জাভাবকে আমরা বিশেষরূপে সামাজিক বিকাশ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি।

অন্যের দ্বারা লক্ষিত হইলেই যে আমাদের সঙ্কোচ-ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে; কিন্তু তৎসঙ্গে আমাদের মনে জ্ঞানোন্মেষ হওয়ারও প্রয়োজন। জ্ঞানোন্মেষের দ্বারা আমাদের মনে আত্মপরভাব বিশেষরূপে জাগ্রত হইলে, তাহাতে পরসংস্রবভাব অনুভূত হইয়া সঙ্কোচভাবের উৎপাদন করিয়া থাকে।

---

(২) 6. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also to her husband with her, and he did eat.

7. And the eyes of them forth were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig-leaves together and made themselves aprons.

8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou?

10. And he said, I heard the voice in the garden, and I was afraid, because Iwas naked and I hid myself.—Genesis Chapter III.

শিশুদিগের মনে জ্ঞান মুকুলিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকায় আত্মপরজ্ঞানও অপরিস্ফুট থাকে। তাহাতেই তাহারা অন্যের দ্বারা লক্ষিত হইয়াও সঙ্কোচভাবের কোন চিহ্ন প্রকাশ করে না। যেরূপ নিঃসঙ্কোচে ইহারা অন্যের প্রতি তাকাইয়া থাকে, বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে তদ্রূপ তাকাইয়া থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। ডারুইন্ এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Children at a very early age donot blush, nor do they show those other signs of self-consciousness which generally accompany blushing, and it is one of their chief charms that they think nothing about what others think of them. At this early age they will stare at a stranger with a fixed gaze and unblinking eyes as on an inanimate object, in a manner which we elders cannot imitate." Ibid p. 346.

যে-সকল অসভ্য জাতি জ্ঞানের নিম্নস্তরে অবস্থিত, পূর্ব্বোক্ত কারণেই তাহাদের মধ্যে সঙ্কোচভাব উদ্বুদ্ধ না হওয়ায়, লজ্জাভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অপর লোক, বিশেষতঃ অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে সঙ্কোচভাব উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে অপ্রকাশ রাখিতে যে প্রবর্ত্তিত করে তাহাই লজ্জার প্রথম ভাব। বাইবেলে আদম ও ইভ্ যে ঈশ্বরকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, তাহা এই সঙ্কোচভাব হইতেই হইয়াছিল।

লজ্জাবতী লতাতে আমরা লজ্জার সঙ্কোচভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই। স্পর্শমাত্রই ইহার পত্রসকল মুদ্রিত হইয়া ইহা যেন আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত হইতে চায়। এই সঙ্কোচের ভাব হইতে লজ্জাবতীর আর-এক নাম "সঙ্কোচিনী" হইয়াছে।

অপরিচিত লোকের নিকট শিশুগণ লজ্জাবতীর ন্যায়ই ব্যবহার করে। লজ্জাবতী যেমন অন্যের স্পর্শে ঢলিয়া পড়ে, শিশুও তেমনি অপরিচিতের নিকট হইতে সরিয়া মায়ের অঞ্চলে মুখ ঢাকে বা মায়ের কোলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ লুকায়। ডারুইন্ লিখিয়াছেন—

"We often see little children when shy or ashamed, turn away, and still standing up, bury their faces in their mother's gown, or they throw themselves face downwards on her lap." Ibid 341.

পাশ্চাত্য ভাষায় লজ্জার বাচক যে shame শব্দ প্রচলিত আছে তাহার মূলার্থ লুক্কায়িত হওয়ার ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। ডারুইন্ 'shame' শব্দের মূলার্থ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন—

"Mr. Wedgwood says ("Dict. of English Etymology" Vol. iii. 1865. p, 155), that the word 'shame' may well originate in the idea of shade or concealment, and may be illustrated by the Low German scheme, shade or shadow." Ibid p. 339.

প্রাগুপ্ত লুক্কায়িত ভাব ব্যতিরেকেও সঙ্কোচের অপর লক্ষণ পরিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। লজ্জার বাচক সংস্কৃত 'মন্দাক্ষ' ও 'মন্দাস্য' শব্দে আমরা তাহার আভাস প্রাপ্ত হই। (৩) এখানে 'মন্দ' শব্দের অর্থ অল্প।

---

(৩) "অথ মন্দাক্ষ মন্দাস্যঃ লজ্জা লজ্যাচ হ্রীস্ত্রপা। ব্রীড়ো ব্রীড়া ব্রীড়নঞ্চ লজ্জা পর্য্যায় ঈরিতঃ।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত—শব্দরত্নাবল্যাম্।

সুতরাং 'মন্দাক্ষ' ও 'মন্দাস্য' শব্দ দ্বারা যাহাতে চক্ষু ও মুখ অল্প অর্থাৎ সঙ্কুচিত হয় তাহাই বুঝায়। মুখ-মণ্ডলে লজ্জাজনিত যে রক্তিমাভা প্রকাশ পায় তাহাও সঙ্কোচ ভাবেরই ফল বলিয়া মনে হয়। 'সঙ্কোচ' শব্দ অভিধানে 'কুঙ্কুম' বুঝায়। কুঙ্কুমের রক্তবর্ণ বলিয়া সঙ্কোচজনিত রক্তিমাভার সহিত ইহার সাদৃশ্য হইতেই ইহার 'সঙ্কোচ' নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কুঙ্কুমের "সঙ্কোচ পিশুন" নামের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টরূপেই সঙ্কোচের রক্তিমাভ চিহ্নের সূচক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

নবদম্পতীর প্রথম প্রেমসম্মিলনে তাহাদের পরস্পরের প্রতি নবানুরাগের কটাক্ষপাতে যে মনোহর সঙ্কোচভাব প্রকটিত হয়, কালিদাস অজ-ইন্দুমতীর বিবাহ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাহার অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; যথা—

> "তযোরপাঙ্গ প্রতিসারিতানি
> ক্রিয়াসমাপত্তিনিবর্ত্তিতানি।
> হ্রীযন্ত্রণামানশিরে মনোজ্ঞাম্।
> অন্যোঽন্যলোলানি বিলোচনানি॥"

এ স্থলে মল্লিনাথ 'হ্রীযন্ত্রণাং হ্রিয়ানিমিত্তেন যন্ত্রণাং সঙ্কোচং' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদ এই—"নবদম্পতীর পরস্পরের দর্শনোৎসুক লোচন, অপাঙ্গগত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতান্তে পুনর্ব্বার প্রত্যাকৃষ্ট হইয়া মনোরম লজ্জাজনিত সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিল।"

ভয়, ঘৃণা, তিরস্কার, পুরস্কার, আদর প্রভৃতি নানাবিধ বিরোধীভাবই সঙ্কোচের উৎপাদক হইয়া লজ্জার উদ্বোধক হয়। বাইবেলের উপাখ্যানে লজ্জার সহিত ভয়ের সম্বন্ধের প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। 'লজ্জা-সম্ভ্রম,' 'লজ্জাভয়' প্রভৃতি কথায়ও আমরা এই উভয় ভাবের স্পষ্ট যোগ দেখিতে পাই। কাহারও প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রদর্শিত হইলে তাহাতে স্বতঃই তাহার মনে একটি অপ্রসন্ন ভাব জন্মে ইহাই সঙ্কোচভাব'। দোষের জন্যই তিরস্কার করা হইয়া থাকে। দোষের জন্য নিজেকে খর্ব্ব বোধ করা সকলেরই পক্ষে স্বাভাবিক। এইরূপ খর্ব্ব ভাবটি সঙ্কোচেরই ভাব। আদর ও প্রশংসাতে বিশেষরূপে অন্যের লক্ষণীয় হওয়াতেই সঙ্কোচ-ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপরিবর্ণিত বিভিন্ন সঙ্কোচ-ভাবসকলের মধ্যে শেষোক্ত ভাবদুইটি প্রফুল্লভাবের যোগের দ্বারা বিশেষ শোভন হইয়া থাকে। কপোলের রক্তিমাভায় এই শোভন ভাব প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমোক্ত ভাবত্রয়ে অপ্রফুল্ল ভাবের যোগের দ্বারা এই শোভন ভাবের পরিবর্ত্তে অশোভন বিচ্ছায়ভাবই কপোল-প্রদেশকে গ্রাস করিয়া থাকে। এই বিচ্ছায়ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই কবি বলিয়াছেন—'লজ্জারাহু মুখে লীন।'

উপরে আমরা লজ্জাভাবের যে বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য ক্রম-বিকাশবাদেরই অনুসরণ করিয়াছি। আমাদের দর্শনে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন দার্শনিক আলোচনা না থাকিলেও লজ্জা-শব্দ ও ইহার বাচক অন্য শব্দে পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণের রহস্য অতি আশ্চর্য্য ভাবেই নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। লজ্জা শব্দের মূল লজধাতুতে ভর্ৎসন, অন্তর্দ্ধান,

ভাসন (দীপ্তি) প্রভৃতি অর্থের যোগ শব্দকল্পদ্রুমে অতি পরিষ্কারভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। লজ্জাবাচক হ্রীশব্দের মূলে ঘৃণা ও ভয় উভয়ার্থেরই যোগ আছে বলিয়া বোধ হয়; তাহাতেই হ্রীধাতু-উৎপন্ন 'হ্রিনীয়া' যেমন 'লজ্জা' ও 'ঘৃণা' অর্থের প্রকাশক তেমনই 'হ্রীকা' শব্দ 'ত্রাস' ও 'লজ্জা' অর্থের প্রকাশক।

লজ্জা শব্দের মূল ধাতু হইতেই 'লগ্ন' শব্দ গঠিত হয়। এই 'লগ্ন' শব্দের দ্বারা আমরা লজ্জার সঙ্কোচভাবের কতকটা ধারণা করিতে পারি। লজ্জাভাবের দ্বারা আমরা যেন আপনাতে আপনি বিলীন হইয়া থাকি, 'লগ্ন' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণে রাবণবধের পর সীতা যখন রামসমীপে আনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার যে সলজ্জভাবের বর্ণনা মহাকবি বাল্মীকি দিয়াছেন, তাহাতে লজ্জার পূর্ব্বোক্ত 'লগ্ন'রূপ সঙ্কোচভাবটি উজ্জ্বলরূপেই পরিস্ফুট হইয়াছে যথা—

"লজ্জয়া অবলীয়ন্তী স্বেষু গাত্রেষু মৈথিলী।
বিভীষণেনানুগতা ভর্ত্তারং সাভ্যবর্ত্তত ॥"

'মৈথিলী লজ্জাবশতঃ নিজদেহে লীন হইয়াই যেন বিভীষণের সঙ্গে পতি রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন।'

লজ্জাতেই যে প্রথম দেহ আবৃত করা আবশ্যক হইয়াছিল, বাইবেলে আদম ও ইভের পত্র-পরিধান-রচনাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। লজ্জানিবারণ করা অর্থে যে 'cover one's nakedness' এরূপ ইংরেজী বাক্য প্রচলিত দেখা যায়, তাহাতেও লজ্জার জন্যই যে আবরণের প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারা যায়। লজ্জার বাচক যে 'ব্রীড়া' শব্দ পাওয়া যায়, তাহার মূলে আবরণার্থক বৃ-ধাতুর যোগ আছে বলিয়াই আমাদের বোধ হয়।

লজ্জাশব্দেরই সহিত একমূল (লজ্জি) 'লঞ্জ' শব্দ অভিধানে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ কচ্ছ। কচ্ছ, কোঁচা ও কাছা উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং 'লঞ্জ' শব্দ হইতে প্রথম লজ্জাবরণ যে কোঁচা ও কাছার আকারে ছিল তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান পত্রপরিধানকারী অসভ্য জাতির (leaf-wearers) যে বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই, তাহাতে পত্রই যে সম্মুখে ও পশ্চাৎদিকে কোঁচা ও কাছার আকারে পরা হয়, তাহাই আমরা জানিতে পারি। 'লঞ্জ' যেমন 'কচ্ছ' বুঝায় তেমনই 'পুচ্ছ'ও বুঝায়। পুচ্ছদ্বারা কাছার কাজ হয় বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে। 'ল্যাজ' শব্দটী 'লঞ্জ'-শব্দেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ।

লজ্জার মূলে যে সঙ্কোচভাবের কথা আমরা উপরে বলিয়াছি বিশেষ অনুধাবনার দ্বারা আমরা ইহার দ্বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাই। এক শঙ্কা, অপর শালীনতা। শঙ্কাতে ভয়ের উপাদান বিদ্যমান, শালীনতায় অধৃষ্টতার উপাদান বিদ্যমান। 'শঙ্কা' ইংরেজীতে shyness এবং 'শালীনতা' ইংরেজীতে modesty। শালীনতা শব্দটী প্রণিধানের যোগ্য। শালা বা গৃহের যোগ্য এই অর্থে 'শালীন' শব্দ সাধিত হইয়া শালীনের ভাব এই অর্থেই শালীনতা সিদ্ধ হয়। 'শালা' শব্দের গৃহ অর্থ হইতে শালীন শব্দের অর্থ 'গৃহস্থ' হয়। সুতরাং শালীনতা গৃহস্থের ভাবকেই বুঝায়। ইহাতে গার্হস্থ্যজীবন

হইতেই যে বিশেষরূপে শালীনতার বিকাশ হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এইপ্রকারে শঙ্কা ও শালীনতা লক্ষণযুক্ত লজ্জাকে আমরা সমাজের বিশেষ মার্জ্জিত বিকাশ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই লজ্জাভাবের দ্বারা লোকের আচার-ব্যবহার যেরূপ মার্জ্জিত হইয়াছে, তাহাদের নৈতিক চরিত্রও তদ্রূপ সুরুচিসম্পন্ন ও উন্নত হইয়াছে। এই কারণেই লজ্জাকে উচ্চবিকাশের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যায়।

লজ্জার দ্বারা আমাদের নৈতিক ভাব যেরূপ নিয়মিত ও মার্জ্জিত হয় ধর্ম্মভাবও তদ্রূপ নিয়মিত ও মার্জ্জিত হয়। লজ্জার সঙ্কোচভাব-হেতু আমরা প্রথমতঃ লোক-চক্ষুর গোচরে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে শঙ্কিত হই। ক্রমে এই সঙ্কোচ-ভাবটি এরূপই স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হয় যে গোপনে বা মনে মনে অধর্ম্ম কার্য্য করিতেও শঙ্কা উপস্থিত হয়। তখন লোকের পরিবর্ত্তে আমরা নিজেরাই আমাদের কার্য্যের বিচারক হই এবং আমাদের কৃতদোষের জন্য নিজের নিকটেই লজ্জিত হই। ইহাকেই ইংরেজীতে "ashamed of one's own self" (নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হওয়া) বলে। আমাদের ধর্ম্মজীবন বা আধ্যাত্মিক জীবনের তখনই পূর্ণ পরিণতি হয়, যখন কোন কার্য্যের জন্য আমাদের নিজের নিকটেও আমাদিগকে অণুমাত্রও লজ্জিত অর্থাৎ সঙ্কুচিত বোধ করিতে না হয়। এই প্রকারে আমাদের আত্মা সর্ব্ববিষয়ে নিঃসঙ্কোচ হইতে পারিলেই পরমেশ্বরের নিকট নির্ভয়ে উপস্থিত হইতে পারে। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে দোষ বা পাপের লেশমাত্রও বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সঙ্কোচভাব বিদূরিত হওয়া কোন-মতেই সম্ভবপর নহে। কারণ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী,—তাঁহার নিকট কিছুই গোপন থাকিতে পারে না। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আমাদিগের সর্ব্বদোষবিনির্মুক্ত হওয়া একান্তই আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগণের "বস্ত্রহরণ" পূর্ব্বোক্ত রূপ নিঃসঙ্কোচভাবেরই রূপক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যতক্ষণ গোপীসকল সঙ্কোচ-ভাব লইয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই—তাই তাঁহাদের 'বস্ত্রহরণ' পূর্ব্বক সঙ্কোচভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিতকরতঃ তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। "ঘৃণা লজ্জা, ভয়, এই তিন থাকৃতে নয়" ধর্ম্মসাধনার এই যে প্রবচন প্রচলিত আছে, তাহাতেও সঙ্কোচভাব নিবৃত্তিই সিদ্ধির প্রকৃত উপায়রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সাধকের আদর্শ মহাদেব যে 'দিগম্বর', তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত রহস্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাদেবের আদর্শেই সন্ন্যাসী প্রভৃতি সাধকগণ 'দিগম্বর' হইয়া থাকে। এই প্রকারে আদম ও ইভে আমরা যে স্বর্গীয় পবিত্র অনাবৃত সরলভাব দেখিতে পাইয়াছি, ধর্ম্মসাধকেও আমরা সেই স্বর্গীয় অকলুষিত নিঃসঙ্কোচভাবই দেখিতে পাই। এইরূপেই বিবর্ত্তনের চক্র পূর্ণ হইতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বেচ্ছাচারী

তৃতীয় খণ্ড

১

বিবাহের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে শৈলজার জীবনে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। তাহার সাধ্বী মাতার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে পিতা কালিকামোহনও সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কার্ত্তিককে বলিলেন, "বাবা কার্ত্তিক, আমার সমস্তই তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আমার উইলে তোমাকেই আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সবই দিয়ে গেলুম। কেবল মার নামে স্বর্গীয় কর্ত্তা যে মহাল আর নগদ টাকা দিয়ে গেছেন, তার ব্যবস্থা তাঁর নিজের হাতেই রইল। তাঁর উপর তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না। তা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ের উপরই তোমার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। তুমি আমার দেব-কীর্ত্তি পিতৃ-কীর্ত্তি বজায় রেখে সমস্তই স্বেচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। তবে শৈলর নামে আগে থেকে যে সম্পত্তি আছে, তা তারই নামে থাকল। তুমি ছাড়া যখন তার আর কেউ রইল না, তখন সে বিষয়ে আর তোমায় কি উপদেশ দেব? সর্ব্বদা তোমার পিতৃদেবের পরামর্শ নিয়ে কাজ করো, তাহলে কোন বিপদ হবে না।"

শৈলজা কালিকা বাবুর পায়ে হাত বুলাইতেছিল। কালিকা বাবুর কথায় সে কাঁদিয়া ফেলিল। কালিকা বাবু বলিলেন, "কেঁদো না, মা। স্বধর্ম্মে থেকে সংসারে কর্ত্তব্য করে শেষে গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলতে বলতে হাসতে হাসতে যে যেতে পাচ্ছি, এ কি কম সুখের কথা! জীবনে যা প্রার্থনা করেছিলুম, তা সমস্তই পেয়েছি। ভগবান যাকে এতখানি দয়া দেখিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করা অন্যায়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরাও যেন শেষে এমনি করে মা গঙ্গার চরণে আশ্রয় পাও! যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বলতে পার, 'ভগবান, তোমার অপূর্ব্ব করুণা!' ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তি যেন তোমাদের কখনও না দেখতে হয়! জীবনে কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ো না; তাহলে যত দুঃখই পাও না কেন, সবই তাঁর করুণা বলে মনে হবে, তা হলে তাঁর রক্ত চক্ষুর তলে তাঁর গভীর করুণাই স্পষ্ট অনুভব করবে।"

কালিকা বাবু বক্তব্য শেষ করিয়া নিমীলিত নেত্রে বলিলেন, "তারা শিব সুন্দরি!" কার্ত্তিক তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শৈলজা স্পষ্ট দেখিল, স্বামীর নয়ন ও অধরের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটিয়াছে। দেখিয়া শৈলজা অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়াই সে অনুভব করিয়াছে, তাহার ও স্বামীর মধ্যে একটা অতি-সূক্ষ্ম অথচ দুর্ভেদ্য ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। বাহিরে সে ব্যবধান কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, কারণ কার্ত্তিকের ব্যবহার অত্যন্ত সরল এবং অমায়িক। সকলেই তাহার নিরহঙ্কার অথচ গম্ভীর

ব্যবহারে সন্তুষ্ট। শৈলজাও এমন কোন কথা বা কাজ স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না, যাহাতে কার্ত্তিকের স্নেহহীনতা বা অন্য কোন অপ্রীতিকর ভাব এতটুকুও প্রকাশ পাইয়াছে। আজ দুই বৎসর তাহার এক পুত্র হইয়াছে। পুত্রটি যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি সুন্দর! কার্ত্তিক যখন বিদেশে তাহার পাঠক্রিয়া-সমাধায় ব্যস্ত, তখন সে মাঝে মাঝে পুত্রের জন্য নানাবিধ খেলনা, এবং যেদিন পুত্র হওয়ার সংবাদ পায়, সে দিন প্রসূতির জন্য নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে কোথায় যে ত্রুটি, সেটুকু শৈলজা কখনও স্পষ্ট ধরিতে পারে নাই; তবু তাহার অন্তঃস্থল হইতে একটা গভীর বিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া নৈশ আকাশে মিলাইয়া যাইত। কার্ত্তিক যে অন্য-গত-চিত্ত, এ কথা ফুলশয্যার রাত্রেই সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল; সেজন্য তাহার যে ত্রুটি হইবে, সে ত্রুটির জন্য ক্ষমাও সে চির-জীবনের জন্য লাভ করিয়াছিল। কার্ত্তিক যে আর-কাহাকেও মনে মনে ভালবাসে, এটা তত দুঃখের নয়, কারণ শৈলজা সে দুঃখকে গণনায় আনিয়া জীবনের মধ্যে জমা-খরচ মিলাইয়া একটা ঠিক দিয়া বসিয়াছিল! সে দুঃখের খরচ সুখের জমার চেয়ে অনেক কম,—তবে কিসের দুঃখ! কিসের ব্যবধান! কিসের বিচ্ছেদ! কার্ত্তিক ভালবাসিতে পারে, তাহার হৃদয়ে যে স্নেহের তরঙ্গ খেলে, ইহা জানিতে পারিলেও যে শৈলজা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করে। শৈলজার মনে হয়, কার্ত্তিকের হৃদয় হইতে এই পরম পবিত্র মন্দাকিনী, স্নেহের সুরধুনী-ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। সে যেন ভালবাসিতেই পারে না! যদি তাহার হৃদয়ে ভালবাসিবার শক্তি সজাগ থাকে, তাহা হইলে শৈলজার কোন ভয় নাই। কারণ তাহার আশা আছে যে, ভগীরথের মত সাধনার দ্বারা সে সেই স্নেহ-মন্দাকিনীকে তাহার সংসারের উপর নামাইয়া আনিতে পারিবে। যদি তাহা কোন বাধায় অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার প্রাণ দিয়াও সে বাধা সরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি তাহা শুকাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি করিবে? তাহার মনে হয়, কার্ত্তিকের চরিত্রে সবই আছে, তবে প্রাণের মধ্যে যাহা থাকিলে মানুষ সজীব থাকে, কেবল সেইটুকুরই যেন অভাব ঘটিয়াছে! কার্ত্তিকের যেন প্রাণ নাই, সে যেন সংসারের চোখে এখন মৃত!

* * *

মহাসমারোহে কালিকাবাবুর শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া, গভীর রাত্রে কার্ত্তিক তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শৈলজা বসিয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। শয্যায় দুই বৎসরের শিশু দেবীপ্রসাদ নিদ্রিত। কার্ত্তিক ধীর-পদবিক্ষেপে শিশুর শিয়রে যাইয়া তাহাকে চুম্বন করিল, পরে শৈলজার নিকটে আসিয়া বলিল, "শৈল, তোমার মুখখানা তোল ত, আমি দেখতে পাচ্ছি না।" শৈলজা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ শৈলজার মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইল এবং তাহাকে আলোর দিকে ফিরাইয়া

ধরিয়া বলিল "শৈল, তোমার মুখে এত আলো! আমি সইতে পারছি না। উঃ—" কার্ত্তিক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শৈলজা চোখ মুছিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হল? তুমি অমন করছ কেন? শোও, আমি বাতাস করছি।" কার্ত্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই সঙ্গে এমন উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিল যে, সে হাসির শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিম্নতলে কর্ম্ম-রত আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলের কর্ণে পৌঁছিল। কি বিকট উন্মাদের ন্যায় হাস্য! শৈলজা পিতৃবিয়োগ-দুঃখ ভুলিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি এক খানা পাখা লইয়া কার্ত্তিককে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিক নিমীলিত নেত্রে অন্ধের মত হাতড়াইতে হাতড়াইতে খাটের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া শৈলজা ব্যস্ত হইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "শীগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্, উনি কি রকম কচ্ছেন।"

শৈলজা কার্ত্তিকের শয্যায় বসিয়া তাহার মাথায় গোলাপজল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মুদিত নেত্রে বলিল, "গরিব বামুনের ছেলের এত ঐশ্বর্য্য সইবে কেন, শৈল! তাই বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, না?"

শৈলজা কাতর হইয়া বলিল, "কেন তুমি অমন করছ? কি হয়েছে,—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বল।"

কার্ত্তিক কহিল, "কি আবার হবে? আমি আলো সইতে পারছি না।"

শৈল কহিল, "আলোটা কমিয়ে দিচ্ছি, না হয় নিবিয়ে দিচ্ছি।"

কার্ত্তিক আবার হাসিল। তেমনি বিকট হাসি! শৈলজা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। শিশুও জাগ্রত হইয়া সে ক্রন্দনে সশব্দে যোগ দিল। শৈলজা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কার্ত্তিকের মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "আর ভয় দেখিয়ো না, আমি যদি কোন দোষ করে থাকি—"

কার্ত্তিক কহিল, "দোষ! তোমার সব-চেয়ে দোষ যে তোমার মুখে একরাশ আলো জ্বেলে নিয়ে তুমি আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছ। আমায় কয়েদ করে, আমার পালাবার পথ না রেখে, সেই আলো নিয়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছ। অন্ধকার—আমি অন্ধকারকে চাই। আনতে পার জগৎ-জোড়া সব-ভুলানো, সব-ডুবানো অন্ধকার? যদি না পার, তাহলে কি হবে মিছে ডাক্তার ডেকে? আমার এ রোগ সারবে না। আমি পাগল হইনি, শৈল, কোন ভয় নেই। বাতাস করে কি হবে? আমার ভেতরটা হাঁপিয়ে উঠছে, বাইরের বাতাসে কি হবে?"

শৈলজা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি জানি যে তুমি আমায় বিয়ে করে সুখী হওনি—"

কার্ত্তিক কহিল, "সুখী হইনি? ভুল শৈল, তোমার ভুল! কিন্তু এ সুখের আলো আমার সইছে না। সুখ আমি চাইনে—আমি চাই দুঃখের অন্ধকার! চাই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দহীন মৃত্যুর মত অন্ধকার! তা ত তুমি আমায় দিতে পারবে না!"

শৈল কহিল, "আমি তোমায় বুঝতে

পারছি না। তুমি ত আমায় বিয়ে করে অবধি কষ্ট পাচ্ছ!”

কার্ত্তিক কহিল, “না শৈল, না, আমি খুব সুখী, অত্যন্ত সুখী। প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী সুখ তুমি আমার হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছ। কিন্তু আমি যে সুখ চাইনে, শৈল!”

বাহিরে পদশব্দ হইতেই কার্ত্তিক উঠিয়া বসিল। শৈলজা সরিয়া গেল এবং ডাক্তার বাবু সেই কক্ষে নানাবিধ ঔষধ-সমেত প্রবেশ করিলেন। কার্ত্তিক স্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া বলিল, “ডাক্তার বাবু, আপনি পাগল! অত শিশি নিয়ে এলেন! ওতে ওষুধ পত্র বাছতেই যে সময় যাবে, রোগী দেখবেন কখন?”

ডাক্তার কহিল, “তুমি শোও কার্ত্তিক, শুয়ে, কি হয়েছে, বল।”

কার্ত্তিক কহিল, “কিচ্ছু হয়নি, আপনি ফিরে যান। সারাদিন খেটে-খুটে মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল—শৈল পাগল, ব্যস্ত-বাগীশ, তাই আপনাকে আবার এত রাত্রে কষ্ট দিলে।”

বাড়ীর পুরাতন ডাক্তার বহুদিন হইতেই কার্ত্তিকের ধরণ-ধারণ জানিতেন। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নন্; কার্ত্তিকের নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, “কিছু ত হয়নি বলছ, এদিকে নাড়ী এত জোর কেন?”

কার্ত্তিক কহিল, “Pure excitement, শুধু, আর কিছু নয়! ঘুমোলেই সব সেরে যাবে।”

শৈলজা ডাক্তারকে ডাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, “আপনি ওঁর কথা শুনবেন না, ওষুধ দিন।” শৈলজা তাহার নিকট সমস্তই বর্ণনা করিয়া বলিল, “কোন দিন ত এমন করেন না।” ডাক্তার বাবু তাঁহার কাঁচা-পাকা মাথাটি চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, “তাইত কিছু ত বুঝতে পারছি না। যাই হোক তুমি এই ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিয়ো, তাহলে ও ঘুমিয়ে পড়বে’খন।”

শৈল কহিল, “আপনি খাইয়ে দিন, আমার কথা শুনবেন না।”

কার্ত্তিক আবার সহজ হাস্যে শৈলজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, “শুনব, শুনব। দিন ডাক্তার বাবু, কি ওষুধ দেবেন, দিন। আপনাদের জ্বালায় অস্থির হতে হল।”

কার্ত্তিক ঔষধ পান করিলে ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। শৈলজা আসিয়া নিকটে বসিতেই কার্ত্তিক উঠিয়া বসিয়া শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল; তারপর শয়ন করিয়া বলিল, “মহারাণি, খাজনা ত দিলুম, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শোওগে। আমার কিছু হয় নি, তোমার সঙ্গে চালাকি করছিলুম, ভাবলুম, দেখি, একটু থিয়েটারী রকম করলে তুমি ভয় পাও কি না।”

শৈলজা তবু উঠিল না। তাহার শিশু পুত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনিই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তবে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও সে মাঝে মাঝে ফুঁপাইয়া উঠিতেছিল। কার্ত্তিক বলিল, “ছেলে ফোঁপাচ্ছে, তবু তুমি এখানে বসে থাকবে? তাহলে এস, আজ বিছানা অদল-বদল হোক। আমি দেবুর কাছে গিয়ে শুই, আর তুমি আমার জায়গা অধিকার করে শুয়ে থাকো।”

শৈলজা অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "যদি এক মিনিটের জন্যও তুমি আমি হতে, তাহলে আমার দুঃখ বুঝতে পারতে। তোমায় সুখী করতে না পেরে—"

কার্ত্তিক কহিল, "আবার ঝগড়া সুরু করলে! এখনি ত' সোলেনামায় সই করে দিলুম।"

শৈল কহিল, "কি করলে তুমি সুখী হও?"

কার্ত্তিক কহিল, "আবার! তা হলে আবার পাগল হব, তখন টের পাবে। আমি সুখী নই? শৈল, তুমি কি কিছু বুঝতে পার না? আমি বলছি, আমি খুব সুখী, খুব আনন্দে আছি। এখন যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোওগে।"

শৈল কহিল, "আজ আমি তোমায় ছেড়ে থাকব না।"

কার্ত্তিক কহিল, "বেশ! সুধায় অরুচি কার?"

২

সমস্ত দিন অন্ধ বালক-বালিকাদের জন্য পরিশ্রম করিয়া সরোজ সন্ধ্যার পর সুকুমারীকে বলিল, "সুকু, আজও সমস্ত দিন সর্ব্ব-দা ত এলেন না, কি হয়েছে বলতে পার?" সুকুমারী ছাদের উপরকার তুলসীতলা হইতে বলিল, "না সরো দি, তিনি কৈ কিছু ত বলে যান নি।"

সরোজদের গৃহের ছাদটি যেন একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। সারি সারি টবে নানা জাতীয় বৃক্ষে থরে থরে বেশ যূঁই চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সদ্য বারিবিন্দু-লাভের আনন্দে অসংখ্য ফুল তাহাদের গন্ধ-সম্পত্তি চারিদিকে বিলাইতেছে। উপরে নবমীর চন্দ্র হাসিতেছে—নিম্নে পুষ্পগুলি শোভায় গন্ধে সমস্ত স্থানটুকু ভরাইয়া ফেলিয়াছে। আর ইহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টি-হীনা বালিকা, আর এক দৃষ্টি-হীনা রমণী—অন্ধ প্রকৃতির সম্মুখে দুই অন্ধ প্রাণী! প্রাণীদুটি শব্দ বা স্পর্শের দ্বারা প্রকৃতিকে জানাইতেছে যে তাহারা আছে, প্রকৃতিও গন্ধের দ্বারা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ-লাভের চেষ্টা করিতেছে।

সরোজ হস্তদ্বারা গাছগুলি স্পর্শ করিতে করিতে দুই তিনবার সমস্ত ছাদটি প্রদক্ষিণ করিল; যেন সব গাছগুলির সঙ্গেই তাহার স্পর্শযোগ রাখার প্রয়োজন, যেন প্রতি ফুলটিই তাহার জন্য প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া নূতন কোন গোপন সংবাদ দিবার জন্য তাহার স্পর্শের আশায় অপেক্ষা করে! কি জানি, যদি কাহারও নিকট হইতে কোন কথা শুনিতে ভুল হইয়া যায়, এইজন্য সরোজ প্রতিদিন প্রভাতে, সন্ধ্যায় তাহাদের সঙ্গে স্পর্শের ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া লয়।

সুকুমারী কিন্তু একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া ছাদের এক কোণে যে তুলসীমঞ্চ আছে, তাহারই নিকটে বসিয়াছিল। সরোজের মত সে প্রতি সন্ধ্যায় এই ছাদটীতে আসে বটে, কিন্তু বেড়াইবার জন্য নয়,—সে আসে ঐ মঞ্চের কুলুঙ্গীতে প্রদীপ দিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য। সরোজের পক্ষে যেমন এই কৃত্রিম উদ্যানটির সমস্তটুকু

আছে, তাহার পক্ষে তেমনি কেবল ঐ কোণটুকুই আছে। সুকুমারী ঐ কোণটুকু হইতে সমস্ত গাছপালা সরাইয়া দিয়া একটী মাত্র তুলসী বৃক্ষকে স্বহস্তের জল-নিষেকে যথেষ্ট বড় করিয়া তুলিয়াছে, এবং নানা উপায়ে ঐ স্থানটুকুতে অন্ধকার সঞ্চিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া দিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়।

শশিভূষণের শ্বশ্রুঠাকুরাণী চিন্ময়ী দেবী ছাদে আসিয়া ডাকিলেন, "সরোজ।"

অপর প্রান্ত হইতে সরোজ বলিল, "যাই মা।"

চিন্ময়ী বলিলেন, "আবার তোমার শরীর ভাল থাকছে না, তুমি হিমে আর থেকো না। সুকু—"

সুকু তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "মা, সরোদিকে অত মেহন্নৎ করতে বারণ করে দাও। ওর সব কাজ এখন আমিই ত পারি, তবুও আমায় ও করতে দেবে না!"

সরোজ নিকটে আসিলে চিন্ময়ী বলিলেন, "আমি মনে করছি, আবার তোমায় কোথাও পাঠিয়ে দি।"

সরোজ কহিল, "আমি কি অফিশের কেরাণী মা, যে বৎসরান্তে আমায় ছুটি নিতেই হবে?"

চিন্ময়ী কহিলেন, "তুমি কেরাণীর চেয়েও বেশী কেরাণী, মা। তাদের পাঁচটার পর ছুটি, তোমার তাও নেই। শশী তোমায় এমনি করে মারছে যে বুঝতেও পারছে না, দিন দিন তুমি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছ, অথচ তোমায় বললেও ত তুমি শুনবে না!"

সরোজ অন্যমনস্কভাবে একটা গাছের পাতা ছিঁড়িতে গিয়া হঠাৎ হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, "আমি—আমি এ বাড়ী ছেড়ে থাকলে, এই সব বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে থাকলে ভাল থাকিনে মা।" সরোজ অতি যত্নে এক যূথিকার ঝাড়ের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। চিন্ময়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি দিনকতক সব কাজ ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাক।"

সরোজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হলে কি নিয়ে থাকব?"

তাহার স্বরে এমন একটা গভীর দুঃখ ধ্বনিত হইল যে চিন্ময়ীর সম্মুখ হইতে সমস্ত শোভা, সমস্ত গন্ধ নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনিও নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে আর আমি কি করব?"

উভয়ে নীরব হইলে সুকুমারী বলিল, "চল, নীচে যাই।" তিন জনে তখন দ্বিতলে নামিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে শশিভূষণ এবং তাহার দুইটি নিতান্ত অনুগত ছাত্র মণীশ ও জ্যোতিপ্রসাদ কলরব করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিল। মণীশ ও জ্যোতি এখন সতেরো-আঠারো বৎসরের হইয়াছে, তাই এখন তাহারা যাহা লইয়া তর্ক করিতেছিল, তাহা ঠিক বালকোচিত কলরবমাত্র নহে। এবং এই কারণে শশিভূষণও তাহাদের তর্কে যোগ দিয়া জ্যোতিপ্রসাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল।

তর্কটা চলিয়াছিল অন্ধের অক্ষর-শিক্ষার

এক নূতন পদ্ধতি লইয়া। মণীশ বলিল, "তা আপনারা যাই বলুন, আমি ঠিক বাঙ্‌লা আর ইংরিজী অক্ষরের পক্ষপাতী। চেষ্টা করতে করতে আমাদের ক্ষমতা এতই বেড়ে যেতে পারে যে হয়তো পরে সাধারণ কালীর লেখাও আমরা ছুঁয়ে পড়তে পারব। কিন্তু আপনার ঐ নতুন "বিন্দু-পদ্ধতি" চললে সমস্ত ভাষার অক্ষরের সঙ্গেই আমাদের যোগ হবার আশা চির-দিনের জন্য চলে যাবে।"

জ্যোতি কহিল, "তবু লেখবার আর transcribe করবার যে একটা মস্ত সুবিধা এতে পাওয়া যাচ্ছে। তা-ছাড়া দশটা মাত্র বিন্দু নিয়ে তাদের কমিয়ে বাড়িয়ে নানারকমে সাজিয়ে যদি বর্ণমালার নতুন একটা আকৃতি সৃষ্টি করা যায়, তাতে সুবিধেই হবে। পুরোনো পদ্ধতিতে এক একটা অক্ষর এমন, যে, পাঁচ আঙুলের মধ্যেও পাওয়া যায় না, হাত নাড়তে নাড়তে কতকটা সময় যায়। এই বিন্দু-পদ্ধতিতে অক্ষরগুলোকে অন্তত আঙুলের ডগাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ করে আনা যেতে পারবে। এতে বইগুলোও ছোট হয়ে আসবে, আর তা ছাড়া অক্ষর গুলো pointed হবার দরুণ অনুভবটাও শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হবে। আমরা যে পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়েছি, তাতে আমাদের যত দিন লেগেছে, এতে বোধ হয় তার অর্দ্ধেক সময়ে সবাই তার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারবে।"

শশী কহিল, "তা ছাড়া আর একটা জিনিষ তোরা দেখছিস্ না যে, এক transcriptionএর হায়রাণীটা এতে কতখানি কমবে। কেবল নিজের সুবিধাটুকু দেখলে ত চলবে না। point systemএ অন্ধদের দ্বারাও নির্ভয়ে এবং নির্জ্জনে transcribe করিয়ে নিতে পারা যাবে।"

সরোজ কিছুক্ষণ তাহাদের তর্ক মন দিয়া শুনিয়া বলিল, "আমি কিন্তু মণীশের দিকে। যদি কোন কালে আমরা কালী দিয়ে লেখা অক্ষর পড়তে নাও পারি, তা হলেও সেই আশায় আমি চির জীবন কাটাতে রাজী আছি। চক্ষু হারিয়ে সাধারণের সঙ্গে একটা মস্ত যোগ আমরা হারিয়েছি। যদি কোন দিন সাধারণ অক্ষরে লেখা কাগজ-পত্র পড়তে পারি, তাহলে আর এক রকমে সেই যোগটুকু ফিরে পাই এবং সেই আশাতেই বেঁচে থাকব, নইলে আর কিসের আশা করব?"

শশিভূষণ বসিয়া বলিল, "তোমাদের নতুন করে কিছু শেখাতে যাচ্ছি না। তোমরা যা শিখেছ, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া কর। কিন্তু আমি যখন অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রিন্‌সিপাল, তখন আমার ছাত্রদের মঙ্গল আমায় দেখতে হবে ত। তুমি এখন হাতের-চেয়ে-আম বড় হয়ে গিয়েছ, তোমার উপর আর আমার হাত কি!"

সরোজ কহিল, "তবে কি তুমি আমার চাকরিটা খাবার চেষ্টায় আছ। তা হলে তোমার চাকরির স্থায়িত্ব বিষয়েও কথা উঠবে।"

শশী কহিল, "তোমার চাকরি কে খায়, বোন? তোমার হল ইম্পিরিয়াল সার্ভিশ। তবে সর্ব্বানন্দ এই Systemটা চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে—"

সরোজ কহিল, "তাই তাঁর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো নেই।"

শশী কহিল, "জো থাকলেও যে তুমি তা চেপে ধরছ না, এইটেই বড় দুঃখ, নইলে--"

সরোজ শশীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "শশিদা, তোমার যত বয়স বাড়ছে, ততই স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান কমে আসছে। আমায় যদি এই রকম করে সকলের সামনে—"

শশিভূষণ উচ্চরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "স্থান ত আমাদের নিজেদেরই বাড়ী, কাল, রাত্রি প্রায় ন'টা, পাত্র দেখছি তুমি। এ তিনটের একটাও ত বুঝতে ভুল করছিনে। আর যে বললে, সকলের সামনে—সকলের মধ্যে তুমি, আমি—আর এ দুটো চেংড়া ত ফাও মাত্র। তবে অন্যায়টা কোথায় হল ?"

সরোজ কহিল, "একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর! তুমি যে একাই একশ'। তোমার সামনে কোন কথা হলে তাইত সারা জগৎকে বলা হয়। ঢাকে কাটী দেওয়া যা, আর তোমাকে কিছু বলাও তাই। যাক্ ও কথা, যে কথা হচ্ছিল, তাই হোক।"

শশী কহিল, "তুমি যে মাঝে পড়ে আমাদের তর্কের মুণ্ডুপাত করলে। মণীশ, কি বলছিলে, বল। আমি খেই হারিয়ে ফেলেছি।"

মণীশ কহিল, "আমিও—"

জ্যোতি কহিল, "আর আমি—"

শশী কহিল, "অতএব তাড়াতাড়ি পেটে কিছু না দিলে আর বুদ্ধির গোড়ায় ধুনো এবং চায়ের বাষ্প না দিলে কিছুই হবে না।"

মণীশ ও জ্যোতি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল। সরোজ সুকুমারীকে ডাকিয়া চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া দিল; তারপর শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কদিন থেকে সর্ব্বদাদাকে দেখছি নে কেন ?"

শশী কহিল, "তুমি ক্রমাগত তাকে দাদা বল বলে সে রেগে চাকরিতে জবাব দিয়ে চলে গিয়েছে। সত্যি বলছি সরো, আর কেন? ঢের ত হল, এইবার ঠাণ্ডা হয়ে আমার এতদিনকার চেষ্টাটা সফল করে দাও।"

সরোজ কাতর কণ্ঠে বলিল, "শশি দা, দয়া কর, আমায় এ দায় থেকে মুক্তি দাও। সত্যি বলছি, তোমায় না সন্তুষ্ট করতে পেরে আমি অনুতাপে মরতে বসেছি। কিন্তু আমি পারছি না, আমি পারব না। সর্ব্বদাদাও তোমারই কথামত আমায় বিয়ে করে অভাগিনীর উপকার করতে চাচ্ছেন বটে, কিন্তু এ উপকার যে আমি চাইনে। তুমি এত বোঝো, এটুকু কেন বুঝছ না যে বিয়ে করবার হলে কোন্ দিন করে ফেলতুম। এই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত যখন কেটে গেল, তখন আর কেন? আর কিসের জন্য? আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে পারবে না। তোমাদের চোখ আছে, তোমরা এক রকম করে সব জিনিষ দেখ, আর আমাদের চোখ নেই, আমরা আর এক রকম করে দেখি। তবে এই বড় আশ্চর্য্য,

যে নিজে আজ পর্য্যন্ত অবিবাহিত থেকে মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে থাকতে পারে, সে কেন বুঝতে পারে না যে—”

সরোজ বলিতে বলিতে থামিয়া গেল, লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। শশিভূষণ গম্ভীর মুখে বলিল, “যার আশায় বসে আছ, সে এখন বিবাহিত। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সে এখন সংসার গুছিয়ে তুলছে। তুমি যদি অন্তরে অন্তরে তাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করতে থাক, তাহলে সে ধর্ম্মে মতি রেখে কি করে সংসারে চলবে? না সরোজ, এ তোমার অন্যায় হচ্চে--নিজের পক্ষে বটে, তার পক্ষেও বটে। সে যদি তোমায় ভুলতে চেষ্টা করে’ প্রবৃত্তিকে দমন করে’ স্নেহময়ী স্ত্রী নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করে, তাহলে তুমিই বা কেন একটা মোহে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে? তুমি কেন—”

সরোজ কহিল, “না শশিদা, এ মোহ নয় —মোহ নয়—আমি তা পারব না। আমি অন্ধকারের জীব, এক মুহূর্ত্তের জন্য যে আলো এসেছিল, সে আলোকে ভুলতে আমি পারব না, তাকে অনাদর করতে পারব না। তাকে অপমান করে হতাদর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেই স্মৃতি আমায় চিরদিন শত শত বেত্রাঘাত করছে, তবু সেই স্মৃতিই আমার সম্বল। অন্ধকার জীবনের বিষয় আলোর জীব বুঝতে পারবে না। আমার যে কি নিয়ে দিন কাটে, তা তুমি কি করে বুঝবে— ?”

সরোজ চলিয়া গেল। শশিভূষণ তাহার দাড়ির মধ্যে হাত চালাইতে চালাইতে মাথা নাড়িয়া আত্মগতভাবে বলিল, “সরোজ বোন, আমিও বুঝি।”

সুকুমারী চা লইয়া আসিলে শশিভূষণ বলিল, “সুকু মার আহ্নিক হয়েছে?”

সুকুমারী বলিল, “হয়েছে।”

শশিভূষণ তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, “মা, আপনার বড় মেয়েটিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন।”

চিন্ময়ী কহিলেন, “আমিও সেই কথা বলছিলুম, ওকে আজ। ওকে তুমি দুদিন ছুটী দাও।”

শশী কহিল, “দু’দিন কেন, চিরজীবনের জন্য ছুটী দিলুম। সর্ব্ব শিবরামপুর থেকে আসুক, আমি নতুন লোক দেখছি।”

চিন্ময়ী কহিলেন, “সে কি, সর্ব্বানন্দ এখানে নেই? তাই বাছা এ ক’দিন এখানে আসেনি, বটে? আহা, কার্ত্তিক কেমন আছে শশী?”

সরোজ নিকটেই ছিল। সে অন্যমনস্কের ভাণ করিয়া কি একটা কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু শশী তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, “সে সর্ব্বানন্দকে কি একটা চিঠি লিখেছে। তাই পেয়ে সে তখনই চলে গিয়েছে।”

চিন্ময়ী কহিলেন, “কি চিঠি তুমি দেখনি?”

শশী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “দেখেছি বটে, কিন্তু সে বিষয়ে কাওকে কিছু বলতে বারণ আছে।”

চিন্ময়ী কহিলেন, “কি এমন গোপন

কথা, শশি? কার্ত্তিকের কোন অমঙ্গল ঘটে নি ত?”

শশি কহিল, “ঠিক অমঙ্গল নয়, তবে সে বাঁদর নিজের অমঙ্গল ঘটাবার চেষ্টায় আছে। তাই সর্ব্বানন্দ তাকে সাবধান করতে গেছে। তবে এখনও ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা যখন সময়ে খবর পেয়েছি, তখন সহজে কিছু ঘটতে দেব না। কিন্তু সবই ঈশ্বরের হাত।”

চিন্ময়ী রামায়ণ পড়িতেছিলেন, সেখানি মাথায় ঠেকাইয়া বন্ধ করিয়া বলিলেন, “যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, আমাকেও বলতে পার, আমিও হয়তো কোন উপকার করতে পারি।”

শশী কহিল, “না মা, এ সব সামান্য ব্যাপারে আপনাকে কেন ব্যস্ত হতে হবে? আমরাই সব ঠিক করে নেব। সরোজ, আমি চললুম, তুমি কাল থেকে ছুটী ভোগ করতে সুরু কর।”

শশিভূষণ চলিয়া গেল; এবং সেই সঙ্গে সরোজের মনে অনেকখানি অশান্তি ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া দিয়া গেল। অমঙ্গল! তাঁহার অমঙ্গল! হায়, সে অন্ধ! সে নিরুপায়! কাহারও কোন উপকার সে করিতে পারে না!

৩

দেওয়ান দুর্গাশঙ্কর যখন পুত্রের অত্যধিক ধার্ম্মিকতায় প্রীত হইয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া কাশী পালাইয়া গেলেন, তখন সহসা মণিশঙ্কর পরমহংস একদিনেই আপনার অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। সে তাহার গর্ভধারিণীর পরামর্শ-অনুসারে এবং মুহুর্মুহু যকৃত-ঘটিত ব্যাধির তাড়নে একদিন তাঁহার ভক্তসভায় বলিয়া বসিল, “জ্ঞানে ও কর্ম্মে মুক্তি নাই, ভক্তিতেই মুক্তি। সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।” ভক্তগণ সকলেই গুরুর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল, কারণ ভক্তিমার্গে পঞ্চমকারের অভাবই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, অন্ততঃ নব-গোস্বামী প্রভু মণিশঙ্করের আজকাল সেই পথ-অবলম্বন-ব্যতীত উপায়ান্তরও ছিল না। গলায় তুলসীর মালা, মস্তকে দীর্ঘ শিখা, এবং সর্ব্বোপরি চিতা-জাতীয় ব্যাঘ্রের ন্যায় অথবা ডেড্‌লেটার অফিসের চিঠির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে তিলকের ছাপ লাগাইয়া প্রভুপাদ গোস্বামী আজকাল তাহার স্বল্প-সংখ্যক অনুগত ভক্তগণের মধ্যে বসিয়া যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে, তাহাতে আমিষের কোনরূপ গন্ধ না থাকায় অবশিষ্ট ভক্তগণ যদিও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বটে, তথাপি মালপুয়া, ক্ষীর, ছানা, চিনি প্রভৃতি “মধ্বভাবে গুড়ং”এর নিতান্ত অভাব এখনও ঘটে নাই বলিয়া তাহারা এখনও নব বাবাজীকে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

কিন্তু মণিশঙ্কর তাহার পূর্ব্ব আশ্রমে যে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল, বর্ত্তমান আশ্রমেও তাহার সে শক্তি অটুট রহিয়াছে। সে পূর্ব্বাশ্রমে যেমন তন্ত্রাদির ব্যাখ্যায় নিজের অদ্ভুত উদ্ভাবনী-শক্তি দেখাইয়া সর্ব্বলোক-নমস্য হইয়াছিল, বৈষ্ণব শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতেও তাহার সেই শক্তি প্রকাশিত হইতেছে।

এমন কি সাধারণের নিকট যে সমস্ত কথা নিতান্তই বৈষয়িক, সে সব কথার মধ্যেও সে ভক্তির গন্ধ পাইত এবং অপূর্ব্ব কৌশলে সেই সব কথার ভক্তি-পক্ষে ব্যাখ্যা করিত।

একদিন তাঁহার কোন শিষ্য গুরুর উক্ত শক্তির পরিচয় লইবার জন্য বলিল, "প্রভু, এই শ্লোকটীর কি ভক্তিপক্ষে কোন ব্যাখ্যা হতে পারে ?

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে॥
কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান।
গণ্ডায় গণ্ডায় ধূল পরিমাণ॥"

বাবাজী শ্লোক শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গদ্‌গদ বচনে বলিল, "আহা, এ যে মাথুর!" শিষ্য অবাক হইয়া বলিল, "প্রভু, ব্যাখ্যা করে আমার হৃদয়কে শীতল করুন।" প্রভু তৎক্ষণাৎ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিল :—

"কুড়বা কুড়বা অর্থাৎ ক্রূর অক্রূর কুড়বা লিজ্জে, অর্থাৎ সেই ক্রূর অক্রূর তিনি কুড়বাকে লইয়া যাইতেছেন। কুড়বা কি ? কু অর্থাৎ বেদ (প্রমাণ, যথা অন্নদামঙ্গলে 'কু-কথায় পঞ্চমুখ') অথবা কুটিল-হৃদয় কৃষ্ণ; ড় কি না লাঙ্গলী বলরাম; (ড়লয়োর ভেদত্বাৎ) বা কিনা বায়ু অর্থাৎ ব্রজের প্রাণ-বায়ু কুড়বাকে লইয়া যাইতেছেন অর্থে কৃষ্ণ-বলরামকে এবং সেই সঙ্গে ব্রজের প্রাণ-বায়ুকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন; ইহাই সঙ্কেতের দ্বারা সূচিত হইতেছে। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে অর্থাৎ কাঠের ন্যায় কঠিন-হৃদয় সেই অক্রূর কাঠায় কি না কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে লিজ্জে লইতেছে। কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান অর্থাৎ সেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথে একগণ্ডা অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, অক্রূর ও সারথি চারজন যাইতেছেন। আর গণ্ডায় গণ্ডায় ধূল পরিমাণ অর্থাৎ হতচেতনা কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপিণীগণ গণ্ডায় গণ্ডায় ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন।"

অর্থ শুনিয়া শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। সাধু মণিশঙ্কর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময় নূতন জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্র সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মণি, তোমার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা এখন রাখ। তোমার বাপকে ত এই শাস্ত্রের অস্ত্রেই তাড়ালে। কিন্তু তিনি পালাতে পালাতেও যে এক কামড় দিয়ে গিয়েছেন, তারই জ্বালায় ভেক নিয়েছ। এখন যদি নিজের মঙ্গল চাও ত আবার সংসার-ধর্ম্মে মন দিয়ে ভালমানুষের মত বিয়ে-থা কর। আমি তোমার বাপের কাজে তোমাকেই বাহাল করব মনস্থ করেছি।"

সাধুজীর মূর্চ্ছিতপ্রায় অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু মুহূর্ত্তে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আমতা-আমতা করিয়া সাধুজী বলিল, "আজ্ঞে—আমি ত বিষয় ত্যাগ করব, স্থির করেছি—কারণ—"

কার্ত্তিক কহিল, "কারণ তোমার সমস্ত বিষয়ই এখন তোমার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দেবোত্তর। বিষয়-বাসনা-ত্যাগের এর চাইতে গুরুতর কারণ থাকতেই পারে না, তুমি বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছ। কিন্তু যখন শ্বশুর-মশায় তাঁর বিষয় "জামাত্রোত্তর"

করেছেন, তখন তোমার মত নিষ্কাম দেবোত্তরজীবী অবিষয়ীকেই জামাইবাবুর বিশেষ প্রয়োজন। অতএব নির্ভয়ে ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে আমার দেওয়ানী খাসের প্রাজ্ঞ দেওয়ান মোহান্ত মহারাজ হতে পার। তোমার এতে মোহান্ত-গিরিরও অসুবিধা ঘটবে না, চাই-কি, জামাইবাবুও তোমার নিষ্কাম কর্ম্মের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন।"

মণি কহিল, "আজ্ঞে—"

কার্ত্তিক কহিল, "আজ্ঞে-টাজ্ঞে নয়—শোন, তোমার মা সেদিন আমাদের ওখানে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁর মতে তোমার পিতার দেওয়ানী কার্য্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে তোমারই দখলি সত্ত্ব জন্মেছে। তোমাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। আমি তাঁর সঙ্গে আইনের তর্কে পরাস্ত হয়ে তোমার প্রাপ্য তোমায় ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক। তবে যদি তুমি পরম-বকই থাকতে চাও, সাধারণ মানুষের মত না হও, তা হলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি দেওয়ানী গ্রহণে ইচ্ছা থাকে, তাহলে দার-পরিগ্রহাদি সাধারণ জীবের জীবনের নিয়মগুলোও মেনে নাও।"

মণিশঙ্কর কোন কথা বলিল না; মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কার্ত্তিক আবার বলিল, "তা হলে তুমি এ বিষয়ে যা ভাল বোঝো, একটা স্থির করে আমায় বলো, আমি এখন চল্‌লুম। "কার্ত্তিক চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর আপনার বহির্বাস-কৌপীনাদির দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কার্ত্তিক তাহার পিতার টোলে গিয়া দেখিল, সর্ব্বানন্দ বসিয়া শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের সহিত কথা কহিতেছে। কার্ত্তিক বলিল, "আমি তোমায় আসতে লিখলুম, আর তুমি আমার কাছে না উঠে বাবার কাছে এলে যে।"

সর্ব্বানন্দ বলিল, "তুমি আমায় আসতে দেখেও যখন কথা না কয়ে চ'লে গেলে, তখন আর কি করে তোমার বাড়ীতে উঠি?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে কাজে যাচ্ছিলুম তাতে তুমি বাধা দিতে, তাই তোমার সঙ্গে কথা বলবার আগেই তাড়াতাড়ি সে কাজ সেরে এলুম। তুমি যে চিঠি পেয়েই রওনা হবে, তা জানতুম না, নইলে আগেই সে কাজ সেরে রাখতুম।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "কি কাজ, কার্ত্তিক?"

কার্ত্তিক কহিল, "আজ্ঞে, মণিশঙ্করকে তার বাপের কাজে বাহাল করলুম। সেও সে কাজ নিতে স্বীকার হয়েছে।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "মণিকে? কাজটা কিন্তু ভাল হল না।"

কার্ত্তিক কহিল, "ভাল-মন্দ ভগবানের হাতে। তার বাপ ঐ কাজে তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন, সরকারের যথেষ্ট উপকারও তিনি করে গেছেন। এখন তাঁর ছেলেকে ঐ কাজে বাহাল করে তাঁর উপকারের প্রত্যুপকার না করলে অকৃতজ্ঞের কাজ হবে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি তোমার এই যথেচ্ছাচারিত্বে বাধা দিতে এসেছি।"

ন্যায়রত্ন কহিলেন, "যথেচ্ছাচারিতা? সে কি সর্ব্ব?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "হাঁ, যথেচ্ছাচারিতাই বটে। ও আমায় বারবার চিঠি দিয়েছে যে হয় আমি এসে ওর সমস্ত জমিদারীর ভার নি, না হয়ত ও মণিশঙ্করকে এই কাজে লাগাবে। আমি আমার উপস্থিত কাজ ফেলে ওর অধীনে কাজ করতে রাজী হইনি, তাই ও আমার উপর রাগ করে মণিকে বাহাল করতে চাইছে। কালকের চিঠিতে ও লিখেছে যে মণিকে বাহাল করাই সাব্যস্ত। কি যে ওর মনে আছে, তা জানিনে, তবু ওকে এ কাজ করতে নিষেধ করুন, না হলে—"

কার্ত্তিক কহিল, "নাহলে কি হবে, সর্ব্ব দা? এ ত আমার পৈতৃক বিষয় নয়! যদি স্বর্গীয় শ্বশুর মশায়ের উপকারী ভৃত্যের প্রত্যুপকার করি, তাতে কি আমার খুবই অপরাধ হবে?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "প্রত্যুপকার করতে চাও, ত বসে বসে মাসিক কিছু বৃত্তি ওর জন্যে বরাদ্দ করে দাও। তোমার বিষয়ের ভার ওর হাতে তুমি দিতে পাবে না। যার বাপ দেবোত্তর করে তার হাত থেকে নিজের বিষয় রক্ষা করে গেছেন, সেই লোককে কি করে তুমি বিশ্বাস করে দেওয়ানী দেবে?"

কার্ত্তিক কহিল, "অবিশ্বাসের কারণ ত এখনো কিছু ঘটেনি। কাজ হাতে পড়লে সকলেরই বুদ্ধি খুলে যায়। তার প্রমাণ এই দেখ, আমি। আমার ত কোন পুরুষে জমিদারী ছিল না, তবু বিষয় হাতে পেয়ে কেমন চালাচ্ছি। মণি পাকা বিষয়ীর সন্তান, ও ত বিষয়ী হয়েই জন্মেছে। ওর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাব কোথায়?"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "সর্ব্ব, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে কলকেতা থেকে চলে এলে কেন? আমাকে লিখলেও ত' আমি এ-সব কথা কার্ত্তিককে বলতে পারতুম।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "সব কথা আপনার সুমুখে বলা যায় না, খুড়ো-মশায়।"

কার্ত্তিক কহিল, "কেন বলা যাবে না? আমিই বলছি, আমি সর্ব্বদাদাকে আমার কাছে পাবার জন্য ওকে আমার সমস্ত এষ্টেটের দেওয়ানী নিতে অনুরোধ করে চিঠি লিখি। আমি ওর বিষ-দৃষ্টিতে পড়া অবধি কি উপায়ে ওকে আবার কাছে পাব, তাই ভাবছিলুম। দেওয়ানজী যখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাশী গেলেন, তখন একটা সুবিধে হল। কিন্তু এমনি আমার কপাল যে যাতে আমার এতটুকু সুবিধে হয়, তা সর্ব্ব-দা কখনই করবে না। তাই এখন এই উপায় অবলম্বন করেছি। মণির হাতে সব কাজের ভার দিলে বিষয় আমার নষ্ট হবার দিকেই যাবে, তখন যদি দয়া করে ও আমায় রক্ষা করতে আসে, এই আমার আশা।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "তোমার উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তোমার চাকরি নেব যেদিন, সেদিন বুঝব যে, আমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা জানি সর্ব্ব-দাদা। বামুনের ছেলে কুকুরের বৃত্তি গ্রহণ করতে

কখনই চাইবে না, বিশেষত আমার মত জামাই বাবুর অধীনে। যে শ্বশুরের নামে বিকুচ্ছে সে যে নিজেই কুকুর, কুকুরের অধীনে চাকরি কোন ভদ্র লোকের ছেলেরই নেওয়া উচিত নয়, তুমি ত ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমি আগেই এ সব কথা জানতুম, তাই মণিকে দেওয়ান করবই ঠিক করেছিলুম। তোমায় ভয় দেখিয়ে যে একবার আনতে পেরেছি, এইটুকুই আমার লাভ। তুমি আমায় বাঁচাতে এসেছ, কিন্তু আমায় বাঁচাতে পারবে না। এখন কুকুরের অন্ন গ্রহণ করবার যদি ইচ্ছা থাকে ত এস। আর অতটা যদি দয়া করতে রাজী না হও, তবুও আমার জিত, কারণ তুমি আমাকে এখনও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারনি, এটুকু আমি জানতে পারলুম।”

কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, কিন্তু শিবচন্দ্র পুত্রের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া বলিলেন, “সর্ব্ব, কার্ত্তিক আমার এ কি হতে চলেছে? ওর মুখ দেখে ওর গর্ভধারিণী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। কালিকাবাবুর কথা রাখতে গিয়ে এ আমি কি করলুম?”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “কিছু অন্যায় করেন নি, খুড়োমশায়। সন্তান যদি পিতা-মাতার সদভিপ্রায় বুঝতে না পেরে মিছি মিছি নিজেকে নিজে নষ্ট করে ত তার জন্য কোন দুঃখ করা উচিত নয়। কালিকাবাবুর মত শ্বশুর, শৈলজার মত স্ত্রী লাভ করেও যে মূর্খ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করে, তার মঙ্গল কখনও নেই।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “বৌমা যে আমার কতখানি গুণবতী, তা তুমি জান না, সর্ব্ব। এমন স্ত্রী লাভ করেও কার্ত্তিক অসুখী হল!”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “সুখ-শান্তি যে চায় না, দুঃখ-অশান্তিই যে চায়, তার ভাল করতে ভগবানও অক্ষম। যাক, খুড়োমশায়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কার্ত্তিককে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে কখনই দেব না। তবে সবই ভগবানের হাত।”

শিবচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সর্ব্বানন্দর সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

বর্ণভেদ

যেমন ধর্ম্মের মধ্যে, তেমনি বর্ণভেদ-প্রণালীর মধ্যেও, চাঞ্চল্য, প্রয়াস, ও ভাঙ্গা-গড়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

প্রথমে আমরা আলোচনা করিব,—য়ুরোপীয় প্রভাবের বাহিরে, ভারতীয় সমাজের

ক্রমবিকাশেই এই প্রণালীটি কিরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমরা উহার মধ্যে চারিটি লক্ষণ দেখিতে পাই। যথা:—সংমিশ্রণ, রূপান্তর-গ্রহণ, মর্য্যাদা-সোপানের পরিবর্ত্তন, ও খণ্ডাংশে খণ্ড-বিভাগ।

(১)

সংমিশ্রণ (confusion)। এইগুলি বর্ণভেদপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত, যথা:—

সামাজিক শ্রেণীসমূহ,
ব্যবসায়-সম্প্রদায় (Corporation),
গ্রাম্য-মণ্ডলী,
ধর্ম্ম-সম্প্রদায়,
দেশবাসী লোক ও বংশসমূহ,
যাযাবর অথবা বন্যজাতি।

এই বিভিন্ন উপাদানগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করায় সুবিধা আছে।

সংখ্যায় ১৪ লক্ষ—ব্রাহ্মণেরা, ২৭৪ মুখ্য জাতে বিভক্ত। নাম ছাড়া তাহাদের মধ্যে সাধারণত্ব আর কিছুই নাই।

মূলোৎপত্তি।—কেহ কেহ বাস্তবিকই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎপন্ন। আবার কেহ কেহ রাজার পদবী গ্রহণ করিয়াছে বা জোর-দখল করিয়াছে:—উহাদের মধ্যে অনেকেরই দেহে দ্রাবিড়ীয় শোণিত বহমান,, অথবা অনেকেই ভারতের নীচতম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বাসভূমি।—হিন্দুস্থান ও পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ-দিগের গর্ব্ব অতুলনীয়। এমন-কি নিম্নতর জাতের হিন্দুস্থানীরাও বাঙ্গালী ও মারাঠী ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করে।

প্রাচীন আচার-ব্যবহারের প্রতি ভক্তি।—খুব উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এখনো পর্য্যন্ত মনুর নিয়ম পালন করে, এমন-কি পূত অগ্নিকে রক্ষণ ও পোষণ করিয়া থাকে। আবুল-ফজল বলেন, নিকৃষ্ট পদবীর অন্য ব্রাহ্মণেরা,—বর্ব্বরের ন্যায়, ম্লেচ্ছের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

কর্ম্ম-ব্যবসায়। — আর্য্যশব্দার্থ-অনুসারে প্রধান যাজকের কর্ত্তব্যগুলি এইরূপ যথা:—উহাদের মধ্যে কেহ-কেহ নিজ বংশের প্রচলিত পূজা-অর্চ্চনায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। আবার কেহ-কেহ অন্যান্য জাতের, গ্রামের ও শাখাজাতির পৌরোহিত্য করে। এসিয়ার লোকদিগের কি-রকম পুরোহিত, তাহা বলি শোনো:—পতিত, অবজ্ঞাত—উহারা, শিব ও বিষ্ণুর মন্দিরে ঠাকুর-পূজার কাজ করিবার জন্য, নীচ জাতের লোকদিগের সঙ্গে মেলামেশা করে; অথচ, শাস্ত্র এই সকল কাজ করিতে উহাদিগকে নিষেধ করে। এইসব ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ-কেহ পূজা-অর্চ্চনায় ব্যাপৃত, কেহ-কেহ পৌরোহিত্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; আবার কেহ-কেহ যাজক-বৃত্তি একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে;—উহারা অন্য অ-পতিত ব্রাহ্মণের দ্বারা নিজ গৃহের পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে; আবার কতক-গুলি ব্রাহ্মণ, নিষিদ্ধ ব্যবসায়ে,—এমন-কি অতীব জঘন্য নীচ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। উহারা মাংস আহার করে; উহাদের কোন যাজকতার কাজ নাই; উহাদের প্রাচীন পদমর্য্যাদা শুধু উহাদের অধঃপতনকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

সম্মান লাভ।—চাষা-লোকেরা উচ্চশ্রেণীর

ব্রাহ্মণের পদতলে প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করে। এমন কতকগুলি অ-শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণও আছে যাহাদিগকে চাষারা তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে দেয় না (১)।

* *
*

ভারতবাসীর যে ৯/১০ অংশ লোক বাহিরে অবস্থিতি করে, সেই কৃষকজাতিই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সামন্ততন্ত্র-প্রণালী উহাদিগকে দুই জাতে বিভক্ত করিয়াছে,—এক, অভিজাত-শ্রেণীর জাত; আর এক দাস-চাষা-শ্রেণীর জাত। আইনের দৃষ্টিতে, দাসত্ব রহিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাতন শ্রেণীবিভাগটা কার্য্যত রহিয়া গিয়াছে।

অভিজাত শ্রেণীর জাত। প্রথম পংক্তিতে রাজপুতগণ (প্রধান ৮০ জাতের মধ্যে, এক কোটি রাজপুত সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে)। রাজপুতেরা অপনাদিগকে প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বংশজ বলিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। উহার এক অংশ—ভারত-আক্রমণ-কারী শাখাজাতি সমূহ:—যথা,—শক, তুর্ক, আফগান, মোগল। অপর অংশ—সামন্ততন্ত্র-গত অভিজাতবর্গ; ঐ সকল শাখা-জাতি রাজপুত নাম ধারণ করিয়াছে, অথবা রাজাদিগের নিকট হইতে ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (এখনো এই উভয় প্রণালী অনুসারেই রাজপুতেরা আভিজাত্য লাভ করিয়া থাকে)। অনেক বংশে বা পরিবারের মধ্যেও এইরূপ ঘটিত: যখন কোন বন্য লোক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তখনই উহারা রাজপুত পদবী প্রাপ্ত হয়, ঐ শাখাটিও আবার এক নূতন জাতে—সাধারণত একটা নীচ জাতে পরিণত হয়। রাজপুতেরা ভৌমিক অভিজাতবর্গ; উহাদিগের রীতিনীতি, ও অন্ধসংস্কারাদি য়ুরোপীয় ভৌমিক অভিজাতবর্গকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

---

(১) Ibbetson নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি প্রদর্শন করেন। দিল্লির "ত্যাগ" বিভাগের ব্রাহ্মণেরা, উহাদের যাজক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে (ত্যাগ দেনা); কারিগর "যাতি"দের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ-সন্তান। দিল্লির "ধারক্রা"রা—সেই-সব ব্রাহ্মণ যাহারা বিধবার বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকার করে। "মহা" ব্রাহ্মনেরা অনেক গ্রামের চৌকাঠ মাড়াইতে পারে না; উহারা নিকটে আসিলে দেহ কলুষিত হয়।

M. Lyall রাজপুতদের সম্বন্ধে এইরূপ বলেন:—

"সমভূমি-প্রদেশের ন্যায়, পার্ব্বত্যভূমির লোকদের মধ্যেও বর্ণভেদপ্রণালী অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। রাজা সম্মানের মূল-উৎস ছিলেন, অনেক সময়ে সম্মান লাভ তাঁহার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছি—এমন দৃষ্টান্ত আছে, যে স্থলে, কাজকর্ম্ম বা অর্থের বিনিময়ে, কোন রাজা একজন "গির্থ"কে "রথি"-পদবীতে, অথবা একজন "ঠাকুর"কে "রাজপুত" পদবীতে উন্নীত করিয়াছেন; এখনও, জায়গির্দ্দার রাজারা কোন দোষের দরুণ জাত্যন্তরিত লোকদিগকে জাতে তুলিয়া লইয়াছেন; এমন-কি ইহাই উহাদের একটা আয়ের পথ।"

Ibbetson আরো এই কথা বলেন যে, তরকারী উদ্ভিজ্জ রোপণ করার দরুণ হুসিয়ারপুরের "সংসার"-রাজপুতেরা পতিত হইয়াছে; কর্ণালের চৌহানেরা, রাজপুতেরা তন্তুবায়-বৃত্তি অবলম্বন করায়, "শেখ" হইয়া পড়িয়াছে... (Census of the panjab)

আদম-সুমারীতে প্রধান বলিয়া যে সকল জাতের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ভোট-দিগের সংখ্যা—৬, ৬৪৪, ৭৩৩; গুজরদিগের সংখ্যা—২, ১৭১, ৬২৭; মারাঠাদিগের সংখ্যা—৩, ২২৪, ০৯৫; ভাবনদের সংখ্যা—১, ২২২, ৬৭৪; নাইরদিগের সংখ্যা—৯৮০, ৮৬০।

জাতিতত্ত্ববিৎদের মতে, জাটেরা শকদের বংশজ। পূর্ব্বকালে জাটশব্দে এক বংশ বুঝাইত; অধুনা এক কৃষকশ্রেণী বুঝায়; এই কৃষকশ্রেণী রাজপুত অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু দাস-চাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জাটেরা আমাদের "alleux"ভূম্যধিকারীদের অনুরূপ। গুজ্জরেরাও ঐরূপ; গুজ্জরদের হইতেই "গুজরাট" নামটা আসিয়াছে। এবং এই গুজ্জরেরা এক্ষণে উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মারাঠাজাতি গণতন্ত্র-প্রবণ, কিন্তু উহাদের মধ্যে জাতের সমস্ত সোপান-পরম্পরাই আছে। অধুনা মারাঠা নামে দাক্ষিণাত্যের অভিজাত শ্রেণী বুঝায়। যাহারা, না-অভিজাত শ্রেণীর লোক, না-মারাঠা,—তাহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ নাম ধারণ করে।

বেহারের "বাব্বন"রা বিশুদ্ধ-শোণিত আর্য্যবংশীয় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কর-মণ্ডলের "নাইর"রা দ্রাবিড়ীয় জাতি হইতে উৎপন্ন এবং নাইর-রমণীদের মধ্যে বহুপতি-গ্রহণ প্রচলিত।

একদিকে যেমন কতকগুলি অভিজাত শ্রেণীর জাত, অপর দিকে তেমনি দাসত্ব-মুক্ত দাস-চাষার (Serf) জাত আছে। এই শ্রেণীর লোক, যথা :—"কুন্‌বি" বা "কুর্ম্মি" (১০, ৫৩১, ৩০০); উক্ত দুই নামে কৃষক বুঝায়; আবার কুর্ম্মি-শ্রেণী, বহু উপবিভাগে বিভক্ত; শুনা যায়, উহাদের ৫২ উপবিভাগ; কিন্তু সম্ভবত আরো বেশী। কতকগুলি জাত ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত, (যেমন "লিঙ্গায়ৎরা"), আর কতক-গুলি জাত ব্যবসায়-সঙ্ঘ-ভুক্ত, বিশেষ কোন গোত্রভুক্ত (clan), অথবা কোন শাখা-জাতিভুক্ত (tribe); যে গোত্র হইতে, যে গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন, সেই গোত্র বা গোষ্ঠী হইতে উহারা নাম পাইয়াছে। কৃষক-শ্রেণীর অনেকগুলি জাতের পদবী অপেক্ষাকৃত উচ্চ (উহারা নিজহাতে মাটি চষে না, উহারা লাঙ্গলী-চাষা নহে); আবার কতকগুলি জাত অস্পৃশ্য বলিয়া খ্যাত, যথা :—পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় নমোশূদ্রেরা (১,৯৪৮, ০৫৮)।

*
* *

শাস্ত্র-প্রচারের যুগে যাদের তেমন মান ছিল না, সেই বণিকেরা (বেনিয়া, মহাজন অথবা বৈশ্য) (৩,১৮৬,৬৬৬) আজিকার দিনে সম্মানিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উহারা প্রাচীন প্রথাদির প্রতি খুব আসক্ত। উহারা উপবীত ধারণ করে, এবং আপনাদিগকে প্রাচীন বৈশ্যদিগের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করে। উহাদের অসংখ্য জাত,—১৩টি প্রধান উপবিভাগে বিভক্ত। লিপিকর-জাত কায়স্থেরা (সংখ্যায় ২,২৩৯,৮১০) অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রভূত প্রভাব অর্জ্জন করিয়াছে।

কারিগর জাতের লোকেরা (২৮,৮৮২, ৫৫১) অধিকাংশই জাতিতত্ত্বঘটিত দল-

সমূহের অন্তর্ভূত; ইহারা কতকগুলি উপবিভাগে বা উপজাতে বিভক্ত। এই সকল উপজাতের নিয়ম ও অধিকারাদি, আমাদের প্রাচীন Corporation-সমূহকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

*
* *

গোটা হিন্দু সমাজটা যাহা লইয়া গঠিত সেই সকল জাতের নীচে,—বুনা, কাঠুরিয়া, শিকারী, ধীবর, দৈবজ্ঞ, কথক, কুস্তিগীর, নর্ত্তকী, বেশ্যা, চোর (২)—এই সকল শ্রেণী ধর্ত্তব্য।

২

উনবিংশ শতাব্দিতে বর্ণভেদ-প্রণালীর দ্বিতীয় লক্ষণটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—বর্ণভেদের রূপান্তর-প্রাপ্তি বা আকার-গত পরিবর্ত্তন।

প্রাচীন ভারতে, আমাদের মনে হয়, বর্ণভেদপ্রণালী হিন্দুসমাজের বা পুরোহিত-সমাজের একটা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহা হইতেই জাতের ধর্ম্মলক্ষণ; জাতের নিয়ম পালন না করা,—আর সমাজ হইতে স্বতঃবহিষ্কৃত হওয়া ও চির-নরক-ভোগের যোগ্যপাত্র হওয়া—একই কথা ছিল।

কালক্রমে, বর্ণভেদপ্রণালী উহার ধর্ম্ম-লক্ষণটা খোয়াইয়া ফেলিল। এমন-কি ভারতেও পুরোহিত-তন্ত্রটা ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং সমাজ ধর্ম্মসমাজ হইতে পৌর-সমাজে পরিণত হইল। যুরোপীয়েরা এই ক্রম-বিকাশটা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। এসিয়িক ও যুরোপীয়, মুসলমান ও খৃষ্টীয় আধিপত্য হইতে ব্রাহ্মণেরা যে প্রভাব লাভ করিয়াছিল, সেই প্রভাব দেখিয়াই উহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। ভারত-আক্রমণকারী-দিগের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ হিন্দুদের পরস্পরের মধ্যে একটা নৈকট্য স্থাপিত হইয়াছিল; উত্তরাঞ্চলে, যখন উহাদের রাষ্ট্রীয় প্রধানেরা পরাভূত হয়, তখন উহাদের গুরু পুরোহিত-দিগকে অধিনায়কের ভার গ্রহণ করিবার জন্য উহারা অনুরোধ করে। তাছাড়া, পরাভূত, ও যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া, স্বকীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, উহারা সহিষ্ণুতাশ্রিত প্রতিরোধশক্তির আশ্রয় লইল:—উহারা নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রাচীন প্রথাদিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। এই জন্যই, যে-যে অঞ্চলে যুরোপীয় ও মুসলমানেরা অভিজাতবর্গকে বিনষ্ট করিয়াছে এবং যে-যে অঞ্চলে অভিজাতবর্গ স্বকীয় অধিকার বজায় রাখিয়াছে, সেই সেই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের আর তেমন প্রভাব নাই। কোথাও উহারা রাজা-মহারাজাদিগের সামান্য ভৃত্য মাত্র, কোথাওবা উহারা উদ্ধত ও অত্যাচারী পুরোহিতরূপে অবস্থিত। তাই, ধর্ম্মসংক্রান্ত ঐতিহ্য-সমন্বিত হইলেও, বর্ণভেদপ্রণালীটা পৌরসমাজিক (civil) প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্য-জাতিদিগের মধ্যেও কতকগুলি জাত গড়িয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে কতকগুলি হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র; এবং কতকগুলি হিন্দুসমাজের

(২) আদম সুমারীর সংখ্যা-তালিকায়, চোরের জাতগুলাকে, শীকারী, চাঁচ-বিনানীয়া, ভবঘুরে, ভিক্ষু এইরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু আসলে উহারাই চোরের জাত। পঞ্জাবের "মীনা" ও "হার্ণী"রাও এইরূপ (Ibbetson)

অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু উহারা নিজের গাছ-পাথর-পূজাপদ্ধতি ও প্রাচীন প্রথাদি বজায় রাখিয়াছে। এইরূপ, মুসলমান, শিখ ও জৈনদিগের মধ্যেও কতকগুলি জাত গড়িয়া উঠিয়াছে। পঞ্জাবে,—হিন্দু ও মুসলমান; শিখদের মধ্যে, কতকগুলি রাজপুতের জাত, গুজ্জরের জাত, জাটের জাত রহিয়াছে; একজন হিন্দু রাজপুত, জাত না খোয়াইয়াও, মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে।

*

* *

জাতের মধ্যে ধর্ম্মপ্রভাব ক্ষীণ হইলেও, তাহার বিপরীতে অন্যান্য প্রভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যথা;—বাসস্থানের প্রভাব, বংশের প্রভাব, ব্যবসায়ের প্রভাব।

বাসস্থান।—বড় বড় শ্রেণী, যথা:—ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেনিয়া, কায়স্থ ইত্যাদি কতকগুলি স্থানীয় জাতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল জাতের মধ্যে কোন প্রকার আদানপ্রদানের সম্বন্ধ নাই।

বংশ।—কতকগুলি জাত,—গোত্র ও শাখা-বংশ বই আর কিছুই নহে। অন্য অনেক জাতের ভিতর, তদন্তর্ভূত ব্যক্তিরা উৎপত্তির এক সাধারণ মূল-স্থান স্বীকার করিয়া থাকে। শোণিত-সম্পর্কে ও আচার-ব্যবহারে ভিন্ন হইলে, শুধু এক সাধারণ ব্যবসায়ের দরুণ উহাদের নৈকট্য প্রতিপন্ন হয় না।

ব্যবসায়।—কারিগর-শ্রেণীর ও বণিকশ্রেণীর সকল জাতই বিশেষ-বিশেষ ব্যবসায়সম্প্রদায়-রূপে (Guild) গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের একচেটিয়া অধিকার খুব কড়াভাবে রক্ষিত হয়। কোন ব্যবসায়-সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হইলে সেই ব্যবসায়ের সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া চাই। কোন এক সম্প্রদায়ের লোক স্বকীয় ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, ব্যবসায়ের হাতিয়ার বা যন্ত্রগুলিও পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। প্রত্যেক দলের এক-এক দল-পতি ও "পঞ্চায়ৎ" নামক নির্ব্বাচনমূলক সভা আছে (৩)। এই সকল সভা—খাটুনীর নির্দ্দিষ্ট কাল ও বেতন-সম্বন্ধে শ্রমজীবিদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া, এবং উহাদের নিয়োগকারীদিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে সকলপ্রকার প্রশ্নের সমাধান করিয়া, নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের নিষ্পত্তির পর আর পুনর্বিচার নাই; কেহ ইহার বিরোধী হইলে, তাহার অর্থদণ্ড হয়, অথবা জাত হইতেও বহিষ্কৃত হইয়া স্বজাতের ব্যবসায়-অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়।

কতকগুলি কঠোর নিয়মের দ্বারা জাতের অখণ্ডতা রক্ষিত হইয়া থাকে। স্বজাতের বাহিরে কেহ বিবাহ করিতে পারে না। স্বজাতের বাহিরের লোকের বাড়ীতে যাতায়াত কিংবা আহারাদি করা নিষিদ্ধ। তথাপি অনেক জাতের মধ্যে এরূপ একটা রফা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা বিবাহের অধিকার স্বীকৃত হয়।

অন্য কতকগুলি নিয়মের দ্বারা জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়। কোন কোন জাতের

(৩) প্রকৃত ভারতীয় ধরণের এইরূপ নির্ব্বাচিত সভা মাত্রেরই যে পাঁচ জন করিয়া সভ্য—"পঞ্চায়েৎ" এই নামে তাহা প্রকাশ পায়। কিন্তু আসলে সভ্য-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

লোক ছাড়া, অপর জাতের লোকের হাত হইতে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় না। কোন অস্পৃশ্য ব্যক্তির ছায়া মাড়াইলেও, রাজপুত বা ব্রাহ্মণের খাদ্য অশুচি হয়।

তাছাড়া, অন্য কতকগুলি আচার ব্যবহার,—জাতের উচ্চ সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিপন্ন করে। প্রথমেই ত বিধবাদিগকে পুনর্বিবাহ করিতে নিষেধ করা হয়। তার পর, রমণীরা অন্তঃপুরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য। কোন কোন জাতের ভিতর, কন্যামাত্রেরই, জাত্যংশে উচ্চতর পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আর কতকগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য নিয়ম আছে—যাহার প্রকৃতিগত লক্ষণ বিশেষভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। যথা—সমুদ্রযাত্রার নিষেধ, মদ্যমাংস আহারের নিষেধ, বিশেষতঃ গোমাংস আহারের নিষেধ।

যে কেহ জাতের নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহার হয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, নয় সে, জাত হইতে বহিষ্কৃত হয়। অনেক সময় ব্রাহ্মণেরা দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে এবং অনেকসময় দলপতির অধ্যক্ষতাধীনে পঞ্চায়েৎ এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করে। যে লোক জাতি হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহার এক প্রকার সামাজিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; স্বজাতের লোকেরা তাহা হইতে বিমুখ হয়, অনেক সময় অন্য জাতের লোকেরাও বিমুখ হয়। কখন-কখন তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরাও তাহাকে পরিত্যাগ করে (৪)।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(৪) আমি M. Senart-এর গ্রন্থ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিব ("ভারতের বর্ণভেদ" পৃ-১৬):—"যে শ্রেণী ও যে অঞ্চলের লোক, তদনুসারে প্রধানেরা বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়; যথা—মিহতর, চৌধুরী, নায়ক, পটেল, পর্গনাইট, সর্দ্দার ইত্যাদি। সাধারণতঃ উহাদের কাজ কুলানুক্রমিক...প্রধানেরা কতকগুলি সম্মানের অধিকার ও কতকগুলি বৈষয়িক সুবিধা সম্ভোগ করে...নিজ নিজ বিভাগে, প্রধানেরা সমস্ত উৎসবের অধ্যক্ষতা করে...উহারা প্রাচীন ব্যক্তিদিগের এক সভার দ্বারা পরিবৃত হয়, সেই সভায় জাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন। এই সভাকে যে চিরস্থায়ী হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই;—অমুক অমুক বিশেষ কাজের উপলক্ষে এই সভা আহূত হইতে পারে... মনে হয় এই সভার নিষ্পত্তি প্রায়ই "কায়েম" হয় না। শেষ নিষ্পত্তি পঞ্চায়েৎ-এর দ্বারাই হইয়া থাকে।" ইংরেজ-আধিপত্যের পূর্ব্বে, এই সকল পঞ্চায়েৎ-সভা, মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পারিত; কোন কোন জাতের মধ্যে, প্রধানদের এই অধিকার ছিল বলিয়া বোধ হয়। Senart (পৃ-৪৬)

বহিষ্করণের অনুষ্ঠানটা একটু গূঢ় অর্থসূচক:—জাত্যন্তরিত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার সামাজিক মৃত্যু। যদি জাত্যন্তরিত ব্যক্তি পুরুষ হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী ও সন্তানাদি বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, এবং সেই হতভাগ্যের পরিত্যক্ত. জাতের মধ্যে তাহাদের স্থান বজায় থাকে না। তাই কোম্পানীর আমলে, যখন কোম্পানী এই বিখ্যাত অধিকার সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতেন না, তখন কোন হিন্দু খৃষ্টান হইলে, সে জাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, স্ত্রীপুত্রাদি হইতেও বঞ্চিত হইত।

ছবির সাজসজ্জা

আজকাল বাঙ্গলা দেশে ছবির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে। ছবি না থাকিলে মাসিকপত্রের গ্রাহক হয় না, গল্পের বই বিক্রী হয় না, এমন কি কাব্য ও গীতাও আদর পায় না। চিত্রকলা খুব ভাল জিনিষ, তবে আমাদের দেশে আজকাল যে সকল ছবির ছড়াছড়ি, তাহাতে কলাবিদ্যার কোনও চর্চ্চা হইতেছে কি না,—ও হইলেও তাহা কি পরিমাণে, সে কথা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

আজকাল বইয়ের মধ্যে কাট্‌তি হয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ও গল্পের বই। এগুলি সকলই আজকাল চিত্রযুক্ত হইয়া বাহির হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেও সচিত্র করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ র'চিত হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পেরও আজকাল অসদ্ভাব নাই। মাসিকপত্রাদিতেও ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক যুগের চিত্র দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল উপন্যাসের ঘটনা ইতিহাসের সহিত সম্পর্কিত, সেগুলিরও সচিত্র সংস্করণ হইতেছে। আজ আমরা এই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চিত্রগুলি সম্বন্ধেই দুই চারি কথা বলিব। দেখা যাক্, এই সকল চিত্র কিরূপভাবে অঙ্কিত হইতেছে। চিত্রশিল্পীগণ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন কি না ও প্রকৃতপক্ষে বর্ষাগমে শিলীন্ধ্র-উদ্‌গমের ন্যায় এই অজস্র চিত্রের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর চিত্রকলা কিয়ৎ-পরিমাণেও উন্নত হইতেছে কি না, এই আলোচনায় তাহাও বুঝা যাইবে।

যে সকল চিত্রকর কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সমসাময়িক নরনারী বা প্রাণী অঙ্কিত করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চিত্রকরকে অধিকতর সাবধান ও পরিশ্রমী হইতে হইবে। সুন্দর নিসর্গদৃশ্য দেখিয়া তাহা পটে তুলিতে পারা যায়, যে নরনারী বা পশুপক্ষী আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, হাবভাব, ও পোষাক-পরিচ্ছদ অঙ্কিত করাও বিশেষ কঠিন নয়। অবশ্য, যাহা আমরা দেখিতেছি অবিকল তাহাই অঙ্কন, চিত্রকলার চরম উদ্দেশ্য নহে। তাহা আলোক-চিত্র-গ্রহণকারীদের কার্য্য হইতে পারে, প্রকৃত চিত্রকলা এই অবিকল নকলের চেয়ে আরও বেশী-কিছু দিতে চায়। বিভিন্ন স্থলের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তাহার মধ্য হইতে কোনও চিত্রের উপযোগী করিতে ঐ সকল উপাদানে যে ছবিটি শিল্পী নূতন করিয়া কল্পনায় গঠিত করেন, তাহা আলোক-চিত্রের মত প্রকৃতির অনুকরণ নহে। এইরূপ সমসাময়িক মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া যে সুখ, দুঃখ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি মানসিক অবস্থাজাত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া কাল্পনিক কোনও ঘটনা চিত্রিত হয়, তাহাও অবিকল স্বভাবের

অনুকরণ নহে। কল্পনা ও নিসর্গের অনুকরণ, এই উভয়ের মিশ্রণেই শিল্পী নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য, জগতে যেরূপ ঘটে তাহা দেখিয়াই শিল্পীর কল্পনা জাগ্রৎ হয়। এমন কি মাইকেল এঞ্জেলো খোদিত ঈশ্বরও বৃদ্ধ মানব দেহধারী ও ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির চিত্রতেও মানব-মুখেরই ন্যায় ঈশ্বরের মুখে রেখা বিকাশ পাইয়াছে ও মানবের ন্যায় তর্জ্জনী সঞ্চালনে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে।

ঐতিহাসিক চিত্রকরকে কিন্তু আরও কিছু করিতে হইবে। তিনি যে যুগের চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইতেছেন, সেই যুগের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, গৃহ প্রভৃতির জ্ঞান থাকা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। মানবদেহ সকল যুগেই এবং সকল দেশেই প্রায় সমান হইলেও যুগগত ও দেশগত কিছু-না-কিছু বর্ণ-বৈষম্য বা গঠন-বৈলক্ষণ্য থাকে। ঐতিহাসিক চিত্রেও নিপুণভাবে এই বৈষম্য ও বৈলক্ষণ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার পর যে যুগে তাঁহার চিত্রের ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন, সেই যুগের পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, কেশ বাঁধিবার ধরণ, অস্ত্র-শস্ত্র, পাদুকা ও ছত্র প্রভৃতি অবিকল দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলটিকেও সেই যুগের অনুরূপ করিয়া অঙ্কিত করিতে হইবে। নহিলে বিশেষজ্ঞের চক্ষে যে তাঁহার চিত্র অস্বাভাবিক ও হাস্য-জনক হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

উদাহরণ না দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে না; তাই পৌরাণিক ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে কোন্ কোন্ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত, তাহা সকলের-জানা একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি।

ধরা যাক্, ভ্রমর কর্ত্তৃক শকুন্তলার পীড়ন অঙ্কিত করিতে হইবে। কালিদাস কল্পনায় এই চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ও নিজ অভিজ্ঞান-শকুন্তলে এই চিত্রের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণণা করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস যদি চিত্রকর হইতেন তাহা হইলে তিনি এই চিত্রখানিকে কিরূপে অঙ্কিত করিতেন তাহাই আমরা দেখিব।

চিত্রের Back-ground হইত স্রোতোবহা মালিনী নদী, তাহার সৈকতে হংসমিথুন নিষণ্ণ। দূরে হিমালয়, তাহার পাদমূলে হরিণ বসিয়া আছে। সম্মুখদিকে তপোবন। বৃক্ষের শাখায় আর্দ্র বল্কল শুষ্ক করিবার জন্য বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার তলে একটা হরিণী, হরিণের শৃঙ্গে নিজ বামনয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে। (১)

যদি কোনও আধুনিক চিত্রকর বৃহদাকারে এই চিত্রটি অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে তপোবনের আরও কয়েকটি জিনিষও পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনার সঙ্গে

(১) "কার্য্যা সৈকতলীন হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণাঃ গৌরীগুরোঃপাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ॥
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥ [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

যোগ করিতে পারেন। এগুলিও কালিদাস-বর্ণিত। তিনি দেখাইতে পারেন, তপোবনের মধ্য দিয়া একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর দিয়া ঋষিগণ স্নানান্তে চলিয়া গিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের আর্দ্র-বল্কলচ্যুত জলবিন্দুর চিহ্ন পথের উপর দেখা যাইতেছে। বৃক্ষগুলির তলে নীবাররাশি ছড়ান। বৃক্ষের কোটরে শুক-পক্ষীর নীড়। শুকমুখভ্রষ্ট হইয়া নীবার ধান্য-কণিকাগুলি বৃক্ষতলে পতিত হইয়াছে। দুই-চারিটি শিলাখণ্ড ইতস্তত পড়িয়া আছে। সেগুলি দ্বারা মুনিগণ ইঙ্গুদীফল চূর্ণ করিয়া তৈল বাহির করিয়া লইয়াছেন, রাত্রিতে ঐ তৈলে প্রদীপ জ্বলিবে। তৈললিপ্ত হওয়াতে শিলা-খণ্ডগুলি চিক্কণ। (২)

যে স্থলটিতে সকলে দাঁড়াইয়া, তাহা অসমতল। (৩) একটি আম্র-বৃক্ষতলে শকুন্তলা দাঁড়াইয়া, জলসেক করাতে বৃক্ষের পল্লবগুলি স্নিগ্ধ হইয়াছে। আম্রবৃক্ষ জড়াইয়া নব মালিকালতা উঠিয়াছে, শকুন্তলার শান্ত ও চকিত ভাব। ললাট ও কপোলে স্বেদ-বিন্দু দেখা দিয়াছে; কবরী শিথিল, তাহা হইতে দুই-একটি কুসুম ঝরিয়া পড়িয়াছে। রক্তোৎপলের ন্যায় প্রসারিত অঙ্গুলি দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া ভ্রমরের দিকে চকিত ভাবে তিনি চাহিয়া আছেন। (৪)

শকুন্তলার পরিধান বল্কল। একখানি কটিদেশে জড়িত, অপরখানি দ্বারা দেহের ঊর্দ্ধভাগ আবৃত। কর্ণে শিরীষকুসুমের অলঙ্কার, তাহার কেশর গণ্ড পর্য্যন্ত লম্বিত। বক্ষে শরচ্চন্দ্রের কিরণের ন্যায় ধবল মৃণালের হার। (৫)

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার বল্কল পরিধান। অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা ও শকুন্তলার তিনটি কলস। শকুন্তলার ঘটটি মাটিতে পড়িয়া আছে।

রাজার ধনু বা আভরণ নাই। বিনীত বেশে আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় বলিয়া

---

(২) "নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদাঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ
বিশ্বাসোপসমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগ
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দ-রেখাঙ্কিতাঃ ॥" [১ম অঙ্ক]

(৩) "খলই বিঅ মে দিট্ঠি ণিণ্ণুণ্ণঅ পাদে সেনু।" [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

(৪) "তক্কেমি জা এসা সিভিলকেসবন্ধুব্বন্তকুসুমেণ কেসন্তেণ উব্ভিন্নস্সেঅবিন্দুণাবঅণেণ বিসেসদো ওসরিআহিং বাহাহিং অবসেঅ-সিণিদ্ধ-তরুণপল্লবস্স চূঅপাঅবস্স পাসে..." [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

"রওকুঅলঅপল্লঅ সোহিণা অগ্গহত্থেণ মুহং"

(৫) "ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।" [১ম অঙ্ক]

"কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে
শিরীষমাসণ্ডবিলম্বিকেশরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচি কোমলং
মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥" [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

ধনু ও আভরণ সারথির হাতে দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। (৬)

এখন দেখা যাক্, বাঙ্গালী চিত্রকরের তুলিকায় কলিদাসের এই কল্পনাচিত্রখানি কিরূপভাবে ফুটিয়াছে।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩২০) 'দৃষ্টি-বিভ্রম' নামে পূর্ব্ববর্ণিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা তিনজনেই এক একখানি সাড়ী পরিয়া আছে। সখীদের লাল কাপড়, শকুন্তলার সাদা কাপড়। চিত্রে যেভাবে শকুন্তলা ও সখীদের এক-একখানি সাড়ী পরান হইয়াছে, প্রাচীন যুগে ওরূপ ভাবে কেহ সাড়ী পরিত না। সেকালে রমণীগণ দুখানি বস্ত্রে দেহ আবৃত করিত,—দুখানি বল্কলের কথা কালিদাসও স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানি দেহের ঊর্দ্ধভাগ জড়াইয়া ছিল তাহা বক্ষের কাছে দৃঢ় করিয়া বাঁধা হইয়াছিল বলিয়া শকুন্তলা তাহা শিথিল করিয়া দিতে বলিয়াছিল। (৭) শুধু বল্কলের বেলায় নয়, শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করিবার সময়ও ক্ষৌম বস্ত্রযুগল দ্বারা দেহ আবৃত করিয়াছিল। (৮) কালিদাস যে যুগে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' রচনা করিয়াছিলেন, এই যুগল বস্ত্র পরিধান সেই যুগের বিশেষত্ব ধরিলেও, প্রাচীনতা হিসাবে সাড়ী পরান অপেক্ষা ঐ যুগলবস্ত্র পরানই যে প্রাচীন চিত্রে অধিকতর উপযোগী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালিদাস অপেক্ষা প্রাচীন ভারতের পরিচ্ছদের অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান চিত্রকরের যে হইতেই পারে না, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না।

এখন দুষ্মন্তের পরিচ্ছদটা কিরূপ দেখা যাক্। নাগরা জুতা, মোজা, হাফ্‌প্যাণ্ট, চাপকান, কোমর ও মাথায় পালকযুক্ত পাগড়ী। চাপকানের হাত আধকাটা, তাহার তলায় লাল রঙ্গের এক জামা দেখা যাইতেছে। রাজার কোমরে তরবারি ঝুলিতেছে। তাহার খাপ লাল রংয়ের। চাপকানের উপরে মুক্তার মালা। চাপকানের কিনারায় জরির কাজ করা। স্কন্ধদেশে জরির কাজ করা পান দেখা যাইতেছে। এই কি প্রাচীন ভারতের রাজবেশ?

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' দুষ্মন্তের পোষাকের বর্ণনা নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন খোদিতমূর্ত্তি ও গ্রন্থাদি হইতে সেকালের রাজাদের পরিধানে কি থাকিত তাহা জানা কঠিন নহে। কিন্তু যে পরিচ্ছদ চিত্রে দেওয়া হইয়াছে তাহা কি কোন অংশে প্রাচীন যুগের উপযোগী? মুসলমান যুগে যে পাগড়ী ও চাপকান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার সহিত ইংরাজী ফ্যাসনের মোজা ও হাফ্‌প্যাণ্ট যোগ করা হইয়াছে। একটু দেশী ভাব দেখানর জন্য মুক্তার মালা গলায় দেওয়া হইয়াছে।

---

(৬) "বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ইদং তাবদ্ গৃহ্যতাম্। [সূতায় আভরণানি ধনুশ্চোপনীয় অর্পয়তি।"] [১ম অঙ্ক]

(৭) "সহি অনসূএ, অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ নিঅন্তিদ ক্ষি।" [১ম অঙ্ক[

(৮) "পরিহেহ্ন সংপদং খোমজুঅলম্" [৪র্থ অঙ্ক]

চিত্রকর 'বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ করিতে হয়' কালিদাসের এ কথা মানেন নাই। দুষ্মন্তের আভরণ ও তরবারি রহিয়াছে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত রাজোচিত আভরণাদি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি যে রাজা সে কথা গোপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ চিত্রের দুষ্মন্তকে দেখিলে বালকেও তাঁহাকে রাজা বলিয়া চিনাইয়া দিবে। যাক্ সে কথা। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই কতক-হিন্দু, কতক-মুসলমানী, কতক-সাহেবী ঢংয়ের পোষাক চিত্রকর কি বলিয়া দুষ্মন্তকে পরাইলেন ? এই চিত্রকরের অঙ্কিত আর-একখানি চিত্র ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে জয়দেবের সমকালীন এক রাজার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। দুষ্মন্ত ও সেই রাজার পরিচ্ছদের কোনও প্রভেদ নাই। চিত্রকর বোধ হয় রাজা হইলেই একরকম পোযাক পরাইয়া থাকেন। তা সে মোগল বাদসাই হউক, দুষ্মন্তই হউক আর আমাদের দেশের আধুনিক খেতাবধারী রাজাই হউন, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না।

আমাদের দেশে যাঁহারা মাসিকপত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই এ-সকল ত্রুটি ধরিবার শক্তি নাই। প্রাচীন যুগের রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সহিত পরিচয়ও তাঁহাদের অল্প। তাই এ-সকল অদ্ভুত ছবি রং-চংয়ে করিয়া ছাপাইয়া দিলে তাঁহাদের তৃপ্তি বই অসন্তোষ জন্মে না। কিন্তু এই চিত্রের পিছনে একখানি মোটরকার ও রাজার হস্তে বন্দুক আঁকিলে যেমন হাস্যজনক হয়, বিশেষজ্ঞের চক্ষে রাজার এই পোষাকও তেমনি উপহাসের জিনিষ।

অবশ্য একটা কথা উঠিতে পারে যে, চিত্রকরকে তাহা হইলে প্রাচীন সাহিত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। আমরাও বলি, তাহা যথার্থ। বিলাতে চিত্রকরদের সহায়তার জন্য কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন যুগের নরনারীর পরিচ্ছদাদির সচিত্র বর্ণনা চিত্রসহ দেওয়া আছে। নাট্যশালার অভিনেতা বা চিত্রকর এই সকল গ্রন্থের সাহায্যে যে কোনও যুগের যে কোনও ব্যক্তি সাজিতে বা আঁকিতে পারেন। আমাদের দেশে এ শ্রেণীর গ্রন্থ নাই তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া চিত্রকরগণ যে যাহা ইচ্ছা আঁকিয়া দিবেন তাহাও সঙ্গত নহে। যাঁহাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা সমসাময়িক যুগের নরনারী বা ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করুন, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা পশু-পক্ষী অঙ্কিত করুন, ঐতিহাসিক বা প্রাচীন যুগের চিত্রাঙ্কণে তাঁহাদের পক্ষে অগ্রসর না হওয়াই মঙ্গল।

এখন ঐ চিত্রখানির ভাবভঙ্গী ও মূর্ত্তিগুলিকে সাজানর বিষয় কিছু বলি। কালিদাসের নাটকে আছে, নবমালিকায় সলিল সিঞ্চন করিলে একটি ভ্রমর উড়িয়া শকুন্তলার মুখের দিকে ধাবিত হয়। (৯) শকুন্তলা মুখের উপর হাত দিয়া চকিতভাবে দাঁড়াইলেন। (১০) আমাদের আলোচ্য চিত্রে

(৯) "অম্মো সলিলসেঅ-সংভমুগ্গদো ণোমালিঅং উজ্‌ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই।" [১ম অঙ্ক]

(১০) "অগ্গহত্থেণ মুহং ওবারিঅ।" [৬ষ্ঠ অঙ্ক]

এ ভঙ্গীটি ধরা হয় নাই। চিত্রে শকুন্তলার এক হাত প্রায় ললাটের নিকট ও অপর হস্তে কলম। যদি এইমাত্র ভ্রমর উড়িয়াছে এমনধারাই হয় (কলমের ভঙ্গী দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে), তাহা হইলে শকুন্তলা যে নবমালিকায় সলিলসেক করিতেছিল তাহার সম্মুখেই সে দাঁড়াইয়া থাকিবে; আলোচ্য চিত্রে চূতবেষ্টনকারী 'বনজ্যোৎস্না' নামক নবমালিকা দেখিতে পাই না। শকুন্তলার নিকটেও চূতবৃক্ষ বা ঐ লতা নাই।

আভরণের মধ্যে কালিদাসবর্ণিত মৃণালের হার বা শিরীষকুসুমের কর্ণাভরণ আলোচ্য চিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে চিত্রকর শকুন্তলা ও সখীদের হাতে ফুলের বালা ও খোঁপায় ফুলের মালা দিয়া সাজাইয়াছেন। কালিদাসের 'শিথিল কেশপাশে'র কিছুমাত্র লক্ষণ শকুন্তলার আঁটা খোঁপায় দেখা যাইতেছে না।

চিত্রটির তলে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে:—

"যতো যতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে
ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে
ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥"

অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে মধুকর যাইতেছে, সেইখানেই শকুন্তলা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। অদ্য এই দৃষ্টিক্ষেপজনিত ভ্রূবিক্ষেপে শকুন্তলার কটাক্ষপাত শিক্ষা হইতেছে!"

এই শ্লোকের শেষ শব্দটি লইয়া চিত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে 'দৃষ্টিবিভ্রম।' চিত্রকর যে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' বর্ণিত চিত্রটি আঁকিতে যত্ন করিয়াছেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই, কিন্তু যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এক মুহূর্ত্তের অবস্থা বর্ণনা করিতেছে না; কয়েক মুহূর্ত্তের অবস্থা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই হিসাবে নামকরণটিও বিশেষ সমীচীন হইয়াছে মনে করি না।

কেবল চিত্রকলার দিক দিয়া দেখিতে গেলে আর-একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কোন মূর্ত্তির পরিচ্ছদ অঙ্কিত করিতে হইলে কেবল পোষাকটি আঁকিতে শিখিলেই চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেহের গঠনটিও পরিচ্ছদের নিম্ন দিয়া ফুটাইতে হইবে; কারণ যেরূপ পরিচ্ছদই হউক না, দেহের গঠন-অনুসারে তাহার বিশেষ ভাঁজ হইবে। কেবল একটা পোষাক আঁকিয়া তাহাতে ভাঁজ আঁকিয়া দিলে দেহের ভঙ্গী বুঝায় না। শকুন্তলার নিকটেই যে সখী অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সাড়ীর নিম্নদেশের ভাঁজ যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আমরা এই একটিমাত্র চিত্র বিশদরূপে সমালোচনা করিয়া দেখাইলাম যে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চিত্রকরকে অতিমাত্র সাবধানতার সহিত নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত চিত্রটি আঁকিবার জন্য সমস্ত উপাদান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' বর্ণিত থাকা স্বত্বেও চিত্রকর তাহার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। অথচ তিনি কালিদাসের নাটকেরই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নাটকে প্রযুক্ত একটি শব্দে চিত্রের নামকরণ করিয়াছেন ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র কাল্পনিক চিত্রটিই পটে আঁকিয়াছেন বলিয়া

জানাইয়াছেন। যেখানে উপাদানের এত প্রাচুর্য্য, সেখানেই এত গলদ্, আর যেখানে সে সুবিধা নাই, সেখানে চিত্রকরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহাও 'কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্মন্ত' নামে একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। (মানসী, বৈশাখ, ১৩১৮) তাহাতে শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার পরিধানে লাল সাড়ী, রাজার পরিধানে নাগরা, পায়জামা, চাপকান ও পাগড়ী। চাপকানের উপর মুক্তার মালা। কটিদেশে তরবারি। 'ভারতবর্ষে'র চিত্রে রাজার পোষাকের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, এই চিত্রের রাজার পোষাক-সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই মুসলমানী আমলের পোষাক আমাদের চক্ষে অতি বিসদৃশ ঠেকে।

ভবানীবাবু চিত্রে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-বর্ণিত অবস্থা অঙ্কিত করেন নাই। ভবানীবাবুর চিত্রে দেখি, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা কলস হস্তে দাঁড়াইয়া, শকুন্তলা আনতমুখী। রাজা যেন সর্ব্বপ্রথম আত্ম-প্রকাশ করিলেন, এই ভাব। যেস্থলে ইঁহারা দাঁড়াইয়া, সেখানে লতা বা বৃক্ষ নাই। হঠাৎ জলসেচন করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এ ভাব হইলে সম্মুখে বৃক্ষ বা লতা বর্ত্তমান থাকিলেই যুক্তিযুক্ত হইত। প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ার কলস-ধারণের ভঙ্গী দেখিয়া কিন্তু মনে হয় যে, রাজা যেন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা সবেমাত্র জলসেচনে নিবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সামনে যে-প্রকারে অনেকটা ফাঁকা জায়গা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে এই ভঙ্গীটি ঠিক খাপ খাইতেছে না। দুষ্মন্তও যে হঠাৎ কোন আবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন, তাহাও মনে হয় না। নিকটে বৃক্ষাদি অঙ্কিত না হওয়াতে এ সম্ভাবনাও মনে উঠে না।

পায়জামা, চাপকান পরা প্রাচীন রাজার চিত্র ভবানীবাবু আরও আঁকিয়াছেন। 'দশরথ ও কৈকেয়ী' চিত্রে (মানসী, ফাল্গুন, ১৩১৮) তিনি কোমরে ছোরা-গোঁজা, সাদা চাপকান-পরা দশরথ আঁকিয়াছেন।

আমরা এমন কথা বলি না যে, কোন গ্রন্থ-উল্লিখিত অবিকল বর্ণনা নকল না করিলে চিত্র হইবে না। চিত্রকর গ্রন্থে অবর্ণিত অবস্থা-বিশেষ কল্পনা করিয়া নিজ প্রতিভার নিদর্শন দেখাইতে পারেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু যখন চিত্রকর কোনও বিশেষ ঘটনার বা কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থলের উল্লেখ করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তখন তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ হয়। সেই হেতু উপরোক্ত চিত্রগুলি দোষযুক্ত হইয়াছে।

আরও একটা কথা। কাল্পনিক অবস্থা চিত্রিত করিলেও তাহা সম্ভবপর হওয়া দরকার। দশরথ বা দুষ্মন্তের হাফ্‌প্যাণ্ট বা চাপকান আঁকিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক চিত্রে এ ত্রুটি অমার্জ্জনীয়। 'বুদ্ধের বৈরাগ্য' নামে একখানি চিত্র ১৩২০ সালের চৈত্রের 'মানসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে পর্ব্বতশিখরের উপর বুদ্ধ ও সারথি দণ্ডায়মান। এই চিত্র যদি সারথির নিকট রত্নালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া বুদ্ধের

প্রস্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার আলেখ্য হয়, তাহা হইলে কোন কিংবদন্তী বা ইতিহাস-বর্ণিত অবস্থার সহিত ইহার মিল হয় না। দক্ষ শিল্পীর হাতে অঙ্কিত হইলে সাধারণ পথে অবস্থান কল্পিত হইলেও পর্ব্বতস্থলী অপেক্ষা কিছু কম হৃদয়গ্রাহী হইত না। সারথি যখন নিকটে, তখন অশ্ব বা রথ পরিত্যাগ করিয়াই বুদ্ধ আসিয়াছেন। পর্ব্বতে তাহার সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধের জন্ম-স্থান ও প্রথম জীবনের যে ইতিহাস আমরা পাইয়াছি তাহাতে পর্ব্বত-শৃঙ্গারোহণ কোথাও নাই। কাল্পনিক অবস্থা চিত্রিত করিলে যদি চিত্রের কোনও নূতন সৌন্দর্য্য বিকাশ পায় তাহা হইলে সে অবস্থা আমরা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলেও একটা সম্ভব-অসম্ভবের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 'চৈতক'-পৃষ্ঠে প্রতাপসিংহের সমুদ্র-সন্তরণ ত আর চিত্রিত হইতে পারে না।

সুতরাং, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চিত্রকরগণের কল্পনার গতি সীমাবদ্ধ। বিশেষ যুগের গৃহাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিশেষ স্থান প্রভৃতির মধ্যেই তাঁহাদিগকে কল্পনার বিকাশ দেখাইতে হইবে। অবিরাম কল্পনার প্রসার হইতেই পারে না। আমরা দুই-একটিমাত্র উদাহরণ দিলাম বটে, কিন্তু যে-কোনও পাঠক আধুনিক ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চিত্রগুলি দেখিলেই এই হিসাবে তাহাদের বহু দোষ ও অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইবেন।

এই দোষ দূর করিতে হইলে প্রথমে আমাদেরই সতর্ক হইতে হইবে। ছবি রং-চংয়ে হইলেই বাহবা দিলে চলিবে না, কলাবিদ্যার দিক হইতে তাহার সমালোচনা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, সেরূপ উপযুক্ত সমালোচক বাঙ্গলায় অল্পই আছেন, যাঁহারা আছেন তাঁহারা এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আমরা এই প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিলাম তাহা কলাবিদ্যার দিক দিয়া নহে। যে-সকল দোষ-ত্রুটি, কলা-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকেও সহজে ধরিতে পারেন, সেইগুলি মাত্র দেখাইলাম। বড়ই আক্ষেপের কথা, এই ত্রুটিগুলি পর্য্যন্ত আধুনিক চিত্রকরগণের চক্ষে পড়ে না। সাধারণের কঠোর সমালোচনা ব্যতীত এ দোষ দূর হইবার অন্য উপায় নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

লেখার কথা

এদেশে একদল নূতন লিখিয়ে উঠিয়াছেন, যাঁরা লেখাকে আর্ট বলিয়া মানেন না, বা মানিতে চান না।

এঁরা যে সুধুই আর্টের সঙ্গে লেখার সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন, তা নয়;—আরও বেশীদূর আগাইয়া গিয়াছেন। অনেক লেখক আছেন, যাঁরা নিজেদের যুক্তির ভিতরে ফাঁক দেখিলে, সেই ফাঁক ভরাট করিবার জন্য গুটিকত বড় বড় লিখিয়ের নাম ও মত বসাইয়া দেন। তাঁদের নামের

জোরেই অনেক সময়ে এঁরা তরিয়া যান। এই নূতন দলের লেখকরাও ঠিক তাই করিতেছেন। কিছুদিন হইল, এ-দলের এক লেখক মত জাহির করিয়াছিলেন, টলষ্টয় ও ডোষ্টোএভ্স্কি প্রমুখ রুশ-লেখকেরা নাকি ভাষাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলই ভাব লইয়া কারবার করিতেন! ভাষাকে ছাঁটিয়া ভাবের আভাস দেওয়া কেমন? না, শূন্যে ক্ষেত বানাইয়া তাতে ফসলের বাগান করা!

আর, টলষ্টয় প্রভৃতি লেখকের যে ভাষার দিকে দৃষ্টি ছিল না, তার প্রমাণ কি? তাঁদের নিজেদের লেখায় এর কোন প্রমাণ নাই। অনুবাদ পড়িয়াই যতটুকু বুঝিয়াছি, তাতে বেশ জানা যায়, টলষ্টয় প্রমুখ রুশ-লেখকদের ভাষায় যাচ্ছেতাই ভঙ্গী, বেসুরো ঝঙ্কার ও বেতালা ছন্দের অত্যন্ত অভাব।

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—"সাহিত্যে এখন রচনাকৌশল, বাক্যবিন্যাস, অলঙ্কারের চরম হইয়াছে। সাহিত্যে কেন রূপের সমাদর থাকিবে? সাহিত্যে এখন ভাবের আদর বাড়াইতে হইবে।"

জগতের কোন সাহিত্যে কেহই কোনদিন জোরগলায় এ-কথা বলিতে পারিবেন না যে,—"সাহিত্যে এখন রচনা-কৌশল, বাক্যবিন্যাস, অলঙ্কারের চরম হইয়াছে।" কারণ, যার ভবিষ্যৎ আছে তার চরম কোথায়? যে সাহিত্য এ-কথা বলিবে, নিশ্চয় বুঝিব, তার মরণ আসন্ন। কেননা, অভিধানে লেখে চরম কথার অর্থ, অন্তিমকাল। সাহিত্য জিনিষটা যেমন কতকগুলা চাকচিক্যময় বাক্যের সমষ্টি নয়, তেমনি সেটা সুধু ভাবের ধোঁয়াও নয়। রচনা-কৌশল, অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা গঠিত ও সজ্জিত সাহিত্যের দেহটাকে চিতার আগুনে পোড়াইয়া, তার উচ্ছৃঙ্খল প্রেতের উদ্দাম নৃত্য-শব্দে কি সাহিত্য মুখরিত করিতে হইবে? ভাষার 'রচনা-কৌশল' কিম্বা 'অলঙ্কার' ত একটা খাপছাড়া জিনিষ নহে—ভাষার ভার-বৃদ্ধি করিবার জন্য ত তাদের সৃষ্টি নয়—ভাবকে প্রস্ফুটিত করাই তাদের কাজ। ভাব যেখানে গভীর বা গম্ভীর, তরল বা সরল, সেখানে তার উপযোগী যে প্রকাশ-নৈপুণ্য তাহাই রচনা-কৌশল। অবশ্য, অলঙ্কার প্রভৃতির যে অপব্যবহার হয় না, তাহা নহে। কিন্তু তার জন্য অলঙ্কারের দোষ নাই—দোষ অপব্যবহারের।

এটাত জানা কথা যে, একই ভাব যুগে যুগে নানারূপ ধরিয়া দেখা দিতেছে। নব নব রূপে সে মানুষের মন ভুলাইতেছে। তাইত সাহিত্যে এত বৈচিত্র, এত নিত্য-নূতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নব নব রূপ, নব নব রসের সৃষ্টি করে বলিয়াইত সাহিত্য এত রসালো। সেইজন্য দেখা যায়, যুগে যুগে সাহিত্যের 'রচনা-কৌশল' নূতনতর, 'বাক্য-বিন্যাস' নূতনতর, 'অলঙ্কার' নূতনতর। সাহিত্যের এ ধারা নদীর ধারার মত চিরদিনই নূতন জলের যোগান্ পায়; নূতন জল যেদিন থেকে বন্ধ হয়, নদীর ধারাও সেদিন থেকেই রুদ্ধ হইয়া যায়। "রচনা-কৌশল, বাক্যবিন্যাস অলঙ্কারে" যেদিন আর নবীনতা থাকিবে না—এক ধরা-বাঁধা

পুরানো রীতিই যেদিন হইতে তাহাদের ভিতরে মাথা চাগাইয়া থাকিবে, বদ্ধ নদীর মত সাহিত্যও সেই দিন হইতে শুকাইয়া যাইতে সুরু করিবে। এর প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যেই দেখুন না কেন,—হাতে পাঁজী মঙ্গলবার!

"সাহিত্যে কেন রূপের সমাদর থাকিবে?" এ প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয়, আমাদের গ্রাজুয়েট্ লেখকদের মাথায় একজামিনে পাশ হইবার বুদ্ধি যতটা বেশী, সহজ-বুদ্ধির পরিমাণ ঠিক ততটাই অল্প! সাহিত্য যে জীবনের অনুচর,—জীবন আগে-আগে যে পথে চলে, তার পাছে-পাছে সাহিত্যও চলে সেই পথেই। সুতরাং জীবনে যা দেখি, সাহিত্যেও তা দেখিব না কেন? যার রূপ নাই তার আকর্ষণ কোথায়? রূপ আমাদের মনকে টানে, সেই টানে আমরা গুণ বুঝিবার সুবিধা পাই। নির্গুণ রূপ ভাল নয় বটে, কিন্তু কুরূপ গুণও অনেক-সময়ে অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে। অত কথার দরকার কি,—জগতে প্রথমশ্রেণীর ভাল লেখক ক-জন এমন জন্মিয়াছেন,—যাঁহাদের ভাষা রূপবতী নয়?

"সাহিত্যে এখন ভাবের আদর বাড়াইতে হইবে।"—বেশ কথা, আমরাও তাই বলি। ভাব যে সাহিতের সর্ব্বস্ব, কে তা না মানে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যিনি 'রচনা-কৌশল' জানেন না, 'বাক্যবিন্যাসে' অপারগ, কোন্ যাদুমন্ত্রে তিনি ভাবের বিচিত্র বিকাশ দেখাইবেন? শিশু যতদিন-না 'বাক্যবিন্যাস' করিতে শিখে, ততদিন কি সে একটা-খুব সামান্য মনের ভাবও প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে? 'বাক্যবিন্যাসে'র অভাবে শিশু যখন তার ক্ষুদ্র মনের সামান্য ভাবও প্রকাশ করিতে অক্ষম, সাহিত্য তখন কি-করিয়া অসীম প্রতিভাধরের হৃদ্‌গুপ্ত, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, ভাবের লীলাকমল বিকশিত করিয়া তুলিবে?

গানে যেমন স্বরগ্রাম-সাধনা, ছবিতে যেমন 'ড্রয়িং'-শেখা দরকার, সাহিত্যেও তেমনি রচনাকৌশল ও বাক্যবিন্যাসের প্রণালী আয়ত্ব করিতে হয়। সুতরাং, যে-সকল মূর্খ-পণ্ডিত চীৎকার করিয়া বলেন, 'আমরা লিখ্‌ছি ভাবের জন্যে; আমাদের লেখায় তোমরা ভাষা দেখো-না"—সাহিত্যসমাজে তাঁহাদের স্থান নাই, তাঁহাদের স্থান পাগলা-গারদে। কারণ সেটার মত আবোল-তাবোল বকিবার নিরাপদ জায়গা আর নাই।

লেখাকে আর্ট বলিয়া না-মানার দরুণ বাঙ্গলাসাহিত্যে আজ আস্তাকুড়ের জঞ্জাল ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এত যে ভাবের অভাব, এত যে আবোল-তাবোল বকা, এত যে পুনরুক্তি ও যথেচ্ছাচার,—এ-সকলেরই মূলীভূত কারণ হচ্ছে, লেখার কায়দা না জানা। বেশীর ভাগ লোকই এখানে সখের লেখক,—সাধনা না করিয়াই তাঁহারা সাধক হইতে চান। রচনাকৌশলের অভাবে তাঁহাদের লেখায় কোন নিজস্ব ভঙ্গী থাকে না; বাক্যবিন্যাস করিতে জানেন-না,—তাঁহাদের ভাষায় তাই সংযম, নিয়ম, শক্তি ও স্ফূর্ত্তি থাকে না; সৌন্দর্য্য-বোধ নাই,—তাঁহাদের রচনায় তাই লঘু গুরু-ভেদ, ছন্দের মাধুরী ও সুরের ঝঙ্কার

থাকে না। যাঁহাদের এ-সব জ্ঞান নাই, তাঁহারা কি-করিয়া বুঝিবেন, কোথায় কিরূপ শব্দ-সন্নিবেশ করিলে পাঠকের মনে কি-রকম ভাবের সঞ্চার হয়! মনের ভাবকে উপযুক্ত আকার দেওয়াই সাহিত্যের আসল কাজ। সব জিনিষের মত ভাবেরও একটা ক্রমবিকাশ আছে। অসঙ্গত শব্দে, পুনরুক্তিতে ও বিশৃঙ্খলতায় লেখায় কখনও ভাবের মূর্ত্তিও ফুটে না, ভাবের ক্রমবিকাশও হয় না। ভাষা খেলে ঠিক ওস্তাদের হাতে বীণার মত! তোমার অপটু অঙ্গুলিপ্রহারে বীণা সুধু এলমেল আর্ত্তনাদ করিবে, আর ওস্তাদের হাতে পড়িলে সেই বীণাই হাসিবে-হাসাইবে, কাঁদিবে-কাঁদাইবে: কারণ, তিনি জানেন যে, কখন্ কোন্-কোন্ তারে ঘা মারিলে বীণায় বাজিয়া উঠিবে আনন্দের ভৈরবী বা বিষাদের বেহাগ!

আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে এমন দু-চারজন লেখকের দেখা পাইয়াছি, যাঁহারা হয়ত ভাবিতে জানেন, কিন্তু প্রকাশ করিতে জানেন না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান কোথায় দিব, আমরা তা জানি না। কারণ, আমরা বুঝি প্রকাশ করাই হচ্ছে সাহিত্যের কাজ। এঁদের চেয়ে যাঁহাদের ভাবিবার ক্ষমতা কম, প্রকাশ-শক্তির জন্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদেরও একটা স্থান আছে। লেখার আর্ট জানা থাকার দরুণ তাঁহারা পুরানো কথাকেও নূতনতর শ্রী-ছাঁদ দিয়া, সাধারণ ভাবকেও অ-সাধারণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা যেটুকু করেন সেটুকু সাহিত্যেরই কাজ। তাঁহাদের আমরা আসন দিতে রাজি আছি, কিন্তু ঐ ভাবুকদের জন্য আমরা ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাই না। আসল কথা, ঐ শ্রেণীর লেখকদের কাছে ভাব জিনিষটা এখনো বিদ্রোহী ঘোড়ার মত। নানা পুঁথি হইতে হয়ত তাঁহারা অনেক বিচিত্র ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নিজের করিয়া লইতে পারেন নাই। ভাবের মূর্ত্তি অন্তরে সুস্পষ্ট হইল বাহিরে তার প্রকাশ তদনুরূপ হইবেই। মোট কথা এই, প্রকাশ যত সুন্দর ও শোভন হইবে, সাহিত্যে তার আদর তত বেশী। এই প্রকাশ-গুণের উপর সাহিত্যের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে;—দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সাহিত্যক্ষেত্রে যখন লিপিকুশলতা ও ভাবুকতার মুক্তবেণী যুক্ত হইয়া যায়, আসল সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় তখন। এই অপূর্ব্ব মিলনেই প্রতিভার পরিচয়,—যেমন মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। এঁদের ভিতরে এ-দুটি গুণ ঠিক সমান-সমান মিশ খাইয়াছে, তাই এঁরা আর-সকলের অগ্রগণ্য।

সত্যানুগামিতা, মৌলিকতা, পূর্ণতা ও অপক্ষপাতিতা—ভাল আর্টিষ্টের কাজে এ লক্ষণগুলি স্পষ্টাস্পষ্টি পাওয়া যায়। আমরা যা-করি-তা-করি,—কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিব না—এই হচ্ছে আর্টের প্রথম কথা।

তারপর—মৌলিকতা। যে লেখায় পরস্বের ছাপ যত কম,—সে লেখা তত ভাল। অন্যের চেয়ে আমার নিজস্ব ভঙ্গীটি হয়ত খারাপ হইতে পারে,—কিন্তু তবুও এ ভঙ্গী আমারই—এতে আমারই ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে এবং এ ভঙ্গীতে আমারই স্বাধীন হৃদয়ের প্রকাশ আছে—এ কথা ত কেউ

না-মানিতে পারিবে না! লেখকের এই আত্মপ্রকাশের দিক থেকেই তাঁর গুণাগুণের বিচার। কারণ, আত্মপ্রকাশের মধ্যেই সাহিত্যের সৃষ্টি।

পূর্ণতা :—আমার যা বলিবার আছে, তাহার একটি পরিপূর্ণ রূপ দিতে হইবে। মাঝখানের গুটিকয় ফুল ছিঁড়িয়া লইলেই, ফুলের মালার অখণ্ড রূপটি যেমন নষ্ট হইয়া যায়,—তেমনি লেখার আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যগত ধারাটি যদি কোথাও ব্যাহত হয়, তাহাহইলে সব মাটি!

অপক্ষপাতিতা :—ভাব, ভাষা, লিখন-ভঙ্গী বা কোন শব্দ-বিশেষের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক দিলে শিল্পীর শিল্পত্ব খর্ব্ব হয়। সকলেরই প্রকাশ ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে, সুসঙ্গত-ভাবে হওয়া দরকার—তাহাদের মধ্যে চেষ্টার পরিচয় জাহির হইলেই সর্ব্বনাশ। ভাল কালোয়াত বলি তাঁকেই—যিনি বাহিরে কোন আড়ম্বর না-করিয়া সহজে রসিক মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আর্ট হচ্ছে ফল্গু-ধারার মত;—তপনতাপতপ্ত বালুকারাশিকে ফল্গু যেমন ভিতরে-ভিতরে স্নিগ্ধ করে, অথচ বাহিরে আপন অস্তিত্ব জানিতে দেয় না!

লেখায় আগে দেখিতে হইবে সৌন্দর্য্য;—ভাবের শ্রী, রূপের শ্রী, সুরের শ্রী। এই সৌন্দর্য্যের প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়া সাহিত্যের মধ্যে যে-সব গাড়ল কাণ-কাটার কান-খোঁজার মত হৈ-হৈ রবে অকারণ ব্যাকরণ খুঁজিয়া মরে,—সে বেচারাদের দেখিলে রাগের চাইতে মনে দয়া হয় বেশী। যাঁরা সবে কলম ধরিয়াছেন, ভাষাকে এখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, রচনা-রীতি যাঁহাদের দুরস্ত হয় নাই,—ব্যাকরণের খুঁটিনাটি তাঁহাদেরই বেশী দরকার হইতে পারে; কারণ, অশিক্ষিতকে স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ দিলে সাহিত্যকে অসার করিয়া তোলা হয়। সাহিত্যের স্বাভাবিক ধারাটি ব্যাকরণের সাহায্যে নিয়মিত হয়। সুতরাং ব্যাকরণকে তুড়ি মারিয়া উড়ানো চলে না। ব্যাকরণ মানা ভাল—কিন্তু তার প্রতি অন্ধ-ভক্তি ভাল নয়। শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধে যেমন শ্রুতিই মাননীয়—ব্যাকরণ ও সৌন্দর্য্যের বিরোধে তেমনি সৌন্দর্য্যের বাণীকেই বড় বলিয়া মানিতে হইবে কেননা, শক্তিধরের স্বাধীনতায় একটা যে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য থাকে, ভাষায় সেইটিই হচ্ছে বড় জিনিষ। প্রতিভাবানের ভাষা পায়ে ব্যাকরণের বেড়ী পরে না—সাহিত্যে এর অগুন্তি নজির আছে। প্রতিভাবান প্রতিপদে ব্যাকরণকে অনুসরণ করেন না,—ব্যাকরণই অনেক সময় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলে। কারণ তাঁহাদের রচনা-রীতির মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য, একটা শৃঙ্খলা পাওয়া যায়, ব্যাকরণের জন্ম তাহার মধ্যেই। কতগুলি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ কথার মারপ্যাঁচ লইয়াই ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে ব্যাকরণের উদাহরণ যোগানো হয় বটে কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য আহরণ হয় কি না সন্দেহ। সেইজন্য সৌন্দর্য্যকে ঠেলিয়া ব্যাকরণকে আগাইয়া দেওয়া, অরসিকের পক্ষেই শোভা পায়।

পণ্ডিতেরা প্রকাণ্ড একটা অশুদ্ধ শব্দের 'লিষ্ট' করিয়া যখন-তখন চোখ রাঙ্গান, "খবর্দ্দার! 'ইতিপূর্ব্বে' লিখ

না, 'সৃজন' লিখ না, 'সক্ষম' লিখ না—ইত্যাদি, ইত্যাদি!" খুব ভাল লেখাতেও যদি ঐ-ধরণের কোন শব্দ পাওয়া যায়, ওঁরা অমনি নাক সিঁট্‌কাইয়া বলেন, "এঃ! যে ব্যাকরণ জানে না, তার লেখা আবার পড়্‌ব কি?"—এদিকে লেখক হয়ত জানিয়া-শুনিয়াই যে 'সৃজনে'র জায়গায় 'সর্জ্জন' লিখিয়া পড়ুয়ার মন-চম্‌কাইতে চান নাই, তাঁরা সে খবর রাখেন না। যা বেশী লোকে বোঝে, তাতে সৌন্দর্য্যবোধও শীঘ্র হয়; ব্যাকরণ-মতে বেঠিক হইলেও সে-সব শব্দকে ভাষা থেকে কেউ তাড়াইতে পারিবেন না; কারণ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ সহজবোধ্য শব্দগুলি লেখকের কলমের মুখে গায়ের জোরেই আর-সবাইকে ঠেলিয়া বাহির হয় এবং পাঠকের মনও এই বিদ্রোহীদের আদর করিয়া ডাকিয়া নেয়—এবং ইহাদের তীক্ষ্ণধারে পণ্ডিতের মত একেবারে খণ্ডিত হইয়া যায়! এই-যে অনেক পণ্ডিত "কায়া" স্থলে "কায়," "রহস্য"কে "কৌতুক" অর্থে ব্যবহার করা ভ্রম বলিয়া কেবল "গোপনীয়" অর্থে, "সম্ভ্রান্ত"কে "ভ্রান্তিযুক্ত" বা "পাগল" অর্থে, "তাচ্ছীল্য"কে উপহাসার্থে ব্যবহার না করিয়া "তৎপরতা" অর্থে চালাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু এ ব্যবস্থায় কি লেখক আর কি পাঠক—কেহই কি কান পাতিয়াছেন? বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক ব্যাকরণ-বিশারদ পণ্ডিত-লেখক আছেন; প্রায়ই দেখা যায়, তাঁদের ভাষা শুদ্ধ হইলেও ভাল নয়। সৌন্দর্য্যের উপরে ব্যাকরণকে আসন দিয়া বিধি-নিষেধের নাগপাশে ভাষাকে এঁরা এমনভাবে বাঁধিয়া ফেলেন যে, সে ভাষা না-পারে ইচ্ছামত চলিতে-ফিরিতে, না-পারে গলা-ছাড়িয়া গান গাহিতে, না-পারে আপন জীবনের স্ফূর্ত্তির পরিচয় দিতে! এ ভাষা সন্ধি-সমাসের বিধানই দেয়, রূপের নিদান দেখাইতে পারে না।

আর-এক দলের লিখিয়ে আছেন, যাঁরা ভাষা-বেচারীর বুকে চাপান শতবার-ব্যবহার-করা উপমা-বিশেষণের জগদ্দল পাথর, তার সর্ব্বাঙ্গে পরান হিন্দুস্থানী রমণীর মত রাশী-কৃত অলঙ্কার, তার উপরে দেন লম্বাচওড়া দুরূহ শব্দের ঘেরাটোপ্;—এ রকম ভাষায় শিক্ষানবিসের কাঁচাহাত জাহির হয় যতটা—ততটা আর কিছুই নহে। এমন ভাষায় লেখা যেমন সহজ, পাঠকের পক্ষে বুঝিয়া-ওঠাও তেমনি শক্ত। যিনি যত ছোট ছোট সোজা কথায় বড় বড় ভাব ফুটাইতে পারিবেন, তিনি তত উঁচুদরের শিল্পী। ভাষার সব-চেয়ে বড় গয়না যে সহজ-সরলতা—এ-কথা অনেকেই অনেকবার বলিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আর কথা না-বাড়াইলেও চলে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মাতালের মাতলামি

(প্রলাপ চিত্র)

আমি মাতাল;—রূপের মাতাল নই, রূপিয়ারও মাতাল নই;—আমি মদের মাতাল। ভক্তি-রসের অমৃত-সুধা পান করে কিম্বা কবিত্বের ফেনা খেয়ে ভাবে ভোর হয়ে আমি সূক্ষ্ম মাতলামি করিনা; আমি বাস্তব জগতের খাঁটি বস্তু পান করে নেশা জমাই। আমার নেশা হাল্‌কা হাওয়ার মতো ফুরফুর করে আকাশের গায়ে উড়ে বেড়ায় না; সে নেশা—এই যে কঠিন বস্তুময় ধরিত্রী—যাকে হাতে করে ধরা যায়, পায়ে থেঁৎলানো যায়, তারই শক্ত বুকের উপরে আমায় আছড়ে-আছড়ে ফেলে;—যেখানে বুক দিয়ে পড়ি, সে কোনো কবির কল্পনা নয়, শিল্পীর স্বপ্ন নয়;—সে মাটি, মাটি, মাটি! তাই ত মাটি আমাদের এত আদরের জিনিষ—আমাদের হৃদয়ের দেবতা! তাই ত মাটির গুণগান স্তবস্তুতি করতে আমরা যেমন পারি, আর-কেউ পারে না। কোনো-কোনো কবি ইনিয়ে-বিনিয়ে মাটির গৌরব-গাথা রচনা করেছেন বটে, কিন্তু তোমরা যাকে ঘৃণা করে বল মাটি, সে তাই হয়েছে—সে আসল মাটি নয়।

মাগো মাটি, সন্তানকে আশ্রয় দেবার জন্য তোমার মতো কে এমন দিবারাত্র বুক পেতে আছে! তুমি না থাকলে আমার মতো মাতাল শূন্যের উপর ঝপ্‌ করে পড়ে কোন্‌ শূন্যতলে তলিয়ে যেত কে বলতে পারে! তার পর, তোমার এই অধম সন্তানদের জন্য কত আয়োজনই না তুমি করেছ,—দিবারাত্র ভোজনের থালা মুখের সামনে ধরেই আছ। তোমার শ্রেষ্ঠ দান, ধান। কিন্তু কি বলব দুঃখের কথা মা, লোভী লোকগুলো সেই ধান থেকে অন্ন পাকিয়ে গোগ্রাসে গিলচে;—তারা বোধ হয় ভাবে ধান্য থেকে শুধু অন্নই হয়; মূঢ়রা জানেনা ধানের সার হচ্ছে সুরা। তাই ভাবি, মানুষের সারগ্রাহিতা কত কম! যার সুরা-জ্ঞান নেই তার সার-জ্ঞান কোথায়?

মাগো, আমরা সুরাগ্রাহী কয়েকটি মাতাল তোমার সুসন্তান—দিবরাত্র তোমার মুখ চেয়েই আছি, তুমি বিনে আমাদের গতি কৈ! কারণ তোমাকে ছেড়ে উঠলে আমরা ঠিক থাকতে পারি না। সাধে কি আকাশকে গাল পাড়ি! ঐ আকাশের সংস্পর্শে যে আমাদের মাথা ঘুরে যায়। তাই তোমায় আঁকড়ে পড়ে থাকতে এত ভালোবাসি। তোমার বুকের উপর দিবারাত্র কান-পেতে পড়ে আছি বলেই তো তোমার বুকের কথা আমরা এত জানি! ওরা কি জানে! ওঁরা হলেন আবার কবি!

তবে দাও মাগো, গ্রামে গ্রামে পথে পথে মদের ভাঁটি খুলে—অজ্ঞান মানুষগুলো মদ খেয়ে মাতাল হোক্‌, তোমার বুকে এসে পড়ুক,—তোমায় চিনুক, তোমার বুকের কথা শুনুক।

বৃথা সব তোমাদের সাহিত্য—তোমাদের

শিল্প! ওর মধ্যে সার নেই—ও একেবারে ভূয়ো জিনিষ। ও জিনিষ পচলেও মাটি হবে না। ও শুধু রঙিন ফানুসের মতো আকাশের গায়ে হাওয়ার তালে দুলে বেড়ায়। অমন রঙিন ফানুস নেশার ঝোঁকে আপনা-আপনি আমাদের মগজে কত যে গজিয়ে ওঠে কে তার খবর রাখে। তোমাদের ঐ ফুরফুরে জিনিষ নিয়ে হবে কি? ভরপুর নেশার ঝোঁকে টাউরে পড়বার সময় ওটাকে জড়িয়ে ধরে যে টাল সামলাবো সেটুকু ভরও সইবে না;—অতটুকু ভারও নেই। ছোঃ! তবে কি তোমরা বাহাদুরি করচ! রচনা কর দেখি এই মাটির মতো একটা জিনিষ—যা চিরদিন স্থির আছে এবং থাকবে—যা সহজ—যাকে বুঝতে কষ্ট হয় না—বোঝাতেও কষ্ট হয় না—যাকে দেখলেই মানুষ চিনতে পারে—সে পণ্ডিতই হোক, আর চাষাই হোক, সে ধনীই হোক, আর দরিদ্রই হোক! তবে বুঝি তোমাদের বাহাদুরি! নইলে কি ফর্‌ফর্ করচ!

তাই পায়ে ধরে বলচি ভাই—কারণ দাঁড়িয়ে উঠে হাত ধরবার শক্তি এখন নেই—কাজ এখনও ঢের বাকি রয়েছে; তোমরা যারা কিছু করতে চাও, বাঁশি বাজিয়ে, গান গেয়ে, সময় ফুঁকে দিয়ো না—তোমাদের ঐ মিহি গলার মিহি সুরে মিহি ভাষায় কিচ্ছু হবে না! দেখচ না দেশ নিদ্রিত! মিহি গলা বন্ধ কর; অনবরত চিঁহি-শব্দে দেশ থেকে নিদ্রা একেবারে দূর করে দাও। ঐ দেখ যাদের চোখে ঘুম নেই তারাও এখন হতভম্ব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। তারা দেখচে না, আহা, জননী ধরিত্রীর বুকের অনেকখানিটা এখনো খালি পড়ে আছে; মায়ের সেই তাপিত বুক শীতল করবার উপায় কর,—দাওয়াই দাও। কাজ কর। গড়িয়ে পড়।

তাই বলি, এস ভাই চাষা, এস ভাই কামার-কুমোর, এস ভাই তিলি-তাম্‌লি, তোমরা মাটির সন্তান, তোমরা কাজের লোক, এস তোমরা যে যার মদের গেলাস, তাড়ির ভাঁড় ভরপুর করে নিয়ে এস। তোমাদের হাতের ঐ চিন্‌চিনে সুধা আমার মুখে,—দেশের মুখে সিঞ্চন কর। তোমাদের ঐ বিদুরের খুদ্ নিয়ে, এস আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলে দেশের লোকের সঙ্গে এক-হয়ে মাটির উপর একবার জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি খাই!

(খানিক পরে)

মদ খাই বলে তোমরা আমার নিন্দা কর। এতে তোমাদের নিজেদেরই হীনতা প্রকাশ করচ। জানোনা, কথায় বলে—চাষা জানে কি মদের স্বাদ! মদের মর্ম্ম তোমরা কি বুঝবে? কিন্তু তোমাদের কথা দিয়েই তোমাদের বুঝিয়ে দেব যে মদ জিনিষটা জগতে অনুপম। তোমরা বল জগতের বড় আদর্শ হচ্ছে এই যে, উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর হোক! আচ্ছা বেশ, কিন্তু তা কি তোমরা কেউ করতে পেরেছ? কিন্তু দেখ আমরা মাতালরা সেই অসাধ্য সাধন করেছি,—মদের গ্লাসে আমাদের জাতিবিচার নেই, উচ্চনীচ ভেদাভেদ নেই—সব একাকার। যে ব্যাটা মাতালের এখনও নিষ্ঠেটুকু আছে, জানবে সে এখনও ঘোর মাতাল হতে

পারেনি—তার সাধনা চলছে। এক মাতাল ছাড়া তোমাদের ঐ মহান্ আদর্শ কেউ গ্রহণ করতে পারেনি! মদ খাও তোমরাও পারবে। তারপর তোমরা মৌখিক বিনয় দেখিয়ে বল—আমি ধূলির অধম দাসানুদাস। কিন্তু কাজে তা দেখাতে পার? আমরা তা পেরেছি! ধূলোয় যখন পড়ে থাকি—তখন ধূলোই বা কে আর আমিই বা কে! আর দাসের দাস যে বলচ সে কথা যদি প্রমাণ করবার দরকার থাকে তো স্বাক্ষী-সাবুদ ডেকে আদালতে তা প্রমাণ করতে রাজি আছি। দাসের হুকুমেই তো আমি চলি, বলি; সেই তো আমার মান, আমার গর্ব্ব! ব্যস আর কি চাও?

তোমাদের কতবার বলব, মদ খাচ্চ না বলেই তোমাদের দ্বারা আসল সাহিত্য গড়ে উঠছে না। মদ খাচ্ছনা বলেই দেশের সঙ্গে—দেশের মানুষের সঙ্গে আসল পরিচয় হচ্ছেনা। সেইজন্য তোমাদের ভাবে উচ্চনীচ-জ্ঞান থেকে যাচ্ছে, তোমাদের ভাষায় শ্লীলঅশ্লীল বিচার রয়েছে, তোমাদের ব্যবহারে স্থানবিশেষ এবং মানুষ-বিশেষের প্রতি শুচিবাই রয়েছে, 'বস্তু'র প্রতি তোমাদের অবহেলা—কাজেই বস্তুজ্ঞান নেই—সেইজন্য সাহিত্যও বাস্তবিক হচ্ছে না। সব-চেয়ে বড় দোষ তোমাদের ঐ ভদ্রয়ানা—যাকে বল চক্ষুলজ্জা! এই চক্ষুলজ্জায় তোমাদের চোখ ঢাকা থাকে বলে দেশের অনেক জিনিষের সঙ্গে তোমাদের চাক্ষুষ পরিচয় হয় না। মদ খাও সব দোষ কেটে যাবে।—মন তোমাদের স্বাধীন হবে, তাহ'লে যা খুসি চিন্তা করতে বাধবে না; গতি অবাধ হবে—তাহ'লে অস্থান-কুস্থান বিচার থাকবে না; ভাষার স্ফূর্ত্তি হবে—নেশার ঝোঁকে তাহ'লে মুখে যখন যা আসে তাই বলতে বা লিখতে আটকাবে না। তবেই তোমাদের দ্বারা আসল সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারবে। নইলে মিছে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করে আমাদের নেশা চটিয়ে দিতে এস না। দোস্‌রা পথ দেখ।

(আরো পরে)

ফুঃ! ফুঃ!—এই ফুঁয়ে তোমাদের রচা সাহিত্য, শিল্প উড়িয়ে দিলুম,—দেখলে ত? তোমাদের লেখায় ভার নেই, সে ভারী নয়,—কাজেই সে ফুঁয়ের মুখে উড়ে যায়। ঐ শোলার চেয়ে হাল্‌কা জিনিষের জন্যে তোমরা সারা জীবনটা প্রাণপাত করলে—আর সেটা আমার একমিনিটের এক ফুঁয়ে উড়ে গেল;—দেখলে ত? কিছু করতে পারলে? তোমাদের কবিশেখরই আসুন, আর কবিসম্রাটই আসুন, কিম্বা শিল্পাচার্য্যই আসুন এই ফুৎকারের মুখে কেউ টিঁকবে না—পষ্ট কথা বলে দিলুম। ফুঃ! ফুঃ! ফু-উ-উঃ! যাক্, সব গেল!

তোমাদের ঐ সাহিত্য আমি ত বুঝি, শুধু হাওয়ার ঢেউ—গায়ে-মুখে লাগে কিন্তু হাতে ধরে পাই না। যা হাতে না পাই তা কি আবার পাওয়া? ও কেবল উড়ে-উড়েই বেড়ায়, মাটিতে চেপে বসে না, তাই নাগালও পাই না। জ্ঞান বিজ্ঞানের শেষ কথা হচ্ছে এই যে, সবেরই পরিণতি হচ্ছে মাটি। তাই বলি তোমাদের ঐ সাহিত্যকে মাটি করবার উপায় এখন-থেকে কর। তা করছনা বলেই ওর পরিণতি হচ্ছে না।

শুনচি বটে তোমাদের ঐ হাওয়া সমুদ্র পেরিয়ে দেশ-বিদেশে ঝড় তুলেছে—কিন্তু

—কিন্তু—এই ফুঃ, ফুঃ! লোকে বলচে—ঐ ঝড় সেখান-থেকে রাশীকৃত সোনার মোহর উড়িয়ে এনেছে। হুঁ! সোনার মোহর ফুঁ দিয়ে নড়ানো যায় না বটে! কারণ সেটা বস্তু! (মাথা চুলকাইয়া) আর অত ভাবনা ভাবতে পারি-নে! কিন্তু বাবা বলে রাখচি ও সব ফক্কিকারী!

তাই বলি তোরা মানুষ হ—মানুষ হ! প্রজাপতির রূপ ধরে সূর্য্যকিরণে ডানা মেলে—বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে উড়ে-বেড়িয়ে হবে কি! কারণ প্রজাপতি মধু খেতে পারে কিন্তু মদ খায় না। মদ খেতে গেলে মানুষ হওয়া চাই। তাই বলি তোরা মানুষ হ! মানুষ হ!—এবং মদ খেয়ে দেশের মাটির উপর পড়ে-থেকে দেশের সঙ্গে পরিচয় করে নে;—দেশের কথা শুনে নে! আর ঐ লাল-নীল পরী-কাহিনী রচনা করিস্‌নে—যাকে চর্ম্ম-চক্ষে কেউ কখনো দেখলে না তার জন্যে এত মাথা-ব্যথা কেন?—তার চেয়ে আমার মতো মদের মুখে প্রলাপ চিত্রের চালচিত্তির তৈরি কর্—আর কেউ বাহবা না দেয় আমরা মাতালের দল নিশ্চয় বাহবা দেব।......

কি বলতে আরম্ভ করেছিলুম—কথার মুখে সব ঘুলিয়ে গেল। হাঁ হাঁ, আমি মাতাল! মাতালের মাতলামির একটা কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছিলাম বটে। কিন্তু গোড়া-থেকে বলে রাখচি—এর মধ্যে কল্পনা নেই—এ একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা!

অমাবস্যার রাত্রি! ঘুটঘুটে অন্ধকার! মাতাল পথে...রাস্তায় গ্যাস কিন্তু তবু অন্ধকার...চোখের মধ্যে তখন যে গ্যাস জ্বলছে তার কাছে রাস্তার গ্যাস লাগে কোথায়!

অনেক রাত্রি। মদের দোকান বন্ধ। হায় ইংরেজ, এ তোমার কি আইন! মাতালের প্রতি তোমার এ নিষ্ঠুরাচরণ কেন? কি অপরাধে তারা অপরাধী!......

মাতাল পথে পথে ঘুরতে লাগল... তখন তার নেশা জমাট কিন্তু তবু পিপাসা, —বড় পিপাসা—মদের পিপাসা! কিন্তু কোথায় মদ? মাতাল মনের দুঃখে গান ধরলে—

"অভাগা যেথানে যায়
সাগর শুকায়ে যায়!"

মাতাল কেঁদে ফেল্লে—হায় মদের সাগর শুকিয়ে গেল! তবে হবে কি? তবে উপায় কি? এ যে বড় পিপাসা! বুক যে ফেটে গেল।—কলজে ছিঁড়ে গেল।......

কি করুণ দৃশ্য! পথে পথে মদের আশায় ছুটে বেড়ানো—কিন্তু হায় কোথাও মদ নেই...শুঁড়ির-পো তখন নাক ডাকিয়ে নিদ্রা!...অদৃষ্টদেবীর এ কি ক্রূর পরিহাস! কে বলে অদৃষ্ট অদৃষ্ট! ঐ দেখ অদৃষ্ট ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নিয়ে চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে! ভ্রান্ত মানব এই রাত্রে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত তাই তাকে দেখতে পাচ্চে না। মাতালের মতো এই মাঝ-রাত্রে পথে এসে দাঁড়াক দেখি, তাকে দেখতে পাবে।......

আর সহে না...মাতাল অবসন্ন...সে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ল...অমাবস্যার চাঁদের মতো কালাচাঁদ পাহারাওয়ালা (তখন শীতকাল—পাহারাওয়ালার সর্ব্বাঙ্গ কালো

লম্বা কোটে মোড়া) হাজির!…তুই রুলের গুঁতো!…বাবারে! আবার অদৃষ্টের পরিহাস! পাহারাওলা মাতাল হয়ে মাতাল তো পাহারাওলা হতে পারত আর ঐ রুলের গুঁতো ত মাতালের পিঠে না পড়ে পাহারাওলার পিঠে পড়তে পারত। তা কেন হল না? কে বলব কেন হল না!

সংসারে মাতাল কে নয়? কেউ ধনের মাতাল, কেউ মানের মাতাল, কেউ জ্ঞানের মাতাল, কেউ বিজ্ঞানের মাতাল। এই রাত্রে সহর-ভরা তো সারি-সারি মাতাল শুয়ে রয়েছে, তবে মদের মাতালের উপর এত অত্যাচার কেন বাবা! পাহারাওলা মূর্খ। সে অত-শত বোঝে না, সে গুঁতোর পর গুঁতো দিতে লাগল। দুনিয়ার সবাই কাপুরুষ! এই অত্যাচারের প্রতীকারের জন্য কারুর ঘুম ভাঙল না…কেউ সেই নিশীথ রাত্রে উঠে বসে একটা কবিতা লিখলে না, কেউ প্রবন্ধ রচনা করলে না—কেউ গান বাঁধলে না! তবে দেশের সাহিত্য সৃষ্টি হবে কেমন করে? দেশের এই কান্না যদি তাতে না রইল তবে বৃথা সে গান—বৃথা সে গল্প!

গুঁতোর পর গুঁতো চলতে লাগল। তবে—জয় গুঁতোরই জয়!

তারপর? তারপর তারপর করে কতদূর যাব বাপু। এদিকে যে নেশা ছুটে আসচে—গলা শুকিয়ে আসছে। তার উপায় করচ কি?

দেখবে আমার এই গল্পটি কেমন dramatic করে শেষ করব? আমি বুঝতে পারছি তোমরা অধীর হয়ে উঠছ ঐ মাতালটি কে তাই জানবার জন্যে। পাঠকের মন-বুঝে গল্প বলাই ত বাহাদুরি। তোমরা ভাবছ, আহা কে ঐ ভদ্রসন্তান মাঝ-রাত্রে রাস্তায় পড়ে—রুলের গুঁতোয় জর্জ্জরিত। শুনবে সে কে? সে আমি—সে আমি।

শ্রীমাতাল।

পলায়নপর ও পলায়নের পর

বঙ্কিম লিখিয়াছেন, সপ্তদশ অশ্বারোহী যে বঙ্গজয় করিয়াছিল মুসলমান-ঐতিহাসিকের এ মিথ্যা কথা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। বোধ হয় তাহার পর হইতে কোন আধুনিক বাঙ্গালীই এ কথা মানিতে আর প্রস্তুত নয়।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দ্বারা বঙ্গদেশ বলে জিত না হইয়া, কিরূপে ছলে গৃহীত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল বঙ্কিম তাঁহার অমর লেখনীতে তাহা চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। চিত্রশেষে বলিয়াছেন:—

"ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল। •

ষষ্টিবৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার

কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তাস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান্ হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।"

বঙ্কিম যেদিন ইহা বলিয়াছিলেন সে দিনকার পক্ষে এ কথাটা ভারি নূতন কথা ও সাহসিক কথা ছিল।

বহুশতাব্দী-যাবৎ মুসলমানকর্ত্তাদের রচিত কথায় যে বিষয়ে সংস্কার মজ্জাগত হইয়া যায়, তার উপর মেকলে-আদি নূতন কর্ত্তাদের সমান কৃপাবারি বর্ষণে যাহা উৎপাটিত না হইয়া, বরঞ্চ আরও প্রবলভাবে বদ্ধমূল জাতীয় ধারণা হইয়া গিয়াছিল, সেই আত্মগ্লানির পাহাড়ের বিরুদ্ধে প্রথম সংশয়-গোলাক্ষেপণ বঙ্কিমেরই কীর্ত্তি।

কিন্তু তখনকার বাঙ্গালীর জাতীয় রক্ত এই আত্ম-অপমান বিষে এতই ভরা ছিল যে মণ মণ বিষ পাম্প্ করিয়া উঠাইয়া ফেলিলেও এক-আধ-ছটাক যে বাকী রহিয়া গিয়াছিল তাহা "মৃণালিনী"-লেখক বঙ্কিমের নিজেরই দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। তাই তিনি "মৃণালিনী"তে মানিয়াছেন—

"মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।"

"আনন্দমঠে"র সময় তিনি এই বিষের জেরটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তাই বন্দে মাতরং-এ সন্ন্যাসীরা গাহিতেছে—"কে বলে মা তুমি অবলে!" এবং 'সীতারাম'-প্রভৃতির চরিত্রচিত্র-দ্বারা ঐতিহাসিক গোটা বীর মানুষগুলাকে লোকের সাম্‌নে ফেলিয়া 'বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা'—এই আদিম ভ্রান্তির সংশোধন করিয়াছেন।

"মৃণালিনী"তে বঙ্কিম সপ্তদশ অশ্বারোহীর তথা-কথিত বঙ্গবিজয়গর্ব্বের অলীকতা নিপুণ তুলিতে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের শেষ-হিন্দু-রাজা লক্ষ্মণ সেনের উপর অঙ্গুলিস্পর্শ করেন নাই। তাঁহাকে মুসলমান ঐতিহাসিক যেমনটি আঁকিয়া গিয়াছে তেমনিটিই রাখিয়া দিয়াছেন। এক-পুরুষের সমাজ-সংস্কারকের মত তিনি কতকগুলি সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, বাকীগুলি পরবর্ত্তী পুরুষের জন্য রহিয়া গিয়াছে।

হারজিৎ রাজনিয়তি। হারিলেই রাজা কাপুরুষ হয় না, এবং জিতিলেই জেতা বীরপুরুষ হয় না। যে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মিত্রভাবে ষোড়শ অনুচরসহ প্রবেশ করিয়া নিঃশঙ্ক, নিরস্ত্র, সৈন্যসজ্জাশূন্য নগরীকে ছলে অধিকার করিয়া আপনাকে বীর বলিয়া ইতিহাসে লিখাইয়া গিয়াছে, নিজগৌরব বাড়াইবার জন্য লক্ষ্মণসেনকে কাপুরুষতার গাঢ়তম বর্ণে চিত্রিত করা তাহারই যে কাজ নয় তাহা কে বলিতে পারে?

বৃদ্ধ বা বিলাসী হইলেও যুদ্ধের আহ্বানে বীরের ধমনীতে রক্ত নাচিয়া উঠে। আমি একজন শতপত্নী-পরিবৃত বিলাসমগ্ন রাজপুত রাজাকে দেখিয়াছি, সম্বাদপত্রে য়ুরোপের যুদ্ধ-ঘোষণা বার্ত্তা পড়িবামাত্র দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরে যেন এক নূতন বৈদ্যুতী ভরিয়া গেল। যিনি একমিনিট পূর্ব্বে প্রেয়সীরাণীর অঞ্চল ছাড়িয়া হিতৈষী মিত্রগণের পরামর্শে

রাজকার্য্য-উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষেরই এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ পাত্রমিত্রগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"চল য়ুরোপ যাই, সমরানলে ঝাঁপাই।" যে সকল পাত্রমিত্রও মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে বিলাস ও আরামেচ্ছায় আড়ষ্ট হইয়াছিল—নিমেষে খাড়া হইয়া কহিল—"ঔর কেয়া? চলো, চলো চলে!" যেন তাহাদের কটিতে বদ্ধকোষে তরবারি ঝন্‌ঝনিয়া উঠিল। আমি ইন্দ্রজালের মত এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

কেহ খিড়কি দ্বার দিয়া পালাইলেও অবশ্যম্ভাবিরূপে যোদ্ধৃভাবশূন্য না হইলেও হইতে পারে। কাশ্মীরের ইতিহাসে পাওয়া যায়, কতশত রাজা কতশতবার অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুসম্পাতে খিড়কি দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া আবার সদলবলে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্য পুনর্লাভ করিয়াছেন।

আজ য়ুরোপের যুদ্ধেও তাহাই হইতেছে। কখনও বা কোনপক্ষ দুর্য্যোগ দেখিয়া পিছু হটিতেছে, আবার সেই পক্ষই সুযোগ বুঝিয়া আগে কদম বাড়াইতেছে।

সেনবংশের গৌররবি বঙ্গাকাশে আর উদীয়মান্ হয় নাই, সেইজন্য পলায়নপর শেষ-সেনরাজার নামে শত্রুপক্ষ যে কিছু কলঙ্ক লাগাইয়াছে তাহাই টিঁকিয়া গিয়াছে ও বিশ্বাসসম্মত হইয়াছে। কিন্তু দেখা চাই ষষ্টিবৎসর পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য ছাড়া আর-কোন সমসাময়িক সাক্ষ্য লক্ষ্মণসেনের বিরুদ্ধে পাওয়া যায় কি না।

১৩১৭ সনের চৈত্র মাসের ভারতীতে লক্ষ্মণসেন শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক দেখাইতেছেন—

"লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব তিরভুক্তি বা ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। * * * তথায় লক্ষ্মণসেনের দানশীলতা সম্বন্ধে এক মনোহর শ্লোক প্রচলিত আছে। চক্রবাক আপন বধূকে কহিতেছে, "প্রিয়ে, আর আমাদিগকে বিরহ যাতনায় অধীর হইতে হইবে না; কারণ আর অল্পদিবস গত হইলেই সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির বিনাশ হইয়া যাইবে"। চক্রবাকী কহিল "তাহাও কি সম্ভব? আমাদিগের কি এরূপ সুখের দিন আসিবে?" চক্রবাক কহিল "আসিবে বৈ কি! কনকগিরি অস্তাচলই যে লোপ পাইতেছে, তাহা হইলে সূর্য্যদেব আর কি করিয়া অস্তমিত হইবেন?" চক্রবাকী ঔৎসুক্যের সহিত কহিল "সে কেমন, সে কেমন?" চক্রবাক উত্তর করিল "বীর লক্ষ্মণসেন যেরূপ উন্মুক্ত হস্তে দানরত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ক্রমে ক্রমে সমুদায় কনকগিরিই নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলেন। যথা

কতিপয় দিবসৈ র্ক্ষয়ং প্রয়ায়াৎ
কনকগিরিঃ কৃত বাসরাবসানঃ।
ইতিমুদ মুপযাতি চক্রবাকী
বিতরতি লক্ষ্মণসেন দেব বীরে॥

ত্রিহুতে লক্ষ্মণসেনের অব্দ অধুনাও প্রচলিত। উহাকে সংক্ষেপে লসং বলে। পণ্ডিতগণ এখনও এই অব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

বঙ্গের বাহিরে লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে এতাদৃশ কিম্বদন্তীর অনুসরণ করিতে করিতে আরও কিছু সম্বাদ পাওয়া যাইতে পারে যাহাতে তাঁহার কাপুরুষতার কলঙ্ক অপনয়ন হইতে পারে।

সেনরাজকলঙ্ক লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালীর কলঙ্কস্বরূপ ইতিহাসে খোদিত হইয়াছে। সে কলঙ্কমূর্ত্তি আমরা তিষ্ঠিতে দিব কিনা তাহা এখন আমাদের বিচার্য্য।

অতীতে যে কার্য্য কৃত হইয়াছে, শত্রু-হস্তে যে দাগ লাগান গিয়াছে তাহাকে অকৃত করিতে হইবে, সে দাগ মুছিয়া সাফ করিতে হইবে, এই এক কথা। আর দ্বিতীয় কথা এই যে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমরা নিজ হস্তে এমন আর কিছু করিব না যাতে সে দাগ না মুছিয়া তার উপর আরও কালী লেপা হয়।

পঞ্চনদের তীর হইতে মধ্যে মধ্যে বঙ্গমাতার ক্রোড়ে আকস্মিক প্রত্যাবৃতার চোখে একবার একখানা বিসদৃশ চিত্র ঠেকিয়া গেল। দেখি ঘরে ঘরে সেই চিত্র। প্রত্যেক চিত্রকলাপ্রেমিক বা প্রেমিককল্প ফ্যাশনেবল গৃহস্থের ড্রইংরুমে সেই চিত্র—অন্যান্য চিত্রসমূহের সঙ্গে বাঁধান, নির্লজ্জভাবে গায়ে গায় লাগান। তাহা পূজনীয় অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জনৈক শিষ্যের অঙ্কিতই পলায়নপর, ভীরু, কুব্জপৃষ্ঠ, বৃদ্ধ, বিবস্ত্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের মিন্‌হাজ-বর্ণিত কল্পমূর্ত্তি।

দুদিন গেলে সে ছবির দিকে আমি আর তাকাইতে পারিতাম না। প্রতিগৃহে পদার্পণ করিয়া সুসজ্জিত দেওয়ালের দিকে চাহিতে ভয় করিত পাছে সেই বিভীষিকা চোখে পড়ে।

বাঙ্গলার নূতন আর্টসোসাইটির প্রতি সানুনয় প্রার্থনা, এই জাতীয়কলঙ্ক চিরস্থায়ী-কারী, জাতিহৃদয়বিদ্ধকারী এ চিত্র তাঁহারা চিত্রপট হইতে মুছিয়া ফেলুন। বাঙ্গালীর মানসপটে এ চিত্রের কল্পনা স্থান পাইবার যোগ্য নহে, বাঙ্গালীর গৃহভূষণ ইহা নহে, বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের অমর তুলিকা এমন আত্ম-অপমানজনক কলুষিত কাজে নিযুক্ত হইবার দুর্ভাগ্য কেন স্বীকার করিয়াছে?

পলায়নপর রাজার বা রাজবংশের উত্তরচরিত তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির পরিচায়ক।

বিশ্বাসহন্তা বখ্‌তিয়ার খিলিজির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু পলায়নের পর তিনি বা তাঁর বংশধরেরা কি করিলেন তাহা অনুসন্ধেয়।

পঞ্জাব-ইতিহাসের পৃষ্ঠার মধ্যে সেই সন্ধান লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালীর হৃত-সম্মান উদ্ধারকারী সেই পৃষ্ঠাগুলি আহরণ করিয়া আগামীবারে 'ভারতী'র পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব।

শ্রীসরলা দেবী।

আর্টের আদর্শ

প্রতিমূর্ত্তি-সম্বন্ধে রোঁদার অভিমত আগেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই। তিনি বলিতেছেন :—"মক্কেলমাত্রই যে সত্যভীত, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত চাহিলে পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক বড়লোকের নাম করা যায়। তাঁহারা, আপনাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইলেই তুষ্ট হইতেন এবং শিল্পীদের কঠোর সরলতা ভালবাসিতেন। সেকালের অনেক চিত্রকর, রাজা-মহারাজার ছবি আঁকিবার সময়ে কুশ্রী চেহারাকে কখনও সুশ্রী করিয়া তুলিতেন না; নিজেদের স্বরূপ দেখিয়া সেকালের রাজারাও কখনও শিল্পীদের উপরে বিরূপ হইতেন না।

একালের লোকেরাই সত্যকে ভয় করে ও মিথ্যাকে ভালবাসে।

সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, মূর্ত্তি গড়িতে বা আঁকিতে গেলে মক্কেলের সঙ্গে শিল্পীদের কি-রকম যুঝিতে হয়! কিন্তু তা-বলিয়া হতাশ হইবারও কোন হেতু দেখিনা,—শিল্পীরা নিজেদের সত্যপথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন কেন? এতে যদি বে-আক্কেল মক্কেলেরা খাপ্পা হইয়া ছবি ফিরাইয়া দেন,—তথাস্তু; কারণ, ছবি যখন বাস্তবিকই ভাল হয়, তখনই তাহা মক্কেলদের মনের-মত হইতে পারে না!"

পল বলিলেন, "আচার্য্য! আপনার ব্যবসায়ের যে-সব অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিলাম, তার মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ, যে-সব মক্কেল জড়ভরতের মত, যে-সব নির্ব্বোধের মুখে ভাল-মন্দ কোনরকম ভাবের লেশমাত্র নাই, তাদের লইয়া আপনাদের ত আচ্ছা-মুস্কিলে পড়িতে হয়?"

রোঁদা হাসিয়া বলিলেন, "এতে আর মুস্কিলের কি আছে?—'প্রকৃতি সর্ব্বদাই সুন্দরী'—তুমি কি আমার এই মূলমন্ত্রটি ভুলিয়া গেলে? প্রকৃতি যা দেখান, আমরা তাই বুঝিতে চেষ্টা করি মাত্র। তুমি ভাবহীন মুখের কথা বলিতেছ ত? কিন্তু শিল্পী যে এমনধারা মুখ কস্মিন্‌কালেও দেখিতে পান না! তাঁর কাছে সকল মুখেরই সমান আদর। নীরস মুখ, মূর্খের হামবড়াই ভাব, চিত্রার্পিত হইলে একটা দেখিবার-মত জিনিষ হইয়া উঠে। এমন-কি, যে মুখ একেবারে অনর্থক, তাহাও প্রাণের লীলায় সুমধুর,—অতএব, শ্রেষ্ঠশিল্পের মধ্যে গণনীয়।"

কয়েকদিন পরের কথা। শিল্পশালায় বসিয়া পল, রোঁদার গড়া কতগুলি সুগঠিত মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন।

সেখানে ভিক্টর হুগোর ধ্যানমগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তিটিও রক্ষিত ছিল। তাঁহার কপাল কোঁচ্‌কানো, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো; মাথার চুল উস্কখুস্ক ও এলমেল,—সেগুলি অগ্নির কতগুলি উর্দ্ধমুখী শ্বেতশিখার মত! এ-যেন আধুনিক গীতিকাব্যের শরীরী মূর্ত্তি!

রোঁদা বলিলেন, "ভিক্টর হুগোর কাছে

ভিক্টর হুগো

গিয়া ভয়ে-ভয়ে যখন তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমি তাঁহার মূর্ত্তি গড়িতে চাই, ঠিক সেই-সময়টিতে তিনি এক বদ্‌ শিল্পীর পাল্লায় পড়িয়া হয়রান্‌ হইয়াছিলেন। সে-ব্যক্তি একটি যাচ্ছেতাই মূর্ত্তি গড়িতে গিয়া হুগোকে আটত্রিশবার আদর্শরূপে বসাইয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিয়া, তবে ছাড়িয়াছিল। সুতরাং আমার বাসনা শুনিয়া হুগো ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া বলিলেন, "আমি তোমার কাজে বাধা দিতে চাই না বটে, তবে, আগে থাক্‌তেই এ-কথা বলে রাখছি যে, তোমার আদর্শ হয়ে আমি কোন বিশেষ ভঙ্গীতে বসে থাক্‌তে পারব না। তোমাকে নিজেই, নিজের সুবিধামত বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।"

প্রথম-প্রথম আসিয়া, কাজের সুবিধার জন্য আমি পেন্সিল-দিয়া হুগোর অগুন্তি নক্সা চট্‌পট্‌ আঁকিয়া ফেলিলাম। তারপর একতাল মাটি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। ভিক্টর হুগো, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া বেশীর ভাগ সময়ই গল্পগুজবে কাটাইয়া দিতেন। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া

মনোযোগের সহিত এই মহাকবির ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতাম; তাঁহার একটা-কোন বিশেষ ভঙ্গী দেখিলেই একছুটে বারান্দায় গিয়া, কাদার তালে সেই সদ্যঃদৃষ্ট ভঙ্গীর ছাঁচ তুলিয়া ফেলিতাম। এম্‌নি করিয়া আমাকে দিনে-দিনে ধীরে-ধীরে হুগোর মূর্ত্তি গড়িতে হয়। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, কতটা বাধা-বিঘ্ন এড়াইয়া কি কষ্টেই আমাকে কাজ করিতে হইত!

*
* *

রোঁদার শিল্পশালায় একটি মূর্ত্তির সামনে গিয়া, পল দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন।

মূর্ত্তিটি রমণীর; তাহার সঙ্কুচিত দেহ যেন কোন গোপন যাতনার আগুণে পুড়িয়া খাক্ হইতেছে। তাহার মাথাটি হেঁট করা, চোখদুটি মুদিত, ওষ্ঠাধর যুক্ত। রমণীর মুখে যদি প্রাণের যাতনার ছাপ্ না থাকিত, তাহাহইলে সকলেই মনে করিত, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মূর্ত্তির মধ্যে সব-চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, তার হাতও নাই, পা-ও নাই। হয়ত, গঠনকালে শিল্পীর পছন্দসৈ না-হওয়াতে, তিনি বিরক্ত হইয়া তাহার হাত-পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

ভাবনা

পল দুঃখিতভাবে বলিলেন, "আহা, এমন চমৎকার মূর্ত্তিটিও অসম্পূর্ণ হইয়া আছে!"

রোঁদা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "বল কি! আমি যে ইচ্ছা করিয়াই মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ রাখিয়াছি, এও তুমি বুঝিতে পারিলে না? এ মূর্ত্তিতে যে ভাবনাকে ফুটানো হইয়াছে! তাইত এর হাতও নাই, পা-ও নাই —এ কাজও করে না

আর চলিয়াও বেড়ায় না। ভাবনার পরিণাম যে জড়তায়!"

এতক্ষণে পল, মূর্ত্তিটির গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিলেন। উচ্চ-আদর্শের সাধনায় যাহা বিফল হইয়াছে, অসীমকে সসীমের মধ্যে ধারণা করিতে না-পারিয়া যাহা বেদনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে—এ হচ্ছে সেই সমস্যা-পূরণে অক্ষম মানব-বুদ্ধিরই মূর্ত্তিমান নিদর্শন!

পল কহিলেন, "আপনার শিল্পকার্য্যে যে সত্য সৌন্দর্য্য থাকে, সাহিত্য-সমাজে তাহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে। কিন্তু কোন-কোন সমালোচক বলিয়া থাকেন, ললিতকলায় এতটা দার্শনিকতা ভাল নয়।"

রোঁদা তীক্ষ্নস্বরে বলিলেন, "যে বিজ্ঞানে পাথর জীবন্ত হইয়া উঠে, আমি যদি সত্য-সত্যই তাহাতে অনভিজ্ঞ হই, সমালোচকেরা তবে একবার কেন—একশ'বার আমার খুঁৎ ধরিতে পারে। কিন্তু আমার গড়া মূর্ত্তি যদি নিখুঁৎ ও জলজ্যান্ত হয়, তবে তারা কেন আমাকে দোষ দেয়? আকৃতির সঙ্গে আমি যদি অর্থসংযোগ করি, তবে তাতে বাধা দিবার শক্তি আছে কার? ভাল আর্টিষ্ট যে সুধুই নিপুণ কারিকর হইবেন, তাঁর কাজে যে বুদ্ধির বিকাশ, মহৎভাবের আভাস থাকিবে না, এটা মনে করা মস্ত ভুল। সাহিত্যেই বল আর ভাস্কর্য্যেই বল, উচ্চচিন্তার আদর দুয়েই সমান; সাধারণের আনন্দ আর লাভ হইলেই এখানে কাজের সার্থকতা—কবি ও ভাস্করে এখানে একাকার—একপ্রাণ। চিত্র, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও সাহিত্যের পরস্পর-সম্পর্ক বড়ই ঘনিষ্ঠ—আমরা এখনও তাহার সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারি নাই; প্রকৃতি যে আলোকপাত করেন, তাহারই মধ্যে তাহারা মানবের সকল মানসভাবের অভিব্যক্তি দেখায়। একব্যক্তি আমার 'ভিক্টর হুগো'র সমলোচনকালে বলিয়াছিলেন, 'ইহা ভাস্কর্য্য নহে—শরীরী সঙ্গীত!'—সমালোচকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক্,—তাই যেন হয়! কাব্যের বা সঙ্গীতের যে ধর্ম্ম, ভাস্কর্য্যে তাহা দেখিলে চঞ্চল হইবার কোন আবশ্যক নাই।

তবে, সাহিত্য ও শিল্পের ভিতরে যে একেবারেই তফাৎ নাই, তাও নয়।

প্রথমেই দেখ, মূর্ত্তি না গড়িয়াই সাহিত্য ভাবের আভাস দিতে পারে। সাহিত্য সুধু বলিয়াই ক্ষান্ত,—"গভীর ভাবনার পরিণাম জড়তা।" অথচ দেখ, এই সত্যটুকুই বুঝাইতে একখানা পাথরের উপরে আমাকে এক ভাবনাবিভোরা অঙ্গহীনা রমণী-মূর্ত্তি গড়িতে হইয়াছে। এখানে শিল্পের চেয়ে সাহিত্যের সুবিধা বেশী।

দ্বিতীয় ভেদ।—সাহিত্য যে গল্প বলে, তাহার আরম্ভ, মধ্য ও শেষ আছে। নানা ঘটনা একসূত্রে বাঁধিয়া সাহিত্য তাহা-হইতে একটি পরিণাম ঠিক করিয়া নেয়। শিল্পে কিন্তু ভিন্নরীতি। কোন কার্য্যের একটি বৈ দুটি দৃশ্য সে একসঙ্গে দেখাইতে পারে না। এই কারণেই যে-সব শিল্পী বিনাবিচারে সাহিত্যের মধ্য হইতে আপনাদের বিষয়-নির্ব্বাচন করেন, তাঁহারা ঠিক কাজ করেন না।

দেখ, Delaroche, "Children of Edward" নামে একখানি ছবি আঁকিয়াছেন।

এডোয়ার্ডের সন্তানেরা পরস্পরকে আঁকড়াইয়া আছে। কিন্তু এই ছবিখানির বিষয় তাহারা বুঝিবে না,—যাহারা জানে-না যে, এরা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, এখন কারাগারে বন্দী এবং ভাড়াটে গুণ্ডা তাহাদের হত্যা করিবে। বিখ্যাত চিত্রকর Delacroix, বাইরণের কাব্য হইতে 'Don Juan's Shipwreck' নামে ছবি আঁকিয়াছেন। তাহাতে দেখি, ঝটিকাসংক্ষুব্ধ সাগরে একখানি তরঙ্গচঞ্চল তরণীতে বসিয়া নাবিকেরা একটি টুপীর ভিতর হইতে কাগজের টুক্‌রা তুলিয়া লইতেছে। যাহারা বাইরণের কাব্য পড়ে নাই, তাহারা বুঝিতে পারিবে না যে, এই অভাগা জীবগুলি অনাহারে পাগল হইয়া গিয়াছে এবং কোন্ সঙ্গী হত হইয়া আর-সকলের আহার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাই নির্দ্ধারণের জন্য তাহারা লটারি করিয়া দেখিতেছে, কাহার নাম আগে উঠে!

এই দুই শিল্পী সাহিত্য হইতে চিত্রবস্তু সংগ্রহ করিয়া ভারি ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ছবির ভিতর থেকেই তাহার আসল অর্থ বুঝা যায় না।"

রোঁদা যখন কথা কহিতেছিলেন, পল তখন ফিরিয়া দেখিলেন, ঘরের ভিতরে Ugolinএর মূর্ত্তি রহিয়াছে।

উগোলিনের অনাহার-মৃত সন্তানেরা কারাগৃহের কক্ষতলে পড়িয়া আছে। তাহাদের নিরাহার-ক্ষিপ্ত পিতা এখনও জীবিত বটে, কিন্তু অসহনীয় ক্ষুৎপিপাসায় হিংস্র জন্তুতে পরিণত। তিনি দুই হাতে ও হাঁটুতে ভর্ দিয়া ছেলেদের আড়ষ্ট মৃত

উগোলিন

দেহের উপরে গিয়া পড়িয়াছেন। মাংস-ভক্ষণের জন্য তিনি তাহাদের দেহের উপরে হুম্‌ড়ি খাইয়া আছেন বটে,—কিন্তু, তাঁহার মুখটি অন্যদিকে ফিরানো। প্রেমপ্রবণ পিতৃত্বের সঙ্গে, মানবত্বের সঙ্গে, উগোলিনের হৃদয়ের মধ্যে তখন পশুত্বের সংগ্রাম চলিতেছে। এর চেয়ে মর্ম্মভেদী আর কিছুই হইতে পারে না।

পল কহিলেন, "আপনি যে দোষের কথা বলিলেন, আপনার 'উগোলিন'ও সেই দোষের আর-একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে। কারণ 'উগোলিনে'র অর্থ বুঝিতে হইলে আগে Divine Comedy পড়া দরকার।

রোঁদা বলিলেন, "দান্তের সর্ব্বজন-পরিচিত মহাকাব্য হইতে বিষয়-নির্ব্বাচন করিয়াছেন বলিয়া শিল্পীর এখানে ততটা দোষ হয় নাই। কিন্তু, আমার মতে শিল্পের অর্থ শিল্পের মধ্যেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। সাহিত্যের সাহায্য না লইয়াও শিল্প স্বাধীন-ভাবেই চিন্তা ও কল্পনার লীলা ফুটাইতে পারে। আমি নিজেও সাধারণত এই নিয়মটি মানিয়া চলি।"

পল শিল্পশালার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, অধিকাংশ মূর্ত্তিই মৌনভাষায় রোঁদার কথাই সপ্রমাণ করিতেছে।

একদিকে রহিয়াছে Ilusion, doughter of Icarns (ভ্রান্তি), নামে মূর্ত্তি। এটি একটি যুবতী পরীর প্রতিমা। ডানা মেলিয়া শূন্যে উড়িতে-উড়িতে ঝড়ের ঝাপ্‌টায় সে মাটির দিকে নিক্ষিপ্ত হইল; পড়িতে-পড়িতে একটি পাহাড়ের ধাক্কা লাগিয়া তাহার সুশ্রী মুখখানি একেবারে:
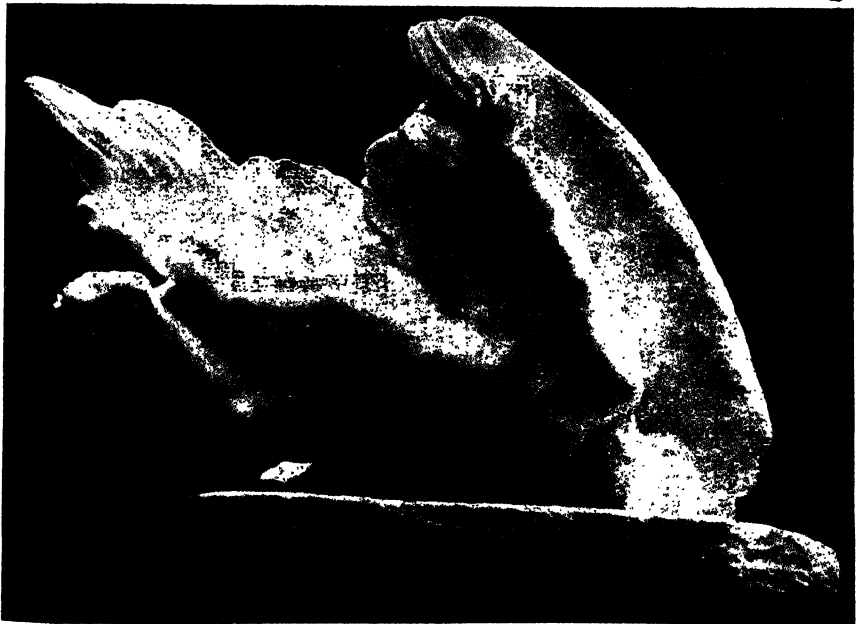
ভ্রান্তি

ছেঁচিয়া গেল। কিন্তু তাহার অক্ষত পক্ষ এখনও বাতাসে ঝট্‌পট্‌ করিতেছে। সে যে অমরী;—সে আবার উঠিবে, আবার উড়িবে, আবার পড়িবে,—এমনি চিরদিন, চিরকাল!—এ হচ্ছে ভ্রান্তির—মায়ার রূপক,—এর অশ্রান্ত আশা, অনন্ত নিরাশা!

রোঁদা বলিতে লাগিলেন, "মনকে মুগ্ধ করে বলিয়াই একখানি সুচারু নিসর্গ-চিত্রের আসল আদর নয়; দর্শকের মনে তাহা যে ভাব জাগায়, তার জন্যই তাহার সমাদর। নিপুণভাবে টানা রেখা এবং বর্ণরঞ্জনের জন্যই তুমি বিচলিত হও না,—তাহাদের মধ্যে যে অর্থ থাকে, তুমি অভিভূত হও তাহাতেই। নিসর্গ-চিত্রের বিখ্যাত শিল্পীরা প্রকৃতির নানাদৃশ্যে নানাভাব, নানাঅর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃতির অবস্থা-হিসাবে সে-সকল ভাবও কখনও গম্ভীর, কখনও তরল,—কখনও শান্ত, কখনও রুদ্র!

ভাল চিত্রকর জানেন, বিশ্ব প্রকৃতি চেতনাময়ী। ঐ বিরাট আকাশে এমন-একখানিও মেঘ নাই, ঐ তৃণশ্যামল ভূমিতে এমন-একটিও অঙ্কুর নাই—যাহার মধ্যে বিশ্ববিসারী মহাশক্তির গুপ্ত অর্থ না লুকানো আছে!

পিতলের হাত

ভাল ভাল শিল্প-কাজগুলি দেখ। এই বিশ্বনিখিলে কলাবিদেরা আপন হৃদয় দিয়া যে ভাবের ধারা দেখিয়াছেন, তাহারই প্রকাশে শিল্পের এই-সব নিদর্শন মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিভা-বান কলাবিদের হৃদয় এতটা গভীর ও ভাব-গ্রাহী যে, সকল বিষয়েই সে আপনার এই বিশেষ-ত্বের শীলমোহর মারিয়া দেয়। কেবল অখণ্ডে নয়—খণ্ডের মধ্য দিয়াও তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ পায়। শ্রেষ্ঠ-একটি শিল্পকার্য্যের যে-কোন একটি ক্ষুদ্র

অংশেও, তুমি তাহার স্রষ্টার মানস-ভাবের পরিচয় পাইবে।”

রোঁদা পিতলের যে হাত গড়িয়াছেন, তাহাতে খণ্ডকে অবলম্বন করিয়াই শিল্পীর প্রাণের ভাব বিকাশলাভ করিয়াছে।

এখানে পল বলিলেন, “আচার্য্য, শিল্পীরা যে গভীর ভাব প্রকাশ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক সংশয়ী এ-কথাও ত বলিয়া থাকে যে, শিল্পীরা ছবি আঁকিবার সময়ে যে ভাব কল্পনাও করেন নাই,—সেই ভাবই পরে জোর-করিয়া তাঁহাদের ছবির উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয়। আপনার কথায় এটুকু বেশ বুঝিতে পারি, অন্তত আপনার হাত মনের দ্বারা চালিত, কিন্তু সকল শিল্পীর হাতই কি তাই?—তাঁহারা কি কেবল সহজাত-সংস্কারের (instinct) দ্বারাই কাজ করিয়া যান না? তাঁহারা কি সত্যসত্যই শিল্পের মধ্যে চিন্তার সমাবেশ করিয়া থাকেন? চিত্রে-ভাস্কর্য্যে যে ভাবটিকে আমরা প্রশংসা করিয়া থাকি, শিল্পীরা আঁকিবার বা গড়িবার সময়ে কি ঠিক সেই বিশেষ ভাবটিকেই পরিষ্কাররূপে ধারণা করিতে পারেন?

রোঁদা সাহাস্যে বলিলেন, “কতকগুলি উর্ব্বর-মস্তিষ্ক লোক আছে বটে, শিল্পের উপরে যাহারা অকল্পিত অপরূপ ভাব আরোপ করে। কিন্তু তাদের কথা আমরা ধরিতেছি না। কার্য্যকালে ওস্তাদ-শিল্পীরা যে সম্পূর্ণরূপেই সচেতন থাকেন, এতে আর কোনই সন্দেহ নাই।”—এইখানে মাথাটি ঘুরাইয়া তিনি বলিলেন, “তুমি যে অবিশ্বাসীদের কথা বলিলে, তারা যদি বুঝিত, মনে-মনে প্রবলভাবে শিল্পী যাহা ভাবেন ও অনুভব করেন, সেই ভাব ও অনুভূতিকে পটের উপরে সামান্যরূপে ফুটাইয়া তুলিতেও কতটা শক্তির দরকার, তাহাহইলে এমন সন্দেহ কিছুতেই তারা করিত না যে,—শিল্পে যে ভাব বিকসিত হইয়াছে, তাহা সচেতন শিল্পীর স্বেচ্ছাকল্পিত নহে।”—একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, “তাহাই শ্রেষ্ঠ শিল্প,—যাহাতে ভাবশূন্য আকৃতি, রেখা ও বর্ণ নাই—যাহার সমস্ত অংশই ভাবের রসে সুরসাল ও প্রাণের লীলায় সুমধুর!

*
* *

নবেম্বর মাসের কন্‌কনে শীত। রোঁদা তাঁহার Mendon এর বাড়ীতে, একদিন সকালে চুপচাপ বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরনে আটপৌরে কাপড়। তাঁহার মাথার চুলগুলি উস্কখুস্ক, পায়ে চটিজুতা। রোঁদা বসিয়া বসিয়া আগুন পোহাইতেছিলেন।

রোঁদার সুমুখেই, দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড একটি ক্রুশবদ্ধ যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি। পল সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি যেমন চমৎকার, তেমনি স্বাভাবিক;—এত স্বাভাবিক যে, দেখিলে মন বিমর্ষ হইয়া পড়ে।

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচার্য্য, আপনি ধর্ম্ম মানেন ত?”

রোঁদা বলিলেন, “বিশেষ কতগুলি বিধি-সংহিতা যে মানিয়া চলে, তুমি যদি তাকেই ধার্ম্মিক বলিতে চাও, তবে সে-হিসাবে আমি অধার্ম্মিক।

কিন্তু কতকগুলি বাঁধা বুলির চর্ব্বিত-চর্ব্বণকে আমি ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে রাজি নই। জীব-নিখিলকে যাহা রক্ষা করে, বিশ্বের তাবৎ পদার্থকে যাহা বিধিবদ্ধ করে, সেই অজ্ঞাত শক্তির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই হচ্ছে, ধর্ম্ম। বিশ্বে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত যাহা-কিছু ;—সেই বিরাট পদার্থ, যাহা আমাদের দৃষ্টি—এমন-কি আমাদের মানসনেত্রও যাহা দেখিতে পায় না,—তাহারই ধারণা করিতে পারার নাম, ধর্ম্ম। অসীমের দিকে, চিরন্তনের দিকে, অগাধ জ্ঞান ও প্রেমের দিকে আমাদের বিবেকনত মনের গতিই হচ্ছে ধর্ম্ম। এই হিসাবেই আমি ধার্ম্মিক।” চুল্লীর কম্পমান অগ্নিশিখার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, রোঁদা আবার বলিলেন, —“ধর্ম্ম যদি পৃথিবীতে না থাকিত, তবে আমাকে তাহা আবিষ্কার করিতে হইত। মনে-প্রাণে যিনি খাঁটি কলাবিদ্, মানুষের মধ্যে তিনি মহাধার্ম্মিক।

সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বাহ্যইন্দ্রিয়ই শিল্পীর সর্ব্বস্ব,—তাই বহিঃপ্রকৃতিই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কলাবিদ্ কি শিশু? যে, শিশু যেমন রঙ্গচঙ্গে পুতুল পাইলেই খুসি হয়, তিনিও তেমনি কতকগুলি জিনিষের বাহিরের গড়ন বা পরিবর্ত্তমান বর্ণলীলা দেখিয়াই উল্লসিত হইয়া উঠিবেন? লোকে শিল্পীকে চিনিতে পারে নাই। রেখা ও বর্ণ শিল্পীর কাছে গোপন সত্যের বহিঃস্ফুট চিহ্নমাত্র।

প্রত্যেক শিল্পী, নিজের স্বভাবমত প্রকৃতিকে রুদ্র বা শান্ত—যে-কোন ভাবে অভিষিক্ত করিয়া তুলেন। নিসর্গ-চিত্রের পটুয়া আরও-বেশী আগাইয়া যান। কেবল জীব-জন্তুর মধ্যেই তিনি বিশ্ব-আত্মার প্রতিচ্ছায়া দেখেন না, তরুদলে, বনজঙ্গলে, উপত্যকায় ও পর্ব্বতমালায় পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ব-আত্মার আভাস পান। অন্যলোকের কাছে গাছ-পাথর সুধু গাছ-পাথর মাত্র, তাঁহার কাছে সেই গাছ-পাথরই মানুষের মুখের মত জীবন্ত। আরসির মত সরসী-জলে, মথ্‌মলের মত নরম ঘাসে-ভরা মাঠ-ময়দানে, বনস্পতির কাণ্ডদেশে শিল্পী Corot দেখিয়াছিলেন বিশ্বব্যাপী করুণার ঝরণা। আবার, উহাদেরই ভিতরে শিল্পী Milletএর চোখে পড়িয়াছিল, জ্বালা-যন্ত্রণা ও সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্য!

ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই শিল্পী শুনেন, তাঁহার আত্মার উত্তরে বিশ্ব-আত্মার বাণী ধ্বনিয়া উঠিতেছে। তবে, বল দেখি পল, শিল্পীর চেয়ে ধার্ম্মিক আর কে আছেন?

সকল ওস্তাদ-শিল্পীর কার্য্যই অতীন্দ্রিয় রহস্যে ভরা। প্রকৃতির সামনে প্রতিভাবানের প্রাণে যে অনুভূতি জাগে, সত্য বটে শিল্পীরা তাহাই অভিব্যক্ত করেন; প্রকৃতিতে নরপ্রাণ যে নির্ম্মলতা, যে মোহন-শ্রী দেখে, সে-সমস্তই তাঁহারাও দেখান, ইহাও ঠিক; কিন্তু আমাদের জ্ঞেয় পৃথিবীকে যে বিরাট অজ্ঞেয়তা আবরণ করিয়া আছে, তাহার সহিতও তাঁহাদের হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত চলে। যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের গোচর, আমরা কেবল তাহাই অনুভব ও কল্পনা করিতে পারি। তাছাড়া আর-সমস্তই অসীম আঁধারে অদৃশ্য। এমন-কি, যে-সব পদার্থ আমাদের কাছে দৃশ্যমান

হওয়া উচিত, আমরা তাহাদিগকে কল্পনা করিতে পারি না বলিয়া সেগুলিও আমাদের গোচরীভূত হয় না। কিন্তু তীক্ষ্ণনেত্র শিল্পীর চোখে ধূলা দিয়া কিছুতেই তাহারা এড়াইয়া যাইতে পারে না।"

রোঁদা স্তব্ধ হইলেন। পল, ভিক্টর হুগোর কয়টি লাইন আবৃত্তি করিলেন :—

"আমরা নিখিল পদার্থের একটি দিক বৈ দেখিতে পাই না—অন্যদিকটি অন্ধকার ও রহস্য-সাগরে নিমগ্ন। মানুষ কারণ না-জানিয়া কর্ম্মফলে দুঃখভোগ করে। যাহা-কিছু তাহার কাছে স্বপ্রকাশ, সেসমস্তই অনাবশ্যক, সঙ্কীর্ণ ও চলচঞ্চল।"

রোঁদা হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আমার চেয়ে ভাল-করিয়া কবি কথাগুলি বলিতে পারিয়াছেন।

প্রতি শিল্পকার্য্যেই এই গুপ্তরহস্য আছে। লিওনার্দো ডা ভিন্সির সকল চিত্রই এমনি রহস্যে ভরা।

Milletএর The Gleaners (উঞ্ছজীবী) নামে ছবিখানি দেখ। সে বিধির অর্থ কি, যে বিধিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এই হতভাগ্য জীবগুলি দুনিয়ায় কেবল কষ্ট ভুগিতে বাঁচিয়া আছে? এই চিরন্তন প্রলোভনের অর্থ কি, যাহাতে মজিয়া, হাজার যাতনা পাইয়াও জীবনকে ইহারা ভালবাসে? হায়, এ কি নিষ্ঠুর সমস্যা!

শিল্পে এই রহস্যের আবরণ কেবল যে খৃষ্টিয় ললিতকলায় দেখা যায়, তাহা নয়। প্রাচীন রোম বা গ্রীসের শিল্পসৃষ্টির পূর্ব্বেও—"ভাগ্যদেবীত্রয়ে"র পূর্ব্বেও মানুষের চারু কলায় রহস্যের এই কুহেলিকা আসিয়া পড়িয়াছিল।

উঞ্ছজীবী

ভাগ্যদেবীত্রয়

"ভাগ্যদেবীত্রয়ে" দেখি, তিনটি রমণী পাশাপাশি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের ভঙ্গী এমন মহিমময়, এমন শান্ত-স্থির যে দেখিলেই মনে হয়, তাঁহারা যেন আপনা-আপনির ভিতরে আমাদের-অজ্ঞাত এক গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের উপরে বিপুল রহস্যের যবনিকা এবং জগৎধাত্রী, অশরীরী ও চিরন্তন মহাশক্তির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে;—তাঁহারা সেই মহাশক্তিরই স্বর্গীয় দূত!

জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরের দিকে সকল শিল্পাচার্য্যই অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রাচীরে আহত হইয়া হতাশপ্রাণে ফিরিয়া আসিয়াছেন; আর, যাঁহাদের কল্পনার প্রসার অধিক, কেবল তাঁহারাই প্রাচীরের আড়াল হইতে চিরগোপন নন্দনকাননের সুমধুর বিহগ-বিরাব শুনিতে পাইয়াছেন।"

পল অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ললিত-কলা-সম্বন্ধে শিল্পাচার্য্যের এই মূল্যবান উপদেশগুলি শুনিতেছিলেন। রেঁাদা স্তব্ধ হইলে পল বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি অন্য-অন্য শিল্পীর কথা অনেক বলিলেন, কিন্তু আপনার নিজের কথা কি? আপনার শিল্পকার্য্যেও অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রভাব ত বড় অল্প নয়! আপনার গড়া খুব ছোটখাট মূর্ত্তিতেও অব্যক্তের আকুলতা দেখা যায়!"

পলের প্রতি ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রেঁাদা বলিলেন, "প্রিয়বন্ধু, আমার কাজে আমি যদি বিশেষ কতগুলি ভাবের বিকাশ দেখাইয়া থাকি, তবে আমার পক্ষে তাহার ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক; কারণ

আমি কবি নই—ভাস্করমাত্র; আমার দেওয়া যা ভাব, মূর্ত্তির দিকে চাহিলে সহজেই তা বুঝা যাইবে। আর, সে সব ভাব যদি দুর্ব্বোধ হয়, তবে জানিও, আমি নিজেও তাদের প্রাণে-প্রাণে অনুভব করি নাই; সুতরাং সে-স্থলে আমার দ্বারা কোন ব্যাখ্যাও সম্ভব বলিয়া মনে করি না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ছন্নছাড়া

দুয়ের অধ্যায়

(১)

মাথা-ঢাকা একখানা গাড়িতে কতকগুলো পুরোনো ঝুড়ির মধ্যিখানে আমাকে গুঁজে বসিয়ে দিলে। তার পর, গাড়ির ঘোড়াটা যখন চাষার বাড়ির সামনে এসে আপনার-থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ল তখন বেশ রাত হয়েছে।

চাষা বাড়ি-থেকে বেরিয়ে এল,—হাতে তার লণ্ঠন,—উঁচু-করে তুলে ধরা; তার আলোতে কেবল তার পায়ের কাঠের জুতোর ডগাটুকু দেখা যাচ্ছিল। সে এসে আমাদের নাবিয়ে নিলে; আমার মুখের কাছে একবার আলোটা তুলে ধরেই একটু পিছিয়ে গেল, বল্লে—"বাঃ বেশ ক্ষুদে দাসীটি ত!"

চাষার স্ত্রী আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল,—সেখানো দুটো বিছানা; আমার বিছানা কোন্‌টি তা দেখিয়ে দিলে; বল্লে —"কাল তোমায় সমস্তদিন এখানকার রাখালটার সঙ্গে এ-বাড়িতে একলাটি থাকতে হবে;—আমরা সবাই সেণ্ট-জন-ভোজে চলে যাবো।"—সকালবেলা ঘুম-থেকে উঠতেই রাখাল আমায় গোয়াল-ঘরে নিয়ে গেল—জাব্‌না দেবার জন্যে। সে আমাকে ভেড়ার খোঁয়াড়টা দেখিয়ে দিলে। বল্লে, বুড়ী বিবিশ্-এর বদ্‌লি আমাকে ঐ ভেড়া দেখতে হবে। সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, প্রাত-বছর ভেড়ার ছেনাগুলোকে তাদের মায়ের কাছ-থেকে সরিয়ে নিয়ে আলাদা রাখা হয়, সেই জন্যে তাদের দেখাশুনো করতে একজন আলাদা লোকের দরকার। সে আরো বল্লে যে, এই যে গোলাবাড়ি এর নাম "ভিল্‌ভিয়েই।" এখানে সবাই বেশ সুখে আছে; কারণ মনিব সিল্‌ভাঁা এবং তাঁর পত্নী পোলিন্ দুজনেই লোক বড় ভালো।

যখন তার গোরু-বাছুর সব দেখা হল সে বাদামতলায় গিয়ে তার পাশে আমায় বসতে বল্লে। সেখানে বসে আমরা গলির বাঁক যেখানে বড়-রাস্তায় মিশেছে সেই পর্য্যন্ত এবং গোলাবাড়ির আগাগোড়া দেখতে পাচ্ছিলুম। বাড়িটার আকার চৌকোণা, মধ্যিখানে উঠোনে গোবরের ডাঁই, সেখান থেকে একটা ভাপ উঠে আধা-শুকনো ঘাসের গন্ধর সঙ্গে মিশছিল। সমস্ত বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ।

আমি বসে-বসে চারিদিক দেখছিলুম। লম্বা লম্বা দেবদারু গাছ আর চাষের ক্ষেত ছাড়া আর-কিছু নজরে পড়ছিল না। আমার মনে হতে লাগল, অনেক-দূরের একটা নতুন দেশে হঠাৎ যেন উড়ে-এসে পড়েছি! এখানেই চিরদিন আমায় থাকতে হবে—এই রাখালের সঙ্গে, আর ঐ গোয়ালের মধ্যে যে গোরু বাছুর ভেড়া আছে তাদের সঙ্গে! সেদিন ভারি গরম। ঘুমে আমার সমস্ত শরীর জড় হয়ে আসছিল, কিন্তু আন্‌খা জায়গার একটা ভয় ছিল বলে চোখ-বুজতে পারছিলুম না। নানা রঙের মাছি মুখের সামনে ভন্‌ভন্‌-শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছিল। রাখালটা গাছের গুল্ম নিয়ে ঝুড়ি বুন্‌ছিল; আর আমাদের পায়ের কাছে পড়ে কুকুরগুলো ঘুম দিচ্ছিল।

সূর্য্য যখন ডুবু-ডুবু ঠিক সেই সময় গলির বাঁক থেকে চাষার গাড়ি মোড়-নিলে দেখা গেল। গাড়ির মধ্যে পাঁচ জন লোক—দু জন পুরুষ, তিন জন মেয়ে। আমাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় চাষার স্ত্রী আমার পানে চেয়ে একটু হাসলে, আর অন্য সবাই আমাকে দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল। একটু পরেই নিস্তব্ধ গোলাবাড়িটা সরগরম হয়ে উঠল। দেরী হয়ে গেছে বলে সেদিন আর রান্না-বান্না হল না,—আমরা সবাই এক-এক বাটি দুধ আর একটু করে রুটি খেয়ে নিলুম।

(২)

পরের দিন চাষার স্ত্রী আমাকে একটা লম্বা জামা পরতে দিলে। আমি বুড়ী বিবিশ্‌-এর সঙ্গে ভেড়া-চরানো শিখতে বেরিয়ে পড়লুম। বুড়ী বিবিশ্‌ এবং তার কুকুর কাস্তিল্‌—দুজনে দুজনের এমন অনুরূপ যে আমার মনে হত ওরা যেন জ্ঞাতি। দেখতে দুজনকে প্রায় সমবয়সী এবং দুজনের চোখ অনেকটা এক রঙের। ভেড়াগুলো যেমনি দল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ত অমনি বিবিশ্‌ বলে উঠত—"কাস্তিল্! হাঁক দে, হাঁক দে!" কথাগুলো সে ভয়ানক তাড়াতাড়ি বলে যেত এবং কাস্তিল্‌ ডেকে না উঠলেও ভেড়াগুলো তখনি সারবন্দি হয়ে পড়ত। তার গলার স্বরের সঙ্গে তার কুকুরের ডাকের এমনি মিল ছিল।

যখন শস্য-কাটার ধুম পড়ল আমার মনে হতে লাগল যে কাজ করচি তা যেন ভারি আশ্চর্য্য, রহস্যময়—যেন আমার চারিদিকে একটা প্রহেলিকা চলেছে। লোকেরা সব জড়ো হয়ে শস্য কেটে স্তূপাকার করছে,—কেউ আছড়াচ্ছে, কেউ আঁটি বাঁধছে, কেউ সেগুলো গাদা করছে; থেকে থেকে তাদের গলার চীৎকার উঠছে। এক একসময় আমার মনে হত, সেই চীৎকার যেন আকাশ থেকে এল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি উপর পানে চেয়ে দেখতুম, মনে হত বুঝি ঐ সোনার শস্যভরা রথ মাথার উপর দিয়ে আকাশ-পথে চলে গেল!

রাত্রের খাবার আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেতুম। লম্বা টেবিলের পাশে যার যেখানে খুসী বসে যেত; চাষার স্ত্রী আমাদের প্লেট কানায়-কানায় ভর্ত্তি করে দিত। যাদের বয়স কম তারা ক্ষিদের চোটে চট্‌পট্‌ চিবিয়ে যেত আর যারা বুড়ো তারা ধীরে-সুস্থে একটু-একটু-করে মুখে

তুলত—যেন সে কি মহামূল্য সামগ্রী! সবাই চুপ-চাপ খেয়ে যেত; তাদের কালো হাতের উপর পোড়া রুটির টুকরোগুলো সাদা দেখাত। খাওয়া শেষ হলে বুড়োর দল চাষবাসের কথা পাড়ত, ছোকরার দল মার্ত্তিন্ বলে যে মেয়েটি ভেড়া চরায় তাকে নিয়ে মজা করত। সে সকলকার ঠাট্টার জবাব দিত এবং নিজেও আশ-মিটিয়ে বিদ্রূপ করত। কিন্তু কোনো পুরুষ যদি তার দিকে হাত বাড়াত সে অমনি লাফিয়ে সরে যেত—কখ্খনো ধরা দিত না। আমার দিকে কেউ খেয়াল করত না। একটু দূরে কতকগুলো কাঠের গুঁড়ি জড়ো করা ছিল আমি তার উপর একলাটি বসে থাকতুম,—বসে বসে তাদের সকলকে দেখতুম। কর্ত্তা সিল্‌ভাঁার তামাটে রঙের বড়-বড় চোখ; সেই চোখ দিয়ে সে এক-এক-করে থেমে-থেমে সকলকার মুখের দিকে চাইত। তার গলা কখনো বেশী উঠত না—কথা কইবার সময় টেবিলের উপর হাত ঝুঁকিয়ে রাখত। তার স্ত্রীর স্বর ছিল গম্ভীর -চিন্তাযুক্ত। যেন কি একটা বিপদ আসচে এই আশঙ্কাই সর্ব্বদা মনে জাগছে। মুখে হাসি বড় দেখা যেত না - সবায়ের হাসিতে ঘর ফেটে গেলেও তার মুখ গোমড়া!

বুড়ি বিবিশ্ খালি ভাবত আমার ঘুম পেয়েছে। সে কেবল আমার কাপড় ধরে টানত;—আমায় বিছানায় তুলে নিয়ে যেত। তার বিছানা ছিল ঠিক আমার পাশেই। সে কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বিড়-বিড় করে ভগবানের নাম করত এবং আমার কাপড় ছাড়া হল কি না সে-খোঁজ না নিয়েই আলোটা নিবিয়ে দিত

(৩)

ফসলের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই বিবিশ্ তার কুকুরকে সঙ্গে দিয়ে আমায় মাঠে একলা ছেড়ে দিলে। তার কুকুরটা আমাকে মোটেই গ্রাহ্য করত না; সে সুবিধে পেলেই আমাকে ছেড়ে বিবিশের কাছে গোলাবাড়িতে পালিয়ে যেত। আমি ভেড়াগুলোকে নিয়ে ভারি মুস্কিলে পড়তুম;—কিছুতেই তাদের ঠিক রাখতে পারতুম না। যে যেম্‌নে পেত পালিয়ে যেত। এই সময় মারি এমের সঙ্গে আমার নিজের অবস্থার তুলনা মনে উঠত; তিনি প্রায়ই বলতেন তাঁর সেই মেয়ের পালটিকে সাম্‌লে রাখা দায়। কিন্তু দেখতুম তিনি ত বেশ সহজেই সামলাতে পারতেন;—ঘণ্টায় একটা ঘা মারলেই আমরা সবাই জড়ো হতুম এবং গলার সুর একটু কড়া করলেই আমাদের সব গোল থেমে যেত। কিন্তু আমি যতই চীৎকার করে গলা ফাটাই না, যতই চাবুকের শব্দ করি না, একটা ভেড়াও আমার কথা শোনে না। কাজেই আমাকে ভেড়া-তাড়ানো কুকুরের মতো ভেড়ার সঙ্গে ছুটে-ছুটে বেড়াতে হত। একদিন সন্ধ্যা বেলা দুটো ভেড়া গেল হারিয়ে। রোজ সন্ধ্যাবেলা তাদের খোঁয়াড়ে পোরবার সময় আমি দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের গুনে তুলতুম। সেদিন গুনে দেখি দুটো কম। আমি খোঁয়াড়ের মধ্যে গিয়ে আবার গুনতে লাগলুম;—কিলবিল করছে ভেড়া, সে কি গোনা যায়! যত-বারই গুনি দেখি সংখ্যা বেড়েই যায়, কাজেই হতাশ হয়ে বেরিয়ে

এলুম। শেষে মনে মনে ভেবে দেখলুম নিশ্চয় প্রথমবার গুনে তোলবার সময় আমার ভুল হয়েছে। কাউকে কিছু বল্লুম না।

পরদিন সকালে তাদের বার করবার সময় আর-একবার গুনে দেখলুম। সত্যিই দুটো কম। আমার বড় ভয় হতে লাগল। সমস্তদিন মাঠে-মাঠে আমি তাদের খুঁজে বেড়াতে লাগলুম, সন্ধ্যার সময় দেখলুম, তাদের আর পাওয়া গেলনা; তখন চাষার স্ত্রীকে বল্লুম। কয়েকদিন ধরে আমরা সবাই মিলে চতুর্দ্দিকে তাদের খোঁজ করতে লাগলুম;—খোঁজার একশেষ হল কিন্তু কোনো ফল হল না। প্রথমে চাষা, তারপর তার স্ত্রী আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগল—"বল্, কোনো লোক এসে তোর কাছ-থেকে ভেড়া-দুটো নিয়ে গেছে কি না!" তারা বল্লে, আমার কোনো ভয় নেই,—সত্যি কথা বল্লে তারা কিচ্ছু বলবে না। আমি বারবার বল্‌তে লাগলুম যে ভেড়া-দুটো কোথায় গেল আমি কিচ্ছু জানিনা,—কিন্তু বুঝলুম বলে কোনো লাভ হলনা, কারণ তারা আমার কথা বিশ্বাস করলে না।

এরপর থেকে আমি ভয়ে-ভয়ে মাঠে যেতুম—কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, আশে-পাশে সব লোক লুকিয়ে থাকে যারা ভেড়া চুরি করে নিয়ে যায়। আমি থেকে-থেকে কেবলই চমকে উঠতুম—ঐ বুঝি ঝোপের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে। তারপর, অল্পদিনের মধ্যেই আমি চোখ-বুলিয়ে ভেড়া গুনে নিতে অভ্যস্থ হয়ে গেলুম—দেখলেই বুঝতে পারতুম সবাই একসঙ্গে আছে, কি, কেউ ছটকে পড়ছে!—একমিনিটও লাগত না।

(৪)

শরৎকাল এসে পড়তেই আমার মন ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল। মারি এমের জন্যে আমার বড় মন-কেমন করত। তাঁকে আমার এমনি দেখবার ইচ্ছে হত যে আমি চোখ-বুজে বসে ভাবতুম যে ঐ তিনি পথ-বেয়ে আসছেন। ভাবতে ভাবতে সত্যই তাঁর পায়ের শব্দ, ঘাসের উপর তাঁর কাপড়ের খস্‌খসানি স্পষ্ট শুনতে পেতুম। যখন মনে হত তিনি আমার খুব কাছে এসে পড়েছেন আমি চোখ খুলতুম,—অমনি তিনি অন্তর্দ্ধান করতেন। অনেকদিন ধরে মনে মনে ইচ্ছে ছিল তাঁকে একখানি চিঠি লিখি, কিন্তু কাগজ কলম চাইবার সাহস হত না। চাষার স্ত্রী নিজে লিখতে জানত না; সেখানে কারুর চিঠিও আসতে দেখতুম না। একদিন সকালে সাহস করে মুখ-ফুটে সিল্‌ভঁ্যাকে বল্লুম—"আজ আমাকে একবার সহরে নিয়ে চলুন না।" সিল্‌ভঁ্যা কোনো জবাব করলে না; তার সেই বড় বড় চোখ মেলে আমার পানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর বল্লে—"যারা ভেড়ার বাচ্ছা পালন করে, বাচ্ছাদের একলা রেখে তাদের কোথাও যেতে নেই।" সে বল্লে যে, আমাকে গ্রামের গির্জ্জেয় নিয়ে যেতে তার আপত্তি নেই; কিন্তু সহরে যাওয়া কিছুতেই হবে না। এই কথা শুনে আমি একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেলুম।—মনে হল, যেন একটা মহা অশুভ সংবাদ শুনলুম। যত-বারই ঐ কথা ভাবতে লাগলুম ততবার কেবল মারি এমেকে আমার মনে পড়তে লাগল। মনে হতে লাগল, তিনি যেন

একটি মহামূল্য দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী; দৈবাৎ চাষা সেটি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভেঙে ফেল্লে!

পরের শনিবার চাষা ও তার স্ত্রী সকাল-বেলা সহরে চলে গেল; প্রত্যেকবার দেখতুম ফিরতে সন্ধ্যে হত; কিন্তু এবার দেখলুম একজন ভেড়া-কেনবার খরিদ্দার সঙ্গে করে বিকেলের মধ্যেই তারা ফিরে এল। আমার ধারণাই ছিলনা যে সহরে গিয়ে এত শীঘ্র ফেরা যায়। আমার মনে হল, তবে ত আমিও একদিন দুপুরবেলা ভেড়ার পাল মাঠে ছেড়ে চট্ করে একবার মারি এমের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসতে পারি! কিন্তু দেখলুম, সে সুবিধে নয়, তাই রাত্রিবেলায় যাওয়া স্থির করলুম। ভাবলুম, চাষার গাড়ির ঐ ঘোড়াটা যতক্ষণে যায় নিশ্চয় তার চেয়ে বেশী সময় আমার লাগবেনা; তাহলে মাঝরাত্রে বেরিয়ে, ভোর বেলায় ভেড়ার পাল মাঠে বার করবার সময়ের মধ্যেই ঠিক এসে পৌঁছতে পারব।

সে-রাত্রে আর কাপড় ছাড়লুম না—সবসুদ্ধ শুয়ে পড়লুম। বড় ঘড়িটায় যখন ঢং ঢং করে বারোটা বাজল, হাতে জুতো নিয়ে পা-টিপে-টিপে বেরিয়ে পড়লুম; একটা গাড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে জুতোর ফিঁতে বেঁধে নিলুম, তারপর একেবারে দৌড়! একদমে গোলাবাড়ির সীমানা পেরিয়ে এলুম। দেখলুম, রাত তত অন্ধকার নয়; কিন্তু জোর বাতাস বইচে; কালো কালো মেঘগুলো চাঁদের নীচে আকাশের গায়ে পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠছে। বড়-রাস্তায় গিয়ে উঠতে অনেকখানি পথ; মধ্যে একটা সাঁকো পার হতে হয়—সেটা মেরামতের অভাবে অমজবুত হয়ে আছে। বর্ষার জলে ছোট্ট নদীটি মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে;—তার জলের ঝাপ্টা সাঁকোর পচা কাঠের ফাঁক দিয়ে চল্‌কে উঠেছে। আমার কেমন ভয় করতে লাগল;—হাওয়া এবং জল এই দুটোয় মিলে কেমন-একটা-ভীষণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠছিল—তেমন শব্দ আমি জীবনে কখনও শুনিনি। কিন্তু ভয়কে আজ মানব না। আমি উর্দ্ধশ্বাসে সাঁকো পেরিয়ে গেলুম।

বড়-রাস্তায় পড়তে যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলুম তার চেয়ে কম সময়ে পৌঁছে গেলুম। বাঁ-দিকের রাস্তাটা নিলুম—কারণ দেখতুম চাষা ঐ-দিক দিয়েই বাজারে যায়। কিছুদূর যেতেই দেখি রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। এইবার কোন্ দিকে যেতে হবে জানতুম না। একবার এ-রাস্তায় খানিকটা, আবার ও-রাস্তায় খানিকটা—এমনি করে ছুটোছুটি করতে লাগলুম। শেষে মনে হল, বাঁয়ের রাস্তাটাই ঠিক হওয়া সম্ভব। আমি সেই পথই নিলুম। হাঁকু-পাকু করে যে সময়টা নষ্ট হয়েছে সেটা পুষিয়ে নেবার জন্যে আমি খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম।

দূরে দেখলুম, প্রকাণ্ড একটা কালো জমাট অন্ধকার—সমস্ত গ্রামখানাকে গিলে রয়েছে। সেটা আমার দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল! মুহূর্ত্তের জন্য একবার মনে হল ফিরে পালাই। একটা কুকুর ডেকে উঠল, সেই শব্দে যেন সাহস এল; সেই-মুহূর্ত্তে দেখতে পেলুম আমার সাম্‌নের সেই কালো দৈত্যটা একটা বন তার মধ্যে

দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। বনের মধ্যে প্রবেশ করতেই হাওয়া ভয়ানক এলোমেলো হয়ে উঠল –থেকে-থেকে দমক দিতে লাগল। সেই ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে, গাছে-গাছে ঠোকাঠুকি, ডালে-ডালে জড়াজড়ি হয়ে চারিদিকে কেবল কড়-কড় শব্দ উঠতে লাগল। বাতাসের চাপে বড় বড় গাছগুলো মাথা নুইয়ে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। চারদিক থেকে অনবরত মড়-মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়বার শব্দ শুনতে লাগলুম।

হঠাৎ পিছনে কার পায়ের শব্দ শুনলুম, কে আমার কাঁধে একবার হাত দিলে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে চাইলুম, কিন্তু কেউ কোথাও নেই! সন্দেহ গেলনা;—নিশ্চয় আমার কাঁধে কেউ হাত দিয়েছে! তার ভুল নেই! পায়ের শব্দও তখনো শোনা যাচ্ছিল!—কে যেন অদৃশ্য হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে! আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলুম—এমন জোরে ছুটছিলুম যে আমার পা মাটিতে পড়চে কি না বুঝতে পারছিলুম না।

আমার পায়ের ঠোক্কর লেগে পাথরগুলো ছিট্‌কে উঠছিল; পিছন থেকে তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম—শিলাবৃষ্টির মতো। মনে তখন কেবল এক-কথা জাগছিল—দৌড়, দৌড়,—যে-পর্য্যন্ত-না বন-থেকে বেরুতে পারি কেবল দৌড়!

অবশেষে একটা ফাঁকা জায়গা পেলুম—বন সরিয়ে সেখানে ক্ষেত হয়েছে। ঘোলাটে চাঁদের একটুখানি আলো সেখানে পেলুম। ঝড়ের বাতাস গাদা-গাদা গাছের পাতা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে একবার উপরে তুলচে, আবার নীচে এনে ফেলেচে,—তার পর চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্চে।

একটুখানি দম নেওয়া দরকার। কিন্তু তখনো বড় বড় গাছগুলো বিকট শব্দে দোল খাচ্ছে। তাদের ছায়া কালো-কালো প্রকাণ্ড জানোয়ারের মতো একবার পথের উপর এসে শুয়ে পড়ছে আবার গাছের পিছনে সরে গিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে। এক-একটা ছায়ার চেহারা যেন আমার জানা। কিন্তু এদের অধিকাংশই এমন-করে আমার সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল যেন পথ আগলে আমায় কিছুতেই যেতে দেবে না। গোটাকতক ছায়া আমায় এমন ভয় দেখাতে লাগল যে আমি ছুটে লাফ দিয়ে তবে তাদের ডিঙিয়ে গেলুম—মনে হচ্ছিল তারা বুঝি আমার পা কামড়ে ধরবে!

বাতাসের বেগ একটু কমে এল—বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ক্ষেতের অপর পারে আমায় যেতে হবে। রাস্তা খানিকদূর গিয়ে আবার বনের মধ্যে মিশে গেছে। সেইখানে এসে আমি একটা দেয়াল দেখতে পেলুম। একটু যেতেই বুঝলুম সেটা একটা বাড়ি। না ভেবে-চিন্তে দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারলুম। ঝড় না থামা পর্য্যন্ত এইখানে থাকবার জন্যে একটু আশ্রয় চাইব। আবার ধাক্কা দিলুম। শুনলুম কারা একবার নড়ে উঠল; ভাবলুম নিশ্চয় এইবার দরজা খুলে দেবে, কিন্তু দেখি একতলার একটা জানলা মাত্র খোলা হল। একটা লোক, কাণ-ঢাকা টুপি-পরা, বলে উঠল—"কে রে!" আমি বল্লুম—"আমি!" "কে তুই!" "একটি ছোট মেয়ে।" লোকটা অবাক

হল ; বল্লে—"ছোট মেয়ে ?" জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাবি ? কোত্থেকে আসচিস ? কি দরকার ?" এত খোঁজ-খবর যে নেবে সে-কথা আমার মনেই হয়নি। আমি বল্লুম—"ঐ গোলাবাড়ি থেকে আসছি।" তারপর একটা মিছে-কথা বল্লুম। বল্লুম—"আমার মায়ের বড় অসুখ, তাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছি।" বলে বৃষ্টির জন্যে একটু জায়গা চাইলুম। সে বল্লে—"আচ্ছা, দাঁড়া !" বলে আর-একজন কার সঙ্গে কি কথা কইলে, তার পর জানলার ধারে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমার সঙ্গে আর-কেউ আছে কি না। বল্লে—"তোর বয়স কত ?" আমি বল্লুম—"তেরো বছর !" সে বল্লে—"তোর ত আচ্ছা সাহস ! এতটুকু মেয়ে এই-রাত্রে ঝড়বৃষ্টিতে একলা বনে বেরিয়েছিস।" বলে সে জানলা দিয়ে ঝুঁকে খানিক দাঁড়িয়ে আমার মুখ দেখবার চেষ্টা করলে ; তারপর এধার-ওধার-করে মাথা ঘুরিয়ে বনের অন্ধকারের ভিতরটা ঘাড় বাড়িয়ে একবার দেখে নিলে ; তার পর আমায় পরামর্শ দিলে আরো-কিছু দূর এগিয়ে যাবার জন্যে। বল্লে, বনের ওপারে গ্রাম আছে, সেখানে কারুর বাড়িতে আমি কাপড় শুকিয়ে নিতে পারব।

আমি সেই-রাত্রে আবার চলতে লাগলুম। চাঁদ তখন একেবারে ডুবে গেছে ; গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অনেকখানি হেঁটে তবে গ্রাম দেখতে পেলুম। সমস্ত বাড়ি বন্ধ। এমন অন্ধকার যে বাড়িগুলো নজরেই পড়ে না। কেবল একজন কামার তখনো জেগে ছিল। আমি তার বাড়ির কাছে পৌঁছে, সিঁড়ির ধাপ দুটো উঠে গেলুম—ভাবলুম ঐখানে একটু জিরিয়ে নেব। সেই কামার দেখলুম একটা প্রকাণ্ড লোহার বাট গন-গনে কয়লার আগুনে তাতাতে দিয়েছে। হাপরের সঙ্গে তার হাত যখন খাড়া হয়ে উঠছিল, তাকে দেখাচ্ছিল যেন একটা দৈত্য ! তারপর হাপর যতবার নেমে আসছিল তত-বারই ফট্‌ফট্‌-শব্দে আগুনের ফুল্‌কি চার-দিকে ছিটিয়ে পড়ছিল। তারই আবছায়া আলোয় ঘরের দেয়ালটা থেকে-থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তাইতে দেখতে পাচ্ছিলুম সেই দেয়ালের গায়ে কাস্তে, করাৎ ও নানারকমের ছোরা ছুরি ঝুলছে। লোকটার কপালটা কুঁচকে রয়েছে ; সে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে আছে। আমি ভয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না ; চুপি-চুপি পালিয়ে গেলুম।

যখন ভোরের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে এল তখন বুঝতে পারলুম সহর আর বেশী দূর নয়। মারি এমের সঙ্গে যে-সব জায়গায় বেড়াতে আসতুম সেগুলো চিন্‌তে পারলুম। আমি তখন খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিলুম—কোনো-রকমে পাদুখানাকে টেনে নিয়ে চলেছিলুম,—এমনি পায়ে ব্যথা হয়ে-ছিল। আমি তখন ভয়ানক শ্রান্ত ;—রাস্তার দুধারে যে পাথরের ডাঁই তার উপর গিয়ে একেবারে থুবড়ি-খেয়ে বসে পড়বনা—এইটুকু মনের জোর ছাড়া আর-কিছুর শক্তি তখন ছিল না।

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে একখানা গাড়ি ছুটে-আসার ঘড়ঘড় শব্দে আমি ফিরে চাইলুম। একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

গেলুম,—বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। সেই লাল ঘোড়া আর চাষার সেই কালো দাড়ি দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম। সে একেবারে আমার গা-ঘেঁসে এসে ঘোড়া থামালে; গাড়ি থেকে হেঁট হয়ে আমার কোমরবন্ধ ধরে চট্-করে আমায় তুলে নিয়ে তার পাশে বসালে এবং গাড়ির মুখ ফিরিয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। বনের মধ্যে এসে পড়তে তবে সিল্‌ভাঁ ঘোড়ার বেগ কমিয়ে আনলে। তখন আমার দিকে ফিরে চেয়ে বল্লে—"ভাগ্যিস্ আমি তোমায় দেখতে পেলুম, নইলে দুই পাহারাওলা দুইধারে ঘিরে তোমায় ধরে নিয়ে আসত।" আমি কোনো উত্তর করলুম না দেখে সে আবার বল্লে—"যে-সব ছোটো মেয়েরা পালায় তাদের ধরবার জন্যে পাহারাওলা আছে—জান!" আমি বল্লুম—"আমি মারি এমেকে দেখতে যাব।" সে বল্লে—"কেন, আমাদের কাছে থাকতে কি তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে?" আমি বল্লুম—"আমি মারি এমের কাছে যাবো।" সে এমনি করে চেয়ে রইল যেন আমার কথা বুঝতে পারলে না; নানা-রকম প্রশ্ন করতে লাগল; তার পর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গোলাবাড়ির প্রত্যেক লোকের নাম করে-করে আমায় জিজ্ঞাসা করলে যে, সবাই আমায় ভালোবাসে কিনা। আমি বারবার সেই একই কথা বলতে লাগলুম—"মারি এমের কাছে যাবো!" অবশেষে তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল, সে সোজা হয়ে বসে বল্লে—"কি একগুঁয়ে মেয়ে!" আমি তার মুখের উপর বল্লুম—"মারি এমের কাছে না নিয়ে গেলে আমি আবার পালিয়ে আসব।" উত্তরের অপেক্ষায় আমি তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম; স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সে কি উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছে না। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল, খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর আমার গায়ে হাত দিয়ে বল্লে—"লক্ষীটি, স্থির হয়ে শোনো আমি কি বলি।" বলে সে যা বল্লে তাতে এই বুঝলুম যে, আমার আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে তার কাছে-কাছে রাখবে বলে সে কথা দিয়েছে;—তার মধ্যে আমার একদম সহরে যাবার যো নেই। আরো বুঝলুম যে, গুরু-মা আমাকে নিয়ে যা-খুসি করতে পারেন; আমি যদি ফের পালিয়ে আসি তাহলে আমাকে চাবি-বন্ধ রাখবার ব্যবস্থা হবে। চাষা বল্লে, আমি ছেলেবেলায় যে আশ্রমে ছিলুম তার কথা যেন ভুলে যাই; এখন তার প্রতি এবং তার স্ত্রীর প্রতিই যেন আমার সমস্ত অনুরাগ গিয়ে পড়ে—কারণ আমি যাতে সুখী হই তাদের সেই কামনা। আমার কান্না পেতে লাগল—অনেক কষ্টে সে কান্না চেপে রাখলুম। চাষা আমার হাত ধরে বল্লে—"চল, মনে কোনো দুঃখ রেখো না। আমাদের তুমি আপনার বলে ভেবো;—কি বল?" আমি তার হাতের উপর হাত রাখলুম, সে আমার হাতখানাকে জোরে চেপে ধরলে। আমি বল্লুম,—"আমি ত পর ভাবচি না।" চাষা অমনি ফটাস্ করে চাবুকের এক শব্দ করলে। অবিলম্বে আমরা বন পেরিয়ে গেলুম। তখনও বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু খুব পাতলা—কুয়াশার মতো। ক্ষেতগুলো সব খাঁ-খাঁ করছে

—জনমানব নেই! খানিকদূর যেতে দেখলুম রাস্তার পাশে একটা ক্ষেতে একটা লোক আমাদের দিকে হাত-নাড়তে-নাড়তে আসচে। প্রথমটা আমার মনে হল সে যেন আমাকে ভয় দেখাচ্চে, তারপর সে যখন খুব কাছে এল দেখলুম বাঁ-হাতে তার কি রয়েছে, আর ডান-হাতটা কেবল উঠছে আর পড়ছে—যেন কাস্তে চালাচ্চে। আমি হতভম্ব হয়ে সিল্‌ভ্যাঁর মুখের দিকে চাইলুম। যেন একটা প্রশ্নের জবাব দিচ্চে এই ভাবে সে বল্লে—"ও বীজ বুনচে।" কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা গোলাবাড়িতে এসে পৌছুলুম। চাষার স্ত্রী আমাদের অপেক্ষায় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে তার মুখের হাঁ সে খুল্লে—যেন অনেকক্ষণ সে নিশ্বাস নেয় নি; তার সেই গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ মুহূর্ত্তের জন্য একবার নিরুদ্বিগ্ন হল। আমি তার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে আমার সেই লম্বা জামাটা নিয়ে একেবারে খোঁয়াড়ের দিকে দৌড়ুলুম। ভেড়াগুলো একটার ঘাড়ে একটা পড়তে-পড়তে হুহু করে বেরিয়ে এল। তাদের মাঠে যাবার সময় তখন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিভাষণ না অতিভাষণ?

[১]

সম্প্রতি বাংলা দেশের খেতাবী রাজা মহারাজেরা একটু-আধটু কেতাবী কস্‌রৎ সুরু করেছেন। এ খুবই আহ্লাদের কথা। বর্ত্তমান যুগে কুলি-মজুরেরাও যখন আত্মপ্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, তখন হুজুরেরা যে হবেন তার আর বিচিত্র কি? আর লিখ্‌তে-লিখ্‌তেই তো সরে, অতএব লিখে যান্, ক্রমে চাই কি, পড়ার যোগ্য লেখাও হয়তো একদিন লিখ্‌তে পার্‌বেন। এখন নেবে পড়েছেন ভালোই করেছেন; —জলে না নাব্‌লে কি কখনো সাঁতার শেখা যায়? অবশ্য এতে-ক'রে এখনকার লেখা সম্বন্ধে গুরু-স্থানীয়দের একটু বিপদ আছে। যাঁরা নব্য বঙ্গকে কলম ধরতে শিখিয়েছেন, আনাড়িদের হাতে তাঁদের একটু-আধটু কলমের খোঁচা সহ্য করতে হবে। তা' যাঁরা সাঁতার শিখিয়ে থাকেন, তাঁদেরও এই দশা;—আনাড়ি সাক্‌রেদের বে-কায়দা রকমের অঙ্গবিক্ষেপে চোট-খাওয়া তাঁদের অঙ্গের ভূষণ। হাত-পা-ছোড়া যখন সাঁতারের অঙ্গ, আর ওস্তাদকেও যখন সঙ্গে-সঙ্গেই থাক্‌তে হয়, তখন সময়-বিশেষে হাতটা পাটা গায়ে এসে লাগ্‌লে—এমন কি জোরে লাগলেও—আনাড়ি বলে মাপ করতে হয়,—রাগ করতে নেই। তবে সাক্‌রেদ যদি নেহাৎ বে-আদব হয় অর্থাৎ গুরু-মারা বিদ্যে জাহির করে তবে ডুবিয়ে না মারা হোক, এক-আধ্‌বার চুবিয়ে ধরা মন্দ নয়।

গ্যালো-ব'শেখের 'সাহিত্য-সংহিতায়' কাশিম বাজারের খেতাবী মহারাজের স্বাক্ষরে বে-কায়দা চিত্ত-বিক্ষেপের একটি অপূর্ব্ব নমুনা ছাপা হয়েছে। রচনাটির নাম "সভাপতির অভিভাষণ"। তা' না হয়ে আনাড়ির অতিভাষণ হলেই ঠিক হত। কারণ এ-লেখায় প্রবীণ কাশিমবাজারের চিন্তাশক্তির বা রসবোধের কোনো পরিচয়ই নেই;—থাকবার মধ্যে আছে শুধু অনভ্যাসের হাঁসফাঁসানি আর অকারণ উষ্মার কস্‌কসানি। তাঁর এই অতিভাষণ পড়লে খালি এই কথাটাই আগে মনে হয় যে, তাঁর হরিনাম কীর্ত্তন করবার এখনো অধিকার হয় নি; তিনি বছর-বছর মচ্ছব দিয়ে মিথ্যে টাকা খরচ করচেন,—তিনি অমানীও নন্, মানদও নন্। তরুর সহিষ্ণুতা তাঁর নেই, তৃণের বিনয়ও না। অন্ততো এই অতিভাষণ যদি তাঁর নিজের লেখা হয়, তবে রচনায় রচয়িতার যে মনের ফোটো উঠেছে তা মোটেই বৈষ্ণবের ছবি বলে কারো ভ্রম হবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নেই।

[২]

মহারাজের উষ্মার প্রথম চোট্‌টা পড়েছে কল্‌কেতার একদল লেখকের উপর। এই লেখকেরা অকথ্য ভাষা ত্যাগ ক'রে কথ্য ভাষায় বই লিখ্‌তে সুরু করেছেন—এই তাঁদের অপরাধ! তাঁদের ভাষা চল্‌তি ভাষা,—অচল নয়। যা আপনার তেজে চল্‌ছে এবং কোটি কোটি লোককে চালাচ্চে সেই চল্‌তি ভাষা। যে ভাষা পরমহংসের মানস-যজ্ঞের চরু ঘরে-ঘরে বিতরণ করছে, যে ভাষা বিবেকানন্দের বীরবাণী শমীশাখার মতন আপনার বুকে অনায়াসে ধারণ করতে পেরেছে, যে ভাষা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে পারিজাতের ফুল ফুটিয়ে বিশ্ব-দেবতার চরণ-বন্দনা করেছে, এ সেই চল্‌তি ভাষা। এই ভাষায় গিরিশচন্দ্রপ্রমুখ নাট্যকারেরা শত-শত নাটক রচনা করেছেন, আর সেই সকল নাটক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর বঙ্গের জেলায়-জেলায় নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে আজ অভিনয় হচ্চে; কই কারো তো বুঝতে অসুবিধা হচ্চে না; বেশ মশ্‌গুল্ হয়েই সব শুন্‌ছে। এ ভাষা হাসতে জানে, হাসাতে জানে, তার সাক্ষী "হুতোম," তার সাক্ষী "বুড়োশালিক," তার সাক্ষী "সধবার একাদশী"। এ ভাষা রং ফলাতে জানে, তার সাক্ষী "রাজকাহিনী" "ক্ষীরের পুতুল" "নালক"। এ ভাষা মন-গলাতে জানে, তার সাক্ষী একদিকে "ভাঙা বাগান জোগান দেওয়া ভার" অন্যদিকে "মন হারালি কাজের গোড়া" "নাম রেখেছি হরিবোলা"। এ ভাষা মাতাতে জানে, তার সাক্ষী "পরিব্রাজক" "ভাববার কথা"। ঐ ভাষা ভাবাতে জানে, তার সাক্ষী সতেরো মহল "শান্তিনিকেতন"। অন্দরে এ "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" শোনায়, বাইরে এ "হিমালয়ের" দুর্গম পথে সেথোর কাজ করে। "ঘরে-বাইরে" এই চল্‌তি ভাষার সমান প্রতিপত্তি।

দক্ষিণ-দেশী এই মধুর ভাষা দক্ষিণে হাওয়ার মতন বাংলা সাহিত্যের কুঞ্জে কুঞ্জে কুঁড়ি ধরিয়েছে, ফুল ফুটিয়েছে। দর্শনের গভীর তত্ত্বকে এ সরস করেছে, শিল্পের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এ পরিষ্কার ক'রে প্রকাশ করেছে। গানে, কবিতায়, নাটকে,

গল্পে, নক্সায়, উপন্যাসে এর ক্ষমতার তুলনা নেই। দক্ষিণ-বাংলার এই চল্‌তি ভাষা—একে প্রাকৃত বলে নাক-সেঁট্‌কালে চল্‌বে না—এ মধুর, এর মনোহরণের ক্ষমতা আছে; এ উদার, এর গ্রহণ করবার শক্তি আছে, আপনার ক'রে নেবার সামর্থ্য আছে। এ বাঙালীর শিক্ষা-সাধনের কেন্দ্রের ভাষা, এ বাংলাদেশের রাজধানীর ভাষা। প্রাকৃত হলেও, এ আমাদের একাধারে সৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্রী। এ আবার গানেরও ভাষা, সুতরাং মাগধীও বটে। বাংলার অন্য বিভাগে যদি তেমন-কোনো গুণাঢ্য জন্মগ্রহণ করেন তবে বঙ্গীয় পৈশাচীটাও না-হয় আমরা মেনে নেব। নৈলে শুধু বৃহৎকথার সমষ্টিতে যে পৈশাচী তৈরী হচ্ছে, সেটাকে দীর্ঘকর্ণ ভিন্ন কেউ বেশী দিন কানে তুল্‌বে না। পূর্ব্ব বা উত্তর বঙ্গে কোনো কালে যদি মিস্ত্রাল্‌ বা রবার্ট বার্ণসের মতন কবির উদয় হয়, তবে আমরা সাগ্রহে আমাদের গ্রেট-বেঙ্গলের পাড়াগেঁয়ে প্রভেন্সাল্‌ বা খচমচ স্কচ্‌ ভাষাটাও আয়ত্ত ক'রে নেব।

তারপর বাংলার মুসলমানদের কথা। এঁদের দিল্লীওয়ালা মুরুব্বিরা যখন হাফিজ সাদির ভাষাকে তালাক্‌ দিয়ে সুবিধার খাতিরে বাজারে' উর্দ্দু ভাষাকে আমল দিয়েছেন, তখন এঁদের কাছে "হইতেছে" বা "হবার লাগ্‌ছে" প্রভৃতি দিগ্‌গজ লম্বা কথার বদলে "হচ্চে" লেখাটা সুবিধার হিসাবেই গ্রাহ্য হবে।

ভাষার গতি পাহাড়ে' -নদীর মতন। নদী যেমন পৈঠায় পৈঠায় নাব্‌তে থাকে এবং স্তরে স্তরে নূতন ক'রে ঢেউয়ের লীলা দেখিয়ে চলে, ভাষাও তেম্‌নি যুগে-যুগে চেহারা বদ্‌লে নূতন-নূতন সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চল্‌তে থাকে। কেতাবের যে অচল-ঠাট পিছনে বরফ হ'য়ে জমাট হ'য়ে আছে, সেখান থেকেও ওকে খোরাক সংগ্রহ করতে হয় সত্য বটে কিন্তু ওর প্রধান অবলম্বন হচ্চে মেঘের জন্মদাতা সমুদ্র;—সকলের নীচে যার জায়গা, চঞ্চলতা যার প্রধান লক্ষণ সেই লক্ষ জিহ্বার স্পন্দনে ওতঃ-প্রোত প্রাকৃতজনের ভাষা। আদিতেও সে, অন্তেও সেই।

ভাষার পরিবর্ত্তন হচ্ছে, এ সবাই জানে; নইলে বেদের ভাষা শ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত না-হ'য়ে আজো জ্যান্ত মানুষের মুখে-মুখে উক্তিই থেকে যেত। এ পরিবর্ত্তন একেবারে নিঃশব্দে হয় না। পুরোনো বঙ্গদর্শনের ফাইল উল্টে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় বিদ্যাসাগরী ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রী দল কি-রকম বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ ক'রে গেছেন। ঐ অস্ত্র-প্রয়োগের ফলে "হইবেক" "করিবেক" প্রভৃতির রেড়ো ক-কারটা দুচার-দিন ককিয়ে শেষে খসে গেল; কল্‌কেতারই জয়জয়কার। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রী ভাষাকে আরও সহজ করেছেন ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি;—তাঁরা বাংলা সংবাদপত্র জিনিসটা চালাতে গিয়ে দেখ্‌লেন যে, ও বস্তু জনসাধারণের বোধগম্য করতে হ'লে বিদ্যাসাগরী এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্রীতেও চল্‌বে না। সুতরাং পাঁচজনের মুখ-চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রী পঞ্চানন্দীতে পরিণত হ'ল। কাজেই দেখা যাচ্ছে "অশিক্ষিতদের বোঝাবার চেষ্টা একটি

ভান মাত্র” নয়। এই-রকমে বছর-পঞ্চাশের ভিতর আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী বার-পাঁচ-সাত ভোল্ বদ্‌লেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে যাঁরা এই সমস্ত অদল-বদল করেছেন তাঁরা কেউ অবিচ্ছিন্ন "উর্দ্ধগতির টানে” হ্যাঁচ্‌কা-হেঁচ্‌কি ক'রে ভাষার প্রাণ-ওষ্ঠাগত ক'রে তোলেন নি; "আদর্শে উপস্থিত” (!) হবার জন্যে অর্থাৎ ফিরি-ফিরৃতি মেঘে পরিণত করবার জন্যে গেলাস ভরা পিপাসার জল তাতিয়ে-তাতিয়ে বাষ্প ক'রে উড়িয়ে ছ্যাননি। "বঙ্গদর্শন” “সাধনা” ও “সবুজপত্র” ভাষাকে ক্রমে সহজ করে এনেছে সত্য, কিন্তু তাই বলে ও-ব্যাপারটা ঐ সব কাগজের সম্পাদকদের “ভাষা ও ভাব দৈন্যের সূচক” একেবারেই নয়। কথাটা বুঝ্‌তে হ'লে একটু বুদ্ধি খরচ করা দরকার,—অবশ্য থাক্‌লে; নইলে পঞ্জিকার “অমুক রাশির জমা শূন্য, খরচ তিন”-এর মতন অবস্থায় পড়লে গা-ঢাকা হওয়াই মঙ্গল। কাগজ-পত্রে ফাজিল দেখানোটা মোটেই সুবিধা নয়।

[৩]

খেতাবী মহারাজের উষ্মার দ্বিতীয় চোট্ নবীনসম্প্রদায়ের নব্যভাবের উপরে। “স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ * * * তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে।” রবীন্দ্রনাথের একখানি উপন্যাসের চরিত্রবিশেষের এই উক্তি পড়েই ধীরোদাত্ত-গুণান্বিত মহারাজের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। তিনি বল্‌ছেন এতে না কি পতিভক্তির অত্যুন্নত (!) আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে এবং এ অপরাধের নাকি মার্জ্জনা নেই। মহারাজের শ্রীমুখের রায় যদি সত্য হয়, তাহ'লে বৈষ্ণব-কবি জয়দেবেরও মার্জ্জনা নেই; কারণ তিনি “দেহিপদপল্লবমুদারং” লিখে—(১) পতিভক্তির অত্যুন্নত অশ্বডিম্বকে পদাঘাতে চূর্ণ করেছেন, (২) পতিভক্তির উল্টো পত্নীভক্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন (৩) পুরুষোত্তমকে দিয়ে নারীর পায়ে ধরিয়েছেন, (৪) ভগবানকে মানুষের অধম প্রতিপন্ন করেছেন; কারণ মনু-শাসিত সনাতনধর্ম্মী মানুষ স্ত্রীর কাছে পূজো দাবী ক'রে থাকে, আর জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে স্ত্রীর (?) পাদপদ্ম মাথায় করিয়েছেন। বহরমপুরী এই রায় বাহাল হ'লে দেশের শাক্ত, বৈষ্ণব কেউ আর রেয়াৎ পাবে না, কারণ শাক্তের যিনি ইষ্টদেবী তিনি পতির বুকে পা রেখেচেন, আর বৈষ্ণবের জপের মন্ত্রে আগে রাধা, তার পরে কৃষ্ণ। বৈষ্ণবশাস্ত্র বল্‌ছেন এর উল্টো বল্লে না কি ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বৈষ্ণব মহারাজের রায়-অনুসারে সুতরাং বৈষ্ণব শাস্ত্রও রসাতলে গেল। মহারাজের উক্তি মেনে নিলে দেশের শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবের শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব-কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ পদে আছেন। কারণ তিনি Sadism বা Masochism দুয়ের একটাকেও প্রশ্রয় ছ্যান্‌নি; স্ত্রী-পুরুষের সমান প্রেমের সম্বন্ধই ঘোষণা করেছেন। মানুষের অন্তরবৃত্তির যা শ্রদ্ধেয়, যা স্থায়ী, যা রুচি ও ন্যায়সঙ্গত তারই জয়গান করেছেন। স্ত্রী বা পুরুষ কারো মর্য্যাদা খাটো করেন নি। এই ত কবির যথার্থ কাজ।

[৪]

এইতো গেল নব্যতন্ত্রের লেখকদের ভাষা আর ভাব সম্বন্ধে। এরপর রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" সম্বন্ধে সাহিত্য-সভার বর্ত্তমান অতিভাষণকারী যা' বলেছেন তাতে মনে হয় তাঁর পক্ষে উক্ত কেতাব পড়া অন্ধের পক্ষে হস্তীদর্শনের ন্যায় হয়েছে। কারণ সমগ্র বইখানির যা তাৎপর্য্য তা তিনি ধরতে পারেন নি ;—বুঝেছেন উল্টো। উল্টে নিজের বুদ্ধির দোষ লেখকের ঘাড়ে চাপিয়ে বেশ-একহাত মাতব্বরী ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ রকম ক'রে খণ্ডভাবে দেখ্‌লে রাম লক্ষ্মণ থেকে আরম্ভ ক'রে সকল চরিত্রই যে মলিন—সকল কাব্যই যে হেয়, তা প্রতিপন্ন করা যায়। ধরুন যেমন রামায়ণে রামের অভিষেকের দিন হঠাৎ বনবাসের হুকুম শুনে লক্ষ্মণ বল্‌ছেন—

"প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকেয্যা
স হুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃশঙ্কং
বধ্যতাম্ বধ্যতামিতি ॥"

আরও দেখুন—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য
কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য
কার্য্যং ভবতি শাসনম্ ॥"

এই দুটি শ্লোক পড়ে কী বল্‌তে হবে? বাল্মীকি হিন্দু-সমাজকে গুরুজনের কান-মলে দিতে বল্‌ছেন? না পিতৃহত্যা করতে শেখাচ্ছেন?

আসল কথা, হুনর না থাক্‌লে জহরতের দালালি করতে নেই, খামকা ফোঁপর-দালালি করতে গেলে ফাঁপরে পড়তে হয়। সাহিত্য কাকে বলে আগে সে জ্ঞানটুকু অর্জ্জন ক'রে সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে হয়।

সাহিত্য গুরুঠাকুরের তল্পীদার নয়, গ্রাম্য পঞ্চায়তের চৌকীদারও নয়। সমাজের বন্ধন কিসে অক্ষয় হবে বা দারোগার শাসন কিসে অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে—এসব কথা সাহিত্য ভুলেও ভাবতে যায় না; হৃদয়ের বন্ধন পাছে শিথিল হয়ে যায়, শুধু এই ভাবনায় তার চোখে ঘুম নেই। আদি-রস তার আস্থায়ী, শান্ত-রস তার আভোগ, বাৎসল্যে সে গদ্গদ, করুণায় সে আর্দ্র, রস-স্বরূপের সে প্রতিবিম্ব, রসসমুদ্রের সহস্রদল পদ্ম।

সাহিত্য সেই—"বহুরে যে করে এক, বিচিত্রেরে করে যে সরস।" সাহিত্য সেই যা বন্ধুভাবে মানুষের সঙ্গে রসালাপ করে। পাড়ার ডাংপিটে ছেলেটার সম্বন্ধে সে সব-সময়ে যে মন্দ বলে তা নয়, পুঁটলি-হস্ত পুরুতঠাকুরেরও সে সব-সময়ে মর্য্যাদা রেখে কথা কয় না। সাহিত্য ধ্রুবপদের ধ্রুবলোক নয়, খেয়ালের রং-মহল। কালকেতুর স্রষ্টা তাকে যেমনটি গড়তে চেয়েছেন সে তাই হয়েছে, কীচকের কবি কীচককে যেমনটি করেছেন সে তেমনি হয়েই আছে। সন্দীপের বিধাতা কালকেতুও গড়তে চান্‌নি, কীচকও আঁকতে চান্‌নি, তাই সন্দীপ কালকেতুও হয়নি, কীচকও হয়নি, সন্দীপ সন্দীপই হয়েছে। সেইজন্যে সাহিত্যে তার জায়গা আছে, নইলে সে কালকেতু হ'লে তাকে ফেলে দিতুম, কীচক হ'লেও

রাখতুম্ না। কারণ সাহিত্যের নোয়ার আর্কে (Noah's ark) একজাতের প্রাণী বা একই রকম জিনিষ একাধিক রাখবার জায়গা নেই।

এ সমস্তই সাহিত্যের গোড়াকার কথা, এ সমস্ত যাঁরা জানেন না তাঁদের পক্ষে সাহিত্য আলোচনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, আর সমালোচনার আসরে তাল-ঠোকা ধৃষ্টতা। সাহিত্য-পরিষদের জন্যে ইঁটের পাঁজাই পোড়ান আর রসিক বৈষ্ণবদের মাল্‌পোই খাওয়ান, বিধাতা যাঁদের রসবোধ দ্যান্‌নি হাজার চেষ্টাতেও রসিক-সমাজে তাঁদের জায়গা হবে না। তাই কবি বলেছেন—

"জড়মতি কি করিবে করি অধ্যয়ন ?
কলপ মাখিলে বুড়া পায় কি যৌবন ?"

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন

মাসকাবারী

হাসির গান

আষাঢ় মাসের "সবুজপত্রে" শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী-মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান লইয়া একটি উপভোগ্য ও মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদেরও বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিশেষত্ব তাঁহার হাসির গানেই বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় গম্ভীর সমালোচকেরা তাঁহার সে-দিকটায় তেমন করিয়া দৃষ্টি দেন না—বোধ হয় তাঁহারা ভাবেন ও-কেবল হাসি-ঠাট্টা! এই হাসির মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিয়া চৌধুরী-মহাশয় ভাল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ—

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার উজ্জ্বল আলো, "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি"র বাইরেও পড়েছে। তাঁর "দেশাত্মবোধে"র প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁর হাসির গানের ভিতরেই পাওয়া যায়। আমাদের নব শিক্ষার আলোকে, প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান ইউরোপের তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান হীনতাই প্রথমে নজরে পড়ে। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার নাম দেশপ্রীতি—দেশভক্তি নয়। যেখানেই প্রীতি আছে, সেখানে প্রিয় ব্যক্তির শুভকামনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা যাকে ভালবাসি, তাকে আমরা দেহে, মনে, চরিত্রে, সবল সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে চাই। এবং এর জন্য তার দোষ দেখিয়ে দিতে আমরা কুণ্ঠিত হইনে, তাকে ব্যথা দিতেও ভয় পাইনে। বিদ্রূপের হাসি সাহিত্য-জগৎকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গানের প্রাণ হচ্ছে এই বিদ্রূপের হাসি। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জাতীয় দৈন্য এত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর হাসি কান্নারই রূপান্তর-মাত্র। দুই উপায়ে আত্মজ্ঞান উদ্রেক করা যেতে পারে—এক যুক্তিতর্কের সাহায্যে, আর

এক বিদ্রূপের দ্বারা। যিনি আমাদের মনের উপর জ্ঞানের আলো ফেলেন, তাঁর উপরেও আমাদের রাগ হয়,—আর যিনি হাসির আলো ফেলেন, তাঁর উপরে তার চাইতেও ঢের বেশী রাগ হয়, কেননা হাসির অন্তরে যে দাহিকাশক্তি আছে জ্ঞানের অন্তরে তা নেই। এ জাতীয় লেখকদের সমাজ প্রথমে শত্রু বলেই জ্ঞান করে। কেননা তাঁরাই যে সমাজের যথার্থ বন্ধু—সে সত্য আবিষ্কার করতে সময় লাগে। সুতরাং যে সমাজ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সে সমাজের নিকট দ্বিজেন্দ্রলাল যে শুধু বাহবা ও করতালি লাভ করেছিলেন, এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তারপর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও কবিতা, কাব্য বলে গ্রাহ্য করবার অনেক বাধা ছিল। তাঁর ভাষা যেমন অপূর্ব্ব, তাঁর ছন্দবন্ধও তেমনি অপূর্ব্ব। রচনার যে ভঙ্গীটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নয়, যে ধরণের কথা আমাদের শোনা অভ্যেস নেই, তা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের কানে বিসদৃশ লাগে। এত বাধাবিপত্তিসত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের গান বাঙ্গালী-সমাজের কাছে যে এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার একমাত্র কারণ তাতে রস ছিল। শাস্ত্রমতে হাস্যরসও রস।

* * *

পাঠোন্মত্ততা

দেখা যায় এদেশে লেখক ও পাঠকদের ভিতরে এমন একদল লোক আছেন, যাঁহাদের পড়িবার বাতিক বড়ই বিষম। পড়াশুনা করা কিছু মন্দকথা নয়—কিন্তু "গ্রন্থকীটে" পরিণত হইলে উল্টা-বিপত্তির খুবই সম্ভাবনা। এ-শ্রেণীর পাঠোন্মত্ত লোকদের জন্য সহযোগী "বিজ্ঞান" বেশ-একটি মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পাঠোন্মত্ততা যতক্ষণ পাঠকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ আমাদের ভয়ের ততটা কারণ থাকে না; কিন্তু যখন তাঁহারা লেখকরূপে আবির্ভূত হন তখনই আমরা মুস্কিলে পড়ি। কারণ তাঁহারা যে-সব রচনা সাহিত্যের দরবারে আনিয়া হাজির করেন তাহাতে অনেক-বই-পড়া পাণ্ডিত্যের খোসা পাওয়া যায় কিন্তু শাঁস মেলে না; তাহাতে দেখা যায় কেবল ভাবের বন্যা চাপাইয়া মানুষের ঘাড় ভাঙ্গিবার উদ্যোগ হইয়াছে—ঘাড়ের উপর যে মাথাটি আছে তার প্রতি লক্ষ্যই নাই। বঙ্গদেশের এই-সব গ্রন্থ-পেটুক অজীর্ণ রোগগ্রস্ত জবস্থব সাহিত্যিকেরা সুচিকিৎসার গুণে আরোগ্য লাভ করিলে আমরা রক্ষা পাইব—এই আশায় আশান্বিত হইয়া ঐ মুষ্টিযোগের সারাংশ এত আগ্রহের সহিত উদ্ধৃত করিলাম:—

"যেরূপ অত্যধিক ভোজনে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় না, সেইরূপ অত্যধিক অধ্যয়নে মনের পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না। অত্যধিক পাঠের ভয়ঙ্কর দোষ এই যে অধীত বিষয়গুলি মস্তিষ্ককে অত্যন্ত গোলমাল করিয়া দেয়, ফলে অধ্যয়ন না করিলে যে ফল হইত, অধ্যয়ন করিয়াও সেই ফল হয়;—অর্থাৎ অত্যধিক অধ্যয়নে মানব অন্তঃসারশূন্য হয়। যাহারা অত্যন্ত পঠনপ্রিয়, তাহাদের পঠন একটা নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়, তাহারা

সমস্তই পাঠ করে, সেগুলি বুঝুক আর নাই বুঝুক, যাহা সে বুঝিয়াছে, তাহা মনে থাকুক আর নাই থাকুক। বৈজ্ঞানিক-ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এইরূপ পাঠোন্মত্ততা একরূপ আলস্যবিশেষ। ইহাতে পাঠকদের বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তই গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। তাঁহাদের নিজেদের বিচার করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং শুকবৎ অধীত বিষয় উচ্চারণ করেন। চিকিৎসকগণ বলেন এরূপ পঠনের দোষ অনেক—স্নায়ুকেন্দ্র অসুস্থ হয়, স্মৃতিশক্তি ক্ষয়িত হয়, চিন্তাপ্রণালী বিশৃঙ্খলিত হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর পাঠকেরা পরের চিন্তায় বাস করে, অথবা পরের আদর্শের ক্রীতদাসস্বরূপ হইয়া জীবন যাপন করে।"

*
* *

সাহিত্য ও ভাষা-সমস্যা

জ্যৈষ্ঠের 'নব্যভারতে' শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন দাস নামক জনৈক লেখক "সাহিত্য ও ভাষা-সমস্যা" নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের মাসিক-সাহিত্যক্ষেত্রে যে কতটা বেওকুবি ও বেয়াদবির আবাদ হইতেছে, তাহারই দৃষ্টান্তরূপে এই লেখাটির একটুখানি তুলিয়া দিলাম :—

"রবীন্দ্রনাথের নভেলপাঠে অনেক সংসারে আজ বিধবা বিনোদিনীর ন্যায় অনেক চোখের বালির সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালীর এতাদৃশ অধঃপতনের কারণ কি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ নহেন? এইজন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকেই অধিক দোষী এবং দায়ী মনে করি। বাঙ্গালার একমাত্র দীনেশবাবুই (শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন?) গল্প-রচনার আদর্শ রক্ষা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন (!)"

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ভাল-মন্দ দু-রকম স্বভাবের ছবি আঁকিয়াছেন; কিন্তু মক্ষিকারা যে মধু ফেলিয়া ব্রণের দিকে ছুটে,—তার উপরে তাঁদের ত কোন হাত নাই! সু ও কু'র দ্বন্দ্ব লইয়াই বিশ্বসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে,—এ-দুটির একটিকে বাদ দিলে অন্যটির সার্থকতা থাকে না। রাবণ না থাকিলে রাম, দুর্য্যোধন না থাকিলে যুধিষ্ঠির ফুটিবার অবকাশ পাইতেন না। এখানে কেউ যদি রাবণ বা দুর্য্যোধনের কার্য্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করে, তবে সেজন্য কেহ কি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইবেন? বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কলম ধরিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী-সমাজের স্ত্রীপুরুষ আদর্শ-চরিত্র ছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। তারপর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে মহৎ চরিত্রেরও অসদ্ভাব নাই। যে যুক্তিবলে বাঙ্গালী-সমাজে হীনতা প্রবেশ করিতেছে বলা হইয়াছে, সেই যুক্তিবলেই সে-ক্ষেত্রে মহত্ত্ব অধিষ্ঠিত হইতেছে এ কথা বলা চলিবে না কেন? কিন্তু এ-সব কথা বলা মিছে;—কেননা যুক্তিতে আর-সবাইকে আঁটিয়া উঠিতে পারা গেলেও নির্ব্বোধকে বোঝ মানাইবে কে?

*
* *

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

১৩২০ সালের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করিয়া

তাঁহাকে 'ঋষি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে এতকাল পরে জনৈক লেখকের (তাঁহার নাম করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ বঙ্গসাহিত্যে তিনি অজ্ঞাতকুলশীল) দ্বিতীয় রিপু এমনি চাগিয়া উঠিয়াছে যে, জ্যৈষ্ঠের 'সাহিত্যে' তিনি রবীন্দ্রনাথকে মনের সাধে যা-ইচ্ছা-তাই গালি দিয়া হাল-ফ্যাসানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

কবিকে বহুস্থানে বহুবার ঋষি বলা হইয়াছে—এ কিছু নূতন নয়। এর জন্য কাহারও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিবার কারণ নাই। ঋষি সত্যদর্শী, এই সত্যদর্শনের পরিচয় যাঁহার মধ্যে পাওয়া যাইবে তিনিই ঋষি;—তিনি কবিই হোন, বৈজ্ঞানিকই হোন্ বা আর-কিছুই হোন্। প্রাচীন কালের ইতিহাসে, সাহিত্যে এই জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির ঋষির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এবং এই ঋষিরা যে মানুষ ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে তার প্রমাণ আছে। আমাদের সাধারণের একটা ধারণা, ঋষি বুঝি আমাদের মত হাত-পা-ওয়ালা মানুষ নন, তাঁহারা সুধু কল্পনার জীব, সেইজন্য কোন চাক্ষুষ ব্যক্তিকে ঋষি নাম দিলে তাঁহারা চমকাইয়া ওঠেন। এদিকে কিন্তু উপনিষদাদিতে সকল ঋষির আরাধ্য রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে কবি বলা হইয়াছে। সুতরাং ঋষিত্ব কবিত্বের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করা যায় না। সে ক্ষেত্রে কবিকে ঋষি বলিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না।

১৩০৭ সালের 'ভারতী'তে আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয় "ঋষিত্ব ও কবিত্ব" নামে যে সুন্দর ও বিখ্যাত প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, কাগজ কালি ও সময়ের অপচয় না-করিয়া প্রবন্ধ লেখক যদি সেটি একবার পড়িয়া দেখিতেন, তবে তাঁহারও চোখ ফুটিত এবং "সাহিত্যে"রও কয়েকখানি পাতা ঢাকা রাবিশে ভরিয়া উঠিত না। স্থানাভাবের জন্য আমরা এখানে আচার্য্য শিবনাথের দু-একটি সিদ্ধান্ত তুলিয়া দিলাম মাত্র;—সংশয়ীরা মূল-প্রবন্ধের যুক্তি পড়িয়া সন্দেহ-নিরসন করিতে পারেন:—

"সত্যের সাক্ষাৎকারটা বড় জিনিস। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বলা যায়। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম চিরদিনই ছিল, আজও রহিয়াছে, আর কেহ কখনও লক্ষ্য করে নাই, লক্ষ্য করিয়াছিলেন নিউটন, এজন্য তিনি একজন ঋষি। * * * সাক্ষাৎ দর্শন বিষয়ে ঋষি ও কবি—দুই সমান। তুমি আমি জগচ্ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনেক সময়ে আহা! আহা! করি, কেন আহা আহা করি, জানিনা, কবি দেখাইয়া দেন যে সকলের মূলে একটা বাঁধা-বাঁধি রহিয়াছে, একটা প্রেমের খেলা রহিয়াছে। ঋষির কার্য্যের ফলের ন্যায় কবির কার্য্যের ফলও উদ্দীপনা;—যে সৌন্দর্য্যবোধ তোমার আমার সকলের অন্তরে অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে থাকে, তাহা প্রকৃত কবির সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। * * * ঋষি ও কবি উভয়ের কার্য্য পরস্পরের এত সন্নিকট যে ঋষি একসময়ে কবি এবং কবি একসময়ে ঋষি।"

'সাহিত্যে'র লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করিয়া তাঁহার 'অ-ঋষিত্ব' প্রতিপন্ন করিবার জন্য সুধু প্রেমের কবিতা তুলিয়াছেন, কিন্তু 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতির দিকে তুলিয়াও ফিরিয়া চান নাই। কারণ সে দিকটা ভয়ের দিক—সেদিকে ফিরিয়া চাহিলে

লেখকের নিজের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য বলিতে হয়, এই-সব সমালোচকের উদ্দেশ্য, আলোচনা করা নয়,—সুধু গাল পাড়া। যাঁহাদের শক্তির অভাব, গালাগালিই তাঁহাদের সম্বল। সমালোচন-বিজ্ঞানের প্রথমভাগও যদি সাহিত্যের এই ভুঁইফোঁড় লেখকের পড়া থাকিত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আনাড়ির মতন এমন একবগ্‌গা আলোচনা করিতে পারিতেন না।

এই স্বয়ং-হাস্যাস্পদ লেখক আবার ঠাট্টার হুল ফুটাইতেও জানেন! ইনি আবার ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন "যদি কেহ রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় বিষয়-দর্শন ও তাঁহার 'অরূপের রূপ দেখা' কথার কথামাত্র বলেন, তবে রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহাকে অরসিক বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। তোমার বাঁধা গান শ্যামের ভাল লাগিল না বলিয়া বুঝিতে হইবে শ্যামেরই সুরবোধ নাই!"

লেখকের ঘটে যদি 'সিকিছটাক বুদ্ধিও' থাকিত, তবে বুঝিতে পারিতেন, এখানে যার-তার কথা হইতেছে না—কথা হইতেছে প্রতিভার অবতার রবীন্দ্রনাথের। প্রতিভার আলো যার কাছে অন্ধকার,—সেত অন্ধ বটেই! রাম-শ্যামের লেখা লোকের ভাল না-লাগিতেও পারে, কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি, মাইকেল, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চায়, তাহাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভদ্র বিশেষণ যদি-কিছু থাকে, তবে তাহা "অরসিক"।

পৃথিবী জুড়িয়া আজ যাঁহার নামে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে, যখন দেখি আপনার দেশবাসী চারিদিক হইতে তাঁহাকেই অপদস্থ করিবার ফিকিরে আছে, তখন সপেনহয়রের ভাষায় বলিতে হয়, বাঙ্গলাদেশের "Public has no sense for excellence." আর, সেইজন্যই তাহারা ভালো কাব্য বুঝিতে না পারিলেও, আপনাদের বুদ্ধিকে দোষ না দিয়া, দোষী করে কবিকেই!

*
* *
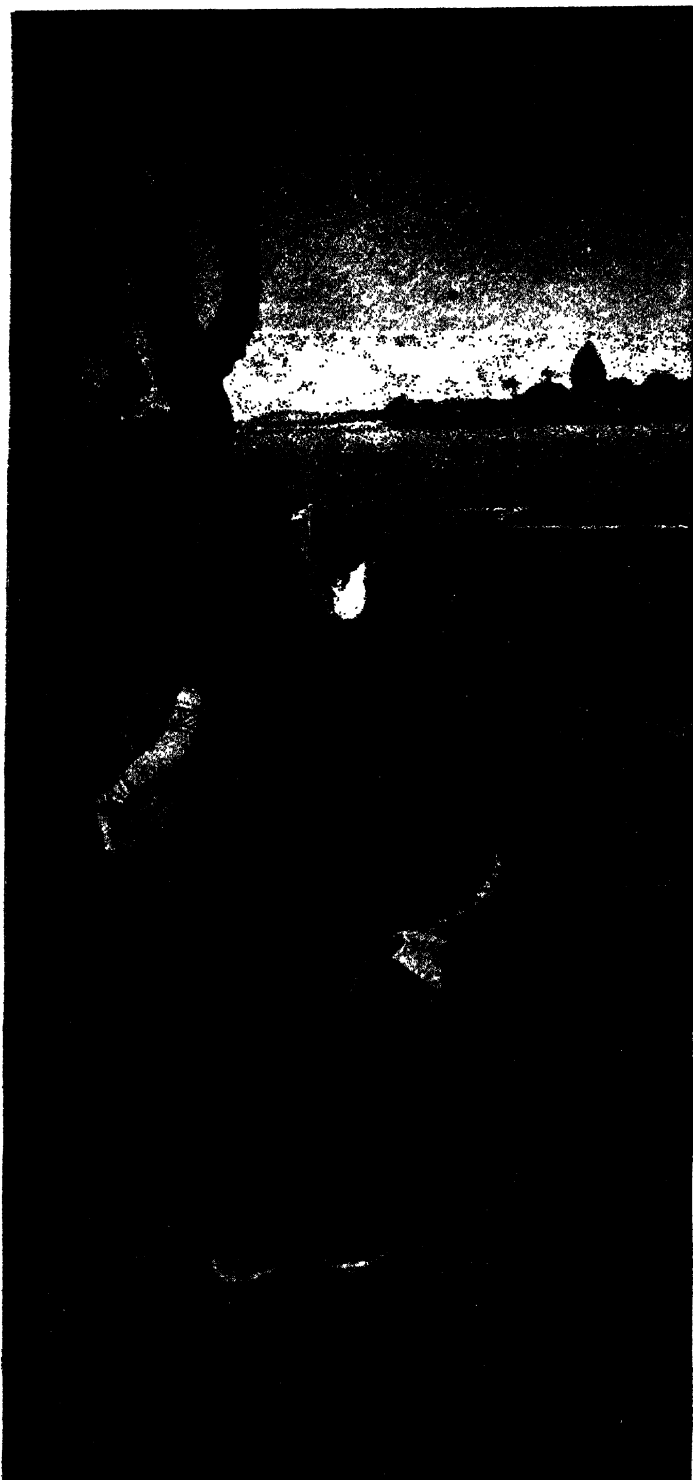
কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

৪০শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৩ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

অতিপাণ্ডিত্যের উপদ্রব

ময়রার দোকানে যে রস তৈরী হয় তার একটি মাপকাঠি আছে, তার নাম তাড়ু। কি-রকম রসে খাজা-গজা পাক করতে হয়, আর কি-রকম রসেই বা রসগোল্লা জীইয়ে রাখ্‌তে হয়, তাড়ু তা সমস্ত জানে। কিন্তু কবি যার দোগ্ধা, রসিকের চিত্তরূপ কামধেনু যে রসের উৎস, আর রসাত্মক বাক্য যে বস্তুর দোহন-কার্য্যে বৎস-স্বরূপ, সে রসের কোনো বাইরের মাপকাঠি নেই। যাঁর যথার্থ চিত্তপ্রসাধন হয়েছে অথচ যাঁর অনুভূতি গভীর, যিনি মরমী অথচ মনীষী, কেবল তাঁরই অন্তর এখানে সাক্ষী। তিনিই বল্‌তে পারেন--কেবল তাঁরই অন্তঃকরণ বল্‌তে পারে—দোহাল যে-বাছুরটি সাম্‌নে ধরেছে সে জ্যান্ত, না মরা-বাছুরের খড়-পোরা ঠাট।

কিন্তু জগতে এ-রকম মণিকাঞ্চন যোগ দুর্লভ। যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি চোখা-রকমের, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের রসবোধ ভোঁতা; আবার যাঁদের উপলব্ধি করবার সবিশেষ শক্তি আছে, তাঁদের হয়তো বিচক্ষণা নেই। তাই চণ্ডীদাস বলেছেন—

> "রসিক রসিক সবাই কহয়ে
> কেহ ত রসিক নয়,
> ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
> কোটিতে গোটিক হয়।"

কবি চণ্ডীদাসের কালে যা' কোটির মধ্যে একটি হ'ত, কল-কারখানার কল্যাণে আমাদের কালে তা দেখ্‌ছি ক্রমে ছ্যা-ছ্যা হয়ে উঠল। তবে আসল জিনিসে আর কলের তৈরী নকলে যে-তফাৎ থাক্‌বার তা' অবশ্য থেকেই যাচ্চে। এখন আমরা সবাই—

> "বড় কথা লিখি, বড় কথা কই,
> জড় ক'রে নিয়ে পড়ি বড় বই;
> এমনি করিয়া ক্রমে বড় হই,
> কে পারে রাখিতে চেপে।"

চেপে কেউ রাখ্‌তে চায়ও না। তবে কষ্ট-ক্রিটিকদের দেঁতো রসিকতা আর গায়ে-পড়া সমালোচনার চাপ চুপ-করে' সয়ে যাওয়াও রক্ত-মাংসের শরীরে সম্ভব নয়। বোধহয় এম্‌নি-ধারা সঙিন অবস্থায় পড়েই কালিদাস বলেছিলেন—

"ইতর তাপ শতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

[২]

পরের মতামত রসনাগ্রে লোফালুফি করে' আসর সরগরম করা আর পরচুলো মাথায় পরে মাথা গরম করা সমান কথা। যার হজমশক্তি নেই তার পক্ষে অতি-ভোজন যেমন দোষের, যার বিচারশক্তি নেই বা বিচক্ষণা নেই তার পক্ষে অতিরিক্ত লেখাপড়া করাও তেম্‌নি দোষের; কারণ

—"His head is like a stomach & intestines which let the food pass through them undigested. That is just why his teaching & writing is of so little use. For it is not upon undigested refuse that people can be nourished but solely upon the milk which secretes from the very blood itself."—Schopenhauer.

এঁরা গাছের মধ্যে ঘানি-গাছ সুতরাং যা প্রসব করেন তা প্রসূন হয় না। এঁদের মন যা চায়, মুখ তা চাইতে ভুল করে। চতুর্ব্বর্গের মধ্যে এঁরা মোক্ষ চাইতে গিয়ে ধর্ম্ম চেয়ে বসেন, বাৎসায়নকে বাদরায়ণ বলে ভুল করে' হাঁকডাক সুরু করে' দ্যান। আবার কান্তাস্থানীয়া কাব্য-সুন্দরীকে গুরুমহাশয়ের মতন কান-মলা দিতে অনুরোধ করে কাব্যকুঞ্জবন পাঠশালার হট্টগোলে সরগরম করে তোলেন। এঁরা জলেরও জাতিভেদ মেনে থাকেন, যেমন—(১) গঙ্গাজল (২) বরফজল (৩) গয়লা-বামুনের জল (৪) পাতঞ্জল (৫) প্রাঞ্জল। আবার এঁদের হাতে প্রেমেরও অমনি দুর্দ্দশা, যেমন—(১) রামের প্রেম (২) রামীর প্রেম (৩) শ্যামের প্রেম (৪) স্বামীর প্রেম (৫) কীচকের প্রেম (৬) চোখের প্রেম ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমঝদার গুণীর গোলাম, কিন্তু বেসমঝদারের সে বালাই নেই। এঁরা রস-গঙ্গাধর রবীন্দ্রনাথের রস-রচনার ভিতর থেকেও "বিকলা রসলক্ষণা রসাঃ" অর্থাৎ উপরস, অনুরস ও অপরসের নমুনা আবিষ্কার করবার স্পর্দ্ধা রাখেন, কিন্তু রসাভাস শব্দের পারিভাষিক অর্থ জানেন বলে বোধ হয় না। আর এও জানেন না যে—

"অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ
সর্ব্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ।"

এঁদের মতে রস অনিত্য, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে,হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-ভেদে রসেরও না কি ভোল ফেরে! আমরা এর চেয়ে আরও নূতন কথা বল্‌তে পারি। রসতত্ত্বের এর চেয়েও গূঢ়তর তথ্য আমরা আবিষ্কার করেছি, আপনারা অবহিত হ'ন। সে তত্ত্বটি হচ্ছে এই যে, রস—পবিত্র রস—হিন্দুর হ-কার যোগে যে রস 'হ'রষে পরিণত হয়

অথচ ষত্ব-বিধানের স্বত্ব লোপ করেনা, তাই আবার নীচ চামারের অর্থাৎ কি-না চ-বর্গের সংস্পর্শে এলে ঘৃণিত চ-রস হয়। তখন সে ঝরে পড়ে না বটে, কিন্তু ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে যায়।

[৩]

"দূর কর এ বিড়ম্বনা বিদ্রূপের ভাণ!" রস কি সত্যই অনিত্য? তাহ'লে জগদন্তরাত্মা জগন্নাথকে রসস্বরূপ বলে কেন? "রসো বৈ সঃ!" এ কি ধ্যান-রসিকের উপলব্ধির কথা নয়? এই কি রসতত্ত্বের শেষ-কথা নয়? ঋষিবাক্য বলে' এ-কথার সত্যতা অনেকেই মেনে নেবেন, কিন্তু আপত্তি উঠ্‌বে যে, সাহিত্যের শেষ-সীমান্তে তত্ত্বের রাজ্য সুতরাং এটা শেষ-কথা হলেও গোড়াকার কথা না হ'তেও পারে। মৃত্যুবাণ দিয়েই যে নাড়ী-কাটা হয়েছে তার কি মানে আছে? বেশ কথা, তা হ'লে সাহিত্যরাজ্যের চৌহদ্দিটা কি, সেইটেই আগে ঠিক করে' নেওয়া যাক। পূর্ব্বাপর বিচার করলে দেখা যায় যে, শিল্পের মতন সাহিত্যের গণ্ডী সুন্দরের এলাকার মধ্যেই আবদ্ধ। সাহিত্যের সত্য, রসের সত্য, অনুভবের সত্য—তত্ত্বের সত্য নয়, দর্শনের সত্য নয়। রাগরাগিণী যেমন কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি, খাঁটি সুরের খেলায় যেমন সমাজ বা ধর্ম্মের ধূলো বা ধোঁয়া কিছুই নেই, তাহ'লেও তাতে চিত্তে রসের আবেশ হয়, খাঁটি সাহিত্যও তেম্‌নি।

সত্য আর কল্পনার সোনার বাসর সাহিত্য। সত্য এখানে বর হলেও চোর হয়ে আছে, কল্পনাসুন্দরীর সহচরীদেরই এখানে জয়জয়কার। সৌন্দর্য্যের এ খাস-মহল। তাই যা শুধুই সুন্দর বিশেষ-করে সেই হ'ল সাহিত্য। স্বয়ং সত্য রসের রংমহলে প্রবেশ করতে পায় তখনি, যখন সে আসে শুধু দর্পণ হাতে; যতক্ষণ তার হাতে তলোয়ার ততক্ষণ ঢোকবার হুকুম নেই। আইবুড়ো-সত্য যতবড়ই ডাংপিটে হোক এখানে তার ঘাড় হেঁট। এখন তার আর জুলুম-জবরদস্তি নেই; এখন সত্য সখিত্ব করবে —সুন্দরের সহযোগী হবে, সাহিত্যের বরাসন পাবে। যে আনন্দে 'জাতানি জীবন্তি' সত্য এখন সেই আনন্দের আবহাওয়া।

যে-রচনা রচনা-হিসাবে সুন্দর নয়, যে রচনায় ভদ্রাশ্রী বিরাজ না করে, তা তত্ত্বকথায় পূর্ণ হলেও তাকে ঠিক সাহিত্যের কোঠায় ফেলা চলে না। ভাবে যা অসংবদ্ধ, প্রকাশে অসুন্দর, সাহিত্য শুধু তাই বর্জ্জন করে; নইলে সামাজিক বিধি-বিধানের সঙ্গে বনিবনাও আছে কিনা রস-রচনার বিচারে সে বিচক্ষণা অবান্তর। সাহিত্য রসোদ্রেক করেই খালাস। সে রস মধুর কি অম্লমধুর তা বড় একটা বিচার করেনা। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এ-বিষয়ে একটু বেশী উদার। তাঁরা সাহিত্যের সার যে কাব্য তাকে রসাত্মক বাক্য বলে বর্ণনা করেছেন। অথচ রসের গণনায় বীভৎসটাকেও বাদ দ্যান নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রসোদ্রেক করাই রস-রচনার অর্থাৎ খাঁটি সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাহিত্যের একমাত্র কাজ জাগা-অবস্থার মানুষকে স্বপ্ন দেখানো, যার হাতে-

গলায় শিকল বাঁধা তার ডানা গজিয়ে দেওয়া। স্বপ্নে সামঞ্জস্য থাকে না, সাহিত্যের স্বপ্নে সামঞ্জস্য আছে এইটুকু তফাৎ। সাহিত্য সংসারও নয়, সপ্তলোকের সর্ব্বোচ্চ ধাম সত্যলোকও নয়; এ ভূলোকও নয়, আবার স্বর্গও নয়,—এ দ্যুলোক, যেখানে মেঘেরা মিছিমিছি যা-নয়-তারি আকার ধারণ করছে, হাতী মারবে না তবু সিংহের মতন কেশর ফোলাচ্চে, বপ্রক্রীড়া করবে না তবু মদমত্ত হাতীর মতন শুঁড় ওঁচাচ্চে। সূর্য্য-কিরণ যেখানে বাজে-খরচ হয়ে যাচ্চে, ঝড় যেখানে পাগলামি করছে, পাখীরা যেখানে পাখা-মেলে হাঁফ-ছেড়ে বাঁচচে, এ সেই আমাদের আব্‌হাওয়ার রাজ্য। এখানে, যে-সব ফুল ফোটে, তা শোজ্‌নে ফুল, মোচা বা ফুলকপির মতন ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না, কেজো লোকের কোনো কাজে লাগে না। রস-রচনার খাতা আমাদের বাজে-খরচের খাতা। কাজের যেখানে শেষ হয়েছে, সাহিত্যের সেইখানে আরম্ভ, তাই সন্ধ্যার অবসর নইলে গান বা গল্প কিছুই জমে না; তাই পৃথিবীর সব-চেয়ে বড় গল্পের বইএর নাম "আলিফ্‌ লয়লা ও লয়লা" "হাজার-এক রাতের কাহিনী"।

এ জিনিসকে কাজে লাগানো আর সুন্দর গোলাপ-ফুলটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ক্ষীরের হাঁড়িতে বা বাদাম-তক্তির বুকে তার পাপ্‌ড়ি বাজে-খরচ করা একই কথা, তাতে ক্ষীর-সন্দেশের ওজন এক-কাঁচ্চাও বাড়েনা অথচ ফুলটা না-হক মাঠে মারা যায়।

[৫]

রসের বহিরঙ্গ যেমনি হোক তার অনুভূতি বা উপলব্ধি সব দেশ এবং সকল কালেই এক। যেমন বাৎসল্য-রসের বাইরের প্রকাশ আগে ছিল শিরশ্চুম্বন এখন অধর বা কপোল-চুম্বন, কাফ্রির দেশে নাকে-নাক-ঘষা, গরু-সমাজে বাছুরের গা-চাটা। এখন কাফ্রি আপনার কালো ছেলেটির নাকে-নাক-ঘষবার সময় অন্তরে যে-রস সম্ভোগ করে, আমরা কস্মিন্‌-কালেও ছেলের নাকে নাক না ঘষ্‌লেও শুধু চুমু খেয়েই ঠিক সেই রসেই আর্দ্র হয়ে উঠি। মালা সুতো-দিয়েই গাঁথ, আর কলার ছোটা-দিয়েই গাঁথ, যে গলায় পরবে তার মনে যে রসের উদ্রেক হবে তা অভিন্ন। নিমের তিতোও "বিশদয়ত্যাস্যং" কুইনিনের তিতোও তাই করে; সুতরাং রসের অনুভূতি দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে অভিন্ন।

[৬]

হঠাৎ-ক্রিটিকদের আরেকটি অদ্ভুত বিশ্বাস হচ্চে এই যে, সাহিত্য না কি যুগ ও জাতি-ধর্ম্মের অনুগমন করে' থাকে; তা যদি করত তা হ'লে সেই সেই জাতি যুগ বা ধর্ম্মের অন্তিম দশা ঘটলে তত্তৎ যুগের সাহিত্যও সহমরণে যেত। গ্রীক জাতির মৃত্যুর সঙ্গে "স্যাফোর গান" মারা যেত; আমরা আর তার একটুও রসগ্রহণ করতে পারতুম না। কিন্তু এখনো তা পারি; তার মানে মানুষ-জাতির ভাব-শরীরের বা হৃদয়-বৃত্তির বিশেষ-কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি;—অন্ততঃ ঐতিহাসিক কালের ভিতর। তাই আজো "One touch of nature makes the whole world kin." তাই প্রাচীন

মিশরের পাঁচ-ছ হাজার বছরের পুরোনো প্রেমের গান আজও আমাদের মনে রসোদ্রেক করে, জানিনে তাদের বিয়ের রীতি কি-রকম ছিল, জানিনে সেই মিশর-কবি যাকে উদ্দেশ্য করে' লিখেছিলেন সেটি তাঁর স্বকীয়া কি পরকীয়া, জানিনে সমাজে তাঁদের কী গতি হ'য়েছিল, জান্‌বার দরকার আছে বলেও মনে করিনে। শুধু এইটুকু জানি, যে, যে লিখেছিল সে ভালোবাসা কাকে বলে তা' জান্‌ত আর তার ভালোবাসার রস আমাদের ভালোবাসার থেকে মোটেই ভিন্ন নয়।

আইসিস্ অসিরিস্ মরে গেছে কিন্তু ঐ সব কবরস্থ দেবতাদের ভক্তেরা তাঁদের লক্ষ্য করে' যে-সব ভক্তির উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করে গেছে তা আমাদের মনেও ভক্তি-রসের উদ্রেক করে;—যদিচ আইসিস্‌কেও আমরা মানিনে অসিরিসকেও গ্রাহ্য করিনে।

পান্থপাদপে ছুরি দিয়ে ঘা দিলেও রস স্রায়, কাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেও স্রায়, ধারালো খাপ্‌রার আঘাতেও স্রায়; রসের কোনো তফাৎই হয় না; তৃষ্ণাও তাতে সমানই মেটে। কিন্তু যাঁরা হঠাৎ-ক্রিটিক, অতিপণ্ডিত তাঁরা এ স্বীকার করেন না। তাঁরা কেবল থাক বাড়াতেই ওস্তাদ।

"বৈশারদ্য তুবৈ নাস্তি
ভেদে বিচরতাং সদা
ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্ বাদা
স্তস্মাত্তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ!"

[৭]

হঠাৎ-ক্রিটিকদের আবদার অনেক। এঁরা সরস্বতীর মরালকে দিয়ে গরুর গাড়ী টানাতে চান্। এঁরা সাহিত্যকে একবার যুগ ও সমাজের দ্বারা চালিত করতে চান্ পরমুহূর্ত্তেই যুগ ও সমাজের চালক করতে চান্। "নাও পর্ গাড়ী, ফের গাড়ী পর্ নাও!" এঁরা "নিত্যবস্তু" শব্দে যে কি বোঝেন তা এঁরাই জানেন। একবার সেটা হ'ল "বাস্তবের মানস আদর্শ" আর-একবার হ'ল খাঁটি সাহিত্যের বাইরেকার অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির তত্ত্বরাজ্য, একবার সেটা রসের বিশিষ্ট প্রকাশ—যেমন গেলাসের জলের আকার গেলাসের মতন, ঘটির জলের ঘটির মতন, একবার রসপ্রবাহিনীর ভাঙনে ধ্বস্-খাওয়া তটভূমি, একবার বিশ্বমানব-মনের অগাধ আনন্দ-সঙ্গম-তীর্থ, আর-একবার আরো কিছু ধোঁয়াটে ব্যাপার। এম্‌নি-ধারা পরস্পরবিসম্বাদী সব কথা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে লিখে এঁরা বাহাদুরি দেখিয়ে থাকেন।

[৮]

কবি গেয়েছেন—

(ও কে) ধারণ করিবে রসগঙ্গা সাধন বিনে।

রসবোধের জন্য সাধনার দরকার, নইলে বাজে বকুনি বকে' হাস্যাস্পদ হ'তে হয়।

সাহিত্য মনের বাগান-বাড়ী, সেখানে স্বাধীনভাবে সকল-রকমেরই আলোচনা অল্পবিস্তর হ'য়ে থাকে। তাতে মাঝে মাঝে সমাজ চাইকি কানে-আঙুল দিতে পারেন, কিন্তু আঁৎকে উঠ্‌লে বাড়াবাড়ি হয়। ঋগ্বেদের যম ও যমীর আখ্যান থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত অনেক ছবি ভারতবর্ষের সাহিত্যে আঁকা হ'য়েছে যা' ঠিক আদর্শ নামের যোগ্য নয়। অথচ সনাতন হিন্দু-

সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে সেগুলিকে মাথায় করে রেখেছেন—অগ্নিসংকার করেন-নি। তার মানে কি? আমাদের মনে হয় তার মানে এই যে, একালের মতন সেকালেও যাঁরা শিং-বাঁকাবার বাঁকিয়েছেন কিন্তু হীরার ধার ভাঙেনি। রামায়ণ মহাভারত তো ঘরে-ঘরে পড়া হ'য়ে থাকে কিন্তু "দেবরাজ-কুতূহলী" অহল্যাকে ক'জন মেয়ে অনুকরণ করেছে? দ্রৌপদীর দেখাদেখি পাঁচের উপর ছয়ের কামনাই বা কে করছে? তারপর, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির কথা ধরবনা, কারণ সে-সব নাকি মুসলমানী অনুকরণ, কিন্তু কথা-সরিৎ-সাগরে বা বত্রিশ সিংহাসনে যে সমস্ত গল্প আছে তা অনেক লোকেই শুনেছে এবং অনেক লোকেই পড়ে থাকে। এই সব বইয়ের অনেকগুলি গল্প আদর্শস্থানীয় তো নয়ই, এমন-কি রুচিরোচনও নয়। তাই বলে কি—সাহিত্যে ঐ-সব আছে বলেই কি—সমাজে তার ঝুড়ি ঝুড়ি অনুকরণ হচ্ছে? তবে অকারণে নব্য-সাহিত্যকে দোষ দেওয়া হচ্ছে কেন? কুন্দনন্দিনী বিষ খাবার আগে কি কেউ বিষ খায়নি? না বিনোদিনীর আগে আর-কোনো বিধবা কাউকে ভালোবেসে ফেলে নি? তা' ছাড়া "বিষবৃক্ষ" বা "চোখের বালি" বা "ঘরে-বাইরে" এ সমস্ত বইএর আগাগোড়া যে পড়েছে তার তো লেখকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো ভুল ধারণা থাক্‌তেই পারে না। এর মধ্যে কোনোখানিই মানুষের পবিত্রতার আদর্শকে খাটো করেনি। অধঃপাতের অতলে পড়তে-পড়তে মানুষ কি করে সাম্‌লাতে পারে এতে (বিশেষ-করে শেষ দুখানি বইতে) তো তাই দেখানো হয়েছে। তবে—

Rire des gens d'esprit, c'est le privelege des sots.

গুণীজনে অকারণে ঠাট্টা।
হাঁদাটের ঐ হ'ল হক্‌দারী পাট্টা॥

এই হচ্চে আসল কথা।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন

চৈতন চুট্‌কি

বাস্তু ভিটে যাকে বলি! সে কী আশ্চর্য্য কারখানা! পাখির ডিমের উপরের খোলার চেয়ে পাতলা, হাজার-হাজার বছরের পুরোনো চীনেমাটির তার দেওয়াল,—এমন হাল্‌কা এমন্ ঠুন্‌কো হয়ে গেছে যে, শব্দের রেশ, বাতাসের পরশ পেলে কাঁপতে থাকে,—মনে হয় এখনি বুঝি ফেটে চৌচীর হল। এই ঠুন্‌কো পাতলা চীনেমাটির আশ্চর্য্য বাড়ি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। এর মধ্যে হুজুরের চাকর-বাকর যারা কাজকর্ম্ম করে বেড়াচ্ছে তারা আস্তে উঠছে, আস্তে বসছে, আসতে চল্‌ছে, আস্তে বল্‌ছে—হুজুরের ভয়ে যত না হোক্, পাছে কিছু তারা ভাঙে, পাছে তাদের সেই পুরোনো ঠুন্‌কো

দেওয়ালের কোথাও আঁচড় লাগে সেই ভয়েই তারা সর্ব্বদা সাবধানে আছে। শুনেছি একসময় একজন নতুন চাকর অসাবধানে হঠাৎ একটা চিনের পুতুলের একটু চটা উঠিয়ে ফেলেছিল, যখন তার মাথা-মুড়িয়ে ঘোল ঢালবার হুকুম হল তখন সে বল্লে—অপমানের জন্যে দুঃখু করিনে; অমন পুতুলটা খণ্ডিত হয়ে গেল আমারি হাতে! প্রাণের চেয়ে পুতুলই তাদের ছিল বড়।

এই বাড়ির বাগান—সে আরো আশ্চর্য্য! কতবড় যে সে বাগানখানা তা সে বাগানের সর্দ্দার-মালীও বলতে পারে না। কুঞ্জবন সে গিয়ে মিলেছে মহাবনে, মহাবন সে মহাসমুদ্রের ভিতর পর্য্যন্ত নেমে গেছে—ছাওয়ার মত হয়ে। এখানে এক-একটা যত্নের গাছে যখন ফুল ধরে, ফল ফলে, তখন তাদের বোঁটায় মালীরা সোনার আর রূপোর ঘুঙুর বেঁধে দেয়, বাতাসে সেগুলি বাজ্‌তে থাকে, তবে জানা যায় বাগানে অমুকদিকে ফুল ফুটেছে, অমুকদিকে ফল ফলেছে;—এতবড় সে বাগান, এমন চমৎকার এমন সৌখীন বাগান।

এই বাগানের একটা দিক—সেদিকের খবর না-জানেন হুজুর, না-জানে তাঁর মালী; কেবল জানে দেশের যত লক্ষ্মীছাড়া আর তাদের রাণী—সে একটি কচি মেয়ে—নীচজাত। কেউ তাদের চায় না, তাই কেউ যেদিকে যায় না সেইদিকে তারা একলা আছে—একটা প্রকাণ্ড কল্পতরু হেলে পড়ে সমুদ্রের নীল জলের উপরে ছাওয়া দিয়েছে—তারি তলায়। ছোটজাত কাজেই রাজ-বাড়ীর সাততলার একটি তলাতেও তাদের জন্যে জায়গা নেই, দেশের লোকের পায়ের ধুলো-কাদা ধুয়ে নেবার জন্যে রাজার দেউড়িতে দুবেলা হাজির থাকবার হুকুমটাও না;—যদিও দেশসুদ্ধ সবাইকে তারাই কিন্তু বরাবর বছরে বছরে নিয়মিত বাগানের খাঁটি পদ্মমধু জুগিয়ে আস্‌ছে।

এই যে কল্পতরু যার পাতা কখনো খসেনা, ফুল কখনো ঝরেনা, এরি উপরে একটি পাখি! সে যে কি পাখি, কেমন পাখি তাতো বলা যায় না—কিন্তু তার গান—সে যে স্বর্গের কিন্নরীদের গানের চেয়ে মিষ্টি। সমুদ্রের এপারে গাইছে সে পাখি, সমুদ্রের ওপার পর্য্যন্ত তার সুর গিয়ে ঠেক্‌ছে—চাঁদনী রাতের আলোর মত বাতাসের ঢেউয়ের উপর দিয়ে! মাঝি মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ থামিয়ে সে গান শুনে গেল, ওপারের লোক সমুদ্রের ধারে দিনের পর দিন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে সে গান শুনে মস্‌গুল হয়ে রইল, আর সে গানের কত তারিফ করে তারা বই লিখলে, বর্ণনা দিলে, সবাইকে জানিয়ে দিলে সেই চমৎকার আশ্চর্য্য পাখির কথা; অথচ সেই ছোট মেয়েটি আর তার দলের লোক ছাড়া বাগানের মালিক যিনি তিনিও জানেন না, বাগানের মালী যারা তারাও জানেনা, হুজুরের সভাসদ পারিষদ লোক-লস্কর পরিবার-প্রজা কেউ জানেনা এই আশ্চর্য্য পাখির খবর—যার গানের কাছে সেই চমৎকার বাড়িখানা, সেই অদ্ভুত বাগানটাও কিছুই নয়!

চট-দিয়ে মোড়া গালামোহর-করা একরাশ বই আজ অনেক দিন হল বিদেশ

থেকে হুজুরের তাকিয়ার কাছেই পড়ে আছে—সময় নেই যে তিনি সেগুলো খুলে দেখেন। সেদিন বেলা দুপুরে একটা মশা হঠাৎ কানের কাছে হুল্ ফুটিয়ে হুজুরের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে, তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই অথচ মশাটা বারেবারে ঘুমও ছুটিয়ে দিচ্ছে! হুজুর হাতের কাছে সেই চটমোড়া বইগুলো একে-একে খুলে দেখতে লাগলেন। বইগুলো তাঁর ঠুন্কো বাড়ির কারখানা, অদ্ভুত বাগানের বর্ণনায় ভরা। এর মধ্যে একখানা বই—তার মলাটের ছবিটায় তাঁর চোখ পড়ল—সোনার একটি ফুলের ডালে পাখি গাইছে। হুজুর সেই বইখানা খুলে পড়তে লাগলেন—"হুজুরের আশ্চর্য্য পাখীর গান!" যিনি প্রকাশক তিনি বিদেশের একজন বিখ্যাত ওস্তাদ। বইখানা পড়তে-পড়তে নাকের উপরে কচ্ছপের খোলা দিয়ে বাঁধানো মোতিয়া-বিন্দু চশমার বড় বড় গোল দুখানা পরকোলার ভিতর দিয়ে হুজুরের দুই চোখ বিস্ময়ে ক্রমে বড় হয়ে উঠছে বেশ দেখা গেল। বাড়ির প্রধান কর্ম্মচারী যিনি কাজের খবরের চেয়ে হুজুরের মেজাজ কখন কেমন তারি খবর ভালো করে রাখেন, তিনি আজ পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখছিলেন। কর্ত্তার চোখ যতই খুল্‌তে দেখা গেল কর্ম্ম-চারীর দম্ ততই বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আজ কর্ত্তা অনেকটা চোখ খুলেছেন; না-জানি আজ কপালে কি আছে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তত্ত্বাবধানিক যখন তিনশো-তেত্রিশ-কোটী দেবতার নাম জপছিলেন এবং দশ আঙুলে কচ্ছপ-মুদ্রা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কর্ত্তার নাকের উপরে কচ্ছপের খোলায় বাঁধানো চশমাটাকে শাপ দিচ্ছিলেন যেন ওর কাঁচদুখানা এখনি গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়—এমন সময় সত্যিই চশমাখানা খুলে কর্ত্তা ডাক্ দিলেন—কোই হ্যায়! কচ্ছপ-মুদ্রা দেখাতেই হুজুরের চশমা চোখের উপর থেকে সরে গেল, কর্ম্মচারী নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন! তিনশো-তেত্রিশ-কোটীকে একে-একে প্রণাম করবার তাঁর সময় হলনা, তিনি দরজার চৌকাঠে তিনবার মাথা ঠুকেই খালিপায়ে কর্ত্তার সাম্‌নে উপস্থিত হলেন। তখন কর্ত্তার চোখ আবার বারো-আনা বন্ধ হয়ে এসেছিল, তিনি বল্লেন—এই বইখানাতে আমার এ বাগানের একটা পাখির কথা লিখ্‌ছে, বল্‌ছে—আমাদের যতকিছু অদ্ভুত আসবাব আছে সেগুলো কিছুই নয় এই আশ্চর্য্য পাখির গানের কাছে। এ পাখির খবর কিছু রাখ?

তত্ত্বাবধানিক দেখলেন হুজুরের চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ হতে আর লহমা-দুই বাকি; তখন তিনি সেই সময়টুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে রয়ে-বসে জবাব দিচ্ছেন—হে প্রবলপ্রতাপ! ভবদীয় দাসানুদাসের নিবেদন এই যে—মহারাজ, রাজ্যের সংবাদ ও খবর অর্থাৎ যে খবর যথার্থ খবর—খবরের মত খবর, তা এ দাসের অবিদিত নাই। আজ্ঞাধীন সকল খবরই রাখে মহারাজ, কিন্তু এই কাল্পনিক পাখি, এর গানের ইতিহাস পুস্তক-প্রণেতার কল্পনা—যাকে পণ্ডিতেরা বলেন কবি-কল্পনা—সু-ত-রাং—।

হুজুরের চোখ তখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে; তিনি বল্লেন—হুঁঃ কল্পনাই ব-টে—। তারপর আর তাঁর সাড়াশব্দ

পাওয়া গেল না। পাখির খবরের দায় থেকে উদ্ধার হয়ে কর্ম্মচারী পায়ে পায়ে সরে পড়েন এমনসময় সেই দুষ্টু মশা আর-একবার হুজুরের কানে পোঁ করে ভেঁপু বাজিয়েছে! মন্ত্রী প্রায় দরজা পার হয়েছিলেন কর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ হতেই তিনি দুয়োরের গোড়ায় পাপোঁছখানার উপরেই ঝুপ্‌ করে বসে পড়েছেন! কর্ত্তা আর-একবার চশমা এঁটে কর্ম্মচারীর দিকে ফিরে বল্লেন—সব কথাই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও! বিদেশের কেতাবে যখন এ পাখির কথা উঠেছে তখন এটা মিথ্যে হতে পারেনা, আমি জানি তারা কাজের মানুষ, আবোল্‌-তাবোল্‌ বাজে বকা তাদের কুষ্টিতে লেখেনি। এই পাখির গান আমার না শুন্‌লেই নয়, আজ সন্ধ্যার সময় তাকে আমার মজ্‌লিসে হাজির করবে, আমার গানের ওস্তাদ সবাইকেও নিমন্ত্রণ করবে—যাও।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম্‌ দিচ্ছে তত্ত্বাবধানিক ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছেন কেমন করে পাখির সন্ধান করি, দেশের কেউ যার খবর জানেনা তাকে ধরা তো সহজ নয়! এমন-সময় হুজুর বল্লেন—আমার এ ঘরে মশার উৎপাত হয়েছে। আচাযিদের দিয়ে মশা হবার কারণটার তদন্ত অবিলম্বে করবে—পাঁজিতে এ-বৎসর সকলপ্রকার মক্ষিকার কোঠায় শূন্য দেখ্‌ছি অথচ মশার জ্বালায় নিদ্রা হচ্ছেনা এরই বা অর্থ কি!

কর্ত্তার চোখ খোলবার মূলে এই 'মশা'। এই মশাবংশ নির্ম্মূল না হলে রক্ষা নেই এটা বেশ করে আচাযিদের সম্‌ঝে দিয়ে প্রধান-কর্ম্মচারী সর্দ্দার-মালীকে পাখির সন্ধানে পাঠালেন। আজ এই দুটো বড় বড় কাজ সারতে তাঁর নাওয়া-খাওয়া হতে বেলা দুটো বাজলো। ইতিমধ্যে কর্ত্তার খানসামা তিনবার জেনে গেছে পাখি এল কি না!

তত্ত্বাবধানিক অতি গম্ভীর লোক। সকলের চেয়ে তিনি কম কথা বলেন, কম চলা চলেন। পাখি যে কি জানোয়ার এবং মশা যে কি পাখি এটা তাঁর জানবার কোনো দিন প্রয়োজনও হয়নি, সুবিধাও ছিলনা,—কাজের চিন্তায় তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয়। লোকের দশটা প্রশ্নের উত্তর তিনি এ-পর্য্যন্ত মাত্র একটি চুট্—তাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার উচ্চারণ না করেই—বলে এসেছেন, আর তাঁকে আজ কর্ত্তার খানসামার প্রত্যেক প্রশ্নের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে উত্তর দিতে হচ্ছে! এদিকে মালী এসে জানালে পাখির কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছেনা। এই সব উৎপাতে হয়রান হয়ে কর্ম্মচারী যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন এবং পাখি না হাজির করতে পারলে তাঁর মাথা কাটা যাবে একথা চুপিচুপি জানিয়ে উকিল ডেকে বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করে একটা উইল লেখবার উদ্যোগ কচ্ছেন তখন তাঁর উকিল একটু মাথা চুলকে বল্লেন—বলতে সাহস হয়না—একবার মজ্‌লিসি লোকদের নামের লিষ্টিখানা উল্টেপাল্টে দেখলে হতনা! যদি পাখি বলে কোনো-কেউ হুজুরে কোনোকালে নিমন্ত্রণ-পত্রের জন্য সওগাদ দিয়ে থাকে তবে সহজেই তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যাবে।

উকিলের কথামত দপ্তরখানার নামের তালিকা ঘেঁটে দেখা গেল, তাতে পা'য়ের কোঠায় ও প'য়ের কোঠায় অনেকগুলো পা ও পদবীওয়ালা নাম কিন্তু 'পাখি' কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা! তারপর দেশের সভাসমিতি কমিটিজমিটি এ-সভা ও-সভা এ-সমাজ ও-সমাজের বাৎসরিক রিপোর্ট-গুলো আনিয়ে কর্ম্মচারী দেখলেন সেখানেও পাখির নামগন্ধ নেই। দেশের গণ্যমান্য বুধ-বৃহস্পতি সভার সদস্যমণ্ডলী বলে পাঠালেন—"তাঁদের কমিটির একখানি কীটদষ্ট প্রাচীন রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে যে, কর্ম্মচারী যাঁর সন্ধান কচ্চেন তাঁকে এই সভা থেকে একবার একটা সম্বর্দ্ধনা ও রূপার তাম্র-শাসন ও স্বর্ণলেখনী মায় মস্যাধার দেবার প্রস্তাব উঠেছিল এবং বাৎসরিক হিসাবনিকাশে সভা তার একটা চুম্বকও পাচ্ছেন কিন্তু উক্ত রিপোর্টের সন তারিখ ইত্যাদি এমনভাবে কীট-দষ্ট হয়েছে যে তার চিহ্নমাত্রও পাওয়া দুষ্কর! হুজুরের তহবিল থেকে কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য হলে কীট-ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারায় এই পুঁথির মাসপঞ্জী ইত্যাদি অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, অন্ততঃ উক্ত পুঁথির জন্য একখান খেরুয়া বস্ত্র পেলেও আপাততঃ তাঁরা হুজুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুখী হতে পারেন।"

কর্ম্মচারী আশা করছিলেন দেশের সব সভাসমিতিগুলোর নজীর দেখিয়ে তিনি হুজুরের কাছে প্রমাণ করবেন—বিদেশীমাত্রেই মিথ্যা কথা বলেছেন, পাখি-সম্বন্ধে তাঁদের কল্পনা ও জল্পনার মূলে কোনো তথ্য—যাকে বলে 'বস্তু',—তা নেই; কিন্তু বুধ-বৃহস্পতি-কমিটির স্বর্ণ-লেখনী মায় মস্যাধার ও তাম্রশাসন! পাখিকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া বরং চলে কিন্তু সোনার মস্যাধার, রূপার তাম্রশাসন এরা যে বস্তু, এদের জন্য যে খাতায় জমাখরচ লেখা রয়েছে এর বিল আছে, ভাউচার আছে, রসীদ ষ্ট্যাম্প আছে—এগুলোকে তো ওড়ানো সহজ নয়!

এদিকে বেলা পাঁচটা হয়; ছয়টায় মজলিস। কর্ম্মচারী নিরুপায় হয়ে স-উকিল নিজেই একবার পাখির খবর করতে অগ্রসর হলেন। বলাবাহুল্য যাত্রার পূর্ব্বে কর্ম্মচারী উকিলের পরামর্শমত বুধসভাকে খুব ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি দিয়ে গেলেন যাতে ভবিষ্যতে রিপোর্টাদি বিষয়ে তাঁরা সতর্ক থাকেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পত্র না-পাওয়া-পর্য্যন্ত এই পাখি সম্বন্ধে কোনো প্রকাশ্যসভায় কোনো আলোচনা না হয়—কেননা হুজুরের কানে তাঁদের এই অসাবধানতার কথা গেলে সভার বার্ষিকী ও চাঁদা ও অন্যান্য বাবদে খরচাদি সরকার হইতে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কর্ম্মচারী তাগা-তিলকাদি নানা ইষ্টি-রিষ্টি দিয়ে আপনাকে বেশ সুরক্ষিত করে নিয়ে তবে পাখির সন্ধানে বাড়ির সদর-দরজা পার হলেন, সঙ্গে সেই উকিল এবং হুজুরের সঙ্গীতাচার্য্য ও বুধ-বৃহস্পতি সভার জনকয়েক নামজাদা কবি ও লেখকবৃন্দ। মালীকে উকিল জেরা করে জানলেন যে বাগানের আর-সমস্ত অংশই সে তন্ন তন্ন করে দেখেছে—কেবল ওই দিকটা—যেটা পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশের মত—ওখানটা গিয়ে সন্ধান করতে সে সাহস পায়নি; কেননা সে জাতিতে উড়ে, ওদিকের

হাওয়া গায়ে লেগেছে শুনলে তার জাত নিয়ে টানাটানি পড়বে। রাজার তাড়ায় কর্ম্মচারীর জাতের কথা ভাববার সময় ছিল না, তিনি চুট্‌ বলেই সেই নিষিদ্ধ দিকটাতেই অগ্রসর হলেন। সঙ্গের সকলে চাদরের আড়ালে নাকগুলিকে নিষিদ্ধ দিকের হাওয়া থেকে ঢেকে নিয়ে কোনোরকমে জাতি রক্ষা করে কর্ম্মচারীর অনুসরণ করলেন। কর্ম্মচারীর জাতি লোহার সিন্দুকে চব্‌সের ডবল তালার মধ্যে সুরক্ষিত ছিল, তার উপরে রাজ-আজ্ঞা সুতরাং তিনি অনেকটা নির্ভয়ে ছিলেন।

এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দিকে তখন বসন্তের ফুল ফুটেছিল, এত ফুল যে তার সৌরভ চাদরের শত ভাঁজ দিয়েও ঠেকানো যায় না—কাজেই জাতি জাতীফুলের জাঁতি-কলে বলির পাঁঠার মত আর্ত্তনাদ সুরু করেছে। কর্ম্মচারী ধমক দিয়ে উঠলেন—চুট! তাঁর সেই জলদ গম্ভীরস্বরে একটা শুক্‌নো কুয়োর ঘুমন্ত ব্যাং হঠাৎ বর্ষার স্বপ্নে মক্‌ মক্‌ করে খানিকটা বকে উঠল, এবং দূর বনে একটা বাছুর কোনো আকস্মিক উৎপাতের আশঙ্কায় হাম্বা-রবে হরি-স্মরণ করতে থাকল।

কর্ম্মচারী ও তাঁর দলবল—এঁদের কারুর পাখির সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় মোটেই ছিল না। কিন্তু 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল'—এর মধ্যে থেকে যে সার বস্তুটুকু পাবার তা তাঁরা সকলেই পেয়েছিলেন। ফুল যখন ফুটেছে তখন ওই হাম্বা ও মক্‌মক্‌ যে পাখিরই রব সে বিষয়ে তাঁরা এক-মত হয়ে ঐ দুটো জীবকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে চল্লেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। উকিল সন্ধ্যাকালের রবগুলোকে পাখির রব বলে ধরা যায় কিনা এবং একটা পাখি দুটো জীব হয় কি ব'লে, এ-বিষয়েও একটু আপত্তি করায় 'অধিকন্তু ন দোষায়' এবং রাতি পোহানোটা যে প্রাচীন কবিদের মতে দিবানিদ্রার পরেই সায়ং-সন্ধ্যাটাকেই বলা হয় এটা বুধ-সভার কবি ও লেখকবৃন্দ সকলে মিলে সমস্ত পথটা তর্ক করে বোঝাতে বোঝাতে চল্লেন। এবং হুজুরের সঙ্গীতাচার্য্যগণ এই দুই জীবের রবে কোথায় ওড়ব, কোথায় বা খাড়ব ষড়জ গান্ধার মধ্যম ইত্যাদির বিচার করে এদের গান হনুমানের মতে সিদ্ধ ও শুদ্ধ বলেই স্থির করে নিলেন,—যদিও কোনো কোনো ওস্তাদ নন্দিকেশ্বরকে একেবারে ছেঁটে দিতে নারাজ ছিলেন।

এক পাখির স্থানে দুই নিয়ে যখন সদলে কর্ম্মচারী হুজুরের মজ্‌লিসে দেখা দিলেন তখন চারি দিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল, এবং দুই পাখির সঙ্গীতের শ্রোতা এত জমে গেল যে হুজুরের উঠোনে সকলের স্থান-সঙ্কুলান দুর্ঘট হয়ে পড়ল। কোনোমতে সকলকে তুষ্ট করে কর্ম্মচারী হুজুরে হাজির হয়েছেন। হুজুরের তাকিয়ার বামপার্শ্বে বাতি ও পুষ্পমাল্য ও তাম্বুলাদি, আর দক্ষিণে অধ্যাপক শাস্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশের দল। মজ্‌লিস্ দেশের গণ্য-মান্য সঙ্গীত-সভা সঙ্ঘ ও সমিতির সদস্যে ভরা। এ-ছাড়া খবরের কাগজওয়ালারও শুভাগমন হয়েছিল। অধ্যাপক প্রথমে

স্বরচিত স্বস্তি-বাচন পত্রখানি পাঠ করলে পর কর্ম্মচারী নম্বর-এক বিহঙ্গকে হুজুরে দস্তুরমত পেশ কল্লেন; হুজুরও তাঁকে যথাযথ আপ্যায়িত করে গানের জন্য ধরে পড়লেন! নম্বর-এক এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ভালোমানুষটির মত অপেক্ষা করছিলেন, হুজুরের অভয় পেয়ে বরাবর অধ্যাপকদের নিকটে গিয়েই উপবেশন করলেন এবং তাঁদের হাতের কুশমুষ্টির দিকে মুখ বাড়িয়ে একটিমাত্র হাম্বা রব করেই ক্ষান্ত হলেন। এখানে হুজুরের দৃষ্টি কর্ম্মচারীর দিকে পড়বামাত্র তিনি দুই-নম্বরকে হাজির কল্লেন। মজ্‌লিসে প্রবেশ করেই নম্বর-দুই বাতির চারিদিকে ভ্রাম্যমান একটি মশাকে গ্রাস করে ফেল্লেন; এবং হুজুরকে একবার মক্‌মক্ শব্দে আশীর্ব্বাদ করেই আকাশের দিকে দুই চক্ষু পাকিয়ে পুষ্পমাল্যের থালার উপরে গম্ভীর মূর্ত্তি ধরে বসলেন।

সকলের মুখে কেমন-একটু নিরাশ ভাব দেখা গেল এবং মজলিসের বাহিরের লোক যারা নিমন্ত্রণ পায়নি তারা যেন একটু টিটকার দেবার উদ্যোগ করলে। সকলকারই মনে হচ্ছে পাখি-সম্বন্ধে কোথায় যেন একটু গোল রয়ে গেছে। হুজুর পর্য্যন্ত কেউ তাঁরা পাখিকে কখনো দেখেনও নি, দেখবার চেষ্টাও পান্‌নি। সুতরাং সবাই বিজ্ঞ হয়ে বসলেন এবং এই দুই জীবের সুর লয় তান নাদ নিনাদাদি সম্বন্ধে বিচার ও সুখ্যাতির চূড়ান্ত করে ও বিদেশীরা যে পাখির সুখ্যাতি করেছেন তাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিয়ে মজলিস্ ভঙ্গ কল্লেন। পণ্ডিত এই সময় কর্ম্মচারীর কানে গিয়ে পরামর্শ দিলেন—"ওহে এ দুটোকে হুজুরে কি বলে হাজির কল্লে? এর একটা গোবৎস আর একটা কূপমণ্ডুক,—কোনো পুরুষে পাখি নয়! একটাকে গো-রক্ষিণীতে পাঠিয়ে দাও, আর-একটা নিয়ে তুমি মশাবংশ ধ্বংস কর গিয়ে।" কর্ম্মচারী এতগুলো কথার জবাবে বল্লেন,—চুট্!

মজলিসের দেউড়ির বাইরে সেই কচি মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। সে কর্ম্মচারীকে আসল পাখির খবর দিতেই এসেছিল। কিন্তু পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখে সে আর কর্ম্মচারীর কাছে যেতে সাহসই পেলে না।

হুজুর ঘরে এসে মিথ্যার ঝুড়ি বিদেশী বইগুলোকে জ্বালিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কর্ম্মচারীর ঘর থেকেও সেদিন অনেক রাত্রে একটু কাগজ-পোড়া গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল আর বুধ-বৃহস্পতি-সভার পুঁথি-রক্ষককে ওখান থেকে ঠিক তেমনি সময়েই পকেটে হাত দিয়ে হাসিমুখে বার হতে দেখা গিয়েছিল।

বিদেশীয় "সুরসিক-সভায়" হুজুরের মজলিসের বিবরণ এবং পাখির সম্বন্ধে উক্ত মজলিসের চূড়ান্ত মীমাংসার খবর পৌঁছেছিল নিশ্চয়! কেননা হুজুরের যারা হুজুর এমন-সব দেশীয় ছেলে-ছোকরা ও স্কুল-বয়ের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বুড়ো বুড়ো যত বিদেশীয় মহাপণ্ডিতেরা হুজুরকে একটা রং-চঙে টিনের পাখি প্রাইজ পাঠালেন, তার পেটে একটা গ্রামোফোন ও মোহিনী ফ্লুট পোরা ছিল। শুভদিন দেখে দেশের যত লক্ষ্মী-ছেলেরা সেই পাখিটা নিয়ে খুব ঘটা করে হুজুরকে একটা অভ্যর্থনা দিতে

এল এবং মজলিসের মধ্যিখানে এসে যন্ত্রটায় কসে দম লাগিয়ে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করে রইল। দু-চারটে মোটা গলা, দু-দশটা মিহি গলার গানের পর ফোন্‌টা একেবারে চুপ করেই প্রকাণ্ড ঝড়ের মত একটা হাসি সুরু কল্লে, - সে একেবারে বিলিতি হাসি, তার চোটে হুজুরের পুরোনো মজলিস্-ঘরের দেওয়াল, চটেফেটে চৌচীর হয়ে হাওয়ার মুখে তাসের বাড়ির মত ভেঙে পড়ল—একেবারে হুজুর, তাঁর কর্ম্মচারী ও সদস্য-বৃন্দের ঘাড়ের উপরে! ঠুন্‌কো মাটির দেওয়াল, আঘাত মোটেই মারাত্মক হল না, কেবল সকলে বিষম ভয়-খেয়ে চীৎকার করতে লাগল– "'ওরে গোহত্যা কল্লেরে!" এই সময় সেই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দিক থেকে যত লক্ষ্মীছাড়া—তারা সেই ছোটজাতের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে হুজুরের ভাঙা মজলিসে দল-বেঁধে দেখা দিলে। সেই মেয়ের গলায় পাখির গানের স্থর হীরের সাত-নলী হারের মত ঝক্‌ঝক্ করছে!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচ্ছদ-পরিচারিকা

(প্রসিদ্ধ ফরাসী-কবি Francois Coppée-র ফরাসী হইতে)

ওদেয়োঁ থিয়েটারে আজ রাত্রে "প্রেমের প্রলয়" প্রথমেই অভিনীত হইবে। চারু-বেণী মারিনেটের ভূমিকা গ্রহণ করিবে। এখনো সে রঙ্গমঞ্চে আছে। এমনসময় ফাব্রেক পরী-রাণীর নির্দ্দিষ্ট সাজঘরে দরজায় ঘা না দিয়াই, দরজা একটু ফাঁক্ করিয়া বলিয়া উঠিল ঃ—"কু কু"।

ফাব্রেকের দাড়ি সোনালী রঙের; চল্লিশ বৎসর বয়স সত্ত্বেও তাহার মুখে নবীন যুবকের ভাব। সব প্রধান থিয়েটারেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। চারুবেণী একবার ঐ থিয়েটারে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল। নাটকের বদমায়েসটা নায়িকার সাজগোজের এলোমেলো অবস্থাতেই তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতে চাহে। চারুবেণী বলিয়া উঠিল—"ছিছি, আমি মানা করচি আমার দিকে তাকিও না, ঐদিকে মুখ ফিরিয়ে থাক,—ছিছি পুরুষগুলোর কি আক্কেল! রোসো, আগে আমার মাথায় কাঁটাটা পরেনি"—এই বলিয়া সে যেরূপ অলীক লজ্জা ও কোপের ভাণ করিয়াছিল, এবং যেরূপ হাবভাবের অভিনয় করিয়াছিল, তাহাতে ফাব্রেকের বড়ই আমোদ বোধ হইয়াছিল। তাই সে পরী-রাণীর সহিত আজ আলাপ-পরিচয় করিতে তাহার সাজঘরে ঢুকিয়াছে।

কিন্তু তাহার সাজঘর খালি দেখিয়া ফাব্রেক একটু নিরাশ হইল। এই সময়ে অভিনেত্রীর পরিচ্ছদ-পরিচারিকা বৃদ্ধা "সৌরভী" একটা পর্দ্দার পিছন হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"আপনি যদি কষ্টস্বীকার করে' একটু

বসেন * * * অভিনয় শেষ হল বলে’— পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠাকুরাণী এখানে আস্‌বেন।”

ফাব্রেক্ পায়ের উপর পা রাখিয়া ফুল-কাটা গদি-ওয়ালা একটা আরাম-চৌকীতে বসিয়া পড়িল। এবং হস্তস্থিত ছড়ির ডগা দিয়া বুটজুতায় ঘা মারিতে মারিতে নানা-প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িল। এদিকে বৃদ্ধা পরিচারিকা টয়্‌লেট্-টেবিলের উপর ছোটখাটো জিনিসগুলা গুছাইয়া রাখিল।

সে যাই হোক্, পরী-রাণীর ঘরে সে কি কাজে আসিয়াছে? ভালবাসার খাতিরে নহে। কোনপ্রকার লালসা চরিতার্থের জন্যও নহে। একদিন যখন ফেব্রেক্ পরি-রাণীর খুব সাধ্যসাধনা করিতেছিল, পরী-রাণী বেশ ধীর বিবেচকের মত তাকে এই কথা বলে:—“আমার একটা কথা শুনুন, আপনি বড় ভদ্র। আমার চল্লিশ হাজার টাকা ধার আছে। আর আপনাদের ত আর সে দিন নেই—সেই “প্যালামা”র সুসময় * * * আপনার যত ইচ্ছে আমার সঙ্গে বোসে খোস্-গল্প করবেন, কিন্তু বন্ধুত্ব ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক থাক্‌বে না।” পরী-রাণী ন্যায্য কথাই বলিয়াছিল। তথাপি, রমণীর প্রতি পুরুষের যেরূপ একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, সেই নিঃস্বার্থ আকর্ষণের টানেই সে সর্ব্বদাই পরী-রাণীর নিকট আসিত। কেননা সে সুন্দরী অভিনেত্রীদের কথায়বার্ত্তায়, রসিকতায় বড়ই আমোদ পাইত। আসল কথা, কোনপ্রকারে সময় কাটানো চাই।

এইসব ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সেই পরিচারিকার দিকে তাহার নজর পড়িল; টয়্‌লেট-আয়নায় সেই ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধার মুখের যে ছায়া পড়িয়াছে, সেই মুখের ছায়া দেখিয়া হঠাৎ যেন তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। কি ধ্বংসাবশেষ! কি লোমহর্ষণ কদর্য্যতা! দেহযষ্টি ছড়িগাছার মত শুক্‌নো, গণ্ডদেশ শীতকালের আপেলের মত চোপ্‌সানো, বলি-রেখাচ্ছন্ন, মাথায় ছাইরঙের একটা পর-চুলো, মড়ার মত চোখ, একটা হল্‌দে লম্বা দাঁত বেগুনীরঙের ঠোঁট কামড়াইয়া আছে—উঃ, দেখিলে ভয় হয়! কে বলিবে একসময় সে রমণী ছিল, হয়ত রূপসী রমণী,—অবশ্য কত ভালবাসাও পাইয়াছে। এখন উহার বয়স অন্ততঃ ৭৪ হইবে। ফাব্রেকের হৃদয় খারাপ ছিলনা—এই শোচনীয়া বৃদ্ধার শেষদশাতেও খাটুনী শেষ হয় নাই দেখিয়া তাহার দয়া হইল। কিন্তু ছেঁড়া-খোঁড়া কালোরঙের শোকবস্ত্র-পরিহিতা ডাইনী-বুড়ির মত উহার চেহারা দেখিয়া এই সৌখীন মেজাজের লোকটির কেমন একটা ঘৃণাও হইল। উহার মনে হইল, এইসব ভাল ভাল জরির ফিতা, এইসব খোদাই কাজ-করা রূপার সুন্দর জিনিস-গুলি, এইসব ঝিনুকের চিরুণী—এই সমস্ত বিলাস সামগ্রী, এইসব সুকুমার সুগন্ধের শিশিগুলি উহার স্পর্শে যেন মলিন হইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ দ্বার খুলিল; পরী-রাণী ঘরে প্রবেশ করিল। কাণে একটি গোলাপ; যে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল সেই নায়িকার মনোহর জমকালো বেশ। পরী-রাণী সদ্য-উৎপাটিত কুসুমগুচ্ছের মত

তাজা; রূপ, যৌবন, রং-মাখান মুখের রং, ও সেইসঙ্গে প্রগল্‌ভতাও যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বলিয়া উঠিল :—

"আপনি এসেছেন? কি সৌভাগ্য! বেশ বেশ! আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন; আসুন, একটু গল্পস্বল্প করা যাক্‌...ওরা এখনি আমাকে ও আমার সঙ্গিনীদিগকে এই থিয়েটারের সাজেই "গেইটি" থিয়েটারে নিয়ে যাবে—সেখানে আজ "বেনেফিট্‌ নাইটের" অভিনয়।...বসুন, বসুন।"

ইহার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা পরিচারিকা পর্দ্দার পিছনে চলিয়া গিয়াছিল। খুব কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এবং পরী-রাণী তাহার চির-অভ্যাস-অনুসারে, থিয়েটার-মহলে ফাব্রেক কত রমণীর হৃদয় জয় করিয়াছে তাই লইয়া তাহাকে ঠাট্টামস্‌করা করিতে লাগিল। লোকে যে বলে আপনি '—'র প্রেমে পড়েছিলেন, সে কথা কি সত্যি? কিন্তু ফাব্রেক খুব সাবধানী লোক। বেফাঁস কথা তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হয়না। ফাব্রেক হাসিয়া রসিকতা করিয়া উহার প্রশ্নটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আসল কথার কিছুই উত্তর দিল না। পরী-রাণী একটু বিরক্ত হইল। দেখিল ফাব্রেকের পেটের কথা কিছুতেই বাহির করা যায় না।

অবশেষে ফাব্রেক্‌ পরী-রাণীকে একটু প্রসন্ন করিবার জন্য একটু হাসিতে হাসিতে বলিল :—

ভাল, পরী-রাণী তোমার এতই যখন শোন্‌বার আগ্রহ, তোমায় আমায় প্রথম ভালবাসার গল্পটা বলি।

—কোনো থিয়েটারের রমণী সেই ভালবাসার পাত্র?

—হাঁ, কিন্তু আগে থাক্‌তেই তোমাকে বলে রাখি, সে সমাজ-ছাড়া ছিলনা...আমার তখন ১৯ বৎসর বয়স, আইন পড়তে সবে আরম্ভ করেছি। তখন আমি নিতান্ত অবোধ সরল ও ভীরু ছিলেম!...একদিন সায়াহ্নে গব্লিন্‌ থিয়েটারে ঢুকে পড়লেম, সেখানে "প্রবাসী পথিক"-এর অভিনয় হচ্ছিল; সেখানকার প্রধান তরুণী অভিনেত্রীর অভিনয় দেখে তার প্রেমে একেবারে বজ্র মুগ্ধ হয়ে পড়লেম। তাকে সবাই "রজনী-গন্ধা" বলে ডাকৃত...যখন সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলে, তখন থেকেই...আমি মনে-মনে ভাব্‌তে লাগলেম; সত্যই কি ওর অত অল্পবয়স? সত্যই কি ও রূপসী? এখন ত আমি বেশ জানি, একটু "কোল্ড্‌ক্রীম" ও দুটো গাম্‌ছার প্রয়োগেই অভিনেত্রীর রূপ ধুয়ে-মুছে যায়, আর তাদের প্রেমে পড়ে সাধারণতঃ সৈন্যশ্রেণীর কতকগুলি নির্ব্বোধ আনাড়ী সুবেদার, জমাদার অথবা সব-ডেপুটী। কিন্তু তখন রমণীর মধ্যে রজনী-গন্ধাই আমার একান্ত কামনার ধন ছিল; তার কথা ভাবা, তার স্বপ্ন দেখাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ ছিল। যে-দিন যে-থিয়েটারে সে অভিনয় করত, আমি সেই থিয়েটারেই যেতেম, আর তাকে দেখে, তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হতেম। ঐ থিয়েটারের দলটা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত। অবশেষে আমার সমস্ত আইনের বই বিক্রি করে ফেল্লেম,...রজনীগন্ধার কৃপায়, প্রাচীন গ্রীকনাটকগুলার সঙ্গে আমার বেশ

একটু পরিচয় হয়ে গিয়েছিল—সেইসকল নাটকের নায়িকার ভূমিকা কি-সুন্দর সে অভিনয় করত!…ঐ একমাত্র রমণী যার উদ্দেশে আমি পদ্য-রচনা করেছিলেম;—পদ্যগুলো অতি-যাচ্ছে-তাই হলেও তার মধ্যে একটা অকপট আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু সেইসব কবিতা তার কাছে পাঠাতে আমার সাহসে কুলোয়নি তারপর কলেজের ছুটি হলে, আমাদের নিজের গ্রামে—নিজের পরিবারের মধ্যে চলে এলেম। সেখানে গিয়ে, কেবল দিন গুণে ঘণ্টা গুণে সময় কাটাতেম। তারপর প্যারিসে ফিরে এলেম। ফিরে এসেই যে তিন থিয়েটারে রজনীগন্ধা অভিনয় করত সেইসব থিয়েটারে যাতায়াত করতে লাগ্‌লেম। কিন্তু আমার "পরাণ-পুতলী"র নাম ঐসব থিয়েটারে দেয়ালে-আঁটা কোন ছাপানো বিজ্ঞাপনে দেখ্‌তে পেলেম না। আমার মনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার তাড়নায়, একটু সাহস করে, দরোয়ানের ঘরে ঢুকে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেম, রজনীগন্ধার এই রঙ্গালয়ে অভিনয়ের কোন বন্দোবস্ত হয়েছে কি না, রজনীগন্ধার সম্বন্ধে সে কিছু জানে কিনা…পরী-রাণী, আমার কথা বিশ্বাস কর,—সে দিন আমি ভালবাসার কষ্ট যে-রকম অনুভব করেছিলেম এমন আর জীবনে কখন করি নি। কত দীর্ঘ মাসের পর তবে আপনাকে একটু আমি প্রকৃতিস্থ করতে পেরেছিলেম।

অভিনেত্রী বলিল ঃ—

—এই শুধু? তার পর আর কিছু নেই? "আমার কথাটি ফুরোলো আর নটে গাছটি মুড়োল"?

—তা নয় ত কি।

—আপনি দেখ্‌ছি লোকের চোখে খুব ধূলো দিতে পারেন। শুধু ছাত্রজীবনের গল্প বলেই সেরে দিলেন? তা হচ্চে না মশায়…

ঠিক্ এই সময়ে হঠাৎ অভিনেত্রীর কাম্‌রার দাসী কামরার মধ্যে হুড়্‌মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

"ঠাক্‌রুণ, ঠাক্‌রুণ,…ওঁরা সবাই গাড়ীতে উঠ্‌ছেন—শুধু আপনার জন্য অপেক্ষা করচেন।"

সিঁড়ির উপর হইতে, থিয়েটারের একজন ম্যানেজার হাঁক্ দিয়া ডাকিল ঃ—"শ্রীমতী পরী-রাণী…শিঘ্‌গির! দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

তারপর, একমিনিটের মধ্যেই, কাম্‌রার চাকরাণী, পরিচ্ছদ-পরিচারিকার হস্ত হইতে বোচ্‌কা-বুচ্‌কি গ্রহণ করিল। পরী-রাণী একটা ওড়না পরিয়া লইল। "মশায়, বিদায় হলেম।" চাক্‌রাণীর সঙ্গে পরী-রাণী প্রস্থান করিল।

ফাব্রেকও যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল; এমন সময়, গৌরভী বুড়ী আস্তে আস্তে নিকটে আসিল এবং তাহার কষ্টের মুখখানি তুলিয়া ফ্যাব্রেকের পানে চাহিয়া রহিল। সসংকোচে ভয়ে-ভয়ে সে গুনগুন করিয়া বলিল ঃ—

"মশায়!"

—অ্যাঁ?…কি বাছা?…

—আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে…দেখুন, আমি বড়ই শ্রান্ত। আমার স্বাস্থ্য একেবারেই গেছে। আমি এখন অতি• কষ্টে আমার কাজ করছি…তাই, কোন আতুরাশ্রমে আমি আশ্রয় নিতে চাই।

ফাব্রেক অন্যমনস্কভাবে বলিল :—

"আচ্ছা বেশ, পরে, আমাকে পত্রের দ্বারা জানিও।

কিন্তু পরিচ্ছদ-পরিচারিকা সব কথা এখনো বলে নাই। "তারপর, মশায়, একটা কথা শুন্‌লে আমার উপর আপনার আর একটু বেশী দরদ হতে পারে…ঠাকরণের সঙ্গে আপনি এইমাত্র যে কথা-বার্ত্তা কচ্ছিলেন, আমি সব শুনেছি।…তবে বলি, —আমিই সেই "রজনীগন্ধা"।

ফাব্রেক বিস্ময়সূচক একটা কথা বলিয়াই এক-পা পিছু হটিল। রজনীগন্ধা! কালো ছেঁড়া-কাপড়-পরা, ডাইনীর মত চেহারা এই বৃদ্ধারমণী—রজনীগন্ধা!

বিচলিত ও আতঙ্কিত হইয়া ফাব্রেক বলিয়া উঠিল :—তোমার বয়স তবে কত হবে?

বৃদ্ধার মুখে একটু করুণ হাসির রেখা দেখা দিল।

"আমাকে দেখ্‌লে যে-রকম মনে হয়, আমার অতটা বয়স নয়। সত্যি কথা বল্‌চি। আমি এত কষ্ট পেয়েছি…আমার এখন ৬২ বৎসর বয়স—সহরতলীতে আপনি যখন আমার অভিনয় দেখেছিলেন, তখন আমার বয়স ৪১ বৎসর…মনে হয় যেন সেদিনের কথা…রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের বয়স বড়-একটা জানা যায় না—তবু ত তার একটা সীমা আছে…যাই হোক্ আমার সেই বৎসরেই ওরা আমাকে জবাব দেয়—ওরা মনে করলে, আমি একটু বেশী বুড়ী হয়ে পড়েছি…আর তখন থেকেই আমার দুঃখকষ্ট আরম্ভ হয়…থিয়েটার ছাড়বার তিনমাস পরে, আমি বাড়ীওয়ালীর কাজ করতে লাগ্‌লেম। তার অনেকদিন পরে, আমার এক পুরোনো বন্ধু, যে এই থিয়েটারে বুড়ো সাজ্‌ত, সে আমার এই পরিচ্ছদ-পরিচারিকার কাজটি জুটিয়ে দেয়—কিন্তু আর আমার কাজ করবার শক্তি নেই—এখন আতুরাশ্রম ছাড়া আর আমার গতি নেই…এখন আমি আতুরাশ্রমের আশ্রয় চাই—আপনি পার্লেমেণ্ট সভার একজন প্রতিনিধি, আপনি যদি আতুরাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষকে…আমার আসল নাম "পেয়ারী"…আর যখন একসময়ে আমার উপর আপনার একটু সুদৃষ্টি ছিল…"

এই কথা বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল—ভয় হইল পাছে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় ফাব্রেক অসন্তুষ্ট হন।

পরিচারিকার সৌভাগ্য,—ফাব্রেকের হৃদয়টা ভাল ছিল। ঈষৎকম্পিত স্বরে ফাব্রেক বলিলেন :—

"আমি যাব…কালই আমি যাব। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আতুরাশ্রমের লোকদের বলে কয়ে যাতে তোমার একটা কিনারা হয়, আমি তা করব।" এই কথা বলিয়াই পকেটে হাত গুঁজিয়া ফাব্রেক আবার বলিল—"আপাতত তোমার খর্চ্চার জন্য কিছু…"

পরিচারিকা হাতযোড় করিয়া, একটু উন্নত গর্ব্বের সহিত অস্বীকারসূচক ভঙ্গী করিয়া এই কথা বলিল :—

"আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ—আমি শুধু অতুরাশ্রমে যেতে চাই, আর কিছু না…সেখানে আশ্রয় পেলে, আমি "শিল্পী-সমাজ"

থেকে যে বার্ষিক বৃত্তি পাই, তাতেই আমার বেশ চলে যাবে,—আমি খুব সুখে থাক্‌ব।”

ফাব্রেক যাইবার আগে খুব হৃদ্যতার সহিত পরিচারিকার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু পরিচারিকা যখন তাঁহার হাতে হাত রাখিল, তিনি একটু শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—২০ বৎসর পূর্ব্বে, যদি ঐ হাতের উপরে তাঁহার যৌবনকালের একটি সসঙ্কোচ চুম্বন স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে আনন্দে তাঁহার অশ্রুপাত হইত।

থিয়েটারের সরু ঢাকা-বারাণ্ডা-পথ দিয়া যাইবার সময় তাঁর বুক্‌টা একটু কাঁপিতে লাগিল। আর আজব সহর প্যারিসের আজব কাণ্ডের বিপুল অভিজ্ঞতা সত্বেও, যার উপর তাঁর প্রথম ভালবাসা পড়িয়াছিল, তার জন্য অতুরাশ্রমের একটি শয্যা যোগাড় করিয়া দিতে হইবে মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বেচ্ছাচারী

৪

সর্ব্বানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে শশিভূষণ তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, “কি করে এলে?”

সর্ব্বানন্দ বলিল, “তোমার লোকটিকে টাকা-কড়ি দিয়ে একটা ঘর ঠিক করে ওখানে বসিয়ে রেখে এলুম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ঐ রকম বোকা লোক কার্ত্তিকের সমস্ত কাজ-কর্ম্মে নজর রাখতে পারবে।”

শশিভূষণ কহিল, “বোঝো একবার ওর ক্ষমতা! তোমার চোখেও ধুলো দিয়েছে! তুমিও বুঝতে পারনি যে ও কেমন লোক। ঐ রকম লোকের দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার হবে। কার্ত্তিক বুঝতেই পারবে না যে ওর উপর আমাদের দৃষ্টি আছে, অথচ কাজ বেশ হয়ে যাবে।”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “কিন্তু আমার মনে হয়, কার্ত্তিক কিছুই গোপনে করবে না, ওর সয়তানী খোলাখুলি রকমেরই হবে। বিষয় আশয় বোধ হয় ও ওড়াবে না, কারণ এতটা নীচপ্রবৃত্তি ওর নয় যে, যে বিষয়ের ও ধর্ম্মত ট্রষ্টিমাত্র, তা উড়িয়ে পুড়িয়ে নীচের মত প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু খুড়োমশায়ের উপরও যখন ওর আক্রোশ হয়েছে, তখন আবার ওর দ্বারা সবই সম্ভব, মনে হয়। কি আশ্চর্য্য, ঠাকুর্দ্দা, সাধারণ মানুষে যা পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, তা পেয়েও নিজেকে ও এতখানি অপমানিত জ্ঞান করছে!”

শশিভূষণ কহিল, “ওর কাছে নিজের ইচ্ছেটাই সব-চাইতে বড়। নিজেকে ও এত বড় করে চিরদিন দেখছে যে অনিচ্ছায় পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব পেলেও ওর মনস্তুষ্টি

হবে না। যাক ও কথা, শৈলর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কাল তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

শশিভূষণ কহিল, "কি রকম দেখলে ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "দেখলুম যা, তা আর বলে কি হবে ?"

শশিভূষণ কহিল, "তুমি কি বল্‌লে ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেমন আছ, শৈল ?' সে হেসে বললে, 'ভালই আছি।' কিন্তু সেই হাসিটুকু অশ্রুর চেয়েও বেদনায় ভরা। সেজন্য আমি স্পষ্টই বল্‌লুম, 'শৈল, তুমি আমায় সব কথা খুলে বল, আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।' প্রথমে সে ত কিছুই বলতে চায় না, শেষে অনেক সাধ্য-সাধ্যনায় বললে, 'আমার দুঃখ কাউকে বোঝানো যাবে না!' আমি বল্‌লুম, 'কেন যাবে না ? তুমি বল, আমি বুঝব। কার্ত্তিক কি এতদূর অধঃপাতে গেছে যে তোমাকেও সে কষ্ট দেয় ?' শৈল তখন কেঁদে ফেলে বল্লে, 'অমন কথা আপনি বলবেন না। উনি প্রাণপণে আমায় সুখী করবার চেষ্টা করছেন। কখনও অনাদর করেন নি, বা একদিনের জন্যও আমায় একটা রুক্ষ কথা বলেন নি। সে বিষয়ে ওঁর কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু আমিই হতভাগিনী, তাই এমন স্বামী পেয়েও সুখী হতে পারছি না।' এতেই বুঝতে পারছ ঠাকুরদা, যে কার্ত্তিকের সয়তানী কি রকম সূক্ষ্ম ধরণের। বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝবার জো নেই।"

শশী কহিল, "আর এতেই বুঝতে পারছ যে ওর সঙ্গে কি রকম সাবধানে চলতে হবে! ও-সব কথা যাক্—এখন এধারে এক মুস্কিলে পড়া গেছে যে, তোমার point systemএ শিখতে কেউ রাজী হয় না। ছেলেদের বাপ-মা-রাও সব বাধা দিচ্ছে, মাষ্টাররা বাধা দিচ্ছে, এমন কি সরোজ পর্য্যন্ত রেগে আগুন হয়ে গিয়েছে। এখন উপায় কি ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "কারুর উপর পরখ না করলে ত কেউ ওটা নিতে চাইবে না। যেমন করে হোক একজনকে দিয়েও দেখতে হবে। আচ্ছা, সুকু, কি বলে ?"

শশী কহিল, "ওর বয়স একটু বেশী হয়ে গিয়েছে না ?"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স বেশী নয়, ও বয়সে নতুন করে আরম্ভ করা চলে। ও যদি রাজী হয় ত আমি বলি তুমি নিজেই লেগে পড়।"

শশী কহিল, "তোমার system ভাই আমি নিজেই তেমন আয়ত্ত করতে পারি নি। যদি পরীক্ষা করতে হয় ত তুমিই কর। আমি আর নতুন করে আরম্ভ করতে পারিনে।"

সর্ব্বানন্দ কহিল, "বেশ কথা, আমিই করব।"

সন্ধ্যার পর সরোজ ও সুকুমারীর নিকট এ প্রস্তাব উঠিলে, সরোজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আহা, সুকু বেচারীর এ কূল ও কূল দু কূল নষ্ট করবে ? একে ত বেচারী অতি-কষ্টে যা হোক কিছু শিখেছে, তার উপর নতুন করে আর একটা পদ্ধতির ভার ওর ওপর চাপিয়ো না, দোহাই তোমাদের

—ও বেচারী কিছু বলতেও পারবে না, অথচ তোমরা ওর জীবনের সমস্ত চেষ্টাটুকু ব্যর্থ করে দেবে। কেন? আর কোন ছোট ছেলে-মেয়ে কি অত বড় ইস্কুলের মধ্যে মিল্‌ল না, যে আমার সুকুকেই তোমাদের বৈজ্ঞানিক অত্যাচার সইতে হবে?”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “তুমিও যদি সাধারণ অবুঝ লোকের মত বাধা দাও সরোজ, তাহলে আর আমাদের আশা নেই। আমি বলছি, সুকুর কোন ক্ষতি হবে না। ও যা শিখেছে, তাও ওকে ভুলতে দেব না, অথচ যদি ওর দ্বারা এই পদ্ধতিটা চালাতে পারি, তাতে সকলেরই উপকার হবে। আমি বলছি যে যদি এর জন্য আমায় দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করতে হয়, তা করতেও আমি প্রস্তুত আছি। এখন চাই কেবল তোমাদের সহকারিতা, আর উৎসাহ। কিন্তু তোমরা যদি এমনভাবে বেঁকে দাঁড়াও তাহলে আমরা করি কি?”

সরোজ কহিল, “গতানুগতিকভাবে চলাই সাধারণের পক্ষে নিরাপদ, বিশেষ অন্ধের পক্ষে অচেনা পথ মাড়াতেই নেই। আমার এ বিষয়ে যা মত, তা তোমাদের জানিয়ে দিলুম, এখন তোমাদের যা ইচ্ছে হয় তাই কর।”

সর্ব্বানন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “নিরুপায়!”

সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুকুমারী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “আমি আপনার নতুন পদ্ধতি শিখব। সরো দিদি, তুমি আর বাধা দিয়ো না; যা হয় আমার ভাগ্যেই হবে।”

সর্ব্বানন্দ সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সুকুমারীর অন্ধ নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, “সুকু, বাঁচালে তুমি। তোমায় যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা ভেবে পাচ্ছি না। আমি বলছি, তুমি আমার উপর নির্ভর কর, এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি প্রাণপণ চেষ্টায় তোমায় এমন করে তুলব যে তুমি আমাদের ইস্কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রী হবে।”

সুকুমারী কহিল, “আমি যাই হই, তাতে কিছুই আসবে-যাবে না, কিন্তু আপনার যে প্রথম ছাত্রী আমিই হব, সেইটেই আমার প্রধান গর্ব্বের জিনিষ হবে।”

সর্ব্বানন্দ পরমানন্দে সুকুমারীর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সুকুমারী তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে সরোজ বলিল, “ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের এই মিলিত চেষ্টার ফল যেন অনাথ অন্ধদের পক্ষে পথের আলো নিয়ে আসে। আর—”

সরোকে হঠাৎ থামিতে দেখিয়া সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল,—“আর কি?”

সরোজ কহিল, “আর কি? যদি রাগ না কর ত বলি।”

সর্ব্বানন্দ কহিল, “রাগ! কবে তুমি আমায় রাগ করতে দেখেছ?”

সরোজ কহিল, “কখনও না, তাই বলছি, শিক্ষক-ছাত্রীর এই মিলন অক্ষয় হোক। তোমরা জীবনের পথে এখন থেকে দু'জনে মিলে এক হয়ে চল। তোমাদের চেষ্টার একত্বের সঙ্গে মন, বুদ্ধি, আত্মা সবই এক হোক!”

সুকুমারী তাহার সলজ্জ মুখ নত করিল। সর্ব্বানন্দ হাসিয়া বলিল, "তোমার ভুল হচ্চে, আমি সুকুর হয়ে উপনিষদের ভাষায় বলি "ওঁ সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।"

সর্ব্বানন্দ ভক্তিভরে "ওঁ হরি ওঁ" বলিয়া প্রণামান্তে প্রস্থান করিল। সরোজ হাস্য-মুখে সুকুমারীকে টানিয়া বুকের মধ্যে লইয়া বলিল, "সুকু, কাঁদছিস কেন, বোন?"

সুকুমারী অশ্রু-গদ্গদ স্বরে বলিল, "অন্ধকে নিয়ে এ রকম খেলা কি নিষ্ঠুরতা নয়?"

সরোজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সুকু, তোর হাতে ধরে বলছি, ভুল বুঝিস নে, সন্দেহ করিস নে। সন্দেহ করে ভুল বুঝে জগতে কত লোক যে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছে, তার ঠিক নেই। এখন থেকে যে আনন্দ আসতে চায়, তাকে ভগবানের দান মনে করে নির্ব্বিচারে গ্রহণ কর্। আমি তোর বড় বোন, আমার কাছে লজ্জা কি? তুই আমার বুকের উপর কান পেতে শোন্, আমার মধ্যে কি হচ্চে। তাহলেই বুঝতে পারবি যে সন্দেহ করা কত বড় অপরাধ। আর সে অপরাধের শাস্তিও কত গভীর!"

সুকুমারী মুখ না তুলিয়া বলিল, "তুমি কাকে সন্দেহ করেছিলে সরো-দি?"

সরোজ কহিল, "সন্দেহ কাকে করেছিলুম? সব-চেয়ে সন্দেহ করেছিলুম আমি নিজেকে। যাক্, আর ও কথা নয়। এখন তোর কথা বল্?"

সুকু কহিল, "আমার ত কিছুই বলবার নেই।"

সরোজ কহিল, "তাই হোক বোন, তাই হোক, জীবনে যেন তোমার কিছুই বলবার না থাকে; যেন কারো কাছে জবাবদিহি করবার একটা ভার বহন করে তোমায় জীবন কাটাতে না হয়! তোমার জীবনে সবই যেন সহজ, সরল থাকে, স্পষ্ট থাকে!"

সরোজ ও সুকুমারী পরস্পরের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় চিন্ময়ী প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "সুকু, তুই নাকি সব্ব'র নতুন ধরণের লেখা শিখতে রাজী হয়েছিস্?"

সুকুমারী সরিয়া বসিয়া বলিল, "হাঁ মা।"

চিন্ময়ী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আহা, সব্ব আমার ভারী খুসী হয়েছে। তুই দেখিস্ সরোজ, সব্ব নিশ্চয়ই সুকুকে এমন তৈরি করে তুলবে যে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এর জন্য তোকে শশী কত আশীর্ব্বাদ করছে।"

সরোজ কহিল, "শশিদা কখন এল?"

চিন্ময়ী কহিলেন, "আমার ঘরে অনেকক্ষণ থেকেই ও এসে বসে ছিল। তোর সঙ্গে তর্কের ভয়ে এখানে আসে নি। সব্ব যখন গিয়ে খবর দিলে, তখন সে লাফিয়ে উঠল। তারপর দুজনে ইংরিজিতে কি বলাবলি সুরু করে দিয়েছে। সব্ব আমায় বল্লে যে আজ তার এত আহ্লাদ হয়েছে, যে রাজ্য

পেলেও এমন হত না। সব্বর মত মানুষের কথা ঠেলে সরোজ তুই কি করে অমত করছিলি?”

সরোজ কহিল, “আর আমার মতামতে কি যাবে-আসবে মা? সুকু যখন নির্ব্বিচারে আপনাকে সর্ব্ব-দার হাতে সঁপে দিয়েছে, তখন আমি বাধা দিলুম, আর না দিলুম, তাতে সুকুর কি? সুকু এখন যতদিন ইচ্ছে যা-ইচ্ছে শিখুক না, এখন সুকুর সব ভার সর্ব্ব-দার উপর।”

চিন্ময়ী কহিলেন, “আহা, সব্বর মত মানুষের উপর নির্ভর করবে না ত কার উপর করবে? ভালই করেছিস্ সুকু, দেখিস্, তোর খুব ভাল হবে।”

চিন্ময়ী মহানন্দে চলিয়া গেলেন। সুকুমারী মৃদু স্বরে বলিল, “সরো-দি, তুমি ভাই বড় দুষ্টু।”

৫

আকরে পদ্মরাগানাং জন্মঃ কাচমণেঃ কুতঃ? এই শাস্ত্র-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়া যখন মণিশঙ্করের পৈতৃক বিষয়-বুদ্ধি শিবরামপুরের বিস্তৃত জমিদারীর প্রত্যেক অংশে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন শৈল ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে ধরিয়া বসিল যে মণিশঙ্করকে ছাড়াইয়া দেওয়া হোক; চারিদিক হইতে অত্যাচারের করুণ কাহিনী সে আর শুনিতে পারে না। কার্ত্তিক পুরাদস্তুর জমিদারী চালে উত্তর দিল, জমিদারী রাখিতে হইলে এরূপ না করিলে চলিবে কেন? মণি যাহা করিতেছে, তাহা কার্ত্তিকের উপদেশানুসারেই করিতেছে। তাহাতে মণির কোন দোষ নাই।

শৈল কাঁদিয়া বলিল, “তা বলে কি গরীব বিধবার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করতে হবে, না, পূর্ব্বপুরুষরা যে-সব দেবোত্তর দিয়ে গিয়েছেন, পুকুর দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব কেড়ে নিতে হবে?”

কার্ত্তিক কহিল, “দেবতা স্বয়ং কিছু ভোগ করেন না, মানুষই ভোগ করে। কতকগুলো বাজে লোক ভোগ করছিল, না হয়, আমরাই সেগুলো ভোগ করলুম। দেবতার পক্ষে রামা যে শ্যামাও সে, কার্ত্তিক যে শৈলও সে। আর ব্রহ্মোত্তর? ব্রাহ্মণ আর গঙ্গা কলিতে লোপ পেয়েছে, অতএব ও সব দান অসিদ্ধ। কতকগুলো জোচ্চোরে ফাঁকি দিয়ে ভোগ করছিল, আমি তাদের জব্দ করে দিয়েছি মাত্র।”

শৈল কহিল, “তা হলে কোন্ দিন তুমি বাবার ব্রহ্মোত্তরগুলোও কেড়ে নিয়ে ওঁকে টোল থেকে তাড়াবে বল?”

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, “তা রামার পক্ষে যা করব শ্যামার পক্ষেও তাই করা উচিত বৈ কি!”

শৈল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, “জানিনা কি মতলবে তুমি আমার কাছে এ সব কথা বল! এ কি আমার পরীক্ষার জন্য —না—কিন্তু যাই হোক্—তুমি মণি-দাকে না তাড়াও, অন্তত আমার জন্য যা-যা ও কেড়ে নিচ্ছে, তা ফিরিয়ে দাও। তুমি না দাও ত আমি দেব।”

কার্ত্তিক কহিল, “তা হলে সে খরচা তোমার নিজের এষ্টেট থেকে হবে, আমি দেব না।”

শৈল কহিল, "কেন ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি ত মণির কোন অন্যায়ই দেখতে পাচ্ছি না।"

শৈল কহিল, "অন্যায় দেখতে পাচ্ছ না! মণি যা করছে, সবই ঠিক ?"

কার্ত্তিক কহিল, "আমার ত তাই মনে হয়।"

শৈল কহিল, "তুমি এত দূর অন্ধ হয়ে গিয়েছ!"

কার্ত্তিক কহিল, "সে কথা কি আজ জানলে, শৈল ? আমার দুটী চক্ষুই গিয়েছে, এ দুটো যা দেখছ, এ পাথরের।"

শৈলজা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি সেই কার্ত্তিক, চিরদিন যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহের মত যুদ্ধ করিতে উদ্যত ছিল! এ কি সেই মানুষ!

গভীর দুঃখে শৈলজা কাঁদিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলিল, "অন্ধকারের ঘুরঘুরে পোকাকে আলোয় ধরে রাখবার চেষ্টা করলে সে ত এমনি করে চারদিকে গর্ত্ত খোঁড়বার চেষ্টা করবেই। এর জন্য দুঃখ কেন করছ, শৈল ? আমি ত বলেছি, সুখ আমায় সয় না! তাই চারিদিকে দুঃখের হাহাকার জাগিয়ে তুলে তার মধ্যে চক্ষু মুদে বসে হাসবার চেষ্টা করছি।"

শৈল কহিল, "না, আমি তোমায় এত অধঃপাতে যেতে দেব না। যদি তোমায় রক্ষা করতে না পারি ত আমি কিসের তোমার স্ত্রী ? কিসের আমার ভালবাসা ?"

কার্ত্তিক কহিল, "ঠিক বলেছ শৈল, কিসের ভালবাসা ? কিসের স্নেহ ? সবই মোহ, সবই বন্ধন!"

শৈল কহিল, "তুমি মরণাধিক মরণের দিকে ছুটে চলেছ। কিন্তু কেন যে তোমার এ মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তা বুঝতে পারছিনে।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমিই বুঝতে পারছিনে, তা তুমি! কিসের মোহে, কিসের আকর্ষণে আমার সমস্ত বুদ্ধি সয়তানীর দিকে ছুটে চলেছে, তা যদি বুঝতুম, তা হলে কি আমিই এমন হতে চাইতুম! আমি জানি না, তবু না জেনেই ছুটতে হচ্চে, এমনি আকর্ষণ পতনের, এম্‌নি আকর্ষণ মৃত্যুর, এমনি আকর্ষণ অন্ধকারের!"

শৈল কহিল, "আমি প্রাণ দিয়েও তোমায় বাঁচাব।"

কার্ত্তিক কহিল, "প্রাণ দিয়েও তুমি রক্ষা করতে পারবে না।"

শৈল কহিল, "তবে কি দিয়ে তোমায় রক্ষা করব ?"

কার্ত্তিক কহিল, "সেইটেই তোমায় আবিষ্কার করতে হবে। আমি সেই আশায় বসে আছি। যেদিন সেইটে তুমি ধরতে পারবে, সেদিন দেখবে, আবার আমার চোখ ফুটেছে।"

কার্ত্তিক চলিয়া গেল। আর শৈলজা আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না, কার্ত্তিক কি চায়! সে অনেক বার কার্ত্তিককে বলিয়াছে, যে যদি শৈলকে বিবাহ করিয়া সে অসুখী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কেন শৈলকে ত্যাগ করিয়া যাহাকে পাইলে সুখী হয়, তাহাকেই বিবাহ করে না ? কিন্তু কার্ত্তিক যে তাহাতে রাজী নয়। তবে কার্ত্তিক কি চায় ? কি পাইলে কার্ত্তিক আবার সুস্থ

হইবে, আবার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া পাইবে? শৈলজা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে আর-একটা এমন ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহাতে কার্ত্তিক শৈলর নিকট আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের পত্নী মনোরমা দেবী বহু দিন হইতে রোগে ভুগিতে ছিলেন। শৈলজা নানা উপায়ে তাঁহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই সুস্থ হইলেন না, পুত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মার প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ক্রমশ তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং পরিশেষে একদিন আর দেরী নাই বুঝিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলকে বলিলেন, "বৌমা, আজ আমার শেষ দিন, আজ যদি একবার সে হতভাগাকে দেখতে পেতুম, তাহলে মনে আর কোন ক্ষোভ থাকত না।"

শৈলজা তাহার স্বামীকে বহু অনুনয়, বিনয় করিয়াও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকটে আনিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ তিনি আসবেন।" শৈল কার্ত্তিকের নিকটে গিয়া সব কথা বর্ণনা করিয়া বলিল, "আজ তোমায় তাঁর এই শেষ মুহূর্ত্তে যেতেই হবে। সর্ব্ব-দাদা তাঁর সব কাজ ফেলে যখন আজ পাঁচ দিন থেকে মার কাছে এসে বসে আছেন, তখন তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান হয়ে মার কাছে তাঁর এ শেষ মুহূর্ত্তেও যাবে না? না, তুমি এত নীচ নও।"

কার্ত্তিক কহিল, "আমি যে অন্ধ, আমি যে কাকেও আর দেখতে পাচ্ছিনে, মার কাছে কেমন করে যাব?"

শৈল কহিল, "এস, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব। যদি তুমি অন্ধই হয়ে থাক, তবু আমার চক্ষুই তোমার চক্ষু হবে।"

কার্ত্তিক পরম স্নেহে আজ জীবনে এই প্রথম তাহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, "আমার হাত ধরে তুমি কেমন করে সকলের সুমুখে রাস্তা দিয়ে যাবে?"

শৈল কহিল, "যার স্বামী অন্ধ, তার আবার লজ্জা কি! এস, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব।"

কার্ত্তিক সত্যই পত্নীর হস্ত অবলম্বন করিয়া নিমীলিত নেত্রে মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইল; গিয়া বলিল, "মা, তোমার অন্ধ ছেলে এত দিন পথ দেখতে পায়নি বলে, কেউ তোমার কাছে আমায় পথ দেখিয়ে আনে নি বলে আসতে পারে নি। আজ সে এসেছে। কি বলতে চাও, বল।"

কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মা কাঁদিয়া উঠিলেন। কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "কাঁদছ কেন মা? আমি ত সুস্থ সবল শরীরে বেঁচে রইলুম। ভয় কি, আমার ১০৮ বৎসর পরমায়ু কোষ্ঠীতে লেখা আছে।"

সর্ব্বানন্দ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "মার এমন অবস্থা দেখেও যে সন্তান তাঁর শেষ সময়েও উপহাস করতে আসে—"

কার্ত্তিক কহিল, "তার শাস্তি আজীবন অন্ধতামিস্র নরকে বাস। ভয় কি সর্ব্ব-দা, তাই ত আমার হচ্ছে। মা, তুমি কি অভিশাপ দেবে, দাও।"

মাতা ক্ষীণ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আমার কাছে আয়, কার্ত্তিক—"

কার্ত্তিক বলিল, "কোথায় তুমি—আমি যে দেখতে পাচ্ছি নে।" শৈলজা তাহার হাত ধরিয়া শাশুড়ীর কাছে বসাইয়া দিল। মাতা পুত্রের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা, এই শেষ সময় আশীর্ব্বাদ করতে চাচ্ছি, আমার আশীর্ব্বাদ নিবি নে?"

কার্ত্তিক কহিল, "মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ চর্ম্ম চক্ষে আর না তোমায় দেখতে হয়।"

মনোরমা দেবী কহিলেন, "চোখ চেয়ে ফেল্ বাবা, তা হলেই দেখবি, সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিজের চোখ নিজে বন্ধ করে রাখলে কে তোকে চোখ দেবে, বল্? আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আবার তুই সুস্থ হবি, আবার তুই আগেকার মত হবি।"

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, "মা, তোমার কথা কবে সফল হবে! কবে আবার আমি সংসারকে আমার সেই পুরোনো চোখে দেখতে পাব! কবে এই ভয়ঙ্কর বন্ধন, অন্ধকারের বন্ধন কেটে যাবে!"

মনোরমা কহিলেন, "যে দিন তুই নিজের জোরে সব ঘোর কাটিয়ে ফেলবি।"

কার্ত্তিক কহিল, "তা পারব না মা, আমার হাত-পা বাঁধা। তোমরা যে বাঁধন বেঁধে দিয়েছ, তা যে বাপ-মায়ের বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন, কে তাকে ছিঁড়তে পারবে?"

মনোরমা দেবী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "কি, আমরা তোকে যে বাঁধনে বেঁধে দিয়েছি, তাতেই তোকে অন্ধ করেছি! ওরে সে বন্ধন যেন তোর অক্ষয় হয়! ওরে অন্ধ, যে দিন বুঝতে পারবি যে কি আলো তোর চোখের সামনে ধরে দিয়েছি, সেই দিনই তোর সব ঘোর কেটে যাবে। তুই যদি নিজে চোখ বুজে থাকিস্, তাহলে কি করে সে আলো দেখতে পাবি?"

কার্ত্তিক কহিল, "মা, আমি আলো চাই নে, আমি যে অন্ধকারই চাই।"

মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিবচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্,মনোরমা, হরি নাম কর, কি যা-তা এ সময় বকছ? নারায়ণ বল, হরি বল!" মনোরমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "মা দুর্গা, কোলে নে মা। গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম।"

শ্রীভগবানের মধুর নাম শ্রবণ করিতে করিতে পতি-পুত্রের সম্মুখে মনোরমা দেবী দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্ম হইয়া গেলে কার্ত্তিক বিকট স্বরে হাসিয়া বলিল, "মা, এইবার তুমি আমার অন্ধকারের দেশে গিয়েছ, এবার থেকে সর্ব্বক্ষণ তুমি আমায় দেখতে পাবে। দেহ কিছুই না, ছাই যার অবশিষ্ট থাকে, তা নিয়ে কি হবে? তুমি ছাইয়ের দেহ ছেড়ে যে দেহ নিয়েছ, তাই তোমার যথার্থ দেহ।"

কার্ত্তিক পাগলের মত ছাই উড়াইয়া তাহারই এক অঞ্জলি এক-টুকরা ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ডে বাঁধিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৬

শশিভূষণ হঠাৎ সর্ব্বানন্দর পত্র পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। সর্ব্বানন্দ লিখিয়াছে, "ঠাকুরদা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কার্ত্তিক আমাদের বুঝি-বা অন্ধ হইয়া যায়!

খুড়িমার মৃত্যুর দিন তাহার যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। এখানে আসিয়া শুনিলাম, সে কিছু দিন হইতে দিনে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে, রাত্রে বাহির হইয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখে। বৈষয়িক কোন গোলমাল এখনও দেখা দেয় নাই বটে, কিন্তু যাহার বিষয়, সে এরূপ হইলে পরে যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সে এতদিন পর্য্যন্ত তাহার মার সঙ্গে দেখাই করে নাই, কিন্তু খুড়িমার মৃত্যুকালে সে চক্ষু মুদিয়া শৈলর হাত ধরিয়া আসিয়া মার কাছে দাঁড়ায়। তখন-পর্য্যন্ত মনে করিতেছিলাম যে এ সমস্তই সয়তানী; কিন্তু খুড়িমার মুখাগ্নি করিয়া সে যখন বিকট হাস্য করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন বুঝিলাম যে তাহার কিছুই কৃত্রিম নয়। সে যখন হাতড়াইতে হাতড়াইতে নদীতীর হইতে উপরে আসিয়া বসিল, তখন তাহার চোখের সমস্ত দীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া কি মানুষ অন্ধ হইতে পারে? ভাই, তোমার ত এ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা আছে, কোথাও কি পড়িয়াছ যে মানুষ. কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারা অন্ধতা আনয়ন করিতেছে—কোন ঔষধের দ্বারা নয়? কোন ঔষধের সাহায্যে যদি ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই বেলা সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু আমি সেদিন হইতে তাহার সমস্ত ঘর সমস্ত বাক্স-আলমারি-সিন্দুক পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি, যে লোকটী সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া সে অন্য কিছু করে। অথচ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কার্ত্তিক দিবসে ক্ষীণদৃষ্টি, কিন্তু রাত্রে তাহার অন্য ভাব। পূর্ণ তেজে সে সমস্ত কাজ তখন দেখা-শুনা করে, কৃত্রিম আলোয় তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু দিন আসিলেই সে যেন ভীত হইয়া একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। তাহাকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে বাহিরে আনিবার কথাতেই কাঁপিতে থাকে। নিতান্ত বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিলে সে যেমন ত্রস্তভাবে হাত চাপিয়া ধরে, তাহাতে ভয় হয় যেন সে প্রতি পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার ভয় করিতেছে। এ কি হইল,ভাই? সে এ কি করিয়া বসিল? আমি যে আর তাকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। ঠাকুরদা, কি করিব? কি উপায়ে কার্ত্তিকের চক্ষু দু'টী ফিরিয়া পাইব?"

শশিভূষণ পত্র পড়িয়া উত্তেজিতভাবে আপনার কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। সহসা পরক্ষণেই কি মনে করিয়া তাহার সেই গোপন কক্ষের দ্বার খুলিয়া মৃতা পত্নীর তৈলচিত্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে ঠিক তাহা সেটি যাইতেছিল না বলিয়া সে দরজা-জানালা খুলিয়া দিল। তবু দেখা যায় না! শশিভূষণ নেত্র মার্জ্জনা করিয়া চাহিয়া দেখিল, মূর্ত্তি যেন হাসিতেছে। সে মনে মনে বলিল, অন্ধতার এত আকর্ষণ! আজ কত বৎসর হল তুমি গিয়েছ, তবু তোমার ঐ অন্ধ নয়ন

আমায় বেঁধে রেখেছে। কি দৃঢ় বন্ধন! কি ভীষণ আকর্ষণ! চোখের আড়ালে গিয়েছ, তবু তোমার এত শক্তি! তোমায় এ জন্মে আর পাব না, তাই কি তোমার বন্ধন এত দৃঢ়? মৃত্যুর আড়ালে যে তোমার অশ্রুত বাণী, তোমার অলক্ষ্য দৃষ্টি আমায় মরণ-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নড়বার-চড়বার শক্তি আর আমার নেই! হাতের গোড়ায় থাকলে, বুকের অতি-কাছে থাকলে হয়তো তোমায় এমন করে চাইতুম না, হয়তো তোমায় অবজ্ঞাই করতুম। কিন্তু এখন তুমি অপ্রাপ্য, এখন তুমি দুর্ল্লভ, তাই তোমার আশায় বসে আছি। পাব না, জানি, তবু পেতে চাই। এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা!

শশিভূষণ আবার সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিল; তারপর তাহার অন্ধ বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও আজ সে কোন আনন্দ পাইল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, জগতের সমস্ত আলো যেন নিবিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে একটী করুণ ধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "আলো, ওগো আলো!"

শশিভূষণ উদাস মনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর শ্বশ্রুঠাকুরাণীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দ্বারের কড়া ধরিয়া টানিতে গিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল; একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহাকে আক্রমণ করিতেই সে সরিয়া গলির অপর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, উপরে কোনরূপ শব্দ হয় কি না। না, কোন ভীতি-জনক শব্দ নাই, সমস্তই শান্ত, সমস্তই আগেকার মত। শশিভূষণ সবলে সকল দ্বিধা দূর করিয়া কড়া ধরিয়া টানিয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সমস্তই সেইরূপ আছে! সেই আলো, সেই ফুল, সেই শোভা, সেই গন্ধ! তবু যেন কোথায় কে কাঁদিতেছে! শশিভূষণ দ্রুত পাদক্ষেপে উপরে গিয়া দেখিল, সব একইভাবে চলিতেছে। সুকুমারী তাহার সন্ধ্যার কর্ম্ম সারিয়া চিন্ময়ীর নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছে; সরোজ সেই একইভাবে উপরের ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শশিভূষণ উপরে সরোজের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সরোজ, আজ তুমি ভাল আছ ত?"

সরোজ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন শশীদা, ও কথা জিজ্ঞাসা করলে কেন? তোমার গলার আওয়াজ এত ভয়ের মত শোনাল কেন? কি হয়েছে, শশীদা? সর্ব্বদার চিঠি পেয়েছ ত? ওঁর খুড়িমা কেমন আছেন?"

শশী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া সরোজ তাহার হস্ত স্পর্শ করিল, তারপর কাতরভাবে বলিল "তুমি অমন করে এসে দাঁড়ালে কেন? বল, তোমার পায়ে পড়ি, কি হয়েছে, বল।"

শশী কহিল, "কিছু হয়নি সরোজ, কেবল কার্ত্তিক - তুমি আজ ভাল ছিলে ত? তোমার—"

সরোজ উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "তাঁর কি হয়েছে, বল। আমি ভালই আছি।"

শশী কহিল, "আঃ, বাঁচলুম। এ তাহলে তার নিজের দোষ। তুমি তাকে কিছু কর নি, তুমি মনে মনে তাকে আকর্ষণ করে, তার চিন্তা করে তোমার অন্ধতা তাকে দাওনি? আঃ বাঁচলুম, সরোজ, তোমার কোন দোষ নেই জেনে বাঁচলুম আমি।"

সরোজ কহিল, "আমি যে তোমার একটা কথাও বুঝতে পারছি না। কে অন্ধ হয়েছে? তুমি পাগলের মত কি বলছ?"

শশী বলিল, "আমি আজ পাগলের মত হয়ে গিয়েছি, সরোজ। আজ আমার সারাদিন মনে হয়েছে যে তুমি তার জন্য কেঁদে কেঁদে তাকেও অন্ধ করে দিলে। কেন বলতে পারিনে, আমার আজ কেবলি মনে হয়েছে যে তুমিই কার্ত্তিকের এই অন্ধতার কারণ, তুমিই—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর, তিনি অন্ধ হয়েছেন, কি করে জানলে?"

শশী কহিল, "সর্ব্বর চিঠিতে জানলুম।"

সরোজ কহিল, "কি লিখেছেন তিনি?"

শশী পত্রের স্থূল মর্ম্ম তাহাকে জানাইল। সরোজ সমস্ত শুনিয়া বলিল, "শশিদা, আমায় নীচে নিয়ে চল।" শশিভূষণ সরোজের হাত ধরিয়া নিম্নতলে তাহার কক্ষে লইয়া গিয়া তাহাকে শয্যায় বসাইয়া দিল; তারপর তাহার শ্বশ্রুঠাকুরাণীর কাছে চলিয়া গেল।

সরোজ কিন্তু কাঁদিল না, কাঠের মত শয্যার উপর বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সুকুমারী আসিয়া দ্বার হইতে বলিল, "মা তোমায় ডাকছেন, সরোদি।" সরোজ সে কথা শুনিতে পাইল না। তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সুকুমারী ভাবিল, সরোজ সে ঘরে নাই। সে শশিভূষণের নিকটে গিয়া বলিল, "কৈ, সরোদি ত তার ঘরে নেই।" শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া সেই কক্ষে আসিয়া দেখিল, সরোজ সেই একই ভাবে বসিয়া আছে। শশী তাহার নিকটে গিয়া মৃদু স্বরে ডাকিল, "সরোজ।" সরোজ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। শশিভূষণ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল, "সরোজ, বোন, অমন করে বসে রইলে যে!" সরোজ হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমায় মুক্তি দাও।" শশিভূষণ সরোজের সংজ্ঞাহীন দেহ শয্যায় শোয়াইয়া দিল; এবং তাহার চীৎকারে চিন্ময়ীও সুকুমারীর সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরোজের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার আসিল, নানারূপ সেবাশুশ্রূষা চলিল, কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সরোজের ভাল করিয়া সংজ্ঞা হইল না। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া সে বলে, 'আলো দাও, দৃষ্টি দাও' তারপর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এইভাবে সারারাত্রি কাটাইয়া ভোরের দিকে সরোজ কতকটা সুস্থ হইল এবং দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত রোগের উপশম হইল। তাহাকে সুস্থভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া শশিভূষণ বাহিরে চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে সুকুমারী সরোজকে ধরিয়া বসিল, "কি হয়েছিল, বলতেই হবে।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "কিচ্ছু হয়নি ভাই, শশীদা আমায় ভয় দেখিয়েছিল।"

সুকু বলিল, "ভয় দেখিয়েছিল! কিসের ভয়?"

সরোজ কহিল, "তা না হয় নাই শুনলে।"

সুকু কহিল, "কেন, আমি শুনলে কি কিছু হানি হবে?"

সরোজ কহিল, "আর কারও হোক না হোক, তোমার হতে পারে।"

সুকু কহিল, "আমার কি ক্ষতি হবে! তুমি বল, আমি শুনব।"

সরোজ কহিল, "না সুকু, তোমার শুনে কাজ নেই।"

সুকু কহিল, "তুমি যদি শুনতে পার ত আমি শুনতে পাব না কেন? তোমার পায়ে পড়ি, বল, তুমি কেন ভয় পেয়েছিলে?"

সরোজ কহিল, "শশীদা বলছিল, যে অন্ধ, সে যদি মনে-মনে কারও কথা বেশী চিন্তা করে, তা হলে সে লোকটিও না কি অন্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্ধতাও না কি কতকটা ছোঁয়াচে। কিন্তু ও-সব মিছে কথা, আমি ডাক্তার বাবুকে বেশ করে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি যে অন্ধতা ছোঁয়াচেও নয়, আর অন্ধ যদি কাউকে চিন্তা করে, তাহলে সে লোকটিও যে অন্ধ হয়ে যাবে, তারও কোন মানে নেই। অন্তত ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন ঘটনার একটীও উদাহরণ নেই।"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু যা কখনও ঘটেনি, তাও ত ঘটতে পারে। যদি শশীদার কথাই সত্য হয়, তাহলে—"

সরোজ কহিল, "তাহলে কি সুকু?"

সুকুমারী বলিল, "তাহলে শশীদাদের আর আমাদের কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয় ত!"

সরোজ কহিল, "সব রোগেই টিকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শশীদা অনেক দিন থেকে অন্ধ মানুষ ঘাঁটছেন; অন্ধ-রোগের টিকে ওঁর হয়ে গিয়েছে। এত দিন যখন ওঁর কিছু হয় নি, তখন ওঁর বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু—আর যাঁরা অন্ধ ইস্কুলে কাজ করছেন?"

সরোজ কহিল, "তাঁরা ভগবানের উপর নির্ভর করে অনাথ-অন্ধদের উপকার করছেন। তাঁদের কিছুই হবে না, বিশেষতঃ তাঁরা দু-চার ঘণ্টা মাত্র অন্ধদের সঙ্গে থাকেন!"

সুকুমারী বলিল, "কিন্তু যিনি প্রায় সারাদিনই আমাদের কাছে থাকেন?"

সরোজ কহিল, "কোন ভয় নেই, সুকু, অন্ধতা ছোঁয়াচে নয়, আমি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি। শশীদাও বলেছে, সেও কোন বইয়ে এ-রকম কোন রোগের কথা পড়েনি।"

সুকুমারী বলিল, "তাহলে তুমি এত ভয় পেয়েছিলে কেন?"

সরোজ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে সুকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমার যেমন এমন একটা কথা আছে, যে কথা সকলকে বলতে পার না, সেই রকম আমারও একটা কথা আছে।"

সুকুমারী বলিল, "আমার ত কোন কথাই তোমার অজানা নেই; আর কারও কাছে গোপন থাকলেও তোমার কাছে ত আমি কিছুই গোপন করি নি, সরোদি, তবে তুমি কেন আমায় তোমার কথা বলবে না?"

সরোজ কহিল, "না সুকু, না, সে কথা শুনে কাজ নেই। তোমার কথার মধ্যে শুধু আনন্দ, শুধু সুখ, আমার কথার মধ্যে কেবলই দুঃখ।"

কিন্তু সুকুমারী ছাড়িল না; তখন সরোজ বাধ্য হইয়া সব কথা তাহাকে শুনাইল। সুকুমারী শুনিতে শুনিতে বলিল, "কার্ত্তিকদাকে আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু তিনি ত দু'-তিন মাসের বেশী এখানে ছিলেন না, এরই মধ্যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে তার জের এখনও এমন ভাবে চলছে! আশ্চর্য্য! আর সে কথা আমরা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি! মাও বোধ হয় এর কিছু জানেন নি?"

সরোজ কহিল, "মা একা কেন? এমন যে ঘটতে পারে, তা আমিই নিজের কাছে স্বীকার করতুম না। কিন্তু সংসারে অঘটনও বিস্তর ঘটে। জানিনে, তিনি আমার মধ্যে কি পেয়েছিলেন যে, আজ এমন করে আমায় পাগল করে দেবার চেষ্টা করছেন। আমি তাঁরই ভয়ে অন্তরে-বাইরে আপনাকে গোপন করে রেখেছি। তবু দূর থেকে তিনি এক ভয়ানক আকর্ষণে আমায় টানছেন! সুকু, তুমি বুঝতে পারবে না যে আজ প্রায় ছ' বৎসর ধরে আমি অন্তরে অন্তরে কি আকর্ষণ এ অনুভব করেছি! তবু প্রাণ পণে সেই নীরব আকর্ষণের বিরুদ্ধেই আমি যুদ্ধ করে এসেছি। কেউ এ কথা বুঝতেই পারবে না, কেউ এ কথা হয়ত বিশ্বাসও করবে না। যেদিন তিনি আমার কাছ থেকে চলে যান, সে দিন বলে গিয়েছিলেন যে 'তুমি আমার পক্ষে যতই দুর্লভ হয়ে গেলে ততই তুমি আমায় বেঁধে ফেল্লে।' সে কথার মধ্যে কতখানি সত্য ছিল, কাল আমি তা স্পষ্ট অনুভব করেছি। সেই লোকটির কতখানি শক্তি আছে, তা কাল এক নিমেষে বুঝেছি। তিনি কাল এক নিমেষে আমার সমস্ত অস্তিত্বটাকে এমন জোরে নাড়া দিয়ে গেছেন যে সমস্ত রাত কেবলি আমার মনে হয়েছে, তিনি আমার অন্তরের ঠিক মাঝখানটিতে বসে আমার প্রাণটাকে দু' হাতের মধ্যে চেপে ধরে পিষছেন। এত দূরে থেকেও যিনি এতখানি শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন,—জানি না, কাছে থাকলে তিনি আমায় কি করতেন! তাঁকে এখন আমার এত ভয় হয়েছে যে যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাই, তবুও তিনি বোধ হয় মনে করলেই আমায় সেখান থেকে টেনে আনতে পারবেন! এখন আমার একমাত্র ভয়, কি করে নিজেকে আমি তাঁর কাছ থেকে রক্ষা করব, কি করে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকব!"

সুকুমারী বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাল তুমি মাঝে-মাঝে 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও' বলে চেঁচাচ্ছিলে। আমরা কেউ বুঝতেই পারিনি যে কেন ও কথা তুমি বলছিলে, আর কাকে উদ্দেশ করেই বা বলছিলে। আচ্ছা, তাহলে তুমি তাঁকে একদিনের জন্যও ভুলতে পারছ না কেন? যদি তাঁর কাছ থেকে পালাতেই চাও, তবে এ তোমার কিসের আকর্ষণ? তুমি তাঁকে চাও না, তবু তাঁর অন্ধ হবার আশঙ্কায় একেবারে এমন হয়ে গেলে কেন?"

সরোজ কহিল, "সুকু, যে ভালবাসা

মানুষকে এমন অশান্ত করে তোলে, সে ভালবাসাই নয়, রাক্ষসের ক্ষুধা। যে বাসনার তাড়নায়, কামনায়, উত্তেজনায় মানুষ নিজেকে এমন করে ছিঁড়ে-খুঁড়ে নষ্ট করতে চায়, সে যে মরণোন্মুখ রোগীর দুষ্ট ক্ষুধা! এ ত ভালবাসা নয়, এ যে ডাকাতের অত্যাচার!"

সুকুমারী বলিল, "না দিদি, এ তোমার অন্যায় সন্দেহ। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কার্ত্তিক দাদার অত অপমান করো না। তিনি ত তোমার কাছে আর একদিনও আসেন নি, তিনি ত তোমার কাছে 'দাও, দাও' বলে ভিক্ষে চাইতে আসেন নি। তিনি নিজেকে অমিতব্যয়ীর মত বিলিয়ে দিচ্ছেন, এই তাঁর অপরাধ। তুমি বাইরে যতই ঔদাসীন্য দেখাও, তোমার কালকের ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে তোমার অন্তরাত্মা জানে, কার্ত্তিকদা তোমায় তাঁর প্রাণ দিয়ে চাচ্ছেন,—তাই তুমি কাল এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে।"

সরোজ বলিল, "সুকু, তোর পায়ে পড়ি, তুই ও কথা বলিস্‌নে। তার চেয়ে বল্ যে তার সব মিথ্যে! সে আমায় চায় না, সে আমায় ডাকছে না, সে আমার জন্য জগৎ-সংসার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে না। সে কেবল একটা দুর্বৃত্ত ইচ্ছার বশে আমাকে তার পায়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে লুটিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। বল্ যে সমস্তই তার দুষ্টুমি, কেবল আমাকে হারাবার জন্য এই ভয়ঙ্কর মায়াজাল বিস্তার করেছে। বল্, ওর কিছুই সত্য নয়।"

সুকুমারী কাঁদিয়া বলিল, "না—কখনই না! এত ভালবাসা মিথ্যে নয়, মায়া নয়, মোহ নয়। এ জীবন্ত স্নেহ! এ স্নেহ, এ আকর্ষণ যে উপেক্ষা করে, সে প্রেমময় হরিকেও উপেক্ষা করে। এ স্নেহ যদি উপেক্ষা কর, তা হলে বলব, তুমি ভিতরে-বাইরে অন্ধ হয়েছ, তোমার ভিতরে-বাইরে অন্ধকার। আমি তা পারব না, সরোদি, আমি স্নেহকে বিশ্বাস করে নিঃসন্দেহে তাকে বুকে ধরে রাখব।"

ক্রমশ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

বিশ্ব-সভার ছবি

(নাটিকা)

চরিত্র

বিনায়ক	চিত্রকর
কমল	ঐ শিষ্য
যুবা	
কারাধ্যক্ষ	
সুরথ	কারা-প্রহরী

বন্দীগণ, নর্ত্তকী ও প্রহরী

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—যমুনা-তীর। কাল—প্রভাত; সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। অদূরস্থ দেবালয় হইতে মৃদু বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে।

বিনায়ক গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে—সম্মুখে চিত্র-পট; বিনায়কের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ চিত্র-পটে নিবদ্ধ; বিনায়কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কমল। বিনায়ক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।]

বিনায়ক। সবই পণ্ডশ্রম, কমল। এ ছবি আর শেষ করতে পারব না। সারা-জীবনের কল্পনা আমার অধীর আশায় চেয়ে আছে। সে আশা সফল হল না!

কমল। কেন, এ ত প্রায় শেষ হয়েই এসেছে—শুধু ঐ-দুটি মূর্ত্তি আঁকতেই বাকী যা!

বিনায়ক। কিন্তু সেই দুটিই যে সব, কমল। আজ দশ বৎসর হল, এই ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছি! দেশে দেশে এই পট নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি—কিন্তু এই দুটি মুখের আভাষ কোথাও পেলুম না। একটি মুখে স্বর্গের আলো ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে—আর-একটিতে নরকের ভীষণ অন্ধকার! একটিতে দেবত্বের প্রতিবিম্ব, আর-একটিতে পাপ তার ভীষণতা নিয়ে জেগে আছে! দশ বৎসর আমি ভাবছি—দশ বৎসর কেবলই মানুষ দেখে বেড়াচ্ছি—কিন্তু ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছি! আমার কল্পনা তার নির্ভরের আশ্রয় পাচ্ছে না!

কমল। তোমার কল্পনাও হার মানলে!

বিনায়ক। হাঁ। আমার কল্পনা রক্ত-মাংসের জীব খুঁজে বেড়াচ্ছে—একটা অব-লম্বন খুঁজছে!

কমল। (নির্ব্বাকভাবে বিনায়কের পানে চাহিয়া রহিল)

বিনায়ক। আমার সমস্ত জীবন এক দারুণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে কেটে এসেছে! সৌন্দর্য্যের সন্ধানে ছুটতে গিয়ে আমার যা কিছু প্রিয় ছিল, যে-কেউ আপনার ছিল, তার কিছুর পানে কারো পানে ফিরে চাই নি! সুখের গৃহ, প্রীতি, স্নেহ, নারীর প্রেম—কোন বাঁধনই আমায় ধরে রাখতে পারে নি! তাই এখন ভয় হয় কমল, বুঝি বা এই নিষ্ঠুর ত্যাগ আর নির্ম্মমতা নিয়ে শুধু নৈরাশ্যের পিছনেই আমি ছুটে চলেছি। আমার সাধের ছবি—আমার সারা জীবনের সাধনা—এই "বিশ্ব-সভা" ছবি এমনি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! মৃত্যুর জড়তা আমায় গ্রাস করবে! (ক্ষণকাল চল তরঙ্গা নদীর পানে চাহিয়া, সহসা) ও কে—কমল? ও কি আমারই কল্পনা ছায়ার মূর্ত্তি ধরে আজ উদয় হল—না, সত্যই মানুষ? ঐ তরুণ যুবা—চেয়ে দেখ, স্নান সেরে ঐ পট্ট বস্ত্রে পরে দীপ্ত শোভায় চারিধার উজ্জ্বল করে এদিকে আসছে? দেখতে পাচ্ছ? না, এ শুধু কল্পনা আমায় ছলনা করছে? এই মুখই যে আমি আজ দশ বৎসর খুঁজে বেড়াচ্ছি—মুখে স্বর্গের জ্যোতি—চারিধারে পুণ্যের রশ্মি! ও কি সত্যই মানুষ, না, এ আমার মতিভ্রম?

কমল। এক তরুণ যুবা স্নান সেরে এদিকে আসছে বটে, বোধ হয়, দেবালয়ে যাবে।

বিনায়ক। তাহলে আমার ভুল নয়। ডাকো, ডাকো কমল, ঐ তরুণ যুবাকে! আমি পেয়েছি, এতদিনকার সাধনা বুঝি সফল হবে, তাহলে!

(সদ্য-স্নাত এক তরুণ যুবা নিকটে আসিল)

কমল। এদিকে এস, যুবা। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিনায়ক তোমার দর্শন-প্রার্থী।

যুবা। শিল্পী বিনায়ক!

কমল। এই তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

যুবা। (অভিবাদনান্তে) আপনার কীর্ত্তি

বিশ্ববিশ্রুত। আমার সৌভাগ্য, এত বড় শিল্পীকে আজ চোখে দেখলুম!

বিনায়ক। তুমি কে যুবা?

যুবা। আমি ঐ দেবালয়ের পূজারী—ব্রাহ্মণ।

বিনায়ক। আমার এক বাসনা আছে, যদি পূর্ণ করেন ত আমি ধন্য হই!

যুবা। ভূমিকার প্রয়োজন নেই। আমার দ্বারা যেটুকু সম্ভব হবে, তা করতে আমি প্রস্তুত আছি।

বিনায়ক। এই "বিশ্ব-সভা"—এই ছবি আমি এঁকে শেষ করতে চাই। নানা নর-নারীর মূর্ত্তি এঁকেছি—শুধু দুটি মুখের আভাষ পাই নি, তাই এ ছবি আজও শেষ হয়নি। আজ দশ বৎসর ধরে আঁকছি—কিন্তু কল্পনা এ মুখের আভাষ দিতে পারছে না। আজ আপনার মুখে একটা আভাষ পাচ্ছি—ঐ দীপ্তি, ঐ সরল প্রসন্নতাটুকু আমার এই পটে আমি ফুটিয়ে তুলতে চাই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

যুবা। (মৃদু হাসিয়া) কোন আপত্তি নেই! শিল্পী বিনায়কের পটে অমর হয়ে থাকব, এ ত পরম সৌভাগ্য আমার।

বিনায়ক। তাহলে কাল ঠিক এমন সময় এখানে যেন আপনার দেখা পাই!

যুবা। তাই হবে।

(অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

বিনায়ক। আশ্চর্য্য হয়েছি, কমল। যে মুহূর্ত্তে নৈরাশ্যে কাতর হয়ে পড়েছিলুম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আশার কি এ আশ্বাস! কাল, এই সময়! না, এই এক দিনের বিলম্ব আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে! একটা দিন, একটা রাত্রির দীর্ঘ ব্যবধান! অসহ্য, অসহ্য এ! কিন্তু উপায় নেই! এস, কমল, ঘরে যাই! (কমলের হাত ধরিয়া) আর একটা মুখ—কমল, তাহলেই আমার সাধ পূর্ণ হয়। পাপের ছায়ায় কালো সেই মুখখানা—

কমল। সে আশাও ভগবান পূর্ণ করবেন, অধীর হবার প্রয়োজন নেই।

বিনায়ক। না, নৈরাশ্য কেটে গেছে—ঠিক বলেছ, সে আশাও পূর্ণ হবে—অধীর হবার প্রয়োজন নেই! এস কমল, আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে! আমার দশ বৎসরের সাধনা, কমল—

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য—অবন্তী; কারাগৃহের সম্মুখ। কাল, সন্ধ্যা। দশ বৎসর পরে। বিনায়ক; কারাধ্যক্ষ পরিক্রমণ করিতেছে।]

কারাধ্যক্ষ। আপনি দেশ-প্রসিদ্ধ শিল্পী—তাই মহারাজ আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

বিনায়ক। মহারাজের জয় হোক্। তাঁর অনুগ্রহের সীমা নেই।

কারাধ্যক্ষ। সব-চেয়ে দুর্বৃত্ত বারো জন বন্দীকে আপনি দেখতে চান—তাদের কারো মুখে আপনার কাল্পনিক ছবির আভাষ যদি পান্—এই না আপনার কথা?

বিনায়ক। হাঁ।

কারাধ্যক্ষ। মহারাজ আদেশ দিয়েছেন, তাই হবে। আমিও প্রহরীদের বলেছি—

এখনই বন্দীদের আনা হবে। কিন্তু একটা কথা আছে! একে ত এরা ভীষণ দুর্বৃত্ত, —যদি ওদের মনে একটুও সন্দেহ হয় যে, তাদের ছবি নেওয়াবার জন্য এভাবে বাইরে আনা হচ্ছে, তাহলে রাগে তারা জ্বলে উঠবে, আপত্তিও করতে পারে—আর আপত্তি থাকলে ছবি নেওয়া দায় হবে।

বিনায়ক। ঠিক—তাহলে উপায়?

কারাধ্যক্ষ। এক কাজ করুন, আপনি। আমার পিছনে অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করে যান—ওদেরও সন্দেহ হবে না—তার পর কোন মুখে আপনার কল্পিত আভাষ যদি পান ত আমায় ইঙ্গিত করবেন।

বিনায়ক। তাই হবে।

(অন্তরালে রহিল)

কারাধ্যক্ষ। (প্রহরীর প্রতি) সুরথ—(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ) বারো জন বন্দী বেছে রেখেছ?

সুরথ। রেখেছি।

কারাধ্যক্ষ। এক-একজন করে নিয়ে এস—

সুরথ। (উচ্চৈঃস্বরে) বন্দী—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) তোমরা বারোজন একে-একে বাহিরে এসো—

[শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীগণ ধীরে ধীরে বাহির হইতে লাগিল—পাঁচজন চলিয়া গেলে ষষ্ঠ বন্দী যেমন বাহিরে আসিল, অমনি বিনায়ক সরিয়া আসিয়া কারাধ্যক্ষকে ইঙ্গিত করিল]

বিনায়ক। এই লোক,—একে রাখুন। এই মুখ! ঠিক—বিশ্বাস-ভঙ্গের কালো ছায়া মুখে যেন লেপে আছে!

কারাধ্যক্ষ। (ষষ্ঠ বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি দাঁড়াও। সুরথ, ওদের নিয়ে যাও। (সুরথ অপর বন্দীগণকে লইয়া প্রস্থান করিলে) তুমি দাঁড়াও। (বিনায়কের প্রতি) এই লোকটির মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ হয়েছে। কাল প্রাতে ঘাতকের হাতে এর প্রাণদণ্ড হবে।

বিনায়ক। (চমকিয়া) কাল প্রাতে!

কারাধ্যক্ষ। এখন আপনার কি অভিপ্রায়, বলুন।

বিনায়ক। আজ রাত্রেই তাহলে এর একটা আদ্‌রা আমি এঁকে নেব। রঙ ফলানো পরে হবে'খন।

কারাধ্যক্ষ। শোন বন্দী, ভারত-বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিনায়ক তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার ছবি আঁকতে চান।

বন্দী। বটে! শুনে বাধিত হলুম। কিন্তু একটা কথা—আমার জীবনের উপর তোমাদের অধিকার আছে—কেন না, সে তোমাদের আইন! কিন্তু আমার ছবি নিয়ে অপমান করা—? না, তোমাদের সে অধিকার নেই—আমি তা হতে দেব না—আমার আপত্তি আছে।

বিনায়ক। বন্দী সত্য কথাই বলেছে। তবে আমার আর-একটি নিবেদন আছে। কাল প্রাতেই এর প্রাণদণ্ড হবে—জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে যদি ওর শেষ সাধ কিছু থাকে, তা যদি পূর্ণ হতে দেন—তাহলে (বন্দীর প্রতি) বন্দী, তোমার ছবি নিতে দেওয়ায় কোন আপত্তি থাকবে? বল, তুমি কি চাও?

কারাধ্যক্ষ। এতে আমাদের আপত্তি নেই।

বন্দী। (উচ্চহাস্য করিয়া) কি চাই? চাই ত অনেক জিনিষ! রূপসী নারী, সুরার পাত্র—আমি এ-সবের বড় ভক্ত! আমি মস্‌গুল হয়ে থাকব—আর শিল্পী, তুমি আমার ছবি এঁকে নেবে—বাঃ! এ ব্যবস্থায় আমার আপত্তি নেই। নেশায় ভোর হয়ে দুটো রঙিন গানের সুরের ভিতর দিয়ে জীবনটা যদি শেষ করতে পারি, তাহলে আর দুঃখ রইল কি?

কারাধ্যক্ষ। (বিনায়কের প্রতি) বেশ, আয়োজন করে দিচ্ছি। বন্দী, তুমি ভিতরে যাও—

বন্দী। দেখো, ভুলে যেয়ো না, শিল্পী—(বন্দী ভিতরে গেল)

কারাধ্যক্ষ। এত-বড় দুর্বৃত্ত বন্দী এ কারায় আর নেই। লোকটা খুনী। সামান্য ক'টা মুদ্রার লোভে এ ওর দু'জন সঙ্গীকে খুন করেছিল। কাল ওর সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর পাপের ভার কতক কমবে!

বিনায়ক। বলিনি, বিশ্বাস-ভঙ্গের কালো ছায়া ও-মুখে লেপে আছে!

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—কারা-কক্ষ। কাল—রাত্রির শেষ যাম। সুরাপান-রত বন্দী উপবিষ্ট—একজন নর্ত্তকী গানশেষে কোণে ঘুমে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। বিনায়ক চিত্রাঙ্কন-রত।

বন্দী। (সুরে) "ঝর-ঝর-বাদল রাতি—এ-সখি—"

বিনায়ক। একটু মাথা তুলে বসো—হাঁ, ঠিক, ঐ—

বন্দী। আর পারা যায় না—মাথা খালি হয়ে গেছে। নেশা কেটে যাচ্ছে—ঐ সব পরীরা উড়ে পালাল! দাও, দাও, আর একপাত্র দাও—নইলে এই শুয়ে পড়লুম—হুঁ, পড়লুম শুয়ে।

বিনায়ক। এই নাও আর একপাত্র;—কিন্তু সোজা হয়ে বসতে হবে, আর-খানিক (পাত্রে সুরা দিল)

বন্দী। পাত্র দাও—যা বলবে, রাজী আছি! আমি তোমার দাসানুদাস, বাবাজী। আঃ, গান থামালে কেন, সখী? গাও, গাও—

বিনায়ক। চুপ কর। না হলে আর পাত্র ভরে দেব না—(ছবি আঁকিতে লাগিল)

বন্দী। দুঃখ ঢের ছিল, বাবাজী, কিন্তু বলি কাকে—শোনে কে? না হয় বন্দীই করেছ বাপু, তা বলে আধ-পেটা খাওয়াবে! আর এ কি বাবা—নেশা-বর্জ্জিত করে রাখবে! এ বন্দোবস্তে অতিথশালা চালিয়ে বাহাদুরী কিসের! আধপেটা খাইয়ে, নেশার ব্যবস্থা উঠিয়ে আমি এমন পাঁচশো কেন, পাঁচ-দুকুনে সাঁইত্রিশ-শো ভদ্দর লোককে পুষতে পারি। এতে আবার বাহাদুরী! ছ্যাঃ। কেমন বাবাজী, ছবি চলছে কেমন?

বিনায়ক। বেশ হচ্ছে।

বন্দী। আচ্ছা, গোল হলে আমায় বলো বাবাজী—কোন লজ্জা করো না। কি বলব, তুমি আর-জন্মে আমার বাপ ছিলে! এত উপকার করলে,—বল কি, পাত্র ভরে এত সেবা! ছবি ঠিক হচ্ছে ত, বাবাজী? দেখো, গোল হলে বলো, আমি ঠিক করে দেব। না, ঠাট্টা করছি না—ঠিক বলছি। মোদ্দা, বাবাজী, তুমি আমায় কিনে রাখলে—

চিরকালের জন্য কিনে রাখলে। এই পাত্র না পেলে মরেও জুড়ুতুম না, বাবাজী।

বিনায়ক। (পট রাখিয়া) এ-রকম হল। তোমার ছুটি। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলুম—এ ছবি তোমারই অনুগ্রহে শেষ করতে পারব বলে এখন মনে হচ্ছে। আঃ, আমার জীবনের সাধ মিটল তাহলে!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। বন্দী, সকালের ঘড়ি বেজেছে —প্রস্তুত হও। ভগবানকে ডাকতে চাও যদি—

বন্দী। ভগবান! হুঁঃ—(পাত্র লইয়া) এই আমার ভগবান! তারপর, আমায় মারছ বটে, কিন্তু বাবা, এ মুখের জোড়া কোথাও পাবে না! সন্দেহ হয় যদি ত এই পটুয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর—কেমন বাবাজী, কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছ ত, কিন্তু এ ছাঁচ কোথাও মিলেছে? ওঃ খাতির কত! আরে বল বাবাজী, এ লোকটাকে বল একবার। এ মুখের—

(প্রহরীর প্রস্থান)

বিনায়ক। এ-রকম মুখ কোথাও দেখিনি বটে! এ মুখ—

বন্দী। (উচ্চ হাস্য করিয়া) কোথাও দেখনি, বাবাজী? কোথাও না?

বিনায়ক। না।

সুরথের প্রবেশ

সুরথ। বন্দী—

বন্দী। সময় হয়েছে? চল বাবা—মোদ্দা বাবাজী, চললুম ত—ছবিখানা কেমন আঁকলে, একবার দেখালে না?

বিনায়ক। এই যে দেখ (পট দেখাইল)

বন্দী। (ছবি দেখিয়া) বাবাজী, তুমি কখনও মথুরায় গেছলে?

বিনায়ক। মথুরায়! নিশ্চয়—বহুকাল ছিলুমও সেখানে। তবে আজ দশ বৎসর মথুরা ছেড়েছি। আর যাইনি

বন্দী। ঠিক—দশ বৎসর মথুরা ছেড়েছ, না? আচ্ছা, সেই যমুনার ধারে ছোট্ট একটি মন্দির ছিল, মনে পড়ে?

বিনায়ক। মনে পড়ে না! কি বল, বন্দী—এই যে মুখ দেখছ—এই, যে-মুখে স্বর্গের জ্যোতি ঢল-ঢল করছে, এ-মুখ সেই মথুরার মন্দিরের পাশে বসে এঁকেছি যে—

বন্দী। কার মুখ এ?

বিনায়ক। মন্দিরের তরুণ পূজারীর—দীপ্ত শান্ত রাগে ভরা—আশ্চর্য্য স্বর্গীয় বিভায়—

বন্দী। (নিজের মুখের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) আর এই মুখ—আমার মুখ?

বিনায়ক। (বিস্মিতভাবে চাহিয়া) একেবারে উল্টো! পাপের—

সুরথ। বন্দী, আর সময় নেই—

বন্দী। চল, যাই। (বিনায়কের প্রতি) দুই মুখে আকাশ-পাতাল তফাত বাবাজী, এই বলতে চাও,—না? হুঁঃ, বাবাজী, চিনতে পারলে না? এ-দুই মুখ যে একই লোকের। আমিই সেই দশ বৎসর আগেকার মথুরার মন্দিরের তরুণ পূজারী।

বিনায়ক। (সবিস্ময়ে) তুমি!

বন্দী। শুধু সঙ্গদোষে বাবাজী। সে মস্ত কাহিনী, উপন্যাসের মত—বসে শোনবার মত—কিন্তু আর ত সময় নেই, বাবাজী—

বিনায়ক। তুমি—

বন্দী। চললুম, বাবাজী—কিন্তু যাবার সময় আমায় চোখের জল ফেলালে তুমি, যে চোখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছ্‌ল—যাক্‌, চল, আর কেন!

(বন্দীকে লইয়া স্থরথের প্রস্থান)

বিনায়ক। (সবিস্ময়ে পটের পানে চাহিয়া) ভগবান—এ কি দেখালে!

কারাধ্যক্ষের প্রবেশ

কারাধ্যক্ষ। পৃথিবীর পাপের ভার এখনই অনেকটা কম পড়বে। যাক্‌, জীবনে একটা ভাল কাজ তবু করে গেল—সমস্ত জীবন তার শেষ মুহূর্ত্তে সার্থক, ধন্য হয়ে উঠল। ভারত-প্রসিদ্ধ শিল্পী বিনায়কের পটে একটা নরঘাতক অমরতা লাভ করে রইল! তারপর আপনার ছবি শেষ হল ত?

বিনায়ক। শেষ! না—শেষ হবেও না, কখনো। দেখলুম, বিশ্বশিল্পী তাঁর নিজের হাতের ছবি আঁকতে-আঁকতেও শেষ করতে পারলেন না—আর আমি ত সামান্য মানুষ! আমি এ দুর্ব্বল হাত নিয়ে "বিশ্ব-সভার" ছবি শেষ করব কেমন করে! এ ত শেষ হবার নয়!

[চিত্রপট সবলে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর পা চাপিয়া দাড়াইল]

যবনিকা *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শৈলপথে ও পরে

আমরা বৃহস্পতিবারে রওনা হয়ে শুক্রবারে এখানে এসে পৌছেছি। গাড়ীতে খুব ভিড় ছিল, কিন্তু সেই গাড়ী ছাড়া অবধি আরোহীদের যে খাবার-ঘরের দিকে যাওয়া-আসা আরম্ভ হল, তা আর গাড়ী থামা পর্য্যন্ত শেষ হল না। গাড়ী ঘণ্টায় ষাট মাইল দৌড়চ্ছে, তারি দোল আর ঝাঁকানি খেতে-খেতে, কাঁপতে-কাঁপতে, দুলতে-দুলতে, দরজা ধরে সামলে নিয়ে, জানালা ধরে দাঁড়িয়ে, উঠে, পড়ে, ছোট-বড় ছেলে-বুড়, স্ত্রী-পুরুষ, স্বদেশী-বিদেশী বিচিত্র বেশ-ভূষায় সজ্জিত আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে কেবলি যাচ্ছেন আর কেবলি আসছেন! বাহিরে খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আলোর আকাশ ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে এল, দু-একটি করে' তারা জলজ্বল করতে লাগল, তারপর দশমীর পূর্ণপ্রায় চাঁদ ধূসর আকাশকে আলোয় উদ্বোধন করে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন; চারিধারে নিস্তব্ধ প্রান্তর, একেবারে সেই দিগ্বলয়ের শেষ-রেখার অন্ধকারে মিশিয়ে গিয়েছে। উপরে আকাশ জ্যোৎস্নার পুণ্য প্রভায় উদ্ভাসিত, প্রশান্ত নীরব, আর মাঝ-পথে আমাদের এই বাষ্পরথ ধূম উদ্গীরণ করতে করতে,প্রবল শব্দে অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। তারি উপরে

* একখানি ইংরাজী নাটিকা-অবলম্বনে

বসে প্রহরেকের যাত্রী-সকল আহার্য্য ও পানীয়ের সৎকার করছেন! ক্ষুধানিবৃত্তি ও লোভের পরিতৃপ্তি;—মানব-জীবনের আদিম চেষ্টা এবং অন্তিম অধ্যবসায়।

সান্তাহারে গাড়ী ঠিক ছিল, আমাদের কোনই কষ্ট সহ্য করতে হয়নি, আমরা তিনটি সঙ্গী আপন-আপন স্থান অধিকার করে' বসে' প্রশান্তভাবে অপরাপর যাত্রীদের গাড়ী খুঁজে বেড়ান, ছুটোছুটি, বকাবকি, আগ্রহ, ব্যস্ততা আর হতাশের আক্ষেপ দেখতে লাগ্‌লাম। একজন রোমান কাথলিক পাদ্রি-সাহেবের ব্যবহার সব-চেয়ে চোখে খারাপ লাগল। তিনি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর পরিচ্ছদে আবৃত করেছেন, আপাদমস্তক সাক্ষ্য দিচ্ছে তিনি খৃষ্টের ধর্ম্মযাজক। আবক্ষ লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু, গলায় ক্রূশ ঝোলান, কিন্তু কি তাঁর অসংযম, ক্রুদ্ধ উগ্র বাক্য-ব্যবহার, উদ্ধত অঙ্গভঙ্গী, কুলীদের উপর আক্রোশ আর রেলবাবুদের প্রতি তম্বী! রেলের খানা-কামরায় এঁরই গতিবিধি অবিরল ছিল। পরদিন সকালে শিলিগুড়িতেও দেখলাম তাঁরি সাহায্যে প্রাতরাশের টেবিলে অনেক ভোজ্য এবং পানীয়ের সদ্গতি হ'ল। "আগুনের পরশমণি" এঁর যে কোথায় ছোঁয়ান হয়েছে তা আবিষ্কার করতে অধিক বুদ্ধি ব্যয় আবশ্যক হ'ল না। ইংরাজী পুস্তকে পাঠ করেছি, অন্তরের অধিবসতি জঠরেরই মধ্যে, এ চতুর তপস্বীটি এক প্রার্থনাতেই দুই বর লাভ করেছেন বোধ হ'ল!

শিলিগুড়ি হ'তে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত পথের দুইধারের উদ্ভিদশ্রেণী দেখলে মনে হয় যেন এখনও তারা তাদের "অষ্টাদশ বর্ষ দেশ" অতিক্রম করেনি, সেই পরিপূর্ণ প্রগল্ভ বয়সেই, "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় বর্ত্তমান আছে! কি তাদের প্রচুর পল্লব, পর্য্যাপ্ত স্তবকাবনম্র অবস্থা!—এত ফুল, এত পাতা এমন শ্যামল শৈবালাচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ, ভরপূর নধর অঙ্গলাবণ্য! গাছগুলি যত উর্দ্ধেই উঠুক না কেন, তাদের লতিকাসঙ্গিনীগুলিও পাতায় ফুলে সুকুমার আলিঙ্গনে শেষ অবধি জড়িয়ে উঠেছে। ঘাসে ফুল, লতায় ফুল, বড় বড় গাছে ফুল, পরগাছায় ফুল,—এ যেন "কুমার-সম্ভবের" অকাল বসন্ত!

ঝিঁঝি কত বিবিধ সুরেই তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাচ্ছে; কারো আওয়াজ নুপূর-নিক্কণের মত, কারো শব্দ রৌপ্য ঘণ্টিকাধ্বনির সমান, কারো বাজখাঁই—শুন্‌লে মনে হয় কেউ যেন তানপূরার পাঁচটি তারের সুরের উপর এককালে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করছে; কারো বাজনায় কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই, নিতান্তই প্রাকৃত,—ছেলেদের খেল্‌বার কটকটের মত! প্রজাপতি কত বর্ণবিচিত্র ডানা মেলে হেলে-দুলে সারি সারি উড়ে চলেছে—কিন্তু কারো সঙ্গে কারো যে কোন জ্ঞাতিত্ব আছে বোধ হয় না,—কুটুম্বিতা থাকতে পারে! আকারে বর্ণে কেউ কারো সমকক্ষ নয়, ছোট বড় মাঝারি, সাদা কালো রাঙা হলুদ পাটল আর কপিশ! কারো পাখায় জোড়া জামিয়ারের মত দুরোখা কাজ করা, কারো বা ডানা চন্দ্রকোণা শাড়ীর গঙ্গা-যমুনা পাড়ের মত দুই ধার দুই রঙের। উড়ছে সবাই

একভাবে, কেন না সৃজন-পর্য্যায়ের এক জাতিরই জীব!

এ পথ দেখে আমার আর একটি কথা মনে হয়,—এ বনপর্ব্ব যেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। বিশ্বের আদিম ছন্দই তাই। সৃষ্টি যখন হয়েছিল তখন জোড় মিলান ছিল না। ছন্দের যতিঃ সামলানই দায়, তা আবার পদে পদে মিল হবে? অবসর কোথা? তখন প্রবল ভাবাবেগ, বিষম ভূমিকম্প, অসহ্য অগ্ন্যুৎপাত, দুঃসহ প্লাবনের পর্য্যায়, বড় বড় গাছ, প্রকাণ্ড ফুল, অদ্ভুত জীবজন্তু—সবাই আপনার মত!

এই মেঘচুম্বী পর্ব্বতমালা, ভূতলশায়িনী অধিত্যকা, ছুটে-এসে-গড়িয়ে-পড়া ঝোরার দল, মেঘ স্পর্শ করবার জন্য উদ্বাহু শাল-প্রাংশু মহাভুজ মহীরুহ-শ্রেণী, তারি পাশে সুকুমার শিশু তৃণদল,—যাদের পাতাগুলি পাখীর ছানার পালকের মত অতি নরম, সবে-গজিয়ে-ওঠা অঙ্কুরের মত কচি সবুজ, তারি ধারে পাথরের গায়ে, জড়িয়ে-ধরা নিশ্চল শৈবাল—সবাই স্ব স্ব প্রধান। ছত্রে ছত্রে মিল নেই, কেউ দীর্ঘ কেউ বা হ্রস্ব। কখনো বা একছত্রের মধ্যেই দুই পদ, কখনো বা ছত্রের পর ছত্র অগ্রসর হয়ে চলেছে, পদের তখনও শেষ হয়নি। প্রকাণ্ড পাদপশ্রেণীর যেমন প্রবীণ গম্ভীর্য্য আবার শিশুতৃণগুলির তেমনি নিরন্তর হেলে দুলে পড়া অবিরাম বাল্য-চপলতা।

অপর্য্যাপ্ত পল্লবসম্ভার নিয়ে কোন গাছ একেবারে বিব্রত, আবার কোনটি বা তারি পাশে কোনরূপে একটুখানি স্থান করে দাঁড়িয়ে আছে—নগ্ন, বজ্রাহত, শীর্ণ, কঙ্কাল-সার। উদ্ভিদরাজ্যে এ সাধারণ-তন্ত্রের দেশ। ধনী-দরিদ্রের এমন অপূর্ব্ব সান্নিধ্য, রাজ-বেশধারী ও নাগা সন্ন্যাসীর এমন অদ্ভুত সমাবেশ আর কোথাও আছে কি না জানিনে; অথচ আশ্চর্য্য এই, সবাই আপন সম্মান বজায় রেখে বেঁচে আছে,—কেউ কারো কাছে হীন হয়নি। তার অর্থ সবাই স্বাভাবিক, কোন চেষ্টা কোথাও নেই, কৃত্রিমতার কাপট্য কিছুই কদর্য্য করতে পারেনি। এখানে গোপন করবার, কিম্বা আড়ম্বর করে প্রকাশ করবার কোন প্রয়াস নেই। চোখ আর মন কোথাও পীড়িত হয়না। সবাই যা দেবার, তা' হরির লুটের মত সহজ আনন্দে ছড়িয়ে দেয়, তুমি কুড়িয়ে নিতে পারলে তোমার সুখ।

ছবি-হিসাবে দেখলে, এ দৃশ্যের শিল্প-চাতুর্য্য নেই,—কিছুই সূক্ষ্ম সুকুমার নয়, কারুকার্য্যে বহুযত্নে পরিস্ফুট করা হয়নি। এ পর্ব্বতমালা প্রকাণ্ড, এর তরঙ্গায়িত ভঙ্গী বিপুল, এর গায়ের গাছপালা একেবারে পল্লবের ভারে মূর্চ্ছাহতপ্রায়, এদের আন্দোলন ধীর,—উদ্যত বাহু হয়ে মেঘের মৃদঙ্গ রবে, সঙ্কীর্ত্তনের আবেগে নৃত্য করে উঠতে পারেনা। এরা যেন দশা ধরে আছে। এ যেন একটা বিশাল তৈল-চিত্রপট; কাছ হ'তে এর পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবের রং আলোছায়ার বৈচিত্র্যহীন একটা গাঢ় প্রলেপ বলে মনে হয়; কিন্তু একটু দূর হতে সরে দাঁড়িয়ে দেখলে, আকাশের প্রচ্ছদ-পটে এই বিপুল পর্ব্বত-কায় তার তুষার মুকুট, তার মেঘ-উত্তরীয়, তার ঘনবনরাজির অঙ্গচ্ছদ নিয়ে গিরিরাজ দেবতাত্মা হিমালয়ের পরি-

পূর্ণ গম্ভীর উদার মহান সৌন্দর্য্যে, মনকে আনন্দে অভিনন্দিত, গাম্ভীর্য্যের প্রভাবে অভিভূত করে।

* * * * * *

কুয়াশা এখানে তাপপীড়িত অধিত্যকা-বাসীর ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, শান্তিকামীর একান্ত ব্যাকুল প্রার্থনা বহন করে নিয়ে, ধীরে ধীরে পর্ব্বত পথ অতিক্রম করে, উর্দ্ধে মেঘের স্বপ্নাতীত রাজ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ঊর্দ্ধ হতে মেঘমালা দেবতার আশীর্ব্বাদ আনয়ন করে,' তাদের দিগন্তচারী বিপুল পক্ষের ছায়া বিস্তার করতে-করতে নেমে এসে, করুণার ধারা বর্ষণে আপনাদের নিঃশেষ করে দিয়ে তাদের তিরোধান হয়।

মেঘের মত খোস্‌-খেয়ালী ত আর কিছুই নেই, মাঝে মাঝে মাঝপথে এসে এম্নি ভিড় করে দাঁড়ায় যে, সূর্য্যদেব বারম্বার দ্রুত রশ্মি সঞ্চালন করেও অগ্রসর হতে পারেন না,—তাঁর উগ্র সপ্তাশ্ব প্রতিহত হয়ে কেবলি ফিরে ফিরে যায়।

দেবতাত্মা হিমালয়ের তিরস্করণী বিদ্যা জানা আছে, থেকে থেকে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, তার আর সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছেনা। তখন সম্মুখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ বিরাজ করছে, তার পরিবর্ত্তনশীল বাষ্প-বিকাশের অন্তরালে বাস্তব স্থাবর কিছু আছে বলে ধারণা করাই কঠিন, তখন চারিদিক অদৃশ্য, সম্মুখের গভীর অধিত্যকা নিবিড় অন্ধকারে পরিণত, সম্মুখে, পিছনে, পাশে, কিছুই দেখা যায়না, ঠিক যতটুকুর উপর আমরা আছি ততটুকুই যথাসর্ব্বস্ব বলে মেনে নিতে হয়।

মা যেমন পাশ ফিরে কাৎ হয়ে শুয়ে বুকের আড়ালে ছেলেকে বসিয়ে খেলা দেন, পাহাড়ের বুকের তেম্নি একটি বাঁকে আমাদের এ বাড়ীখানি আশ্রয় পেয়েছে। এর সম্মুখে অনেকদূর পর্য্যন্ত কিছু নেই, আর তিন ধারে পাহাড়ের এই বেড়। এই বাড়ীর পূর্ব্বমুখী একটি ঘর আপাততঃ আমার অধিকারে আছে। কাঠের ঘরে কাচের দরজা জানালা। এখানে শুয়ে বসে এই তিন দিকের পাহাড়ের সব দৃশ্যই দেখতে পাই। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ঝোপ-ঝোপ চায়ের গাছ, থাকে-থাকে সাজান, নীচে হতে উপরে উঠেছে। পাহাড়ের গায়ে গাছ যেখানে আপনার বেড়ে-ওঠবার-মত স্থান করে নিতে পেরেছে, সেখানে তার আর কোন কুণ্ঠা নেই, সেখানে তার অব্যাহত উন্নতি, দীর্ঘ সরল বাহুল্যবর্জ্জিত অঙ্গযষ্টি তীরের মত সোজা। বিজয়ী সৈন্যদলের অগ্রগামী পতাকাবাহী দূতের মত সগর্ব্বে সে তার পল্লবপুঞ্জ উর্দ্ধে বহন করে রয়েছে। আবার যে-গাছটি আপনাকে বড় করে তোলবার মত যথেষ্ট স্থান অধিকার করতে পারেনি, তাকে কত কল-কৌশল করে, বেড়ে উঠতে হয়েছে। সে সোজা হয়ে উঠতে পারেনি, নুয়ে পড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে, সে যেন গরুড়টি—মূর্ত্তিমান বিনতানন্দন, নম্র হয়েই আছে, ডালপালা যে সমান করে সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দেবে সে আরামটুকুও সে পায়নি।

এমনি একটি দরিদ্র খর্ব্ব পীচ গাছ আমার জানালার কাছে, পাহাড়ের গায়ে, কোনরূপে দিনাতিপাত করছে। তার কাণ্ডের

কটিদেশটি বক্র, নিজেকে খানিকটে মুড়ে-রেখে তারপর এগোতে চেষ্টা করেছে, ডালপালার সবগুলিরই কনুই বার করা, বুকের দিকে দুমড়ে আনা। কিন্তু তার ফল প্রচুর, চারিদিক ছেয়ে আছে, ছড়িয়ে পড়ছে (কাঙালের ঘরে চিরকালই • ষষ্ঠীদেবীর কৃপা সমধিক—ঐশ্বর্য্যবানেরই হয় এক, নয় ত পোষ্যপুত্রের বিধান)। এখন এই ফল পাক্‌বার সময়, এই গাছটির ঝুঁকে-পড়া ঘাড়ের কাছ হতে, পিঠে বুকে কোমরে চারিদিকে এই সন্তানের দল ভিড় করে আছে। কেউ-বা টক্‌টকে রাঙা, কেউ-বা কাঁচা সবুজ, কারো-বা গায়ে নতুন বয়েসের সোণার বর্ণ সবে ধরতে আরম্ভ করেছে। এই অপর্য্যাপ্ত ফলপুঞ্জের আঁকা-বাঁকা ছোট-বড়, পরিপুষ্ট অপরিণত, গোল, অর্দ্ধগোল, কুঁজো থেঁতলান, পোকায়-খাওয়া, রুগ্নমূর্ত্তি, নানান আকারের ফলের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ লাবণ্যশ্রী নিটোল নধর-অঙ্গ-সৌষ্ঠব একটি ফল প্রতিদিনই আমার চোখে পড়ে। সে এই কাঙাল গাছটির বুক-ঘেঁসে আছে, সেখানে কাছাকাছি আর কেউ নেই। সেখানে তাকে দেখি আর মনে হয়, সে যেন একদল ডানপিটে ছেলের মধ্যে একটিমাত্র শান্ত, শিষ্ট, সুন্দর লক্ষ্মীশ্রীমতী মেয়ে, সাত ভাইয়ের একটি বোন! এরও নিটোল অঙ্গে রং ধরতে আরম্ভ করেছে, সবুজ আর নেই—সবটাই সোণালি হয়ে উঠেছে—বোঁটার ঠোঁটের কাছের চিরটি টুকটুকে গোলাপী, আর তার কপোলের উপর যে বর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে, তা রং নয়—আভা; পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের লালিত্য, এ রং উপরে ফলান হয় নি, ভিতর হতে বিকাশ লাভ করে বাহিরে আভাযে জানান্‌ দিচ্ছে।—আমাদের দেশের "কনক-চম্পক-দাম-গৌরী"র গালে যেমন ঈষৎ লালের আমেজ দেখা যায় তেমনি। প্রতিদিন ফলটি আমি দেখি আর মনে করি, এ সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক—সৌন্দর্য্যে, সুষমায়, স্বাদে, লাবণ্যে, তখন আমি একে তুলে নিয়ে এসে খাব। এ ফলের সংবাদ গোপনে রেখেছিলাম, স্বার্থপরের মত বাড়ীর আর-কাউকে বলিনি।

এখানে আমার একটি পরিচারিকা সংগ্রহ হয়েছে, পাহাড়ী মেয়ে, বয়স পনের কি ষোল, সবে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পা দেবে' মনে করছে। এ যেন মূর্ত্তিমতী চঞ্চলতা, শৈলসুতা গিরি-নির্ঝরিণী, নেচে চলে, স্থির হতে জানে না; থেকে-থেকে গান গেয়ে ওঠে; এক কাজ হাতে নিয়ে, ফেলে রেখে, দশবার দৌড়ে আসে! এরও মুখখানি নিটোল ফলের মত; এতেও রং ধরতে আরম্ভ করেছে, বর্ণ-চোরা আম পাকতে আরম্ভ করলে যেমন রাঙা হয় তেমনি; কেননা এর গায়ের বর্ণ শ্যাম। একদিন দুপুরে সে আমার বিছানার পাশে বসে কাপড় কোঁচাচ্ছিল, হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, কাপড় ফেলে একছুটে ঘরের বাহিরে দৌড়ে গেল—একলাফে পাহাড়ে উঠে পড়ল, তারপর গুঁড়িমেরে আমার পীচ গাছটির দিকে অগ্রসর হতে লাগল! আমি বিছানা হতে উঠে-বসে আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগ্‌লাম; মনে হ'ল—"ঐরে নিয়ে নিলে"। "আমি নেব বলে মনে করে

আছি, কিন্তু নেবার কোন চেষ্টাই করিনি, আর এ দেখাবামাত্র ছুটে চলেছে, ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে এখনি নেয় আর কি! আমি যেমন "নন্দলাল"-বৃত্তি অবলম্বন করে আছি তদনুরূপ ফললাভেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে"—!

যাই হোক, একটু বাদেই বুঝতে পারলাম পার্ব্বতীর এ অভিযান ফলের জন্যে নয়, সে ছুটি সোনা-পোকা উড়ে বেড়াতে দেখে তাই ধরতে গিয়েছিল; মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ছুটিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে, আবার ছুইলাফে ঘরের মধ্যে এসে পড়ল, হাতের কাজ পড়ে রইল, সোনালি পতঙ্গ-ছুটি নিয়ে সে খেলায় মনোনিবেশ করলে। আমিও ফলটি আর নিজে হাতে পাড়বার ও খাবার অভিপ্রায় ত্যাগ করলাম। ঐ দেখার সুখই আমার যথেষ্ট! ফলটি যে আমি ছিঁড়িনি এ কথা যখনি ভাবি, তখনই আমার এখন আনন্দ হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ছন্নছাড়া

(৪)

চাষা আমায় যা বলেছিল, আমি সমস্ত-দিন সেই-কথা মনে-মনে তোলাপাড়া করতে লাগলুম। মারি এমের সঙ্গে দেখা করতে দিতে গুরুমায়ের যে কিসের আপত্তি আমি বুঝতে পারলুম না। এতে মারি এমের কোনো হাত নেই আমি বেশ জানতুম, তাই মনে-মনে স্থির করলুম যে অপেক্ষা করব; ভাবলুম, এমন-একদিন নিশ্চয় আসবে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। সেদিন রাত্রে শোবার সময় চাষার স্ত্রী আমার ঘরে এসে বিছানায় একখানা জেয়াদা কম্বল দিলে; বল্লে যে, এইবার থেকে তাকে আর মা-ঠাকরুণ বলে না ডেকে, তার নিজের নাম-ধরেই যেন ডাকি। সে আরো বল্লে যে, সে আর তার স্বামী আমাকে তাদের মেয়ের মতনই দেখে—এখানে থাকতে যাতে আমার কষ্ট না হয় তার জন্যে তারা যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করবে না।

পরের দিন সিল্‌ভ্যাঁ খাবার টেবিলে তার ভাইয়ের পাশে আমার জায়গা করে দিলে; আমাকে উদ্দেশ করে হাস্‌তে-হাস্‌তে তাকে বল্লে যে আমার কোনো অভাব সে থাকতে দেবেনা; কারণ আমাকে বড়-সড় করে তোলা চাই। চাষার ভাইয়ের নাম ছিল ইউজেন্‌। সে নিজে কথা খুব কম কইত; অন্য যারা কথা কইত তাদের সকলকার দিকে সে চেয়ে-চেয়ে দেখত এবং তার ছোট ছোট চোখ ছুটি হাসিতে ভরে উঠত। তার বয়স ছিল ত্রিশ, কিন্তু কুড়ি-বছরের বেশী তাকে দেখাত না। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তখনই তার একটা জবাব সে দিয়ে ফেলত। তার পাশে বসতে

আমার একটুও বাধো-বাধো ঠেকেনি। টেবিলে আমাকে ভালো-করে জায়গা দেবার জন্যে সে দেয়ালের গায়ে একেবারে ঘেঁসে কুঁকড়ে বসত। সিল্ভঁ্যা যখন তাকে বলত আমার দিকে একটু চোখ রাখতে, সে বলে উঠত—"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

সমস্ত জমি যখন চষা হয়ে গেল, মার্ত্তিন্ তার ভেড়ার দল অনেকদূরের একটা গোষ্ঠে নিয়ে যেত। আমি আর রাখালটা মাঠ পেরিয়ে একটা বনের মধ্যে আমাদের ভেড়ার পাল নিয়ে যেতুম। সেখানে চারিদিকে কেবল ফার্ণ। আমার গায়ে পা-পর্য্যন্ত-লম্বা একটা পশমী জামা থাকত, কিন্তু তবুও আমি শীতে কাঁপতুম। রাখালটা আগুন তৈরি করত। তারই ছাইয়ের উপর রেখে, আলু ও চেস্নাট সেঁকে আমরা দুজনে খেতুম। যতটুকু পারা যায় শীত বাঁচিয়ে চলবার জন্যে কোন্ দিক থেকে হাওয়া আসচে তা কেমন করে বুঝতে হয়, সে আমায় শিখিয়ে দিত। আমরা আগুনের ধারে বসে হাত-পাগুলো গরম করে নিতে থাকতুম, সে আমাকে গান শোনাত। গানটা ছিল "সাদা পানি ও লাল পানি" সম্বন্ধে। প্রকাণ্ড গান—কুড়িটা কলি। তাতে ছিল লাল-পানি ও সাদা পানির ঝগড়া; নিজের নিজের গুণ বর্ণনা করে এ ওর গাল পাড়চে—বলচে, তুই মানুষকে অধঃপাতে দিচ্চিস! আমি যতদূর বুঝতে পারতুম তাতে মনে হত জলের কথাই ঠিক; কিন্তু রাখালটা বলত মদের কথাও ভুল নয়। আমরা এক-সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথা কইতুম। সে তার নিজের দেশের কথা, নিজের বাড়ির কথা আমার বলত। তার দেশ সোলোঞ থেকে অনেক দূর। সে বলত যে ছেলেবেলা থেকেই সে রাখাল। সে যখন খুব ছোট, একটা ষাঁড় তাকে একবার গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছিল; তার জন্যে তাকে অনেক দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। তখন যন্ত্রণায় সে চীৎকার করে কাঁদত। যন্ত্রণা তার সেরে গেল বটে কিন্তু তারপর থেকে তার চেহারা, এখন যেমন দেখচি অমনিধারা তেড়া-বাঁকা হয়ে গেল। সে অনেক চাষার কাছে চাকরি করেছে। তাদের সবাইকার নাম এক-এক-করে আমায় বলত। তাদের মধ্যে কেউ ছিল ভালো, কেউ পাজি; কিন্তু এখানকার মনিবের মতো এমন চমৎকার লোক সে কোথাও দেখেনি। সে বলত, সিলভঁ্যার গোরুগুলো মোটেই তাদের দেশের গোরুর মতন নয়—সেখানকার গোরুগুলো বেঁটে, আর তাদের শিং ছুঁচোলো। ভিল্ভিয়েইর গোরু ছিল বড়-বড়, মোটা-সোটা, জোরালো, এব্ড়ো-খেব্ড়ো পাকানো শিং-ওলা। এই গোরুগুলোকে সে ভারি ভালোবাসত; কিছু বলতে হলে সে তাদের নাম-ধরে ডাকত। সব-চেয়ে ভালোবাসত যেটিকে সেটি ছিল একটি সুন্দর ধবলী গাই। সিলভঁ্যা সেটিকে সম্প্রতি কিনে এনেছিল। সে দিনরাত কেবল মুখটি উঁচু করে দূরের দিকে চেয়ে থাকত, তারপর কখনো-কখনো হঠাৎ একেবারে দৌড় দিত। রাখাল যেই বলে উঠত—"ব্লাশ্! দাঁড়া! দৌড়স্নি!" সে অমনি থেমে পড়ত। কিন্তু একএক-সময় সে কথা শুনত না; তখন কুকুর

বেরিয়ে দেওয়া হত। কুকুর গিয়ে ধরলেও সে কখনো-কখনো পালাবার চেষ্টা করে ছুট দিত। তারপর যখন কুকুরটা তার মুখের বাঁধনটা কামড়ে ধরত, সে আস্তে আস্তে গোয়াল-ঘরে ফিরে আসত। রাখালটা তার জন্যে মধ্যে-মধ্যে দুঃখ করে বলত, আহা! বেচারার যে কিসের দুঃখ তা ও মুখ-ফুটে বলতেও পারে না!

(৫)

ডিসেম্বর মাসে গোরুগুলোকে গোয়ালে বন্ধ রাখা হল। আমি ভাবলুম, ভেড়াগুলোকেও ঐ রকম রাখা হবে। কিন্তু চাষার ভাই আমাকে বল্লে যে সোলোঞঃ দেশ ভারি গরীব—এখানকার চাষাদের এমন সামর্থ্য নেই যে ভেড়াদের জন্যেও শীতের খাবার তারা পুঁজি করে রাখতে পারে। এখন আমায় একলা মাঠ-ভেঙে বনের মধ্যে ভেড়া চরাতে যেতে হত। পাখীরা সব চলে গেছে; চষা জমিগুলো কুয়াশার জালে ঢাকা পড়েছে; বন একেবারে নিস্তব্ধ।

এক-একদিন আমার এমনি একা বোধ হত যে ঠিক মনে হত যেন আমার চারপাশের পৃথিবী ধ্বসে পড়ে গেছে। হঠাৎ যখন একটা কাক কর্কশ সুরে ডাকতে-ডাকতে ঘোলাটে আকাশের গায়ের উপর দিয়ে উড়ে যেত, মনে হত তার সেই বিকৃত সুর যেন পৃথিবীর এই দুর্দ্দিনের গান ফুক্‌রে বেড়াচ্ছে। ভেড়াগুলোও এখন একেবারে ঠাণ্ডা। একজন খরিদ্দার এসে সব মদ্দগুলোকে কিনে নিয়ে গেছে, মাদিগুলো সঙ্গী হারিয়ে একা-একা কি করে খেলবে যেন ঠিক করতে পারচে না। তারা পরস্পরে খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে চলে বেড়াচ্চে, ঘাড়গুলো সব নীচু করেই আছে; এমন কি, যা সামান্য ঘাস আছে, তাও যখন খুঁটে বেড়াচ্চে না, তখনও তাদের মাথা নীচু। তাদের সেইরকম দেখে আমার চেনা কয়েকটি মেয়ের কথা মনে পড়ত। আমি তাদের কাছে গিয়ে গায়ে থাবড়া দিতুম, মুখ তুলে ধরতুম, কিন্তু তারা চোখ তখনই নামিয়ে নিত। তাদের চোখের তারাগুলো দেখতে ঠিক কাচের মতন অথচ এতটুকু আভা নেই।

একদিন এমন ঘন কুয়াশা হল যে আমি অবাক—পথ কোথায় খুঁজে পেলুম না। হঠাৎ দেখলুম একটা অজানা ঘন-বনের ধারে এসে পড়েছি। গাছের মাথাগুলো কুয়াশার মধ্যে মিশিয়ে গেছে—লতাগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভেড়ার লোম দিয়ে তাদের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। গাছগুলোর গা থেকে সাদা সাদা ছায়া নেমে এসে ঝরা-পাতার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে সরে-সরে যাচ্ছিল। আমি ভেড়াগুলোকে সামনের মাঠের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে অনবরত ঠেলা দিচ্ছিলুম, তারা জড়াজড়ি করে কেবল তাল পাকাচ্ছিল—কেউ এক পা এগচ্ছিল না। ব্যাপার কি বোঝবার জন্যে আমি সাম্‌নে এগিয়ে গেলুম—গিয়েই দেখলুম সেখানে সেই নদী—যেটি পাহাড়ের তলা দিয়ে বহে গেছে।

জল প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। আমার মনে হল নদীটি যেন একখানি মোটা সাদা পশমী কম্বল আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্চে।

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই দেখলুম, তারপর ভেড়াগুলোকে জড়ো করে রাস্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলুম। আমি যখন ঠাউরে ঠাউরে দেখছি গোলাবাড়িটা কোথায় হবে সেই সময় ভেড়াগুলো ছুটে-গিয়ে বন থেকে ঘুরে, দুধারে বেড়া-দেওয়া একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। কুয়াশা ক্রমেই আরো ঘন হয়ে আসছিল, আমার মনে হতে লাগল, দুধারে উঁচু পাঁচিল, তার মধ্যে দিয়ে আমি চলেছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না, ভেড়া গুলো যে দিকে নিয়ে যায় সেই দিকেই চলতে লাগলুম। হঠাৎ তারা গলিটা ছেড়ে বাঁ-দিকে ঘুরে পড়ল। আমি তাদের থামালুম। সাম্‌নেই দেখি একটা গির্জ্জে। তার দরজা খোলা। দুধারে দুটি লাল বাতি জ্বলছে, তার আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা ছাই-রঙের গম্বুজ ওলা ছাদ; দু-সারি বড়-বড় থাম চলে গেছে; ওধারের কিনারায় ছোট ছোট শাসি-দেওয়া জানলা; তার উপর একটা আলো চিক্-চিক্ করছে। আমি অনেক-কষ্টে ভেড়াগুলোকে সাম্‌লাতে লাগলুম—তারা যেন হুড়মুড় করে গির্জ্জের ভিতর না ঢুকে পড়ে। তাদের ঠেলা দিতে গিয়ে দেখলুম, তাদের গা ছোটো ছোটো সাদা দানায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে; থেকে-থেকে তারা গা-ঝাড়া দিচ্চে আর সেগুলো ঝুন্-ঝুন্-করে শব্দ করে উঠছে। আমার ভারি ভাবনা হতে লাগল—নিশ্চয় এতক্ষণে সিল্‌ভ্যাঁ আমাদের দেরী দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি ভেবে দেখলুম, যে-পথ দিয়ে এসেছি, সেই পথ দিয়ে ফিরে গেলে গোলাবাড়ি শীগ্‌গির খুঁজে বের করতে পারব। পাছে বেশী গোলমাল হয় সেই-জন্য আস্তে আস্তে ভেড়াগুলোকে এক-করে আমি আবার তাদের গলির ভিতর চালিয়ে দিলুম। নিজে গলির ভিতর ঢুকতে যাচ্ছি এমন-সময় ঠিক আমার মাথার উপর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পেলুম। সে বল্লে—"আহা, বেচারাদের ঘরে যেতে দাও।" এই ব'লে সে ভেড়াগুলোকে গির্জ্জের দিকে ফিরিয়ে দিলে। আমি তখনই চিন্‌তে পারলুম, সে ইউজেন্—সিল্‌ভ্যাঁর ভাই। একটা ভেড়ার গায়ে হাত-বুলিয়ে সে বল্লে—"বরফের এই দানাগুলি পড়ে কি চমৎকার দেখতে হয়েছে, দেখ! কিন্তু বেচারাদের এতে অসুখ হতে পারে।"

তাকে সেইখানে দেখে আমি একটুও আশ্চর্য্য হলুম না। আমি গির্জ্জেটার দিকে হাত-বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওটা কি?" সে বল্লে—"ও তোমার জন্যে! আমার ভয় হ'ল, হয়ত বাদাম-গাছের মধ্যে দিয়ে এই পথ তুমি খুঁজে পাবে না, তাই দু-ধারে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছি।" মাথার ভিতর আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর আমি বুঝতে পারলুম যে, ঐ যে বহুকালের পুরোনো, ক্ষয়ে-যাওয়া কালো থাম, ওগুলো বাদাম গাছের গুঁড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর চিনতে পারলুম, ঐ যে শাসি-দেওয়া জানলা—যার ভিতরে আলো চিক্-চিক্ করছে, সেটা গোলাবাড়ীর রান্নাঘর! ইউজেন নিজেই ভেড়াগুলোকে গুনে তুল্লে। তার পর তাদের গরম-রাখবার জন্যে আমার সঙ্গে মিলে খড়-নিয়ে বিছানা তৈরি করতে লেগে

গেল। আমরা যখন খোঁয়াড় থেকে ফিরে আস্‌ছি, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে যে, যে-দুটো ভেড়া হারিয়ে গেছে তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না বলেছি—সে কথা কি সত্যি? সে যে বিশ্বাস করতে পারলে আমি মিছে কথা বলেছি এইতে আমি লজ্জায় মরে গেলুম—আমার বুক-ফেটে কান্না এসে পড়ল। আমি কাঁদতে-কাঁদতে বল্লুম—"তারা যে কেমন করে কোথায় গেল, আমি কিচ্ছুই টের পাইনি!" সে তখন বল্লে যে তারা একটা নালার মধ্যে ডুবে মরেছে—সে খোঁজ পেয়েছে। আমি ভাবলুম সে নিশ্চয় আমায় খুব বক্‌বে—আমি কেন ভালো-করে তাদের উপর নজর রাখিনি; কিন্তু নরম সুরে সে বল্লে—"যাও, ঘরে গিয়ে গরম-হয়ে নাও-গে! সোলোঞ্জর সমস্ত বরফের গুঁড়ি তোমার চুলে এসে জড়ো হয়েছে!" আমি মনে-মনে স্থির করলুম, আমি নিজে গিয়ে নালাটা একবার দেখে আসব, কিন্তু রাত্রের মধ্যে এমন বরফ পড়ল যে পর-দিন আমরা কেউ আর মাঠে বেরুতেই পারলুম না।

বুড়ি বিবিশ্‌ বাড়ির যত ছেঁড়া কাপড় শেলাই করছিল—আমি তার সঙ্গে বসে গেলুম। মার্ত্তিন্‌ তার চরকায় সুতো কাটতে লাগল; আমি শেলাই করতে-করতে তাদের গান শোনাতে লাগলুম।

(৬)

সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন কাজে বসেছি কুকুরগুলো অনবরত চীৎকার করতে লাগল। মার্ত্তিন্‌কে ভারি উদ্বিগ্ন দেখা গেল। সে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে কুকুরের ডাক শুনলে; তার পর চাষার দিকে চেয়ে বল্লে—"আজ যেরকম দুর্য্যোগ, এতে নেকড়ে বেরুবে!" কুকুরদের কাছে যাবার জন্যে চাষা উঠে দাঁড়াল এবং লণ্ঠন-হাতে সমস্ত বার-বাড়িটা ঘুরে এল। সমস্ত সপ্তাহ ধরে যখন অনবরত বরফ পড়তে লাগল, তখন দেখি বিস্তর কাক গোলাবাড়িতে এসে জুটেছে। এম্‌নি তাদের ক্ষিধের জ্বালা যে কিছুতে প্রাণে ভয়-ডর নেই। তারা গোয়ালে, খোঁয়াড়ে, গোলাঘরে—সর্ব্বত্র যেতে লাগল;—শস্যগুলো নিয়ে যেন ফেলা-ছড়া করতে লাগল। তাদের অনেকগুলোকে চাষা গুলি করে মারলে। আমরা তার কতকগুলো নিয়ে সব্‌জি দিয়ে রান্না করলুম। সবাই খেয়ে বল্লে ভালো, কিন্তু কুকুরগুলো মুখে তুল্লে না।

(৭)

প্রথম-যেদিন ভেড়া ও গোরুগুলোকে বার করে ছেড়ে দেওয়া হল, সেদিন তখনও লম্বা লম্বা পাইনগাছগুলো বরফে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। পাহাড়টারও চেহারা আগাগোড়া কেবল সাদা। মনে হচ্ছিল, সেটা গোলাবাড়ির দিকে যেন এগিয়ে এসেছে। চারিদিকের এই সাদাতে আমার ধাঁধা লাগছিল। যেখানে যেসব জিনিষ থাকে, সেখানে তারা আছে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। আমার ভয় হতে লাগল, হয় ত গোলাবাড়ির চাল দিয়ে যে নীল ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে ওঠে তা আর দেখতে পাবনা। ভেড়াগুলো খাবার কিছু পাচ্ছেনা—কেবল খুঁজে-খুঁজেই বেড়াচ্ছে। আমি তাদের বেশী ছড়িয়ে-পড়তে দিতুম না। তাদের দেখাত ঠিক যেন চলন্ত বরফ। তাই পাছে তারা নজর

এড়িয়ে যায় এইজন্যে খুব সাবধানে তাদের উপর দৃষ্টি রাখতে হ'ত। আমি তাদের জড়ো করে নিয়ে একটা বড়গোছের বনের কিনারায় এনে ফেল্লুম। দেখে মনে হল সমস্ত বনটা যেন তার ঘাড় থেকে বরফের বোঝা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। বড়-বড় ডালগুলো এক-একটা নাড়া দিয়ে গায়ের বরফ ঝরিয়ে ফেলছে; যাদের শক্তি অল্প, তারা হুমড়ি-খেয়ে পড়ে বরফ গড়িয়ে দিচ্ছে। এই বনের মধ্যে আমি আগে কখনো আসিনি। আমি শুনেছিলুম এটা একটা প্রকাণ্ড বন—মার্ত্তিন্ এইখানে মাঝে-মাঝে ভেড়া নিয়ে আসত। পাইন-গাছগুলো এখানে প্রকাণ্ড লম্বা, ফার্ণগুলোও খুব বড়-বড়।

আমি অনেকক্ষণ ধরে এক-ঝাড় ফার্ণের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ মনে হল সেটা নড়ে উঠল—পায়ের চাপে শুক্‌নো কাঠি ভেঙে গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা শব্দ শুনতে পেলুম। আমার ভয় হতে লাগল। আমার মনে হল, ওখানে নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে আছে। একটু পরেই আবার সেইরকম শব্দ—এবার আরো কাছে; কিন্তু কিছু নড়তে দেখলুম না। আমি মনকে খুব সাহস দিতে লাগলুম, ভাবতে লাগলুম, নিশ্চয় খরগোস কিম্বা ঐরকম কোনো ছোট জানোয়ার আহারের চেষ্টায় ঘুরছে। কিন্তু যতই মনকে প্রবোধ দিইনা, কেউ যে ওখানে আছে এ সন্দেহ কিছুতেই গেল না। আমার ভারি ভয় করতে লাগল; ভাবলুম, গোলাবাড়ির কাছাকাছি কোনো জায়গায় চলে যাই। ভেড়া-গুলোর দিকে দু-পা গেছি আর দেখি তারা জড়ামড়ি করে বন থেকে ছুটে পালাতে লাগল। তারা কিসের জন্যে ভয় খেলে বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক চাচ্ছি, এমন সময় দেখি, আমার খুব কাছেই, ভেড়ার পালের মধ্যে একটা হল্‌দে রঙের কুকুর পড়ে একটাকে মুখে-করে নিয়ে পালাচ্ছে। গোড়াতে আমার মনে হল—কাস্তিল্ বোধ হয় ক্ষেপে গেছে; কিন্তু ঠিক সেই-মুহূর্ত্তেই দেখলুম, সে আমার ঘাগরার উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, একটা করুণসুরে চীৎকার করে উঠল। তখন আমি বুঝতে পারলুম যে ওটা নেকড়ে। দেখলুম সে ভেড়াটাকে নিয়ে ছুটে চলেছে—তার মধ্যিখানটা কামড়ে ধরে। দেখতে-দেখতে সে বেশ সহজে একটা পাহাড়ের ঢিবির উপর উঠে পড়ল, এবং যখন সে মাঠ ও বনের মধ্যিখানের খালটা ডিঙিয়ে লাফ মারলে তখন তার পিছনের পা-দুটো দেখালো যেন পাখীর ডানা! সে-সময় সে যদি গাছের মাথার উপর দিয়েও উড়ে যেত তাহলেও আমার আশ্চর্য্য বোধ হত না। আমি সেখানে অনেকক্ষণ একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ভয়-ডর যেন ভুলে গিয়েছিলুম। তারপর আমার বোধ হতে লাগল সেই খানাটার দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছিনা। চোখের পাতা এমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে মনে হতে লাগল আর কস্মিন-কালেও চোখ বুজতে পারব না। ইচ্ছে হতে লাগল খুব জোরে চীৎকার করি--গোলাবাড়ির লোকেরা যাতে শুনতে পায়, কিন্তু গলা

থেকে একটুও স্বর বেরুল না। ছুটে যাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু পা এমন থর-থর করে কাঁপতে লাগল যে ভিজে মাটিতে বসে পড়তে হল। কান্তিল্ অনবরত চীৎকার করে যেতে লাগল—যেন তার একটা ভয়ানক যাতনা হচ্ছে; আর ভেড়াগুলো সব জড়াজড়ি করে কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল।

তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েই আমি সিল্‌ভঁ্যার খোঁজে ছুটে গেলুম। আমাকে দেখেই সে বুঝতে পারলে ব্যাপার কি। সে তার ভাইকে ডেকে নিয়ে দুজনে দুটো বন্দুক-হাতে বেড়িয়ে পড়ল; কোন্‌দিকে নেক্‌ড়েটা গেছে আমি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম। তারা দুজনেই সন্ধ্যা হলে তবে ফিরে এল; নেকড়ের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। সেদিন সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঐ নেকেড়ের কথা ছাড়া আমাদের আর-কোনো কথাই হল না। ইউজেন জানতে চাইলে নেক্‌ড়েটাকে দেখতে কেমন। আমি যখন বল্লুম তার গায়ের রং কান্তিলের মতো হলদে, কিন্তু দেখতে তার চেয়ে ভালো, তখন বিবিশ্ রেগে উঠল।

(৮)

এইবার মার্ত্তিনের পালা। ভেড়াগুলো বের করে সবেমাত্র বেরিয়েছে—তখনো বাদাম-তলা পার হয়নি, আমরা শুন্‌তে পেলুম সে চীৎকার করে উঠল। বাড়ির সবাই ছুটে বেরিয়ে পড়লুম। আমিই সবপ্রথম তার কাছে গিয়ে পৌছলুম। গিয়ে দেখি সে হেঁট-হয়ে পড়ে একটা ভেড়াকে ধরে প্রাণপণে টানছে;— নেক্‌ড়ে সেটাকে মেরেছে, এখন নিয়ে পালাবার চেষ্টা। নেক্‌ড়েটা তার টুঁটি কামড়ে ধরে ছিল; মার্ত্তিন্ যত জোরে টানে, সেও তত জোর করে। মার্ত্তিনের কুকুরটা গিয়ে তার পা কাম্‌ড়ে ধরলে কিন্তু তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই; তারপর যখন সিল্‌ভঁ্যা এসে তার উপর সটান গুলি চালালে তখন সে একথাবা মাংস দাঁতে নিয়ে ডিগ্‌বাজি খেয়ে উল্টে পড়ল। মার্ত্তিনের চোখ যেন ঠিকরে পড়ছিল; তার মুখ একেবারে সাদা। মাথা-থেকে তার টুপিটা পিছলে পড়েছিল, তার সেই লম্বা সিঁথেটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা চওড়া রাস্তা—যার উপর দিয়ে লোকে নির্ভয়ে চলে যেতে পারে। তার মুখের স্বাভাবিক সেই তেজের ভাব বদলে গিয়ে একটা দারুণ বিষণ্ণতায় বিকৃত হয়ে এসেছিল। সে ক্রমাগত হাত খুলচে আর মুড়চে—যেন দুহাতে তাল দিচ্ছিল। এতক্ষণ সে একটা বাদামগাছে হেলান-দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এইবার ইউজিনের কাছে এগিয়ে গেল। ইউজিন তখনো নেকড়েটার দিকে চেয়েছিল। সে তার পাশে খানিক দাঁড়িয়ে সেই মরা নেকড়েটাকে দেখতে লাগল, তারপরে বলে উঠল—"আহা, বেচারা! হয়ত কদ্দিন খেতে পায়নি!" ঠেলা গাড়িতে সেই নেকড়েটা আর ভেড়াটাকে তুলে গোলাবাড়িতে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কুকুরগুলো গাড়ি শুঁকতে-শুঁকতে সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল—মনে হল তারা ভয় পেয়েছে।

তারপর কয়েকদিন্ ধরে রোজ চাষা আর তার ভাই—দুজনে কাছাকাছি যত জায়গা আছে সেখানে শিকার করতে বেরুত। যেখানে ইউজেনের সঙ্গে দেখা হত সে

চতুষ্পাঠী

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

দাঁড়িয়ে আমায় দুটো মিষ্টি কথা বলে যেত। সে বলত যে তাদের ঐ বন্দুকের আওয়াজে নেকৃড়েরা সব পালিয়েছে, আর এখানে বড়-একটা নেকড়ে দেখাও যায় না—হঠাৎ আসে। সে আমায় ঐসব বলে সাহস দিত বটে কিন্তু আমি আর সেই বনটায় যেতুম না। তার চেয়ে পাহাড়ের উপর যাওয়া আমার ভালো বোধ হত—সেখানে কেবল ফার্ণ আর পালকওলা ডাঁটা।

(৯)

বসন্তকাল পড়তেই চাষার স্ত্রী আমাকে দুধ-দোহা ও শূয়োরপালা শেখাতে লাগল। সে বলত, আমাকে সব কাজ শিখিয়ে সে তৈরি করে তুলবে। গুরুমার কথা সেই যে তিনি নাক-সিঁটকে বলেছিলেন আমাকে দুধ দুইতে হবে, শূয়োর ঘাঁটতে হবে—সে-কথা আমি মনে না তুলে থাকতে পারতুম না। তখনকার তাঁর কথার ভঙ্গীতে মনে হয়েছিল যে তিনি আমার শাস্তির ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু এখানে এসব কাজে আমার আনন্দই হত। ভালো-করে দুধ পাবার জন্যে আমি গোরুর পেটের ধারে কপালটা ঠেস দিতুম, দেখতে-দেখতে আমার কেঁড়ে ভরে উঠত। দুধের উপরটা ফেনা হয়ে উঠত—তাতে কতরকম রং যে খেলত; সূর্য্যের আলো পড়ে এমন আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাত যে চেয়ে-চেয়ে আমার ক্লান্তি আসত না।

শূয়োরগুলোকে পালন করতে আমার কখনো বিরক্তি ধরত না। সিদ্ধ আলু ও দই ছিল তাদের খাবার। আমি সেগুলো ভালো করে মেখে দেবার জন্যে ডাবার ভিতর হাত পুরে দিতুম এবং তাদের একেবারে খেতে আসতে না দিয়ে—একটু দেরী করিয়ে দিতুম। তাই দেখতে আমার বড় ভালো লাগত। তাদের ক্ষিধের সেই ছটফটানি আর নাকের ফস্‌ফসানিতে আমি ভারি আমোদ পেতুম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শিশুর চরণ

ছোট ছোট রাঙা পায়   চুমো খেতে সাধ যায়,
কোকনদ সম,
রক্তিম চরণ দুটি—   গৃহ সরোবরে ফুটি
দূর করে তম।
নবনীত সুকোমল   শোভে রাঙা শতদল
ধবল শয্যায়,
কনক চম্পক-কলি   সজ্জিত আঙ্গুলগুলি
আনন্দ জাগায়!

সাদা-লালে মাখামাখি,   বর্ণ ফলাইয়া, আঁখি
সচঞ্চল করে,
কভু বসি কভু শুয়ে   খেলে শিশু নুয়ে নুয়ে
পদযুগ ধরে'!
আবার পূরিয়া মুখে   লেহন করয়ে সুখে
খেলনা ভাবিয়া,
সে পদ-সরোজে তার   চুমো দেয় বার বার
জনক হাসিয়া!

জননী হৃদয়ে তুলে স্তন্য যবে দেয় খুলে,
শিশু রাঙা পায়
কৌতুকে আঘাত করে উচ্ছ্বাস-আনন্দভরে
সোহাগে মাতায়!
প্রত্যেক আঘাতে পা'র সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার
পুলক-নির্ঝরে,

মায়ের অন্তর দিয়া, সুখ-উৎসে উথলিয়া
চরণ বিহরে!
ভৃগুপদ-চিহ্ন বুকে, হরি রেখেছেন সুখে
পুরাণ-কথন,
আজি হেরি ধরা-মাঝে জননীর হৃদে রাজে
শিশুর চরণ!

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

উন্মাদ

আমাকে উঠিতে দেখিয়া শচীশ বলিল, "সে কি, এরি মধ্যে! এলে যখন, গারদটা দেখেই যাও একবার!"

আমি বলিলাম, "সে কথা মন্দ নয়,—চল।"

শচীশ আমার বাল্যবন্ধু। এখন পাগ্‌লা গারদের ডাক্তার। কার্য্যগতিকে এ-অঞ্চলে আসিয়া পড়াতে, অনেকদিন পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

কত-রকমের পাগলই যে দেখিলাম! কেহ 'শিবনেত্র' হইয়া 'বোম্‌-ভোলানাথে'র মতই ধ্যানাসনে বসিয়া আছে, কেহ হাসিতেছে-কাঁদিতেছে, কেহ নাচিতেছে-গায়িতেছে, কেহ-বা চেঁচাইয়া আকাশ ফাটাইতেছে! একজন আমাকে গম্ভীরভাবে কাছে ডাকিয়া চুপিচুপি কাণে-কাণে বলিল, "আপনি যদি কারুকে কিছু না-বলেন, তাহলে একটি ভাল খবর দিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, কারুকে বলব-না—বলুন।"

পাগল বলিল, "আপনি কি রাতারাতি নবাব হতে চান?"

—"খুব চাই!"

—"শুনুন তবে। দেখ্‌বেন—কারুকে বল্‌বেন-না কিন্তু! আমি যখের ধনের সন্ধান পেয়েছি। সাতঘড়া মোহর—এক বাক্স হীরে-জহরৎ! কোথায় আছে, আপনাকে বলে দেব।"

আমি বলিলাম—"বলুন।"

সে বলিল—"একি ফস্‌ করে বলে ফেলবার কথা! আসুন, আগে একটু বসুন—বিশ্রাম করুন—তারপর ধীরে-সুস্থে একে একে সব বলচি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, পরে আর-একদিন এসে সব শোনা যাবে। আজ আর সময় নেই।"

আর-এক জায়গায় দেখিলাম, একটি লোক একখানা কাঁচ লইয়া জলে ডুবাইতেছে, শানে ঘষিতেছে আর মাঝে-মাঝে কাঁচখানা একচোখ বুজিয়া দেখিতেছে।

আমি তাকে অনেক ডাকিলাম, সে কিন্তু একবার মুখও তুলিল না—আমার কথার উত্তরে একটি টুঁ-শব্দও করিল না।

শচীশ বুঝাইয়া দিল, "এঁর বিশ্বাস, ইনি শীঘ্রই বিজ্ঞান-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত কর্‌বেন। ওঁর ব্রত, ঐ কাঁচখানাকে মেজে-ঘষে একেবারে খাঁটি হীরে করে ফেলা। যতদিন এ মহৎ ব্রত-উদ্‌যাপন না-হয়, এঁর দৃঢ়পণ, ততদিন ইনি মৌনী থাক্‌বেন।"

আর-একজন আমাকে ডাকিয়া বড়ই দুঃখিতভাবে নালিশ জানাইল, "মশাই, এরা 'জিনিয়াসে'র ওপরে কি-রকম যাচ্ছেতাই জবরদস্তি করে, জানেন?"

আমি বলিলাম, "কি-রকম?"

সে তার মাথাটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখাইয়া বলিল, "দেখুন্‌, মশাই দেখুন! এরা আমার মাথার চুল খাটো করে ছেঁটে দেয়, আমার মানা মানে না। মাথায় বাব্‌রি-কাটা চুলই যদি না রইল, লোকে আমাকে তবে কবি বলে চিনবে কিসে, বলুন-ত?"

আমি হাসি চাপিয়া বলিলাম, "তা যা বলেছেন!"

পাগল খুসী হইয়া বলিল, "আপনাকে রসিক বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আরো শুনুন, আমি কাগজ-কলম চাইলে এরা তা কিছুতেই দেয় না, উল্টে দাঁত বার করে হাসে। হায়, হায়, কাগজ-কলমই যদি না রইল কবি তবে কেমন করে কবিতা লিখ্‌বে—কেমন করে দুঃখিনী বঙ্গ-ভাষার মুখোজ্জ্বল কর্‌বে? এরা ভাবে আমি বুঝি পাগল,—"

তার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই আমি সরিয়া পড়িলাম।

পাগল কবি আমাকে ডাক্ দিয়া বলিল, "আ আমার কপাল! আপনিও ঐ দলে? মশাই, যাবেন না—যাবেন না! পাগলের সঙ্গে 'জিনিয়াসে'র কতটা যে সম্পর্ক, আগে সেটা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রাণ জল করে দি আসুন।"

শচীশ বলিল, "ইনি ভাবেন, কবিতা লিখ্‌লেই ডাল-ছেঁড়া পাকা আমের মত 'নোবেল-প্রাইজ' এঁর হস্তগত হবে। এঁর মনে দৃঢ় ধারণা, পাছে ইনি 'নোবেল-প্রাইজ' পেয়ে যান, সেই হিংসায় রবি-ঠাকুরই ষড়যন্ত্র করে এঁকে এখানে নির্ব্বাসিত করে রেখেছেন!"

বাস্তবিক,—এ-এক নতুন দুনিয়া, এখানে সমস্তই আজব ব্যাপার! সকলেই এখানে সুখী—কেননা, এদের বিশ্বে বাস্তব বলিয়া কোন-কিছু নাই। আপনাদের বাসনাকে এরা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যেমন-ইচ্ছা তেমনি করিয়া গড়িতেছে—যুক্তি, কারণ ও সহজ-জ্ঞানের কোন ধার ধারে-না বলিয়া 'অসম্ভব' কথাটি এদের অভিধান হইতে মুছিয়া গিয়াছে!

সামনেই একটি ঘর। প্রথমে ভাবিয়া-ছিলাম, ঘরে কেউ নাই; কিন্তু তার পরেই দেখিলাম, এককোণে আধা-অন্ধকারে আবছায়ার মত একটি মূর্ত্তি, একেবারে যেন দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। বিশীর্ণ তার দেহ—বিষণ্ণ তার মুখ!

আমাদের পায়ের শব্দে চমকিয়া, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। শচীশকে দেখিয়া, তার

কোটরগত অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুদুটি একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আস্তে-আস্তে বলিল, "কে, ডাক্তার?"

সে স্বর কি মানুষের? এমন অনৈসর্গিক স্বর আমি জীবনে আর-কখনো শুনি নাই!

শচীশ বলিল, "এখন কেমন আছেন?"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর পা-দুটো যেন কোন-মতে টানিয়া-টানিয়া আমাদের কাছে আসিয়া, শচীশের দিকে অস্থিচর্ম্মসার একখানা হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "দেখুন।"

এতক্ষণে ভাল-করিয়া লোকটার চেহারা দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন শ্মশানের মড়াকে তুলিয়া আনিয়া ভুতুড়ে বিদ্যায় কে তাহাকে জীয়ন্ত করিয়া চলাইতেছে, ফিরাইতেছে! ওঃ, আর তার সেই বুকের ও কণ্ঠার হাড়গুলা! সেগুলার উপরে যেন মাংসের লেশমাত্র নাই—প্রতি নিশ্বাসেই ভয় হয়, উপরকার পাত্‌লা চামড়ার ঢাক্‌নি ফুঁড়িয়া এই মুহূর্ত্তেই তাহারা বুঝি বাহির হইয়া পড়িবে! আমি স্তম্ভিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া কাঠ্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শচীশ তাহার হাত ধরিয়া যতক্ষণ তার নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল, ততক্ষণ সে উদ্বেগে ও আগ্রহে বিস্ফারিতচক্ষে শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, "আপনার নাড়ীতে এখনো জ্বর আছে।"

কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া সে বলিল, "বুকটা দেখ ত ডাক্তার!"

শচীশ তাহার বুকটা খানিকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিল, "আপনার যক্ষ্মারোগ হয়েছে।"

রোগী একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, আপনমনে মৃদুস্বরে বলিল, "আঃ! বাঁচলুম!" তারপর সে আবার ঘরের কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল।

বাহিরে আসিয়া শচীশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভয়ানক! এ কে শচীশ?"

শচীশ বলিল, "আশ্চর্য্য পাগল! বছরের আর ক-মাস এ-লোকটি অনেকটা সহজ মানুষের মত থাকে; কিন্তু যতই বর্ষা ঘনিয়ে আসে, এর পাগলামিও তত বিষম হয়ে ওঠে। তখন ওর কাছে ঘেঁষে, কার সাধ্য!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যক্ষ্মারোগ হয়েছে শুনে লোকটা অমন খুসী হয়ে উঠ্‌ল যে?"

শচীশ হাসিয়া বলিল, "যক্ষ্মা-টক্ষ্মা ওর কিচ্ছু হয়-নি। ও আমার মিছে কথা।"

—"সেকি-হে?"

—"হ্যাঁ; আমি যদি বলতুম, 'আপনি ভাল আছেন'—তাহলে ও রসাতল কাণ্ড বাধিয়ে দিত। তারপর খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে হয়ত উপোস করেই মরে যেত। প্রথম যখন এখানে ডাক্তার হয়ে আসি, তখন ওর হাল-চাল জানা না থাকাতে ভারি মুস্কিলেই পড়া গিয়েছিল।"

আমি বিস্মিত স্বরে বলিলাম, "এ-রকম পাগলের কথা কখনো শুনি-নি।"

শচীশ বলিল, "ভদ্রবংশে লোকটির জন্ম, বেশ ভাল লেখাপড়াও জানে। ওর জীবনের

কথাও অদ্ভুত। গেলবছরে ওর পাগলামি যখন বেড়ে ওঠেনি, আমি তখন কৌতূহলী হয়ে একদিন ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। সেদিন সে কিছু বললে-না বটে, কিন্তু দিনকতক পরে ওর হাতে-লেখা মস্ত এক চিঠি পেলুম। তাতে ওর নিজের কথা সব খুলে লেখা ছিল।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম, "সে চিঠি তুমি ছিঁড়ে ফেল-নি ?"

—"না, সে ছিঁড়ে ফেলবার চিঠি নয়। সত্যি-মিথ্যে জানিনা, কিন্তু সেই কাগজ-ক-খানায় যা লেখা আছে, তা অতি ভয়ানক ব্যাপার। হয়ত তাতে পাগলের প্রলাপও কিছু-কিছু আছে। কারণ আমার বিশ্বাস যে, চিঠিতে ও-লোকটি যে-সব ঘটনার কথা বলেছে, সে ঘটনাগুলি ঘট্‌বার আগেই ওর মাথায় পাগ্‌লামির ছিট্ ঢুকেছিল। তুমি বোধ হয় জান, লোকে যখন প্রথম পাগল হয়, তখন কোন-একটা বিশেষ বিষয়ে তার অস্বাভাবিক ঝোঁক্ পড়ে। সে অবস্থায় প্রথম-প্রথম সে কার্য্য-কারণের জ্ঞান হারায়-না। কিন্তু, তারপর সেই ঝোঁক্‌টা ক্রমে যতই বেশী হয়ে উঠ্‌তে থাকে, উন্মাদ-রোগ ততই তার ঘাড়ে চেপে বসে। হয়ত এ-লোকটিরও সেই দশা হয়েছিল—চিঠি পড়্‌লে তুমিও তা বুঝতে পারবে। তুমি কি সে চিঠি পড়্‌তে চাও ? বিশ্বাস কর না-কর, সে পড়্‌বার মত চিঠি বটে !"

আমি বলিলাম, "পড়্‌ব বৈকি !"

* * *

শচীশের বৈঠকখানায় পাগলের পত্র লইয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলাম। চিঠিতে যা লেখা ছিল, তা এই :—

"ডাক্তার,

আমি যে পাগল, আমার এই পরিচয়ই কি যথেষ্ট নয় ?—পাগলের কথায় কে বিশ্বাস করবে ? তোমার গারদে কত লোক আছে, তাদের কেউ মনে করে 'আমি সম্রাট', কেউ মনে করে 'আমি কবি', কেউ মনে করে 'আমি দেবতা',—কিন্তু তোমরা জান, তারা স্রেফ্‌ পাগল,—খেয়ালের স্বপনে মস্‌গুল হয়ে আছে। তোমরা সে সম্রাটদের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়েছ, কবিদের বাণীর কমলকানন থেকে নির্ব্বাসিত করেছ, দেবতাদের ফুল-চাল-কলা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। তাদের মুখের কথাকে তোমরা সম্রাটের হুকুম বা কাব্যের শ্লোক বা দেবতার অভিশাপ বলে ভ্রম কর না। তাদের কথা তোমরা তুড়ি মেরে স্রেফ্‌ উড়িয়ে দাও—আমার কথাতেই-বা তোমাদের বিশ্বাস হবে কেন ? তবু আমার কথা কেন-যে তুমি জান্‌তে চেয়েছ তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু, জানতে যখন চেয়েছ, আমি যতটা-পারি সব খুলে লিখ্‌ব। মনের কথা মনে চেপে রাখায় বড় কষ্ট। পাগলরা তা পারে-না বলেই তারা এত দিল-খোলা হয়। আমি এখনো পাগলের সব গুণে গুণী নই,—মনের কথা তাই মনেই চেপে রাখতে পারি। কিন্তু এ কথা-চাপ্‌বার চাপ মনকে আমার জাঁতাকলের মত পিষে ফেল্‌ছে—এতদিন তাই যা পারি-নি, আজ তা করব। সব তোমাকে বল্‌ব। বিশ্বাস

কর ভালই,—না-কর পাগলামি বলে উড়িয়ে দিও। আমি স্রধু বলে খালাস হতে চাই।

আর এক কথা। আমি পাগলা-গারদে আছি বটে, কিন্তু এখন ঠিক পাগল নই। তুমি ত জান, বর্ষাকালটায় উন্মাদ-রোগ এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসে। কিন্তু অন্যসময়ে আমি আর পাগলামির স্বপ্ন দেখি না। এ-সময়টায় মনে হয়, আমি যেন সবে ঘুম থেকে জেগে উঠেছি; কেন মনে হয় জানিনা,—কিন্তু, মনে হয়। সবে ঘুম ভাঙ্গলে মানুষের দেহ যেমন একটা অলস জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, আমিও তেমনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। পাগ্‌লামি না থাক্‌লেও আমি যে এই সময়টাতে একেবারে সহজ মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারি-না, তার মূলে, ঐ জড়তা! এ-সময়টায় আমি ভাব্‌তে পারি, সে ভাবনায় একটা কার্য্য-কারণের ধারা পাই—যে ধারা পাগলের চিন্তায় থাকে না। এইতেই বুঝি, এখন আমি পাগল নই।

ছেলেবেলাতেই বাপ-মা আমার মারা যান,—আমি মানুষ হয়েছি মামার-বাড়ীতে। শুনেছি বাবা মরবার আগেই পাগল হয়েছিলেন। আমার অতি-বৃদ্ধ পিতামহও পাগল ছিলেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের বংশে পাগলামির চর্চ্চা হচ্ছে পুরুষানুক্রমে। মামাদের দৌলতে আমি বি-এ পাশ দিয়ে বিয়ে করি। তারপর নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়ে সংসার পাতি। বাবার লোহার সিন্দুকে যা ছিল, তা নিয়ে বড়মানুষী কর্‌তে না পারলেও মোটা ভাত-কাপড়ের অকুলান হল না। বলে রাখা ভাল, মামারা ছাড়া আমার আর কেউ আত্মীয়-স্বজন ছিলেন না।

ক-বছর কাট্‌ল বেশ।

নির্ম্মলা অল্পবয়সেই পাকাগিন্নী হয়ে উঠেছিল; তার যত্নে আমার গৃহস্থালীতে সর্ব্বদাই লক্ষ্মী-শ্রী বিরাজ কর্‌ত। আমাদের আর-কোন দুঃখ ছিল না—কেবল একটি সন্তানের অভাবে নির্ম্মলা মাঝে-মাঝে মুখখানি ভার করে থাক্‌ত। তার মনে মনে কেমন-করে একটা কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল,—যে রমণী বন্ধ্যা, পরলোকে তার সদ্গতি নেই!

নির্ম্মলা যে স্রধু গুণে লক্ষ্মী ছিল, তা নয়; রূপেও সে ছিল সরস্বতীর মতন। যেমন মুখ, তেমনি রং, তেমনি গড়ন,—আমার মত গৃহস্থের সংসারে সে-যেন ভাঙ্গাঘরে চাঁদের আলো! তাকে নিয়ে আমিও কিছু বিব্রত হয়ে থাকতুম। কেন, তা বল্‌ছি।

নির্ম্মলার রূপের খ্যাতি সারা গাঁয়ে রটে গিয়েছিল। পাড়ার কতকগুলো বখাটে ছোঁড়াকে আমার বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে দেখতুম। দু-চারখানা উড়ো চিঠিও আমার বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছিল। অবশ্য, সে-সব চিঠির কথা আমি টের পেতুম না,—নির্ম্মলা নিজেই যদি সেগুলো এনে আমাকে না দেখাত।

ডাক্তার, স্পষ্ট কথা বল্‌তে-কি—স্ত্রীলোককে আমি তেমন ভাল চোখে দেখতুম না। নারী ঘরের লক্ষ্মী হতে পারে,—কিন্তু লক্ষ্মীর মতই সে চঞ্চলা—কখন্ যে কার উপর সদয় হবে, শিবের

বাবাও বলতে পারেন না। শক্ত পুরুষের পাল্লায় না পড়লে রমণী কখনো ঠিক থাকতে পারে না—এই ছিল আমার ধারণা। যে বাগানে মালীও নেই বেড়াও নেই, সে বাগানের ফুল যে আর-পাঁচজনে লুঠে নেবে—এ ত জানা কথা। কামিনী-ফুলকে চোখে-চোখে রাখতে হয়,—নইলে, কোন্‌দিন দেখবে, হয়ত তোমার গলার মালা অন্যের গলায় দুলছে!

সুতরাং নির্ম্মলাকে আমি পৈ-পৈ করে মানা করে দিতুম, অন্দরের আড়াল থেকে সে-যেন কোনমতে বাইরে না বেরিয়ে পড়ে।

নির্ম্মলা কথা বড় বেশী কইত না—উত্তরে একবার 'আচ্ছা' বলেই অন্য কাজে চলে যেত।

ঘরের দিকে এবং পরের দিকে—দুদিকেই আমার দৃষ্টি ছিল সমান সতর্ক। "কোলে থাকিলেও নারী রেখ সাবধানে"—এটা বোধ হয় কবি ঠেকে শিখেছিলেন, কেননা, এর-চেয়ে খাঁটি কথা আর হতে পারে না।

একদিন ভিন্‌-গাঁ থেকে ফিরে আসছি; বাড়ীর কাছে এসে দেখি, একটা ছোঁড়া বাইরে থেকে দরজার ফাঁক্‌ দিয়ে আমার বাড়ীর ভিতরপানে কি দেখছে। কি যে দেখছে, তা বুঝতে আমার দেরি হল না। এখানে কথার চেয়ে গায়ের জোরের দাম বেশী। অতএব, আমি ছুটে গিয়ে তার গণ্ডে এমন-এক প্রচণ্ড চড়্‌ কষিয়ে দিলাম যে, সামলাতে না পেরে দড়াম করে সে মাটির উপরে পড়ে গেল। একেবারে অজ্ঞান! সেই অজ্ঞানতা থেকে গ্রামের আর-আর সকলেই পরম জ্ঞানলাভ কর্‌লে;—কেননা এরপর হতে আর কারুকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় উকিঝুঁকি মারতে দেখি-নি। আমিও জেনে রাখলুম, এ-লোকগুলোর রূপের প্রতি তৃষ্ণা যত, কিল-চড়ের প্রতি বিতৃষ্ণাও তত। এদের ফুল তোলবার সখ আছে বিলক্ষণ—কিন্তু কাঁটা দেখলেই হাত-গুটিয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার কত সাধু যে সুধু এই কাঁটার ভয়েই দায়ে-পড়ে সাধু,—তা ঠিক করে বলা দায়!

একদিন বিকালে বাড়ীর সুমুখে পাইচারি করছি,—হঠাৎ দেখলুম এ-দিকপানে একজন লোক আসছে।

লোকটি বয়সে যুবা, দেখতেও সুশ্রী। চোখে সোনার চশমা, হাতে বাঁধানো ছড়ি—পরণের কাপড়-চোপড় দেখলে বোঝা যায়, বাবুআনার দিকে লোকটির ঝোঁক আছে ষোল আনা। ছেলেবেলায় পরের বাড়ীতে পরের খেয়ে মানুষ হয়েছি, নিজে কখনো বাবু-আনার বায়না ধরবার সুবিধা পাই-নি। এইজন্যে কিনা জানি-না,—যারা বাবুআনা করত তারা ছিল আমার চোখের বিষ। কাজেই এই সভ্য-ভব্য নব্যবাবুটির প্রতি গোড়া থেকেই আমার মন চটে গেল।

লোকটা বরাবর আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল। ছড়ি দিয়ে আমার বাড়ীটা দেখিয়ে সে বল্‌লে, "এ বাড়ীখানা কার মশাই?"

আমি শুষ্ক স্বরে বল্‌লুম, "মশায়ের সে খোঁজে দরকার?"

লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে,

"না, না,—এটা কি বিনয়বাবুর বাড়ী,—আমি তাঁকেই খুঁজচি।"

"মশায়ের আসা হচ্চে কোথা থেকে?"

"আমি সম্প্রতি এখানকার সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে এসেছি।"

লোকটি পদস্থ বটে! কাজেই একটু নরম হয়ে বল্লুম, "আজ্ঞে, আমারই নাম বিনয়বাবু।"

আগন্তুক একবার আমার পা-থেকে মাথা পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্লে, "আপনিই নির্ম্মলার স্বামী? নমস্কার বিনয়বাবু, নমস্কার!"

হুঁ! 'বিনয়বাবু' বলতে এ ঠিক করে নিলে,—'নির্ম্মলার স্বামী'! অর্থাৎ পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নির্ম্মলাকে এ চেনে এবং কান টান্‌লে মাথা আসে বলে, 'বিনয়বাবু'কে এ খুঁজছে নির্ম্মলারই খোঁজ পাবার জন্যে!

আগন্তুক বল্লে, "তাহলে বিনয়বাবু, বাড়ীর ভিতরে একবার দয়া করে বলে আসুন-গে, যে ললিত এসেছে দেখা কর্‌তে।"

কে এ ললিত?—ভাবতে-ভাবতে অন্দরে গেলুম। নির্ম্মলা তখন বসে-বসে একটা বেড়ালের গলায় ঘুঙুর পরাচ্ছিল।

আমি বল্লুম, "হাঁগা, ললিত-নামে কারুকে তুমি চেন?"

নির্ম্মলা একবার চম্‌কে উঠ্‌ল। সে চম্‌কানি আমার চোখ এড়াল না।

বেড়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে নির্ম্মলা বল্লে, "কেন গা?"

নির্ম্মলার মুখ-চোখের উপর নজর রেখে আমি বল্লুম, "ললিত বলে একটি লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে সে?"

নির্ম্মলার মুখ প্রথমে কেমন-একরকম হয়ে গেল। তারপরেই সে কিন্তু খুব খুসী হয়ে উঠল। বল্লে, "ললিত এসেছে? যাও, যাও, ডেকে আন এখানে!"

আমি অটলভাবে বল্লুম, "যা জিজ্ঞেস করলুম তার জবাব কৈ? ললিত তোমার কে হয়?"

নির্ম্মলা একটু থতমত খেয়ে বল্লে, "ললিতের বাপের সঙ্গে আমার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ললিত আমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানে।"

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর স্থিরস্বরে বল্লুম, "ললিত ছেলেবেলা থেকে তোমাকে যখন জানে, তখন এটাও বোধ হয় জানে যে, তুমি এখন পরস্ত্রী। সে তোমার আত্মীয় নয়, তার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া অসম্ভব।"

নির্ম্মলা কাঠের পুতুলের মত ঘাড় হেঁট করে বসে রইল।

বাইরে গিয়ে ললিতকে বল্লুম, "আমার স্ত্রী এখন পাড়ায় নেমন্তন্নে গেছে।"

ললিত একবার আড়চোখে আমার দিকে চাইলে; বল্লে, "আচ্ছা, কাল আমি আবার আসব অখন।"

—"ললিতবাবু, কাল সে তার বোনের বাড়ী যাবে; তার সঙ্গে আপনার দেখা হল না বলে আমি দুঃখিত।"

সে বল্লে—"নির্ম্মলার বোন? সে কি রকম? সে ত এখানে থাকে না!"

আমি থতমত খেয়ে বল্লুম—"আপনার বোন নয়—দূর-সম্পর্ক!"

আমার দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর-কিছু না বলে ললিত ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে চলে গেল। বেশ বুঝলুম, আমার কথার ভাব সে ধরেছে।

বাড়ীর দিকে ফিরবামাত্র দেখলুম, ছাদের এক-কোণে লুকিয়ে নির্ম্মলা দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে কেন সে?—ললিতকে দেখছিল?

মনে-মনে নিজের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিলুম। ভাগ্যে পতঙ্গের সামনে আগুনকে আনি-নি!

নির্ম্মলার এক বোন ছিল, নাম কমলিনী। সে আজ এক বছর হল, বিধবা।

হঠাৎ একদিন খবর এল, কমলিনী কুলত্যাগ করেছে।

খবরটা শুনে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হলুম না। এ ত স্বাভাবিক!

আরও সাবধান হলুম। কমলিনী যে রক্তে জন্মেছে, নির্ম্মলার দেহেও ত সেই রক্তই আছে!

অতএব·········

অতএব বাগানের মালীকে সতর্ক হতে হবে।

নির্ম্মলা মাঝে-মাঝে পাড়ার মেয়ে-মহলে তাস খেলতে যেত। আমি বারণ করে দিলুম, আমার হুকুম-ছাড়া সে যেন আর-কোথাও না যায়। নির্ম্মলা 'হাঁ-না' কিছুই বল্‌লে-না।

এম্‌নি সময় হঠাৎ আমাকে ঘুষ্‌ঘুষে জ্বরে ধর্‌লে। গাঁয়ে একজন বাঙ্গলায় পাশ-করা ডাক্তার ছিল, মাস-দু-এক তার চিকিৎসায় রইলুম। তার ওষুধে সুফলের চেয়ে কুফল হল বেশী। দিনে-দিনে আমি ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। তারপর জ্বরের সঙ্গে দেখা দিলে—খুক্‌খুকে কাশি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার পা টিপে দিতে-দিতে নির্ম্মলা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ গা, এ ডাক্তারকে দিয়ে অসুখ যখন কম্‌ল না, অন্য ডাক্তার ডাক না!"

আমি বল্‌লুম, "গাঁয়ে আর ডাক্তার কৈ?"

নির্ম্মলা থেমে-থেমে বল্‌লে, "আচ্ছা, ললিতকে ডাক্‌লে হয় না? সে ত সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, হাত-যশ না থাকলে সে অতবড় কাজ পেত না।"

আমি তীব্র তিক্ত স্বরে বলে উঠলুম, "না!"

আমার কণ্ঠস্বরে নির্ম্মলা বোধ হয় আঘাত পেয়েছিল। কারণ পা টিপ্‌তে-টিপ্‌তে তখনি সে একবার থেমে পড়্‌ল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তবে সে আবার পা-টেপা সুরু করলে।

ললিত-ডাক্তারের কথা যে আমার মনে ছিল না, তা নয়। কিন্তু তার সুন্দর মুখকে আমি ভয় করি। নির্ম্মলা যে তাকে চায়,—সে কথা সেইদিনই বুঝেছি, যেদিন সে ছাদ-থেকে লুকিয়ে তাকে দেখ্‌ছিল! সুতরাং এটা আন্দাজ করা শক্ত নয়, যে, আমার এই অসুখের অছিলায় নির্ম্মলা ললিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়!······

ডাক্তার, চিঠি পড়্‌তে-পড়্‌তে আমার

মনের ক্ষুদ্রতা দেখে নিশ্চয়ই তুমি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছ। নিশ্চয়ই ভাবছ যে, আমি কি নীচ—কি হীন স্বভাবের লোক! বাস্তবিক, আজ এই গারদে বসে, নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করে চিঠি লিখ্‌তে-লিখ্‌তে আপন-স্বভাবের জন্য আমি আপনিই লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ছি।......সন্দেহ-রোগটা আমার ধাতের সঙ্গে কেমন মিশে গিয়েছিল। এ রোগ যদি আমার না থাকত, তবে আজ কি আমাকে কেউ এই সুন্দর পৃথিবী থেকে, এই বিচিত্র সংসার থেকে, সেই বিমল প্রেমের আলিঙ্গন থেকে, সেই স্বাধীন উদ্দাম জীবন থেকে বঞ্চিত রাখতে পারত? ডাক্তার,—ডাক্তার, আমি লম্পট নই, মাতাল নই, অন্য কোন পাপে পাপী নই—কিন্তু এক সন্দিগ্ধ প্রকৃতির জন্যই আজ আমি সকল-হারা কাঙ্গাল, মানুষ হয়েও অমানুষ, জগতে থেকেও জীবন্মৃত!......

থাক্—যা বলছিলুম—

ললিত-ডাক্তারকে ডাকা হল-না।

পরদিন আমার চিকিৎসা করতে এক কবিরাজ এলেন। কবিরাজ প্রাচীন বটে, কিন্তু অর্ব্বাচীন কি প্রবীণ সেটা জানতুম না।

তবে, তিনি যে স্পষ্টবক্তা এবং রোগীর কাছেও শিশুর মত সরল, তার পরিচয় পেলুম।

চোখ বুজে অনেকক্ষণ আমার নাড়ী-পরীক্ষা করে তিনি সুধু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লেন,—"হুঁ।"

এই "হুঁ"র মানে কি? জিজ্ঞাসা করলুম, "জ্বর কতদিনে সারাতে পার্‌বেন?"

কবিরাজ মাথা তুলে ঢুলু-ঢুলু চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকালেন,—অর্থাৎ, জ্বর সারা না সারা—সমস্তই ভগবানের হাত।

একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌লুম, "কব্‌রেজ মশাই, সুধু ভগবানকে ডেকে যদি অসুখ সারাতে হয়, তবে আপনাকে ডেকে লাভ কি?"

কবিরাজ বল্‌লেন, "আমরা নিমিত্ত মাত্র। বাবা, তোমার অসুখ কিছু গুরুতর।"

—"অসুখটা কি?"

—"যক্ষ্মা!"

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

দরজার কাছে ধুপ্ করে একটা শব্দ হোল। সেখানে ঘোমটা দিয়ে নির্ম্মলা দাঁড়িয়েছিল—চেয়ে দেখি, মাটীর উপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে!

যক্ষ্মা!

সারাদিন—সারাদিন বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলুম,—মনে হতে লাগল অশরীরী মৃত্যু যেন এখনি এসে আমার অপেক্ষায় দরজা আগ্‌লে বসে আছে। যক্ষ্মা! এই দুটি অক্ষরের সঙ্গে কি বিপুল যন্ত্রণা গাঁথা আছে,—কি আতঙ্কের ভাব মেশানো আছে! আজ আমি যেন এই পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর নই—এরি মধ্যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক যেন ঘুচে গেল। ফাঁশীর হুকুম পেলে কয়েদীর মনে কি এমনিতর ভাবের উদয় হয়?

এতদিন, জ্বর হলেও আমি উঠে, বসে, নড়ে-চড়ে বেড়াতুম,—তাতে কোন কষ্ট হোত না। কিন্তু, ব্যাধির নাম শুনে পর্য্যন্ত আমি একেবারে কাবু হয়ে পড়েছি; মনে

হচ্ছে, কে যেন আমার বুকের উপর জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে,—উঠে বসি, সাধ্য কি !

নির্ম্মলা এসে আমার মুখে ওষুধ ঢেলে দিলে। উদাস চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আজ তার মুখ মলিন, কেশে-বেশে কোন শ্রী নেই। কিন্তু এই বিষণ্ণতা ও মলিনতার মধ্যেই তার রূপের শিখা যেন বেশী জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।

আস্তে-আস্তে বল্লুম, "নির্ম্মল,—আমি আর বেশীদিন নই।"

অন্য কোন স্ত্রীলোক হয়ত এখানে পাড়া কাঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ত। কিন্তু নির্ম্মলা স্নধু বললে, "ভয় কি, তোমার কিচ্ছু হয়-নি।"

—"কিচ্ছু হয়-নি! এত সহজে তুমি আমার এ রোগটাকে উড়িয়ে দিতে চাও? আরো বেশী-কিছু হলে তোমার ও শিঁথের সিঁদুর কোথায় থাকৃবে নির্ম্মল?"

নির্ম্মলা হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়াল—তারপর জানলাটা বন্ধ করে দিলে। আমি বুঝলুম, সে পিছন ফিরেছে মুখের ভাব লুকোবার জন্যে—জানলা বন্ধ করে দেওয়া ছলমাত্র।

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। নির্ম্মলার বিড়ালটা বিছানার উপরে লাফিয়ে উঠ্‌ল, তারপর আরামে ঘুমোবার মতলবে আমার বুকে চড়ে বস্‌ল। নির্ম্মলা ছুটে এসে হঠাৎ তার বিড়ালকে এমন-এক চড় মারলে যে, আয়েসের আশা ছেড়ে সে একলাফে আমার বুক থেকে নেমে ল্যাজ তুলে সরে পড়্‌ল। ব্যাপারটা তোমাদের চোখে সামান্য ঠেক্‌বে —কিন্তু আমার কাছে এ তুচ্ছ নয়। কারণ, 'পুসী'কে এর আগে নির্ম্মলার হাতে কখনো মার খেতে দেখি-নি!

নির্ম্মলাকে এইমাত্র কড়া কথা বলেছি বলে মনে একটা ঘা লাগল। গাঢ়স্বরে ডাকলুম, "নির্ম্মল!"

সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

—"বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?"

—"কোত্থেকে এসে নোংরা পায়ে বিছানায় উঠেছিল, তাই।"

—"কেন, আগেও ত সে গঙ্গাজলে পা না ধুয়েই বিছানায় উঠ্‌ত, তখন ত ওকে মারতেও না, তাড়াতেও না।"

নির্ম্মলা চুপ করে রইল।

—"সত্যি করে বল দেখি, পাছে আমার কষ্ট হয় বলেই তুমি ওকে মেরেছ কি না?"

সে কথা কইলে না।

"নির্ম্মল—"

"বল।"

"আমার কষ্টে তুমি কষ্ট পাও?"

নির্ম্মলা একবার আমার চোখে তার চোখ রেখেই নামিয়ে নিলে।

—"নির্ম্মল, শোন।"

—"কি?"

—"কাছে এস, আরো কাছে।"

—"বল।"

—"আমাকে তুমি ভালবাস?"

—নির্ম্মলার মুখে হঠাৎ একটি তরল হাসি খেলে গেল; তারপরেই,—বোধহয় আমার অসুখের কথা ভেবেই—তার সে হাসি থেমে গেল। বললে, "তোমার আজ হয়েছে কি, এত আবোল-তাবোল বক্‌ছ কেন?"

—"নির্ম্মল, তুমি কি আমার কথার উত্তর দেবে না? আমাকে ভালবাস? বল, বল!"

নির্ম্মলা খানিকক্ষণ অবাক-আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তার-পর আস্তে-আস্তে মুখ নামিয়ে, আমার ঠোঁটের উপরে তার দুখানি তপ্ত ঠোঁট রেখে, দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধর্‌লে।

স্বামী হতে গেলে স্বভাবটা কিছু কর্কশ, কিছু গম্ভীর হওয়া চাই—এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু কেন জানিনা, সেদিন আমার মুখ থেকে গাম্ভীর্য্যের মুখোস কি-করে হঠাৎ খসে পড়েছিল। তার পরের দিন সকালে নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভেবে নিজেই যে লজ্জা পেয়েছিলুম—আজও তা ভুলি-নি। সামান্য কারণেই কেন-যে প্রাণ চঞ্চল হয়, মুখ দিয়ে কেন-যে শিশুর হাল্‌কা কথা বেরিয়ে পড়ে, এ-এক মহা রহস্য!

কিন্তু তবু আজ আমার মনে হচ্ছে, সে-সময় সত্যই যদি ছেলেমানুষ থাক্‌তে পারতুম, আজ তাহলে আমাকে এই দুঃখের কাহিনী লিখতে হোত না!

পরদিন ভিন্নগ্রাম থেকে এক পাশ-করা ডাক্তার আনালুম। কারণ 'শতমারী'র বিষবড়ি খেয়ে মরার চেয়ে পাশকরা ডাক্তারের হাতে মরা ঢের ভাল।

ডাক্তারের মুখে এই-একটু ভরসা পেলুম যে, আমার রোগ এখনো সাংঘাতিক হয়ে ওঠে-নি। হয়ত, সেটা মিথ্যা-প্রবোধ!

চিকিৎসা চল্‌তে লাগল। ঘরে ওষুধের শিশি খুবই বাড়ল, কিন্তু রোগ কম্‌ল না। এমনি সময় আর-এক ঘটনা ঘটল।......

সেদিন ভর্‌সন্ধ্যায় বাদল নামল,—নবীন আষাঢ়ের প্রথম জলধারা। আমি বিছানার উপর বালিসে পিঠ রেখে বসেছিলুম,—জানলাটা একটুখানি ফাঁক্ করে দিয়ে। গুমোট্-করা ঘরের মধ্যে মাঝে-মাঝে ঝুরুঝুরু জলের ছাট্ এসে গায়ে লাগ্‌ছে—আঃ, সে কি মিষ্টি! গাছের পাতায়, গাঁয়ের পথে, খানায়-ডোবায় বৃষ্টিবিন্দুগুলি যেন শিশুর মত খেলায় মেতে কলরব কচ্ছিল,—আর আমি আনমনে বসে-বসে বর্ষার 'জলতরঙ্গে' বাদলের সেই মেঠো সুর শুনছিলুম।

হঠাৎ নীচের পথে চোখ পড়ল; সন্ধ্যার আবছায়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল না,—কিন্তু মনে হোল, কে-একটা লোক যেন ছাতি-মাথায় দিয়ে আমার বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়্‌ল।

প্রথমে ভাবলুম, ডাক্তার। কিন্তু, এখন ত—ডাক্তারের এখন আসবার কথা নয়, তায় এই বৃষ্টি! আচ্ছা, ডাক্তার ত এখানেই আসবেন, দেখা যাক্।

একে-একে পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। না, ডাক্তার নয়; তবে, কে ও? আমারই চোখের ভ্রম? না, তাই-বা কি-করে বলি!

আস্তে-আস্তে বিছানা থেকে উঠ্‌লুম। দরজাটা ফাঁক্ করে দেখলুম, রান্নাঘরে নির্ম্মলা নেই। এ-সময় তার ত এখানেই থাকবার কথা,—কোথায় গেল সে?

নিজের অসুখের কথা ভুলে গেলুম। পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে, একটি,

দুটি, তিনটি ঘর পেরিয়ে এলুম,— নির্ম্মলা কোথাও নেই।

হঠাৎ দেখলুম, বৈঠকখানা থেকে আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। খুব সন্তর্পণে, চোরের মতন দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।......

ধারালো তীরের মত একটা অচেনা গলার আওয়াজ আমার কাণে এসে লাগ্‌ল।

কে বল্‌ছে,—

"না বুঝে তখন বদ্ সঙ্গে মিশেছিলুম তোমার বাবা তাই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইলেন না। নির্ম্মল, এখন আমি আর মদ খাই না বটে, কিন্তু তোমাকে—"

বাধা দিয়ে আমার স্ত্রী বল্‌লে, "ললিত, ও কথা আর তুলো না। ছেলেবেলায় আমরা যেমন দুই ভাই-বোনের মত একসঙ্গে ছিলুম, এখনো তেমনি করে আর থাক্‌তে না পারলেও, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার বোন।"

নির্ম্মলার স্বর কি অস্বাভাবিক!

ললিত,—সেই ডাক্তার ললিত, যে এক-দিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, যাকে আমি সন্দেহ করে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, আমাকে লুকিয়ে তারই সঙ্গে নির্ম্মলার এ কি কথা হচ্ছে!

নির্ম্মলা দরজার দিকটা একবার দেখে নিয়ে বল্লে "ললিত, শোন, আমার বেশী সময় নেই, উনি টের্ পেলে আর রক্ষে রাখবেন না। তোমাকে এখানে আসবার জন্যে কেন চিঠি লিখেছি, তা ত জান না?"

ললিত বল্‌লে, "না।"

"আমার স্বামীর বড় অসুখ।"

"কি অসুখ?"

নির্ম্মলা অল্পকথায় আমার রোগের বর্ণনা করলে।

ললিত বল্‌লে, "আমাকে কি করতে বল?"

—"ললিত, তুমি ডাক্তার। রোগের যে লক্ষণ বল্‌লুম, তা শুনে তোমার কি মনে হয়? এখানকার পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার-কব্‌রেজ সব হাতুড়ে। তাদের বিশ্বাস নেই।"

—"মুখে শুনে কি রোগ-ধরা চলে নির্ম্মল?—রোগী দেখতে হবে।"

—"সে হবে না।"

—"কেন?"

নির্ম্মলা থেমে-থেমে বল্‌লে, "তুমি যে এখানে আস, সেটা উনি পছন্দ করেন না।"

"কেন?"

একটু ইতস্তত করে নির্ম্মলা বল্‌লে, "না, সে আমি বলতে পারব না।"

ললিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে, "থাক্, আর বলতে হবে না, বুঝেছি। কিন্তু রোগী না দেখে এত বড় রোগ ধরা অসম্ভব।"

নির্ম্মলা কাতরস্বরে বল্‌লে, "ললিত, ললিত, তবে আমার কি হবে?"

ললিত বললে, "একটা কথা বলি শোন। তোমার স্বামীর যদি সত্যই যক্ষ্মা হয়ে থাকে, তবে তুমি বাপের বাড়ী যাও।"

—"এ কি কথা ললিত!"

—"হ্যাঁ। অবশ্য, যাবার আগে রোগীর সেবার জন্যে একজন ভাল লোক ঠিক করে যেতে হবে।"

—"সে কি হয়?"

—"হতেই হবে। এ-সব রোগীর কাছে স্ত্রী থাক্‌লে রোগীরই অনিষ্ট!"

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌লে, "ওঁকে যদি জান্‌তে, ললিত! আমাকে উনি এখান থেকে এক-পা নড়তে দেবেন না।—অনেক ক্ষণ হয়ে গেল, আর নয়। আজ আসি।"

আমি পা টিপে-টিপে আবার উপরে উঠলুম। তখনো বৃষ্টি পড়্‌ছিল—জলে আমার কাপড়-চোপড় অল্প-অল্প ভিজে গেল।

নির্ম্মলা ঘরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছ?"

কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুলুম। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল।

নির্ম্মলা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,—বোধ হয় ভাবছিল, আমি জবাব দিলুম না কেন!

হঠাৎ কি-দেখে সে আমার পায়ে আর কাপড়-চোপড়ে হাত দিলে। বেশ বুঝলুম, সে চমকে উঠল।

আমি মুখ ফিরিয়ে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম।

নির্ম্মলা আমার দৃষ্টিতে যেন আহত হয়ে দু-পা পিছনে হটে গেল। তারপর উদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌লে,—"তুমি—তুমি কি বাইরে গিয়েছিলে?"

যতটা-পারা-যায় গলাটা ভারি করে বললুম,—"হুঁ। তুমি মর। আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

মড়ার মত সাদা মুখে, ঘাড় হেঁট করে নির্ম্মলা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল—আমার দিকে আর চাইতেও পারলে না।

সে কি বুঝ্‌তে পেরেছে, আমার চোখে ধূলো দেওয়া কত শক্ত?

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলুম।

আমি ত মরবই! যে রোগে ধরেছে কথায় বলে, তা 'শিবের অসাধ্য রোগ'। সংসারের খাতা থেকে আমার নাম কাটা গেল বলে।

আমি ম'লে নির্ম্মলার কি হবে? সে কোথা থাকবে—কার কাছে? তার বাপ নেই, মা নেই,—এক ভাই আছে, সেও গরীব আবার মাতাল। নির্ম্মলার এই বয়স, এই রূপ,—সংসারের বিষম পাকচক্রে পড়লে সে কি আর আপনাকে সামলাতে পারবে?

তারপর,—ঐ ললিত! নির্ম্মলার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—সে এখনো নির্ম্মলাকে ভুলতে পারে-নি নিশ্চয়। ছেলে-বেলা থেকে তারা দুজনে দুজনকে জানে—তাদের মধ্যে এখনো একটা ভালবাসার টান থাকা খুবই স্বাভাবিক। নির্ম্মলা এখনো তাকে দেখ্‌তে চায়—এর প্রমাণও হাতে-হাতে পেয়েছি।

মাঝখান থেকে তাদের মেলা-মেশায় বাধা দিচ্ছি—আমি। নির্ম্মলা মনে-মনে সত্যই আমাকে ভালবাসে—না, কেবল কর্ত্তব্যের জন্যে যেটুকু করবার তা করে—এটা ঠিক জানি না; কিন্তু সে যে আমাকে ভয় করে, এ-কথা বেশ বোঝা যায়।

ললিত এখনি পরামর্শ দিচ্ছে, আমাকে একলা ফেলে নির্ম্মলা চলে যাক্‌। নির্ম্মলাও

তার কথা শুনত—যদি-না আমাকে ভয় করত। আমি বেঁচে থাকতেই এই!

কমলিনী নির্ম্মলার বোন—এক রক্তে এদের জন্ম। যতদিন সধবা ছিল, ততদিন কমলিনীর নামে ত কিছুই শুনি-নি। বিধবা হয়ে কমলিনী বাপের বাড়ী গেল, তারপর বছর ঘুরতেই শুনলুম, সে কুলত্যাগ করে কূল ছেড়ে অকূলে ভেসেছে!

কমলিনীর জীবনে যা ঘটেছে, নির্ম্মলার জীবনেও তা ঘটবে না কেন?— বিশেষ, নির্ম্মলার সামনে আর-এক প্রলোভন আছে; ললিত তার বাল্যবন্ধু, ললিতকে এখনো সে দেখতে চায়, ললিতের সঙ্গে তার বিয়ের কথাও হয়েছিল, ললিত এখনো বিয়ে করে-নি। ঐ সুপুরুষ ললিতকে আমি ভয় করি।.........

সে রাত্রে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কেবল নির্ম্মলা আর ললিতকে স্বপ্নে দেখতে লাগলুম। বারবার ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল। শেষবারে দেখলুম,—এই ঘরে, এই বিছানায় বিধবার বেশে বসে আছে নির্ম্মলা, আর তার পায়ের তলায় ললিত! দরজার কাছে আমি অসহায়ের মত, ম্লান-কাতর চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি—তারা আমায় দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, আমি তখন মৃত; দাঁড়িয়ে আছে,—সে আমার প্রেতাত্মা!

এক-চমকে ঘুম ছুটে গেল। ঘর্ম্মাক্ত দেহে, বিছানা থেকে লাফিয়ে মেঝেতে গিয়ে পড়লুম। জানলার কাছে ছুটে গেলুম। তখনো বৃষ্টি পড়ছিল।

চীৎকার করে বলে উঠলুম, "এ হবে না, এ হবে না! নির্ম্মলা আমার—আমি তাকে ভালবাসি—মরে গিয়েও ভালবাস্‌ব! মরবার আগে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব নির্ম্মল—নিয়ে যাব, নিয়ে যাব!"

অন্ধকারে হঠাৎ কে আমাকে দুহাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধর্‌লে। আমি বিহ্বলের মত বল্‌লুম,—"কে তুমি?"

—"ওগো, আমি—আমি—"

"—অ্যাঁ নির্ম্মল! শোন, আমি তোমাকে নিয়ে যাব—ছাড়্‌ব না!"

—"কি বল্‌ছ গো—ও কি বল্‌ছ! তোমার কি হয়েছে?"

তখন আমার চমক ভাঙ্গল। মাথাটা ঘুরে উঠ্‌ল—পা টল্‌তে লাগল। কোনরকমে নির্ম্মলার গা ধরে বেহুঁসের মত মাটীর উপরে ধুপ্‌ করে বসে পড়লুম।

ডাক্তার, ডাক্তার, সেই রাত্রে আমার মাথার ভিতরে যে-রকম ভাব এসেছিল, এখনো ফি-বছরের যে-সময়টায় আমি পাগল হয়ে যাই, আমার মাথায় ঠিক তেমনিধারা ভাব আসে!

সে-রাত্রি থেকেই যে আমাকে এই উন্মাদ-রোগ আক্রমণ করে-নি তা কে বল্‌তে পারে?—

তুমি বল্‌তে পার, ডাক্তার?

ওঃ, সে স্বপ্নটা কি বাস্তব! লিখতে-লিখতে এখনো আমার চোখের উপর সেই দৃশ্য আগুনের রেখায় জেগে উঠ্‌ছে আর আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। মনে হচ্ছে, আমি

বুঝি আবার এখনি পাগল হয়ে যাব! মাগো, এ কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

দু-চারদিন পরেই বুকে ব্যথা হয়ে নির্ম্মলা ভয়ানক জ্বরে পড়্‌ল। বাড়ীতে আমরা দুটি প্রাণী,—দুজনেই শয্যাশায়ী; কে যে কাকে দেখে তার ঠিক নেই। এ ক'দিন নির্ম্মলা নিজে-থেকে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে-নি। যখনি তাকে দেখেছি, তখনি মনে হয়েছে সে-যেন কি দুর্ভাবনা ভাবছে। আমি ডাক্‌লে বিমর্ষ মুখে আমার কাছে এসে দাঁড়াত, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সে অত্যন্ত নীরস একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিত,—যেন নিতান্ত দায়ে পড়েই।

তার এমনধারা ভাবভঙ্গি দেখে, আমার গা যেন জ্বলে যেত। আমি কি তার চক্ষুঃশূল? কেন, এমন-কি দোষে দোষী আমি?—ক্রমেই আমার রাগ বেড়ে উঠ্‌ছিল;—তার এই নির্লিপ্ত অবহেলার ভাব আমার রুগ্ন মাথাটাকে যেন বিগ্‌ড়ে দিচ্ছিল!

কি ভাবছে সে? কেন ভাবছে? কার জন্যে এ ভাবনা? মনে-মনে এমনি নানান্ প্রশ্ন জাগ্‌তে লাগল। সে কি আমাকে ঘৃণা করে? সে কি ললিতের কথা ভাব্‌ছে? আমাকে ছেড়ে পালাতে চায়?

ললিতকে মনে পড়লেই, সেই গুপ্ত-সাক্ষাৎ, সেই ভীষণ স্বপ্নদৃশ্য স্মরণ হয়—আর আমার মাথা যেন আগুনের মত গরম হয়ে ওঠে—আমি যেন পাগল হয়ে যাই।

এমন সময় নির্ম্মলা অসুখে পড়্‌ল। আমাকে যে ডাক্তার দেখ্‌ছিলেন, তিনিই তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। প্রথম দু-তিনদিন অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে লাগল, ডাক্তার পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু আমার একটুও ভয় বা ভাবনা হোল না।......

ডাক্তার! তুমি কি বিশ্বাস কর্‌বে, যে, নির্ম্মলার তখন মৃত্যু হলে, আমি খুসি হতুম! হ্যাঁ, সত্যি কথা। আমি ত মর্‌বই,—তবে সে কেন বাঁচবে? আমাকে স্বার্থপর ভাবছ? না, আমি তা নই। নির্ম্মলাকে আমি ভালবাসি,—প্রাণের মত ভালবাসি। সে ভালবাসার তল নেই, সীমা নেই, অন্ত নেই। কিন্তু বলেছি ত, নারীর চঞ্চল মনকে আমি বিশ্বাস করি-না। তার উপর নির্ম্মলার বোন কমলিনী আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি যদি মরি,—তবে তার নবীন, নশ্বর, পুষ্পিত যৌবন নিয়ে, কুচক্রীর বিষাক্ত নিশ্বাসে নির্ম্মলা কি নির্ম্মল থাক্‌তে পারবে? পারবে না—পারবে না! আর একটা কথা শোন, ডাক্তার।

নির্ম্মলা একদিন জ্বরের ঘোরে ভুল বক্‌ছিল। আমি মাঝে-মাঝে রোগশয্যা থেকে উঠে নির্ম্মলাকে দেখে আস্‌তুম। কিন্তু সেদিন গিয়ে কি শুনলুম জান? শুন্‌লুম, নির্ম্মলা সকাতরে বল্‌ছে, "ললিত সেদিনের কথা ভুলে যাও—তুমি বিয়ে কর; তাহলেই আমি সুখী হব—"তারপর সে চুপিচুপি বিড়্‌বিড়্ করে আরো কি-সব বলতে লাগল, আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু যা শুনেছি তাই শুনেই ঘরের ভিতরে

যেতে আমার পা উঠ্‌ল না; আচ্ছন্নের মত আপন ঘরে এসে বিছানার উপর আছ্‌ড়ে পড়লুম।

ডাক্তার, রোগের ঘোরেও সে ললিতকে ভোলে-নি! তাই কামনা করছিলুম, নির্ম্মলা মরুক্—আমি মরবার আগে নির্ম্মলা মরুক! রোগে যদি তার মৃত্যু হোত,—তাহলে, আজ জীবন শূন্য হয়ে গেলেও হয়ত আমি পাগল হয়ে যেতুম না।......

আজ তুদিন নির্ম্মলা কতকটা সাম্‌লে উঠেছে; কিন্তু ভয় যায়-নি।

সেদিন বিকালবেলায় তার ঘরে গেলুম। ঢুকেই দেখি, নির্ম্মলা শুয়ে-শুয়ে একখানা চিঠি পড়ছে। চিঠি পড়তে-পড়তে সে এমনি তন্ময় হয়ে উঠেছিল যে, আমার পায়ের শব্দ মোটেই তার কানে ঢুকল না।

যখন একেবারে তার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন সে মুখ তুলে আমাকে দেখেই চম্‌কে উঠল। তারপর, চিঠিখানা তাড়াতাড়ি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে।

দেখলুম, তার চোখের কানায়-কানায় জল টলমল করছে। চিঠি পড়্‌তে-পড়্‌তে সে কাঁদছে!—কেন?

কুতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কার চিঠি নির্ম্মল?"

নির্ম্মলার মুখ পাঙ্গাশপানা হয়ে গেল। সে জবাব দিলে না।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কার চিঠি?"

নির্ম্মলা নিরুত্তর।

বিরক্তস্বরে আমি বল্লুম, "বলবে-না তাহলে?"

নির্ম্মলা মুখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

আর সইতে পারলুম না। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে চড়া গলায় বল্লুম, "নির্ম্মলা, তুমি ঠাউরেচ কি, আমি কি তোমার গোলাম? তুমি লুকিয়ে পরের সঙ্গে দেখা করবে—জ্বরের ঘোরেও পরপুরুষের নাম করবে—আড়ালে পরের চিঠি পড়বে, আমার বাড়ীতে বসে আমারই কথা মানবে-না শুনবে-না,—আমার অসুখে কি তোমার ফূর্ত্তি বেড়েছে? আমি না-মরতে এই, ম'লে কি করবে? তার চেয়ে তুমিও মর, আমিও মরে জুড়োই!"

নির্ম্মলা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে শয্যায় পড়ে রইল।

—"এখনো বল বল্‌ছি, কার চিঠি?"

নারীর এ কি স্পর্দ্ধা—তার এ নীরবতা অসহ্য!—আমার শিরায় শিরায় তপ্ত রক্ত ছুটতে লাগ্‌ল। সামনে একটা জলের কুঁজো ছিল, নিষ্ফল আক্রোশে সেটা তুলে নিয়ে দুম্ করে মেঝেতে আছ্‌ড়ে ফেল্লুম, সেটা সশব্দে ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল; ক-টুক্‌রো ছিট্‌কে নির্ম্মলার গায়ের উপরেও গিয়ে পড়ল—তবু সে পাথরের মত নিসাড়-নিথর হয়ে রইল,—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করল-না।

কোনমতেই না-পেরে-উঠে ব্যঙ্গের হাসি হেসে শেষটা আমি তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলাম, "বোঝা গেছে, এ সেই লম্পট ললিতের চিঠি। তোমার বোন বিধবা হয়ে কুলত্যাগ করেছে, তোমার বোধ হয় অত দেরিও সইচে-না; স্বামী বেঁচে থাকতেই তুমি

কুলে কালি দিতে চাও! কুলটার বংশে তোমার জন্ম—তুমিও—"

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত চকিতে সোজা হয়ে নির্ম্মলা দাঁড়িয়ে উঠল—তার মাথার রুক্ষ এলমেল চুলগুলো ক্রুদ্ধ সাপের মত চারিদিকে ঠিক্‌রে-ঠিক্‌রে পড়ল—তার দুই চোখ স্থির বিদ্যুতের মত আমার চোখের উপর জ্বল্‌তে লাগ্‌ল—তার মাথা থেকে পা-পর্য্যন্ত থরথর্‌ করে কাঁপতে লাগল! কি-যেন সে বল্‌তে চায়—কিন্তু রাগের আবেগে তার কথা কণ্ঠের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে!

অনেক কষ্টে শেষটা সে একনিশ্বাসে দৃপ্তস্বরে বলে উঠল,—"কি! কুলটার বংশে আমার জন্ম—আমি কুলটা!"

নির্ম্মলাকে বরাবর নেতিয়ে-পড়া লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কোচে জড়সড় দেখে আস্‌ছি,—আজ তার এ কি মূর্ত্তি—এ কি ভাব!—এ যে কখনো কল্পনাতেও ভাবতে পারি-নি। মুহূর্ত্তে এমন পরিবর্ত্তন কি সম্ভব!

আমি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না-করে সে ঘর ছেড়ে চলে এলুম।

নিজের ঘরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লুম। মাথার ভিতরে তখন সমস্ত ওলট্‌-পালট্‌ হয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ হতভম্বের মত চুপচাপ বসে রইলুম।

তারপর, সব ঘটনা মনে-মনে একবার ভেবে নিলুম। নির্ম্মলার সুমুখ থেকে অমন করে পালিয়ে এলুম কেন? আমি কি কাপুরুষ! নির্ম্মলা দোষী হয়েও অনায়াসে আমাকে চোখ রাঙ্গালে—আর, আমি পালিয়ে এসে তার স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিলুম! ছিঃ, ধিক আমাকে! পুরুষ হয়ে নারীকে—নিজের স্ত্রীকে ভয়! গলায় দড়ি আমার!

আপনাকে-আপনি বারবার ধিক্কার দিতে লাগ্‌লুম। কিন্তু তাতেও মন উঠল না! আমি যে ভয় পাই-নি, আমি যে স্ত্রৈণ নই, আমি যে ইচ্ছে কর্‌লেই নির্ম্মলাকে পায়ের নীচে থেঁৎলাতে পারি,—এটা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে, এ-ঘর থেকেই আমি হো-হো করে তাচ্ছল্যের উচ্চহাসি হেসে উঠলুম। ও-ঘর থেকে নির্ম্মলা কি আমার হাসি শুনতে পায়-নি? পেয়েছিল বৈ কি।

সেই চিঠির কথা মনে পড়ল। কার চিঠি? নিশ্চয়ই ললিতের। নৈলে সে চিঠিখানা অমন করে লুকোত না। পাপী না হলে চিঠি দেখাতে তার অত ভয় কিসের? আমার সুকথা-কুকথা কিছুই সে গ্রাহ্য কর্‌লে-না, চিঠিতে নিশ্চয়ই কোন দূষ্য কথা আছে।

হ্যাঁ—চিঠি পড়তে-পড়তে সে কাঁদছিল। আমার কড়াক্কড়িতে তার মনের ইচ্ছে পূর্ণ হচ্ছে না—সেইজন্যেই তার এ কান্না আর-কি! কান্না ত দুর্ব্বলেরই বল!—আর, চিঠিখানা যে তার কত মনের মত হয়েছিল, তাও বেশ বুঝতে পাচ্ছি। আমার পায়ের শব্দও তার তন্ময়তা ভাঙ্গতে পারে-নি!

ললিত, ললিত, নির্ম্মলা তোমাকেই ভাবছিল! তোমাকে যদি এখন হাতের কাছে পাই, তবে নির্ম্মলার সামনে তোমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে, এই দুই হাতে তোমার গলা টিপে ধরে, আস্তে আস্তে—ক্রমে ক্রমে—চেপে চেপে নিশ্বাস বন্ধ করে তোমাকে আমি মেরে ফেলি!

তোমাকে চোখের সামনে মরতে দেখে নির্ম্মলা কেঁদে উঠবে, আর তার কান্নার উত্তরে আমিও আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠব, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!......

হঠাৎ আমার হুঁস হোল—এ কি! বিছানার একটা বালিশ দু-হাতে চেপে ধরে সত্যি-সত্যিই আমি যে বিকটস্বরে হাস্‌ছি! অ্যাঁঃ,—আমি কি পাগল হলুম—এ আমি করছি কি?

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বাতাসের সঙ্গে যুঝে কোনই লাভ নেই। একটা কিছু করা চাই!

মরবার আগে আমাকে একটা কিনারা করতে হবেই-হবে। সেদিনের স্বপ্ন আমি এখনো ভুলি-নি। কিছু-না-করে আমি যদি আজ মরি, তবে কাল সেই স্বপ্নই সত্য হবে।

কিন্তু, কি করব—কি কর্‌তে পারি?...

একমনে ভাবতে লাগলুম—তেমন ভাবনা আর-কখনো ভাবি-নি।

ঝী এসে খবর দিলে, ডাক্তার-বাবুর লোক এসেছে। তাকে উপরে আনতে বল্‌লুম। যে এল সে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার।

কম্পাউণ্ডার নির্ম্মলার জন্যে দুটো ওষুধ এনেছিল। সে বল্লে, একটা খাবার, আর-একটা বুকে মালিস করবার।

শিশিদুটো দেখলুম। মালিশের ওষুধের শিশিতে একখানা কাগজে বড়-বড় ইংরেজী হরফে লেখা রয়েছে—"বিষ।"

শিশিটা একমনে দেখতে-দেখতে কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"এ খেলে কি মানুষ মরে?"

—"মরে বৈ কি!"

খানিক ভেবে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "যদি সমস্তটা খায়?"

—"বারো ঘণ্টার মধ্যে মরে যেতে পারে।"

—"আচ্ছা, যাও।"

সেই রাত্রি—কালরাত্রি! ওঃ, কে-যেন ধারাল ছুরি দিয়ে ছেঁদা করে সে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার আমার বুকের মধ্যে পূরে দিয়েছে। সে রাত্রি কি ভুলব—ভুলতে কি পারি?

ডাক্তার, সে-রকম রাতও কখনো দেখি-নি,—তেমন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারও আর-কখনো দেখি-নি! খালি কি অন্ধকার? যেমন ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি—তেমনি হুহু-হুহু ঝড়! মড়মড় করে বড় বড় গাছের ডালগুলো ভেঙ্গে পড়ছে,—সেইসঙ্গে ক্রমাগত গুড়্‌গুড়্ করে বাজ ডাকৃছে আর ডাকৃছে! সে রাতে পৃথিবীকে মনে হচ্ছিল, যেন সুধু শব্দের পৃথিবী!

এক-পা এক-পা করে নির্ম্মলার ঘরের দিকে গেলুম। ঘরে ঢুকবা-মাত্র লক্ষ্য করলুম—নির্ম্মলা চুপ করে উপরপানে চেয়ে শুয়েছিল, আমাকে দেখেই চোখ মুদলে। আমার উপর তার এত ঘৃণা! মনে একটু-যে ইতস্তত ভাব ছিল, নির্ম্মলার রকম দেখে তাও ঘুচে গেল।

খাটের পাশে গিয়ে ইচ্ছে করেই নীরস, কর্কশ স্বরে বললুম, "কেমন আছ?"

সে আমার দিকে পিছন ফিরে শুল। আমিও তখন তার ভালমানুষী চাইছিলুম না—সে রাগ করে, তাই আমার ইচ্ছা!

আমি তেমনি স্বরে বল্লুম, "আমার এই অসুখ শরীর, কখন্ আছি কখন্ নেই, এই দুর্য্যোগে বিছানা ছেড়ে উঠে, আমি এলুম তোমার কাছে—আর, তোমার কিনা এই ব্যবহার! যে রক্তে কমলিনী জন্মেছে, সেই রক্তেই ত তোমার জন্ম! স্বামীকে তুমি ভক্তি করবে কেন! আমি ত ললিত নই!"

এই কথাগুলো বলব বলে আমি আগে-থাকতে অনেকক্ষণ ধরে মুখস্থ করে রেখে ছিলুম।

নির্ম্মলা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে, দুহাতে প্রাণপণে মাথার বালিশটা চেপে ধরলে,—যেন সে অনেক—অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে নিচ্ছে!

আমি আবার বল্লুম, "তুমি অসতী! তোমার মৃত্যুই ভাল!"

নির্ম্মলা শিউরে উঠল।

"শোন, যা বল্তে এসেছি। মাথার উপরে যে শিশিটা রইল, ওটা বিষ। খেলেই লোক মরে যায়। ওটা বিষ—ভয়ানক বিষ, বুঝলে?"

কে-এক পণ্ডিত বলেছিলেন, সঙ্গিন মুহূর্ত্তে কারুর মাথায় কোন কু-সঙ্কেত ঢুকিয়ে দিলে সেটা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। সে-কথা আমি ভুলি-নি। আমি জানি, এইজন্যেই পৃথিবীতে অনেক মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে! এই মুহূর্ত্তে নির্ম্মলার আচ্ছন্ন দুর্ব্বল মস্তিষ্কের যে অবস্থা,—এখন কেমন করে কি ইঙ্গিত দিলে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে,—আগে-থাক্তে তার প্রত্যেক কথাটি তন্ন-তন্ন করে আমি ভেবে রেখেছিলুম।......

ঠক্ করে নির্ম্মলার শিয়রে ওষুধের শিশিটা রেখে দিলুম। দেখলুম, শিশি-রাখার শব্দে নির্ম্মলা চম্‌কে উঠ্‌ল।

আস্তে-আস্তে দরজা পর্য্যন্ত এসে, ফিরে দাঁড়ালুম। তারপর, প্রত্যেক কথাটিতে খুব জোর দিয়ে-দিয়ে কর্কশস্বরে আবার বল্লুম, "তুমি মলে আমি বাঁচি। কিন্তু দিচ্ছি শোন, ওটা খাবার ওষুধ নয়, মারাত্মক বিষ। খেয়োনা যেন—ভয়ানক বিষ—খেলেই মরবে!"

নির্ম্মলার ঘর থেকে বেরুতেই,—কেন জানি-না, আমার প্রাণে কেমন-একটা আতঙ্ক হোল। ছুট্‌তে-ছুট্‌তে নিজের ঘরে এসে ঢুকে পড়্‌লুম। তাড়াতাড়ি দড়াম্ করে দরজাটা এঁটে বন্ধ করে দিলুম।

ঘরের এককোণে জবুথবু হয়ে বসে-বসে কাঁপছি আর কাঁপছি। এত কাঁপুনি কেনরে বাপু—শীত নেই, গা কাঁপে কেন? ভয়ে? ইঃ, ভয়টা কিসের—আমি কি কাপুরুষ? যার মরবার ভয় নেই, যে মরবে নিশ্চয়, যে মরতে প্রস্তুত, তার আবার কিসের ভয়—কাকে ডরায় সে? কিন্তু গা কেন তবু কাঁপে, বুকের কাছটা থেকে-থেকে কেন দুন্দুড় করে ওঠে?

ওকে—কে ও!—ঐ যে নড়্‌ছে, আমার পাশে-পাশে—নীরবে, নীরবে!—একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম—সেও যে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল! হাঃ হাঃ, আরে দ্যুৎ! এ যে আমারি ছায়া!

দাও পিদিমটা নিবিয়ে,—ছায়া আর পড়্‌বে না!

উঃ, কি অন্ধকার—কি অন্ধকার! এত

অন্ধকারও পৃথিবীতে ছিল? এ কি পৃথিবীর অন্ধকার,— না, নরকের? অন্ধকার যেন ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে, এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, জমাট হচ্ছে, তাল পাকাচ্ছে! ঐ যে শোঁ-শোঁ করে ঘরের মধ্যে কি এসে ঢুকে পড়ল, ও কি ঝড়ের হাঁক, না অন্ধকারের দীর্ঘনিশ্বাস?

চুপ্‌—চুপ্‌! ঐ শোন, অন্ধকারে কে-যেন যন্ত্রণায় কাত্‌রে কাত্‌রে কেঁদে উঠছে না? ঐযে—ঐযে! মাটীতে কাণ পেতে শোন—ও কান্না ঠিক তোমার বুকে এসে লাগছে না কি? কে-যেন বলছে না কি "ওগো বুক গেল গো—ওগো বুক—উহু-হু-হু?"—হ্যাঁ, বলছে ত—বলছে ত! কৈ, না—কেউ ত কাঁদছে না—হ্যাঁ, কাঁদছে বৈকি,—না, না, কাঁদছে না—ও তোমার ভ্রম!

না—দেখে আসি, সত্যি হোক্‌ মিথ্যে হোক্‌—একবার দেখে আসি। এমন করে জড়ের মত এই অন্ধকারে হাত-পা গুটিয়ে কি বসে থাকা যায়?

এলমেল কতরকম ভাবনাই যে মাথার মধ্যে এল-গেল—কে তার ঠিক্‌ রাখে?

আস্তে-আস্তে একবার উঠে দরজার কাছে এগিয়ে গেলুম। দরজায় হাত দিতে-না-দিতে সমস্ত ঘরখানা বিদ্যুতের তীব্র আলোয় দপ্‌ করে একবার জ্বলে উঠল। তারপর—বজ্রের সে কি ভয়ানক শব্দ! সে শব্দে বাড়ীখানার ভিত্‌-পর্য্যন্ত যেন টল্‌মল্‌ করে নড়ে উঠল—সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের একটা প্রচণ্ড ঝাপটা দুম্‌দুম্‌ করে জানলাদুটো বন্ধ করে দিলে! কেমন-একটা ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল—আমার পিছনে-পিছনে, আমার সামনে-সামনে, আমার আশে-পাশে—যেদিকে চাই সেইদিকে, যে দিকে যাই সেইদিকে—আকাশে বাতাসে, ঝড়ে বৃষ্টিতে, বিদ্যুতের আলোয় অন্ধকারের ভিতরে—কি-একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক যেন শূন্য-মূর্ত্তিতে ফুটে উঠছে, ওৎ পেতে, প্রকাণ্ড হাঁ করে আমাকে গোগ্রাসে গিলে ফেল্‌তে চেষ্টা করছে;—খানিক হামাগুড়ি দিয়ে, খানিক দেয়াল হাত্‌ড়ে-হাত্‌ড়ে টল্‌তে-টল্‌তে পিছিয়ে এসে আমি বিছানার উপর এলিয়ে ধপাস্‌ করে পড়ে গেলুম।

সত্যিসত্যি মনে হোল, পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে, কে-যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে! সে কি কান্না—সে কি ছটফটানি! থেকে-থেকে আমি আঁৎকে আঁৎকে উঠতে লাগলুম! নিজের দেহকে যতটা পারি গুটিয়ে নিয়ে বিছানার চাদরখানায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে বালিশে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রৈলুম, দু-হাতে প্রাণপণে দু-কান চেপে ধরলুম, তবু সে কান্না থাম্‌ল না—থাম্‌ল না আমি বিকৃতস্বরে চীৎকার করে উঠলুম,—"নির্ম্মল, নির্ম্মল! কেঁদনা—আর কেঁদনা—সত্যি বলছি, তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকৃতে পারব না—আমি ত মরবই—আজ না-হয় দুদিন পরে,—তাই তোমাকে—তাই তোমাকে—"

নাঃ! তবু ত কান্না থামে না—একি সর্ব্বনেশে কান্না গো!

আর সহ্য করতে পারলুম না—ধড়মড় করে উঠে ছুটে গিয়ে জানলা খুলে দিলুম। বাইরে মুখ বাড়াতেই ঝড়ের

অট্টহাস্যে সে-কান্নার শব্দ কোথায় মিলিয়ে গেল—ঝর্‌ঝর্‌ বৃষ্টির স্নিগ্ধ-শীতল জলধারায় আমার উত্তপ্ত শিরে যেন কার শান্ত আশীর্ব্বাদ এসে পড়ল।

সেইভাবে চোখ মুদে দাঁড়িয়ে রইলুম—কতক্ষণ, কে-জানে! যখন চোখ চাইলুম, তখন প্রাতঃসন্ধ্যার কোমল ছায়ালোকে নিদ্রোত্থিত পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কালকের রাতের ঘটনা স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু, সে স্বপ্ন কি কঠোর সত্য!

আমার দেহ রুগ্ন বটে, কিন্তু মনের উত্তেজনায় রোগের কোন লক্ষণ বুঝতে পাচ্ছিলুম না। এককথাই একশোবার মনে হচ্ছিল, নির্ম্মলা কি আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে? সে কি সেই শিশির ওষুধ·····

দু-তিনবার ঘর থেকে বেরুতে গেলুম, —কিন্তু পা উঠল না। কে জানে গিয়ে কি দেখব?······ তাই যদি সত্যিসত্যিই ঘটে থাকে, তবে সে দৃশ্য প্রাণ ধরে দেখতে পারব কি? সেই চিকণ রেশমী চুল,—ঘাড়ের উপর কপালের উপর যা এঁকে-বেঁকে কুঁকড়ে থাকত, সেই দুটি বড়-বড় টানা-টানা চোখ,—আমার চুম্বনে যারা আবেশে কাঁপতে-কাঁপতে পদ্মকোরকের মত মুদে থাকত, সেই দুটি কপোল—আমার স্পর্শে যাতে ধীরে-ধীরে গোলাপের রং ফুটে উঠ্‌ত, —সেই রূপের কুসুম যদি স্বর্গচ্যুত পারিজাতের মত পরিম্লান হয়ে গিয়ে থাকে—আমি কি তবে তা দেখতে পার্‌ব—পাষাণে বুক বেঁধে, শুষ্কনেত্রে, স্থিরভাবে?

কিন্তু, দেখতেই হবে—দেখতেই হবে! আমার এ লক্ষ্মীশূন্য সংসারে আমাকে ত আর বেশীদিন জ্বালা পোহাতে হবে না। আমি আর কতদিন? তবে—ভয় কি?

ঝী-বামুন তখনো আসে-নি, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। আমার বাড়ীখানা যেন প্রেতপুরীর মত ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ হয়ে আছে! সাহসে ভর্‌ করে নির্ম্মলার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

প্রথমেই চোখ পড়ল খাটের উপরকার তাকের দিকে। মালিশের শিশিটা সেখানে নেই!

খুব-জোরে দরজায় ঠেশ-দিয়ে দাঁড়ালুম—নইলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতুম। বুকের ভিতরটা দুপদুপ কর্‌ছিল—সে দুপদুপুনি বন্ধ কর্‌তে দু-হাতে বুকের কাছটা চেপে ধর্‌লুম—কিন্তু সে আওয়াজ থাম্‌ল না।

বিছানার চাদরে মাথা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢেকে, মেঝের উপরে স্থির হয়ে শুয়ে আছে—কে সে?—নির্ম্মলা! তার আর-কিছু দেখতে পেলুম না—কেবল পা-দুটি ছাড়া। ওঃ! এই কি সেই নির্ম্মলার পা? রক্তহীন—কালিমালিপ্ত আড়ষ্ট,—আঙ্গুলগুলো সামনের দিকে বেঁকে-বেঁকে দুম্‌ড়ে পড়েছে!

প্রাণ শিউরে উঠল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলুম।

যা দেখেছি, যথেষ্ট! চাদর খুলে ও মুখ কে দেখবে?—আমি? পারব-না —পারব-না! এত ভয়ানক,—মৃত্যু?—কে জানত!

মেঝের উপরে একখানা কাগজ পড়ে রয়েছে না? হ্যাঁ—নিশ্চয় সেই চিঠি! এ

চিঠি এতক্ষণ প্রাণপণে যে আগ্‌লে ছিল, সে এখন কোথায়? তার প্রেতাত্মা কি ঘরের একপাশে মলিনমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখনো আমার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ কর্‌ছে?

ভয়ে-ভয়ে গুড়ি মেরে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চিঠিখানা তুলে নিলুম। ও কি ও! নির্ম্মলার গায়ের চাদরখানা নড়ে কেন? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, মাথার চুলগুলো যেন মাথার উপব খাড়া হয়ে উঠল! বিস্ফারিত নেত্রে স্পষ্ট দেখলুম, চাদরের একপাশ জোরে জোরে নড়্‌ছে—ভিতর থেকে কি-যেন ঠেলে-ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে!

বিকটস্বরে চীৎকার করে উঠলাম—চাদরের ভিতর থেকে নির্ম্মলার পোষা বেড়ালটা বেরিয়ে এসেই একছুটে পালিয়ে গেল। আঃ—রক্ষা পাই! কিন্তু, তবু আমার ভয় ঘুচল না—বেড়ালটার সঙ্গেসঙ্গে আমিও একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।......

নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ পরে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোল। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, এক গেলাস জল খেলুম। খানিকক্ষণ ঘরের মেঝেতে পাইচারি করলুম। তারপর, সেই চিঠিতে কি আছে, তাই জানবার আগ্রহ হোল।

চিঠিখানা চোখের সামনে ধরলুম। প্রথমেই হাতের লেখা দেখে মন চম্‌কে উঠ্‌ল। এ কি, এ ত পুরুষের লেখা নয়!

"শ্রীচরণেষু,

দিদি, বড় লজ্জায়, মুখ পুড়িয়ে তোমাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি। সংসারে তুমি বৈ এ পোড়ারমুখীর আপন-বল্‌তে আর কে আছে? দিদি, যার কথায় ভুলে ধর্ম্ম ছেড়েছি, কুলে কালি দিয়েছি, সে এখন আমায় পথে বসিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমি এখন খেতে পাচ্ছি না, এ-সময় তুমি যদি কিছু দাও, তবেই প্রাণে বাঁচব। আর কি লিখ্‌ব। উপরে ঠিকানা দিলুম।

অভাগিনী কমলিনী।"

চিঠি পড়ে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম।

কমলিনীর পত্র! নির্ম্মলা তাই আমাকে এ চিঠি দেখায়-নি! তাই সে কাঁদছিল! আর আমি—আর আমি—

এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিলুম, আর পারলুম না। মেঝেতে কপাল ঠুক্‌তে-ঠুক্‌তে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম।

ডাক্তার! এই আমার কথা। আমি যে কি পাষণ্ড, তা কি বুঝতে পারছ? আমার মতন আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক মানুষ তুমি কি আর-কখনো দেখেছ?

কিন্তু সবুর কর, এখনো একটু বাকি আছে। সে ঘটনার পরের কথা আমি তোমাকে কিছুতেই বল্‌তে পারব-না; সুতরাং কি ফল সে বিফল চেষ্টায়? তবে, আমার নিজের কথাই আরো-কিছু বল্‌ব। মাঝখানে বাদ দেওয়াতে যদি কোথাও খাপ্‌ছাড়া বোধ হয়, তবে সেটুকু তুমি নিজেই পূরিয়ে নিও।......

আমি শ্মশানে যাই-নি—যেতে পারি-নি। গাঁয়ের লোকেরাই এসে নির্ম্মলাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। তারা জানলে, নির্ম্মলা ভুল

করে মালিশের ওষুধটা খেয়ে ফেলাতে, এই বিপত্তি ঘটেছে। নির্ম্মলা মরে গিয়েও নাকি *শিশিটা* হাত থেকে ছাড়ে-নি, সেটা তার মুঠোর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। আহা, ছাড়বে কেন,—সেই শিশিই যে তাকে আমার কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে!......

খবর পেয়ে ললিতও এসেছিল। নির্ম্মলার ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এল, সে তখন কাঁদছিল। তার উপর আর আমার রাগ ছিল না। তার কান্নায় আমারও কান্না এল।

আমি কাঁদছি দেখে চোখের জল মুছে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

আমি বল্‌লুম," ললিতবাবু শুনেছি আপনি মস্ত ডাক্তার। একটা কথা রাখবেন কি?"

—"বলুন।"

—"আপনি ঠিক বল্‌বেন--লুকোবেন না?"

—"কি কথা আগে শুনি।"

—"আমার যক্ষ্মা হয়েছে, জানেন ত?"

—"শুনেছি বটে।"

—"হাঁ, আমার যক্ষ্মা হয়েছে। আপনি আমাকে একবার পরীক্ষা করে ঠিক বলুন দেখি, কতশীঘ্র আমি মরব। আপনার পায়ে পড়্‌ছি, কিছু লুকোবেন না। মরণে আমার ভয় নেই।"

ললিত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে, "মাপ করবেন—এতে পায়ে-পড়াপড়ির কি আছে? আপনি যখন জানতে চাইছেন, তখন কিছুই লুকোবো না।"

ললিত খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানারূপে আমাকে পরীক্ষা কর্‌লে। তার-পর বললে, "আমার যতদূর বিদ্যা, তাতে বল্‌তে পারি, আপনার একেবারেই যক্ষ্মারোগ হয়-নি।"

—"অ্যাঁ, ঠিক বলছেন?"

—"হাঁ।"

আমি দুহাতে ললিতের হাত জড়িয়ে ধরে কাতরস্বরে বল্‌লুম, –"বলুন—বলুন, লুকোবেন না। আমার যক্ষ্মা হয়-নি, বলেন কি?"

আমার রকম দেখে ললিত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—"আমি ঠিক বল্‌ছি, কিছুই লুকোই-নি। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন।".........

আমার নির্ম্মল!—আমার নির্ম্মল!—এই আলোয়-ভরা পৃথিবী আমার চোখে একলহমায় আঁধার-ঢাকা হয়ে গেল! দু-চোখ মুদে যেন দেখলুম, সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল একখানি মুখ জেগে উঠ্‌ল—চোখে সেই মধুর লজ্জা, ঠোঁটে সেই মৃদু হাসি, মুখে সেই স্বর্গের শ্রী—সে যে তারই মুখ! চকিতে সে মুখ কোথায় লুকিয়ে গেল,—তারপরেই আবার ও কি জেগে উঠল!—ও যে সেই পা-দুখানা,—সেই আড়ষ্ট, রক্তহীন, আঙ্গুল-দুম্‌ড়ানো পা-দুখানা!

ভয়বিভোর চোখে সেই বিকৃত পা-দুখানা দেখতে দেখতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম......

যখন জ্ঞান হোল—দেখলুম, স্মৃতির শ্মশানে আমি পরিত্যক্ত, উন্মত্ত, জীবন্মৃত!

ডাক্তার! না, আর থাক্—"

* * * * *

এই অপূর্ব্ব পাগলের বিচিত্র কাহিনী-পড়া সাঙ্গ হইল। মনটা কেমন ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া

বলিলাম, "চল, চল, তোমার এ গারদ থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!"

শচীশের সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। ফটকের দিকে যাইতে-যাইতে পথে সেই পাগলের ঘর পড়িল।

সেদিকে তাকাইতেই দেখি, আকাশের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া সেই পাগল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাণ্ডুর মুখে সূর্য্যের কিরণ লাগাতে গালের উঁচু-উঁচু হাড়দুখানা যেন আরও-বেশী বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া পাগল ডাকিল, "ডাক্তার, ডাক্তার!"

শচীশ তার কাছে গেল।

হাতটা বাড়াইয়া দিয়া পাগল কহিল, "হাতটা দেখুন ত একবার!"

শচীশ তার হাত ও বুক পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তাইত, আপনার যে যক্ষ্মা হয়েছে!"

ম্লান হাসি হাসিয়া পাগল বলিল, "আঃ, বাঁচলুম!"

শচীশ আমার কাছে আসিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "যখন ভাল থাকে, তখনো এর এই পাগলামি-টুকু ঘোচে না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নিষ্ফল

মনের মাঝে বীজ বুনেছি
চোখের জলে সরস করি তাই,
আ-গাছা তার ঘুচিয়ে দিতে
দুখের ফলা উজল রাখি, ভাই।
পঙ্গপালের আনাগোনা,
কোন্ কালে যে ফল্‌বে সোনা,
ভালবাসার সার দিয়াছি
একটি কণার ভর্সা তবু নাই।
ষোল-আনার মালিক নহি,
অনেক ধারি মহাজনের ঠাঁই,
জমার চেয়ে খরচ বেশী,
নেইক পুঁজি, দিন আনি দিন খাই।

শূন্য মরাই পাতার কুঁড়ে
প্রলয় ঝড়ে যায় রে উড়ে,
না পাকিতেই সবুজ ফসল
পাগল হয়ে' ক্ষেতের পানে চাই।
হায় রে আমার সাধের ফসল
ডুবিয়ে দিলে মরীচিকার জল,—
আজনমের সোনার স্বপন
বজ্র-শিখায় কর্‌ছে ঝলমল।
কোথায় ছুটি আঁধার রাতে!
প্রলোভনের আলেয়াতে
মণির মত ঝল্‌সে' আঁখি
সারা-জীবন কর্‌লে অ-সফল!

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদিমার শক্তি

শরতের এক নির্জ্জন সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রীতে দাওয়ায় বসে পরামর্শ হচ্ছিল।......

গ্রামের এরা বহুদিনের প্রাচীন বাসিন্দা। বয়সেও তাদের জুড়ি এখন বড়-কেউ নেই। গ্রামের উপর দিয়ে আধিব্যাধির যে-সমস্ত ঝড়ঝাপ্‌টা চলে গেছে, তাতে কত বড়-বড় ঘর, ছেলে-বুড়ো-সমেত, ধূলিসাৎ হয়ে শ্মশান হয়ে গেল; কিন্তু এই ক্ষুদ্র কুটীরের এই দুটি প্রাণী যে কেমন-করে এত-সব ফাঁড়া উৎরে টিঁকে গেছে তা বলা যায় না। এদের যারা দোসর ছিল, বন্ধু ছিল, তারা কেউ এখন নেই;—এখন সব নতুন মানুষ—নতুন চেহারা, নতুন মুখ।

দুজনেই এরা এই গ্রামের। রত্ন-মঞ্জরীর সঙ্গে শ্যামাচরণের যখন বিবাহ হয়—উঃ সে কতদিনের কথা! সেই অবধি রত্ন স্বামীর এই ঘরটিতেই আছে। একে-একে তার বাপ-মা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই চলে গেল;—রইল কেবল সে আর তার স্বামী। আটবছর বয়সে এই ঘরে সে প্রথম এসেছিল; আর তাকে নড়তে হয়নি। এখানকার মাটির প্রত্যেক কণাটির সঙ্গে তার চেনা-পরিচয় হয়ে গেছে। তার চোখের সাম্‌নে কত গাছ বুড়ো হয়ে মরে পড়ল, কত পুকুর শুকিয়ে মাঠ হয়ে গেল, কত ঘর ভেঙে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেল;—তার সব-খবর সে জানে, তার সব-কথা তার বুকের ভিতরে পোরা আছে।

এক একসময় এখন তার পথ-চলতে ধাঁধা লাগে;—হঠাৎ মনে হয়, এ যেন নতুন জায়গা। ঐ শিব-মন্দিরের বাঁকের কাছটা দিয়ে যাবার সময় তার মনে হয় তালপুকুরে একবার পা-টা ধুয়ে নি—কিন্তু কোথায় সেই সারিসারি তালগাছের বন—আর কোথায় তার তলে সেই কালো জলের আরসি! শিব-মন্দিরটা এখনো খাড়া আছে বটে কিন্তু ঘনগাছের ছায়ার অন্ধকারে সেটাকে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড প্রেত আকাশের গায়ে অশথডালের হাত-ছড়িয়ে বুক-চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিয়ের পরদিন তারা বর-কনে এসে এই মন্দিরে ঠাকুরপ্রণামী দিয়ে-ছিল—প্রদক্ষিণ করবার সময় তাদের গাঁঠ-ছড়াটা একটা ত্রিশূলের খোঁচায় আটকে গিয়েছিল—সেকথা এখনো তার মনে আছে; কিন্তু সে ত্রিশূলের আর চিহ্নমাত্র নেই। ঐ-মন্দিরের পাশেই ছিল তার সখীর বাড়ি। দুই সখীতে মিলে কতদিন তারা দুপুরবেলা ঐ তালপুকুরে ঝাঁপাই ছুঁড়েছে, তাই নিয়ে শাশুড়ির কাছে কত বকুনি, কিন্তু তার জন্যে খেলা কখনো বন্ধ যায়নি। সখীর স্বামী যেদিন সখীকে নিয়ে গেল সেদিন দুইসখীতে মিলে কী কান্না! সে সখী আজ কোথায়? এখন কেবল এক একসময় মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ মনে হয় কে যেন ঐ নারকোল গাছটার পিছন থেকে লুকিয়ে হাওয়ার সুরে ডেকে উঠল—"সই-ই!"

মানুষ ত গ্রামে এখনো অনেক—কিন্তু

একলার খেলা

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত

মনের মতন মানুষ আর কৈ! রত্নর কেবলই মনে হয় যারা গেল তাদের মতন ত আর কেউ ফিরে এল না। গ্রামের ছোকরা-দের সঙ্গে মিলে তার স্বামী যে পাঁচালির দল খুলেছিল, তাদের প্রত্যেককে এখনো মনে পড়ে। এই দাওয়ায় বসে সে কী হুল্লা! ভালো খাবার জিনিষটি ঘরে থাকবার যো ছিল না;—গন্ধ পেলেই হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙে, ভাঁড়ার লুঠ করে তারা একাকার করত। স্বামী মুখ-টিপে-টিপে হাসতে থাকত। তাই দেখে তখন ভারি রাগ হত বটে কিন্তু এখন সে-সব কথা মনে করতেও আহ্লাদ হয়। ঘরের দরজা ভেজিয়ে একটু ফাঁক রেখে, সে রোজ সন্ধ্যাবেলা পাঁচালির গান শুনতে বসত। তাদের হাত-মুখ-নাড়া দেখে তার কখনো কখনো হাসি পেত, আবার কখনো-কখনো গানের কথায়, সুরের টানে, তার চোখের পাতা ভিজে আসত। সব-চেয়ে তার খারাপ লাগত ঐ সবাইকে তামাক জোগানো। তার ঘরের দিকে চেয়ে থেকে-থেকে চীৎকার উঠত —"ওগো তামাক!" অমনি তাকে উঠে গিয়ে তামাক সাজতে বসতে হত। তখন মনে হত—বাবা! এত তামাকও খেতে পারে! এম্‌নি করে ঘড়িক-ঘড়িক তামাক সেজে তার হাত হেজে যাবার যো হয়েছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে, তামাকের ধোঁয়ায়, গানের সুরে, বাজনার ঝমাঝমে, ঘরের বাতাস এমনি ঘুলিয়ে উঠত যেন চোখে নেশা লাগত। তারপর এক একদিন পাঁচালি গাইতে তার স্বামী যখন তাকে একলাটি ফেলে চলে যেত, তার এমনি রাগ হত যে সে মনে-মনে বলত, এই যে ঘরে খিল দিলুম—কিছুতেই আর খুলচি না।

এখন আর গ্রামে পাঁচালির দল নেই;—ভিন্ গাঁ থেকে মাঝেমাঝে যাত্রার দল, পাঁচালির দল আসে বটে, কিন্তু তেমনতর আর জমে না। চন্দ্রকান্ত কি নিধের মতন গাইতে পারে তেমন লোক কৈ!

আর সেই ভুঁড়িদার দাদামশাই গিয়ে অবধি ত গ্রামের হাসি চলে গেছে। তাঁর চেহারা দেখেই হাসি চাপা শক্ত, তার উপরে তিনি যখন নাতনী, নাত-বউদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গা-দুলিয়ে-দুলিয়ে কথা বল্‌তেন তখন গাঁয়ের বউ-ঝিরা মাটিতে লুটোপুটি খেত। এখনকার ছেলেমেয়েরা হাসে বটে কিন্তু কেন যে হাসে রত্ন তা বুঝতেই পারেনা! সে বলে—ওমা, ও কি হাসি! আমাদের হাসিতে তিনদিন বুকে ব্যথা থাকত।

আর-একজন ছিলেন, তিনি রায়মশায়। তাঁকে দেখলে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপত। পায়ে খড়ম, খালি গা, থান ধুতি, সাদা ধব্‌ধবে পৈতে গলায় তিনি যখন বেড়াতেন তখন তাঁর সামনে যাবার কারো সাহস হত না। তাঁর চোখের দিকে চায় কার সাধ্যি! সে কট্‌মটে চাহনিতে ছোটো ছেলেরা আঁতকে কেঁদে উঠত। রাগ ছিল তাঁর দুর্ব্বাসার মতন। শাপমন্যির ভয়ে কেউ তাঁকে চটাত না। তিনি খট্‌খট্-শব্দে সামনে দিয়ে চলে যেতেন, সবাই তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত—তিনি হাত-তুলে আশীর্ব্বাদ করতে থাকতেন। গাঁয়ের ছেলেগুলো এখন আর কাউকে ভয় করেনা—সব যেন

ধিঙ্গী! আর ভয়ই বা করবে কাকে? রায়মশায়ের মতন তেজস্বী লোক কোথায়!

এখনকার ছেলে-মেয়েরা কি-ছাই আমোদ-আহ্লাদই করতে জানে! তাদের কালে গ্রামে বিয়ে-থার সময়, পালপার্ব্বণে যে হৈ-হৈ রৈ-রৈ চলত, লোকে বুঝত যে হাঁ, একটা-কিছু হচ্ছে বটে! এখন সব ফুস্‌ফাস করে কোথা-দিয়ে কখন্ যে কি হয়ে যায় কেউ টেরও পায়না। এসব বিষয়ে কোনো কথা বলতে গেলে লোকে বলে—"দিদিমা, ও-সব তোমাদের সেকেলে!"

সে দিন পাড়ার এক বাসর-ঘরে রত্ন ঢুকতেই সকলকার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। রত্ন বল্লে—"ওমা তোরা সব বাসর-ঘরে মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন লো? আমোদ-আহ্লাদ কর্‌না!" সবাই চুপ—কেবল হরিদাসী বলে উঠল—"দিদিমা তুমি থাকলে আমাদের আমোদ হবেনা।" রত্ন থতমত খেয়ে বেরিয়ে এল। আর-একদিন পাড়ার মেয়েরা সব শিবতলার মেলা দেখতে যাচ্ছিল; দিদিমাকে দেখে তাদের মধ্যে কানাকানি চলতে লাগল, শেষে একজন বল্লে—"দিদিমা তুমি একটু এগোও না বাছা!"

এমনিতর প্রায়ই হয়। কেউ তাকে চায় না। সে যা বলে, যা করে, কারুর তা আর মনের মতন হয় না। রত্ন বলে, তাকে নইলে আগে গ্রামের কোনো কাজই হত না। কিন্তু এখন হল কি?—কোথাও তার ডাকই পড়েনা। লোকে কেবল বলে—দিদিমা তুমি পরকালের চিন্তায় মন দাও—দিন যে হয়ে এল।

তা ঠিক বটে!......

আজ ক-দিন থেকে শক্তির জন্যে রত্নর বড় মন-কেমন করচে। শক্তি তার নাতনী। এই মেয়েটিকে এক-মাসেরটি রেখে তার মা মারা যায়; সেই থেকে সে এই দাদা-দিদির কাছেই মানুষ। বারোবচ্ছর ধরে এই নাতনীটিকে রত্ন কোলেপিঠে করে বেড়িয়েছে; আজ তিনবছর হল তার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু নিশ্চিন্ত কি ঠিক হতে পেরেছে? তার ভাবনা ত এখনো মনে লেগেই আছে। উঠতে-বসতে তারই কথা কেবল মনে পড়ে। কেবলই মনে হয়—আজ শক্তি থাকলে গাছের এই আমটি খেত, এই ফুলটি নিত; পুকুরের মাছ এতগুলো নষ্ট হল—খাবার লোক কৈ? ইত্যাদি ইত্যাদি। গাঁয়ের মধ্যে কোথাও উৎসবের বাজনা বেজে উঠলে রত্নর মন-কেমন করে ওঠে—আহা, শক্তি আজ নেই, থাকলে সে কত আমোদ করত। প্রতিবছর পূজোর সময় তাকে একবার আনবার ইচ্ছে হয় কিন্তু এ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি। এই তিন বচ্ছরের মধ্যে সে একটিবারও আসেনি। রত্নর এবার কেবল মনে হচ্ছে—কবে মরে যাব ঠিক নেই, একবার শক্তিকে দেখে নিই। তাই সে রোজ স্বামীকে বলচে, ওগো শক্তিকে একবার আনো। আজও সেই কথাই হচ্ছিল।

শ্যামাচরণ কিন্তু ঘাড় নাড়ছিল বলছিল, শক্তি শ্বশুরবাড়ি আছে—বেশ আছে। এই বুড়োবুড়ির কাছে কি তার মন টি৺কবে?

এই পূজোর সময় সেখানে তার কত আমোদ !

রত্নর সে-কথা মনে লাগছিল না ; সে বলছিল, ওগো তা নয়, শক্তি আমার তেমন নয়।

পরামর্শ করে ঠিক হল শক্তিকে একখানা চিঠি পাঠানো যাক্। কিন্তু চিঠি কে লেখে ? শ্যামাচরণ একটু-আধটু লিখতে জানে বটে কিন্তু এখন তার কলম ধরবার শক্তি নেই ;— হাত এত কাঁপে যে লিখতে গেলে কেবল হিজিবিজি হয়। হরিদাসীর ভাই হরিচরণ ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে পড়ে, সে বাংলা খুব ভালো লিখতে পারে বলে গ্রামের মধ্যে তার ভারি সুখ্যাতি। তাকে ধরে-করে আনলে হয় না ? রত্ন বল্লে, কাল সকালেই তাকে ধরে আনছি।

বেশী সাধ্য-সাধনা করতে হল না— হরিদাস অল্পেই রাজী হল। গ্রামের সবাই যে তাকে চিঠি-লিখতে ডাকে এতে মনের মধ্যে তার ভারি গর্ব্ব ছিল। নিজের দাম বাড়াবার জন্যে প্রথমটা সে একটু-আধটু আপত্তি দেখাত বটে কিন্তু তার জোর বেশীক্ষণ থাকত না।

পরের দিন সকালে হরিদাস নিজেই কাগজ, কলম, কালি নিয়ে হাজির হল। বল্লে—"দিদিমা কি লিখতে হবে বল ?"

রত্নর কত কথাই মনে পড়তে লাগল ;—সে একরাশ কথা। সমস্ত কথাগুলো তার মাথার মধ্যে একসঙ্গে ঘুরপাক খেতে লাগল। শক্তিকে এতদিন না দেখে তার মনটা যে কি হচ্ছে, সে যে কি ;—কি-কথা বল্লে সেটা বলা হয়, সে তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না ;—কতকগুলো ভাবের আবছায়া কেবল তার মনের মধ্যে পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠতে লাগল।

দেরী দেখে হরিদাস বলে উঠল—"কি লিখতে হবে চট করে বল দিদিমা।"

রত্ন থতমত খেয়ে বলে উঠল—"এই পূজো আসছে—"

হরিদাস বল্লে,—"ওঃ !"

এই বলে, আর-কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে, সে ঘাড় গুঁজে লেখা সুরু করলে। খস্‌খস্-শব্দে কলম চলতে লাগল। যখন একপাতা ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, সে কলম থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে - "দিদিমা, আর কি লিখব ?"

দিদিমা এতক্ষণ যেন শক্তির স্বপ্নে ভোর হয়ে ছিল। সে শক্তিকে কি-কি বলবে তাই মনে-মনে তোলাপাড়া করছিল, —কত কথাই মনে উঠছিল। সুখময়ীর বিয়ে হয়ে গেছে, মুখুয্যেদের বাড়ির শ্রাদ্ধে এবার ভারি ধূম হয়েছে, বড় কাঁঠাল গাছটা ঝড়ে পড়ে গেছে—এমনিতর কত খবর শক্তিকে দেবার আছে। সে মনে মনে সব গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, এমন-সময় হরিদাসের ডাকে তার চমক ভাঙল।

সে বল্লে—"কি লিখলে ভাই, শুনি।"

হরিদাস চীৎকার করে পড়তে লাগল—

"শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা সমাগতা। শরতের নভোমণ্ডল স্বর্ণমণ্ডিত আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বলশ্রী ধারণ করিয়াছে। খণ্ড খণ্ড তুষারশুভ্র জলদজালে অখণ্ড নীলিমা স্থানে স্থানে বিযুক্ত ;

—তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যেন অসংখ্য বিশালকায় মরকতমণিবিচ্ছুরিত দ্যুতিতে ব্যোমমণ্ডল উদ্ভাসিত। গৃহে গৃহে দিগ্দিকে আনন্দ সঙ্গীত প্রবহমান। কলভাষী পক্ষি কণ্ঠের অবিরাম সুরলহরী ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হইয়া গিরিতনয়ার পাদপ্রান্তে শুভআগমনীর আবেদন জ্ঞাপন করিতেছে। মায়াপ্রপঞ্চ-নাশিনী মহামায়ার অভ্যর্থনাব্যপদেশে প্রকৃতি সুন্দরী নবনবসাজে সুসজ্জিতা হইবার অভিলাষে পুরাতন জীর্ণ বেশ স্খলিত করিয়া সে সমুদায় দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন।"—

বৃদ্ধা একমনে চিঠি পড়া শুনতে লাগল। একটির পর একটি করে কথা যতই অগ্রসর হতে লাগল, তার চোখ ততই বড় হয়ে উঠতে লাগল। দুই লাইন শোনবার পর হরিদাসের কণ্ঠস্বর তার কানে আর পৌঁছল না। তার মনে হতে লাগল—শক্তির সেই ছেলেবেলার ময়না পাখীটা এখনো বেঁচে আছে, সে কথাটা তাকে জানানো দরকার। পাখীটাকে সে বড় ভালোবাসত, তার কথা শুনলে সে নিশ্চয় খুসী হবে। আহা, সেটাকে সে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে কত কান্নাকাটি করলে—নাতজামাই কিছুতেই নিতে দিলে না গা! বল্লে, কে বয়ে নিয়ে যাবে? শক্তি বলেছিল, সে নিজে হাতে-করে ধরে নিয়ে যাবে; কিন্তু তার পাল্কীতে এত জিনিষ যে জায়গা হল না; কর্ত্তা পাল্কীর মাথায় সেটা বেঁধে দিতে চাইলে, কিন্তু নাতজামাই বল্লে, রেলে পাখীর ভাড়া দিতে হবে। শক্তি আমার কানে-কানে বল্লে—দিদিমা বল, আমার কাছে আশীর্ব্বাদী টাকা আছে, আমি তাই থেকে ভাড়া দেব। আমার কিন্তু নাতজামাইকে সে-কথা বলতে সাহস হল না। আহা, যতক্ষণ দেখা গেল, বেচারা পাল্কীতে মুখ-শুকিয়ে বসে একদৃষ্টিতে খাঁচার পানে চেয়ে রইল।—

হরিদাস বল্লে—"দিদিমা লেখা কেমন হয়েছে?"

দিদিমা চম্‌কে উঠে বল্লে—"বেশ হয়েছে দাদা।"

হরিদাস ফূর্ত্তির সঙ্গে বল্লে—"দিদিমা, আর কি লিখতে হবে?"

দিদিমার মনের মধ্যে আবার একরাশ কথা তোলপাড় করে গেল।

হরিদাস বল্লে—"দিদিমা অমন চুপ করে থাকলে চলবে কেন? একটা-কিছু বল; আমি সব গুছিয়ে ঠিক-করে লিখে দিচ্ছি।"

দিদিমা বল্লে—"লেখ—তোমার জন্যে বড় মন কেমন করছে।"

হরিদাস লিখতে গিয়ে থেমে পড়ল। উপর-দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে—"মন কেমন! মন কেমন! মন কিরূপ! মন কীদৃশ!" বলতে বলতে বলে উঠল-"দিদিমা অন্য কথা বল, ও কথা ঠিক চিঠিতে লেখা যায় না।"

দিদিমা অবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

তারপর, অস্থির হয়ে বলে উঠল—"এই বল যে, কতদিন দেখা হয়নি, তাই মন-কেমন করছে—কবে মরে যাবো ঠিক নেই—একবার তাকে দেখবো।"

হরিদাস একটু মাথা-চুলকে নিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বল্লে—"আচ্ছা লিখে দিচ্ছি।" বলে সে প্রত্যেক কথাটি উচ্চারণ করে-করে লিখতে লাগল—"কতকাল

কালের করালকবলে পরিত্যাগ করিল। ইতোমধ্যে তোমার দর্শনলাভ সংঘটিত হয় নাই। সেই কারণে আমার অন্তঃকরণ কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া আছে। অতএব অবিলম্বে অত্র আগমনকরতঃ মদীয় মনঃপ্রাণ সুশীতল করিবে। যেহেতু জীবন্ ক্ষণবিধ্বংসী—মহাকালের ভৈরববদনব্যাদান চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত—কোন্ মুহূর্ত্তে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে তাহার কোন স্থৈর্য্য নাই।"

হরিদাস বল্লে—"দিদিমা এইবার চিঠি মুড়ে ফেলি?"

দিদিমা ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"এরই মধ্যে?"

—"আর জায়গা কই? দু-পিঠ যে ভর্ত্তি হয়ে গেল।"

দিদিমা কাতর কণ্ঠে বলে উঠল—"আর জায়গা নেই?"

—"না!"

দিদিমার সমস্ত হৃদয়টা মথিত হয়ে উঠে আর্ত্তনাদ করতে লাগল।—আর জায়গা নেই? এখনো যে কিছুই বলা হয়নি! পাখীর কথা না হয় থাক—নাতজামাই রাগ করতে পারে; কিন্তু তার নিজের হাতে পোঁতা করবী-গাছে যে ফুল ধরেছে, সে খবরটা তো দেওয়া চাই—আরো—।

হরিদাস বল্লে—"দিদিমা ঠিকানা কি?"

দিদিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"রোসো দাদা!"

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল শক্তির তো কোনো খবর জিজ্ঞাসা করা হয় নি! সে কেমন আছে? তার মন-কেমন করচে কি না? নাতজামাইয়ের সোহাগ, শাশুড়ীর আদরযত্নে সে কি এই বুড়োবুড়িকে ভুলে গেল? নাতনী-নাতজামাইকে একটা ঠাট্টা করবারও প্রলোভন হচ্ছিল। কিন্তু জায়গা কৈ! সে ফুক্‌রে বলে উঠল—"লক্ষ্মীটি ভাই, আমার দিদির খবরটা একবার জিজ্ঞেস কর—সবাই কেমন আছে?—"

হরিদাস চিঠি ভাঁজ করে ফেলেছিল; আবার খুলে এক-কোণে ছোট ছোট অক্ষরে ঘেঁসাঘেঁসি করে লিখতে লাগল—"তত্রত্য সার্ব্বজনীন কুশল লিপিসহযোগে প্রেরণ করতঃ মানসিক উদ্বেগ দূরীভূত করিবে।"

হরিদাস চিঠিখানা মুড়ে খামের মধ্যে পুরে ফেলে বল্লে—"এইবার ঠিকানা দাও!"

—"ঐ যাঃ আশীর্ব্বাদ করা হল না যে!"

সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্, স্বামী-সোহাগে চিরদিন সোহাগিনী থাকো, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীর মতন হও—এই সব কথা দিদিমার মুখের গোড়ায় ঠেলে ঠেলে আসতে লাগল। সে কাকুতি-মিনতি করে বল্লে—"লক্ষ্মী দাদা আমার, আর একটা কথা—আশীর্ব্বাদ—

হরিদাস বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—"দিদিমা আর পারি না।" বলে সে সবশেষে ছোট্ট করে লিখলে—"আশীর্ব্বাদমস্তু।"

"আশীর্ব্বাদমস্তু!"—দিদিমার মন ভরল না। আশীর্ব্বাদের এই বীজ মন্ত্রটি তার কানে ভারি ফাঁকা শোনাতে লাগল;—অন্ততঃ সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক—এটুকু না বল্লে কি হল! এতে যে অকল্যাণ হবে! সে শিউরে উঠে ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে-করতে মনেমনে বারবার বলতে লাগল—"অক্ষয় হোক্, অক্ষয় হোক্!"

হরিদাস আবার ঠিকানা চাইলে। দিদিমা বল্লে—"চিঠিখানা একবার তোর দাদামশায়কে শোনাবি না?"

হরিদাস উৎফুল্ল হয়ে বল্লে-"শোনাব বৈ কি!"

শ্যামাচরণের সামনে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়া হল। শুনতে শুনতে দিদিমার কেবলই মনে হতে লাগল—এ সব যেন কি রকম কথা! মনের তৃপ্তি এতটুকু হল না। কিন্তু উপায় কি?

পড়া শেষ হলে দিদিমা জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁগো, কেমন হয়েছে?"

শ্যামাচরণ প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেল, তার পর হরিদাসের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"ছোকরা লিখতে শিখেছে বেশ!"

তখন দিদিমার মন যেন একটু আশ্বস্ত হল; মনে হতে লাগল, আমরা হলুম সেকেলে মুখ্যু মানুষ, এরা সব বিদ্বান; নাতজামাই হয়ত এইরকম চিঠিই বুঝবে ভালো!

(২)

শক্তি এসেছে—কিন্তু চিঠির জোরে নয়, দাদামশায় বুড়োমানুষ আনতে গিয়েছিলেন বলেই তার আসা হয়েছে। রত্নমঞ্জরীর এবার এমন তাড়া যে শ্যামাচরণ না-গিয়ে পারে নি।

শক্তি বাড়ি ঢুকেই দিদিমাকে দেখে বল্লে—"আচ্ছা-মানুষ দিদিমা তুমি! বাড়িতে পূজো ছেড়ে চলে এলুম। সমস্ত পথটা বুক ঢিপ-ঢিপ করছে—দাদামশায় বল্লেন, মরবার আগে তুমি দেখতে চাও, আমি ভাবলুম না-জানি কি হয়েছে! তুমি তো দিব্যি ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্চ!"

দিদিমা বল্লে—"ওলো শুধু কি ঘুরে বেড়াচ্চি? এখনও এমন শক্তি আছে যে নাত-জামাইকেও ঘুরিয়ে দিতে পারি।"

শক্তি বল্লে—"ঠাট্টা রাখো দিদিমা। কেমন আছ?"

দিদিমা বল্লে—"আছি ভালো; বোস।"

শক্তি দাওয়ার উপর মাদুরে বসতে গেল; দিদিমা বল্লে—"ওরে ওখানে কেন?—এই আমার কোলে এসে বোস না!"

শক্তি হেসে বল্লে—"দিদিমা তুমি যেন কী! বুড়িধাড়ি কোলে বসব কি!"

দিদিমা বল্লে—"ওমা! তুই আবার বুড়ি হলি কবে লো! এই সেদিন শ্বশুর-বাড়ি যাবার সময় আমার কোলে বসে গলা-ধরে কেঁদে গেছিস! আয় না, অনেক দিন পরে এসেছিস, একবার কোলে করি। কতদিন তোকে কোলে করি নি।"

শক্তি বল্লে—"না বাপু, সে আমি পারব না।"

শক্তি কিছুতেই কোলে গেল না।

দিদিমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল শক্তিকে কোলে নিয়ে একবার খুব-কসে আদর করে নেয়। শক্তি এল না বলে তার বুকটা ভারি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল।

শক্তি একটুখানি বসেই বল্লে—"দিদিমা একবার সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

দিদিমা বল্লে—"এই এলি, একটু বোস্, দুটো কথা কই!"

শক্তি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"কথা হবে এখন দিদিমা—একবার দেখে আসি।"

দিদিমা বল্লে—"আহা তা যা! মন-কেমন করছে বুঝি?"

শক্তি চলে গেল।

দিদিমা শক্তির জন্যে রাঁধতে বসল। যে-জিনিষগুলি শক্তি ভালোবাসে আজ কদিন থেকে দিদিমা সেগুলি জোগাড় করে রেখেছে। রাঁধতে রাঁধতে দিদিমার মনে পড়তে লাগল—শক্তি শ্বশুরবাড়ি যাবার দিন তেঁতুলের অম্বল খেয়ে বলেছিল—চমৎকার হয়েছে দিদিমা! আজ সেই-রকম করে অম্বল রাঁধতে হবে। কৈ-মাছ শক্তি বড় ভালোবাসে, কদিন ধ'রে অনেক চেষ্টা করে একটাও পাওয়া যায় নি—সেই জন্য মনটা ভার হয়ে ছিল; আজ সকালে হঠাৎ দুটো পেয়ে দিদিমার মুখে হাসি ফুটেছে।

একটি-একটি-করে দিদিমা কত তরকারি রান্না শেষ করলে। শক্তি তখনো ফিরে এল না। খাবার ঠাঁই পেতে, সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিদিমা বসে রইল। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বলে মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। এই-আসে এই-আসে করে-করে হেঁসেল ছেড়ে উঠতেও পারছিল না। অনেক দিন পরে এসেছে, আহা একটু আমোদ করে নিক—এই ভেবে মনে-মনে রাগ করতেও পারছিল না।

অনেকক্ষণ কাটিয়ে শক্তি যখন এল, দিদিমা বল্লে—"নে চট্ করে খেতে বোস—অনেক দেরী হয়ে গেছে!"

শক্তি বল্লে—"দিদিমা আমি খেয়ে এসেছি।"

—"সে কি রে!"

—"হ্যা দিদিমা, সই কিছুতে ছাড়লে না—বল্লে, এত বেলা হ'ল, না-খাইয়ে ছাড়চি না।"

—"আমি যে তোর জন্যে রেঁধে-বেড়ে বসে আছি।"

—"কি করব দিদিমা! সইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বসে কতদিন খাইনি। তারপর, হরিদাসী এসেছিল, সুখময়ী ছিল—সবাই বেশ একসঙ্গে বসে খাওয়া হ'ল। এখানে তো একলাটি বসতে হত।"

নাতনী অনেকদিন পরে দুদিনের জন্যে এসেছে—কিছু বল্লে পাছে মনে দুঃখ করে এই ভেবে দিদিমা আর-কিছু না বলে হেঁসেল তুলে ফেল্লে। সেই সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত আগুনের তাতে বসে গা-কেমন করছে বলে নিজে কিছু মুখে তুল্লে না।

সে দিন ষষ্ঠী। বিকেল-বেলা দিদিমা পেটরা থেকে তার লাল বেনারসী সাড়িখানি বার করলে। এখানি দিদিমা বেশী পরেনি—খুব যত্ন করে রেখেছিল, এখনো বেশ ঝকঝকে আছে। সেখানি হাতে করে নিয়ে শক্তিকে বল্লে—"দেখ্ তুই বড় হলে তোকে দেব বলে এখানি রেখেছিলুম। আজ ষষ্ঠীর দিন এইখানা পর।"

শক্তি সাড়ির দিকে চেয়ে বল্লে—"ওমা, ও-সাড়ি আমি পরব না।"

দিদিমার মনের বিশ্বাস এই-রকম সাড়ি আর-একখানা খুঁজে পাওয়া শক্ত—আজ কালকার বাজারে এমন সাড়ি পাওয়া যায় না; ঢের সাড়ি তো সে চোখে দেখে

কিন্তু এমন-একখানি কৈ! এই সাড়িখানি পেয়ে তার মনে যে কী আনন্দ হয়েছিল তা এখনও সে ভুলতে পারে নি। এই সাড়ী নিয়ে সে কতবার কত স্বপ্নই দেখেছে। একবার পূজোর সময় যেন মুখুয্যেদের বাড়ি সে প্রতিমা দর্শন করতে গেছে— গিয়ে দেখে সেই প্রতিমা তার সাড়িখানি চুরি করে পরে বসে আছে! সে ছুটে গিয়ে যেমন সাড়িখানা হাত দিয়ে ধরতে যাবে অমনি দুর্গার হাতের বর্ষা অসুরের বুক-থেকে উঠে তার বুকের উপর খোঁচা মারতে এল।

এমন-একখানা সাড়ি শক্তি পরতে চায় না শুনে দিদিমা অবাক হয়ে গেল, বল্লে—"পরবিনে কেন?"

শক্তি বল্লে—"ও-সাড়ি পরলে লোকে হাসবে দিদিমা!—উঃ যে টক্‌টকে লাল! যে বড়-বড় কল্‌কা আর বড়-বড় ফুল!"

দিদিমা বল্লে—"ওমা, এ বুঝি তোদের পছন্দ নয়?"

শক্তি বল্লে—"ও যে বড্ড সেকেলে দিদিমা!"

দিদিমা সাড়িখানি আস্তে আস্তে তুলে রাখলে। শক্তি সেদিন বাসন্তী রঙের যে একরঙা সাড়িখানি পরলে তাতে দিদিমার মন উঠল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল শক্তির অমন ঢলে-ঢলে চেহারা— জরির সাড়িখানি পরলে কেমন দেখাত বল-দিকিন—ঠিক যেন দুর্গাঠাকরুণটি। বাসন্তী রং তার চোখে সেদিন বিঁধতে লাগল।

শক্তিকে ধরে দিদিমা সে-দিন অনেকক্ষণ বসে এঁটে-সেঁটে চুল বেঁধে দিলে। শক্তি সে চুল-বাঁধা খুলে ফেলে আলগা খোঁপা বেঁধে এল।

দিদিমা বল্লে—"ওকি হ'ল চুলের ছিরি!"

শক্তি বল্লে—"তুমি যে কপাল বার-করে দিলে—দেখে হাসি পায়!"

দিদিমা বল্লে—"ওমা সে কি লো! বড় কপাল তো ভাগ্যিমানীর লক্ষণ!" বলতে বলতে দিদিমা চুপ করে গেল, পাছে ঐ-কথার জের টানলে আজ ষষ্ঠীর দিন কোনো অলক্ষণে কথা বেরিয়ে পড়ে!

অষ্টমীর দিন ভোরে মুখুয্যেদের বাড়ি যাত্রা। কত-বছর ধরে এই ভোরবেলা দিদিমা শক্তিকে নিয়ে যাত্রা শুনতে গেছে। যে-ক'বছর শক্তি ছিলনা সে-ক'বছর যাত্রা শুনতে যেতে দিদিমার তেমন উৎসাহ হ'ত না;—না-গেলে নয়, তাই যেতে হত। এবার আগের দিন বৈকালে শক্তিকে দিদিমা বল্লে—"শক্তি, কাল যাত্রা শুনতে অন্ধকারে যেন একলা যাস্‌নি—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।"

শক্তি বল্লে—"দিদিমা, আমি যে আজ সইয়ের কাছে থাকব—আজ রাত্রে সেখানে তাসখেলা হবে, তারপর ভোরবেলা পাড়ার সব মেয়ে সেখানে জড়ো হয়ে যাত্রা শুনতে যাবো।"

দিদিমা চুপ।

সেদিন সকালে অনেকখানি বেলা পর্য্যন্ত দিদিমা বিছানা থেকে উঠতে পারলে না। শ্যামাচরণ বল্লে—"কি হল গো, যাত্রা শুনতে গেলেনা?" দিদিমা কোনো উত্তর করলে

শিউলি-তলায়

শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত

না। শ্যামাচরণ আবার বল্লে—"শক্তিকে নিয়ে যাবে না?" তারপর এদিক-ওদিক দেখে এসে বল্লে—"শক্তি চলে গেছে বুঝি!"

আজ এই প্রথম দিদিমার যাত্রা-শোনা বন্ধ গেল।

শক্তির মেয়াদ ছিল খুব অল্প দিনের। দেখতে দেখতে হট্টগোলের ভিতর দিয়ে সেই দিনকয়টি কেটে গেল। দিদিমার কত কথা বলবার ছিল—কত ঠাট্টা ছিল, কত আদর ছিল; সে-সব কিছুই হল না। শক্তি এসে তার বুকের মধ্যে কোথাও জমে বসল না—ফাঁকায়-ফাঁকায় আল্‌গায়-আল্‌গায় যেন উড়ে-উড়ে গেল। দিদিমার কেবলই মনে হতে লাগল—শক্তিকে নিয়ে এই পৃথিবী যেন বুকের কাছ থেকে অনেকদূরে সরে গেছে। আর তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে চেপে-ধরবার যো নেই।

শক্তি আজ যাবে, তাই তার জন্যে দিদিমা একগাছা শিউলি ফুলের মালা গাঁথছিল। এক একবার মনটা আঁৎকে উঠছিল—যদি শক্তি মালাগাছটা না নেয়। সেইজন্যে মধ্যে মধ্যে মালা গাঁথার উৎসাহ কমে যাচ্ছিল কিন্তু তবুও হাত চলছিল। এম্‌নি করে মালা শেষ হ'ল। নাতজামাইকে একটা ঠাট্টার জিনিষ পাঠাবার মতলব মনে-মনে ছিল কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না।

শক্তি সইয়ের কাছে বিদায় নিতে গেছে। দিদিমা একলাটি জিনিষপত্র সব ঠিক-করে গুছিয়ে রাখচে—এইতেই তার সমস্ত দুপুরটা কেটে গেল। বিকেলবেলা শক্তি এসে ভালো কাপড় পরে দাঁড়াল, বল্লে—"দিদিমা আসি!"

দিদিমা শিউলি ফুলের মালাগাছটি হাতে নিয়ে বল্লে—"এগিয়ে আয় দিদি, এই মালাটা পরিয়ে দিই।"

শক্তি বল্লে—"ঐ-দেখ দিদিমা, মালা বলতে মনে পড়ল। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। আমার শাশুড়ি বৃন্দাবন থেকে হরিনামের মালা এনেছিল, তোমার জন্যে এক-ছড়া দিয়েছে।" এই বলে সে তার গোছানো পেঁটরাটা ঘেঁটে-ঘুঁটে এক-ছড়া শুক্‌নো কাঠের মালা বার করলে। দিদিমা সেই টাট্‌কা ফুলের গন্ধভরা মালাটি শক্তির গলায় পরিয়ে দিয়ে, সেই শুক্‌নো মালাটি হাতে করে নিলে। তার একটা কঠিন খট্‌-খটে আওয়াজ বিদায়বেলাকার আর্দ্র কথার মাঝে-মাঝে বেসুরে বেজে উঠতে লাগল।

শক্তি দাদা-দিদিকে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে। যখন সে মুখ-তুলে উঠে দাঁড়াল তখন তার দুই চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল!

দিদিমা কাপড় দিয়ে নিজের চোখ-মুছে বল্লে—"আবার আসিস্ দিদি!"

শক্তি শুধু ঘাড়টি কাত করলে—মুখ-থেকে কোনো কথা বেরুল না।

পাল্কি চলে গেল।

দিদিমা ঘরে ফিরে এসে দাওয়ার উপর বসে পড়ল। আর-সমস্ত মুছে গিয়ে তার চোখের সামনে জাগতে লাগল—শক্তির চোখের সেই দুফোঁটা টলটলে জল! মনে হতে লাগল, ঐ দুটিমাত্র ফোঁটা যেন অন্তরের সমস্ত শুষ্কতাকে আবার সরস স্নিগ্ধ করে দিয়ে গেল!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

জাফরানিস্থান

যে দেশেতে চড়ুই-পাখীর চাইতে প্রচুর বুল্‌বুলি,
যেথায় করে কাকলি কাক নীরস নিজের বোল্‌ ভুলি',
বারোমাসেই সরস ঘাসে সবুজ যেথা ঘরের চাল,
চালে চালে ফুলের ফসল চুম্‌কী-চমক নিত্যকাল,
ভূর্জ্জপাতার ঠোঙায় যেথা আঙুর বেচে সুন্দরী,
হাজার হাজার হৈমবতী বেড়ায় যেথা রূপ ধরি',
পথে ঘাটে রূপ-শতদল পাপ্‌ড়ি যেথা ছড়িয়েছে,
গিরিরাজের বুকের পাঁজর আলোক-লতায় জড়িয়েছে,
কোমল-কঠিন মিল্‌ছে যেথায় আঙুরে আর আখরোটে,
ভুঁই-চাঁপারি সই-স্যাঙাতি জাফরানে নীল ফুল ফোটে,
শৈল-শ্লেটে অলখ্‌ আঙুল যেথায় দাগা বুলিয়ে যায়,
বলাকা-বকফুলের মালা বিনি-সূতায় ছুলিয়ে যায়,
পাহাড়-কোলের ফাঁকগুলি সব যেথায় তরল সুর ভরা—
দিকে দিকে নূপুর পায়ে নাম্‌ছে ঝোরা শ্রগ্ধরা,
হাওয়া যেথা মেওয়ার সামিল, মেওয়া সে অফুরন্ত,
এক্‌লা ঝিলম্‌ একশো যেথা, শান্ত এবং দুরন্ত!
যেথায় লুকায়—মন্ত্রে যেন—ক্লান্তি যত কায়-মনের,
চিড়্‌-খাওয়া হাড় হয় সে তাজা বাতাস লেগে চীড়-বনের,
বনে ফোটে বনপ্‌ষা ফুল, পদ্ম ফোটে পল্বলে,
ধূপের গন্ধে আমোদ করে ধূপী-বনের জঙ্গলে,
ফল্‌সা চেয়ে আঙুর সুলভ, ফুলের জল্‌সা রোজ দিনই,
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলাব ফোটে, ফোটে গুলেল্‌ য়োস্‌মিনী।
লাখে লাখে ম্যজারমণ্ডি গিলাস্‌-ফুলের খাস্‌-গেলাস্‌,
সোষম্‌ ফুলের নীল সুষমায় আকুল যেথা হয় আকাশ,
মর্ত্ত্যে যাহার নাই তুলনা, তাই যারে কয় ভূস্বর্গ,
মুগ্ধ ওরে! দু-হাত ভ'রে দে তুই তারে দে অর্ঘ্য।

* * *

গোগর ঝাউয়ের গোকর্ণ-ছাঁদ শাখায় তুষার সরতেছে,
শালের পশম ঝল্‌মলিয়ে ছাগলগুলি চরতেছে,

শিস্ দিয়ে যায় রাখাল-ছেলে গুজ্জর এবং গক্করে,
লাফিয়ে হঠাৎ হাস্‌তে থাকে উছট্ খেয়ে টক্করে,
ধান চলেছে চাল চ'লেছে পশমী মোটা বস্তাতে,
মোদো হ'য়ে উঠ্‌ছে মেতে আপেল-পেয়ার রাস্তাতে,
কল্কা-ছাঁদে নক্সা এঁকে চলছে বেঁকে ঝিলম্ গো,
ফুস্‌ছে ফেনায় সাপবাজী তার দিন-দেওয়ালীর কি রঙ্গ !
ঘুর্ণি ঘুরে চর্কী কেটে চল্‌ছে কোথাও ঝড়-গতি,
ঝঙ্কারে তার ঝঞ্ঝা বধির মঞ্জীরে ছড়ায় মোতি,
ঝম্‌ঝমিয়ে যায় রূপসী চাঁদি রূপার পায় তোড়া,
ফুলিয়ে হোথা দুলিয়ে কেশর বার হ'ল ওর সাতঘোড়া,
চল্‌ছে নেচে কাঁচিয়ে কেঁচে পাহাড়গুলোর অচল ঠাট,
ওঠা-নামার নাগর-দোলায় দুলিয়ে আঁচল পাগল নাট,
তুঁত-পাহাড় আর খয়ের-পাহাড় পাহাড় সাদা ফট্‌কিরি,
নস্যি রঙের পাহাড়গুলো ভস্ম হেন যায় চিরি,
গৈরিকে সে সাজ্‌ছে কোথাও, মাজ্‌ছে কোথাও নীল পাথর,
জম্‌কে এসে থম্‌কে হঠাৎ ঘোম্‌টা টেনে হয় নিথর।

* * *

কঠোর ধূসর নয়কো ঊষর পাথর হেথা উর্ব্বরা,
এই পাথরের স্তরে স্তরে ফসল ফলে বুক-ভরা,
এই পাথরের পাটায় পাটায় স্বর্গ হ'তে বারম্বার
লক্ষ্মী নামেন, ঐ দেখ গো পৈঠা-পীঁড়ি আসন তাঁর !
উথ্‌লে দিতে সোনার সরিৎ হরিৎ-বেশে উদয় হন
এই কঠোরের ঘাটে ঘাটে রানায় রানায় তাঁর চরণ !
এই কঠোরে কোমল ক'রে ফসল ফলায় কাশ্মীরী,
অন্ন, আয়ু, আদায় করে এই পাথরের বুক চিরি।

* * *

পৌঁছেছি গো পৌঁছেছি আজ গিরিরাজের অন্দরে,
শিবের বিয়ের ওই যে টোপর ওই যে গো বিরাজ করে,
ঐ যে 'হরমুকুট' উজল ঐ যে চির-চমৎকার,
বেড় দিয়ে ভুজঙ্গ সাথে গঙ্গা আছেন অঙ্গে যার,
ঐ যে 'নাঙ্গা' ঐ যে ধিঙ্গি ঐ যে নন্দী ভৃঙ্গী সব,
নিচ্ছে মনে আজ বা মোরা শুনব শিবের শিঙার রব,

মূর্ত্তিমতী হৈমবতী কবিরা কন কাশ্মীরে,
ফুটেছে এই সোনার কমল গিরিরাজের বুক চিরে,
তপের তাপের শেষ নাহি এর, শিবের আশা-পথ চেয়ে,
দুঃসহ ক্লেশ সইল কত ঊষা-প্রভা এই মেয়ে।

* * *

সার দিয়েছে সফেদ্ তরু দীর্ঘ পথের দুই ধারে,
লক্ষ ময়ূরপুচ্ছ-চামর হেল্ছে হাওয়ার সঞ্চারে,
সবুজ ঘাসের গাল্চে' পরে গাব্বা পাত সুন্দরী,
গাছের ছায়ার গাব্বা—তাতে টুক্‌রো রোদের ফুলকরী,
চীনার গাছের ধবল বাহু মেল্ছে পাতার পাঁচ আঙুল,
দেবের ভোগ্য ফলছে গো সেব্, ফুট্‌ছে হোথা আনার ফুল,
বাদাম গাছের পাৎলা পাতায় লাগ্‌ছে হাওয়া দিক্-ভোলা,
হাস্‌ছে আলো আকাশভরা, হাস্‌ছে হাসি দিল্ খোলা।

* * *

সপ্তসেতুর শহরে আজ নূতন হিমের পড়ছে ঘের,
শৈল-পটে বরফ হরফ নূতন কেগো লিখছে ফের,
হ্রদের জলে কমল লুকায়—মন্ত্রে যেন যায় উড়ে,
পদ্মফুলের পাপ্‌ড়ি শুকায় পদ্মপাতার কোলজুড়ে,
শিঠিয়ে ওঠে কাঁটার মালা বেগ্‌নি পাতায় পানফলের,
ট্যাপের ট্যাপা ফলগুলো সব শীতের শাসন পাচ্ছে টের,
সর্ষেফুলের ঝাঁঝালো মউ, পদ্মফুলের মউ মিঠে
মৌমাছিরা ভিয়েন্ করে, নেই অপচয় এক-ছিটে,
ভাসা ক্ষেতে খাট্‌ছে চাষা শেষ-ফসলের তদ্বিরে,
কাংড়িতে ফের ভরছে আগুন বুড়োবুড়ী গম্ভীরে,
হাজার মেয়ে আজকে সাঁঝে প্রাচীন কাঁথা জড়িয়েছে,
শীতের বাতাস প্রাচীন গাথা পাণ্ডু পাতা ছড়িয়েছে,
বর্‌ফি-কাটা ক্ষেতের পরে জাফরানে ফুল ফুট্‌ল রে,
শিশির-জলে ঘুম-জড়ানো চোখের ঘুম কি টুট্‌ল রে!
নীল-লোহিতের বিভূতি ওই লেগেছে আজ আস্‌মানে,
লেগেছে য়োস্‌মিনীর ফুলে, আর লেগেছে মোর প্রাণে,
নীলের কোলে সোনার কেশর 'নীলসুখেতে' স্পন্দমান,
নীলপাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফরানিস্থান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

গণেশ দাদা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

আলাপ

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত

সম্প্রদান

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডিবেটিং ক্লাবে 'পণপ্রথা'র বিরুদ্ধে তীব্র ঝাঁজে বক্তৃতা করিয়া গৃহে ফিরিয়া পৃথ্বীশ শুনিল, তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। সীতানাথবাবু খুব বড় কোন্ এক ইংরাজ হৌসের মুৎসুদ্দি, তাঁহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা পারুলবালার সহিত বিবাহ! সীতানাথ বাবু কাল সকালে সবান্ধবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। এক সপ্তাহ পরেই বিবাহ। দেরী করা চলিবে না—সম্মুখে মলমাস পড়িতেছে, তাই এত তাড়া!

পৃথ্বীশ নবীন গ্রাজুয়েট। এ বংশের ছেলেরা চিরকাল ইংরাজীতে কোনমতে নামটা সহি করিতে শিখিয়াই সরস্বতীর সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া থাকে। পৃথ্বীশের পিতৃ-পিতামহ তিনপুরুষ ধরিয়া পাকা ব্যবসাদার; লোহার ব্যবসায়ে বাজারে তাহাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি। লক্ষ্মীদেবীও লোহার বাঁধনে অচঞ্চলভাবে বাঁধা আছেন। পৃথ্বীশই শুধু বংশের চিরন্তন প্রথা ঠেলিয়া সরস্বতীর দরবারে হাজিরা রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রসাদ-প্রার্থী হইয়াছিল। তাই গৃহে তাহার খাতিরেরও সীমা ছিল না। পিতা নরেশ বাবু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন কাজ করিতে পারেন না; মা ছেলের কথায় চলা-ফেরা করেন। বড় দুই ভাই পরেশ ও সতীশ কোন ব্যাপারের মীমাংসার জন্য পৃথ্বীশের মুখ চাহিয়া থাকে!

তাই আজ তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা এতখানি পাকা হইয়া গিয়াছে শুনিয়া শুধুই যে সে বিস্ময় অনুভব করিল, এমন নয়—তাহার ললাটে একটু ভ্রূকুটি-রেখাও দেখা দিল।

জামা না খুলিয়াই সটান্ সে মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তখন উপরে দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, নিকটে বামা দাসী পা মেলিয়া সুপুরি কুচাইতেছিল। পৃথ্বীশ আসিয়া হাঁকিল, "মা—"

মা বলিলেন, "কে পিতু, আয়, বোস্।"

পৃথ্বীশ কহিল, "বসব না। একটা কথা শুনলুম, সেটা সত্যি কি না, তাই জানতে এলুম।"

মা বলিলেন, "কি কথা?"

"আমার না কি বিয়ে হচ্ছে? আর কাল তারই পাকা দেখা!"

মা হাসিয়া কহিলেন, "তা পাশ-টাশ করলি ত সব, এখন আমাদের কি সাধ যায় না, যে একটি টুকটুকে বৌ এনে ঘর আলো করি!"

বামা দাসী জাঁতির মধ্যে একটা আস্ত সুপুরিকে বাগাইয়া ধরিয়া আব্দারের সুরে বলিল, "ছোড়্দাদাবাবুর বিয়ের কিন্তু আমায়

সোনার হার চাই, মা—হাঁ, নাহলে শুনছি না বাপু।"

পৃথ্বীশ তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "তুই চুপ কর্।" তারপর মাকে কহিল, "কতগুলি গুণে নিচ্ছ, শুনি?"

মা বলিলেন, "আমরা কি এমনিই কসাই রে যে মেয়ের বাপের গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করব!"

পৃথ্বীশ কহিল, "তবু শুনিই না—"

মা কহিলেন, "সে নিজে থেকে থরচ করবে। পয়সা-ওলা মানুষ, দশ-বারো হাজার টাকা থরচ করা ত তার পক্ষে বেশী কথা নয়। তার উপর তোর মত জামাই পাচ্ছে! এমন ছেলে বাজারে কটা আছে?"

পৃথ্বীশ কহিল, "বাজারে! তা এ কথাটা ঠিকই বলেছ বটে! আলু-পটলের মত পাত্তরও আজকাল বাজারে সাজানো থাকে—যে যেমন দর দেয়, সে তেমনি জিনিস বুঝে নেয়,—না, মা?"

হরিনামের ঝুলিটা মাথায় ঠেকাইয়া মা বলিলেন, "তোর সঙ্গে আর তর্ক করতে পারি না বাপু। বাপ-মায়ে বিয়ে দিচ্ছে, তুই মুখটি বুজে বিয়ে করে আসবি, ব্যস্—এতদিন পড়াশোনা বলে যে আপত্তি করেছিলি, কোন কথা কইতে গেছলুম কি? তারপর এতগুলো পাশ করলি, এখনো বেঁকে থাকবি!"

পৃথ্বীশ কহিল, "বেঁকে থাকার কথা ত হচ্ছে না! বিয়ে করতে আমি রাজীও আছি, তবে আমার এক সর্ত্ত আছে!"

মা বলিলেন, "সর্ত্ত আবার কি, শুনি।"

পৃথ্বীশ কহিল, "গরিবের ঘরের মেয়ে বিয়ে করবো—বড়লোকের মেয়ে নয়।"

মা মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়া ছিলেন। ছোট ছেলেটির বিবাহ দিলেই তাঁহার সংসারের সব সাধ মিটে! যেমন ঘর, তেমনই মনের-মত পাত্রীও জুটিয়াছে—সব ঠিক-ঠাক, আর এই সময় ছেলে একটা বেয়াড়া সখের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত ভণ্ডুল করিয়া দিতে চায়! মা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "গরিবের ঘরের মেয়ে আনলে আমাদের কথনো চলে! না জানে সে কায়দা-কানুন, না জানে কিছু। ছোট মন নিয়ে এসে শেষে আমার এমন ঘর ভেঙ্গে থান্-থান্ করে দিক্! তার উপর তার মা-বাপ,ভাই-বোনকে মাসহারা দিয়ে পোষো!"

পৃথ্বীশ হাসিয়া বলিল, "গরিবের ঘরের মেয়ে আন্‌লে তার সেবা খেয়ে বাঁচবে মা, অন্তত পানটাও ঝীয়ের হাতে সাজিয়ে খেতে হবে না! আর বড়মানুষী কায়দা-টায়দার কথা যা বলছ, আচ্ছা মা, আমি কথা দিচ্ছি—আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ছ'মাসের মধ্যে কেতা-মাফিক গড়ে দেব।"

মা বলিলেন, "অনাছিষ্টি কথা তোর। যা বাপু, নিজের কাজ দেখ্‌গে—আমার জপ ভুলিয়ে দিস্‌নে।"

পৃথ্বীশ বুঝিল, মা চটিয়াছেন। কিন্তু মার রাগের ঔষধও তাহার বিলক্ষণ জানা ছিল। সে কহিল, "বেশ, আমি বলে-কয়ে খালাস রইলুম, কিন্তু। ভেবো না যে, আমি বাজারের আলু-পটল; আর শ্বশুরমশায় থলি ভরে টাকা এনে আমায় বেশ করে দেখে পরখ করে দাম ছাড়বেন! দেখো, শেষ সব

না ভেস্তে যায়! বিয়ের রাত্রে বাজনা-রসুনচৌকি আলোর ঘটায় স্পষ্ট না দেখ, পৃথ্বীশচন্দ্র চম্পট দেছে!"

মার গাটা শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "থাম্, থাম্, তোর আর অত ইয়ে করতে হবে না!"

পৃথ্বীশ আর কথা না বাড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

গৃহিণী আসিয়া কর্ত্তার কাছে কথাটা পাড়িলে তিনি বলিলেন, "ও-সব লেখাপড়া-শেখা ছোঁড়াগুলোর জ্যাঠামি! ওতে কান দিয়ো না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথ্বীশ সেদিনকার ছেলে—তাহার আবার কথা, তাহার আবার ওজর-আপত্তি! সে-সব ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—এমনই ভাবের মধ্য দিয়া উভয় পক্ষে অয়োজন চলিতে লাগিল। ম্যারাপ, নহবৎখানা, জ্ঞাতি-কুটুম্বের বিপুল সমাগম হইতে সুরু করিয়া এসেটিলিনের ঝাড়, কাগজের পাহাড়-পর্ব্বত রাক্সস-খোক্কস, গড়ের বাদ্য অবধি সব বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গেল।

বিবাহের দিন সকালে পৃথ্বীশ ভারী গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল। মার কাছে স্পষ্টই সে খুলিয়া বলিল, সে বিবাহ করিবে না—আজ রাত্রের ট্রেনেই পশ্চিম যাইবে। মা প্রথমে কৌতুক ভাবিয়া ব্যাপারটাকে আমোল দিলেন না। শেষে যখন মেজ বৌ আসিয়া খবর দিল, পৃথ্বীশ সাজগোজ করিয়া একটা ব্যাগে কাপড়-চোপড় পুরিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেছে, তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন। সকালে নহবতের বাঁশীতে তখন ভৈরবীর সুর ছুটিয়াছিল।

কথাটা নিমেষে বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কর্ত্তা চটিয়া বলিলেন, "যাক্ চলে সে হতভাগা! পাশ করে মাথায় উঠে বসেছে—দেশে আর কোন ছেলে পাশ করেনি, বটে! আমার অপমান করে সে বড় হতে চায়! খবর্দ্দার, কেউ তার খোঁজ করো না—"

গৃহিণী কাঁদিয়া কহিলেন, "আমিও এ বাড়ীতে থাকতে চাই না। গাড়ী তৈরি করতে বল, বিপিন এসেছে, ওর সঙ্গে এখনই আমি চাঁপাডাঙ্গা চলে যাব।" বিপিন গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র—চাঁপাডাঙ্গায় তাঁহার পিত্রালয়।

বাড়ীতে হুলস্থূল বাধিয়া গেল। জ্ঞাতি-কুটুম্বের দল—যাহারা এ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া যাইত,—কলতলায় জটলা পাকাইয়া চাপা গলায় দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের এই বিসদৃশ বিদ্রোহের তীব্র সমালোচনা লাগাইয়া দিল। মেজ বৌ পৃথ্বীশকে একটু ভয় করিত; কারণ মেজ-বৌয়ের বাপের জমিদারীর আয় বেশী বলিয়া চাল-চলনটাকেও সে পিতৃগৃহের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায় অহরহ ব্যস্ত থাকিত এবং পৃথ্বীশ মেজবৌয়ের এই গূঢ় প্রয়াসটুকু ধরিয়া ফেলিয়া তাহার প্রতি মধ্যে-মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিত। মেজবৌ দেখিত, বাড়ীর বড় হইতে ছোট অবধি সকলেই 'পৃথ্বীশ' বলিতে অজ্ঞান—কাজেই সে বিদ্রূপ অসহ্য বোধ হইলেও নিরুপায়ে সে তাহা গায়ে মাখিয়া আসিয়াছে। বামা দাসী হলুদ-মাখা

কাপড় পরিয়া প্রকাণ্ড বঁটিতে মাছ কুটিতেছিল; এখন সুযোগ পাইয়া মেজবৌ বামা দাসীর কাছে মনোভাবটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। মেজ-বৌ বলিল, "এই ছেলেকে সুছেলে বলে সব পূজো করেন! আমারও এক বোন্-পো ছুটো পাশের পড়া পড়ছে—কিন্তু বাপ-মায়ের কি বশ! হুঁঃ, এ কি র‍্যালাটাই করলে!"

বিনা-মেঘে বাজ পড়িলে লোকে যেমন স্তম্ভিত অভিভূত হইয়া পড়ে, বামা দাসীর অবস্থাটা সেইরূপ হইয়াছিল। সে কোন কথা না বলিয়া বঁটির উপর হাত রাখিয়াই বসিয়া রহিল।

বাহিরের ঘরেও আন্দোলন চলিয়াছিল। সরকার মহাশয় এইমাত্র প্রোসেশনের পুলিশ-পাশখানা কর্ত্তার কাছে লইয়া গিয়া বলিতেছিল, "এখানা বড়বাবুর জিম্মা করে দেবেন—হারিয়ে গেলে—" সে কথা আর শেষ হইল না। কর্ত্তার তাড়ায় সে হতভম্ব হইয়া থামিয়া গেল।

পাড়ার মাতব্বর নারাণ চক্রবর্ত্তী কহিল, "তাই ত, এখন উপায়—"

নরেশবাবু কহিলেন, "উপায় আর কি! ঘাড় হেঁট করে এখন মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াইগে। সব কথা তাঁকে খুলে বলে মাপ চাই গে।"

আশু গিকদার বলিল, "ঐ ত ইংরিজি পড়ার দোষ! মাথা গরম হয়ে ওঠে। হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না! আমার ছেলেটার পড়ার অত চাড়—আমি বললুম, না বাবা,ও ইংরিজি শিখে কাজ নেই! তুমি আমার কাজ-কর্ম্ম দেখ, তাহলেই আমি হাসতে হাসতে স্বর্গে যাব!"

বিজয় বোস্ বলিল, "ও সব কথা থাক্! এখন আর-একটা দায় রয়েছে মাথার উপর, মেয়েদের বাড়ী খবর পাঠাতে হবে—সে ভদ্রলোক না হলে মহা ফাঁপরে পড়বেন।"

যদু মণ্ডল বলিল, "ওঃ, কাল দেখা হল ভদ্দরলোকের সঙ্গে—বাড়ীতে যত কুটুম অমনি গিস্-গিস্ করছে! কি হাসি মুখ—প্রথম মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছে—কাউকে আর বলতে বাকী রাখেনি, খরচেরও 'ক্রটি' করে নি। ইলেক্‌ট্রিক আলোর মালা পরে বাড়ী যেন হাসছে!"

নরেশবাবু বলিলেন, "নিজে আর এ মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই কি করে? পরেশ কি সতীশ কেউ না হয় যাক্, হাতে-পায়ে ধরে ব্যাপারখানা তাঁকে বুঝিয়ে আসুক!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরেশের মুখে ব্যাপার শুনিয়া সীতানাথ বাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার উপায়? বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্ব গিস্-গিস্ করিতেছে। সকলের কাছে মাথা হেঁট!

বন্ধু রমাপতি বাবু নিকটেই বসিয়া ছিলেন, চুপি চুপি বলিলেন, "আরও কিছু নেবার ফিকির নয় ত হে?"

সীতানাথ বাবু পরেশের দুই হাত ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আরও কিছু বেশী দিতে আমি রাজী আছি, বাবা—আমায় রক্ষা কর।"

পরেশ নত শিরে কহিল, "আপনি সন্দেহ করবেন না, সীতানাথবাবু—আমি দাঁও কষতে আসিনি। যথার্থই এই বিপদ হয়েছে।

বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন, মার মূর্চ্ছা-অবধি হয়েছিল।"

সীতানাথবাবু কহিলেন, "এখন আমার জাত রক্ষা হয় কি করে?" তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রমাপতিবাবু ব্যবসায়ে উকিল। সহজে তিনি কোন কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না! জেরা করিয়া-করিয়া স্বভাবও আবার এমন দাঁড়াইয়াছে যে নিতান্ত সহজ ব্যাপারটাকেও তিনি অত্যন্ত ঘোরালো করিয়া দেখেন। তাহার উপর পয়সা-কড়ির গন্ধ যেখানে আছে—সেখানকার সমস্তই ত দারুণ সন্দেহ-জনক! আদালতে হাকিমদের সঙ্গে নানা তর্ক করিয়া তাঁহার আর-একটা গুণ জন্মিয়াছিল। চক্ষু-লজ্জার তিনি ধার ধারিতেন না—এবং যত কঠিন হোক না কেন, স্পষ্ট কথা তিনি কহিতে জানেন। তিনি এবার পরেশের দিকে চাহিয়া খোলাখুলি ভাবেই বলিলেন, "কেন আর ভদ্দরলোকটাকে মজাও বাবাজী, আরও কিছু নয় ধরে দেবে'খন, ভাইটিকে যথাসময়ে হাজির করে দিয়ো!"

লেখাপড়া না শিখিলেও পরেশের স্বভাবটি ছিল নম্র। ব্যবসাদারের ছেলে সে—লোকের মর্য্যাদা রাখিতে বিলক্ষণ জানে এবং সহ্য করিবার শক্তিও তাহার অসাধারণ; কিন্তু রমাপতি বাবুর কথা শুনিয়া তাহার ইচ্ছা হইল, ঐ অভদ্র বর্ব্বরটার টাক-ধরা মাথায় সজোরে এক ঘুষি বাগাইয়া দেয়! মানুষ এমন হৃদয়-হীন অসভ্য হইতে পারে, মুখে এমন কঠিন কথা বলিতে পারে, তিন পুরুষ ধরিয়া কঠিন লোহার কারবার করিয়াও তাহার এ জ্ঞান জন্মে নাই। শুধু সীতানাথ বাবুর বিপন্ন অবস্থার কথা ভাবিয়াই সে কোনমতে আত্মসম্বরণ করিল।

পরেশ রমাপতির দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া সীতানাথবাবুর পদ স্পর্শ করিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী করতে আসিনি। বিপদ আপনারও, আমাদেরও। তবে আপনার বিপদ আরও বেশী! আমাদের সাধ্য থাকলে যে কোন উপায়ে হোক্ আপনাকে আমরা সাহায্য করতুম! তা ছাড়া আপনি বাবাকে চেনেন—আপনি বরং তাঁর কাছে চলুন, যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়—" পরেশের চোখের কোণে অশ্রু-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

সীতানাথবাবু তাহা দেখিলেন; তিনি কহিলেন, "দাঁড়াও, বাবা, তাই যাব। এ বিপদ তাঁরও, আমারও। তবে বাড়ীতে এক বার খবরটা দিয়ে আসি।"

সীতানাথবাবু অন্দরে চলিয়া গেলেন। রমাপতি-উকিল গড়গড়ায় তামাক টানিতে টানিতে পরেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি তামাক ইচ্ছা করেন?"

পরেশ হাঁ-কি না কোন কথা বলিল না, তক্তাপোষের উপর বসিয়া রহিল।

অন্দর-মহল এ দুঃসংবাদে জ্বলিয়া উঠিল। নানা কণ্ঠে নানা ভাবের সুর খেলিয়া গেল। সীতানাথবাবু হতবুদ্ধির মত চাতালে বসিয়া পড়িলেন, ভাগিনেয়ী চপলা তাড়াতাড়ি এক খানা পাখা লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। শ্যালিকা মনোরমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দিদিকে ডাকিয়া ভগ্নীপতিকে কহিল, "একটু দুধ এনে দি, খানু দেখি—"

মনোরমার দিদি অর্থাৎ সীতানাথবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা তখন গরদের সাড়ী পরিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। মোটাসোটা দোহারা গৌরবর্ণ দেহ, নীচে হাতে গিন্নি-প্যাটার্ণের কয়গাছা করিয়া সোনার চুড়ি ও শাঁখা, উপর-হাতে অনন্ত—গহনাগুলা সে হাতে ঠাঁই পাইয়া চমৎকার মানাইয়াছে। কুটুম্বিনীদের মুখে এ সংবাদ শুনিয়া অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হৃদয়ে স্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্নপূর্ণার স্বভাবটি খুব ধীর, বিপদে টলিতে জানেন না—স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া তিনি কহিলেন, "তা তুমি অমন করে বসে পড়লে কেন? কলকেতা সহরে পাত্রের অভাব কি? এখনই চারদিকে লোক পাঠাও—পাত্র এনে হাজির করবে। মেয়ে ত আমার কালো-কুৎসিত নয়—আর টাকাও তুমি কম দিচ্ছ না—"

সীতানাথবাবু হতাশভাবে কহিলেন, "কিন্তু নরেশবাবুর ছেলের মত পাত্র কি আর চট্ করে মেলে! সুপাত্রের জন্যই না মেয়েকে বড় করে রেখেছিলুম—"

অন্নপূর্ণা জানিতেন, এ পাত্রটির প্রতি স্বামীর ঝোঁক কতখানি! রূপে-গুণে ধনে-মানে এমন পাত্র সহজে পাওয়া যায় না, সত্য! কালই রাত্রে উচ্ছ্বাসের মুখে স্বামী কতখানি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন,—নিজেদের জামাতৃ-ভাগ্য ও পারুলের স্বামী-ভাগ্যের আলোচনায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া ছিলেন! ঘর-বরের কথা শুনিয়া তাঁহারও প্রাণটা স্নেহে-বাৎসল্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু ঘটনা যখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখন আর কাঁদিয়া কি হইবে? সত্যই ত, দেশে পাত্রের কিছু আকাল পড়ে নাই—ঠিক এটি না হইলে উহার-মতও ত মিলিতে পারে! তবে সম্মুখে এই মলমাস পড়িতেছে—পাঁচ মাস আর বিবাহ হইতে পারিবে না, এই যা! তবুও স্বামীর কাতরতা ঘুচাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "তা যাই বল—যে ছেলে মা-বাপের কথা অমান্য করে, তার হাতে যে আমার পারুলকে পড়তে হল না, এ ওর একটা ভাগ্যি! ও ছেলে ত দেখছি, গোঁয়ার-গোবিন্দ। শিখুক লেখা-পড়া বাবু, তা বলে এতই কি এ!"

তার পর পরামর্শান্তে স্থির হইল, সীতানাথবাবু এখনই গিয়া নরেশবাবুর সঙ্গে স্বয়ং দেখা করিবেন, এবং তাঁহার পুত্রকে একান্ত না পাওয়া যায়, তবে এখনই চারিদিকে লোক পাঠাইয়া পাত্রের সন্ধান করাইবেন। কলিকাতার মেসগুলা ত ছেলের ঠাসা—পাত্রের অভাব কি! অন্নপূর্ণার বৃদ্ধা পিসী কহিলেন, "সত্যিই ত—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয়! এত টাকা খরচ করবে শুনলে কত পাত্তর অমনি লুটিয়ে এসে তোমার পায়ে পড়বে!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলা তখন প্রায় দশটা। নরেশবাবু আত্মীয়-বন্ধুদের সহিত বৈঠকখানা ঘরেই ছিলেন। অন্দরের দিক হইতে প্রচুর বর্ষণ পাইয়া তাঁহার রোষাগ্নি একেবারে নিবিয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে সতীশ, সরকার মহাশয় এবং দুইজন ভৃত্য পৃথ্বীশের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এত বড়

উৎসব-ভবনের উপর দারুণ অপ্রসন্নতার কালো ছায়া পড়িয়াছে। বৈঠকখানা-গৃহ নিস্তব্ধ; কেবল দুই-চারিজন নিতান্ত লোলুপ বন্ধু গড়গড়া-টানার শব্দে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। এমন সময় পরেশের সহিত সীতানাথবাবু পাগলের মত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সীতানাথবাবুকে দেখিয়া সকলেই একটু উস্-খুস্ করিয়া নড়িয়া বসিল।

নরেশবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পরেশের মুখে বিপদের কথা শুনেছেন ত?"

সীতানাথবাবু বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এখন আমার উপায়?"

"সেই কথাই ভাবছি" বলিয়া নরেশ বাবু বাহিরের দিকে তাকাইলেন।

তাহার পর বন্ধুর দলের আলোচনায় ছেলেদের ইংরাজী লেখা-পড়া শেখানো, পণের মিটিং, খবরের কাগজ—কিছুরই নিন্দা বাদ পড়িল না। বিস্তর বাদানুবাদেও যখন কিনারার সন্ধান মিলিল না, তখন সীতানাথবাবু কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "এখন আমার জাত-রক্ষার উপায় করে দিন। আমার দুরদৃষ্ট—এমন ঘর, এমন বর তপস্যায় মেলে—তা এ আমার মেয়ের বরাত, আমারও বরাত!"

নরেশবাবু ঐ সকল নিন্দাবাদে যোগ দেন নাই—তিনি বাস্তবিকই সীতানাথবাবুর জাতি-রক্ষার উপায় খুঁজিতেছিলেন। সহসা একটা কথা মনে পড়িল; তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমারই এক জ্ঞাতি-ভাই আছে, লক্ষ্মীকান্ত—অগাধ পয়সা—তার এক ছেলে আছে উমাকান্ত, ছেলেটি মন্দ নয়। সেটির জন্য দেখলে হয় না?"

সীতানাথবাবু অকূলে কূল পাইলেন। তিনি কহিলেন, "তবে উঠে পড়ুন—আমার গাড়ী আছে—তাঁকে ধরে যেমন-করে পারেন, আমায় উদ্ধার করে দিন। আজ পাত্রের ঠিক না করে আমি বাড়ী ফিরব না—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েছি। পাত্র পাই, ভাল, না পাই ত যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাব। এত জ্ঞাত-কুটুমের মাঝে মাথা হেঁট! একে ত মেয়ে বড় করে রেখেছি বলে পাঁচজন পাঁচ কথা শুনিয়ে আস্‌ছে, তার উপর এই বিভ্রাট!"

নরেশবাবু একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া সীতানাথবাবুর সহিত জ্ঞাতি লক্ষ্মীকান্তর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

মোটা থামওয়ালা বাড়ী। লোকজনের অপ্রতুল নাই। বাহিরের ঘরে কালো মোটা এক ভদ্রলোক শুইয়াছিলেন, একটা ভৃত্য বসিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিতেছিল। নরেশবাবু আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, "লক্ষ্মী—শুন্‌ছ?"

মোটা ভদ্রলোকটি উঠিয়া বসিলেন। তখন নরেশবাবু আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন; সীতানাথবাবুও বিস্তর আবেদন-নিবেদন জানাইলেন। শুনিয়া ভাল্লী দাঁও মিলিয়াছে ভাবিয়া লক্ষ্মীকান্ত কহিল, "তাই ত—মশায়ের এ দায় আমার দেখা ত খুবই উচিত, স্বীকার করি—কিন্তু এদিকে যে এক বিপদ ঘটেছে—"

বিপদ! সীতানাথবাবু ভড়কাইয়া গেলেন।

তিনি একেবারে লক্ষ্মীকান্তর পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "আমায় রক্ষা করতেই হবে।"

লক্ষ্মীকান্ত পা সরাইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "আহাহা, করেন কি! আপনি মহাশয় ব্যক্তি! তবে বিপদটা কি জানেন? উমাকান্তর বিস্তর সম্বন্ধ আসছিল—তার মধ্যে টিকুলির জমিদাররা শেষ কথা দিয়ে গেছে। তারা সবশুদ্ধ পঁচিশ হাজার দেবে এই ত বলে পাঠিয়েছে,—আমিও একরকম মত দিয়েছি। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই তাঁরা পাকা দেখাটা সেরে রাখতে চান—তারপর প্রথম তারিখ পেলেই বিয়ে হবে। বাড়ীতে মেয়েদেরও সাধ, ঐখানে বিয়ে হয়!"

লক্ষ্মীকান্তর চেহারা ও কথাবার্ত্তার ধরণটা সীতানাথবাবুর বড় মনঃপূত হইতে-ছিল না। অন্য সময় হইলে তিনি এ-সকল কথা উত্থাপনও করিতেন না—কিন্তু এ যে বড়-বিপদের মুখ। এখন আর বিচার-তর্কের সময় নাই! তবুও পঁচিশ হাজার টাকার কথাটা তাঁহার কানে অত্যন্ত বেসুরা বাজিল। তিনি বলিলেন, "পঁচিশ হাজার টাকা—?"

লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "আমার ঐ এক ছেলে, আর আমার বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে মশায় বাইরে খবর নিতে পারেন।"

সীতানাথবাবু বলিলেন, "তাহলে আমায় উঠতে হল। আমার এটি বড় মেয়ে বটে কিন্তু এটি-ছাড়া আরো ছুটি মেয়ে আছে—অবশ্য প্রথমটির বিয়েয় যা খরচ করব, তা যে সকলের বেলায় করতে পারব, তাও বলছি না। তবু আমার মত লোকের পক্ষে পঁচিশ হাজার দেবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। তাহলে আর কি, নিরুপায়!" কথাটা শেষ করিয়া সীতানাথবাবু হতাশভাবে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ঘড়ির পানে চাহিলেন। এগারোটা বাজিতে তখন তিন মিনিট বাকী!

লক্ষ্মীকান্ত দেখিল, শীকার বুঝি পলায়! তিনি ভাবিলেন, না, দর নামাইতে হইবে। ও পক্ষ খবর লইতে গেলে বিস্তর গোল বাধিতে পারে! টিকুলির জমিদারের কথাটা একেবারে বানানো না হইলেও, দরটা অবশ্য একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই বলা হইয়াছিল। তা এরূপ ব্যবসা-ক্ষেত্রে একটু আধটু অতিরঞ্জিত করায় দোষ নাই! পঁচিশ হাজার না হোক পাঁচ হাজার অবধি উঠিতে পারে বলিয়া তাহারা আভাস দিয়া গিয়াছে ত! তবে এ কথাও ঠিক, ছেলের গুণের কথা জানে না বলিয়াই। পুত্র উমাকান্তর গুণের মধ্যে পাড়ার এ্যামেচার থিয়েটারের সে সেক্রেটারি। নাটকে নায়ক সাজিয়া বেশ চমৎকার নাকি সুরে করুণ অভিনয় জমাইয়া তুলিতে পারে, এবং ইয়ার-মহলেও পুরদস্তর 'খরচে' বলিয়া তাহার নাম-ডাক আছে; রাত্রেও সবদিন বাড়ীতে থাকে না! বনিয়াদি প্রথায় এতখানি পোক্ত থাকার জন্য কলিকাতার কোন সম্বন্ধ জমিতেছিল না, আসিয়াই ফাঁসিয়া যাইতেছিল! ভাগ্যক্রমে যদি বা আজ এমন দাঁও মিলিয়াছে! লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "তা বেশ, আপনি ভদ্রলোক, আপনি নয় বিশহাজারই দেবেন! আপনার মত মশায় ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলে, পাঁচহাজার টাকা লোকসান করা কি-আর এমন বড় কথা!"

সীতানাথ বাবু কহিলেন, "না মশায়, বিশ হাজার দেওয়াও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, অসম্ভবই বলতে হবে।" সীতানাথবাবু উঠিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "আহা উঠলেন যে—বসুন, বসুন—একছিলিম তামাকই নয় খেয়ে যান। আপনি নরুদার সঙ্গে এসেছেন—যাক, তবে নয় ঐ ষোল হাজারেই রাজী হয়ে পড়ুন—আমিও উমাকান্তকে ডাকিয়ে দি—আশীর্ব্বাদ করে যান। আজই লগ্ন বললেন না? তা ও আটটার লগ্নে হতে পারবে না ত! ঐ যে বললেন, দশটায় আর-একটা লগ্ন আছে, সেইটেতেই ঠিক করুন। কেন না, আমায় ত আবার সব গোছগাছ করে নিয়ে যেতে হবে। একটি ছেলে,—বাজনা-বাদ্যি, আলো, লোকজন, এ-সব না হলে নিন্দেয় যে মুখ দেখাতে পারব না।"

সীতানাথ বাবু দেখিলেন, তিনি এখন দায়ে পড়িয়াছেন—সে দায়ে রক্ষা পাইতে হইলে মূল্য কিছু ধরিয়া দিতেই হয়। তবু লক্ষ্মীকান্তকে খুব ভদ্র বলিতে হইবে, তাহার জন্য এতগুলা টাকা লোকসান করিতেছে! তাঁহারও আজ যেমন করিয়া হোক, পাত্র চাইই! তখন আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পনেরো হাজারেই দর রফা হইয়া গেল।

লক্ষ্মীকান্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উমাকান্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আধ ঘণ্টা পরে বংশধর উমাকান্ত আসিয়া দেখা দিল! রং শ্যামবর্ণ, চোয়াড়ে ধরণের চেহারা, মাথার চুল সম্মুখদিকে অত্যন্ত দীর্ঘ, পিছনে নাই বলিলেও চলে—চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল—কাল সারারাত্রি থিয়েটারে কাটাইয়া সকালে আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল; বাড়ীর লোকের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙ্গিলে চিত্ত এখন বিরক্তির ভাব ধারণ করিয়াছে। সীতানাথবাবু একদৃষ্টে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "কাল এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে সারারাত জেগে খাটতে হয়েছে, তাই আর কি—"

পুত্র পিতার পানে ঈষৎ কৌতুক-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নামাইয়া বসিল। সীতানাথবাবু পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তাহলে আমি বাড়ী গিয়ে খবর দিইগে—উদ্যোগ সব বন্ধ আছে কি না! ঐ দশটার লগ্নই তাহলে ঠিক? আর কন্যা-আশীর্ব্বাদটা আপনি—"

তাকিয়াটা কোলের উপর তুলিয়া শরীরটাকে একটু দোলাইয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল, "তার আর কি! আমার মা-লক্ষ্মীকে ঐ সম্প্রদানের পূর্ব্বেই আশীর্ব্বাদ করব'খন। এখন আমিও সব উদ্যোগ করি। বলেন কি, নালিশ করতে গেলেও লোকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দেয়—আর এ আট-দশ ঘণ্টার নোটিশে বিয়ে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—" লক্ষ্মীকান্ত গলা ছাড়িয়া উচ্চ হাস্য করিল।

লক্ষ্মীকান্তর হাসির সুরটা সীতানাথ-বাবুর প্রাণে বাজের মতই বাজিল। তিনি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। আভ্যু-দয়িক শ্রাদ্ধ সারিয়া একটু মিছরির সরবৎ

মাত্র গলায় ঢালিয়া সীতানাথবাবু নিজের ঘরে আসিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন। মেঝেয়-বিছানো কার্পেটের উপর বসিয়া মেয়েরা পারুলকে 'কনে' সাজাইতেছিল। সীতানাথবাবুর মনটা মোটেই প্রসন্ন ছিল না—প্রথম মেয়ের বিবাহ, বলিতে গেলে তাঁহার আমোলে বাড়ীতে এই প্রথম কাজ! বাহিরে বাজনা-বাদ্য, গণ্ডগোল পুরা মাত্রায় চলিলেও তিনি যেন উহারই মধ্যে কলের-পুতুলের মতই চলা-ফেরা করিতেছিলেন, কোন কাজেই তেমন মন লাগিতেছিল না। বিবাহের দিন এ-ভাবে বর-বদল হইয়া গেল! এমন ব্যাপার কোথাও কখনও ঘটিয়াছে, না, কেহ কখনো এমন ব্যাপারের কল্পনাও করিতে পারিয়াছে! একটা ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাঁহার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সহসা তিনি পারুলের পানে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, পারুলের চোখ দুটিতে যেন আজ তাহার সে স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু আর নাই! মুখেও কেমন বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে, কৈ, কাল ত ও মুখ অমন ছিল না, চমৎকার দেখাইতেছিল! একটা তীব্র বেদনায় তাঁহার মনটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে পড়িল, উমাকান্তর সেই চেহারা—লাল্ চোখ, কামানো ঘাড় ও মাথার সম্মুখে প্রকাণ্ড চুল! নিতান্তই গোঁয়ারের মূর্ত্তি! —হায়, এমন সোনার কমল মেয়েকে তিনি শেষ কিনা একটা বানরের হাতে সঁপিয়া দিতেছেন! না হয়, আরও পাঁচ মাস অপেক্ষা করিতেন—না হয়, লোকে দূষিত! তবুও মেয়েটার ত এ-ভাবে সর্ব্বনাশ হইত না। ঝোঁকের মাথায় তখনই তাড়াতাড়ি পাত্র খুঁজিতে বাহির হইয়াই ত এই বিভ্রাট ঘটিল! হায়, হায়, মেয়েটার কি দুর্দ্দশাই না তিনি করিলেন! অমনি আবার মনে মনে হইল, মিথ্যা আর এ-সব ভাবিয়া কি ফল! ভবিতব্য! ঐ উমাকান্তই যে পারুলের বর! নহিলে এত পাত্রের মধ্যে ঘটকেরা কৈ কোন দিন তাহার কোন সংবাদ লইয়া আসে নাই ত—আর আজ এমন ভাল পাত্র ঠিক থাকিলেও হাত-ছাড়া হইয়া গেল এবং ঘটনাচক্র শেষে এ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইল! যাক্, উহাকে লইয়াই পারুল সুখী হোক! ও বিষয়ে আর মন খারাপ করিয়া কি হইবে?

সীতানাথবাবু এমনই নানা কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় এক সুবেশ তরুণ যুবা সে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, আসিয়াই কহিল, "মেজমামা, এ কি শুনছি! পৃথ্বীশবাবুর সঙ্গে না কি সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে?"

সীতানাথবাবুর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল—আপনাকে একান্তই করুণার্হ ভাবিয়া মৃদু কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "কে ললিত, আয় বাবা, বোস্—"

যুবার নাম ললিত। সীতানাথবাবুর খুড়তুতো বোনের ছেলে সে, প্রেসিডেন্সিতে বি, এ পড়িতেছে। ললিত বলিল, "না, বসবো কি! তার উপর শুনলুম, ঐ উমাকান্ত-টার সঙ্গে পারুলের বিয়ে দিচ্ছেন!"

"—হাঁ। কিন্তু উপায় কি?"

"উপায় কি। রামচন্দ্র! ঐ বিশ্ব-বখা ছেলে উমাকান্ত! এমেচার থিয়েটারে রাজা সেজে বেড়ায়—নেশাটেশাও দিব্যি ধরেছে—

যত লক্ষ্মীছাড়া সঙ্গীর সঙ্গে দিবারাত্র ইয়ার্কি দিয়ে ফেরে—এত টাকা খরচ করে সেইটের সঙ্গে পারুলের বিয়ে দিচ্ছেন! ইঃ তার চেয়ে ওর গলা টিপে ওকে মারলেন না কেন?"

মেয়েদের দলে উপবিষ্টা এক বর্ষীয়সী সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "ললিত—"

সে স্বরে চমকিয়া ললিত চাহিয়া দেখে, সে ঘরে পারুল বসিয়া আছে। বর্ষীয়সীর চোখের ইঙ্গিত ললিত বুঝিল, এ কথাটা পারুলের সমুখে কওয়া ঠিক হইতেছে না!

ললিত কহিল, "আপনি এমন চুপচাপ পড়ে থাক্‌লে চলছে না ত, মেজমামা—পৃথ্বীশবাবুকে যেমন করে হোক, পাকড়ানো চাইই। আমি সব শুনেছি, এতেই আপনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন! আসুন'দিকি, আমার সঙ্গে, একখানা মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—সন্ধ্যারও এখনো দেরী আছে—"

সীতানাথবাবুর মনে হইল, এতক্ষণ তাঁহার যেন একটা কঠিন পীড়া হইয়াছিল—হাত-পাগুলা দুর্ব্বল অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, কোন শক্তি ছিল না—এখন ললিতের কথায় যেন আবার নূতন করিয়া চেতনা, শক্তি সব তিনি ফিরিয়া পাইলেন! ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "নরেশবাবুর ছেলের সঙ্গে তোর জানাশোনা আছে না কি?"

ললিত কহিল, "না, তবে ওঁর যে প্রধান মন্ত্রী হরিহর—ওদের ক্লাবের সেক্রেটারি, তার সঙ্গে আমার খুব আলাপ পরিচয় আছে। চলুন দেখি, তাকে ধরে পৃথ্বীশবাবুকে বার করতে পারি কি না, দেখি। তাঁকে পেলে, আর ব্যাপারটা বোঝালে সহজেই তিনি রাজী হবেন বলে আমার বিশ্বাস। নিন, নিন, আপনি উঠুন, একটা জামা—থাক্‌গে না হয়, দেরী হয়ে যায় যদি,—তার চেয়ে আমার এই চাদরখানা নিয়েই চলে আসুন। আমি ত এসে এ-সব শুনেই অবাক হয়ে গেছি!" একনিশ্বাসে ললিত কথাগুলা বলিয়া গেল।

সব কথাগুলা সীতানাথবাবুর কানেও গেল না—তিনি ঠিক বুঝিতেও পারিলেন না! তিনি কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন! ললিত তাঁহাকে একরূপ টানিয়া লইয়াই বাহিরে আসিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পৃথ্বীশকে বাহির করিতে কষ্ট হইল না। ক্লাবের সেক্রেটারি হরিহরের বাড়ী আসিয়া তাহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিতেই সে বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি রাস্কেল হঠাৎ আমার এখানে এক ব্যাগ নিয়ে এসে উপস্থিত—বললে, বিয়ের দিন পেছিয়ে গেছে, মেয়ের বাড়ীতে কার খুব অসুখ—চল, এই হিড়িকে পুরী-টুরী কোথাও ঘুরে আসি।"

ললিত কহিল, "সব মিছে কথা।" তার পর সীতানাথবাবুকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "ইনি আমার মেজমামা, এঁরই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। ভদ্দরলোক বাধ্য হয়ে শেষ কি না পনেরো হাজার টাকাশুদ্ধ মেয়েটিকে ধরে ঐ লক্ষ্মীছাড়া উমাকান্তর হাতে সঁপে দিচ্ছেন! কাল বিকেলে আমি মামার বাড়ী থেকে চলে এসেছি; তারপর আজ সারাদিন সেই সকাল থেকেই ত প্রেসে কেটেছে! সেখানে বসে থেকে বিয়ের পদ্য

ছাপিয়ে ফিরে গিয়ে শুনি, এই ব্যাপার! তাই ওঁকে তোমার কাছে টেনে আনলুম। এখনো নদন আছে—তুমি উপায় কর, পৃথ্বীশবাবুকে চাইই! তুমি তাঁকে এনে দাও—নাহলে মেয়েটার সারা জন্মটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়!"

হরিহর কহিল, "দাঁড়াও,—সে রাস্কেল আমার উপরকার লাইব্রেরি-ঘরে বসে কি সব কেতাব-পত্র ঘাঁটছে। বলে, মাথায় মজার আইডিয়া এসেছে—কি বই লিখবে। বেশ, সীতানাথবাবুকে নিয়ে আমি উপরে যাচ্ছি। তুমি :এইখানে অপেক্ষা কর।"

সীতানাথবাবুকে লইয়া হরিহর লাইব্রেরী ঘরে আসিল। একখানা কৌচে প্রকাণ্ড এক কেতাবের আড়ালে মুখ গুঁজিয়া পৃথ্বীশ পড়িয়াছিল; হরিহর ডাকিল, "পৃথ্বীশ—"

পৃথ্বীশ বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া মাথা তুলিল, কহিল, "কি?"

হরিহর কহিল, "তোমার শ্বশুর এসেছেন দেখা করতে—"

শ্বশুর! পৃথ্বীশ বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া কুতূহলী দৃষ্টিতে সীতানাথবাবুর পানে চাহিয়া দেখিল। সীতনাথবাবু একেবারে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, এ দায়ে আমায় উদ্ধার কর—তোমার মঙ্গল হবে।"

হরিহর কহিল, "তুমি এত বড় পাষণ্ড যে পালিয়ে এসে ওঁর সর্ব্বনাশ করছ!"

পৃথ্বীশ কহিল, "কিন্তু—"

সীতানাথবাবু কহিলেন, "না বাবা, কোন দোষ নেই তোমার। তবে আমারও কথা শোনো, শুনে যা বলবার থাকে, বল। আজ আমায় মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—নাহলে সে দ'পড়া হবে। দ'পড়া হলে সে মেয়েকে কেউ আর বিয়ে করবে না। তাই তোমার কাছে নিরাশ হয়ে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের ছেলে উমাকান্তর সঙ্গেই তার বিয়ের ঠিক করতে হয়েছে—লক্ষ্মীকান্তবাবু পনেরো হাজার টাকায় বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু সে ছেলে কেমন, তা তুমি জান, বোধ হয়। তোমার এই বেঁকে দাঁড়ানোতে মেয়েটাকে বাধ্য হয়ে একেবারে এ যে কোথায় ফেলে দিচ্ছি, তা আমি বাপ হয়ে কিছু বুঝতেও পাচ্ছিনে।"

পৃথ্বীশ কহিল, "কিন্তু জানেন ত, আমার এ বিয়েয় দারুণ বাধা আছে—"

"—কি বাধা বাবা, বল।"

"আমার প্রতিজ্ঞা, যদি বিয়ে করি ত একপয়সা পণ নেব না, গরিবের মেয়ে বিয়ে করব, আর—"

"তাহলে আমার মেয়েটা ভেসে গেলেও তুমি ফিরে চাইবে না? শোন বাবা, আমি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, সুপাত্র পাইনি বলে জ্ঞাত-কুটুমের মানা ঠেলেও তাকে বড় করে রেখেছি—মনের মত পাত্র পেয়ে মহা-আনন্দে নিজের ইচ্ছায় আজ যখন খরচ-পত্র করতে বসেছি, তখন এই বিপদ। বুঝছি, উমাকান্তর হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে মেয়ের গলা কেটে মেরে ফেলাও নিষ্ঠুরতা নয়। কিন্তু তাও বাধ্য হয়ে আমায় করতে হচ্ছে—"

হরিহর বলিল, "এ তোমার অন্যায় হচ্ছে, পৃথ্বীশ—তোমার গোঁয়ের জন্য একটি বালিকার ইহজন্মটাই একেবারে নষ্ট হয়ে

যাবে! না তা কখনো হবে না!—বিশেষ এত পাকাপাকি বন্দোবস্তের পর—"

সীতানাথবাবু আর্দ্র স্বরে বলিলেন, "আমায় দয়া না হয় ত আমার মেয়ের মুখের পানে চেয়েও—একটা নারী-জন্মকে চিরদিনের দুঃখ-দুর্দ্দশা থেকে রক্ষা করবার জন্যও না হয়—"

পৃথ্বীশ বলিল, "বেশ, কিন্তু আমার সর্ত্ত আছে—"

"—বল, কি সর্ত্ত—"

"এ বিয়েয় আপনি যৌতুক-হিসেবে এক-পয়সাও আমায় দিতে পারবেন না—"

"বেশ বাবা, শুধু-শাঁখা-হাতে মেয়েকেই তোমার হাতে সম্প্রদান করব।"

"আর—"

"আর কি? বল।"

"বাজনাবাদ্যি করে, আলোর ঘটা নিয়ে চতুর্দ্দোলে চড়েও বিয়ে করতে যাব না, আমি। একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ ভাড়াটে গাড়ী—আর আমার ক'জন আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে—ব্যস! কিন্তু আমার বাবাকে এতে রাজী করাতে পারবেন কি?"

"সে ভার আমার। তিনি আমায় দয়া না করে থাকতে পারবেন না।"

হরিহর কহিল, "তাহলে চলুন, ওকে নিয়ে যাওয়া যাক। আমি ওদের বাড়ী খবর পাঠিয়েছি—'ভয় নেই, পৃথ্বীশ কোথাও সরে যাবে না, আমি নজর রেখেছি—তাকে ফিরিয়ে বাড়ীতে আনবই' বলে। তবে ওর মা থামেন, যে কান্নাকাটি লাগিয়েছিলেন—।"

সীতানাথবাবু কহিলেন, "তাহলে আর দেরী করো না বাবা—এ ধারে সন্ধ্যা হল!"

পথে মোটর দাঁড়াইয়াছিল। সকলে পৃথ্বীশকে লইয়া মোটরে চড়িয়া তাহার গৃহের দিকে ছুটিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতানাথবাবু চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন; বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আজ জীবনটার উপর দিয়া কি এ ঝড় বহিয়া গেল! এই সুখ, এই দুঃখ, আবার সুখ, ভারী বিচিত্র! আজ যে ঘটনাটা এই ঘটিয়া গেল, ইহা সত্যই ঘটিল, না, এ স্বপ্ন! —ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাড়া দিতেছিলেন, "ওগো স্ত্রী-আচার সেরে নাও—এধারে আর বিলম্ব নাই।"

পৃথ্বীশকে লইয়া মেয়ে-মহলে তখন স্ত্রী-আচার চলিতেছিল। নিরানন্দ পুরীতে আবার আনন্দের ঢেউ ছুটিয়াছিল। শাঁখের রোলে পাশের লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পৃথ্বীশও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—বিশেষ ললিতের নবোঢ়ার জ্বালায়! সে সজোরে পৃথ্বীশের কাণ মলিয়া দিলে পৃথ্বীশ রাগিয়া উঠিল, "আঃ—"

অমনি পাঁচ-সাতটা বীণা এক সুরে ঝঙ্কার তুলিল, "ওগো মিনি-পয়সার জিনিষ পেলে লোকে এমন হেনস্তাই করে থাকে—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার হাঁক পাড়িলেন, "ন্যান আপনারা—ঐ আটটা বাজল, লগ্ন বয়ে যায়—"

বর আসিয়া বসিলে কন্যাকে তাহার সম্মুখে বসানো হইল এবং মন্ত্র-পাঠ আরম্ভ হইল। ছেলে-মেয়েরা চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া আসিয়া বসিল। সীতানাথবাবু যখন কন্যা-জামাতার হাত এক করিয়া দিলেন, তখন আনন্দে

তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল! আহা, সুখী হও, দু'জনে চিরসুখী হও!

কন্যা-জামাতাকে বাসরে পাঠাইয়া স্বচ্ছন্দ মনে সীতানাথবাবু বাহিরে আসিলেন ; নরেশ বাবুকে অত্যন্ত আবেগে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমায় আপনি কিনে রাখলেন, চিরদিনের জন্য কিনে রাখলেন। ওঃ, আমার যে আজ কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর কি বলব ?"

নরেশবাবু বলিলেন, "আমার সঙ্গে আর ও-সব কথা কেন ? এখন এই ভদ্রলোকরা যাঁরা আসছেন, এঁদের আর বসিয়ে রাখা কেন ? ওঁদের বসাবার উদ্যোগ করা যাক্ না !"

ছাদের উপর ভোজনের স্থান হইয়াছিল —সকাল-সকাল আহারের ডাক পড়ায় উপস্থিত নিমন্ত্রিতবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ছাদে গিয়া উঠিলেন। সীতানাথবাবু নিজে আগাগোড়া খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করিতে লাগিলেন। "এঁকে আরো মাছ দাও-হে, ও পাতে খানকতক লুচি।—না, না, তাও কি হয়! আজ বড় আমোদের রাত—আপনারা আমোদ করুন।—ফেলা যাবে? যাক্ ফেলা—তার জন্যে কি!—ওরে সরবৎটা আর-একবার এদিকে আন্—আপনার কি চাই—? পটল-ভাজা—? ওরে, পটলভাজা, পটল—" এত টাকার মানুষ হইয়াও সীতানাথবাবু নিজে দাঁড়াইয়া সকলকে খাওয়াইতেছেন—কোনদিকে এতটুকুও না ত্রুটি হয়, সে বিষয়ে এমন লক্ষ্য! দেখিয়া নিমন্ত্রিতের দল চমৎকৃত হইয়া গেল।

এমন সময় গলির মোড়ে ঝমর্ঝম্ শব্দে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড সমারোহ করিয়া এক বর চলিয়াছে, বিবাহ করিতে! শব্দ নিকটে আসিল, ক্রমে আরও নিকটে —বাড়ীর সম্মুখে! শেষ বাজনার শব্দে লোকের কাণে তালা ধরিবার উপক্রম।

এমন সময় ললিত ছুটিয়া ছাদে আসিয়া ডাকিল, "মেজমামা—"

সে ডাক মেজমামার কানেও পৌঁছিল না। তিনি তখন ও-পাড়ার বিখ্যাত খাইয়ে নন্দ চাটুয্যের পাতে গুঁজিয়া কচুরি দেওয়াইতে ছিলেন। ললিত তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, "মেজমামা, এ আপনি করেছেন কি ? বর উমাকান্ত যে বাদ্যভাণ্ড নিয়ে উপস্থিত। তাদের বুঝি আর খবর দিয়ে বারণ করে পাঠান নি ?"

সীতানাথবাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তাইত—ভারী ভুল হয়ে গেছে ত! আহ্লাদের চোটে ও কথাটা আর মনেই পড়েনি! তাছাড়া সময়ই বা পেলুম কখন্, বল ? এদের নিয়ে ঠিকঠাক করে ফিরতেই ত পৌনে আটটা বাজল—তার পর ফিরেই বিয়ে দিতে বসলুম! তবে ফের্বার মুখে গাড়ীতে একবার কথাটা মনে হয়েছিল, ভেবেছিলুম, বাড়ী ফিরে তোকে দু-একজন মাতব্বরের সঙ্গে পাঠাব—কিন্তু আর মনেই পড়েনি।"

ললিত কহিল, "এখন উপায় ?" তাহার স্বরে অনেকখানি উদ্বেগ প্রকাশ পাইল।

সীতানাথবাবু তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত! কোন দুর্ভাবনাই তাঁহার মনে আর হুল ফুটাইতে পারে না! তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তার আব কি ? সব

অভ্যর্থনা করে বসাও। তারপর ঐ বড়ঘরে ওঁদের সমস্ত বরযাত্রীদের জন্য পাত করতে বলে দাও গে -”

ললিত অবাক হইয়া গেল! আনন্দের আতিশয্যে মেজমামার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি! এ কি বলেন!

সীতানাথবাবু কহিলেন, “অবাক হচ্ছিস তুই—? ছেলেমানুষ কি না! ওরে, আজ আমার বড় আহ্লাদের দিন—আজ আমার বাড়ী থেকে না খেয়ে কারো ফেরবার জো কি! সব পাত করিয়ে বসিয়ে দাও গে—তারপর আমিও যাচ্ছি—”

মামার খোসখেয়ালী মেজাজ দেখিয়া ললিতের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। মামা ত জানেন না, বাহিরে ঐ যে নূতন দলটি আসিয়া উদয় হইয়াছে, তাহারা কি দিয়া তৈরী পদার্থ!

উপর হইতে সীতানাথবাবু নামিয়া আসিলেন। বাহিরে একেবারে লোকারণ্য। দরদালান ও হলঘরে বরযাত্রীর বেজায় ভিড়! লক্ষ্মীকান্তকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া নমস্কার করিলেন, কহিলেন, “এই যে, বসুন, তামাক-টামাক পেয়েছেন ত ঠিক?”

লক্ষ্মীকান্ত কোন জবাব দিল না। ঝড়ের পূর্ব্বে বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরটা ভিতরে-ভিতরে যেমন ফুলিতে থাকে, বাহিরে শান্ত-মূর্ত্তি,—লক্ষ্মীকান্তর ভাবখানাও ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল।

বর উমাকান্ত একখানা কৌচে বসিয়া-ছিল। গায়ে লাল ভেলভেটের উপর জরির কাজ-করা চাপকান—পরিধানে যাত্রার রাজার মতই লাল ভেলভেটের হাফ-প্যাণ্ট; হাঁটুর নীচে সে প্যাণ্টের প্রান্তভাগটুকু গুটানো-মত; মাথায় জরি-দেওয়া লাল ভেলভেটের পাগড়ী, সম্মুখে সাদা একটা পালক খাড়া দাঁড়াইয়া,—বায়ু-স্পর্শে মৃদু দুলিতেছে!

সীতানাথবাবু কহিলেন, “জায়গা হচ্ছে—এখনই সব বসিয়ে দেব। ততক্ষণ—ওরে, পান নিয়ে আর না রে পান, মিঠে পান—দোনা, দোনা—আর কতকগুলো হুঁকো বেশী করে আন্—আর তামাক—”লক্ষ্মীকান্তর পার্শ্বে তাহারই এক সম্বন্ধী দাঁড়াইয়াছিল—মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—তাড়াতাড়ি বরযাত্রী আসিতে হইয়াছে বলিয়া কামাইবার আর সময় পায় নাই! গায়ে সার্ট,—হাতা দুইটা একটু বেশী দীর্ঘ—দেখিলেই মনে হয়, নিজের জামা নয়—আর-কাহারও, ধার করিয়া আজিকার রাত্রের মত গায়ে দিয়া আসিয়াছে। সম্বন্ধী হাতা দুইটা উহারই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে মাঝে-মাঝে টানিয়া উপরে তুলিতেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা আবার ঝুলিয়া পড়িতেছে! ভিতরে বরযাত্রীর দল নানাবিধ কলরব করিতেছিল।

লক্ষ্মীকান্তর ইঙ্গিতে তাহার সম্বন্ধী অর্থাৎ উমাকান্তর মাতুল বলিল, “বসতে ত বলছেন—কিন্তু এধারে এ কি সব শুনছি!”

সে কথা কানে না তুলিয়াই সীতানাথ বাবু বলিলেন, “ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওরে, জায়গা হল?”

লক্ষ্মীকান্ত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, “আসল কাজটা—”

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া মাতুল কহিল, "তার সঙ্গে খোঁজ নেই! বাড়ীতে পুরে অপমান করবার জন্যেই কি ওবেলা পায়ে ধরতে যাওয়া হয়েছিল? জুচ্চুরির আর জায়গা পাননি!" মাতুল ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল।

সীতাকান্তবাবু তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আহা, রাগ করচেন কেন? মুখে কিছু দিন আগে, তারপর কথাবার্ত্তা হবে'খন।"

লক্ষ্মীকান্ত কহিল, "আমরা নেমন্তন্ন খেতে আসিনি ত এখানে—"

মাতুল জের টানিল, "—আমাদের লুচির লোভ দেখানো হচ্ছে না কি! দু'খানা লুচি ভাজিয়ে খাবার সামর্থ্য আমাদের আছে।"

সীতানাথবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, "আজ্ঞে, তা কেন? তবে একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে কি ছাড়তে পারি?"

লক্ষ্মীকান্ত গম্ভীর স্বরে কহিল, "সীতানাথ-বাবু, চালাকি রাখুন।"

মাতুল কহিল, "পাজী ছোটলোক কোথাকার!"

বরযাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল, "লোকটা পাগল না কি!"

লক্ষ্মীকান্ত বুক ফুলাইয়া কহিল, "জানেন, আমি লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার!"

সীতানাথ কহিল, "আজ্ঞে তা আর জানিনে!"

—"তবে চালাকি করবেন না! সম্প্রদান করুন।"

"—সম্প্রদান ত হবার যো নেই—সে যে হয়ে গেছে!"

—"তা জানিনে—সম্প্রদান হওয়া চাই।"

—"হওয়া চাইই?"

—"হাঁ!"

সীতানাথ একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। এত গালাগালিতে আজ তাঁহার একটুও রাগ হইতেছিল না; তাঁহার চোখে আজ সমস্তই বেশ সহজ সরল বলিয়া ঠেকিতেছিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "ললিত, এই চাবি নিয়ে উত্তরের ঐ ঘরটা খোল ত বাবা।"

ললিত উত্তরের ঘর খুলিল। পারুলের সম্প্রদানের জন্য সীতানাথবাবু এই ঘরটিই সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন—স্তরে স্তরে দানের নানা সামগ্রী সাজানো—কেমন সুন্দর সব আসবাব, খাট-বিছানা, টেবিল-চেয়ার, কত বহুমূল্য গহনা, আরো কত কি। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই ঘরে বসিয়া এই সমস্ত সামগ্রী ও অলঙ্কারের সহিত তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু পৃথ্বীশের ধনুর্ভঙ্গ পণের জন্যই এ ঘর বন্ধ রাখিয়া দক্ষিণের একটা ফাঁকা ঘরেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইয়াছে। সীতানাথবাবু সেই ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীকান্তবাবু, আসুন।"

লক্ষ্মীকান্তর বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল—ঘরে পুরিয়া প্রহার দিবে না কি! শুভবিবাহের ইতিহাসে এরূপ ঘটনার অভাব নাই। কিন্তু যখন দেখিল, ঘরে মাত্র সীতানাথ একা, তখন সে সাহস করিয়া দল বাঁধিয়া প্রবেশ করিল।

সীতানাথ বলিলেন "বরকে বসতে বলুন।"

একখানা আসন পাতা ছিল, উমাকান্ত

আসিয়া তার উপর বসিল। সীতানাথ পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মীকান্তর কানে কানে মামা বলিল, "বোধ হয় মেজ মেয়েকে সম্প্রদান করবার মতলব করেছে—তা মন্দ কি! কি বল?"

লক্ষ্মীকান্তর মুখ বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সীতানাথ পাশের ঘর হইতে প্রকাণ্ড একটা থলি বহিয়া আনিয়া, বরের সামনে রাখিল—ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল।

সীতানাথ বলিলেন, "সম্প্রদানের বাকি ছিল এইটে—আসুন, শুভকার্য্য সম্পন্ন করি।" বলিয়া সেই থলিটায় হাত রাখিয়া সীতানাথ বরের পাশে বসিয়া পড়িলেন।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নিরুত্তর

চিরদিন নিরুত্তর মৌন এ অবনী,
তবু তার বক্ষে বহে মাণিক্যের খনি
অনিন্দিত পদ্মরাগ; কত না বেদনা
শষ্পে ঢাকা দিয়ে, হাস্য-প্রফুল্লবদনা
চেয়ে রহে অহর্নিশি
ব্যথা তার মূক রহে মিশি
নিশীথের শিশির সঞ্চয়ে
অন্ধকারে প্রস্ফুটিত পুষ্পের বিনয়ে!

আকাশ কহেনা কিছু, যুগ যুগ ধরি
একাগ্র অসীম স্নেহ নতনেত্রে ভরি
শুধু চেয়ে রহে, বক্ষে বহে আপনার
বিদ্যুতের বজ্রবাণ, ঝঞ্ঝা লাঞ্ছনার—
মেঘেরে মার্জ্জনা করি,
অন্ধকার দূরে অপসরি,
আনে ভানু, জ্বালে ধ্রুবতারা
নিরুত্তর চিরদিন সেও বাক্যহারা!

অটল পাষাণ অদ্রি ভাষা নাহি তার,
গলাইয়া হৃদয়ের জমাট তুষার
দিকে দিকে প্রবাহিয়া দেয় নদনদী
অপার ব্যথার শান্তি চাহে নিরবধি
অপরে সান্ত্বনা দিয়ে,
বাক্য যাহা কভু বাথানিয়ে
কহিবারে নারে কোনদিন,
সে বারতা অবারিত স্রোতোমাঝে লীন!

যে লগ্নে বচন নাহি রহে বচনীয়,
সে লগ্ন এসেছে প্রাণে আজি, বরণীয়!
আকাশ ধরিত্রী সম মৌন আমি তাই,
এ নিবিড় সমাধির কোন ভাষা নাই,
আছে অন্তরের দেখা,
অটুট নিকষে হেম-লেখা,
সে ছবি যে মুছিবার নয়,
সাধকের সাধনার অব্যর্থ প্রণয়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সত্যং ব্রূয়াৎ

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"—এ কথাটা পুরোনো কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেটিকে আমাদের নূতন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে আমাদের মধ্যে অনেকে যুগপৎ ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এ ত হবারই কথা। ইংরাজিতে বলে, "তলোয়ারের চাইতে কলমের ধার বেশি।" এই মত-অনুসারে বাংলার সমালোচক-বীরেরা লেখনীকে গুপ্তি হিসেবেই ব্যবহার করাই সঙ্গত মনে করেন। এ ক্ষেত্রে, সমালোচনার থোঁতা মুখ ভোঁতা করবার উদ্দেশ্যেই যে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন উপদেশ অনুসারে লিখ্‌তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সমালোচকদের মনে এরূপ সন্দেহ হওয়া একান্তই সম্ভব; এবং সাহিত্য সম্বন্ধে সংস্কৃত মত যে বাংলা-সাহিত্যে খাটে না একথা অস্বীকার করাও কঠিন। একটি জানা উদাহরণ নেওয়া যাক্। পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলে গেছেন যে, "মধুমিচ্ছন্তি ষটপদাঃ"। এ-কথা এ-কালের সমালোচকদের সম্বন্ধে খাটে না এবং খাটবার কথাও নয়। কেন না, বাক্যের মধুচক্র রচনা করা কাব্যের উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বোল্‌তার চাক তৈরী করা। এর থেকে প্রমাণ হয় সেকালের আলঙ্কারিকরা নিতান্ত স্থূলদর্শী লোক ছিলেন। তাঁরা খুঁজতেন রূপ, আমরা খুঁজি ছিদ্র। কাজেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল ফুল-ফোটানোর দিকে, আমাদের লক্ষ্য হুল-ফোটানোর দিকে।

তারপর, মানব-জীবনের সকলক্ষেত্রেই ঘাত-প্রতিঘাতের বলে যে সুফল ফলে এ-সত্য অবশ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের জানা ছিল না।—সে কালে জ্ঞান থাকলেও বিজ্ঞান ছিল না। আমরা কিন্তু জ্ঞানী না হলেও সকলেই বিজ্ঞানী। এও আমরা জানি যে, আমরা যদি আঘাত না করি তাহলে প্রতিঘাত আসবে না। সুতরাং সমালোচক-দের পক্ষে লেখকদের আঘাত দেওয়া কর্ত্তব্য। জীব-জগতের ধর্ম্ম রেশারেশি এবং কর্ম্ম পেষাপেষি—সুতরাং লেখকেরা পরস্পরের সঙ্গে গলা-গলি না করে পরস্পরকে গালাগালি করলে সাহিত্যের ইভলিউসন হতে বাধ্য।

এ সব কথাই সত্য। তবে উক্ত সংস্কৃত বচনটি যে অতি সুন্দর তা আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। এমন-কি, কোন-কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত উক্ত বাক্যটিকে এদেশের প্রাচীন সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে তুলে ধরেছেন। সুতরাং ও উপদেশটিকে আমরা হেলায় হারাতে প্রস্তুত নই। অতএব উক্ত বাক্যটির বর্ত্তমান যুগেও কোন সার্থকতা আছে কিনা তার বিচার করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ এই আপত্তি অনেকে তুলতে পারেন, যে যেহেতু ও-বাক্য সুন্দর সেই

কারণে তা অকেজো। বাক্যের সৌন্দর্য্য জিনিষটে যে অশিব এ-বিষয়ে ত পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকল-সমালোচক একমত। utilitarianism আমাদের একেবারে মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে; সুতরাং উক্ত বাক্যের কোনও utility আছে কিনা তাই অবশ্য বিচার্য্য। আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে ও-বাক্য মান্য করাতে সাহিত্যের কোনও লাভ না হোক, কোনও ক্ষতি হবে না।

বিচার্য্য শ্লোকের প্রতি ঈষৎ মনোযোগ দিলেই দেখা যায় যে তার প্রথম-অংশে ছুটি বিধি এবং শেষ-অংশে ছুটি নিষেধ আছে। আচার্য্য আদেশ করেছেন যে "সত্য কথা বলিয়ো, প্রিয় কথা বলিয়ো"। এ ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিধি। "প্রিয়সত্য বলিয়ো"—এ আদেশ তিনি করেন-নি। অতএব যে-সত্য উক্ত হলে শ্রোতা প্রীত হবেন, সে-সত্য গোপন করবার স্বাধীনতা আমাদের সম্পূর্ণ বজায় থাক্‌ল। সুতরাং উক্ত বচন অনুসারে যে-বস্তু সত্যসত্যই প্রশংসার যোগ্য তার প্রশংসা কর্‌তে আমরা বাধ্য নই—অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিভার প্রশ্রয় দেওয়াটা আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। সমালোচকেরা প্রিয়সত্য সম্বন্ধে মৌন-ব্রত অবলম্বন করাতে সাহিত্যের যে উপকার হয়, সে উপকার সাধন করা আমাদের আয়ত্তের ভিতরই থেকে গেল। উপরোক্ত বিধি ছুটি সম্পূর্ণ যে পৃথক তার প্রমাণ—সত্য বলবার বিধি থাক্‌লেও যখন প্রিয়সত্য বলবার বিধি নেই এবং অপ্রিয় সত্য বলবার নিষেধ আছে তখন বুঝতে হবে এ সত্য সেই সত্য যা প্রিয়ও নয় অপ্রিয়ও নয় অর্থাৎ নিরুপাধিক সত্য। এ-সত্য, দর্শনের অধিকারভুক্ত। অতএব "সত্য বলিয়ো" এ বিধি দার্শনিকের প্রতিই প্রযোজ্য,—সাহিত্যিকের প্রতি নয়। অপর-পক্ষে "প্রিয় বলিয়ো" এ বিধি সাহিত্যিকের প্রতিই প্রযোজ্য,—দার্শনিকের প্রতি নয়। তারপর "অপ্রিয় সত্য কহিয়ো না" এ নিষেধের দ্বারা যে-বাক্য মুখ্যতঃ অপ্রিয় তাই বাধিত হয়েছে, যা গৌণতঃ তা নয়। উক্ত বিধি শিরোধার্য্য করে সমালোচকেরা যদি এমন-কথা বলেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তি-বিশেষ কিম্বা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা এবং সে কথা যদি গৌণভাবে কারও পক্ষে অপ্রিয় হয় তাহলে তাতে-করে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয় না। অতএব উক্ত বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও, সমালোচকেরা যথেষ্ট অপ্রিয় কথা বল্‌তে পারেন।

তারপর দেখা যাচ্ছে যে "অপ্রিয় সত্য" বলাই শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ কিন্তু "অপ্রিয় মিথ্যা" বলা সম্বন্ধে কোনই নিষেধ নেই। এ বিষয়ে সমালোচকদের অবাধ স্বাধীনতা আছে। সুতরাং সমালোচনার হালফ্যাসান বজায় রাখবার জন্য উক্ত শাস্ত্রবচন অগ্রাহ্য করবার কোনই প্রয়োজন নেই। অতএব রবীন্দ্রনাথ নববর্ষের পয়লা বৈশাখে এই পুরোনো কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে সমালোচনার স্বাধীনতা অপহরণ কর্‌বার চেষ্টা করেন-নি।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উক্ত বাক্যটির আবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হন-নি, সেই-সঙ্গে তিনি বলে-ছেন যে শিশুসাহিত্যের পক্ষে শাসনের চাইতে লালন-পালন বেশি কল্যাণকর।

বড়র পক্ষে ছোটর উপর হাত-চালানো অকর্ত্তব্য—একথা বলায় এ বোঝায় না যে ছোটর পক্ষে বড়র উপর হাত-চালানো অকর্ত্তব্য। সুতরাং সমালোচকদের পক্ষে কৃতি লেখকদের প্রতি ধৃষ্ট তাড়না করবার অধিকার রবীন্দ্রনাথ কেড়ে নিতে চাননি। যে-সব সমালোচকদের motto এই—"মারি ত রাজা, লুঠি ত ভাণ্ডার" রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বীরত্ব খর্ব্ব করবার প্রস্তাব করেন নি। রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেন-নি যে, একের লেখার জন্য অপরকে গালিগালাজ করা অন্যায়। সুতরাং দেখা গেল যে রবীন্দ্রনাথ এমন কোনও কথা বলেন-নি যার দরুন সমালোচকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন। কেননা হালফ্যাসানের সমালোচনা তাঁর নিষেধের অধিকার-বহির্ভূত। একটি কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম। একের লেখার জন্য অপরকে প্রশংসা করতেও রবীন্দ্রনাথ কাউকে বারণ করেন-নি।

বীরবল।

রামছুঁচায়ন

ছুঁচামিতে বড় যারা তারা রামছুঁচা।
দুটা কান কাটা তাই মান ভারি উঁচা॥

* *
*

কিচ্‌ কিচ্‌ স্বরে ছুঁচা কয় একদিন।
"আমি প্রায় ক্ষুদ্রকায় কস্তূরী হরিণ"॥
খাঁদা নাক ফোলাইয়া ব্যাঙ কহে "ভাই!
এ খোঁজ রাখেনা কেউ কারো নাক নাই"॥

* *
*

সবঠাঁই গতিবিধি আছে যে ছুঁচার।
একথা সবাই জানে—ভুবনে প্রচার॥
ছুঁচার সর্ব্বত্র গতি—জানি ভালো-মতে।
দর্‌বারে সে যায়, কিন্তু, নর্দ্দমার পথে॥

* *
*

ছুঁচো কয় "শোনো মোর কুলজীর পাঁতি।
গণেশের বাহনের আমি হই জ্ঞাতি॥
বিধাতা অজাতশত্রু কৈল এ-জনায়।
অজগরও জব্দ হয় ঘাঁটালে আমায়"॥

* *
*

সাপে-কাটা ছুঁচো বার হয়েছে রে
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!
কেউটের বিষে বিষিয়ে উঠেছে
রক্ষা নাহিক আর!
মন্ত্র ওষধি কিছু নেই ওর,
ঘাঁটাসনে ওরে, বাপ্‌!
সাপে-কাটা ছুঁচো কাটে যদি সাপে
সাপই নাকি হয় কাবু!

* *
*

—ছুঁচা প্রতি নাই প্রীতি,—
তবে এ কেমন রীতি?—
ছুঁচার কীর্ত্তন কেন শোনে জনগণ?
—হায় বন্ধু, জান না কারণ?
বৈষ্ণব বাঙালী জাতি
তাই শুধু দিবারাতি
কীর্ত্তনের প্রীতে শোনে ছুঁচার কীর্ত্তন।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

প্রসাধন

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর-অঙ্কিত

শৈলদুর্গ

সঙ্কাহারী

কেহ কেহ বলিতেছেন, দ ... আবির্ভাবের অপেক্ষায় ... লে নাট্যশালায় পিণ্ডদানের

... গ বলেন, রবির আলো ... চামচিকেদের চর্ম্ম-চক্ষে সহে ... আলো শীতল করিবার ... কবি বলিতেছেন—

... য়ে থুতু দিতে
... ড়ছে বাদুড় মেলা
... ক! নাম কিন্‌বি যদি
সঙ্গ নে এই বেলা॥

* *
*

... নবকুমারের ... দেখা গেল যে তিনি লক্ষ্মী ... সেইজন্য লক্ষ্মীমন্ত ও তাঁহা ... তিনি কখনো মন-যোগাই ... না। তিনি কেবল মরালদে ... ক্ষীর সঞ্চয় করিবেন।

* *
*

ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলাম যাত্রার সঙে দাড়ি-গোঁফ সুদ্ধ পুরুষ, মেয়ে সাজিয়াছে। সম্প্রতি দেখিতেছি বাংলা সাহিত্যে এমনিতর সং বাহির হইয়াছে। কখনো বিবি-বেশে কখনো দিদি-বেশে লোক হাসাইতেছে। মনে পড়ে একবার দপ্তরীর বেশও দেখিয়াছিলাম—সেইটিই কিন্তু সব-চেয়ে মানাইয়াছিল।

* *
*

সাহিত্য-পুঙ্গবেরা কবি-জননী সরস্বতীকে না কি ঘুঁটে-কুড়ানী নামে অভিহিত করিতেছেন। সাহিত্যকুঞ্জে যেরূপ গোরুর পাল প্রবেশ করিতেছে তাহাতে বিল্ ঘুঁটে ডাঁই হইয়া কুঞ্জের সব ঠাঁই শীঘ্রই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। সেইজন্য জননী ভারতীর সেবকেরা এখন গোরুও তাড়াইতেছেন—ঘুঁটেও পোড়াইতেছেন।

* *
*

নাট্যশালার দৌলতে আমরা পুরাকালের মুনি-ঋষিদের চাক্ষুষ করিয়াছি, বহু দেব দেবীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, এইবার পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী দেখিলাম।

আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল প্রাণের দায়ে চীৎকার করিতেছে—"ভারতীর হাতে ঝাঁটা কেন?" ভারতী উত্তরে বলিতেছেন—"বাছা, তুমি আগে দূর হও—বীণা ত আমার আছেই!"

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত